“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com
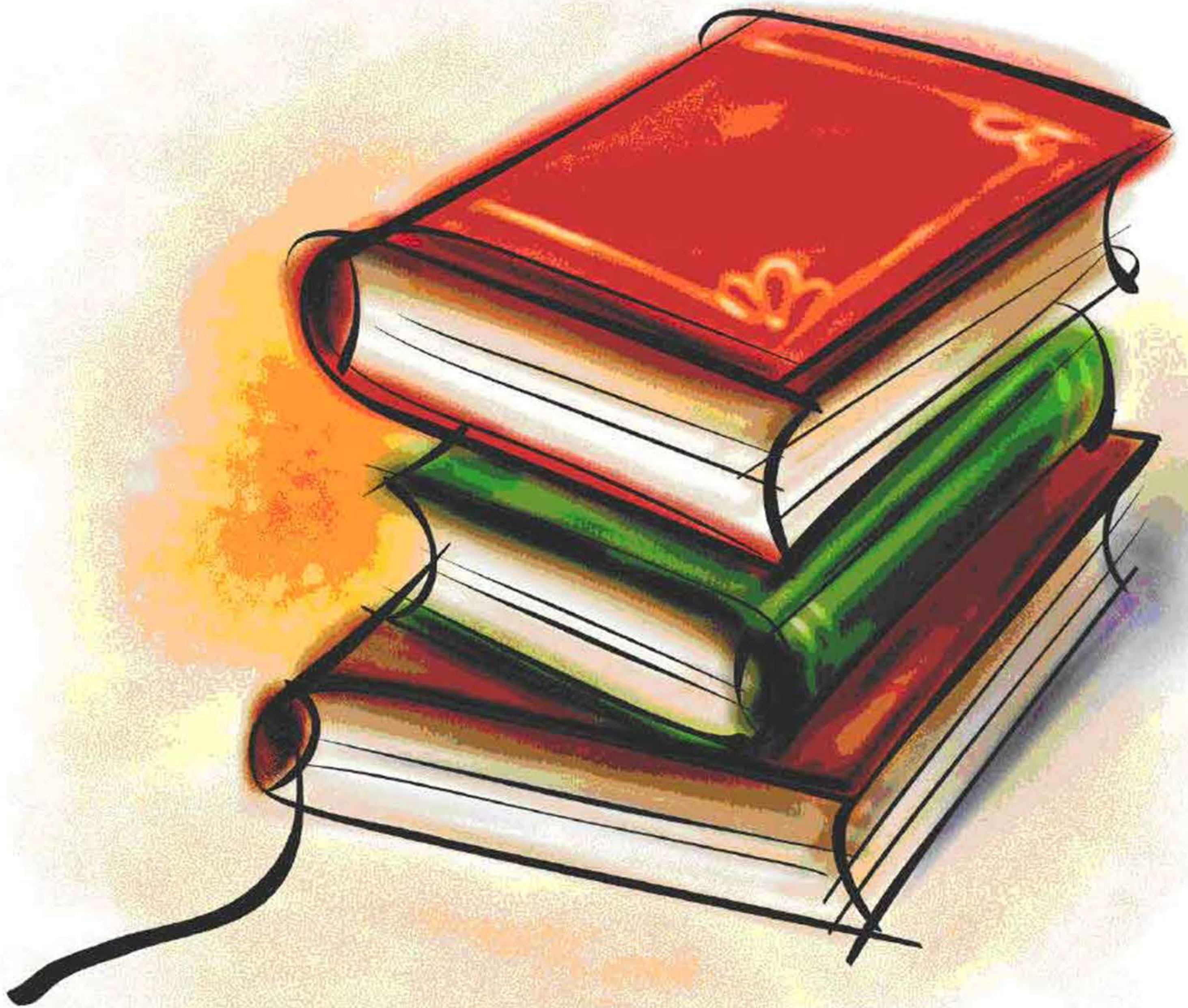
বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

মাসিক পত্র।

নবম বর্ষ।

১৩১৬।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কালিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত মনিলাল, গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সর-কার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমতী জ্যোৎস্নালতা দেবী, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুম-দার, ও সম্পাদক

প্রভৃতি।

এস্, সি, মজুমদার কর্ত্তৃক
২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

বঙ্গদর্শন।

বিস্মৃত জনপদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

সে আজ প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কথা, যখন দাক্ষিণাত্যে এক হিন্দু সাম্রাজ্য হিন্দু-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিংহল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত শাসন করিত। তাহার ধন জন-গৌরব পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল। তাহার লক্ষাধিক বীর যোদ্ধৃপুরুষ বর্ম্মে চর্ম্মে সুশোভিত হইয়া গর্ব্বে জয়ধ্বনি করিত, তখন সাগর হইতে শৈলমালা পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিত। সেই অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়া পর্ত্তুগীজ পায়েস্ (Paes) বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দুর দুরদৃষ্ট—ভারতের দুরদৃষ্ট—যে আমরা এখন তাহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি!

পর্ত্তুগীজ পায়েস এবং নুনিজের কাহিনী না থাকিলে কে আজ বিশ্বাস করিত যে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই বিপুল জনপদের একচ্ছত্র নরপতি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন,—এমন কি উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার করায়ত্ত ছিল? কে আজ বিশ্বাস করিত যে তাঁহার অধীনে প্রায় তিন শতাধিক বন্দর ছিল?—সেই সকল বন্দরে বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে আগমন করিয়া যখন রাজপ্রাসাদ ও নগর শোভা দর্শন করিত তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইত এবং বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে দেখিত তথায় সুবর্ণ মণ্ডিত মণিমাণিক্যখচিত অথবা হস্তি দন্তে নির্ম্মিত কক্ষের অভাব নাই! আজ এতকাল পর এ কাহিনী শুনিলে ইহাকে আরব্য উপন্যাসের কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, যে এত ঐশ্বর্য্য, এত মণিমাণিক্য, এত হীরক কণক আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ স্পর্শ না করিলে দেখা যায় না!

কিন্তু ইহা কল্পনা নহে—অথবা উপন্যাস নহে—এ কাহিনী সত্য। ইহা সত্য যে সেই বিস্মৃত জনপদের জনৈক নৃপতির হস্তিশালায় পঞ্চশত সুন্দর অশ্ব বিরাজ করিত—তাঁহার নেতৃত্বাধীনে লক্ষাধিক সৈনিক হিন্দু-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা মরিতে প্রস্তুত ছিল! ইহা সত্য যে তিনি যে পালঙ্কে শয়ন করিতেন তাহার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বেধের রেলিং ছিল—সে রেলিং কাষ্ঠের বা প্রস্তরের বা স্বর্ণের ছিল না, উহা মতির ছিল; ইহাও সত্য যে তাঁহার রাজ-

প্রাসাদে হস্তিদন্তনির্ম্মিত* কক্ষ ছিল—কক্ষপ্রাচীরগাত্রের লতা পুষ্প পল্লব শিল্প-নৈপুণ্যে পাশ্চাত্য জগতকেও পরাজিত করিয়াছিল! যাঁহারা সে সমুদয় দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদের লিখিত কাহিনী এতকাল পর জনসমাজে প্রচারিত হইতেছে। সে কাহিনী হিন্দুর গৌরবের কাহিনী—ভারতের গৌরবের কাহিনী—তাহা পতিত হিন্দু জাতির হৃদয়ে তড়িৎ ছুটাইবে সন্দেহ নাই।

যে আজ বহু দিনের বার্দ্ধক্য-জীর্ণ সুদূরাগত কোন্ এক অতি পুরাতন ঐতিহাসিক কালেরও অতীত যুগের বস্তুত ইতিহাস, যখন দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়, চোল, কর্ণাট, পাণ্ড্য, চেরা, কেরল প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; যখন পাণ্ড্য রাজের সহিত চোল-রাজের নিয়ত সমর ঘটিত, যখন উত্তর কেরলের এক স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বাধীন থাকিয়া যদু রাজপুত-বংশের বেলালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল; যখন নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ কেরল তাহার স্বধর্ম ত্যাগী ইসলাম মন্ত্রে দীক্ষিত ভূপতির অধীনে থাকিতে অস্বীকার করিয়া নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল;—আজ যে বিস্মৃত জনপদের গৌরব মণ্ডিত কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি তখনো তাহার জন্ম হয় নাই। তখন দাক্ষিণাত্যে কেবল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা বাস করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে মাদুরার পাণ্ড্য ও তাঞ্জোরের চোল-রাজই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহম্মদ যে দিন খলিফার আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে গজনীর সুলতান বলিয়া প্রচারিত করিলেন, ভারতের ভাগ্য বিধাতা সে দিন পুনরায় নূতন করিয়া ভারতবর্ষের অদৃষ্ট লিপি লিখিয়াছিলেন! স্বরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুলতান মহম্মদ সমরাভিযানে বাহির হইলেন। যে স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম্মানুরাগ বীর সেকেন্দরকেও ভারতবর্ষ বিজয়ে বাধা প্রদান করিয়াছিল তাহা তখনো দেশে বর্ত্তমান ছিল। গঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে নর্ম্মদা পর্যন্ত, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজন্যবর্গ স্বদেশ রক্ষার্থ সুলতান মহম্মদকে বাধা প্রদান করিয়া ইতিহাসে অমর হইলেন। যুদ্ধে সুলতানেরই জয় হইল। প্রথমে পঞ্চনদ, পরে মুলতান এবং শেষে অন্যান্য স্থানে অকারণ নর হত্যায় † রুধির স্রোত বহাইয়া মহম্মদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সুলতান মহম্মদ ভারতবর্ষে যে লুণ্ঠন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা বহু দিন ধরিয়া অব্যাহত ছিল এবং তাঁহার সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দী মধ্যেই মুসলমান সাম্রাজ্য দিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের নানাস্থান শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রোথিত করিতেছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় হিন্দু রাজগণ প্রতিনিয়ত সমর-দুন্দুভি নিনাদ করিয়া উত্তর ভারতকে জাগ্রত-সচেতন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

* Elephinstone's History of India, p.240.
† Rennell Memoirs of Hindustan.

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্দ্দমনীয় মুসলমান তেজঃ দক্ষিণাত্যের দিকে লোল-রসনা মেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আল্লাউদ্দীন খিলিজি ১২৯৭ খৃঃ অব্দে দেবগিরি জয় করিয়া লইলেন। চারি বৎসর পর গুর্জ্জরি ভূমি আক্রান্ত হইল। ১৩০৩ খৃঃ অব্দে ওয়ারেঙ্গলে যুদ্ধ ঘটিল। প্রতি যুদ্ধেই হিন্দু বীরগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১৩০৬ খৃঃ অব্দে পুনরায় দেবগিরিতে যুদ্ধ ঘটিল। তখন হিন্দু সামন্তগণ ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজ্যলিপ্সা ও ধন লিপ্সা মুসলমানদিগকে ক্রমেই উত্তেজিত করিতে লাগিল। সুবিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর তখন অগণিত সৈন্য সমভি-ব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুগণ টলিল। দেখিতে দেখিতে ওয়ারেঙ্গল শত্রু কবলে আক্রান্ত হইল, বেলালদিগের বহু পুরাতন রাজধানী দ্বার সমুদ্র মুসলমান সেনাপতির করতলগত হইল। কাফুর বিজয় গর্ব্বে অগ্রসর হইয়া মালাবার তীরে একটী মসজেদ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার নিম্মম অস্ত্রাঘাতে হিন্দুর দেব মন্দিরগুলি বিচূর্ণীত হইল—রাজ কোষ লুণ্ঠিত হইল—পদ-দলিত গ্রাম শস্য ক্ষেত্র শ্মশান হইল! সমগ্র হিন্দু-প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া কাফুর দিল্লির সম্রাটের জন্য ৩১২টী হস্তি, বিংশ সহস্র অশ্ব এবং প্রায় লক্ষ মণ স্বর্ণ ও বহু মণি-মাণিক্য লইয়া প্রস্থান করিলেন।*

মুসলমানদিগের দারুণ রাজ্য লিপ্সা তখনো চরিতার্থ হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্তও তাঁহারা কেবল দেবমন্দির লুণ্ঠন ও হিন্দুর শোণিতে তর্পণ করিয়া আসিতে-ছিলেন—দাক্ষিণাত্যে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৩১৮ খৃঃ অব্দে আল্লাউদ্দীনের পুত্র মবারক দেবগিরিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার আদেশে দেবগিরি-পতি হরপাল নিতান্ত নৃশংস ভাবে নিহত হইলেন। হরপালের রুধির রঞ্জিত ছিন্ন মুণ্ড শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দেবগিরির সিংহদ্বারেই স্থাপিত হইল! কয়েক বৎসর পরেই একমাত্র ভরসার স্থল ওয়ারেঙ্গলও মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইয়া গেল।

হিন্দুগণ প্রমাদ গণিলেন! যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপাত করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, যে ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য কত বীর যোদ্ধা অনায়াসে সমর ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, হিন্দু নরপতিগণ অতি ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিতে লাগিলেন তাহা আর থাকে না! ১২৫০ খৃঃ অব্দ মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। বিজয় গর্ব্বে উল্লসিত সাম্রাজ্যলোলুপ লুণ্ঠনলুব্ধ মুসলমান যোদ্ধৃগণ তখন উত্তর ভারতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়া দক্ষিণ ভারত গ্রাস করিবার জন্য গর্জ্জন করিতেছিল। তখনো কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ হইতে সমগ্র দক্ষিণ ভারত হিন্দুনরপতিদিগের অধীনে ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা তখন শক্তিহীন, মুসলমান অত্যা-চারের ভয়ে শঙ্কিত হৃদয়, এবং ভবিষ্যতের

* Ferista, Dow (vol I. p 307)

প্রতি বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তখন এখন এক আকস্মিক ভূমিকম্পে থর থর কম্পিত হইতেছিল। হিন্দুগণ দেখিলেন, দেশ যায়—ধর্ম্ম গেল—সব ভাসিয়া গেল! সে দেশ রক্ষা করিতে পারে এমন আর তখন কেহ ছিল না—সে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে তেমনও আর কেহ ছিলনা!

এমন সময়ে মহম্মদ তোগলক আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার নানাবিধ ব্যয় বাহুল্যে রাজকোষ শূন্য প্রায় হইয়া উঠিল। তিনি কাগজের মুদ্রা (!) প্রবর্ত্তিত করিলেন; দেশে এবং বিদেশে সে মুদ্রা চলিল না। বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল—দেশের লোক অন্ন এবং অর্থের অভাবে শেষে দস্যু হইয়া উঠিল! গৃহস্থ গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, কৃষক শস্যক্ষেত্র ফেলিয়া কাননাভ্যন্তরে মাথা লুকাইল, মহম্মদের আদেশে দেশমধ্যে রুধির-স্রোত বহিতে লাগিল!

রাজার অত্যাচার বৃদ্ধি না হইলে সুখ-সুপ্ত প্রজার নিদ্রালস নয়ন উন্মীলিত করিবার কারণ হয় না, হৃদয়ে নবজাগরণের নবীন স্পন্দনও অনুভূত হয় না। মহম্মদের অত্যাচারে যখন প্রজার অর্থ ও জীবন পদ্মপত্রে বারি-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল হইল তখন রাজ্য মধ্যে প্রথমে অসন্তোষ, পরে রোষ এবং শেষে মুক্তি কামনায় বিদ্রোহ দেখা দিল। মালব জ্বলিয়া উঠিল। পঞ্চনদে সমর দুন্দুভি বাজিল, বাংলা বিদ্রোহী হইয়া বাদসাহের করচ্যুত হইয়া পড়িল, করোমণ্ডল বাংলার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক পুনরায় স্বাধীন হইল, বহিঃশত্রু আফগান ও গক্করগণ সুযোগ বুঝিয়া ভারতবর্ষে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। এই উদ্বোধন সঙ্গীত, এই নব-জাগরণের প্রথম উষালোক ব্যর্থ হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের ভয়বিজড়িত হিন্দুনরপতিগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভারত-গগণ রক্তাভ হইয়াছে—বিহগকূজনে স্বাধীনতার মত্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, প্রতি পত্রমর্ম্মর যেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কহিতেছে—ওঠো—জাগ—কর্ম্মে অগ্রসর হও—আত্মপদে ভর করিয়া, গৃহকলহ মিটাইয়া মিলিত হও—তৃণগুচ্ছও মত্ত জন্তুকে বাঁধিয়া রাখে! বিপদ ও বাধা যখন জ্ঞানাঞ্জনশলকা স্পর্শে তাঁহাদের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিল তখন ওয়ারেঙ্গল, দ্বারসমুদ্র এবং অনেগুন্দি একত্র সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের গতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল! তিনটী ধূলিবিন্দু একত্রিত হইয়া তখন সেই বিশাল সাগরের উৎক্ষিপ্ত বারিরাশিকে বাধা দিতে চাহিল! কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা—কি প্রমত্ত দুরাশা—কি অসামান্য স্বদেশ-হিতৈষা!

তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—মুক্ত পবন বহিল, প্রভাত তপনে তীক্ষ্ণ তরবারি ঝলসিয়া উঠিল—শাণিত বর্শাফলক শত্রুরুধির পানের জন্য কম্পিত হইল;—মুসলমানগণ সে দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইলেন, মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিত-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন হিন্দু কিরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে! কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত বর্ষ হইল, বর্ষ যুগে যাইয়া দাঁড়াইল—যুগ মন্বন্তরে পরিণত হইল। মুসলমানগণ

তখনো দণ্ডায়মানই রহিলেন! তারপর সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী চলিয়া গেল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম অটুট রহিল!

স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার এই প্রচেষ্টাই অধুনা-বিস্মৃত বহু গৌরবমণ্ডিত বিজয়নগরের অমলোজ্জ্বল ইতিহাস। ক্ষুদ্র জনপদ অনেকগুলি কিরূপে সেই বিপুল সাম্রাজ্য বিজয়নগরে পরিণত হইয়াছিল, বিজয়নগর কিরূপে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এই সার্দ্ধদ্বিশতাব্দীর কাহিনী তাহারই বিস্ময়কর ইতিহাস। সে ইতিহাসকে শুধু দাক্ষিণাত্যের হিন্দুর গৌরবের ইতিহাস বলিয়া মনে করিনা—তাহা ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দুর গৌরবের ইতিহাস।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ব্যাক্‌টিরিয়া

আমাদের মত বসন্ত, কলেরা প্লেগ ও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে 'ব্যাসিলস' বা ব্যাক্‌টিরিয়া শুনে নাই এমন লোক দুর্লভ। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের শতকরা নিরনব্বই জনের ভাসা ভাসা নিতান্তই অস্পষ্ট রকমের ধারণা আছে এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

এই অণুবীক্ষণিক জীবগুলি জগতে না থাকিলে একদিকে আজিকার দুঃখ দৈন্য রোগ শোকের অধিকাংশের যেমন লাঘব হইত অন্য দিকে তেমনি এই সুন্দর শ্যামল ধরিত্রীর বক্ষে মানুষ পশু পক্ষী তরুলতা তৃণ-গুল্মেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যাইত না।

কারণ জন্ম মৃত্যুর এই যে চিরন্তন আবর্ত্ত, এই যে আবহমান চক্রের পরিবর্ত্তন, ব্যাক্‌টিরিয়াই ইহার যোগ রক্ষা করিতেছে। ব্যাকটিরিয়া ব্যতীত আপাততঃ আমাদের জীব জগতের এই 'ধূলার শরীর' ধূলায় মিশাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। বাঘের পক্ষে খড় ও ষণ্ডের পক্ষে মাংস যেমন প্রাণ রক্ষার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে, বিশুদ্ধ জৈবিক পদার্থও গাছের পক্ষে সেইরূপ; খুব ভাল পোলাও কালিয়া কিম্বা পাঁঠার মাংস দিয়া ঘিরিয়া রাখিলেও গাছ অনাহারে মরে। কারণ জৈবিক পদার্থ যতক্ষণ না ভাঙিয়া চুরিয়া আবার আপনার আদিম মৌলিক অজৈবিক পদার্থে ফিরিয়া যায় ততক্ষণ গাছের তাহা অখাদ্য; গাছ তাহাকে কোনো কাজেই লাগাইতে পারে না। জৈব পদার্থকে ভাঙিয়া চুরিয়া গাছের খাদ্য হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্ব্বণ নাইট্রোজেন প্রভৃতি অজৈব পদার্থে পরিণত করিবার শক্তি শুধু এই ব্যাক্‌টি-রিয়ারই আছে। অতএব ব্যাকটিরিয়া নহিলে জগতে মুহূর্ত্তের জন্যও উদ্ভিদ টিঁকিতে পারে না এবং উদ্ভিদ নহিলে মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের জীবন ধারণও সম্ভব নহে।

ব্যাকটিরিয়ার এই ভাঙা চোরার প্রণালীকে সাধারণ ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি "পচন।" পচিয়া ওঠা জিনিষটা মোটেই চিত্তপ্রফুল্লকর নহে—পচা ও ঘুণ ধরার প্রণালী জগতে না থাকিলে অনেক ক্ষতি এবং অসুবিধার হাত হইতে মানুষ নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু ইহার আর একটা দিকও আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত যত গাছের গুঁড়ি ভাঙিয়া পড়িয়াছে সমস্তই তাহা হইলে পৃথিবীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া থাকিত, পশু পক্ষী জীব জন্তুর স্তূপাকার মৃতদেহে পৃথিবী জীবিতের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত।

বস্তুতঃ পচিয়া ওঠা ব্যাপারটা আমাদের কাছে এতই নিত্য এবং সত্য যে কোথাও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিলে আমরা নিতান্ত বিস্মিত হই। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তস্থিত তৃণাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তরে শীকারীরা মহিষ মারিয়া ফেলিয়া আসিত, গ্রীষ্মের কয়মাস রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যেও তাহা অবিকৃত থাকিত; এবং কয় বৎসর পূর্ব্বে সাইবিরিয়ার তুষারময় মরুভূমে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মৃত যে সকল হস্তীর দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে দিনও তাহারা সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল, এমন কি শীকারী কুকুরেরা তাহাদের মাংস ছিঁড়িয়া খাইয়াছে—এ ঘটনা আজও লোকের অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সে আজ ত্রিশ বৎসরেরও কথা নহে। তখনও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা মনে করিতেন জীবের শরীরের ভিতরেই যে সকল রাসায়নিক পদার্থ রহিয়াছে মৃত্যুর পর তাহাদেরই প্রভাবে জৈবিক পদার্থ পচিয়া গলিয়া যায়। এ সম্বন্ধে যাঁহারা কোনো প্রকার আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের আজও যদি বলা যায় যে মৃত জীব জন্তু অথবা জৈবিক পদার্থের নিজস্ব এমন কিছুই নাই, যাহা হইতে তাহারা আপনাপনি পচিয়া উঠিতে পারে, যদি তাঁহাদের বলা যায় যে ব্যাক্‌টিরিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারিলে মাছ মাংসের পচা দূরে থাকুক তাহাতে কোনোরূপ দুর্গন্ধও আসিতে পারে না, দুধ ও রক্ত চিরদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, ঘরের কাঁচা কাঠের খুঁটিকেও পাথরের মতই শত বৎসর সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, তবে সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিবার আশঙ্কা থাকে।

অথচ শত সহস্র ছোট বড় মাঝারি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা গৃহে বহুবার ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।—এবং বিজ্ঞান-কুহেলিকা মুক্ত এই সত্যকে পৃথিবীর লোকে সর্ব্বত্রই আজ কাজে লাগাইতেছে।

ব্যাকটিরিয়া অধিকাংশ রোগের মূল—এ কথা সম্বন্ধেও আমাদের ঐ রূপই ধারণা। ইঁদুর প্লেগ-ব্যাসিলস বহন করে—এ সংবাদ আমাদের অধিকাংশ সংবাদ পত্রের কাছে নিতান্ত হাস্যজনক ব্যাপার, এবং মশা ম্যালেরিয়ার "বীজ" বহন করে, এ উক্তিকেও আমরা পাগলের প্রলাপ বলিয়াই জানি।

কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের অবকাশ থাকে না।

এই ত এত ক্ষুদ্র জীব—অনুবীক্ষণ নহিলে খালি চোখে ইহাদের কোনোটিই দৃষ্টি গোচর হয় না। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটিরিয়ার বিভিন্ন আকার—কেহ বা গোলাকার, কেহ বা ডিম্বাকৃতি, কাহাকেও দেখিতে খণ্ড খণ্ড সূতার মত। এই শেষোক্তদের কেহ বা সোজা ও খাড়া, কেহ বা স্ক্রুর মত প্যাঁচাল; সাধারণতঃ গড়ে ইহাদের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ, ইহাদের অনেকেরই দৈর্ঘ্য (অথবা প্রস্থ) ইহার অর্দ্ধেকেরও কম।—এক ইঞ্চির দুইশত ভাগের এক ভাগই সাধারণ লোকের চোখে ধরা পড়ে না—অতএব একটি ব্যাকটিরিয়মকে সুধু লোকচক্ষুর গোচর করিতে হইলেও অনুবীক্ষণের সাহায্যে অন্ততঃ তাহাকে দুই শত গুণ 'ম্যাগনিফাই' করিতে হয়, তাহার আকৃতি প্রকৃতির কোনো রূপ পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহার পরেও অন্ততঃ দশগুণ ম্যাগনিফাই না করিলে চলে না। একজন সাধারণ মানুষের দৈর্ঘ্য হাজার গুণ বাড়াইয়া দিলে, তাহার মাথা পৃথিবী ছাড়াইয়া এক মাইল ঊর্দ্ধে আকাশে গিয়া ঠেকে, কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়াকে হাজার গুণ ম্যাগনিফাই করিলেও, একটি কাচ খণ্ডের উপর এক বিন্দু জল রাখিয়া আর একটি কাচ খণ্ড তাহার উপর চাপিয়া ধরিলে যতটুকু স্থান থাকে তাহার মধ্যেই সে নড়িয়া চড়িয়া, সাঁতার কাটিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবার যথেষ্ট স্থান পায়!—বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পৃষ্ঠার যতটুকু ঘনত্ব, ততটুকুর মধ্যে ইহাদের একশত হইতে আড়াই শতের পাশাপাশি বসিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না!

আকারের এই ক্ষুদ্রতা ইহারা বংশ বৃদ্ধির দ্রুততায় পোষাইয়া লইয়াছে। ব্যাকটিরিয়ার স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই—প্রত্যেকেই নিজের শরীরকে আধাআধি ভাগ করিয়া নূতন নূতন জীব সৃষ্টি করে। শরীরে লম্বালম্বি মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটি রেখার দেখা দেয়, শরীর ইতিমধ্যে বাড়িয়া উঠিতে থাকে এবং অবশেষে এই ক্ষীণ পর্দ্দা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া শরীরকে যখন দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, তখন দুইটি খণ্ডাংশই পরিপূর্ণ পূর্ণাবয়ব ব্যাকটিরিয়া; মাতা অথবা পিতার সহিত শিশু ব্যাকটিরিয়ার আকারে প্রকারে কোনোই প্রভেদ থাকে না। সন্ততিদের মধ্যেও এই রূপ বিভাগ চলিতে থাকে। অনুকূল অবস্থায় ব্যাকটিরিয়ার অনেক স্পিসিসে (Species) এইরূপ এক ঘণ্টার মধ্যেই এক দুইয়ে পরিণত হয়, পরবর্ত্তী ঘণ্টায় দুই হয় চার, এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জিওমেট্রিক প্রোগ্রেষণে একের বংশ অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ বাড়িয়া উঠে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপে এক ব্যাকটিরিয়ার বংশ ১৬০০০০০০ এক কোটী ষাট লক্ষ এবং আটচল্লিশ ঘণ্টায় ৩০০,০০০,০০০,০০০,০ তিন শত হাজার কোটীতে পরিণত হয়। শত-কোটী কথাটা আমরা কারণে অকারণে প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়া কোটীত্বের পরিমাণ সহসা করিয়া ওঠা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।—খ্যাতনামা পণ্ডিত Cohn হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, অণু পরিমাণ এই একটি জীবের সন্তান সন্ততি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওজনে এক সেরেরও

অধিক হইয়া উঠে, তাহার পর এই অবিরাম জিওমেট্রিক প্রোগ্রেষণের ফলে এক ঘণ্টা পরেই এক সের হয় দুই সের, এবং দুই ঘণ্টা অন্তে দুই সের চারি সেরে পরিণত হয়। Cohn দেখাইয়াছেন এই রেটে অবাধে বাড়িতে পাইলে একটিমাত্র ব্যাকটিরিয়ার বংশে পৃথিবীর সমস্ত সাগর উপসাগর পাঁচ দিনের মধ্যে ভরিয়া যায়।

সৌভাগ্য ক্রমে ব্যাকটিরিয়ার এই বিপুল বংশ বৃদ্ধির পথে অসংখ্য বাধা আছে। প্রকৃতি একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ তাহাকে দেন না, প্রায়ই তাহাদের খাদ্যাভাব ঘটে, অনেকের পক্ষে শীত গ্রীষ্মের সামান্য একটু কম বেশি এমন কি সামান্য একটু মাত্র আলোড়নও মারাত্মক সূর্য্যালোক ইহাদের প্রবল শত্রু। অনেক species এর অক্সিজেন নহিলে চলে না, অনেকের পক্ষে বায়ু বিষের মত, ইহার সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

আর কিছু না হৌক, এই সকল হিসাব হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে অবস্থা অনুকূল হইলে অভাবনীয় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা ইহাদের আছে।

মানুষ ও পশুদের অনেক রোগই যে স্পর্শ সংক্রামক অতি প্রাচীন কালেও মনুষ্য সমাজে তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সুস্থ সবল নীরোগ দেহ, রোগীর সামান্য একটু সংস্পর্শে কেমন করিয়া যে পীড়িত হইয়া ওঠে সে সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক কল্পনা জল্পনায় অনেক জাতিরই প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ। 'খোস' ও 'পাচড়া' জাতীয় নানাবিধ চর্ম্ম-রোগ পাশ্চাত্য জগতে এক সময়ে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরব্য, ইতালীয়, ফরাসী ও জর্ম্মাণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ তর্ক বিতর্কের অন্ত ছিল না। কেহ বা মনে করিতেন অপরিচ্ছন্নতাই ইহার মূল ও একমাত্র কারণ,—যেখানে অপরিচ্ছন্নতা, স্থান কাল পাত্র বিচার না করিয়া সেখানেই এই ব্যাধি আপনা আপনি দেখা দিবে। কেহ বা 'খোসের' ক্ষতের ভিতর সূক্ষ্মকায় সরীসৃপবৎ এক কীটের অস্তিত্ব দেখিয়া মনে করিতেন, ইহারাই রোগের একমাত্র কারণ। এই কীট আবিষ্কারের পর তর্ক উঠিল কীট হইতে ব্যাধির না ব্যাধি হইতে কীটের উৎপত্তি! এবং ইহা লইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণা দেখা দিয়াছিল তাহা সর্ব্বাংশে পাত্রাধারে তৈল অথবা তৈলাধার পাত্রেরই অনুরূপ।

অবশেষে 'বাক্যের ঝড়' এবং 'তর্কের ধূলায়' ক্লান্ত হইয়া একজন একদিন আপনার শরীরে এইরূপ একটি কীট প্রবেশ করাইয়া প্রমাণ করিলেন কীটই ব্যাধির কারণ, ব্যাধি কীটের কারণ নহে।—এইরূপ অসংখ্য পরীক্ষার ফলে ক্রমশ দেখা গেল, কীটমাতা একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া অণ্ড প্রসব করে, এবং অণ্ড হইতে যে সকল কীট বাহির হয় তাহারাই ব্যাধির জনক। ইহাদিগকে কোনো প্রকারে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে, সহস্র প্রকার অপরিচ্ছন্নতাতেও খোস হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

বস্তুতঃ অণুবীক্ষণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অনুবীক্ষণের এত দ্রুত উন্নতি না হইলে আজও আমাদিগকে শুধু অন্ধকারেই হাতড়াইয়া ফিরিতে হইত।

সৌভাগ্য ক্রমে জলস্থল পরিপূর্ণ করিয়া এই যে অসংখ্য জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া বিরাজ করিতেছে ইহাদের অল্প সংখ্যকই ব্যাধি-জনক। ইহারা অন্যান্য ব্যাকটিরিয়ার মত 'প্রাণ হীন' জৈবিক পদার্থ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না—মানুষ ও উচ্চশ্রেণী পশুদের দেহই ইহাদের প্রিয় আবাসস্থল। যে সকল ব্যাকটিরিয়া মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, দেখিতে ইহারা তাহাদেরই মত, তাহাদের মতই অবস্থানুকূল যে খাদ্যের সংস্পর্শে ইহারা আসে শরীর দিয়া তাহা শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে। জীবন নির্ব্বাহের এই প্রক্রিয়ার ফলে জৈব পদার্থ ভাঙিয়া চূরিয়া মিলিয়া মিশিয়া নূতন নূতন কম্পাউণ্ডের (Compound) সৃষ্টি হয়। মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিতে পারিলে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার দল বিভিন্ন প্রকারে বাড়িয়া উঠিতে থাকে এবং এই বৃদ্ধির ফলে আনুসঙ্গিক বিভিন্ন রাসায়নিক বিভিন্ন কম্পাউণ্ড সমূহের উদ্ভব হয়, তাহারাই ব্যাধির যথার্থ কারণ।—ব্যাধিকর ব্যাকটিরিয়া-সৃষ্ট এই সকল রাসায়নিক বিষের সাধারণ নাম 'টোমেন' (Ptomains).

কিন্তু ব্যাকটিরিয়া-জনিত এই টোমেনের সহিত রোগের সম্বন্ধ কোথায় তাহা বুঝিতে হইলে ব্যাধি কি, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক।

বস্তুত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অণুবীক্ষণিক জীবকোষ-সমষ্টির বিভিন্ন কর্ত্তব্য ;—কেহবা রক্তে অক্সিজেন সঞ্চারিত করে, কেহবা খাদ্য পরিপাক করে, কেহবা শরীরের দূষিত পদার্থকে বাহির করিয়া দিতে নিযুক্ত। এইরূপে প্রত্যেক সমষ্টিরই 'বিশেষ' কোনো না কোনও কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু ইহাদের সকলেই পরস্পরের সহিত এমন একটি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত যে পরস্পরের সহিত আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও জীব-শরীরের সকল প্রক্রিয়াই একই ভাবে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারে।

এই বিভিন্ন সমষ্টি তাহার অসংখ্য বৈচিত্র্য লইয়া কিন্তু একটিমাত্র জীবিত জীবকোষ হইতে উদ্ভূত। ব্যাকটিরিয়ার মতই আপনার চতুষ্পার্শ্ব হইতে অহোরাত্র আহার সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে অবিশ্রাম বিভক্ত করিয়া ইহা বাড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ ও পশুর এই আদিম জীবকোষ দেখিতে একই প্রকার—খুব ভাল অণু-বীক্ষণের সাহায্যেও আজ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ ধরা পড়ে নাই। অথচ ইহার একটী আপনাকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত নিজেকে মানুষ করিয়া তোলে, অন্যটি হয় পশু। প্রাণীতত্ত্বের এই বিস্ময়কর ব্যাপার নিবিড় রহস্য জালে আবৃত হইয়া আছে, আজিও কেহ ইহার মীমাংসা করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে মানুষ অনেক প্রকারের 'থিওরি'

বাহির করিয়াছে কল্পনা করিয়া তুলনা দ্বারা নানা প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি এই সকল প্রকরণের একটা নামও দিয়াছে। কিন্তু সব যখন শেষ হইয়া যায়, তখনও দেখা যায় রহস্য সে দিন যেখানে ছিল আজও সেখানেই আছে।

যাহা হউক জীব ও জীবন সম্বন্ধে একটা কথা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, জীবকোষ-গঠিত আমাদের এই শরীরের সৃজন করিবার ক্ষমতা আছে, কোথাও কিছুর ক্ষয় হইলে শরীর তাহা কোনো না কোনো প্রকারে পূরণ করিয়া দিতে পারে; এবং এ ক্ষমতা তাহার চিরদিন থাকে না। শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক এমন একদিন আসেই যখন শরীরের কল আর ঠিকমত চলে না, কখনও এখানে কখনও সেখানে, তাহাকে বিকলতা আক্রমণ করে, অবশেষে যে শক্তি শরীরকে এত দিন এত কাজে নিযুক্ত করিতেছিল, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া সহসা তাহা কোথায় চলিয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ দেহচ্যুত যে দুইটি জীবকোষ পরস্পরের সহিত অখণ্ড ভাবে মিলিত হইয়া একে পরিণত হইয়াছিল, এত দিন পরে তাহা সর্ব্বপ্রথম বিশ্রাম লাভ করিল। ইহা মৃত্যু। ইহাকে আমরা বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া থাকি। এরূপ স্বাভাবিক মৃত্যু পৃথিবীতে সাধারণতঃ অত্যন্ত বিরল।

স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ জল বাতাস আহার্য্য ও জীবন ধারণের অন্যান্য উপকরণ যথাযথ অবস্থায় থাকিলে এই সকল জীব-কোষ সমষ্টি—যাহাদিগকে আমরা মস্তিষ্ক ––– –– পীহা যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতি বলিয়া জানি—তাহারা শুধু যে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিয়া যায় তাহা নহে, বাহিরের ও ভিতরের সকল প্রকার শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকে। কিছু দিনের জন্য আহার্য্যের অভাব ঘটিলেও মাংসপেশী আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইতে বিরত হয় না, অত্যন্ত দূষিত বায়ুর মধ্য হইতেও আংশিক ভাবে অক্সিজেন বাছিয়া লইয়া রক্তের জীবকোষ শরীরের সর্ব্বত্র অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও অক্সিজেন প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।—এমন কি কোনো সমষ্টির অধিকাংশ জীবকোষ কোনো আঘাত অথবা অন্য কোনও কারণে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সমষ্টির অবশিষ্ট জীবকোষ নিজেদের বিভক্ত করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সে অভাব পূরণ করে কখনও বা অন্যান্য সমষ্টিরা সেই লুপ্ত সমষ্টির কার্য্যভার নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়।

কিন্তু কোনো প্রয়োজনীয় জীবকোষ সমষ্টি গুরুতর রূপে আহত হইলে সমষ্টির শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। অনিষ্ট যখন এতদূর অগ্রসর হয় যে জীবকোষের গঠন বদলাইয়া যাওয়ায় সে আর পূর্ব্বের মত আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারে না এবং সৃজন করিবার ক্ষমতাও হারায় অথবা অন্যান্য কোষ-সমষ্টি কিম্বা আপনার মধ্যেই কোনো গোলোযোগ বশতঃ শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত সে আর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, তখন শরীরে বিকলতা দেখা দেয় এই বৈকল্যের নাম ব্যাধি।

এইরূপে শরীরের শৃঙ্খলা ভাঙিয়া গেলে যে সকল লক্ষণ দেখা দেয়, বহু বর্ষের অধ্যয়ন পরীক্ষা পটুত্ব ও বীক্ষণপরতার ফলে সুশিক্ষিত চিকিৎসক মাত্রেই এখন তাহার সহিত সম্পূর্ণ সুপরিচিত। ভিতরের কলে কোথায় কি বিকলতা ঘটিয়াছে বাহ্যিক লক্ষণ হইতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ তাঁহারা তাহা ঠিক করিতে পারেন। বিশৃঙ্খলার কারণ নির্দ্ধারণ অবশ্য সহজ নহে; কখন ইঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়া থাকেন, কখন পান না।

ব্যাধিগ্রস্থ কোষ-সমষ্টি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকে। বিশেষ মারাত্মক না হইলে শরীরে ছোট বড় অনেক বিশৃঙ্খলাই এইরূপে আপনিই দূর হইয়া যায়। চিকিৎসক তাঁহার ঔষধ পথ্য ও স্থান পরিবর্ত্তনের দ্বারা এই স্বাভাবিক চেষ্টার পথে যে সকল বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে তাহা দূর করিবার এবং কখনও বা ইহাকে অধিকতর রূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন মাত্র।

এইরূপে, শরীরের কল কারখানার বৈকল্য এবং জীবকোষের রূপান্তর গ্রহণ প্রভৃতি যে সকল বিশৃঙ্খলা ব্যাধি নামে অভিহিত, তাহার অধিকাংশের মূল যে ব্যাকটিরিয়া, আধুনিক বিজ্ঞান তাহা সহস্র প্রকারে প্রমাণ করিয়াছে।

ক্রমশ।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।
আমেরিকা—(U S A)

ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাস্তিক-পর্য্যায় শব্দের আলোচনা।

আলো অন্ধকার পাশাপাশি; একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই থাকিবে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রকাশ করিয়া থাকে; অন্ধকার না থাকিলে আলো কিছু প্রকাশ পাইত না, এবং আলো আছে বলিয়াই আমরা অন্ধকার অনুভব করিয়া থাকি। আস্তিক-নাস্তিকও এইরূপ; যে দেশে আস্তিক মতের সম্ভাব আছে, নাস্তিক মতেরও সেখানে অসম্ভাব নাই। সর্ব্বদেশেই এবং সর্ব্বকালেই ইহার অন্যথা হয় নাই। আস্তিক-নাস্তিক এই শব্দ দুইটি না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহার অসম্ভাব কখনই ছিল না। মানবের বিচিত্র চিন্তাশক্তির প্রভাবই এইরূপ।

অতএব আমরা মনে করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষে সুবহু পূর্ব্বে—বৈদিক সময়ে—

(* বোলপুর শান্তি-নিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপক সমিতিতে পঠিত।)

নাস্তিক ভাব ছিল না। আজ আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব যে ভারত-বর্ষে কিরূপে কোন সময়ে নাস্তিক বাদ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য অংশ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক মূল নাস্তিক শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে—

না স্তি ক।

পাণিনি বলিয়াছেন[১] :—

"অস্তি-নাস্তি-দিষ্টং মতিঃ।" ৪, ৬।

অর্থাৎ "অস্তি"-"আছে" এই মতি যার সে "আ স্তি ক" (ঠক্) ; এব "নাস্তি" "নাই" এই মতি যার সে "না স্তি ক" কিন্তু ইহাতে কিছু পরিষ্কার হইল না ; কি আছে, বা কি নাই-বুদ্ধি থাকিলে আস্তিক বা নাস্তিক জানা যাইবে? এজন্য ব্যখ্যা-কারগণ বলেন—যে কোন বুদ্ধি থাকিলে, বা না থাকিলে আস্তিক বা নাস্তিক বলা চলে না ; তবে কি? পরলোক আছে—ইহাই বুদ্ধি যাহার, সে আস্তিক ; এবং পরলোক নাই ইহাই বুদ্ধি যাহার—সে নাস্তিক।[২]

অতএব পাণিনি সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিলে ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যে পরলোক স্বীকার করে না সেই নাস্তিক।

মনু বলেন—যে বেদের নিন্দা করে, সেই নাস্তিক।[৩]

কেহ কেহ বলেন—যে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না, সেই নাস্তিক।

আবার কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত মতের কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া, বা কিঞ্চিৎ যোগ করিয়া বলিয়া থাকেন—পরলোক নাই, পরলোকের সাধন অদৃষ্ট নাই, বা তাহার সাক্ষী ঈশ্বর নাই—ইহা যাহার বুদ্ধি, সেই নাস্তিক।

বৈদিক কালের প্রথমাবস্থায় কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রবলবেগে চলিতেছিল। যাগযজ্ঞের অধিকাংশই পরলোকে ফল-প্রসব করে বলিয়া ইহলোকে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার ফল দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সেই সময়ে সামাজিকগণের পর-লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন নিতান্তই আবশ্যক ছিল। পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে পারলৌকিক ফলপ্রদ কর্ম্মসমূহে কাহারো প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কাল-

১ অতিপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে নাস্তিক-পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই নাই। মৈত্র্যুপনিষদে (৩।৫) আছে—অথাস্তরাপ্যক্তং সম্মোহো ভয়...নাস্তিক্য মত্সরঃ...তামসানি।" এই উপনিষৎখানি অনতি প্রাচীন, ইহাতে ঈশ, প্রশ্ন কঠ ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক অমৃতবিন্দু ও মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার রচনাও ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করে না।

২। "ন চ মতিসত্তামাত্রে প্রত্যয় ইষ্যতে। কিং তর্হি? পরলোকোঽস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ। তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ। ...[illegible]।" কাশিকা, ৪-৪-৬০।

৩। "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" মনু-২-১১।

মনুসংহিতায় ৩-১৫০ ; ৮-২২ ; ৩০৯ প্রভৃতি বহুস্থানে নাস্তিক শব্দের উল্লেখ আছে।

ক্রমে, বহু বহু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ইহ-লোকে বস্তুত তাহার কোন ফলপ্রাপ্তি না প্রকাশ পাওয়ায় যে সকল লোকের কর্ম্মবিধির উপর শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে লাগিল, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা খুবই সম্ভব যে, কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি-স্থান পরলোকেও (যাহা এ জন্মে কখনো দেখিতে পাওয়া যায় না) ক্রমশ তাহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া থাকিবে। কোন বহুল-আয়াস-সাধ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া লোকে বর্ত্তমান সংসারেই তাহার ফল দর্শন করিবার জন্য সাধারণত উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার কোন আশা নাই। কর্ম্মফল দেখিবার জন্য কেহ উৎ-কণ্ঠিত হইয়া উঠিলে, কর্ম্মবিধি শ্রদ্ধালুগণ পরলোকের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন; পরলোক ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মবিধির কোন সার্থক্যই থাকে না। যখন এইরূপে কর্ম্ম-শ্রদ্ধালু এক দল পরলোকের দোহাই দিয়া কর্ম্মবিধিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস করিতেন, তখন কর্ম্ম বিধির ইহলোকে ফলদর্শনের অভাব-হেতু আর এক দল পূর্ব্বদলের মত খণ্ডনের জন্য পরলোককেই অস্বীকার করিয়া ফেলেন।[৪] পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রধান অস্ত্র বেদ বা মন্ত্রসমূহ; কালক্রমে পরবর্ত্তী দল ইহাকেও অপ্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রবন্ধের না স্তি ক বা দে র সূ চ না-নামক অংশে এ বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইবে।

অতএব নাস্তিকের লক্ষণ সম্বন্ধে মনু ও পাণিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উভয়ই সঙ্গত বোধ হয়।[৫]

৪। ইহা সমর্থনের জন্য মীমাংসাদর্শনের (১-১-৫) শবরস্বামীর ভাষ্য হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়; শব্দের (বেদের) অপ্রামাণ্যবাদী বলিতেছেন:—

"প্রত্যক্ষাদি আর আর প্রমাণ হয় হউক, কিন্তু শব্দ প্রমাণ নহে। কেন?...যে উপলব্ধি বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই, যেমন শশ-বিষাণ। ইন্দ্রিয়সমূহ পশুপ্রভৃতিকে উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু পশুকাম ব্যক্তির (পশু উদ্দেশে) ইষ্টি অর্থাৎ যাগ করার পর পশু দেখা যায় না। অতএব ইষ্টির ফল পশু নহে। যখন কর্ম্ম করা যায়, তখনই ফল হইবে; যখন শরীর মর্দ্দন করা হয়, তখনই সুখ হইয়া থাকে। কালান্তরে ফল হইবে? তাহা হইতে পারে না। কি প্রকারে? যখন ইষ্টি বিদ্যমান থাকে, তখন তাহা ফল দেয় নাই আবার যখন ফল উৎপন্ন হয়, তখন তাহা নাই—অসৎ! অসৎ হইয়া কিরূপে ফল দিতে পারে? আরও, আমরা ফলপ্রাপ্তির অপর কারণ স্পষ্টই দেখিতে পাই, দৃষ্টকারণ পাওয়া গেলে অদৃষ্ট কল্পনা করিতে পারা যায় না, কেননা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব যখন বেদের এইরূপ অপচার দেখা যাইতেছে, তখন আমরা মনে করি স্বর্গাদি ফলও নাই ...।"

যদিও ইহা বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষের কথা, এবং যদিও শবরস্বামী ইহা খণ্ডনা করিয়াছেন, তথাপি ইহার দ্বারা সেই সময়ের কতকগুলি লোকের বেদ ও পরলোক-স্বর্গাদি বিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৫। তুলনীয়—মৈত্র্যুপনিষৎ ৭-১০।

"বক্ষ্যামি জাজলে বৃত্তিং নাস্মি ব্রাহ্মণ নাস্তিকঃ।

ন যজ্ঞং বিনিন্দামি যজ্ঞবিৎ তু সুদুর্লভঃ॥" মহাভারত, ১২-২৬৩-৪।

কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দু দার্শনিকগণ মনুর মতকেই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়; বেদের অপ্রামাণ্যবাদীকেই তাঁহারা নাস্তিক বলেন। এইজন্য পরলোক স্বীকার করিলেও বৌদ্ধগণকে হিন্দু-দার্শনিকের নাস্তিক শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন যদি নামমাত্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিত, তবে তাহাকে আমরা আস্তিক সমাজে দেখিতে পাইতাম, এবং তাহার প্রভাব আরো অধিকতর ভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইত। ঈশ্বরের অভাববাদী নাস্তিক—নাস্তিকের এ লক্ষণও নিতান্ত নূতন নহে; মহাভারতে ইহার মূল পাওয়া যায়।[৬] কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দু দার্শনিকগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এবং সেইজন্যই ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেও সাঙ্খ্য ও মীমাংসা দর্শন নাস্তিক-দর্শন শ্রেণীতে পরিগণিত না হইয়া আস্তিক দর্শন বলিয়া গৃহীত হইতেছে। বোধ হয়, এই লক্ষণানুসারে মীমাংসা দর্শনকে নাস্তিকতার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ নিরীশ্বর কর্ম্ম-মীমাংসার মধ্যেও ঈশ্বরকে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[৭]

আবার কালক্রমে এক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে নাস্তিক শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; যথা মাধ্বগণ শৈবগণকে বলিয়া থাকেন—

"লিঙ্গার্চ্চনপরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

আবার শৈবগণও পালটায় বলেন—

"তপ্তমুদ্রাঙ্কিতমূর্ত্তির্নাস্তিকং ধর্ম্মমাশ্রিতঃ।
পশুতুল্যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

এইরূপ অনেকে অনেক অনেক বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ সমস্তই যে বিদ্বেষ-প্রসূত তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

লৌকায়তিক, লোকায়তিক, ও লোকায়ত।

নাস্তিকের অপর নাম লৌকায়তিক। যে ব্যক্তি লোকায়ত অধ্যয়ন করে বা জানে, সে লৌকায়তিক। যদ্যপি পাণিনি নিজের কথায় এই শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি "ক্রতুকৃথাদি"-গণে[৮] লোকায়ত শব্দ পাঠ করায় পূর্ব্ব প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিই যে তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা মনে করা যাইতে পারে।

কোথাও কোথাও লৌকায়তিক-স্থানে লোকায়তিক দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য ও গীতাভাষ্যে লোকায়তিক পদই দৃষ্ট হয়। মহাভারতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে।[১০]

৬। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্"—গীতা ১৬-৮।

৭। মীমাংসার্থসংগ্রহে লোগাক্ষি ও মীমাংসার্থপ্রকাশে আপোদেব লিখিয়াছেন যে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মুক্তির জন্য হয়। তাঁহারা ইহার সমর্থনের জন্য গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মীমাংসা দর্শনে যে বস্তুত ঈশ্বর স্বীকার করে না, তাহা বঙ্গদর্শনের 'মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরবাদ" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত করিয়াছি।

৮। "ক্রতূক্থাসূত্রান্তাট্ঠক্", ৪-২৬০

৯। "লোকায়তিকা নাম্পি চেতন এব দেহ ইতি," "লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ"—ইতি বেদান্তদর্শন,শা-ভা-২-২-২; ৩-৩-৫৩ (আনন্দাশ্রম ও কালীবর বেদান্তবাগীশ উভয় সংস্করণেই এই পাঠ আছে) "লোকায়তিক—দৃষ্টিরিয়ম্"—গীতাভাষ্য ১৬-৮

১০। "নানাশাস্ত্রেষু মুখ্যৈশ্চ শুশ্রাব স্বনমীরিতং।
লোকায়তিক-মুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতং॥ ১-৭০-৪৬ (প্রতাপরায়ের সংস্করণ)

আবার কোনো কোনো স্থানে ঐ অর্থেই লো কা য় ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।"[১১]

লো কা য় ত-শব্দের অর্থ।

যাহা লোকের মধ্যে আয়ত অর্থাৎ বিস্তৃত —যে দর্শন বা মত সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ বিশেষ রূপে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নাম লো কা য ত। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিয়াছেন :—

'প্রায় সমস্ত লোকেই—

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"[১২]

অর্থাৎ যতকাল বাঁচিবে সুখে বাঁচিবে, মৃত্যুর অবিষয় নাই, ভস্মীভূত দেহের আবার কোথা হইতে আগমন হইবে!—এই লোক-গাথার অনুরোধে নীতি ও কাম শাস্ত্রের অনুসরণে অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া, ও পারলৌকিক (স্বর্গাদি) অর্থকে অপলাপ করিয়া চার্ব্বাকের মতের অনুবর্ত্তন করে বলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই চার্ব্বাক-মতের লো কা য ত এই নামটি সার্থক।'

রামায়ণের একস্থানে রাম ভরতকে বলিতেছেন :—

"বৎস, তুমি ত লো কা য় তি ক ব্রাহ্মণকে সেবা করিতেছ না? ইহাঁরা মূঢ়, পণ্ডিতাভিমানী ও অনর্থকুশল। মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ বিদ্যমান থাকিলেও সেই কুপণ্ডিতগণ আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি (তর্ক বিদ্যা) লাভ করিয়া নিরর্থক বাদ করেন।"[১৩]

ইহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রাম এখানে হেতুবাদের অবলম্বনকারী হৈতুকগণের কথাই বলিতেছেন। মহা-ভারতেও এতাদৃশ অনেক-অনেক কথা আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না।[১৪] রামায়ণের টীকা-কারগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ লো কা য় তি ক শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী চার্ব্বাকমতানুচারী;' আবার কেহ কেহ বলেন—'শুষ্কতর্কবাবদূক।' শুষ্ক-তর্ক শব্দ হেতুবাদের নামান্তর।

বৌদ্ধ সাহিত্যে লো কা য় ত শব্দে বিতণ্ডা-শাস্ত্রকে বুঝায়।[১৫] এই বিতণ্ডা বস্তুত

১১। বেদান্তসারের টীকাকার রামতীর্থ লিখিয়াছেন—"লো কা য় তা নাং চার্ব্বাকবিশেষাণাং মতভেদমাহ"—১৪১ পৃঃ (Colone G. A. Jacobeএর সংস্করণ); আর্হতপ্রবর শ্রীহরিভদ্রসূরি স্ববিরচিত "ষড়্-দর্শন সমুচ্চয়ে বলিয়াছেন :—"লো কা য় তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবো ন নির্বৃতিঃ—"৮০ শ্লোক; ঐ গ্রন্থের টীকাকার মণিভদ্রও ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (৮০-৮৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য), নৈষধচরিতে (১৭-৯৪) শ্রীহর্ষও ঐ অর্থে লো কা য ত-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

১২। "কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥ রামায়ণ, ২-১০০-৩৮—৩৯।

১৩। মহাভারত, ১৩-৩৭-১৩। ১২-১০০-৪২। প্রবন্ধের হে তু বা দ-নামক অংশ দ্রষ্টব্য।

১৪। "বিতণ্ডাসত্থং বিক্ক্রেতব্যং যত্তং লোকায়তং"—অভিধানপ্পদীপিকা, ১২২।

১৫। তুলঃ—ন্যায়দর্শন, ১-২-২—৩।

শুষ্কতর্ক বা হেতুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈতণ্ডিক বলিলে ঠিক নাস্তিকবাদীকেই বুঝা যায় না, কিন্তু যে কোন শুষ্কতার্কিক হেতুবাদীকেই সাধারণত আমরা বুঝিয়া থাকি।

শুষ্কতর্ক, বিতণ্ডা বা হেতুবাদকে লো কা য় ত-শব্দে অভিহিত করিবার কারণ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, নাস্তিকবাদের ন্যায় ইহাও লোক সাধারণে বিস্তার লাভ করিয়াছিল; অথবা লো কা য় ত নামে প্রসিদ্ধ নাস্তিক বাদে ইহার অত্যন্ত প্রভাব থাকায়, ইহারও ঐ নাম হইয়াছে; অথবা ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমে হেতুবাদই লোকমধ্যে বিস্তার লাভ করায় তাহার নাম লো কা য় ত হয়, পরে হেতুবাদে অভ্যুত্থিত নাস্তিক বাদও ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

নাস্তিক বাদ যে হেতুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মনুতে তাহা স্পষ্টরূপেই দেখা যায়; তিনি বলিয়াছেন :—

"যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের মূল স্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবমাননা করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।"[১৬]

এ স্থানে ইহাও জানা গেল যে, নাস্তিক ও হৈতুক বস্তুত অভিন্ন।[১৭]

মনুর ন্যায় অন্যান্য স্থানেও হৈতুকগণের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।[১৮] কিন্তু আবার মনুতেই ধর্ম্মমীমাংসায় তাহারও স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।[১৯] পণ্ডিতেরা (কুল্লুক ভট্ট-প্রভৃতি) বলেন—সে স্থানে হৈতুক-শব্দে শ্রুতি স্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রবিৎকে বুঝিতে হইবে।

বৃ হ স্প তি ও বা র্হ স্প ত্য।

নাস্তিকেরা বা র্হ স্প ত্য নামেও পরিচিত।[২০] বৃ হ স্প তি র মত অনুসরণ করায় নাস্তিকগণের বা র্হ স্প ত্য নাম হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে বৃহস্পতি নাস্তিক দর্শনের উদ্ভাবন করেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে 'নাস্তিক শিরোমণি' চার্ব্বাককে বৃ হ স্প তি র মতানুসারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য দার্শনিকগণও নাস্তিক বাদ প্রসঙ্গে বৃ হ স্প তি র মত বা বচন উদাহৃত করিয়া থাকেন। বৃ হ স্প তি ই যে নাস্তিক

১৬। "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" মনু ২-২১

১৭। প্রবন্ধের হে তু বা দ-নামক অংশ দ্রষ্টব্য।

১৮। "হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥" বিষ্ণুপুরাণ, ৩-১৮-৯৯
"সন্দেহকৃদ্ হেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু স হৈতুকঃ", ঐ টীকায় শ্রীধর।

১৯। ত্রৈবিদ্যো হৈতুক স্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥" মনু-১২-২১১

২০। "বার্হস্পত্যাস্তু নাস্তিকঃ"—হেমচন্দ্র।

বাদের প্রচার-কর্ত্তা তাহা আমরা মৈত্র্যুপনিষদে (৭।৯) দেখিতে পাই। সেখানে উক্ত হইয়াছে :—

"বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করিয়া[২১] ইন্দ্রের অভয় ও অসুরগণের ক্ষয়ের জন্য এই (পূর্ব্বোক্ত নৈরাত্ম্যবাদ রূপ) অবিদ্যাকে সৃষ্টি করেন। তাহার দ্বারা অসুরেরা মঙ্গলকে (শিব) অমঙ্গল, ও অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল, এবং বলিল—'বেদাদি শাস্ত্রের বিনাশক ধর্ম্মের অভিচিন্তন করা হউক!' অতএব ইহাকে অধ্যয়ন করিবে না। এই বিদ্যা বিপরীত, এবং বন্ধ্যা; আচারভ্রষ্ট লোকের ন্যায় কেবল রতিই ইহার ফল।"

এ স্থানে জানিতে পারা গেল যে, ইন্দ্রের অভয় ও অসুরগণের ক্ষয়ের জন্য বৃহস্পতি নাস্তিক বাদের প্রচার করেন।

আবার ঐ উপনিষদেরই অন্যত্র (১০ম প্রপাঠক) উক্ত হইয়াছে যে, কোন সময়ে দেব ও অসুরগণ আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মার নিকট গমন করেন, ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলেন:—"ভগবন্, আমরা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন!' ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সেই অসুরগণের মতি (প্রকৃত আত্মা হইতে) অন্যত্র। এজন্য তিনি তাহাদিগকে (প্রকৃত আত্মা হইতে) অন্য আত্মা বলিয়া দিলেন। সেই মূঢ়গণ তাহাই গ্রহণ করিয়া আসক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠিল; (সংসার সমুদ্র) তরণের উপায়কে অভিহত করিতে লাগিল; মিথ্যা কহিতে লাগিল; এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় অনৃতকে সত্যরূপে দেখিতে আরম্ভ করিল। অতএব যাহা বেদ-সমূহে উক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য। যাহা বেদ সমূহে উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাহাই গ্রহণ করেন সেই জন্য (অসুরগণের ন্যায়) ফল হইবে মনে করিয়া ব্রাহ্মণ অবৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না।"

পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, বৃহস্পতি নাস্তিক বাদ প্রচার করেন, এখন জানা গেল যে, ব্রহ্মা তাহা করিয়াছিলেন।

অসুরগণের দেহাত্মবাদের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৮।৭-৮) দেখা যায়; কিন্তু সেখানে তাহার প্রচার কর্ত্তা প্রজাপতি, বৃহস্পতি নহেন। সে স্থলে এ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণের ইন্দ্র ও অসুরগণের বিরোচন আত্মতত্ত্ব অন্বেষণের জন্য সমিৎ-হস্তে প্রজাপতির নিকট আগমন করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করেন। অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"এই যে চক্ষুর মধ্য পুরুষ দেখা যাইতেছে, এই আত্মা।" শিষ্যদ্বয় সন্দেহ নিরাসের জন্য আবার প্রশ্ন করিলে, তিনি তাহাই বলিয়া উপদেশ দিলেন—"জলপূর্ণ শরীরে নিজেকে দেখিয়া যদি তোমরা আত্মাকে জানিতে না পার, তবে আমাকে বলিও।" তাঁহারা সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি দেখিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন—"নখলোম পর্য্যন্ত নিজেরই প্রতিরূপ দেখিতেছি।" প্রজাপতি বলিলেন—"তোমরা ভালরূপে অলঙ্কৃত হইয়া, সুন্দর বসন পরিধান করিয়া, ও পরিষ্কৃত হইয়া

২১। মূল—"শুক্রো ভূত্বা" দীপিকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"শুক্ররূপমাস্থায়।"

জলপূর্ণ শরাবে দর্শন কর।” তাঁহারা সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা কি দেখিতেছ?” তাঁহারা উত্তর করিলেন—“ভগবন্, আমরা যেমন ভালরূপে অলঙ্কৃত হইয়াছি সুন্দর বসন পরিধান করিয়াছি, ও পরিষ্কৃত হইয়াছি, এই প্রতিবিম্বও সেইরূপ হইয়াছে।” প্রজাপতি বলিলেন—“এই আত্মা, এই অমৃত অভয়, এই ব্রহ্ম।” শিষ্যদ্বয় ইহা শুনিয়া শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—“ইহারা আত্মাকে লাভ না করিয়া, আত্মাকে জানিতে না পারিয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে দেব বা অসুর, যাহারা এই নিশ্চয় করিয়া থাকিবে, তাহারা পরাভূত হইবে।

বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অসুরগণের নিকট গমন করিলেন, ও তাঁহাদিগকে এই উপনিষৎ বলিলেন—“লোকে আত্মাই (দেহই) পূজনীয়; আত্মাকেই পূজা করিয়া ইহলোক ও পরলোক উভয়কেই লাভ করা যায়।” উপনিষৎ ইহার পরেই বলিতেছেন—“সেই জন্য আজিও যে ব্যক্তি দান করে না, যে শ্রদ্ধাহীন, ও যে যাগ করে না, লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকে—‘অহো! এ ব্যক্তি আসুর! কেন না, ইহা আ সু র উ প নি ষ ৎ, তাহারা মৃত ব্যক্তির শরীরকে ভিক্ষাগন্ধ (গন্ধমাল্যাদি ও) বসনের দ্বারা অলঙ্কৃত ও সংস্কৃত করে। তাহারা মনে করে যে ইহার দ্বারাই পরলোক জয় করিবে!”

ইন্দ্র কিন্তু দেবগণের নিকট না গিয়াই এই ভয় দেখিলেন—“যেমন এই শরীরকে ভালরূপে অলঙ্কৃত করিলে ইহাও (প্রতিবিম্ব) ভালরূপে অলঙ্কৃত হয়, উত্তম বসন পরিধান করিলে ইহাও উত্তম বসন পরিধান করে, এবং পরিষ্কৃত হইলে ইহাও পরিষ্কৃত হয়, এইরূপই ইহা (শরীর) অন্ধ হইলে ইহাও (প্রতিবিম্ব) অন্ধ হয়, কাল হইলে ইহাও কাল হয়, ও ছিন্ন হইলে ইহাতে ছিন্ন হয়; এবং শরীরের নাশ হইলে ইহাও নষ্ট হয়। অতএব আমি ইহাতে ভোগার্হ কিছু দেখিতেছি না।”

ইন্দ্র এই মনে করিয়া পুনর্ব্বার সমিৎহস্তে আগমন করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—“মঘবন্, তুমি যে বিরোচনের মত শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে! আবার কি ইচ্ছা করিয়া আগমন হইয়াছে?” তিনি বলিলেন—“যেমন এই শরীরকে ভালরূপে অলঙ্কৃত করিলে ইহাও ভালরূপ অলঙ্কৃত হয়, উত্তম বসন পরিধান করিলে ইহাও উত্তম বসন পরিধান করে, পরিষ্কৃত হইলে ইহাও পরিষ্কৃত হয়, এইরূপই ইহা অন্ধ হইলে ইহাও অন্ধ হয়, কাল হইলে ইহাও কাল হয়, ছিন্ন হইলে ইহাও ছিন্ন হয়, এবং শরীরের নাশ হইলে ইহাও নষ্ট হয়। অতএব আমি ইহাতে কিছু ভোগার্হ দেখিতেছি না।”

প্রজাপতি বলিলেন—“মঘবন্, ইহা এইরূপই; আমি তোমার নিকটে ইহারই ব্যাখ্যা করিব। আরও দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ এখানে (ব্রহ্মচর্য্যে) বাস কর।”

অনন্তর ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া প্র জা প তি র নিকটে যথার্থ আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং দেবগণও ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা জানিয়াছিলেন।[২২]

২২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮—৮—১২

ছান্দোগ্য আলোচনা করিয়া জানা গেল যে, আসুর-উপনিষৎ বা দেহাত্মবাদ বলিয়া যে মত অসুরগণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার উদ্ভাবনের মূলে প্রজাপতি। মৈত্র্যুপনিষদে প্রজাপতির স্থানে ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি এই উভয়কেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি ও ব্রহ্মা একই বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু মৈত্র্যুপনিষদে আবার বৃহস্পতির অবতারণা কেন? মোক্ষমূলর মনে করেন, পরবর্ত্তী সময়ে ঋষিগণ ভাবিয়া থাকিবেন যে, প্রজাপতির ন্যায় উচ্চতম দেবতার পক্ষে অসুরগণকেও বিপথে লইয়া যাওয়া ঠিক দেখায় না। তাই তাঁহারা অর্ব্বাচীন উপনিষদে তাঁহার স্থান বৃহস্পতিকে দিয়া গ্রহণ করাইয়াছেন।[২৩]

এখন কথা হইতেছে—কোন্ বৃহস্পতি এই নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়াছেন? অনেক বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া এক বৃহস্পতি প্রসিদ্ধ আছেন। ইহাঁর প্রণীত বৃহস্পতি-সংহিতা আজো আমরা দেখিতে পাই। আর এক বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ইহাঁর উল্লেখ দেখিয়াছি। আর এক বৃহস্পতিকে মহাভারতে পাওয়া যায়; ইনি সেখানে অহিংসাশ্রিত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, এবং সেই উপদেশকে বৌদ্ধধর্ম্ম সদৃশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[২৪] মহাভারতেই অপর এক বৃহস্পতিকে পাওয়া যায়; ইনি উশনা অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যের সহিত বঞ্চনাশাস্ত্রকার বলিয়া সেখানে উল্লিখিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে[২৫] বৃহস্পতি নামে দুইজন ঋষি

২৩। It is not unlikely that Brihaspati was introduced in the latter Upanishads in order to take the place of Projapati, because it was felt wrong that this highest deity should ever mislead any body, even the demons.—Six systems of Indian Philosophy P. 126.

২৪। যুধিষ্ঠির বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, অহিংসা, বৈদিক কর্ম্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপঃ, ও গুরুশুশ্রূষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? বৃহস্পতি ইহার উত্তরে অহিংসাশ্রিত ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বলিয়াছেন। মহাভারত, ১৩-১১২-১-৩। এ স্থানের পঞ্চম শ্লোকের সহিত ধম্মপদের ১৩২শ শ্লোকের, এবং ৭ম শ্লোকের সহিত ধম্মপদের ৪২০শ শ্লোকের অক্ষরগতও অনেক মিল আছে।

বৃহস্পতি শান্তিপর্ব্বেও (২১ অধ্যায়) ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, ঐ উপদেশকেও অদ্রোহপ্রধান দেখা যায়।

২৫। "শম্বরস্য চ যা মায়া মায়া যা নমুচেরপি।
বলেঃ কুম্ভীনসেশ্চৈব সর্ব্বাস্তু যোষিতো বিদুঃ।
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ।
স্ত্রীবুদ্ধ্যা ন বিশিষ্যেতে তাস্তু রক্ষ্যাঃ কথং নরেঃ॥
অনৃতং সত্যমিত্যাহুঃ সত্যঞ্চাপি তথানৃতং।
ইতি যাস্তাঃ কথং বীর, সংরক্ষ্যাঃ পুরুষৈরিহ॥
স্ত্রীণাং বুদ্ধ্যর্থনিষ্কর্ষাদর্থশাস্ত্রাণি শত্রুহন্।
বৃহস্পতিপ্রভৃতিভির্মন্যে সদ্ভিঃ কৃতানি বৈ॥" মহাভারত, ১৩-৩৯-৬, ৮—১০।

প্রসিদ্ধ আছেন; ইহাঁদের একজন আঙ্গিরস (১০-৭১), অপর জন লৌক্য অর্থাৎ লোক-পুত্র (১০-৭২)। এই লৌক্য বৃহস্পতির সহিত লোকায়ত মত বা নাস্তিক দর্শনের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। লৌক্য বৃহস্পতি-রচিত স্বক্তটিতে নাস্তিক-বাদের কোনো আভাসই নাই। ইহা ভিন্ন আরও বৃহস্পতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কে নাস্তিক দর্শনের প্রবর্ত্তক তাহা বলিতে পারা যায় না। মহাভারতে পূর্ব্বোক্ত (১৩-৩৯-৬,৮-১০) যে বৃহস্পতিকে বঞ্চনাশাস্ত্রকার বলা হইয়াছে, তাঁহার সহিত মৈত্র্যুপনিষদের (৭।৯) নৈরাত্মবাদ প্রকাশক বৃহস্পতিকে অভিন্ন বলিয়া (অন্তত মত সম্বন্ধে) মনে করা যাইতে পারে। অতএব এই বৃহস্পতিই নাস্তিকবাদের উদ্ভাবন কর্ত্তা হইতে পারেন—ইহা ভিন্ন আর কিছু বিশেষ রূপ বলা চলে না।

চার্ব্বাক।

সকলেই জানেন নাস্তিক দর্শন চার্ব্বাক দর্শন নামেও প্রসিদ্ধ আছে। মাধবাচার্য্য সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে লিখিয়াছেন "বৃহস্পতি-মতের অনুসরণ-কারী নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক।" অতএব ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চার্ব্বাক নাস্তিক দর্শনের উদ্ভাবন কর্ত্তা নহেন, তাহার একজন প্রধান অনুসরণ-কারী মাত্র।

পণ্ডিতগণ চার্ব্বাক-শব্দটির এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন—চারু অর্থাৎ আপাত মনোরম-লোক-চিত্তাকর্ষক বাক্ অর্থাৎ বাক্য যাহার, সে চার্ব্বাক।[২৬]

নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক কে, তাহা বিশেষ জানা যায় না। মহাভারতে এক চার্ব্বাকের সহিত আমরা পরিচিত আছি। তিনি রাক্ষস, এবং দুর্য্যোধনের সখা; দুর্য্যোধনের কথায় ভিক্ষু ব্রাহ্মণের বেশে যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চিত করিবার জন্য ইনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নিহত হন।[২৭]

ইহাঁর পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—চার্ব্বাক সত্যযুগে বহু বর্ষ ধরিয়া বদরিকাশ্রমে তপশ্চর্য্যা করেন, ও তাহা দ্বারা ব্রহ্মার নিকটে সর্ব্বভূত হইতে নিজের অভয় বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা 'ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না' বলিয়া তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করেন। বর লাভ করিয়া চার্ব্বাক দেব-

---

২৬। মোক্ষমূলের এস্থানে বলিয়াছেন:—"The name of Charvaka is clearly connected with that of Charva, and this is given as synonyms of Buddha by Lala Sastri in the preface to his edition of Kashikar—Six system of Indian Philosophy P. 130.

কিন্তু বালশাস্ত্রী সেখানে তাহা বলেন নাই. তিনি বলিয়াছেন:—"চার্ব্বী বুদ্ধিঃ, তৎসম্বন্ধাদাচার্য্যোঽপি চার্ব্বা (চার্ব্বী বা চ্যার্ব্বিঃ নহে)।" শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞাপনে কাশিকারই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশিকার পাঠ এই—"মহতে চার্ব্বী লোকায়তে। চার্ব্বী বুদ্ধিঃ, তৎসম্বন্ধাদাচার্য্যোঽপি চার্ব্বী, স লোকায়তশাস্ত্রে পদার্থান্ নয়তে উপপত্তীভিঃ স্থিরীকৃত্য শিষ্যেভ্যঃ প্রাপয়তি"—(১-৩-৩৬)। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের বিজ্ঞাপনে ধৃতপাঠ মূল হইতে ভিন্ন, এবং মোক্ষমূলর তাহা আরও ভিন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছেন।

২৭। মহাভারত ১২-৩৮-২২...৪৫।

গণকেও পীড়া দিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া তাহার বধের উপায়ের কথা বলিলেন। ব্রহ্মাও তাহা উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—চার্ব্বাক মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনের সখা হইবেন, এবং ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিবেন; তাহাতেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।[২৮]

এই উপাখ্যানে চার্ব্বাকের নাস্তিক-বাদিতার কোনো পরিচয় না পাইলেও, ব্রাহ্মণগণের যে তাঁহার প্রতি ক্রোধ ছিল, এবং সেই ক্রোধের কারণ যে তাঁহার দ্বারা তাঁহাদের অবমাননা, তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাভারতে অনেক স্থলে নাস্তিকবাদের কথা আছে,[২৯] কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে চার্ব্বাকের নাম দেখা যায় না। মহাভারতের উপাখ্যানে চার্ব্বাককে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহার রাক্ষস বলিয়া পরিচিত হওয়া খুবই সম্ভব। হইতে পারে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অবমাননা-কারী নাস্তিকগণকে মহাভারতের চার্ব্বাকের নাম মনে করিয়া চার্ব্বাক শব্দেই অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

উদয়নাচার্য্য তাঁহার ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিতে ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধগণকে চার্ব্বাক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩০] কুসুমাঞ্জলির প্রকাশ-টীকাকার বর্দ্ধমানও তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুত চার্ব্বাক বৌদ্ধ নহে, কেননা, উভয় মতের পার্থক্য অনেক।

পাষণ্ড, পাষণ্ডী, পাষণ্ডক, ও পাষণ্ডিক।

নাস্তিকগণকে বহু স্থানে পাষণ্ড শব্দে, এবং কখন কখন পাষণ্ডী, বা পাষণ্ডক, বা পাষণ্ডিক-শব্দে উল্লেখ করা হয়।[৩১] হিন্দু পণ্ডিতগণ কষ্ট কল্পনা করিয়া পাষণ্ড শব্দের এইরূপ অর্থ করেনঃ—"যে ব্যক্তি দর্শন ও সংসর্গ প্রভৃতিতে পাপ দান করে, সে পাষণ্ড;[৩২] অথবা—যে দুষ্কৃত হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম পা (নপা×ক্বিপ্), অর্থাৎ বেদ ধর্ম্ম, সেই বেদ ধর্ম্মকে যে খণ্ডন করে, সে পাষণ্ড।"[৩৩] আধুনিক অনুসন্ধিৎসু কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে পাষণ্ড-শব্দটি বৈদেশিক বা প্রাদেশিক ভাষা জাত।[৩৪]

সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে কেবল নাস্তিকেরাই যে পাষণ্ড বলিয়া অবজ্ঞাত হয়, তাহা নহে;

২৮। মহাভারত ১৩-৩৯-৩—১৯।

২৯। ১২-১৩৩,১৪, ২-৩১-৭০, ইত্যাদি See Hopking's The Great Epic of India, pp. 86-90.

৩০। "স্যাদেতৎ—মাভূদবাধকমনুমানং বা ক্ষণিকত্বে, তথাপি সন্দেহোঽস্তু, এতাবতাপি সিদ্ধং সমীহিতং চার্ব্বাকস্যেতি।" ১ম স্তবক, ১৯২ পৃঃ (সোসাইটি)।

৩১। বিষ্ণু পুরাণাদিতে (৩।১৮) পাষণ্ডী, শব্দরত্নাবলীতে পাষণ্ডক, ও ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের (২ শ্লোক) মণিভদ্রের টীকায় পাষণ্ডিক দেখা যায়।

৩২। "পাপং সনোতি দর্শনসঙ্গাদিনা। দদাতীতি (ষণুঞ্ দানে ঞমন্তাৎ ডঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পাষণ্ডঃ"। দ্রষ্টব্য :—বিষ্ণুপুরাণ ৩-১৮।

৩৩। "পালনাচ্চ এয়ীধর্ম্মঃ পা-শব্দেন নিগদ্যতে। তং ষ (খ) ণ্ডয়ন্তি তে যস্মাৎ পাষণ্ডাস্তেন হেতুনা।"

৩৪। The Great Epic of India p.89, foot note.

বৌদ্ধ ও জৈনগণও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই।[৩৫] অধিক কি, শেষে নাস্তিক শব্দের ন্যায় এ শব্দটিও পরস্পর-বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।[৩৬]

পা ষ ণ্ড শব্দে জৈন ও বৌদ্ধ মত।

বৌদ্ধ সাহিত্যে পা ষ ণ্ড-শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। বলা বাহুল্য বৌদ্ধগণ ঐ পদের দ্বারা নিজেকেই বুঝাইবার জন্য তাহা প্রয়োগ করেন নাই; হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারাও নিজের বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষগণকে,—যাঁহাদিগকে তাঁহারা না স্তি ক বলিয়া গণ্য করিতেন,—ঐ পদে সম্বোধন করিতেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ৯৬ জন পাষণ্ডে উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কুটীশক-প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ৩৪জন, এবং অপর ৬২জন।[৩৭] ব্রহ্মজাল সূত্রে, ইহাদের মত বর্ণিত আছে।[৩৮]

জৈনগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে ৩৬৩ জন পাষণ্ডের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াবাদী ১৮০ জন, অক্রিয়াবাদী ৮৪ জন, বৈনয়িক ৩২ জন, এবং অজ্ঞানী ৬৭ জন।[৩৯] বলা বাহুল্য জৈনগণও নিজের বিরুদ্ধবাদীকে পাষাণ্ড বলিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে যে সকল পাষণ্ডের কেবল সংখ্যা মাত্র উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের মত একত্র সংগৃহীত করিতে পারিলে দর্শন শাস্ত্র আলোচনার অনেক উপকার হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী)।

৩৫। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২২০, ৩৩০ পৃঃ (সোসাইটি); বিষ্ণুপুরাণ, ৩-১৮।

৩৬। পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৪২ অধ্যায়।

৩৭। "কুটীসকাদিকচতুত্তিংস—দ্বাসট্ঠিদিট্ঠিয়ো।
ইতি ছন্নবতী এতে পাসণ্ডা সম্পকাসিতা॥"—অভিধানপ্পদীপিকা, ৪৪১।

৩৮। পূর্ব্বোক্ত ৬২ জন পাষণ্ডের মতকে সাধারণত নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যায়, যথা—শাশ্বতবাদ, অন্তানন্তিক, অমরবিক্ষেপ অধীত্যসমুৎপন্ন, সংজ্ঞিবাদ, অসংজ্ঞিবাদ, নৈবসজ্ঞি-নাসংজ্ঞিবাদ, উচ্ছেদবাদ, ও দৃষ্টধর্ম্মনির্ব্বাণবাদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত মত ইংরাজীতে এই সকল গ্রন্থে আছে—Buddhism : Its History and Literature, pp. 31-33. A Manual of Buddhism pp. 403-4. Questions of King Milinda Part II. pp. xxiii—xxv (Sacred Books of the East).
উল্লিখিত শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ মহাভারতেও দেখা যায়, যথা—
"এবং সতি ক উচ্ছেদঃ শাশ্বতো বা কথং ভবেৎ।
স্বভাববর্ত্তমানেষু সর্ব্বভূতেষু হেতুতঃ॥ ১২-২১৯-৪১।

৩৯। "অসিয়সয়ং কিরিয়াণং অকিরিয়বাঈণ হোন্তি চুলসীই।
অন্নাণিয় সত্তট্ঠী বেণইআণং চ বত্তীসং॥"—মণিভদ্র, ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়, ২ শ্লোকটীকা।

ভ্রমর

(কৃষ্ণকান্তের উইল)

ভ্রমর কালো হইয়াও সুন্দর, ভ্রমরকে দেখিলে মনে বিমল আনন্দ উপজাত হয়, ভ্রমর পবিত্রতার আধার। আর ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য নিত্য, অনন্ত, পবিত্র সুখের স্বর্গ সৃজন করিয়াছিলেন নিত্য ও অনন্ত, এই অর্থে যে, গোবিন্দলাল আপনার দোষে সে স্বর্গের উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন মাত্র, অন্যথা তাঁহার সম্বন্ধে সে প্রীতিপ্রস্রবণ কখনও শুষ্ক হয় নাই, তাহা স্বর্গের জিনিস; ইহজীবনের অবসানে শরীর পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবসান হইবার নহে, ভ্রমর তাহা অক্ষুন্ন ভাবে সঙ্গে লইয়া, অনন্ত ধামে, গোবিন্দ লালের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; ইহ জীবনে ভ্রমরের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন অসম্ভাবিত হইয়া থাকিলেও, ভগবৎপাদপদ্মে মনস্থাপন করিয়া, পাপমুক্ত হইয়া গোবিন্দ-লাল সে সুখের অধিকার পুনর্লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রমরের শোকে বিকৃত-মস্তিষ্ক গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিবার কল্পনা করিলে, রোহিনীর সেই পথে আহ্বানের বিরুদ্ধে ভ্রমরের আত্মা জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করতঃ গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"—তাহারও এই অর্থ। তাহারও অর্থ এই যে, ভ্রমর গোবিন্দলালকে, মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দ-লালকে, নিত্য অনন্ত পবিত্র সুখে সুখী করিবার জন্য ভগবৎপ্রেরিতা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যের প্রাবল্যে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, গোবিন্দলালকে আহ্বান করিতেছেন, "মর্ত্ত্যে তোমার জন্য যে সুখের স্বর্গ সৃজন করিয়াছিলাম তাহা টিকিল না, তুমি ভগবৎভক্তির বলে মর্ত্ত্যের আবর্জ্জনা এড়াইয়া, পাপমুক্ত হইয়া, স্বর্গে আসিয়া সে অনন্ত সুখময়ের, সে আনন্দস্বরূপের সান্নিধ্যে নিত্য সুখ উপভোগ কর। অনন্ত প্রেমের রাজ্যে কেহ প্রেম ভিখারী নহে, এ অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যে সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় কাহার মতিভ্রম ঘটে না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, মর্ত্ত্যে যাহা পাইয়াও হারাইয়াছিলে, পুনরায় তাহা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হও।"

ভ্রমর চিত্রে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বিরাজমান। এ চিত্র অঙ্কনে কবি কম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। অল্প কথায়, অনেক সময়ে একটীমাত্র কথায়, একটি নামমাত্র দ্বারা একটি সমগ্র চরিত্রের আভাস দিবার ক্ষমতা এরূপ কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমর নামটি নির্ব্বাচনে কবি কিরূপ

সৌভাগ্যশালী তাহা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই কালো ক্ষুদ্রাকায় জীবটি, যাহা ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গুন্ গুন্ রবে পুষ্পোদ্যান আমোদিত করে; যাহা কালো হইলেও আমরা ভালবাসি, যাহা ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের প্রীতিসম্পাদন করে, যাহা কোমল মধুর পবিত্রতার আদর্শ পুষ্পের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট, ভ্রমর সেই ক্ষুদ্র জীবের কেমন অনুরূপ! ভ্রমর কালো, ভ্রমর ক্ষুদ্র শরীরা বালিকা, স্বল্পদেহা, যেন এখানে ওখানে সেখানে ফুটিয়া ফুটিয়া বেড়াইতেছে—কখন স্বামীপার্শ্বে বাতায়ন পথে,—স্বামী অনিমিষ লোচনে সে কালো অথচ সুন্দর সরলতাপূর্ণ নিত্য প্রীতির আকর মুখপানে তাকাইয়া আছেন, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না! কখন রন্ধনশালায় পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া রূপ কথা শুনিতে বসিয়াছেন; বালিকার অমায়িকতায় পাচিকার রন্ধন ক্লেশ উপশমিত হইতেছে! অথবা দাসীগণ মধ্যে উপনীতা হইয়া তাহাদের অনর্থবোধক কোলাহল শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে গালি দিতেছেন, আবার, কেহ দুঃখ করিলে, তাহার জন্য কাতর হইতেছেন। এইরূপে স্থানে স্থানে প্রীতি প্রক্ষেপ করিয়া নাচিয়া নাচিয়া আবার তাঁহার নিত্য-স্বর্গ স্বামীসন্নিধানে উপস্থিত হইতেছেন।

উষা সমাগমে প্রভাত বায়ু সেবন জন্য মুক্তবাতায়ন পথে গোবিন্দলাল দণ্ডায়মান। ভ্রমর আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কিঞ্চিৎ রঙ্গালাপের পর, গোবিন্দলাল বলিলেন, "তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।" কবি বলিতেছেন, "ভোমরা নথ-নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া একটা হুকে রাখিয়া গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে অতৃপ্তলোচনে চাহিয়াছিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যোদয় সূচক প্রথম রশ্মি কিরীট পূর্ব্বগগণে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃ পুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার কোমল শ্যামছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি-চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে, আর প্রভাতের বাতাসে মিলিয়া গেল।"—কি সুন্দর ছবি! ইহা কবির চিত্র। দেখাইয়াই কেবল বুঝান যায়, অন্যথা এ সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়! স্থানান্তরে, ভিন্ন ভাবে, রোহিনীর প্রণয়-প্রসঙ্গে রহস্যালাপ করিতে করিতে, গোবিন্দলাল যখন কৌতুহলব্যাকুলিতহৃদয়া ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, তাঁহার প্রফুল্লনীলোৎপল-দলতুল্য মধুরিমাময় মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করতঃ মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, "মিছে কথাই ভোমরা, আমি

রোহিণীকে ভালবাসি না, রোহিনী আমায় ভালবাসে," তখনও এই সৌন্দর্য্যই আভাসমান।

আবার সরলা বালিকা,ক্রীড়াময়ী, নিত্য-প্রফুল্লহৃদয়া, মৃদু-প্রস্ফুটিত ফলৎপুষ্পবৎ, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যের সহিত কিরূপ মিশিয়া যাইতেন দেখুন—জ্যোৎস্না-প্রভাসিত বারুণীতীরবর্ত্তী গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানে প্রস্তরবেদিকোপরি নির্ম্মিত পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি—অর্দ্ধাবৃতা:বিনতলোচনা, যেন একটী ঘট হইতে আপনার চরণদ্বয়ে জল ঢালিতেছে। বেদিকার উপরে উজ্জ্বল-বর্ণরঞ্জিত মৃণ্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ—নীচে, বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী যুথিকা প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি। ভ্রমর আসিয়া, ক্রীড়া-পরবশ ভাবে কখন অর্দ্ধাবৃতা স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিতেছেন, কখন আপনার অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিতেছেন, কখন বা তাহার হস্তস্থিত ঘট ধরিয়া টানাটানি বাধাইতেছেন।—এইরূপে কেমন সে জড় সৌন্দর্য্যের সহিত এই জীবন্ত সৌন্দর্য্য মিশিয়া গিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব করিতেছে! এ সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়।

রোহিণীর চুরির কথা শুনিয়া গোবিন্দ-লাল তাহাতে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলেন। ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিশ্বাস হয়?" গোবিন্দলালের যখন বিশ্বাস রোহিণী নিরপরাধিনী, ভ্রমরেরও তখন সেই বিশ্বাস। ভ্রমর আপনার অস্তিত্বে যেরূপ বিশ্বাসবতী রোহিণীর নির্দ্দোষিতায়ও সেইরূপ। ইহার একমাত্র কারণ গোবিন্দলালের বিশ্বাস। গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। স্বামীর জ্ঞান-বুদ্ধিবিশ্বাসে ভ্রমর অনন্ত আস্থাবতী। গোবিন্দলাল ইহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই ভ্রমরের বিশ্বাসের কারণ জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর, ভ্রমর, বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিলেন না, লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরব রহিলেন। গোবিন্দলাল মনে মনে বড় সুখী হইলেন। তিনি ভ্রমরকে চিনিতেন, তাই সে কালো এত ভাল বাসিতেন; পুনরায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে যাইতে উদ্যত হইলে ভ্রমর গোবিন্দলালের বস্ত্র ধরিয়া "কোথা যাও?" জিজ্ঞাসা করায়, গোবিন্দলাল বলিলেন "কোথা যাই বল দেখি?" ভ্রমর উত্তর করিলেন "এবার বলিব, তুমি রোহিণীকে বাঁচাইতে যাইতেছ।" গোবিন্দলাল প্রকৃতই তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট সেই উদ্দেশ্যে যাইতে-ছিলেন। তিনি ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন, পরদুঃখকাতরহৃদয় পরদুঃখকাতরতা বুঝিল, তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।—এ স্বর্গের সৌন্দর্য্য, ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়! ভ্রমরের এই পরদুঃখকাতরতা দুইটি সামান্য ঘটনায় বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রোহিনীর চৌর্য্য লইয়া রায়-গৃহের দাসীগণ মধ্যে কিরূপ কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল কৃষ্ণকান্তের উইলের পাঠকগণের অবশ্য তাহা স্মরণ আছে। ভ্রমর

অনেক চেষ্টায়ও সে কোলাহলের অর্থ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, দাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "তোদের গলায় দড়ি।" তাহাতে কোন কোন দাসী চোখের জল ফেলিল, তাহাদের দুঃখের কপাল তাই গতর খাটাইয়া খাইতে আসিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের হাস্যোদ্দীপক ব্যবহারে ভ্রমর যদিও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তবু তাঁহার কথায় কেহ কেহ মনে বেদনা বোধ করিয়াছে বুঝিয়া ব্যথিত হইলেন। অন্যত্র, গোবিন্দলাল জ্যেষ্ঠতাতকে অনুরোধ করিয়া রোহিণীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ভ্রমর তাহাকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ভাল করিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছেন না, কি জানি যদি রোহিণীর এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে? ভ্রমর-হৃদয়ের কোমলতা ইহাতে অতি সুন্দর রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

ভ্রমরের সলজ্জ ভাবটি কবি স্থানে স্থানে এরূপ সুন্দর ফুটাইয়াছেন যে তাহাতে ভ্রমর চরিত্রের সৌন্দর্য্য অতিশয় মধুরতার সহিত বিকসিত হইয়াছে। ভ্রমরের বালিকাস্বভাবের সহিত সে সলজ্জ ভাব সুন্দর শোভা পাইয়াছে। রোহিণীর চৌর্য্যাপবাদ সম্বন্ধে রোহিণীর মনের কথা অন্যের সমক্ষে রোহিণী বলিবে না আশঙ্কা করিয়া ভ্রমরকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য গোবিন্দলাল বলিলেন—"আমাকে কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।" ভ্রমর এ কথায় বড় অপ্রতিভ হইলেন। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পালাইলেন, একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে একটী রূপকথা বল না।" এই সলজ্জ ভাবের সহিত ভ্রমর কেমন নিত্যপ্রফুল্লতাময়ী তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—উভয়ের মিশ্রণে বালিকা ভ্রমরে কি মাধুর্য্যের উদ্ভব হইয়াছে! আমরা তাই ভ্রমরকে মৃদুপ্রস্ফুটিত চলৎপুষ্প বলিয়াছি। প্রফুল্লতাময়ীর রহস্যালাপে লঘুত্ব নাই, অথচ লজ্জাপীড়িতার নীরব বিষণ্ণতাও তাহাতে দৃষ্ট হয় না। ভ্রমরের এই বালিকা স্বভাব, এই নিত্যপ্রফুল্লতা, এবং এই প্রফুল্লতাজনিত ঈষৎরঙ্গপ্রিয়তা, ক্রীড়া পরবশতা, অথবা এ সকলের সমষ্টিভূত যে প্রকৃতি তাহা তাঁহার বিষণ্ণতার মধ্যেও প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বশুর অমতে স্বামীসঙ্গে বিদেশ যাওয়া হইল না, গোবিন্দলাল একাকী বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। পতিবিরহে "ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল, তাহার পর উঠিয়া অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুলসকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এই রূপ নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার

কাঁদিতে আরম্ভ করিল।" ভ্রমরের পতি-বিরহজনিত মনঃক্লেশের এইরূপ বিকাশ ভ্রমর প্রকৃতির কিরূপ উপযোগী হইয়াছে! অথবা ভ্রমরের প্রকৃতি ক্রীড়াতৎপর, বালিকা-সুলভচাঞ্চল্যবিশিষ্ট, এবং সেই ক্রীড়া-পরবশতা বা চাঞ্চল্য মধ্যে মাধুর্য্যবিজড়িত; সেই প্রকৃতিবশতই তাঁহার বিরহদুঃখ এই ভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে। কবির মনুষ্যপ্রকৃতির জ্ঞান এবং প্রকটনে নৈপুণ্যের ইহা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আর ভ্রমর চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, রোহিণীও সে পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছিল—পরকালে আত্মদুষ্কৃতের ফলভোগ করিতে করিতে রোহিণী ভাবিতেছিল, সে জীবনেও গোবিন্দলালের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারিলে ভ্রমরের পুণ্যে যদি সেই সঙ্গে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

তথাপি ভ্রমর কল্পনার সৃষ্টি নহে। বিরল হইলেও—যাহা সুন্দর তাহা এ সংসারে বিরলই হইয়া থাকে—সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও, হিন্দুর গৃহে ভ্রমর অপ্রাপণীয়া নহে। সূর্য্যমুখী অবশ্য অবিসংবাদে হিন্দু পত্নীর প্রকৃত আদর্শ। ভ্রমরও আদর্শ; ভিন্ন প্রকৃতিক হইয়াও আদর্শ, তবে ভিন্ন ভাবে। আদর্শ মাত্রেই এক প্রকৃতির হয় না। ভ্রমরকে আদর্শ হিন্দুপত্নী বলিতে হয় ত অনেকের আপত্তি হইবে। জনৈক সমালোচকের মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা বা সংশ্রবপ্রভাবে ভ্রমরে যে আত্মসম্মান বা আত্মস্বত্ব বোধের সংক্রামণ এবং তাহা হইতে তাঁহার চরিত্রে যে তেজস্বিতার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা অহিন্দু বা হিন্দুরমণীর পতিভক্তির সহিত অসঙ্গত, সে তেজস্বিতা না থাকিলেই সুখের হইত, সেই তেজস্বিতাই ভ্রমর গোবিন্দলাল সম্বন্ধে অকল্যাণের কারণ হইয়াছিল। কবি নিজেও তাঁহার এই সুন্দর সৃষ্টিকে নির্দ্দোষ বলিয়া যান নাই, গোবিন্দলালের ভাগিনেয় শচীকান্ত বসু ভ্রমর-গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যানে সুবর্ণগঠিত ভ্রমরের যে প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার পদতলে কবি তাঁহার দ্বারা লিখাইয়াছেন,—

"যে সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা দান করিব।"

যে দোষে গুণে ভ্রমরের সমান হইবে শচীকান্ত বাবু তাহাকে এই পুরস্কার প্রদান করিবেন; অর্থাৎ ভ্রমরের দোষও সুন্দর, তাহা আদরের জিনিস, সম্মানের জিনিস, পুরস্কৃত করিবার জিনিস,—ভালবাসিবার জিনিস, ঘৃণার জিনিস নহে। তথাপি তাহা দোষ, কেন না তাহা অনর্থ ঘটাইয়াছে। অন্ততঃ অনেকে বলিবেন, "ভ্রমর, তোমার আত্মত্ব ভাবটুকু না থাকিলে, তজ্জনিত এই রাগাভিমানটুকু না থাকিলে, হয় ত তোমার অদৃষ্ট এরূপে ভাঙিত না, হয়ত তুমি যাহার কল্যাণের জন্য যাহার সুখের জন্য আমরণ এত উদ্বিগ্ন চিত্তে সময়াতিপাত করিতে, তাহার এরূপ অধঃপতন হইত না, ইহজীবনের জন্য তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইত না।" আমরা বলি, প্রৌঢ়বয়স্কা গৃহিণী এবং গৃহিণীস্বভাবসঞ্জাত গাম্ভীর্য্য সমন্বিতা

সূর্য্যমুখীর প্রকৃতি, বালিকা সরলা সংসারানভিজ্ঞা ভ্রমরে অস্বাভাবিক হইত। কবি যে বালিকার স্বভাব সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাই তাঁহার প্রশংসা। আপনার বিপুল সংসারে গৃহিণী পদারূঢ়া হইয়া সূর্য্যমুখী যে ধীরতালাভ করিয়াছিলেন, কার্য্যকালে বিচার করিবার যে শক্তি তাঁহার জন্মিয়াছিল, ভ্রমরের বয়সে ও জীবনের অবস্থায় তাহা সম্ভবে না। তাই সূর্য্যমুখী গাম্ভীর্য্যের সহিত মৌনভাবে যাহা বহন করিয়াছিলেন, ভ্রমর বালিকাস্বভাবসুলভ রাগাভিমানের বশীভূতা হইয়া তাহা সহ্য করিতে সমর্থা হয়েন নাই, ভ্রমরে হিন্দু পত্নীর নীরবে দুঃখ সহিবার সেরূপ শক্তি তখনও জন্মায় নাই। ভ্রমরের এই রাগাভিমানটুকু, তাঁহার এই তেজস্বিতাটুকু, এই আত্মত্বটুকু সম্পূর্ণ তাঁহার বালিকাস্বভাব হইতেই উদ্ভুত নহে, ইহার মূলে আরও মহত্তর কারণ রহিয়াছে। তাহার অনুধাবন করিলে, ভ্রমরকে শ্রদ্ধা করিতে, এবং তাহাকে এক হিসাবে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে, স্বতই প্রবৃত্তি হইবে।

ভ্রমরের বালিকাপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে, তৎপ্রকৃতিপোষক অন্যান্য কারণের মধ্যে, আমরা সর্ব্বাগ্রে স্বামীর ভালবাসায় তাঁহার তন্ময়তার কথার উল্লেখ করিব। সূর্য্যমুখীতে পতিপ্রেম এবং পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখী যদিও যথাসময়ে যথাবিহিত স্বামীসেবা করিয়া সতী জীবনের চরিতার্থতা বোধ করিতেন, তথাপি স্বামীর বিশাল সংসারে গৃহিণীরূপে তাঁহাকে অন্য অনেক কথা ভাবিতে হইত, অন্য অনেক কার্য্য দেখিতে হইত, অনেক বিষয়ে বিচার ও মীমাংসার ভার তাঁহার উপরে বিন্যস্ত ছিল—স্বামী বা স্বামীসেবার চিন্তায়, নানা কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতে হইত। স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া তিনি অবশ্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, সতী স্বামীর ভালবাসা বিহনে নিজ জীবনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না; কিন্তু যদি তিনি গৃহত্যাগিনী না হইয়া, কার্য্যে সময়ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে, তাঁহার মন ও শরীরকে নিযুক্ত রাখিবার উপায়ের অসংস্থান হইত না, এরূপে নিযুক্ত থাকিবার অভ্যাস ও শিক্ষাও তাঁহার হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথকেও বিষয়াদি সংরক্ষণের চিন্তায় এবং সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হইত। তিনি প্রণয়িনী সূর্য্যমুখীকে লইয়া নিরন্তর অন্তঃপুরে বাস করিতে পারিতেন না। সূর্য্যমুখীরও সংসারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীসকাশে অধিক সময় অতিবাহিত করিবার অবসর হইয়া উঠিত না। আর নবানুরাগের নিরবচ্ছিন্ন আসঙ্গলিপ্সার বয়সও তাঁহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অন্য দিকে, ভ্রমরের শ্বশ্রূ তাঁহার শ্বশুর গৃহে কর্ত্রী, এবং জ্যেষ্ঠা ননদিনী সংসারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সুতরাং ভ্রমরকে শিখিবার জন্য স্বেচ্ছায় ভিন্ন কর্ত্তব্যবোধে কোন কার্য্যের ভার বহন করিতে হয় নাই। গোবিন্দলালেরও সেইরূপ। জ্যেষ্ঠতাত সংসারের কর্ত্তা, কর্ত্তৃত্বের সকল ভার তিনিই বহন করিতেন।

গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মাত্মা, পরোপকার নিরত, পরের জন্য চিন্তা বা কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইলে করিতেন, কিন্তু ইচ্ছামত প্রণয়িনীর সঙ্গে সময়াতিপাত করিবার পক্ষে তাঁহার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। আবার উভয়েই নব যৌবনে উপনীত; নব দম্পতীর, বা দাম্পত্য ব্যবহারের সময় সমাগমে পরিণীতা স্ত্রী পুরুষের, আসঙ্গলিপ্সাও তাঁহাদের পূর্ণভাবে সমুপস্থিত। সমস্ত রজনীর সংসর্গলাভেও ভ্রমরের সে আসঙ্গলিপ্সার পরিতৃপ্তি হয় নাই—প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গোবিন্দলাল একটু সরিয়া গেলেই ভ্রমর গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইতেন। এই রূপে স্বামীসঙ্গ ও স্বামীর ভালবাসা ভ্রমরের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি অন্য কিছু ভাবিতেন না, তাঁহার অন্য কিছু ভাবিবার বিষয়ও ছিল না। এই তন্ময়তাহেতু তিনি স্বামীসঙ্গ এবং স্বামীর ভালবাসার অভাবের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাই, ভ্রমরকে গৃহে রাখিয়া গোবিন্দলাল বিষয় পরিদর্শন উপলক্ষ করিয়া দশ দিনের পথ বন্দরখালি গমন করিলে, ভ্রমর স্বামীসংসর্গের অভাবে জীবন্মৃতবৎ হইয়াছিলেন; তাই, ভ্রমর যখন গোবিন্দলালের মুখে শুনিলেন রোহিণী প্রকাশ করিয়াছে সে গোবিন্দলালকে ভালবাসে, অর্থাৎ অন্যে তাঁহার সাত রাজার ধন এক মাণিকের অংশ গ্রহণে চেষ্টিতা, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া বালিকার ন্যায়, বালিকার ভাষায়, বালিকার ভাবে, রোহিণীকে উদ্দেশ করিয়া গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন; তাই, পতিবিরহবিধুরা ভ্রমরের কাতরতা দূর করিবার মানসে ভ্রমরের প্রিয় দাসী ক্ষীরোদা যখন গোবিন্দলালের নামের সঙ্গে রোহিণীর নাম সংযুক্ত করিয়া ভ্রমরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে, ভ্রমর যাঁহার জন্য এত ব্যথিত তিনি ভ্রমরের নহেন, অন্যের, সুতরাং তাঁহার জন্য এত কাতরতা ভ্রমরের পক্ষে নিরর্থক; এবং যখন এই দাসীবাক্য—ভ্রমর যদিও তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস দেখিতে পাইতেছিলেন না এবং আর্য্য তনয়ার ন্যায় মনে করিতেছিলেন, অবিশ্বাসী হইলেই কি, মরিলেই সকল যন্ত্রণা ফুরাইয়া যাইবে—যখন এই দাসীবাক্য, গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট আত্মগোপন করিয়া ভ্রমরের মনে যে কালো মেঘের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ভ্রমরের অস্পষ্ট সন্দেহকে আকার প্রদান করিতেছিল, তখন ভ্রমর যেন মণিহারা ফণীর ন্যায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, দাসীকে প্রহারের উপর প্রহার করিলেন এবং প্রথমতঃ সে জীবনান্তকারী সন্দেহকে হৃদয় হইতে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পরে প্রতিবেশিগণ, তাঁহার দুঃখে দুঃখ দেখাইবার ছলে, যখন বলিয়া গেল, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙিয়াছে, তখন, ভ্রমর মনে মনে কাহাকেও যমের হাতে সমর্পণ করিলেন, কাহারও সহিত প্রকাশ্যে কলহ করিলেন এবং সকলের নির্দ্দয় ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে সন্দেহ-ভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই যে এ কথা বলে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া, প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, তোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।" ইহার পর, এই ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থাতে সংসারের কুটীল নীতি-অনভিজ্ঞ বালিকার পক্ষে, অকাট্য প্রমাণরূপে রোহিণী আসিয়া যখন সন্দেহকে বিশ্বাসে পরিণত করিয়া গেল, যখন সন্দেহ-দোলায়মান চিত্ত বিশ্বাসের স্থিরতায় উপনীত হইল, তখন বালিকা,—বালিকার বুদ্ধি বালিকার অর্ব্বাচীনতা বালিকার সরলতা বালিকার রাগাভিমান লইয়া, হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে যাঁহার জন্য প্রণয়ের উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাঁহাকে ভিন্ন ইহ সংসারে তিনি আর কিছু জানিতেন না, তাঁহাকে বালিকার ভাবে কটু কথা বলিয়া—সে হৃদয় দহনকারী দাবাগ্নি কতক পরিমাণে প্রশমিত করিবার আশাতেই যেন, হৃদয়োপরিস্থ সে প্রস্তর চাপ কতক পরিমাণে অপসারিত করিয়া রুদ্ধশ্বাস প্রবাহিত করিবার জন্যই যেন—দুটি কটু উক্তি করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন; লিখিলেন, "তুমি মনে জান বোধ হয়, যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত, আমিও তাহা জানিতাম কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই! তোমার দর্শনে আমার আর সুখও নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।" 'তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই'—এ মিছে কথা! এ কেবল ভালবাসার পাত্রের উপর রাগের ভাষা। গোবিন্দলালকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে বাস করাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইয়াছিল, পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিলেই পারিতেন, গোবিন্দলালকে সে কথা লিখিবার প্রয়োজন কি ছিল? না লিখিলে ভালবাসার পাত্রের উপর রাগাভিমান প্রকাশ করা হয় কই? হৃদয়ের প্রিয় বস্তুকে দুটা মন্দ কথা বলিয়া, তিনি এত প্রিয় বলিয়াই তাঁহার নির্দ্দয়তায় এত ব্যথিত হইয়াছি, তাহা দেখান হয় কিরূপে? সংসারাভিজ্ঞা বর্ষীয়সী বা প্রৌঢ়া যাহা গোপনে সহিয়া যাইতেন, ভবিষ্যৎ চিন্তা-বিহীনা সরলা বালিকা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়া একবার বলিতেন "ছি! ভ্রমর, এই কি তোমার উচিত হইয়াছে? আমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার

উপর এত অবিশ্বাস!" ভ্রমর লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, ভ্রমর চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া বলিতেন "আমি বালিকা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমা ভিন্ন এ সংসারে আর কিছু জানি না বলিয়াই তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম। আমি ত হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া তোমার উপর এক বিন্দুও অবিশ্বাস পাই নাই; তবে, সকলেই যে বলিতেছিল!" ভ্রমর পরে, তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু রোহিণীর রূপ চিন্তায় বিকৃতমস্তিষ্ক গোবিন্দলাল তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। স্বামীর ভালবাসায় বিশ্বাসই ভ্রমরের জীবন-সামগ্রী। সে বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিত, তাহা পুনঃ স্থাপনের জন্য গোবিন্দলালকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইত না, ভ্রমর তাহার হৃদয়ের সে স্বাভাবিক সামগ্রী আগ্রহে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া আপনার বস্তুতে আপনার বস্তু মিশাইয়া লইত। বিশ্বাস ও ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা ভ্রমর-হৃদয়ের স্বভাবদত্ত বস্তু, তাহার গঠন-সামগ্রী; তাহার বিহনে সে হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল, ভ্রমরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রহিত হইয়া আসিতেছিল, গোবিন্দলাল ইচ্ছা করিলে সে হৃদয়ে পুনরায় অমৃত-সঞ্চার করিতে পারিতেন, বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেই, সে প্রকৃতিতে সে সকলের গভীরতম উৎসের মুখ হইতে সাময়িক চাপ অপসারিত করিবার কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা করিলেই, সে উৎস পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রবাহিত হইতে থাকিত।

ভ্রমরের আত্মসম্মান ও তেজস্বিতার দ্বিতীয় কারণ ভ্রমরের পতিপ্রেমের প্রকৃতি, —সে প্রণয়ের ধর্ম্মমূলকতা। হিন্দুর দাম্পত্য-প্রণয় রূপজ প্রণয়ও নহে, গুণজ প্রণয়ও নহে; মনের উপর রূপগুণের প্রভাব হইতে তাহা উৎপন্ন হয় না, তাহা পতিপত্নীসম্বন্ধ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। পতিপত্নী সম্বন্ধ স্থলে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতির ভাবের উদ্ভব সকল সমাজেই প্রায় একই ভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু দাম্পত্যপ্রণয়ের একটু বিশেষত্ব আছে, ধর্ম্মমূলকতাই তাহার বিশেষ প্রকৃতি। পত্নী পতিকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, সেবা করিবে, ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সহায় হইবে—ইহাই পতির সম্বন্ধে পত্নীর ধর্ম্ম; পতি পত্নীকে স্নেহ করিবেন, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যথাসাধ্য বিধান করিবেন, এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপথে তাহার নেতা হইবেন—ইহাই পত্নীসম্বন্ধে পতির ধর্ম্ম; পত্নী পতির ভার্য্যা এবং সহধর্ম্মিণী, অতএব জীবনে নিত্য সহচরীরূপে, অতি নিকট এবং প্রীতির চক্ষে দেখিবার পাত্রী। পতি, পাতা পালন কর্ত্তা গুরু বা ধর্ম্মশিক্ষক; অতএব প্রেম ভক্তি সেবার পাত্র। হিন্দু নরনারীর ইহাই শিক্ষা; এ শিক্ষা এবং এরূপে সঞ্জাত প্রণয়ানুরাগ সমাজের বিশেষ কল্যাণকর। এ প্রণয়ানুরাগ রূপগুণের অপেক্ষা করে না, যদিও প্রণয়ীযুগলের রূপ গুণ বা পরস্পরের প্রীতির বস্তু উভয়ের সম্বন্ধকে মধুর করিয়া তুলে, এবং এরূপ প্রীতির বস্তুর পরিমাণাধিক্যসহকারে সে সম্বন্ধ চিত্তবিমোহনকারী হইয়া উঠে। ভ্রমর-গোবিন্দলাল যখন প্রণয় প্রফুল্ল নেত্রে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিতেন, তখন ভ্রমর ভাবিতেন গোবিন্দলালের কত রূপ, গোবিন্দলাল ভাবিতেন ভ্রমরে কত গুণ! আবার গোবিন্দলাল ভ্রমরের সেই কালো রূপের মধ্যেই কত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন, তাঁহাদের সেই প্রেমানুরাগ পরস্পরের সে রূপগুণকে আরও মধুর করিয়া দেখাইত। কিন্তু ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রেমানুরাগ মূলে রূপ ও গুণের প্রভাব হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে উপজাত। ভ্রমর ভাবিতেন স্বামীকে প্রেম করা ভক্তি করা সেবা করা তাঁহার ধর্ম্ম, অতএব তাঁহার কর্ত্তব্য। স্বামী তাঁহাকে প্রেম করিবেন, ইহাও তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। যাহা ধর্ম্ম, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা উভয়েরই সমান, তাহাতে ন্যায়তঃ উভয়ের একই রূপ দাবি। ভ্রমর কখনও মনে করিতেন না যে, বিশেষ রূপগুণের অভাবে, পত্নী পতির স্নেহাধিকারী না হইতেও পারেন। রোহিণী প্রসঙ্গে ভ্রমর গোবিন্দলালে কথা হইতে হইতেই গোবিন্দলাল এক স্থলে বলিলেন, "তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।" ভ্রমর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাহাকেও তোমার ভালবাসিতে নাই।"—ভালবাসিতে নাই—অর্থাৎ ভালবাসা তাঁহার অকর্ত্তব্য, তাঁহার পক্ষে তাহা ধর্ম্ম নহে। স্থানান্তরে, মাতাকে কাশীতে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য, ভ্রমর নিরতিশয় কাতরতার সহিত বারম্বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, গোবিন্দলাল যখন একান্ত নির্ম্মমের ন্যায় উত্তর করিলেন, "ইচ্ছা নাই", ভ্রমর উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম নাই কি?" এই ধর্ম্মের জ্ঞান, এই কর্ত্তব্যের জ্ঞান ভ্রমরের অত প্রবল ছিল বলিয়াই ভ্রমরের ওরূপ তেজস্বিতা। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেমও এই প্রকৃতির, অর্থাৎ হিন্দু দাম্পত্যপ্রণয় ধর্ম্মজ্ঞান হইতে সঞ্জাত। তবে সূর্য্যমুখী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিয়াও, স্বামীর সন্তোষের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত ছিলেন। তাহা তাঁহার প্রকৃতি গত হিন্দু ললনাসুলভ সৌন্দর্য্য। ভ্রমর বালিকা, সে এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞান লইয়া সূর্য্যমুখীর ক্ষমাশীলতা শিক্ষা করিতে পারে নাই। বালিকা হউক বালক হউক যাহারা সংসারজ্ঞাননিরত নহে, তাহারা ন্যায় ধর্ম্ম কর্ত্তব্যের বড় গোড়া, তাহারা দুর্ব্বলতার ক্ষমা করিতে বড় রাজী নহে। ইহাতে অপ্রশংসার কথা কি আছে আমরা বুঝি না।

সাবিত্রী সতীত্বের বলে যমের নিকট হইতে আপনার স্বামীকে ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন। ভ্রমর সেই সতীত্ব ধর্ম্মের মহিমায়, প্রকৃত হিন্দু রমণীর ন্যায় এরূপ বিশ্বাসবতী ছিলেন যে তিনি মনে করিতেন সতীত্বধর্ম্মে তাঁহার মতি থাকিলে দেবতারা তাঁহার সহায় হইবেন, তাঁহার কুত্রাপি পরাভব হইতে পারে না। ধর্ম্মের বলে অনুপ্রাণিতা ভ্রমরের এ তেজস্বিতা স্বাভাবিক। যখন ধর্ম্মের নামের অঙ্কুশেও মত্ত মাতঙ্গবৎ গোবিন্দলালের মন ফিরিল না, তখন তেজস্বিনী উঠিয়া তেজোগর্ব্বে বলিলেন, -"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন

আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি, আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার অপায়মার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে, যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী! তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" সতীর বিশ্বাস, সতীর স্বামীকে যমে লইতে পারে না, রোহিণী কি করিবে?

ভ্রমর চরিত্রের তেজস্বিতা যদিও ভ্রমরের প্রকৃতিগত—এবং আমরা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিরূপে তাহা তাঁহার প্রকৃতির অংশীভূত হইয়াছিল—যদিও গোবিন্দলালের অন্যায়াচরণে, তাঁহার নির্দ্দয়তা, তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানের পরিচয় ভ্রমর পদে পদে প্রদান করিয়াছেন, তথাপি, সতীর পতিভক্তিবশতঃ, হিন্দু রমণীর চিরন্তন শিক্ষানুসারে, স্বামীর অসন্তোষ অকারণ হইলেও, তাহা দূর করিবার মানসে, স্বামীর পদানত হইয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে, ভ্রমর কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। নিম্নলিখিত দৃশ্য দেখিয়া ভ্রমরের জন্য কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়?—

"ভ্রমর। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতি-পালিত, তোমার খেলিবার পুতুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গোবিন্দলাল। মনে করিয়া দেখ।

ভ্রমর। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িত-কুন্তলা, অশ্রু বিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। * * * * *

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখ দুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। * * * * *

ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল?" স্বামী উত্তর করিলেন "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।" স্বামীকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা পরিত্যক্তা সতীর হৃদয় স্বামী সম্বন্ধে কিরূপ তাহা দেখুন:—

ভ্রমরের ক্রন্দনে গোবিন্দলাল কর্ণপাত

করিলেন না দেখিয়া, ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, কক্ষান্তরে গিয়া, তাঁহার সূতিকাগারে মৃত শিশু পুত্রের জন্য ধূলায় পড়িয়া, অশমিত নিশ্বাসে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—"আমার ননীর পুতলী আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজ তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?"—সংস্কৃত কবিগণ সন্তানকে পতিপত্নীর প্রণয়বন্ধন বলিয়া গিয়াছেন, তাই ভ্রমর কাঁদিলেন "যদি আমার সন্তান বাঁচিয়া থাকিত, তবে আমাদের মমতা এড়াইতে পারিতেন না।" ইহা নিজের অদৃষ্টের জন্য ক্রন্দন। স্বামীর উপর রাগ নহে। স্বামী নিদয় নিগ্রহকারী, তথাপি স্বামীর ভালবাসার প্রতি হৃদয়ের একান্ত লোলুপতা বশতই হিন্দু রমণীগণ, সন্তানের প্রতি স্বামীর স্নেহাকর্ষণের নানা উপায়াবলম্বনে, স্বামীর সহিত আপনাদের প্রণয়বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য প্রয়াস পান।

মাতার সহিত গোবিন্দলালের কাশীধামে পৌঁছাসংবাদ বাড়ীতে আসিল। ভ্রমরের কাছে কেবল পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমর পত্র লিখিলেন না। অভিমান কাহার উপর? ভালবাসা আশা আকাঙ্খা না থাকিলে, অভিমানের অর্থ কি? এখনও ভ্রমর স্বামীর ভালবাসায় বিশ্বাসবতী, অন্ততঃ সে ভালবাসায় আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিতে তিনি নিতান্ত অসমর্থা। তিনি, রাগ করিয়া যাহাই বলিয়া থাকুন, স্বামীর প্রতি ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ে এক বিন্দুও কম হয় নাই—সতীর হৃদয়ে তাহা কখনও কমে না।

কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন। ছয় মাস গত হইল তিনি বাটীতে আসিলেন না, কোন সংবাদও আসে না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। ভ্রমর কেবল মনে করিতেন, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদ পাই না কেন? স্বামীসংসর্গ পুনর্লাভের আশা যদি নাও থাকে তিনি কুশলে আছেন জানিলেই ভ্রমর সুখী। ভ্রমর এখানে স্বার্থত্যাগিনী হইতে চেষ্টিত হইলেও স্বামীর একান্ত কল্যাণাভিলাষিনী।

গোবিন্দলাল এইরূপে নিরুদ্দেশ; রোহিণীও কিছু দিন পরে নিরুদ্দেশ হইল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীর হত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত, সকলই ভ্রমর অবগত হইলেন। ভ্রমর যখন শুনিলেন স্বামী রোহিণীকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখনই পুনরায় স্বামীর সংসর্গলাভ ও তাঁহার চরণ সেবার সুখের আশা তাঁহার ফুরাইল। হৃদয়ে প্রদীপ্ত আকাঙ্খা লইয়াও, তাঁহার পুষ্পপেলব প্রকৃতির সহিত অথবা তাঁহার হিন্দু রমণীর ধর্ম্মসংস্কারের সহিত হত্যাকারীর সেবা ও সহবাসের সামঞ্জস্য কল্পনা করিতে পারিলেন না। সেই জন্যই স্বামীর গৃহ প্রত্যাগমন তাঁহার বিপদ বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল; তাঁহার মর্ম্মান্তিক

যাতনা আরম্ভ হইল। কবি ভ্রমরকে যে প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা সুন্দর সংরক্ষিত হইল। ভ্রমর আপনার সকল আশা ধূম্রবৎ দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সতী হিন্দু রমণীর হৃদয় স্বামীসম্বন্ধে সকল অবস্থায়ই কিরূপ অপরিবর্ত্তিত তাহা প্রতিপন্ন করিলেন :—

রোহিণীর হত্যাকারী সম্বন্ধে পুলিসের অনুসন্ধান চলিতেছে, ভ্রমর তাহা অবগত হইয়া স্বামীর পাছে বিপদ হয় সেই আশঙ্কায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, সে চিন্তায় তাঁহার হৃদয়শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী মনে করিলেন গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে নিজের বাড়ীতে আসিয়া বসিলে অন্ততঃ অনেক টাকা হাতে হইবে; পুলিস টাকার বশ, তাঁহার কোন আপদ থাকিবে না। ভ্রমর কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন, সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব? যামিনী গোবিন্দলালের হরিদ্রাগ্রামে আসা সম্বন্ধে কিছু ভরসা প্রকাশ করিলে ভ্রমর বলিলেন,—যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।' নিজের আকাঙ্খা পরিপূরণের আশা অসম্ভব মনে করিয়া সে আশা ভ্রমর একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদি ইহজন্মে কখন তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, স্বামীর কল্যাণের জন্য তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে তিনি প্রস্তুত। স্বামীর কল্যাণই এখন তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয়। এইখানে ভ্রমরের পতিপ্রেম সম্পূর্ণ স্বার্থহীন আকারে প্রতীয়মান। ভ্রমর রুগ্নাবস্থায় মাতাভগিনীর শুশ্রূষা পাইবার জন্য পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন, হরিদ্রাগ্রামে তিনি না থাকিলে স্বামীর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা কম হইতে পারে বুঝিয়া পুনরায় হরিদ্রাগ্রামে গিয়া, স্বামীর আগমন নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যদিও স্বামী কর্ত্তৃক রোহিণীর নিধনপ্রাপ্তির সংবাদে ভ্রমর তাঁহার কোমল প্রকৃতিতে স্বামী সাক্ষাৎ তাঁহার পক্ষে একটী সমস্যা বোধ করিয়া, নিজের রোগের উল্লেখ করিয়া হরিদ্রাগ্রামে যাইতে প্রথম কিছু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি রোগক্লেশ সহ্য করিয়াও, শরীরের যাহা কিছু ছিল তাহা পাত করিয়াও যদি স্বামীর নিরাপদ হইবার সহায়তা করিতে পারেন, এই আশায় নিজের সকল ক্লেশ সকল বিপদের জন্যই প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর গত হইল, স্বামী আসিলেন না। রোগে ভ্রমরের শরীর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিল, মৃত্যুর দিন আসন্ন বোধ হইল; ভ্রমর মনে মনে বলিলেন-বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না। স্বামী সন্দর্শনের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক থাকিলেও তাহা অসম্ভব মনে করিয়া বা স্বামীর মঙ্গলার্থে সে আশা ইহজন্মের মত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেও ভ্রমর সে আকাঙ্খা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে জনরবে ভ্রমর শুনিলেন গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার রক্ষার জন্য

তাঁহার পৈতৃক বিষয় হইতে অর্থব্যয় করা অভিপ্রেত হইলে তাহার এই সময়। তিনি যোগ্য নহেন, তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছাও নাই, তাহার তবে ফাঁসি যাইতে না হয় তাঁহার এই ভিক্ষা। ভ্রমর শুনিবামাত্রই লোক পাঠাইয়া পিতাকে আনাইলেন এবং তাঁহার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।" এই স্থলে ভ্রমর-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে;—যে হৃদয় ব্যাধকর্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া যাতনায় ছট ফট করিতেছে, যে হৃদয় শরাহত হইয়া সহস্র ধারে প্রসৃত রক্তধারায় অবসন্ন, সে আপনার সকল যন্ত্রণা, সকল ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া সেই ব্যাধের জন্যই ব্যথিত! সে ব্যথা সামান্য ব্যথা নহে; ব্যাধের অমঙ্গল ঘটিলে, সেই জীবনান্তকারী শরাঘাতের ফলের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে প্রস্তুত। ভ্রমর-হৃদয়ের প্রকৃতি প্রদর্শনে কবি এখানে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ভারতের কলা বিদ্যা।

আর্য্যগণ শিল্প জ্ঞানকে কলা বিদ্যা বলিতেন। এই কলা বিদ্যা চতুঃষষ্ট (শৈব তন্ত্রোক্ত) শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১। গীত। ২। বাদ্য। ৩। নৃত্য ৪। নাটকাভিনয়। ৫। আলেখ্য। (ইহাদের বিষয় পশ্চাৎ সবিশেষ বলিতে ইচ্ছা রহিল।) ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য। পুরাকালে নরনারীগণ কুঙ্কুম চন্দনাদি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিত; এই চিত্র রচনের (অলকা তিলকা প্রভৃতি) কৌশল বিশেষকে "বিশেষকচ্ছেদ্য" বলিত। ইহা সখীরা বা মেলেনীগণ সম্পাদন করিত। মেলেনীগণের ইহা জীবিকা ছিল। এখন অলকাতিলকাচিত্র সভ্যতাসঙ্গত নহে বলিয়া পরিত্যক্ত; কাজেই এখন আর উহা জীবিকাপদ বাচ্য নহে। দক্ষিণ দেশে আজিও প্রসাধিকাগণ অলক্তক পরাইয়া দুই এক পয়সা উপায় করে ইহা আমি দেখিয়াছি। কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এখনও লোকে উড়ে ও হিন্দুস্থানী ঘাটওয়ালার নিকট চন্দনের ফোঁটা পরিয়া থাকে। ইহাই পুরাকালের বিশেষকচ্ছেদের অপভ্রংশ বা অনুকরণ।

৭। তণ্ডুল কুসুম বলিবিকার॥ পুরাকালে পূজা ও যাগ যজ্ঞাদির সময় তণ্ডুলাদি দ্বারা যে নৈবেদ্যাদি রচনা ও গন্ধ পুষ্পাদি সাজান হইত তাহাকে তণ্ডুলকুসুম-বলিবিকার বলিত। ইহাও ব্যক্তি বিশেষের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ ছিল। এখন আর ইহা বড় একটা দেখা যায় না।

৮। পুষ্পাস্তরণ॥ ফুলের শয্যা ও ফুলের ব্যজন (পাখা) প্রভৃতি রচনা করা। পুরাকালে মালীরা এই কার্য্য করিত। এখনও ফুলের স্তবক (তোড়া) পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া স্থান বিশেষে কেহ

কেহ অর্থোপার্জ্জন করে। এখন এই কার্য্য মালির আর একচেটে নহে।

৯। দশন বসনাঙ্গ রাগ॥ দশন রঞ্জন, বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গ রঞ্জন। পূর্ব্বকালে লোকেরা দাঁতে নানারূপ ছক কাটিত, গায়ে উল্কী পরিত। এখন এ সব বঙ্গ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোকের মধ্যে দাঁতে ছক কাটা ও স্ত্রীলোকদের উল্কী পরা দেখা যায়। আমাদের দেশে বিলাসিনীগণ কাপড় ছোবান ও আলতা পরা এই দুইটীমাত্র বজায় রাখিয়াছেন।

১০। মণিভূমিকাকর্ম্ম মণি অর্থাৎ প্রস্তর, তদ্বারা চত্বর (উঠান) পিণ্ডিকা প্রতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা। ইহা একটী প্রধান শিল্প। ইহা বর্ত্তমান সময়েও সমধিক গৌরবের ও উপার্জ্জনের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভাস্কর্য্য হইতে অধিক উন্নত হয় নাই। বারান্তরে প্রমাণাদিসহ প্রাচীন মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখাইব।

১১। শয়ন রচন॥ খাট পালঙ্ক প্রভৃতি শয্যা রচনা চাতুর্য্য।

১২। উদক বাদ্য॥ জলে কোন পাত্র রাখিয়া অথবা কোনও পাত্রে জল রাখিয়া নানা তালে বাদ্য করা। ইহাই আধুনিক জলতরঙ্গ বাদ্য।

১৩। উদক ঘাত॥ প্রাচীন গ্রন্থে উদকঘাত শব্দের "জলস্তম্ভবিদ্যা" এইরূপ অর্থ দেখা যায়। দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা বলে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। ইহা মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন জলমগ্ন জাহাজের দ্রব্য উত্তোলনকারী ডুবুরিরাই জলস্তম্ভ বিদ্যার অনুকরণ করিয়া থাকে মাত্র।

১৪। চিত্র যোগ॥ আশ্চর্য্য কার্য্যপ্রদর্শন করা। ইহা এক প্রকার বাজী বিশেষ।

১৫। মাল্যগ্রহণে বিকল্প॥ নানাপ্রকার মালা বা পুষ্পের পেটরাদি প্রস্তুত করা। সুন্দর, বিদ্যার নিকট পুষ্পের পেটরায় ফুল-ময় ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মাণ করিয়া হীরে মালিনীর দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন; বিদ্যাসুন্দর যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। অতিপুরাকালে মাল্যগ্রথনাদি সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য ছিল।

১৬। শেখরাপীড়যোজনা॥ শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপী পাগড়ী ও তাহার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করা।

১৭। নেপথ্য যোগ॥ রঙ্গরচনা, অভিনেতাদিগকে সাজান, এবং সাজের উপকরণাদি প্রস্তুত করা।

১৮। কর্ণ পত্রভঙ্গ॥ পুরাকালে রমণী-গণ পত্র-পুষ্পাদি নির্ম্মিত পত্রাকার কর্ণভূষণ ব্যবহার করিতেন। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা হইত সেই নারী রাজ মহিষীদের নিকট সৈরিন্ধ্রী (দাসী) পদপ্রাপ্ত হইত।

১৯। গন্ধযুক্তি॥ নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করা। ইহাও সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য ছিল।

২০। ভূষণ যোজন॥ অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তাহার গ্রন্থনাদি। নির্ম্মাণ কার্য্যটী এখন স্বর্ণকারের হাতে গিয়াছে। গ্রন্থন কার্য্যটী প্রায়ই আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সম্পন্ন হয়।

২১। ইন্দ্রজাল॥ ভোজবাজী।

২২। কৌচুমার যোগ॥ সর্ব্বপ্রকার অক্ষরের অনুকরণ করাকে কৌচুমার যোগ বলে। আমরা ইহাকে জাল করা বলি। ইহাকে তস্কর-জীবিকা বলা যায়।

২৩। হস্তলাঘব॥ অলক্ষ্যে অতি সত্বর হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন করা। ইহা এক চমৎকার বাজী। এখনও অনেক হস্ত লাঘব পটু বাজীকর আছে।

২৪। চিত্রশাকপূপভক্ষবিকার ক্রিয়া॥ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পিষ্টকাদি প্রস্তুত করা।

২৫। পানকরস রাগাসব। মদ্য নানা-প্রকার সরবৎ ও মোরব্বাদি প্রস্তুত করণ। বারান্তরে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিব।

২৬। সূত্রক্রীড়া॥ সূত্রসংযোগে পুতুল নাচান। ছায়াবাজী খেলা। ইহা অতি হীন ও সংকীর্ণ জীবিকা।

২৭। সূচীবাপ কর্ম্ম॥ সূচীকার্য্য ও বস্ত্র বয়ন কার্য্য।

২৮। প্রহেলিকা। কবিতার গোপনীয় অর্থ পরিজ্ঞান। ইহাকে হেঁয়ালী বলে। পূর্ব্বে লোকে ইহাতে চমৎকৃত হইয়া রচয়িতাকে পুরস্কৃত করিত। এখন ইহার তত প্রচলন নাই।

২৯। প্রতিমালা বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করা। বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যাকে ফটোতোলা বলে।

৩০। দুর্ব্বচক যোগ॥ যে সকল কাব্যের লিপির অর্থ সাধারণের বলিবার শক্তি নাই তাহা বলা। এই বিদ্যাটী পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকারী॥

৩১। পুস্তক বাচন॥ অতি শীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ সংযোজিত করিয়া পুস্তক পড়া ও নানা-প্রকার অক্ষর পড়িতে পারা। এটীও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর সাহায্যকারী।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন॥ নাটক অভিনয় দেখান। এই বিষয়টী নাট্যাচার্য্য ভারত ঋষি রচিত গ্রন্থে বহুল রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সময়ান্তরে এই বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

৩৩। কাব্য সমস্যাপূরণ॥ কাব্যের বা শ্লোকের একাংশ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করা।

৩৪। পট্টিকাবেত্রবাণ বিকল্প॥ পাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করা। হস্তী, অশ্ব, ও উষ্ট্র প্রভৃতির পৃষ্ঠাস্তরণ ও সাজ প্রস্তুত করা। বেতের দ্বারা আসনাদি নির্ম্মাণ ও যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৩৫। তর্ক কর্ম্ম॥ একটী ছোট মৃত্তিকা বা পাষাণাদি নির্ম্মিত পিণ্ডে লৌহাদি শলাকা প্রোথিত করিলে তাহাই তর্ক নামে অভি-হিত হয়। সাধারণ কথায় যাহাকে "টাকুয়া" বলে। ইহাদ্বারা বহুবিধ সূক্ষ্ম ও স্থূল সূত্র প্রস্তুত করা যায়। এই যন্ত্রে আমাদের দেশে (উত্তর বঙ্গে) ব্রাহ্মণ রমণীগণ পৈতা প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে সকল ব্রাহ্মণের মেয়েরাই পৈতা প্রস্তুত করিতেন। সম্প্রতি সভ্যতার যুগে নব্যাঠাকুরাণীগণ ইহাকে অসভ্যতা বোধে পরিত্যাগ করিয়া ইহার পরিবর্ত্তে বড় ঘরে পিয়ান বাজান ও আমাদের ঘরে কম্ফর্টার, চেইন প্রভৃতি প্রস্তুত করা ধরিয়াছেন। আমাদের এখন তাসের সূতা পৈতা স্থানীয় হইবে বা হইয়াছে!

৩৬। তক্ষণ ক্রিয়া॥ কাষ্ঠের কার্য্য।

ছুতার মিস্ত্রিই ইহাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৩৭। বাস্তু বিদ্যা॥ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য। বর্ত্তমানে যাহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য বলে। পুরাকালে ইহার অতিশয় উৎকর্ষতা ছিল। এখনও গৌড়ে, মহাস্থানে এবং পাটনা প্রভৃতি স্থানে অনেক ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন মন্দির তাহার সাক্ষী স্বরূপে আছে। এ সম্বন্ধে অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অদ্য সময় ক্ষেপণ করা নিষ্প্রয়োজন। বারান্তরে এ বিষয়ের সবিশেষ ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে।

৩৮। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা॥ সোনারূপা হীরকাদিরত্নের পরীক্ষা করা। এখন জহুরিরাই ইহার উপকারিতা জানে। বারান্তরে এবিষয়েরও বিশেষ ব্যাখা করিতে ইচ্ছা আছে।

৩৯। ধাতুবাদ॥ স্বুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুর সাঙ্কর্য্য পরিহার করণ ও তাহার প্রস্তুত করণ বিধি। ইহাদ্বারা পুরাকালে রসায়ন বিদ্যার কিরূপ উৎকর্ষতা ছিল তাহা বুঝা যায়।

৪০। মণিরাগ জ্ঞান॥ হীরক প্রভৃতি রত্নের বর্ণপরীক্ষা ও তাহাদের উজ্জ্বলতা সম্পাদন।

৪১। আকর জ্ঞান॥ পরীক্ষাদ্বারা কোথায় কোন বস্তুর খনি আছে তাহা জানা।

৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ॥ বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদগণের রোপণ, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি করণ, ও চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান।

৪৩। মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি॥ মেড়ার লড়াই, কুক্কুটের লড়াই, বটোরের লড়াই প্রভৃতি। বগুড়া সহরে এবং সেরপুরে পৌষ সংক্রান্তি দিনে এখনও বুলবুলের লড়াই হইয়া থাকে। অন্যত্র কোথাও আছে কি না জানি না। দণ্ড্যাচার্য্য প্রণীত দশকুমার চরিতে কুক্কুট যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

৪৪। শুকসারিকা প্রলাপ॥ পক্ষীদিগকে বুলি শিখান। এখন যাহারা পাখী পোষণ করে তাহারা স্বয়ং তাহাকে বুলি শিখাইয়া থাকে। এ জীবিকা আর কাহারও নাই।

৪৫। উৎসাদন কর্ম্ম॥ কৌশলে শত্রু-বাস উচ্ছেদ করা।

৪৬। কেশ মার্জ্জন কৌশল॥ চুলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার বিবিধ উপায়। পূর্ব্বে ধনীব্যক্তিগণ এই কার্য্যের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন।

৪৭। অক্ষয় মুষ্টিকা কথন॥ সাঙ্কেতিক লিপি বিজ্ঞান।

৪৮। ম্লেচ্ছিতক বিকল্প॥ ম্লেচ্ছ ভাষা ও ম্লেচ্ছশাস্ত্র জানা। এখনও ইহাদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আয়ের সম্ভাবনা আছে।

৪৯। দেশ ভাষাজ্ঞান॥ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত থাকা।

৫০। পুষ্পশকটিকানিমিত্তজ্ঞান॥ পুষ্পশকটিকা রচনা বিদ্যার মূল উপকরণ জ্ঞান।

৫১। যন্ত্র মাতৃকা। অনায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৫২। ধারণ মাতৃকা॥ পূজার জন্য, ধারণের জন্য দেবতাদের রেখাময় শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র রচনা করিতে জানা।

৫৩। সম্পাট্য কর্ম্ম॥ মণিমুক্তাদির কৃত্রিমতা নির্ণয় করা। এবং কৃত্রিমরত্ন প্রস্তুত করা।

৫৪। মানসী কাব্য ক্রিয়া॥ অন্যের মনোভাব ছন্দদ্বারা প্রকাশ করা। এরূপ কৌতুক এখন আর নাই।

৫৫। অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান॥ শব্দ-শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

৫৬। ক্রিয়া বিকল্প॥ একটী কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা।

৫৭। ছলিতক যোগ॥ পরপ্রতারণার কৌশল। ইহাও একপ্রকার বাজী বিশেষ।

৫৮। বস্ত্র গোপন॥ এক বস্ত্র লইয়া অন্য বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্র করিয়া দেখান। এই শিল্পটীর মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুরূহ।

৫৯। দ্যুত॥ নানাপ্রকার জুয়া খেলা। তাস, পাশা, দবা, খেলাকেও দ্যুত বলা যায়। অপ্রাণী বস্তু দ্বারা যে ক্রীড়া করা যায় তাহাকে দ্যুত বলে।

৬০। আকর্ষ ক্রীড়া॥

৬১। বাল ক্রীড়নক॥ বালকদিগের জন্য নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত করা।

৬২। বৈতালিকী বিদ্যা॥ পূর্ব্বে হিন্দু রাজগণের স্তুতিপাঠক ছিল। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজগণের স্তুতিপাঠ কিরূপে করিতে হয়, তাহার জ্ঞানকে বৈতালিকী বিদ্যা কহে।

৬৩। বৈজয়কী বিদ্যা॥ শত্রু বিজয় বিষয়ক জ্ঞান।

৬৪। বৈনায়কী বিদ্যা॥ ভূত প্রেতাদি দেবযোনি বিশেষকে নিবারণ করা। অর্থাৎ যাহাকে ওঝা বলে। এখনও অনেক দেশে ভূত ছাড়ান, কালী ছাড়ান ওঝা আছে। মেয়ে মহলে তাহাদের এখনও অনেক প্রতিপত্তি দেখা যায়।

পুরাকালে, ভারতের শিল্প বিদ্যা উদ্ভিদ্ বিদ্যাদি অত্যন্ত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। আর্য্য বংশীয়গণ সকলেই প্রায় কলাবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। ইহা আমাদের কাব্য পুরাণ ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। এইজন্য সে সময়, ভারতবর্ষ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। ঐ সমুদায় কলা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদিগকে কলাবিৎ বলা হইত। বর্ত্তমান সময়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ইহার একটী ক্ষীণ জ্যোতিঃ দেখিতে পাই। এখনও যাহারা পূর্ব্বোক্ত কলাগুলির অংশবিশেষ কেবলমাত্র সেতার বা তানপুরাদি যন্ত্র বাজাইতে এবং সেই যন্ত্রাদির যোগে গান করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কলাবিৎ বা কলাবৎ ইহার অপভ্রংশ "কালোয়াৎ" বলিয়া উহাতেই কলাজ্ঞানের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হই। ইহা আমাদের অদূরদর্শিতার ফল ভিন্ন আর কি বলিব। এখন দেখা যাউক, প্রাচীন কালে যন্ত্র বিজ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ পাঠে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, অদ্য সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা বাষ্পীয় শকট দেখিয়া, ইংরেজের কামান বন্দুক, গোলাগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশংসা

করি। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ অধ্যাত্ম দর্শনে, জগতে যে অধিক উন্নত ছিলেন ইহা এখনও অনেক স্বদেশী ও বৈদেশিক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন; কিন্তু বাহ্য জগতের, অর্থাৎ সংসারে বাস করিতে হইলে যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন তাহাতে, পুরাকালে ভারতবাসীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অর্থাৎ অণুবীক্ষণ, বাষ্পীয় শকট ও দিগ্‌দর্শনাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিশেষ বিষয়গুলির আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, ইহা বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। আমি বলি ইহা অভ্রান্ত সত্য নহে। প্রমাণ স্বরূপ বিগত উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে ঐতিহাসিক প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ হইতে গম্বুজের চূড়ার ভগ্নাংশে এনামেল করা কারুকার্য্য বিশেষ এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য সব্‌ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও কালেক্টার মহোদয় কর্ত্তৃক মহাস্থান হইতে আনীত এনামেলযুক্ত ক্ষুদ্র একটী মৃদ্‌ঘট ও বাটুল দুইটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা পুরাকালের রঞ্জন কার্য্যাভিজ্ঞতার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। আজ আমি আর্য্যগ্রন্থ শিল্প-সংহিতা হইতে সংগৃহীত বাষ্পীয় শকটাদি সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রমাণ দেখাইব। শিল্প সংহিতার অষ্টাদশাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বাষ্পঃযোগেতু বৈ যানং চকার বিধিনন্দনঃ।
অবিচ্ছেদ গতির্যস্য বায়ুবৎ কাম গামিনং।
নানোপকরণৈ র্যুক্তং ভাস্বন্তং পুষ্পকং বিদুঃ।"

অর্থাৎ—বিধিনন্দন বাষ্পযোগের বায়ু ন্যায় দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণ করিলেন, ইহা আকাশ পথে ইচ্ছামত যাইতে পারে। ইহা দীপ্তিশালী ও নানাবিধ উপকরণযুক্ত। পুরাকালে ইহাকেই পুষ্পক রথ বলিত। শাল্বরাজ দানবের নিকট হইতে প্রাপ্ত কামগামী বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিয়া, বৃষ্ণী বংশীয়গণের বৈরস্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ঐ যান জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও পর্ব্বত শৃঙ্গে, যে কোন স্থানে চালান যাইতে পারে। ইহাও শিল্প সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,

"স লব্ধা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদং।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতংস্মরন্‌॥
ক্বচিদ্‌ভূমৌ ক্বচিদ্‌ ব্যোম্নি গিরি শৃঙ্গে জলে ক্বচিৎ॥"

ইত্যাদি।

তবে এখন বিবেচনা করুন বর্ত্তমান সময়ের বাষ্পীয় শকট হইতে পুরাকালের পুষ্পক নামক বাষ্পীয় যানের উৎকর্ষতা ছিল কি না? এখন স্থলে রেলওয়ের গাড়ী, জলে ষ্টীমার, ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য অনেক। বর্ত্তমান সময়ে আকাশগমন জন্য যে ব্যোমযান বা বেলুন ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া অভিলষিত স্থানে অবতরণ করিতে হইলে প্যারাযুট্‌ নামক অপর একটী যন্ত্র বা যানের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন; কিন্তু তাহাতেও অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। অতএব পুরাকালের যানের সহিত এ কালের যানের অনেক পার্থক্য আছে। শিল্প সংহিতার অষ্টাদশাধ্যায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ কৌশল লিখিত হইয়াছে। * [illegible]

"মনোর্ব্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতং।
যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্টার্থে দূর দর্শনং।
পলালাগ্নি দগ্ধমৃদা কৃত্বাকা চ মনশ্বরং।
শোধয়িত্বাবৈ শিল্পীন্দ্র নৈর্ম্মল্যং ক্রিয়তেচ তৎ।
চকার জলবৎ স্বচ্ছং পাতনং সুপরিষ্কৃতং।
বংশ পর্ব্ব সমাকারং ধাতুদণ্ডং প্রকল্পিতং।
তৎপশ্চাদগ্রমধ্যেষু মুকুরঞ্চ বিবেশ সঃ॥"

মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দূরদৃষ্টির জন্য স্থায়ী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে পলালাগ্নি দগ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা অধ্বংসী কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিসংস্কারে পুনঃ পুনঃ শোধন করিলেন, এবং ঐ কাচকে নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ ও পাতন করিয়া বংশ পর্ব্বের ন্যায় এক সচ্ছিদ্র ধাতু নির্ম্মিত নলের মধ্যে ও উভয় প্রান্তে পূর্ব্বপ্রস্তুত মুকুর (কাচ) সন্নিবেশিত করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন।—ইহাদ্বারা পুরাকালে ভারতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, ইহা দৃঢ়তা সহকারে প্রমাণিত করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, সে কালেও গ্লোবদ্বারা ভূগোল শিখান হইত; ইহা সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামকগ্রন্থে দেখা যায়।

"অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বাতু দারবং।
যষ্ঠ্যাচ্ছন্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিতং॥
তোয়যন্ত্রং কপালাদ্যৈ ময়ুর নর বানরৈঃ।
সসূত্র রেণু গর্ব্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥
পারদা বাম্বু সূত্রাণি শুক্লতৈল জলানিচ।
বীজানি পাংশবস্তেষু প্রয়োগাস্তেঽপি দুর্লভাঃ।
যায়াদ্রুদণ্ড মুখোনিত্যময়স্কান্ত শলাকবৎ॥"

সময় নির্ণয় জন্য নানাবিধ ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হইত, এবং দিগ্‌দর্শনযন্ত্রেরও ব্যবহার ছিল, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণে জানা যায়। কাহারও মতে থার্ম্মোমেটার, ব্যারোমেটার প্রভৃতি যন্ত্রও পুরাকালে প্রচলিত ছিল। দিঙ্ নির্ণয় করিবার জন্য আর্য্যগণ দিগ্‌দর্শন যন্ত্র প্রথমে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা প্রিন্‌সেপ্‌স্ ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকুইটিস্ (Indian Antlquities) পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লিখিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে শতঘ্নীনামক অস্ত্রের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যদ্বারা এককালে শত জনকে হত করা যায়, তাহাকে শতঘ্নী বলে। গঙ্গার খাল কাটিবার সময় বিহাটনামক স্থানের নিকট ভূগর্ব্ভগত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় সেই স্থানে শতঘ্নীনামক একটী অস্ত্র পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওয়ান-বাগগ্রামে পুষ্করিণী খননের সময় ৩১৪ বৎসরের পুরাতন সাতটী কামান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমান নৃপতি ঈশাখাঁর সময়ে ১০০১ সালে ঐ সকল কামান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কামানগুলির দৈর্ঘ্য ৩৸০ ফিট্ হইতে ৫।০ ফিট পর্য্যন্ত, ব্যাস ১।০ ফিট হইতে ২ ফিট পর্য্যন্ত। সম্প্রতি শতঘ্নী, তোপ বা কামান নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নিপুরাণে গোলা, গুলি, বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। মহাত্মা প্রিন্‌সেপ্ সাহেব বলিয়াছেন, যে, বারুদ ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল। বারান্তরে এই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ পুরাণাদি হইতে সংগৃহীত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। অদ্য এই স্থানে এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ইতি

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।*

* রাজসাহী শাখা সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক

নাম-করণ রহস্য।

প্রিয় সুরেন্দ্র

মান করলি তো করলি
অব কাহে রোইলি ?

ছবি খানার নাম 'লক্ষণসেনের পলায়ন' দিয়া এখন দুঃখ করিবার কি কারণ ? ভাবিতেছ নামই যদি দিলাম তবে অন্য নাম দিলাম না কেন ?

আচ্ছা আমি কতকগুলি নাম দিতেছি তোমার মনে ধরে কি না—বিভীষণের লঙ্কাপুরি ত্যাগ, বিদুরের হস্তিনা ত্যাগ, রামনির্ব্বাসনের পূর্ব্বে দশরথ, দাদামহাশয়ের তীর্থ যাত্রা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জগৎসেঠের গৃহ হইতে মন্ত্রণা আঁটিয়া ফিরিতেছেন – কোনটাই তোমার মনে ধরিতেছে না কেন বল দেখি ?

মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার রূপ মাত্র থাকে নাম থাকে না, নামকরণ হয় ছয় মাস পরে। আর ছবিটা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামরূপটাও লইয়াজন্ম গ্রহণ করে। পিতামাতা ইচ্ছা করিলে কালো ছেলের 'কর্পূরচাঁদ' সাদা ছেলের 'কেষ্টধন' চিররুগ্নের 'প্রতাপ সিংহ' এবং বণ্ডা ও অবাধ্য ছেলের দীনবল্লভ নাম দিতে পারে। কিন্তু artistএর সে ক্ষমতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

স্বর গ্রামের রেখাবের পর্দ্দায় ঘা দিলে রেখাব স্বরই বাহির হইবে, সেটাকে গান্ধার বলিতে পারনা ; তেমনি মন তোমার লক্ষণসেনের পর্দ্দায় ঘা দিয়া লক্ষণসেনেরই সৃষ্টি করিয়াছে, কি করিয়া বলিবে সেটা রামসেন ?

এখন তুমি তোমার মনের দোষ দিবে। আমাদের Art Societyতে সমস্ত বাংলার ইতিহাস হইতে ছবি বাছিয়া লইবার সুবিধা দিয়াছিল কিন্তু কেন তোমার মন ঠিক ওইখানটায় গিয়া ঘা দিল যেখানটা বাংলার কলঙ্ক ও ঐতিহাসিক সত্য নয় ? পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের পতন, নন্দকুমারের ফাঁসী, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বড় বড় ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ছাড়িয়া কেন সে লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক-সাগরে মিলিতে গেল—যে কলঙ্ক রেখা আমরা ইতিহাস হইতে মুছিতে চাহিতেছি আমাদের জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিব বলিয়া ?

মন বেচারির বিচার পরে করিব। এই লক্ষণসেন যাঁহাকে লইয়া এত গোলযোগ কোন ঘটনায় তিনি আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন ? বাংলার এত রাজা বাদশা থাকিতে কেনইবা একমাত্র লক্ষণসেন আমাদের হৃদয় এমনি ভাবে অধিকার করিয়াছেন যে তাঁহার নামে কলঙ্ক স্পর্শমাত্রে আমাদের জাতীয়তা ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে বলিতে পার কি ? সত্য ইতিহাস লক্ষণসেনকে যে ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করে তাহাতে সেই সেনরাজার চরিত্রে আমরা এমন একটা কিছু পাইনা যাহাতে তাঁহাকে হৃদয়ের ধন বলিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারি। যেমন আর সকলে তিনিও তেমনি দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ব্রাহ্মণসেবা প্রজাপালন রাজ্যরক্ষা দান ধ্যান ও দেবালয় পুষ্করণী প্রতিষ্ঠা করিয়া

স্বর্গে গিয়াছেন, এই মাত্র। তাঁহার আগেও অনেক রাজা এবং পরেও অনেক রাজা হইয়া গিয়াছেন যাঁহারা রাজগুণে আমাদের নিকট লক্ষণসেন অপেক্ষা কিছু কম স্মরণীয় নহেন অথচ লক্ষ্মণসেনই আমাদের হৃদয়-অধিকার করিয়া থাকেন কেন? তবেই দেখিতেছ সে লক্ষণসেন-মূর্ত্তি আমরা হৃদয় মন্দিরে বসাইয়া রাখিয়াছি। তিনি বাংলার সত্য ইতিহাসের সত্য লক্ষণসেন নহেন কিন্তু আমাদেরই কল্পনাপ্রসূত গল্প কথায় গঠিত তিনি অন্য কেহ, যাঁহাকে বিজিত জাতির হৃদয় বেদনায় বিজেতার শ্লেষ উক্তি পূর্ণ চমৎকার গল্প কথায় সিঞ্চিত করিয়া আমাদের স্বাধীনতার শেষ দুঃখের মাঝে সুন্দর কল্পনা কুসুমের মত আমরাই ফুটাইয়া তুলিয়াছি। এখন বুঝিতেছ সোনাকে গিল্টী করা সহস্র বৎসরের শৈবালাচ্ছাদিত দেবমন্দিরে চূণকাম করা আর এই লক্ষণ-সেনের পলায়ন কাহিনী হইতে কালিমা ও মলা তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করা সমান।

এই তোলা চূণকাম ও গিল্টী ব্যাপারে সোনা আরও সোনা সুন্দর গল্প আরো ভাল গল্প অথবা সহস্র বৎসরের পুরাতন মন্দির সুশোভন হইয়া ওঠে না কিম্বা তাহাতে সেগুলার মূল্য বাড়ে না, উল্টিয়া বরং কালে কালে সেগুলার উপরে যে রংটুকু ধরিয়াছিল সে রং সহস্রবার গিল্টি শতবার চূণকাম এবং প্রাণ পণে মলা উঠাইলেও আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই, সেটুকু চলিয়া যায়; এই রংটুকুর কি বাহার তাহার কত মূল্য তাহা শিল্পি জানে কবি জানে আর জানেন যাঁহারা রসিক পুরুষ।

সাদা বাস্তব ঐতিহাসিকের চক্ষে শোভন হইতে পারে কিন্তু সুনিপুণ ভাবে কথিত মুসলমান ঐতিহাসিকের যে চমৎকার গল্পটি আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া আমাদের নিজের অক্ষমতার ক্ষত চিহ্নের মত বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার কি কোন মূল্য নাই বলিতে পার? আফিসের হিসাব পরিষ্কার দেখিতে সোজারাস্তা চিনিয়া লইতে টাকার তোড়া গণিয়া লইতে খাঁটি বাস্তবের মত প্রখর সূর্য্যালোক প্রয়োজন বটে কিন্তু বিশ্ব রহস্যের দিকে চাহিয়া দেখিবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য গল্পকথার মত ছায়ালোক ও ভ্রান্তিময় ঊষা সন্ধ্যা ও গভীর রজনীর প্রয়োজন।

বিষ পরিত্যাগ পরিহার ও দূরে নিক্ষেপ করা উচিৎ কিন্তু এটা কি দেখ নাই যে অনেক সময়ে বিষ ঔষধ রূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

শ্রীরাধিকার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছ তো? তাহার মধ্যে কত অসত্য কত শ্লেষ। সদাচারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সে কলঙ্ক কথা আমাদের পুরাণ সাহিত্য হইতে মুছিয়া ফেলা উচিৎ; অথচ "সেই কলঙ্ক যত গাওত ভাগবত", কেননা সেই কলঙ্ক কথার একটা সৌন্দর্য্যের দিক শ্রেষ্ঠদিক আছে বলিয়া। তুমি কি বলিতে চাও আমাদের এই পরাজয় কলঙ্কের আর একটা দিক নাই?

বঙ্গের বঙ্কিম সে দিকটা তো দেখাইয়া-ছেন সাহিত্যের করুণ চন্দ্রালোকে, আর তুমিও দেখাইয়াছ শিল্প ঊষার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়।

শিল্পি আর কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু

হইতে মধু, হীনতা হইতেও মিষ্টতা বাহির করা ; সেটাকে পরিবর্ত্তন করা নয়, বাস্তবের অনুরোধে পরিত্যাগ করাও নয়। এই জন্য অযথা পঙ্কে কলঙ্কিত জানিয়াও বঙ্কিম বাংলার ইতিহাসের ঠিক ওই খানটায় তাঁহার মৃণালিনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন আর তুমিও ঠিক ওইখানটায় তোমার তুলি ডুবাইয়াছ। পঙ্কে মূল না গাড়িয়া পদ্ম যদি চন্দন তরু হইতে রস গ্রহণের বন্দোবস্ত করিত তবে সুসঙ্গত শোভন হইলেও পদ্মের শ্রেষ্ঠতা এবং বিচিত্রতা অনেকটা চলিয়া যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন তোমার মনের গতির বিচার করা যাক। 'জলেই জল বাধে' একথাটা তোমার জানা আছে। শিল্পির বল কবিরই বল মন লইয়াই কারবার। দর্শকের বা পাঠকের মন আর নিজেদের মন—দুই দিকে দুই কূল, মাঝে সংস্কার শিক্ষা প্রভৃতির খর স্রোত দুই মনকে পৃথক রাখিয়াছে; এই খরস্রোতের উপরে বর্ণের ও ভাবের সেতু বাঁধিয়া দুই মনে সংযোগ স্থাপনেই শিল্পির ও কাব্যের সার্থকতা ; অতএব, তুমি শিল্পি, বাংলার ইতিহাস হইতে তোমাকে যখন ছবি বাছিয়া লইতে বলা হইল তখন স্বতঃই তোমার মন, বাংলার অধিকাংশ লোকের মনে ঐতিহাসিক সত্যই হউক বা অসত্যই হউক যে ঘটনাটা আশৈশব নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে সেই ঘটনাটাকেই বাছিয়া লইল মনে মনে সংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত জানিয়া। অতএব তোমার মনের দোষ দিই কেমন করিয়া ?

আমি দেখিতেছি তোমার মন সাহস পাইয়াছে, এবার হইতে পঙ্ক মধ্যেই বিচরণ করিতে চাহিবে ; কিন্তু তাহাকে সাবধান করিও, এইরূপ বিচরণ করিতে করিতে চোরা পঙ্কে পড়িলে তাহাকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইবে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন। ইহাতেও যদি তোমার মন সন্তুষ্ট না হয় তবে তোমার মনের আরও বলবৎ সাফাই আছে যে 'মহাজনো যেন গতঃ' সেই পন্থাই সে অনুসরণ করিয়াছে, বাংলার সাহিত্য-বীর বঙ্কিম সে পথ ধরিয়াছিলেন তোমারও মন সেই পথে নির্ভয়ে বিচরণ করুক এবং আশা করি তোমার পরে যাহারা আসিবে তাহারা এই পরিচয় কাহিনী তোমারি মত করিয়া চিত্রিত করিতে শিখুক।

যে কলঙ্ক ভাগবতে গায় আর যে কলঙ্ক সাহিত্যে ও শিল্পে স্থান পাইবার মত তাহা কলঙ্কই নয়।*

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' নামক চিত্রের প্রতিবাদস্বরূপ পলায়ন-কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার বিষয় আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গত পৌষমাসের "বঙ্গদর্শনে" 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র বাবু শিল্পকলার দিক দিয়া সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়া বঙ্গদর্শনে যে পত্র পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিলাম। বঃ সঃ

গ্রাম্য-সাহিত্য।

ভারতবর্ষীয় সমাজের অন্তঃস্থলে যে উদার ধর্ম্মভাব লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে তাহা সর্ব্ব কালে দেশের এক একজন সাধককে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এমনি করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র নানা সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাস ভারতবর্ষের মনের ইতিহাস। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতার উক্তি, ধর্ম্ম মত ও জীবন আলোচনা করিলে আমরা সমাজের মনের গতি অনুসরণ করিতে পারি। এক বাংলা দেশেই কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সাধক কবির পরিচয় দেওয়া যাইবে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মও কালে এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে—তাঁহার রচিত গান শত শত গায়কের মুখে বাংলার একাংশের পল্লী হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে। লালন ফকিরের নাম বাংলার শিক্ষিত সমাজে অজ্ঞাত হইলেও নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত এবং তাঁহার রচিত গান নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

লালন ফকিরের জীবনে ও আচার ব্যবহারে যে একটা উদার ধর্ম্ম-ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার গানে সেই ভাবটি এমন সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে—যে তাঁহার দুই একটা গান উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। তিনি মুসলমানের গোড়ামি এবং হিন্দুর গোড়ামি উভয়ই সমান ঘৃণা করিতেন—অথচ হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব গোসাঁই এবং মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির বলিয়া পূজা করিত। তিনি জাতি বিচার করিতেন না; এ বিষয়ে তাঁহার এমন কঠোর বিধি ছিল যে আমার অনেক চেষ্টাতেও তাঁহার শিষ্যদিগকে তিনি কি জাতি ছিলেন তাহা বলাইতে পারি নাই। জাতি সম্বন্ধে তাঁহার একটা গান উদ্ধৃত করিতেছি—

"সবলোক কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলাম না
এই নজরে।
কেউ মালায়, কেউ তছবি গলায়
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনি কিসে রে?
জগত বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব যথা তথা
লালন সে জেতের কাতা—
ঘুচিয়েছে সাধ্ বাজারে।"

লালন ফকির যদিও নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু এই অশিক্ষিত ফকিরের গানে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও কবি-সুলভ সরস হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না; 'মনের মানুষের'—জন্য তাঁহার যে এক গভীর আকাঙ্খা তাঁহার গীতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তাঁহার গভীর প্রেমের পরিচায়ক।

"খাঁচার ভিতর অচীন পাখী
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ি
দিতেম পাখীর পায়।
চির দিনে পুষলেম পাখী
বুঝলেম না তার ফাঁকি জুঁকি
দুধ কলা দিই খায় রে পাখী
তবু ভোলে না তায়।"

কত সাদা গ্রাম্য কথায় তিনি তাঁহার সাধনার ধনের জন্য মনের আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনা বাহুল্য না করিয়া আমরা লালন ফকিরের জীবনী সম্বন্ধে দু চারিটি কথা বলিব। তাঁহার কথা নিতান্তই দু চারিটি হইবে কেন না, সাধারণতঃ তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা লোকে জানে না।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমীদারী বিরাহিমপুর পরগণার অন্তর্গত ছেউড়িয়া গ্রামে কালীগঙ্গ নদীর ধারে লালন ফকিরের আখড়া ছিল। সে আখড়া এখনও আছে—তাঁহার শিষ্যদের ১০।২৫ জন এখন সেখানে থাকে। শুনা যায় চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় প্রায় দশ হাজার শিষ্য তাঁহার আছে। ছেউড়িয়ার আখড়ায় লালন ফকির সস্ত্রীক বাস করিতেন। গত ১২৯৮ সালে ১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার ১১৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর কুষ্টিয়ার "হিতকারী" নামক সংবাদ পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"ফকির লালনের ধর্ম্মজীবন বিলক্ষণ উন্নত ছিল। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখা পড়া জানিতেন না কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্ম সাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকীর নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত আচার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইহাঁকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। ইনি জাতিভেদ মানিতেন না; নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইহাঁকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইহাঁর শিষ্যগণ ইহাঁর উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্ব্বদা "সাঞ" এই কথা তাহাদের মুখে—শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নেমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদ বিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে ইহাঁর অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনের কথা ইহাঁর মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা

হউক তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎ সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হয় ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন, বস্তুতঃ তাহা নহে; ইনি সংসারী ছিলেন, সামান্য জোত জমা আছে; বাটী ঘরও মন্দ নহে। জিনিষ পত্রও মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মত, নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার রাখিয়া মরিয়া যান। ইহাঁর সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্ম্ম কন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগ জন্য ইনি একখানি চরম-পত্র (Will) করিয়াছেন। ইনি নিজে শেষ কালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইহাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটী "ভাণ্ডারা" (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫।৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইহাঁর জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয় ত তাঁহার নিষেধ ক্রমে না হয় অজ্ঞতা বশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহাঁর জ্ঞাতি। ইহাঁর কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থ গমন কালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পথে মুমূর্ষু অবস্থায় একটী মুসলমানের দয়ায় ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকীর হয়েন। ইহাঁর মুখে বসন্ত রোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইহাঁর পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন না। পীড়িত কালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ব্ববৎ সাধন করিতেন। মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন! ধর্ম্মের আলাপ পাইলে নব বলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইহাঁর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫ টার সময় শিষ্যগণকে বলেন "আমি চলিলাম।" ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সাম্প্রদায়িক মতানুসারে তাঁহার অন্তিম কার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নাম ও দরকার হয় নাই। হরি নাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটী ঘরের ভিতর তাহার সমাধি হইয়াছে; শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাঁহারই জন্য শিষ্য মণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মাণিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েক জন ভাল লোক আছেন।"

এক্ষণে লালন ফকিরের কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। লালনের গান সংগ্রহ করাও এক দুরূহ ব্যাপার। লোকমুখে যে গান শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অসম্পূর্ণ, সকলে সব গান জানে না। ছোড়িয়ার আখড়ায় লালন ফকিরের গানের যে খাতা আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম—তাহাতে এত বর্ণশুদ্ধা যে তাহা পাঠের অযোগ্য, যাহা হউক আমরা যে কয়টি গান উদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতে পাঠক এই প্রাচ্য সাধক-কবির কতকটা পরিচয় পাইবেন, আশা করি।

১

আমার মনের মানুষের সনে, মিলন হবে
কত দিনে॥
চাতক প্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছি কালশশী॥
হব বলে চরণ দাসী, তা হয় না কপালগুণে॥
মেঘের বিদ্যুত মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ,
কালারে হেরিলাম তেমন রূপ হেরিয়ে
স্বপনে॥
যখন রূপ স্মরণ হয়, থাকে না লোক লজ্জা
ভয়,
অধীন লালন বলে সদা এ প্রেম যে করে
সেই জানে॥

২

আমি কি দোষ দিব কারে রে, আপন মনের
দোষে পল্লেম ফেরে রে॥
সুবুদ্ধি সুস্বভাব গেল, কাজির স্বভাব মনের
হোল,
ত্যেজিয়ে অমৃত ফল মাকাল ফলে মন
মজিল রে॥
যে আশায় এ ভবে আসা, ভাঙ্গিল সে
আশার বাসা,
ঘটিল একি দুর্দ্দশা, ঠাকুর গড়িতে বানর
হোল রে॥
গুরুবস্তু চিনলিনে রে মন অসময়ে কি
করবি তখন,
বিনয় করে বলছে লালন যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায়
খেলে রে॥

৩

আমার মনচোরারে কোথা পাই।
কোথা যাই মন আজ কিসে বুঝাই॥
নিষ্কলঙ্কে ছিলাম ঘরে, কিবা রূপ নয়নে হেরে
মন ত আমার ধৈর্য্য নাই।
ও সে চাঁদ বটে কি গৌর দেখে, হলেম বেহুঁস
থেকে থেকে, আমার মনে পড়ে তাই॥
বিষম রোগে আমায় দংশিলে, বিষ উঠিল
বেঘ মূলে,
সে বিষ গাঁটরি করা, না যায় হরা, কি করিবে
এসে কবিরাজ গোঁসাই।
মন বুঝে ধন দিতে পারে, কে আছে এই
ভাব নগরে,
কার কাছে এই মন জুড়াই, যদি গুরু দয়াময়
এই অনল নিভায়, অধীন লালন বলে তার
কি বল উপায়॥

৪

কি এক অচিন পাখী পুষিলাম খাঁচায়।
না হ'ল জনম ভরে তার পরিচয়॥
পাখী রাম রহিম বুলি বলে, ধরে সে অনন্ত
লীলে,
বল তারে কে চিনিলে বলগো নিশ্চয়॥
আঁখির কোনায় পাখীর বাসা, দেখিতে নারি
সে তামাসা,

এ বড় আদলা দশা কে আর ঘুচায়॥
যারে সাতে সাতে লয়ে ফিরি, তারে যদি
চিনতে নারি,
লালন কয় অ-ধর ধরি কেমন ধন্ধায়॥

৫

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম ভোর মেলে না॥
খুঁজি তারে আসমান জমী, আমারে চিনিনে
আমি, এও বিষম ভুলে ভ্রমি,
আমি কোন জন সে কোন জনা
(কে তা কয়রে)?
রাম রহিম বোলছে সে জন, ক্ষিতি
জল কি বায়ু হুতাশন॥
শুধালে তার অন্বেষণ মূর্খ দেখে কেউ বলে না
হাতের কাছে হয় না খবর,
কি দেখতে যাই দিল্লী লাহোর,
সিরাজ সাই বোলছে লালন,
সদাই মনের ভ্রম যায় না॥

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

সরল কাশীরাম দাস।*

প্রাচীন যুগে যখন এত বিভিন্ন বিচিত্র নীতি-গ্রন্থাদি লেখার বা প্রকাশের বন্দোবস্ত ছিল না, তখন, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিই একমাত্র শিক্ষার অঙ্গ ছিল। তখনকার দিনে, কথকথায় মুখে মুখে মহাভারতাদির উপদেশাখ্যান প্রচারিত হইত। সে সকলের জন্য তখন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তখন প্রতি প্রধান পূজা বা বারোয়ারীর সময় কথকথা এবং চণ্ডীপাঠ হইত। এবং দেশ বিদেশস্থ জনসমূহ সেই সকল শুনিতে এবং তাহার রসাস্বাদন করিতে সাগ্রহে ভাঙিয়া পড়িত।—তা ছাড়া, সহজ কথায়, গল্পচ্ছলে, প্রতি গৃহস্থাশ্রমে গৃহাধিষ্ঠাত্রী জননীগণ কর্তৃক সে মূল নীতি বিবৃত হইত। তখনকার মহিলাসম্প্রদায় এক প্রকার নিরক্ষর ছিলেন স্বীকার করি,—কিন্তু তাঁহাদের সে সহজ শিক্ষা, সে মহানুভাবানুপ্রাণিত উদারচিত্ততা আজকালকার দিনে কতটুকু মেলে!—তাঁহাদের সে সকল শিক্ষার মূলে সেই মহাভারতাদি! সে শিক্ষা যেন তাঁহাদের যথার্থ 'অন্তরের ধন' এবং যথার্থ নির্ভর দণ্ড হইয়া দাঁড়াইত!

শিক্ষাদান হিসাবে, চরিত কথার একটা খুব সুবিধার দিক আছে।—নীরস উপদেশ সাধারণতঃ মানুষকে ততটা আকৃষ্ট করে না। বাস্তব জীবনে, বাস্তব আদর্শে যদি সেই উপদিষ্ট বিষয়কে সফল হইতে দেখিতে পাই, তবেই তাহা মনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যথার্থ সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। মহাভারত পুরাণাদিও তাই।—তাহাদের সাধারণ ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া কেমন একটি আদর্শের অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের বর্ণিত চিত্রগুলির মধ্যে যেমন একটি পরিপূর্ণ আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে! সাধারণ মানবসুলভ সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া

---

* সরল কাশীরামদাস—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, সিটীবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ৩৲।

তাহাদের পাত্রপাত্রীগণ কেমন একটা পরম তৃপ্তি এবং চরম সান্ত্বনার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছে! তাই মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণাদি আমাদের এত আদরের!— ইহাদেরই চরিত্রগণের আদর্শে একদিন ভারতের প্রতি হিন্দু নরনারী চরিত্র-গঠিত হইয়া উঠিয়াছে! ইহাদেরই শিক্ষা ভারতকে তাহার নিজস্ব বলিয়া একটা জিনিস দিয়াছে!

বারব্রতের মধ্য দিয়া সেই শিক্ষার সাধনাই পরিস্ফুট। স্নাতানুচর্চ্চিতচন্দনা, মুক্তকুন্তলা, ভারতের ভবিষ্যত-জননী আমাদের বালিকাকন্যাগণ শুদ্ধসংযতা হইয়া প্রত্যুষে উঠিয়া বারব্রতের সময় যে

'সীতার মত সতী হবো,'
'শিবের মত পতি পাবো'
'লক্ষ্মণের মত দেবর পাবো'
বা, 'স্বামীর চিতায় পুড়ে মরব'

প্রভৃতি আবৃত্তি করে—তাহা কি নিরর্থক? বালিকারা হয়ত তখন স্পষ্ট একটা কিছু বোঝে না, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতসারে একটা মহা দীক্ষা তাহাদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, এক উচ্চ আদর্শের মতে তাহাদের চরিত্রকে সেই শৈশব হইতে গঠিত করিয়া তুলিতে থাকে; শৈশবে যে বীজ রোপিত হয়, পরবর্ত্তী নানা শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল বাতাসে উপ্ত হইয়া কালে তাহা এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। সে পরিণতি প্রাচ্য আদর্শাবলম্বী—তাহা হিন্দুর নিজের সম্পত্তি।

রামায়ণ এবং মহাভারতের চরিত কথা বাস্তবিকই 'অমৃত সমান'; যে পুণ্যবান সেই ইহার রসাস্বাদন করিতে পারে। ইহাদের ছত্রে ছত্রে, কাহিনীতে কাহিনীতে কত না গভীর তত্ত্ব প্রস্ফুট রহিয়াছে! মূর্খ আমরা, তাই এ সকল ছাড়িয়া, আজ কোথায় আমেরিকা কোথায় ইতালি কোথায় ইংলণ্ড কোথায় জর্ম্মানীতে আদর্শের আখ্যানের জন্য লালায়িত হইয়া ধাই!—হায় রে অদৃষ্ট!—একেই বলে,—'ছাদে লক্ষ্মী, হলি লক্ষ্মীছাড়া।'

কিন্তু, সে প্রাচীন যুগে, বাংলার সে খাঁটী বাঙালীত্বের দিনে, ভীষ্মের সে মহত্ব, ভরত-লক্ষ্মণের সে ভ্রাতৃপ্রেম, হরিশ্চন্দ্রের সে সত্যপালন, রামের সে পিতৃভক্তি, কর্ণের সে ত্যাগ, অর্জ্জুনের সে দৃঢ়তা, আবার সীতা-গান্ধারী-শৈব্যার সে পতিভক্তি, দময়ন্তীর সে প্রেম নিষ্ঠা, উর্ম্মিলার সে নিঃস্বার্থপরতা, উমা সাবিত্রীর সে একাগ্রতা, সুকন্যার সে পতিব্রতা, শর্ম্মিষ্ঠার সে আত্ম-বিসর্জ্জন, কুন্তী দ্রৌপদীর সে তেজস্বিতা প্রভৃতি প্রত্যেকের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। ধর্ম্মের জয়, পাপের ক্ষয়, গর্ব্বের পতন, মানবে দেবত্ব, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের একত্ব—এ সকল কথা নিতান্ত সহজভাবেই প্রত্যেকে অনুভব করিত। এক কথায়, সে সকল প্রকৃত শিক্ষা তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিত। তাই সে প্রাচীন যুগের লোকের মনে তেজ ছিল, দেহে শক্তি ছিল;—তাই তখনকার লোকেরা গঠিত-চরিত্র স্থির-প্রতিজ্ঞ, সংযমী এবং যথার্থ সাধক হইতে পারিতেন।

তার পর নানা আঘাত সংঘাত নানা

বাধাবিপত্তি নানা প্রতিকূল ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া বাংলাকে—ভারতবর্ষকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাহার ফলে কত রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন কত আদর্শের ব্যত্যয় আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তবু প্রাচীনের সে মূল শিক্ষা ঠিক ছিল। তাহার পর, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-সম্মিলনের বিপ্লব-যুগে নূতন এবং পুরাতনে যখন ঘোর সংঘর্ষণ চলিতেছিল, প্রতীচ্য যখন তাহার নূতনত্বের সম্মোহন লইয়া এবং রাজশক্তি-পুষ্ঠ হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তথা-কথিত শিক্ষিত বঙ্গসম্প্রদায়ের মধ্যে সে এক দিন আসিয়াছিল! সে দিনের সে প্রতিকূল খর স্রোতে রামায়ণ মহাভারতাদি ভাসিয়া চলিয়াছিল; তখন সে সকলের আলোচনাও নব্যশিক্ষিতগণের কাছে ক্রমশ নিতান্ত "সেকেলে" এবং "বর্ব্বরতা" হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এবং "রাণী কৃষ্ণভাবিনী" "ভারতচন্দ্র" "রেণল্ডস্" এবং "জোলা"(Zola) প্রভৃতিই অধিকতর আদরণীয় হইয়া আমাদের চিরায়াস-গঠিত চরিত্রকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছিল!

সৌভাগ্যক্রমে দেশের চক্ষু আজ দেশের প্রতি ফিরিয়াছে। দেশীয় জিনিসমাত্রেই আজ আর পূর্ব্বের মত হেয় নয়—বরং মূল্যবান। আজ আমরা ভারতবাসী, আমাদের ভাণ্ডারে কোথায় কি রত্ন আছে কোথায় কিসের মাঝে আমাদের ভারতীয় খাঁটি আদর্শ টুকু প্রচ্ছন্ন আছে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছি। তাই আজ এ সকলের প্রতি লোকের ঝোঁক পড়িয়াছে। আজ Masterman Ready, Midshipman Easy, Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Don Quixote' প্রভৃতির স্থলে, অভিভাবকবর্গ এখন সন্তানদের হাতে ভারতের প্রাচীন কাহিনীমালা তুলিয়া দিতেছেন।—এই শুভ অবসরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবু যে এত আয়াস স্বীকার করিয়া এমন একটা মহাভারতের সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন এজন্য তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির ধন্যবাদার্হ। সকল আপত্তিকর-অংশ-বিবর্জ্জিত অযথাবিস্তৃতিদোষাদুষ্ট আড়ম্বরহীন অথচ ভাব-প্রচুর ললিত-মধুর এমন একখানি সংস্করণের বিশেষ অভাব ছিল। 'শাণোল্লিখিত মণির' ন্যায় যোগীন্দ্র বাবুর এ পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারকে উদ্ভাসিততর করিয়া তুলিবে। সাধারণ প্রচলিত কাশীরাম দাস নানা কারণে ছেলে মেয়েদের হাতে দেওয়া চলে না।—সেই অসুবিধা নিরাকরণের জন্যই সম্পাদক মহাশয় আপনার বিবেচনা মত অনেক অংশ সম্পূর্ণ-রূপে বর্জ্জন এবং স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার পরিবর্ত্তন ও নূতন ব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন। তাহাতে মহাভারতের মূল শিক্ষা-নীতি আরও যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাই যোগীন্দ্র বাবু এ গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন—সরল কাশীরাম দাস। তিনি ইতি পূর্ব্বে একখানি সরল কৃত্তিবাসও সম্পাদন করিয়া আমাদের প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

ইহাতে 'মহর্ষি বেদব্যাসের তপঃক্ষেত্র বদরিকাশ্রমস্থিত মন্দির' "দেবব্রতের রাজ্যত্যাগ" "ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়" "কৈলাস পর্ব্বত ও মানস-সরোবর" প্রভৃতি উপাখ্যাত ঘটনাবলি এবং স্থান সমূহের প্রায়

কুড়িখানি সুচিত্রিত রঙ্গীন হাফটোন ছবি আছে; তাহাতে গ্রন্থের উৎকর্ষতা আরও বাড়িয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে পৌরাণিক ভারতের একটি মানচিত্র আছে। দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ সমূহের অর্থের জন্য একটি পরিশিষ্ট দিয়া গ্রন্থকার পাঠকবর্গের খুব সুবিধা করিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি উপহারের জিনিস।—সমস্ত মূল কথা ঠিক রাখিয়া অথচ শিশুগণের উপযোগী করিয়া, কাশীরাম দাসের এরূপ কোন উৎকৃষ্ট সংস্করণ বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকের ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, বাঁধানও সুন্দর।

মোট কথা, এ সংস্করণখানি পাইয়া আমরা খুব প্রীত হইয়াছি। এখন আমাদের কামনা যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যোগীন্দ্র বাবু এ শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হউক, ভারতের ভবিষ্যৎ-আশারূপী আমাদের সন্তান সন্ততিগণের তরুণ হৃদয়ে প্রাচ্যের 'যথার্থ-নিজস্ব' মহত্বালোক প্রতিফলিত হইতে থাকুক;—এবং ভারতের মনে আবার সেই প্রাচীন আদর্শ এবং পূর্ব্ব গৌরব উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

নীলকণ্ঠ।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলকণ্ঠের প্রথম পত্নী, মন্মথকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। পীড়িতা প্রসূতি, সন্তান প্রসব করিয়াই খালাস, শিশুর আর সমস্ত ভার পড়িয়াছিল নীলকণ্ঠের গৃহিণীর উপর। মন্মথ শিক্ষামত শৈশব হইতেই তাঁকে "রাঙ্গা বউ" বলিত। বালক বোধ হয় তখন স্থির বুঝিয়াছিল "রাঙ্গা বউ'য়ের প্রকৃত স্বামীই সে-ই! কেন না সংসারের মধ্যে "রাঙ্গা বউ"য়ের উপর সে যেমন জোর জুলুম করিত, এমন আর কোথাও নহে, মার উপরও নহে। তার যত কিছু বায়না, যত কিছু আবদার, সবই সেই রাঙ্গা বউয়ের নিকট। পক্ষান্তরে, রাঙ্গা বউও সেই শিশু ভর্ত্তার বিরহ দণ্ডেক সহ্য করিতে পারিতেন না। সারা দিন মন্মথকে লইয়াই তাঁর কাটিত। মান, অভিমান, হাসি খেলা প্রভৃতি যত রকমের প্রণয় লীলা, এই শিশুর সহিতই হইত। মন্মথও সেই শিশু বয়সে প্রণয়ী-সুলভ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল;—রাঙ্গা বউ যে দিন রাঙ্গা পায়ে 'আলতা' পরিতেন সেদিন মন্মথ শতবার সে রাতুল চরণে

* গত মাঘ মাসে নীলকণ্ঠের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে বাহির হয়, বৎসরের প্রথম হইতেই উপন্যাস বাহির হওয়া অনেকের ইচ্ছা জানিয়া গত দুই মাস ইহা আর প্রকাশ করা হয় নাই। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম দুই পরিচ্ছেদ এ মাসে পরিশিষ্টরূপে পুনরায় ছাপান গেল। বঃ সঃ।

প্রণত হইত। কোন কারণে, রাঙ্গা বউ যে দিন রোষ প্রকাশে মুখ ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, শিশু সে দিন নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত; যদিও সে তখন জয়দেবের শ্লোক আওড়াইতে শিখে নাই তবু সে 'আঙ্গা বউ'এর কোলে উঠিয়া শত শত চুম্বনে সে অভিমান ভাঙাইয়া দিত; তখন নীলকণ্ঠ-গৃহিণী 'ভাব সম্মিলনে' মুগ্ধ হইয়া মন্মথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া সে কচিমুখে বার বার চুমা খাইতেন। প্রেমের এ প্রতিদান অনেক সময় নীলকণ্ঠের সমক্ষেই হইত; নীলকণ্ঠ হাসিতেন, আর, মন্মথকে আদর করিয়া বলিতেন, 'কি রে সম্বন্ধী,বুকে বসে দাড়ি উপড়াচ্ছিস নাকি?" গৃহিণীও হাসিয়া নথ নাড়িতে নাড়িতে কর্ত্তাকে "দেখচ কি, তোমার হাতে খোলা" ইত্যাদি মধুর কথা শুনাইয়া দিতেন। শিবতুল্য নীলকণ্ঠ সত্যই আর বড় আমল পাইতেন না। মন দুঃখে তিনি রামেশ্বর বাবুর নিকট নালিশ দায়ের করিতেন "বাপু তোমার ছেলের আক্কেলটা দেখ, সে এরই মধ্যে আমায় বেদখল করেছে।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠ গৃহিণীর সহিত মন্মথর এ স্বাধীন প্রণয় লীলার তরঙ্গ-ভঙ্গ আপাততঃ প্রশমিত হইয়াছিল সত্য তবু 'রাঙ্গা বউ'য়ের সহিত সে প্রীতিবন্ধন কখনও ঘুচে নাই। পিতৃ বিয়োগের পর, মন্মথ শোকাতুরা মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বৎসরাধিকাল সপরিবারে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া এত দিনে দেশে ফিরিয়াছেন, তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করার পরেই একদিন নীলকণ্ঠ তাহাকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সেই দিন পূর্ব্বের সে সকল কথা স্মরণ করিয়াই নীলকণ্ঠ মন্মথকে বলিয়াছিলেন, "আঙ্গা বউকে কি ভুলে গেলে?" আর আঙ্গা বউ-য়ের স্থানীয়া মনে করিয়াই ষোড়শীকে, "নাতির কাছে আবার লজ্জা" এই বলিয়া অপ্রতিভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শীবালার পড়া শুনায় বড় অনুরাগ; অবসর সময়ে সে সর্ব্বদাই প্রায় পড়া শুনার চর্চ্চা করিত, কবিতা রচনায় তার বড় ঝোঁক, রচনার শক্তিও যে একটু আধটু না ছিল তা নয়, কিন্তু পুঁজি বড় কম—বোধোদয়, পদ্য পাঠ, আর তার সুদ, কীর্ত্তিবাস আর কাশীদাস; তবে বঙ্কিম বাবুর এবং দীনবন্ধু বাবুর অবশ্য নিস্তার ছিল না, তাঁরা অন্তঃপুরে দ্বিতীয় ভাগেও ধরা পড়েন। নীলকণ্ঠ পত্নীর বিদ্যানুরাগ লক্ষ্য করিতেন, তাহাতে উৎসাহও দিতেন, কিন্তু লেখা পড়া শিখান তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিত না। আর ভারতচন্দ্র ছাড়া সাহিত্য টাহিত্যর ধার নীলকণ্ঠ শর্ম্মা কোন পুরুষে ধারিতেন না। খত, কবুলিয়ত, পাট্টা, কিস্তি-বন্দী, জামিনী নামা,উইল, প্রভৃতিতে বড় বড় উকীল মোক্তারও তাঁর মুশাবিদায় কলম ডালিতে পারেন না; কিন্তু কবিতা, প্রবন্ধ-রচনা—আরে বাপ্‌রে—! তা ছাড়া হ্রস্ব, দীর্ঘ ন কার স কার ইত্যাদির প্রয়োগের সারবত্তাও তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। লিখিতে বসিয়া কলমের

মুখে যেটা সহজে আগে আসে নীলকণ্ঠ তাহাই লিখিয়া যান, অনেক সময় তাঁর বর্ণ বিকৃতি দর্শনে বোধোদয়-পড়া ষোড়শীও মুখ বিকৃতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, 'ষোড়শী'ও তাঁর কলমে 'ষড়ষি' রূপে ফুটিয়া উঠিত।—তা হোক্ ষোড়শী মনের মত লেখা পড়া শিখিতে পারে এ ইচ্ছা নীলকণ্ঠের আন্তরিক ছিল; ষোড়শীর কোন সাধই তিনি অপূর্ণ রাখিতেন না। বারাণসী হইতে সাড়ি, বালুচর হইতে চেলি, শান্তিপুর হইতে ডুরে, ঢাকা হইতে অলঙ্কার, জয়পুর হইতে জড়োয়া, আনিয়া তিনি ষোড়শীকে উপহার দিতেন। ষোড়শী আপনার নবীন 'জীবনের' নূতন আশা, সরস যৌবনের উত্তপ্ত মত্ততা, বৃদ্ধের সেই অসার ভগ্ন জীবন-তুষারে বিলীন করিয়াছিল,—এ কি তারই বিনিময়? বৃদ্ধ এতটা বুঝিতেন কি না জানি না। কিন্তু ষোড়শীর একটিমাত্র সরস কথা, একটু মৃদু মধুর হাস্য তাঁহার জীবনখানিকে কৌমুদী-সম্পৃক্ত জীবনের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিত!

ষোড়শীর লেখা পড়ার সাধ এতদিন অপূর্ণ ছিল, নীলকণ্ঠ এবার সে সাধও পূর্ণ করিবার উপায় সম্মুখে পাইলেন। মন্মথ সুশিক্ষিত, বাংলা রচনায় তাঁহার নাম যশও ছিল, তাই নীলকণ্ঠ ষোড়শীর বিদ্যা শিক্ষার ভার মন্মথের উপর দিতে প্রস্তুত হইলেন। মন্মথের সহিত কথা কহিতে তাহার নিকট পড়িতে ষোড়শী প্রথমে খুবই আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু স্বামীর অনুজ্ঞায় ও অনুরোধে, এবং তাহার প্রবল জ্ঞান-পিপাসা মিটিবার ইহা একটা সুযোগ বুঝিয়া অবশেষে ইহাতে সে রাজি হইল।

মন্মথ ষোড়শীকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে বিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; দেখিলেন, ষোড়শীর কেবল জ্ঞান পিপাসা প্রবল নহে, তাহার মেধা শক্তিও অদ্ভুত! তিন চার মাসের ভিতরে ষোড়শী যাহা শিখিল, সাধারণে তাহা দুই বৎসরেও শিখিতে পারে কিনা সন্দেহ! নীলকণ্ঠ পত্নীর এরূপ দ্রুত উন্নতি দেখিয়া মনে মনে বড় খুসী হইতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জনে পত্নীকে একটু আধটু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। একদিন,হাসিতে হাসিতে বলিলেন—পাঠ ত শেষ কল্লে, এখন গুরু দক্ষিণা কি দিবে?' 'যাও, ছি, ওকি ও' বলিয়া নীলকণ্ঠের প্রতি ষোড়শী কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন—বাণাহত নীলকণ্ঠ তখন হাসিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন! আর একদিন, যখন ষোড়শী ও মন্মথ সাহিত্য চর্চ্চায় গাঢ় নিবিষ্ট তখন কি একটা প্রয়োজনে নীলকণ্ঠ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

"পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।"

মহা অপ্রতিভ হইয়া ষোড়শী ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইল; 'তা আর লজ্জা কি' বলিয়া নীলকণ্ঠ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন; এইরূপে হাসি তামাসার সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শী বাংলাটা বেশ মোটামুটী শিখিয়া লইল।

ষোড়শীর একটী রোগ ছিল, সেটী হিষ্টিরিয়া নহে, কিন্তু ততোধিক সংক্রামক। ভাল করিয়া বাংলা শিখিবার পূর্ব্বেই ষোড়শীর সে রোগ গোপনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেটা 'পাকা পাকিতে' দাঁড়াইয়াছে, ষোড়শী আপনাকে রাধাস্থানীয়া করিয়া

এখন প্রেম, বিরহ ইত্যাদি নানা বিষয়ের কবিতা রচনা করে ; সে কবিতায় মিলনের মদিরা, চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, যৌবনের মধু, বসন্তের সমীর. কদম্বের মূল, কোকিলের গান, যমুনার কলতান, নয়নের সলিল, প্রচুর পরিমাণে থাকিত! আর থাকিত তাহে—আয়ানের তাড়না, কুটিলার ভর্ৎসনা, প্রতিবাসীর গঞ্জনা, রাধার লাঞ্ছনা, আকুল পরাণ, আর বাঁশরীর আহ্বান! ষোড়শী একখানি খাতা বাঁধাইয়া যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সে কবিতা-গুলি তুলিয়া রাখিয়াছিল, পুস্তকের নাম-করণ করিয়াছিল "ব্যথা." কিন্তু সে কবিতা-গুলি ষোড়শী কাহাকেও দেখাইত না, সে "ব্যথা" নিভৃতে লুকাইয়া রাখিত। একদিন সন্ধ্যার পর ষোড়শী নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাগামী কল্পনা করিয়া 'রাধার নিবেদন' লিখিতেছিল, এমন সময় নীলকণ্ঠ শশব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন, ষোড়শীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বাবুদের পরগণায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, আমায় এখনই যাত্রা করিতে হইবে, সহসা এই কথা শুনিয়া ষোড়শীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল, "এখনই? কদিনের জন্য"--বলিয়া সে 'নিবেদন' রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নী। ক দিন কি কয় মাস কেমন করিয়া বলি বল?

ষো। তবে আমাকেও নিয়ে চল না?

—'না, পাগ্‌লি না' বলিয়া নীলকণ্ঠ ষোড়শীর চিবুক খানি ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

ষো। তবে আমি একলা কেমন ক'রে থাকব?

'একলা থাকতে যাবে কেন? ঝি চাকর রহিল, মন্মথকে ব'লে যাব সে সর্ব্বদা তোমার তত্ব লইবে।' তার পর "এখনই যেতে হবে" বলিয়া নীলকণ্ঠ যাইবার উদ্যোগে ব্রতী হইলেন; 'না খেয়েই—তাই কি হয়?' বলিয়া ষোড়শী বাধা দিল।

নী। খেয়ে যেতে হলে যে রাত্রের ট্রেণ ফেল হতে হবে!

ষো। তা হয় হবে! তা বলে না খেয়ে যাওয়া হবে না!

নীলকণ্ঠ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, গৃহিণী তখন তাড়াতাড়ি রন্ধনের উদ্যোগে গেলেন। নীলকণ্ঠ ভাবিতে লাগিলেন কি পুণ্য ফলেই কি ভাগ্য বলেই এই পত্নীরত্ন তাঁহার মিলিয়াছে! ষোড়শীর কি ভক্তি, কি ভালবাসা!

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ তখন দাস দাসী ও মন্মথের হাতে যুবতী পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া প্রভুর বিষয় রক্ষার্থে প্রবাস যাত্রা করিলেন। * * *

নীলকণ্ঠ ত পরগণায়, প্রবাসে গেলেন, ষোড়শীর চিন্তার আর ইয়ত্বা রহিল না; কে তাঁহার জল গরম করিয়া দিবে, পান ছেচিয়া দিবে, সময়ে কেই বা দুটী রাঁধিয়া দিবে, তাঁর সেবাশুশ্রূষাই বা কে করিবে, দিন রাত্রি ষোড়শীর এই ভাবনা।

নীলকণ্ঠ পরগণায় পৌঁছিয়াই যথা সময়ে গৃহিণীকে পত্র দিলেন—সে পত্রে ষোড়শীর বিরহ ছাড়া আর কোন বিষয়েই যে নীলকণ্ঠের কষ্ট নাই, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল! যাইবার সময় স্বহস্তে পত্র দিবার জন্য নীলকণ্ঠ ষোড়শীকে বার বার বলিয়া গিয়াছিলেন, পত্রেও সে অনুরোধ ছিল! ষোড়শী তাই স্বহস্তে "শ্রীচরণ কমলেষু" কাঁদিয়া স্বামীকে পত্র দিল, সে পত্রে সত্বরে ফিরিবার জন্যও অনুরোধ ছিল। পত্র প্রাপ্তে নীলকণ্ঠ হাতে স্বর্গ পাইলেন। ক্রমশ।

(পরিশিষ্ট)

নীল-কণ্ঠ।

(উপন্যাস)

(প্রথমাংশ).

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খাঁ বাবুদের প্রবীণ দেওয়ান নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অবগুণ্ঠনাবৃতা পরিবেশন-নিরতা, যুবতী গৃহিণী শ্রীমতী ষোড়শী বালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ রে, ছি', তুমি যে হাঁসালে, নাতির কাছে আবার লজ্জা!" ষোড়শী এই কথায় যেন আরও একটু সঙ্কুচিতা হইল, তাহার সেই মৃণাল-নিন্দিত চম্পক-গৌর-কর-ধৃত রজত-অন্নপাত্র-শোভিত পুষ্পিতা দেহ-লতাখানি একটু কাঁপিয়া উঠিল! বেচারী তখন ত্রস্তে আত্ম সম্বরণ করিয়া অন্ন পাত্র স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া, কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাঁহার প্রতি এক বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল! কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী মহাশয় তখন সম্মুখস্থিত সুশোভিত অন্ন ব্যঞ্জনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, কাজেই সে বাণে তাঁহাকে আহত করিতে পারিল না! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মন্মথ মুখ তুলিয়া, নীলকণ্ঠকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, ষোড়শীর সেই সম্মোহন-নয়ন-বিশিখ তাঁহারই নয়নে পড়িল! ষোড়শী অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া, মন্থরগমনে চলিয়া গেল। তপ্ত কাঞ্চন-নিভ সে সু-বর্ণ, সুচারু-বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পুরাকাল হইতে, ভুবন মোহিনী ষোড়শী অন্নপূর্ণারা বুঝি বৃদ্ধেরই অঙ্কগতা হইতে ভালবাসেন!

আহারাদি শেষ হওয়ার পর নীলকণ্ঠ মন্মথকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "যাও ভায়া তোমার নূতন ঠান্ দিদির কাছ হতে পান নিয়ে এস!" মন্মথ একটু ইতস্তত করিতেছিলেন, বৃদ্ধ আবার কৌতুক করিয়া বলিলেন, "তোমারও লজ্জা হলো না কি? রাঙ্গা-বউয়ের কথা কি ভুলে গেলে?"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের যেন কিছু ভাবান্তর হইল, কোন্ দিনের একটা পুরাতন সুখ-স্মৃতি যেন তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীকে সহসা আহত করিল! কিন্তু নীলকণ্ঠ নিমেষে আবার আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন, মন্মথকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি বলচি, তা আর ভয় কেন, যাও" বলিয়া একটু হাসিলেন। মন্মথ তখন অগত্যা তাঁহার মন্মথ-নিন্দিত, কুমার-সুলভ-সুকুমার সৌন্দর্য্য কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে গৃহমধ্যে যথায় সম্মুখে পানের বাটা রাখিয়া অবগুণ্ঠিতা ঠান্ দিদি দাঁড়াইয়া, সেইখানে গেলেন। মন্মথ ষোড়শীর সম্মুখে প্রণত হইলেন;—দূর হইতে নীলকণ্ঠ

পত্নীকে বলিলেন "নাতিকে আশীর্ব্বাদ করলেনা ?" ষোড়শী তখন হাসিমুখে পানের-ডিবাটী সরাইয়া দিল, ডিবা সরাইতে যাইয়া তাঁহার অবগুণ্ঠন একটু সরিয়া গেল! সেই সময় মন্মথ আর একবার সে রাহু-মুক্ত বদন-চন্দ্র দর্শন করিলেন, আর একবার তাঁহার যুগল আঁখি সলজ্জ আঁখির সহিত মিলিল।

ষোড়শীকে তখন কার্য্যান্তরে যাইতে দেখিয়া নীলকণ্ঠ গৃহিণীর প্রতি একটী বিদ্রূপের ক্ষুদ্র-বাণ প্রয়োগ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না! বৃদ্ধ সহজে রসের সাগর, আজ আবার সে সাগরে জোয়ার বহিয়াছে। তামাসাটী এই, "বলি নাতিকে ত পান দিলে, কিন্তু পুরাতনে অযতন কেন, আমার "ছেঁচা" কই ?"

"ছেঁচা বিজ্ঞান" বোধ হয় সকল পাঠক পাঠিকার জানা নাই! দন্তহীন নীলকণ্ঠ তাম্বুল চর্ব্বণে অশক্ত হইলেও তাম্বুল-রসে বঞ্চিত হইবার বাসনা রাখিতেন না! তাই তাঁহার জন্য পান সাজিয়া হামাল-দিস্তায় ছেঁচিয়া দিতে হয়। তারই নাম "ছেঁচা ;" তরুণী ভার্য্যা শ্রীমতী ষোড়শী স্বহস্তে প্রত্যহ বৃদ্ধকে "ছেঁচিয়া দেন," আর বৃদ্ধ দুটী বেলায় আহারান্তে নিমীলিতপ্রায় চক্ষে সুরভি-তাম্রকুটের ধূম সংযোগে এই তাম্বুল-রস গলাধঃকরণ করেন।

কিন্তু এইখানে একটু রসভঙ্গ করিতে হইতেছে, আগেকার গোটা কতক কথা এখন বলিবার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের খাঁ বাবুরা বড় জমীদার। নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘ চত্বারিংশবর্ষ এই সংসারের কার্য্যে সংসৃষ্ট, এবং ত্রিশ বৎসর "এক কলমে" অপ্রতিহত প্রভাবে "দেওয়ানী" করিয়া আসিতেছেন ; বলিতে কি তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে ও যত্নে এ ষ্টেটের এত উন্নতি! রায় রামেশ্বর খাঁ বাহাদুর যে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন তাও কেবল দেওয়ান নীলকণ্ঠের কার্য্য প্রণালীর গুণে ; প্রজার দুঃখ বিমোচনে, দুর্ভিক্ষ দমনে, সাধারণের হিত সাধনে, তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। এ সকল কীর্ত্তির প্রতি গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে, রামেশ্বর বাবু "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে অকপট চিত্তে বিশ্বাস করিতেন, পরের উপর এতটা নির্ভর একালের কেহ বড় করে না। পিতার আমলের কর্ম্মচারী বলিয়া রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে খুড়া সম্বোধন করিতেন, কেবল সম্বোধন নহে, পিতৃব্য জ্ঞানে যথোচিত সম্মানও করিতেন, তাঁহার নিজের যে খরচের প্রয়োজন হইত, তাহাও তিনি বালকের ন্যায় দেওয়ান খুড়ার নিকট চাহিতেন, ভ্রমেও কখন তাঁহার প্রতি হুকুম জারী করিতেন না। নিজে কেবল সঙ্গীতচর্চ্চায় ও দেশ ভ্রমণে দিন কাটাইতেন।

এতটা বিশ্বাসের এতটা নির্ভরতার কারণও যথেষ্ট ছিল ; নীলকণ্ঠের সততা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, ধর্ম্মে একাগ্রতা, দেশ-

প্রসিদ্ধ! পরমশত্রুতেও তাঁহার এ গুণ-গ্রামের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিত না।

এইরূপে নীলকণ্ঠের দিন বেশ সুখে শান্তিতে কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁহার সুশীলা পত্নী তাঁহাকে অকূল সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া, ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন; নীলকণ্ঠের গৃহ অন্ধকার হইল।—বৃদ্ধ বয়সে পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা বড় অসহনীয়! বৈষ্ণব কবি প্রণয়িনীকে—

> শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা'
> বরিসার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।'

বলিয়া আদর করিয়াছেন, এ স্তুতি সকলের পক্ষে সর্ব্বথা সত্য কি না জানি না। কিন্তু বৃদ্ধের পক্ষে ইহা নিগূঢ় সত্য! বৃদ্ধ বয়সে এই "না" হারাইয়া নীলকণ্ঠ সংসার-দরিয়ায় "হাবুডুবু" খাইতে লাগিলেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণীং গৃহমুচ্যতে," তবে আর এখন কিসের গৃহধর্ম্ম? অপত্যহীন নীলকণ্ঠ তখন স্থির করিলেন শাস্ত্রের বচনই মানিতে হইবে, "পঞ্চাশোৰ্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।" ক্রমে নীলকণ্ঠের এ সংকল্প রায় বাহাদুরের কর্ণেও উঠিল! রায় বাহাদুর তখন দেওয়ান খুড়ার শূন্য-গৃহ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। প্রথমতঃ খুড়া মহাশয় কিছুতেই একার্য্যে সম্মত হন নাই। "এ বয়সে আর কেন?" কিন্তু শেষে অনেক যুক্তিতর্কে অনুরোধে উপরোধে খুড়া আবার নূতন দার-পরিগ্রহ করিয়া রুদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন। নীলকণ্ঠ ধনে মানে জ্ঞানে কুলে শীলে কিসে কম? কেবল "কিঞ্চিদ্বয়ে দোষ," কিন্তু একে পুরুষ, তায় কুলীন, সে দোষ'ত ধর্ত্তব্যই নহে; নীলকণ্ঠ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটী আপত্তি করিয়াছিলেন, "এ বিবাহে কোনরূপ ধুমধাম করা হইবে না। গোপনে গোপনে কোন প্রকারে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।" "বিলক্ষণ, তা হলে খুড়ার শাশুড়ীর মন ভুলিবে কেন" বলিয়া রায় বাহাদুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; স্বয়ং বর কর্ত্তা হইয়া রায় বাহাদুর মহা আড়ম্বরে দেওয়ান খুড়ার বিবাহ দিয়া আনিলেন। বিবাহ-সভায় বৈবাহিকের পরিহার বস্ত্র কে লইবে প্রশ্ন উঠিলে, রায় মহাশয়—'এই যে আমি, বরের বাবা উপস্থিত' বলিয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন--সভামঞ্চ উচ্চ-হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর সে বৎসর পরগণায় গিয়া যত টাকা নজর পাইয়াছিলেন, সে সমস্তই এ বিবাহে ব্যয় করিলেন। এ বিবাহে বিবিধ বিধানে এতটা সমারোহ হইয়া গেল যে, নীলকণ্ঠের প্রথমটীতে এবং তাঁহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের তিপ্পানটী বিবাহতেও ইহার এক আনা রকমের ব্যয় হয় নাই।

বিবাহে এতটা খরচ পত্র করায় নীলকণ্ঠ বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে কত দিন রায় বাহাদুরকে কত রকমে অনুযোগ করিতেন, নিজেকেও গালি দিতে ছাড়িতেন না। একদিন নীলকণ্ঠ রায় বাহাদুরকে বলিতেছিলেন—বাবাজী, লোকে আজ কাল তোমাকে অমুক রাজার বাপের সহিত তুলনা দেয়!'

রায় বা—কেন বাপু!

খুড়া—তা বুঝি জান না, সেই রাজা

বিড়ালের বিবাহে ষাট্‌ হাজার খরচ করে ছিলেন।

রায়—তাতে তার বাপের সঙ্গে আমার তুলনা কেন?

খুড়া—শুনই ত, একদিন ঐ রাজা তাঁর শ্যালিকার নিকট এই বিড়ালের বিবাহের ধুম ধামের কথা তুলিয়া বড় বড়াই করিতে-ছিলেন, তাহাতে তাঁহার শ্যালিকা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, -এ আবার ভারি কথা আমার দিদির শ্বশুর মহাশয় এক বাঁদরের বিয়েতেই এক লাক টাকা খরচ করিয়াছিলেন,'—রাজা প্রথমে রহস্যটা তলাইয়া বুঝেন নাই, মিছে কথা বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্যালিকারত্নের অধরে বিদ্রূপের চাপা হাসি দেখিয়া শেষে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া উঠিয়া শ্যালিকার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন।——রাজার শ্যালিকার এই পরিহাসের মূল কথাটা অনেকেই জানেন না কিন্তু অমুক রাজার বাপ বাঁদরের বিয়েতে যে এক লাখ টাকা খরচ করে ছিলেন এ কথাটা একটা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়াইয়াছে! এইজন্যই তোমার খুড়োর বিয়ের কথায় তোমাকে সেই রাজার বাপের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছে!"

রায় বাহাদুর "খুড়ো কি বলে বাপু," বলিয়া কথাটা চাপা দিতেন।

এইরূপ প্রায়ই চলিত।

কিন্তু রায় বাহাদুরের এত টাকা বৃথায় ব্যয় হয় নাই, আর নব বধুর পিতা মাতাও কন্যার "ষোড়শী" নাম করণ বৃথায় করেন নাই; কুলীনের ঘরে "ষোড়শী" পাওয়া কঠিন নহে সত্য, কিন্তু তেমন সুন্দরী "ষোড়শী" লাখে এক।

নীলকণ্ঠ তখন আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিলেন; সে গৃহ-অরণ্য আবার উদ্যানে পরিণত হইল! বৃদ্ধ তখন পুনশ্চ যুবার উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, রায় বাহাদুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, এখন তিনি আবার নিশ্চিন্ত মনে দেশ ভ্রমণে ও সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন, কিন্তু বড় অধিক দিনের জন্য নহে, দেশ-ভ্রমণপ্রিয় রায় বাহাদুরের সহসা সেই মহা দেশ হইতে ডাক আসিল। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি মহা প্রস্থান করিলেন, অন্তিম সময়ে গঙ্গাতীরে একবিংশবর্ষীয় পুত্র মন্মথকে নীলকণ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিয়া রায় বাহাদুর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন 'খুড়ো, আমি ত চলিলাম, মন্মথ রহিল ইহাকে জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিও না।" নীলকণ্ঠ তখন শোকে বড় কাতর, প্রথমে সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু রায় বাহাদুর বার বার পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিলেন,—শেষে সেই গঙ্গাতীরে নীলকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজীবন তিনি মন্মথকে ত্যাগ করিবেন না!—তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্মথকে খুড়ার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, রামেশ্বর এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বর-পণ ও বিবাহ।

(সামাজিক প্রসঙ্গ)

বঙ্গদেশে অনেকে বর-পণগ্রহণ নিন্দা করিতেছেন। যাহাতে সমাজ হইতে এই প্রথা উঠিয়া যায়, সে বিষয়ে কেহ কেহ চেষ্টাও করিতেছেন।

কিন্তু উঠিবার কথা দূরে থাক্, প্রথাটা ক্রমশ ব্যাপক হইতেছে, এবং পূর্ব্বে যে সমাজে ছিল না, এখন সে সমাজে অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে। ইংরেজী শিক্ষার সংগে সংগে যেমন জামা জোড়ার চলন বাড়িতেছে, ইংরেজী শিক্ষিত বরের দামও তেমনই বিশেষ ভাবে চড়িতেছে। এখন কন্যা-দায় একটা মস্ত দায় হইয়া উঠিয়াছে।

দায়টা যদি মস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার প্রতিকারও নিশ্চয় মস্ত হইবে। সামান্য ব্যাধিতে ঔষধ সেবন আবশ্যক হয় না, কঠিন রোগে কঠিন চিকিৎসা ব্যতীত সামান্য টোটকা টুটকি ফলদায়ক হয় না।

লোকে বর পণ গ্রহণ কু-প্রথা বলে; বলে, পণ দিতে কন্যার পিতার কষ্ট হয়, কোন কোন স্থলে কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

কিন্তু কাজি কালিকার বিলাসিতার এবং মহার্ঘের দিনে এই হেতুবাদ তত কাজের হইতেছে না। তোমার ক্লেশ হইবে বলিয়া আমি অর্থ লইব না, অর্থাৎ তোমার উপকার করা আমার কর্ত্তব্য হইলে আমাকে প্রায় উপোসে থাকিতে হইবে। এমন কে আছে নিজের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল পরের স্বার্থ দেখিতে থাকিবে? আর, স্বার্থপর না হইলে সমাজই বা চলিবে কিসে?

বস্তুতঃ স্বার্থপরতার দোষ যতই দিই না কেন, উহাই সৃষ্টি-স্থিতির মূল। দুই দশ জনের উদারতা কিংবা ত্যাগ স্বীকার দ্বারা সামাজিক প্রথার উচ্ছেদ চেষ্টা সফল হইতে পারে না।

কেহ বলেন, আমি কন্যাদায় গ্রস্ত; দায় হইতে মুক্ত করিয়া আমার জাতি কুল রক্ষা করুন। বরের পিতাও বলেন, দায় তোমার এবং তোমার মত দায় অনেকের আছে, অন্যকে দায় মুক্ত না করিয়া তোমাকেই কেন করিব?

ঠিক কথা। পরস্পরের সাহায্যে সমাজ চলে। এক আধ জনের ত্যাগ স্বীকারে চলে না।

বরপণ-গ্রহণের একটা নূতন যুক্তিও শোনা যাইতেছে। সেটা এই যে, পুত্রের লেখাপড়ায় তাহাকে মানুষ করায় বহু

অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু কন্যাকে মানুষ করিতে কিছুই লাগে না। পুত্র ও কন্যা একই পদার্থ, উভয়কে সমান চক্ষে দেখা উচিত। অতএব পুত্র হইলে যে অর্থ ব্যয় করিতে, কন্যাতে সেই অর্থ ব্যয় কর। বরপণ আর কিছু নয়, কন্যার কৃপণ পিতাকে ধর্ম্মশিক্ষা দান!

এই যুক্তি শুনিতে বেশ, কারণ সাম্য-নীতির দোহাই। কিন্তু কেবল এক পক্ষের সাম্যনীতি প্রচারে ফল হয় না। পুত্র থাকে পিতার, কন্যা হয় অন্যের। পিতার ভরসা কন্যা নহে, পুত্র। পুত্র সংসারের স্তম্ভ, কন্যা অলংকার। শাস্ত্রেও বলে পুত্ররূপে পিতা জন্মগ্রহণ করেন, কন্যারূপে করেন না। কারণ কন্যা বধূরূপে অন্যের হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, পুত্রও বধূ আনে, তাহার সুখ সচ্ছন্দতা দেখে, ভরণপোষণের ভার লয়। ফলে, পুত্রের ঘাড়ে অন্যের কন্যারও বোঝা চাপানা হইয়া থাকে। সুতরাং পুত্রের নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয়, তাহার ফলভাগী কেবল পুত্র নহে, অপরের কন্যাও হয়।

লাভের পথ থাকিলে যুক্তির অভাব হয় না। এমন কে আছে যে যুক্তির অভাবে অর্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছে? পথের দস্যু যখন হতভাগ্য পথিকের মস্তকে দীর্ঘ যষ্টি প্রহার করে, তখন সে কি বিনা যুক্তিতে পথিকের প্রাণ হরণ করে? বস্তুতঃ যাঁহারা যুক্তি জালে বরকর্ত্তাকে বাঁধিয়া বর-পণ রহিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মানব প্রকৃতি অবগত নহেন, কিংবা সে প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়া কর্ম্ম সিদ্ধির দুরাকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হন।

কারণ বর-পণের অর্থ, বর বিক্রেয় বস্তু। বরের পিতা বিক্রেতা, কন্যার পিতা ক্রেতা। পণ অর্থে মূল্যও আছে। বর-পণ বরের মূল্য। বরের হাটে বিক্রেয় বর একটি আছে। ক্রেতা বহু। তখন বরের মূল্য না বাড়িয়া পারে কি? সেকাল হইলে হয় ত ক্রেতার মধ্যে কাড়া-কাড়ি মারা-মারি হইত। একালে টাকায় সে রক্তা-রক্তি নিবারণ করিয়া সমাজে শান্তি আনিয়াছে।

পূর্ব্বকালে এক বরের বহু পত্নী থাকিতে পারিত। ক্রেতার মধ্যে কাড়া-কাড়ির প্রয়োজন হইত না। এখন সেদিন গিয়াছে। যত কন্যা তত বর চাই। কাজেই কন্যার বিবাহ দেওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ের যে স্বাভাবিক নিয়ম তাহা যুক্তি-তর্কে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের মহাজন লাভের পথ দেখে, অন্ন বিনা লোকে মরিতেছে কি না, তাহা মনেও ভাবে না। পুত্রের বিবাহে যদি চাইলেই টাকা আসে, এমন মূর্খ কে যে টাকা পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে? নিজের বেহাইকে কেমন ঠকাইয়া বেশী টাকা আদায় করিয়াছেন, —একথা বলিতে সে দিন কোন ভদ্রলোক কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিলেন না।

বাস্তবিক যদি আইন হয় যে, বরের বাপ বরের দাম লইতে পারিবে না, দাম চাহিলে রাজদ্বারে দণ্ড পাইবে, তাহা হইলেও ক্রয় বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম উলটাইবে না। তখন সেআনার দল বাড়িবে। সেআনার দল এখনও আছে।

ইহারা বরের দাম কষাকষি না করিয়া কন্যার ধনবান্ পিতার ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। যেখানে প্রাপ্তির আশা বিলক্ষণ না থাকে, সেদিক মাড়ায়ও না। আইন হইলে, ক্রয় বিক্রয় নাম ঘুচিবে কিন্তু কাজ চলিতে থাকিবে।

হিন্দু সমাজের বিবাহপ্রথার মূল উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা। কোন্ কন্যার কি বর আবশ্যক, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বিচার করিয়া গিয়াছেন। পুরুষ ও নারী পরীক্ষার উদ্দেশ্যও তাই ছিল। বিবাহে জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজনও এই কারণে হইয়াছিল। এই গণনা দ্বারা কেবল ভবিষ্যৎ নহে, বর কন্যার অতীত অবস্থা জানিয়া পরবর্তী দাম্পত্য দশার অনুমান চেষ্টা হইত। ঘটক অজ্ঞাতকুলশীল বরের বংশের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিত। বিবাহে যে অশেষ বিষয়ে সাবধান হইতে হয়, তাহা আমাদের সমাজ যত উপলব্ধি করিয়াছিল, বোধ হয় অন্য কোন সমাজ তত করে নাই। এই কারণেই কুলীনের কুলমর্য্যাদা, এবং কন্যাকে যৌতুক দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কিন্তু হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীতে একই বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। কালে কালে উহার পরিবর্ত্তনও হইয়াছিল। ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গন্ধর্ব রাক্ষস পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহের নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই আটের মধ্যে প্রথম চারিতে কন্যাদান, আসুর বিবাহে কন্যা ক্রয় হইত; গান্ধর্বে দানাদান ক্রয় বিক্রয় ছিল না; রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ হইত। সমাজের কোন্ শ্রেণীতে কি প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাও এই সকল নাম হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। ব্রহ্মবাদীকে প্রসন্ন করিয়া যথা শকতি অলংকার সহ কন্যাদান ব্রাহ্ম ধর্ম্ম; যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান দৈবধর্ম্ম; গো-বিনিময়ে ঋষিকে কন্যাদান আর্ষধর্ম্ম; স্বামীর সহিত ধর্ম্মচারিণী করিবার নিমিত্ত সালংকৃতা কন্যাদান প্রাজাপত্য; কন্যার পিতা ও জ্ঞাতিজনকে অর্থ দিয়া কন্যাগ্রহণ আসুর; কন্যা ও বরের ইচ্ছাক্রমে বিবাহ গান্ধর্ব; কন্যাপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ রাক্ষস; সুপ্ত মত্ত কন্যা ছলে হরণ পৈশাচ। পৈশাচবিবাহ সকলের অধম বিবেচিত হইত। রুক্মিণী হরণে রাক্ষস বিবাহের দৃষ্টান্ত পাই। গন্ধর্ব বিবাহও দূষ্য ছিল না। দূষ্য হইলে ঋষি ও ঋষিকন্যা শকুন্তলার বিবাহ অনুমোদন করিতেন না। স্বয়ংবর বিবাহ গন্ধর্ব বিবাহের অন্তর্গত মনে করিতে হইবে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে প্রাজাপত্য বিবাহ নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং এই বিবাহ বর্ত্তমান সমাজে চলিতেছে। *

* বোধ হয় এই কারণে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কথাটা ভাষায় চলিত হইয়াছে। প্রজার সৃষ্টি করেন বলিয়া ব্রহ্মার নাম প্রজাপতি। কিন্তু একা ব্রহ্মা প্রজাপতি ছিলেন না। যাহা হউক, আধুনিক বিবাহ নিমন্ত্রণ পত্রের মাথায় চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি শোভা পাইবার বরং কিছু হেতু আছে, উড্ডীয়মান পতংগকুলের চিত্রে অজ্ঞানতার প্রসার ব্যক্ত হয়। প্রাজাপত্য নামের কারণ প্রজা বা সন্ততি বোধ হয়; কিন্তু বহু সন্তানবন্ত কি না সন্দেহ।

প্রাজাপত্য বিবাহ চলিতেছে বটে, কিন্তু বিবাহের অংগ প্রত্যংগে আদি মানব সমাজের রাক্ষস বিবাহের লক্ষণও বর্ত্তমান আছে। বর পক্ষ দল বলে কন্যার গৃহে উপস্থিত হয়। মাংগল্যকর্মে বাদ্যভাণ্ড বুঝিতে পারি; কিন্তু বরযাত্রীর সংগে লাঠীখেলআড় কেন থাকে, কেনই বা বর ও কন্যা পক্ষের মধ্যে কলহ বিবাদ এমন কি মারামারি পর্যন্ত হয়? সবাই জানে কন্যাকর্ত্তা কন্যাদান করিবেন; অথচ বীরত্ব ও বৈরিতা প্রকাশ ব্যতীত বিবাহ হয় না। বিবাহের এক নাম পাণি-গ্রহণ, পাণি-পীড়ন। কন্যার হাত ধরিয়া বর কি তাহাকে বলপূর্ব্বক বহিয়া লইয়া যায় না? বিবাহ, উদ-বাহ শব্দেও বলপূর্ব্বক অপহরণের আভাস পাই। বরের সঙ্গে জাঁতি থাকে; কোন কোন সমাজে তরবারি থাকে। বর কি যুদ্ধ করিতে যায়? বিবাহের পরে গাঁট-ছড়া বাঁধা, পাছে কন্যা পলায়ন করে। ইহাতেও বরের মন নিশ্চিন্ত হয় না; কন্যার হাত দোড়ী দিয়া বাঁধিয়া ফেলে (সুতাবাঁধা)। দোড়ী অধিক দিন থাকে না। এই হেতু বিবাহিতা কন্যা দোড়ীর অনুকরণে হাতে কড় (সংকটক) পরে, এবং লোহার বালা রাখিয়া নিজের দাসীত্ব লোকসমাজে ঘোষণা করে। আধুনিক নব্যা নারী লোহার উপরে সোণা চড়াইয়া মনে করেন, তিনি শৃংখলাবদ্ধা দাসী নহেন; কিন্তু ভুলিয়া যান, হাতের লোহাই তাঁহার আয়তির লক্ষণ, এবং শৃংখল সোনার কিংবা শাঁখার হইলেও শৃংখল মাত্র।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্য বরকন্যার ফুল-শয্যা, বাসরঘরে বরের সহিত রমণীগণের পরিহাস। কন্যার বাসর সজ্জা এবং বর-কন্যার কুসুম শয্যা হইতে বুঝিতেছি গৌরী-দান ব্যবস্থা প্রাচীন সমাজে ছিল না, কিংবা থাকিলেও তাহা নামে মাত্র ছিল, প্রকৃত বিবাহ (পুনর্বিবাহ) অধিক বয়সে হইত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র হিন্দুসমাজে শিশু-বিবাহ আছে, কিন্তু অনেক সমাজে অধিক বয়সে কন্যার দ্বিরাগমন হয়। অষ্ট বর্ষের কন্যার নাম গৌরী। এমন শিশুকন্যার বাসরসজ্জা এবং সে কন্যার নিমিত্ত কুসুমশয্যারচনা লজ্জাকর। এই দুই প্রমাণ দ্বারা বুঝিতেছি হিন্দুসমাজে যুবক যুবতীর বিবাহই বিবাহ। বেদের সময়ে শিশুবিবাহ ছিল না, সে সময়ের বহুকাল পরেও ছিল না।

লোকগণনায় দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে ১৪ বৎসরের কম বয়সের ১৪ জন বালিকার মধ্যে ১জন অবিবাহিতা। কিন্তু কন্যার অপেক্ষা বরের বয়স অধিক থাকে। ফলে, ৫জন নারীর মধ্যে একজন বিধবা। যখন কন্যার একবার বিবাহই দুর্ঘট, তখন বিধবা বালিকার বিবাহ কে জিজ্ঞাসা করে?

অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার শক্তিতে সমাজের জীবনী শক্তি বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকে শ্রদ্ধাভক্তি অবশ্য করিব, কিন্তু বর্ত্তমানের প্রতি তাকাইয়া কাজ করিব। এই কারণে গৌরীদানের ফল ছাড়িতে হইয়াছে, শিশু বরকন্যার বিবাহ হাস্যজনক হইয়াছে, মূর্খ কুলীনের সমাদর কমিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ কএকটি পরিবর্ত্তন

যথেষ্ট নহে। সমাজ জ্ঞান বুদ্ধির সংগে সংগে অন্য পরিবর্ত্তন আসিবে। তখন প্রাচীন শাস্ত্র হইতে পরিবর্ত্তনের প্রমাণও বাহির হইবে।

পুত্রের নিমিত্ত বিবাহ। বিবাহের ব্যভিচার আছে, কিন্তু প্রকৃতি বলিতেছে পুত্র কামনা বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বরকন্যা রূপে গুণে ভাল না হইলে সন্তান ভাল হয় না। সমাজ চায়—বলবান্ সুঠাম দেহ, বলবান্ পবিত্র মন।

এই কারণে সকল বরের বিবাহ কর্ত্তব্য নয়, সকল কন্যারও নয়। জন্মিলে মৃত্যু আছে; এদেশে জন্মিলে বিবাহও আছে। যে রুগ্ন, যে কামন ও ক্রোধন, যে উচ্চ আকাংক্ষাকারী, তাহার বিবাহ কর্ত্তব্য নয়। কেবল 'পাশের' সংখ্যা দেখিয়া বর-নির্ব্বাচন বাতুলতা। কেবল চাকচিক্যময় দেহ কিছু নয়, দেহের দেহী আসল। পড়িয়া পড়িয়া যে যুবকের চক্ষু কোটরগত হইয়াছে, অনিয়মে যাহার অন্নপাক শক্তি লঘু হইয়াছে, যে যৌবনেই বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিবাহ অনিষ্টের হেতু। যে বংশে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ দীর্ঘজীবী ছিলেন, যাঁহাদের প্রশান্ত ললাট মংডল অবিশ্রান্ত কর্মশীলতার পরিচয়ভূমি হইয়াছে, সে বংশের যুবক বিবাহ করিতে পারে। এই রূপ শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে যে উংকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট কন্যা তাহারই প্রাপ্য। ইংরেজীতে বলে, None but the brave deserves the fair—কথাটা সত্য, বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

বর নির্বাচন কঠিন, কন্যা নির্বাচন আরও কঠিন। কোন কোন পরিবারে কন্যার ফরসা রংগের আদর। কেহ কেহ 'পরমাসুন্দরী' কন্যা চান। তাঁহারা ভুলিয়া যান, দ্রৌপদী কৃষ্ণা ছিলেন, এবং তাঁহাকে লাভ করিতে গিয়া ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বাহুবল পরীক্ষা হইয়াছিল। ডানা-কাটা পরী ঘর আলো করিতে পারে, কিন্তু প্রায়ই অহ পর্য্যন্ত। যে কন্যা সোনার লতিকার তুল্য কাংচনবর্ণা, কিন্তু অল্প বাতাসেই নুইয়া বাঁকিয়া পড়ে, যাহার মনে ঘর ছাড়া বাহির প্রবেশ করে না, সে কন্যা ঘরণী হইবার অযোগ্যা। কুরূপা, বিকলাংগা কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হইবার কথা। কিছু বয়সের পর দেহ আর বাড়ে না; অনেকের মনও আর বাড়ে না। যে বংশে মন বাড়ে না, সে বংশের পুত্র কন্যা জামাই ও বউ হইবার যোগ্য নয়। বরকর্ত্তা প্রায়ই কন্যার রূপ চায়, গুণ অনুসন্ধান করে না। ভুলিয়া যায়, রূপজ প্রেম অপেক্ষা গুণজ প্রেম স্থায়ী এবং এই কারণেই শাস্ত্রকার প্রাজাপত্য বিবাহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদি পুত্রের অংগে ও মনে কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকে, সে বিষয়ে বধূর পূর্ণ বিকাশে ত্রুটি সংশোধন কর্ত্তব্য। খর্ব পতির খর্ব পত্নী, কৃশপতির কৃশপত্নী ইত্যাদির যোগে বংশের দোষ বাড়িতে থাকে।

এখানে বর কন্যার দোষ গুণের তালিকা তুলিয়া ফল নাই। একটু চিন্তা করিলেই নানাকথা মনে আসিবে। সমাজের দুঃখ এই, লোকে ভবিষ্যৎ ভাবে না।

সব মানুষ যে টাকাতে মরে টাকাতে বাঁচে, এমন নয়। অনেকে তোমার আমার আশাআকাংক্ষা সুখ দুখের কথা ছাড়িয়া সমাজের হিতাহিত চিন্তাও করে। এই

হেতু বরপণ কন্যা পণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে, এবং বোধ হইতেছে বাংগালীর বিবাহ প্রথা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইবে।

প্রকৃতিকে কাজ করিতে দিলে, সমাজে গান্ধর্ব বিবাহ বা স্বয়ংবরপ্রথা শ্রেষ্ঠ হইবে। নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্যে এই প্রথাই দেখিতে পাই। কন্যা পিতৃ-গৃহে কিংবা স্বগৃহে থাকে, বিবাহযোগ্যা হয়, বরের আগমন প্রতীক্ষা করে। কন্যার নিকট আসিয়া বর নিজের বলবিক্রম রূপ গুণ প্রদর্শন করে, কন্যা একটিকে বরণ করিয়া অপরকে প্রত্যাখ্যান করে। ইহাতেই কন্যার কন্যাত্ব, কন্যার প্রতিষ্ঠা। ইহাতেই কন্যা আদরণীয়া, পূজ্যা, মাতৃরূপা হয়।

কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা কাল গ্রাহ্য করে না; তাহার কাছে কাল অনন্ত। অনন্ত কাল পাইয়া প্রকৃতি যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন ঘটায়।

মানুষ এতকাল অপেক্ষা করিতে পারে না, অচিরে ফল পাইবার আশায় সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। কোন্ সমাজ প্রকৃতির বশে চলিতেছে, অপর সমাজ প্রকৃতিকে সংযত করিয়া অভীষ্ট পথ রক্ষা করিতেছে। যে সমাজ সংযম-মাত্রা অত্যধিক না করিয়া প্রকৃতির অনুসরণ করে, সেই সমাজই জ্ঞানী।

এই বিচারে প্রাজাপত্যের সহিত গান্ধর্ব বিবাহের সম্মিলন কল্যাণকর বোধ হইতেছে। পিতা ও অভিভাবক প্রথমে কন্যার যোগ্য বর অনুসন্ধান করিবেন, কন্যা নিজের অভিমত বর বাছিয়া লইবে। বর্ত্তমানে কন্যার মতামত আদতে গ্রাহ্য হইতেছে না; অভিভাবক মনে করিতেছেন তাঁহার নির্ব্বাচিত বর কন্যার নিশ্চয়ই বরণীয় হইবে। কোন কোন বর স্বয়ং কন্যা দেখিয়া নির্ব্বাচন করে। এই উপলক্ষে কন্যাও বর নির্ব্বাচনের সুযোগ পায়। কিন্তু এনিমিত্ত কন্যার কিছু বয়স হওয়া চাই। বরের বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে, কন্যারও কিছু বাড়িয়াছে; কিন্তু আরও কিছু বাড়া চাই।

কেহ কেহ বলিবেন—সর্ব্বনাশের কথা, এ যে খ্রিসটানী সমাজের কথা। ইহাতে যুবক-যুবতী রূপজ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, পরিণামে দম্পতি অনুতপ্ত হয়।

একথা সত্য, দুই দশটার স্থলে কন্যার ভুল হইতে পারে; বরেরও ভুল না হইতে পারে, এমন নয়। কেবল সুফল ফলিবে, এমন ব্যবস্থা কল্পনা করা মানবের পক্ষে অসম্ভব। সংসার কেবল সম্ভাবনা বিচার করিয়া চলিয়াছে। কথা হইতেছে, বর্ত্তমান প্রথায় কন্যার অভিভাবক বর নির্বাচনের সমস্ত ভার লইয়াছেন, কন্যার হাতে কিছুমাত্র দেন নাই। ইচ্ছা করিলে বরও কন্যা নির্বাচন করিতে পারে। অর্থাৎ দুই পক্ষের এক পক্ষ অধিকার পাইয়াছে, অন্য পক্ষ পায় নাই। কন্যা কি ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু,—অচেতন পদার্থ,—যে তাহার মতামত কিছুমাত্র ধর্ত্তব্য হইবে না?

বাস্তবিক শৈশবে কন্যার বিবাহ হওয়াতে —তাহার মতামত না থাকাতে, বরপণ প্রথা কন্যাদায় ইত্যাদি চলিত হইতে পারিয়াছে। কন্যাকে স্বয়ংবরা হইতে দিলে বরের গরিমা ঘুচিয়া যাইবে। তখন বর বুঝিবে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাশে' কন্যা মেলে

না। এদিকে যে যুবক বিবাহব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিবাহার্থী হয়, সে বুঝিতে পারে যে সে রাজকন্যা চায় না, অর্দ্ধেক রাজত্বও চায় না! পিতামাতা পুত্রের নিমিত্ত রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব অবশ্য চাহিবেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন, পুত্র ইহা অপেক্ষা আর কি অভিলাষ করিবে? কিন্তু শিক্ষিত বর বাস্তবিক রাজ-কন্যা চায় কি?

বর্ত্তমান সমাজের চিত্র ভাবিয়া দেখুন। কন্যার বয়স ৮।৯ বৎসর হইতে না হইতে পিতামাতার মনে চিন্তার সঞ্চার হয়। পিতা কিংবা ঘটক এখানে ওখানে বর খুঁজিয়া বেড়ান। কোন্ প্রাণী কোন্ উদ্ভিদ সমাজে বর খোঁজা আছে কি? কন্যার অনুসন্ধানে বর ফেরে, বরের সন্ধানে কন্যা ফেরে না। কন্যার পিতা হয়ত কন্যাকে লইয়া এখানে ওখানে গিয়া ভাবি বরের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে দেখাইয়া বেড়ান; যেন কন্যা প্রদর্শনীর বিক্রেয় দ্রব্য! কন্যার বিবাহ বড় না গৌরব বড়, একথা তিনি ভাবিয়া দেখেন না। যদি পিতা কন্যার মানরক্ষা না করিবেন, তবে আর কে করিবে? এই কারণে সমাজের ব্যবস্থা, কন্যা কদাপি পিতৃগৃহ হইতে অন্যত্র গিয়া নিজকে দেখাইবে না। কোন কোন অজ্ঞান বরকর্ত্তা কন্যার পিতাকে কন্যা বহিয়া লইয়া দেখাইতে বলিতে লজ্জা বোধ করে না। যে কন্যাকে ঘরের লক্ষ্মী করিয়া আনিতে যাইতেছে, প্রথমেই তাহাকে অপমান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাতেও তৃপ্ত নয়। বর কন্যাকে গ্রহণ করিবে, এই অনুকম্পার মূল্য চাইতে সাহসী হয়। বালিকা কন্যা বর-পণের অর্থ বুঝিতে পারে না, তাই বরপণ প্রথা চলিত আছে! কিন্তু বয়সে বুঝিতে পারে, স্বামীর ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি ভক্তি হীনা হয় এবং নিজের অপদার্থ জীবনে ধিক্কার দেয়। সে কি বুঝিতে পারে না, তাহার প্রার্থী কেহ ছিল না, পিতামাতা বরের পিতাকে টাকা দিয়া বহু কষ্টে বশীভূত করিয়া তাহাকে বরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন?

যে বরকর্ত্তা বলেন, আমি দরিদ্র তুমি ধনী, তোমার কন্যার ভরণপোষণের নিমিত্ত কিছু অর্থ স্থাপন কর, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যখন তিনি বলেন, আমি বরের পিতা আমাকে দেও, বরের প্রাপ্য পণ দেও, বরকে হীরা মাণিকের আভরণ দেও, তখন তিনি নানা ছাঁদে বিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে বসেন। সেই সত্যযুগে সাধারণ গৃহস্থেরা সোনার থালে খাইয়া হীরার খাটে শুইতেন কি না ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু আজি কালি বিশ ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরিয়ার বুকের উপরে সোনার ঘড়ী 'চেন' ঝুলিতে থাকে। সে সোণা-দানা স্ব-উপার্জ্জিত নহে, শ্বশুর-দত্ত। বাস্তু ভিটাটুকুও হয় ত নাই, কিন্তু বধূর গাএ হাজার টাকার অষ্ট অলংকার। অষ্ট অলংকার কি বিয়াল্লিশ সে গণনায় প্রয়োজন নাই! এটা ঠিক সে অলংকার কন্যার কন্যার পিতাকে দিতে হইয়াছে। শোনা গিয়াছে, বিবাহের লগ্ন বহিয়া যায়, বরকর্ত্তা পণের টাকা একটী একটী করিয়া বাজাইতেছেন। এমনও শোনা গিয়াছে, সেই লগ্ন সময়ে বরকর্ত্তা সেকরা

লইয়া অলংকার ওজন করিতেছেন। রাত্রে কিরূপে সোণা কষা হয়, তাই জানিবার বিষয় বটে। কিন্তু এইখানেই বরকর্তার দস্যু-বৃত্তির শেষ হয় না। কন্যা শ্বশুর বাড়ী গেলে বরকর্ত্রী পালা আরম্ভ করেন

তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোনও গহনা ভাল নয়, তত্ত্বের সন্দেশ পাড়াপড়শীকে দিতে কুলায় না, ইত্যাদি। শ্বাশুড়ীর প্রথম গর্জ্জন, বধূকে পিত্রালয়ে যাইতে দিবেন না; তাঁহার অমোঘ তর্জ্জন তিনি পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবেন। কিন্তু এই সব বিচার ও আলোচনা ও গঞ্জনায় বালিকা বধূর শ্বশুর ঘর করা সন্তাপ গৃহ বাস তুল্য হয়। বালিকার পিতামাতা না খাইয়া না পরিয়া শ্বাশুড়ীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু এই যে বিবাহ এবং বিবাহের অনুষ্ঠা, ইহা কি বিবাহের ছলে দস্যু বৃত্তি না আরও কিছু?

কেহ কেহ বিক্রয় শব্দে ও রুষ্ট হন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পণ অর্থে মূল্য নয় কি? আরও জিজ্ঞাসা করি, সে মূল্য কিসের, কি সূত্রে সে মূল্য হইল? পূর্ব্ব-কালে হাটে দাসদাসী বিক্রয় হইত। এখন বর বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন সমাজে কন্যা বিক্রয় ও চলিতেছে। কিন্তু মানুষ বিক্রয়, সে মানুষ বর হউক কন্যা হউক, দাস হউক দাসী হউক, ঘৃণিত কাজ। কুলীর আড়কাটি কুলী বিক্রয় করে বলিয়া সমাজে একান্ত ঘৃণ্য এবং লোকের সহানু-ভূতি প্রাপ্তির অযোগ্য হইয়াছে। স্বাধীনতা বিক্রয় হইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। ইহাতেই ঘৃণা, ইহাতেই লজ্জা ইহাতে আশাও হয় জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর ক্রয় বিক্রয় উঠিয়া যাইবে। উঠিয়া যায় নাই, কারণ এখনও সকলে প্রথাটার কুফল ভোগ করে নাই। যখন কন্যার বিবাহ আরও দুর্ঘট হইবে, তখন প্রতিকার আপনি আসিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাশ' করা বিবাহার্থী যুবক বিদ্যালাভ করে, কিন্তু প্রায়ই জ্ঞান-লাভ করে না। তাহার বুদ্ধি বৃত্তি চালিত হয়, কিন্তু সদাশয়তা ও ধর্ম্ম বুদ্ধি নিদ্রিত থাকে। কারণ যে নিজকে বেচিতে দেয়, তাহাকে মানুষ বলিতে পারি না, হাটে কেনা-বেচার সামগ্রী বলিতে পারি। যে যুবক ভাবী সহধর্ম্মিনীর অভিমানে আঘাত দিতে পারে,, সে বর হইতে পারে না, বর নামে বিবাহের ব্যবসাদার হইতে পারে। কারণ সহধর্মিনীর অভিমানে আঘাত প্রকারান্তরে নিজের অভিমানে আঘাত। বিদেশীরা না জানিয়া বলিতে পারে, হিন্দু নারীর সম্মান নাই, তাহারা ঘরের দাসী মাত্র। কিন্তু শিক্ষিত যুবকও কি সেই কথায় সায় দেয়? বিবাহের যোগ্য না হইয়াই সে বিবাহ করে। এই হেতু বিবাহ সময়ে সে নির্বাক্ নির্জীব, চেতনা হীন যন্ত্র স্বরূপ থাকে। কোন কোন যুবক নিজের দাম শুনিয়া পুলকিতও হয়। কারণ তাহারা জানে ভবের হাটে তাহাদের মূল্য তেমন নাই। এই কারণে তাহারা ভাবী শ্বশুরের কষ্টের মাত্রা বাড়াইয়া সুখ পায়। মানুষের স্বভাব এই, যেখানে আদর পায় সেখানে সে গম্ভীর হইয়া বসে।

আশা হয়, জ্ঞান বৃদ্ধির সংগে সংগে বিবাহের পণ গ্রহণ উঠিয়া যাইবে। যুবকেরা অজ্ঞাতসারে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। তাহারা সে কালের নিরক্ষরা বধূর পরিবর্ত্তে লেখা পড়া জানা মেয়ে খুঁজিতেছে। ইহাতে এক দিকে বালিকার বিদ্যা শিক্ষা যেমন আবশ্যক হইতেছে, অন্যদিকে তাহার জ্ঞানের পথও মুক্ত হইতেছে। দশ বার বৎসর বয়সে যাহার বিদ্যার্জ্জন শেষ হয়, সে অধিক কিছু শিখিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার মনের বিকাশের সূত্রপাত হয়। বয়সের সংগে সংগে সংসার জ্ঞান বাড়িতে থাকে এবং শীঘ্র শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রিয় হইয়া স্বামীর গৃহের ছোট কর্ত্রী হইয়া দাঁড়ায়। যুবকেরা বধূর আর একটু বিদ্যা চাহিলে বিবাহের বয়স বাড়িবে, এবং বিবাহের বয়স বাড়িলেই বর বিক্রয় ও কন্যা বিক্রয় সমাজ হইতে অদৃশ্য হইবে। বাস্তবিক জ্ঞান বিস্তার সমাজ সংস্কারের একমাত্র অব্যর্থ উপায়।

কন্যা মাত্রেরই বিবাহ দিতে হইবে, এই সামাজিক নিয়ম হেতু বরের বাজার গরম রহিয়াছে। ইহার উপরে আর একটা আছে। সেটা এই যে,--১০।১২ কি ১২।১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। অন্যদিকে কিন্তু বরের বিবাহের বয়স বাধা নাই। কন্যার বয়স একটু বাড়িলে সমাজে নিন্দা, গৌরীকাল বহিয়া গেল। কিন্তু বরের বয়স যতই বাড়ুক, নিন্দা নাই; বুড়া বরও বালিকার পাণি গ্রহণ করিতে পারে।

এইখানেই বর-পণের আরম্ভ। প্রতিকারও দেখা যাইতেছে --কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধি। এখন কন্যার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ১২, বরের বয়স ২০ হইতে ৩০। অর্থাৎ কন্যার পক্ষে সময় দুই বৎসর, বরের পক্ষে দশ বৎসর। কন্যারও বিবাহের সময় দশ বৎসর না হউক পাঁচ বৎসর করুন, বরের বাজার নরম হইবে। এমন কি, বরকে কন্যা কিনিতে হইবে। কারণ বরেরও লোক গঞ্জনার ভয় আছে, কন্যার অভাবে বিবাহ না হইলে বর অপবাদন হইবে। গ্রামে দেখা যায়, আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য বেশী বয়স হইলেও বর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কন্যারত্ন সংগ্রহ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মার্কা' মারা বরের দাম বেশী। যে পিতা এই 'মার্কা' চান না, তাঁহার কন্যা-দায় প্রায় নাই। রূপে গুণে, ধনে ও মানে ভাল বর দুর্লভ, কন্যাও দুর্লভ। দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পাইতে কষ্ট হইবেই।

কোন কোন সমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক, এবং কোন কোন সমাজে কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক জন্মে। বর অধিক হইলে কন্যা কিনিতে হয়, কন্যা অধিক হইলে বর কিনিতে হয়। এস্থলে মানুষ কেনা বেচা অবশ্য থাকিবে। প্রতিকার খুঁজিতে হইলে অনেক কথা মনে আসে।-- এক আধ প্রতিকার উপজাতিকে জাতির মধ্যে টানিয়া লওয়া। লোকে এই প্রতিকার বুঝিয়াছে, কুলীন ও মৌলিকের ব্যবধান ভুলিয়াছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পাশ্চাত্য দলভাগ মিশাইয়া ফেলিতেছে। কন্যাদায়ের

এই আশু প্রতিকারে স্থায়ী উপকার না হইতে পারে। অধিক-পুত্র এবং অধিক-কন্যা-যুক্ত জাতি ও উপজাতির মিলনে একের ত্রুটি অন্যে পূরণ করিতে পারে। কিন্তু যদি একই ত্রুটি দুই জাতি বা উপজাতিতে থাকে, তাহা হইলে কন্যাদায়ের কিছুমাত্র লাঘব হইতে পারে না। জাতির বৃদ্ধিতে এক লাভ এই যে সুলক্ষণ পাত্র ও সুলক্ষণা পাত্রী সুলভ হয়, এবং বহু স্থলে ইহাই কন্যাদায়ের উত্তম প্রতিকার।

আমরা কন্যাদায়ের প্রতিকার খুজিতে খুজিতে তিন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এক স্থানে দেখিতেছি, বরের বিবাহের বয়স যেমন অধিক, কন্যার তেমনই অল্প। প্রতিকার, কন্যার বিবাহের বয়স বাড়ানো। ইহাতে তাহার বিদ্যালাভেরও সুবিধা হইবে এবং বিদ্যার সংগে জ্ঞান জুটিয়া সামাজিক কুপ্রথার সংস্কারের সাহায্য হইবে। যাঁহারা শিশু বিবাহে কেবল সুফল এবং বালিকা বিবাহে কেবল কুফল দেখেন, তাঁহারা একদেশদর্শী। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় যুবতী বিবাহ এদেশে চলিতে পারে না। কিন্তু শিশুও নয়, যুবতীও নয়, এমন বয়সেও বিবাহ হইতে পারে। দ্বিতীয় স্থানে দেখিতেছি, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মূল্য অত্যন্ত অধিক ধরিতেছি। বরের বিদ্যা অবশ্য চাই, এবং বিদ্যার সমাদর চিরকাল সর্বত্র থাকিবে। কিন্তু একথাও ভাবা উচিত বিদ্যা অপেক্ষা জ্ঞান আরও মূল্যবান্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় না দাঁড়াইলেও পাত্রের জ্ঞান থাকিতে পারে। বিশেষতঃ যে বিদ্যায় কেবল ধন রত্নের বিলাস চাকচিক্যের আদর করিতে শেখায়, সে বিদ্যা বরের হউক কন্যার হউক, তদপেক্ষা জ্ঞান শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তৃতীয় স্থানে দেখিতেছি, বিবাহে ঘর ও বর দুইই দেখিবার রীতি থাকিতেও তাহার ব্যতিক্রম চলিতেছে। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রকারগণের শাস্ত্র প্রণয়ন বৃথা হইতেছে। শাস্ত্রের যে অংশ পালন করিলে বিবাহ দুর্ঘট এবং সমাজ স্থিতি দুরূহ হয়, আমরা প্রায় সেই অংশ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতেছি, শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য উপেক্ষা করিয়া গৌণ ব্যবস্থায় সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। ঘর ও বর দেখিবার সুযোগ করিতে কন্যাকেও বর নির্বাচনের অধিকার দান বাংছনীয় মনে করিতেছি।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসিতে পারেন, এইরূপে কন্যাদায় কি লঘু হইবে? উত্তরে বলিতে পারি,—কন্যার বিবাহ সুলভ হইবে না, কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ হইবে। যুক্তিসিদ্ধ বিবাহে বর সুলভ হইবে না, কন্যাও হইবে না। অনেক যুবক বিবাহ করিবে না, অনেক কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না। যে কন্যাকে কেহ চায় না, তাহার মনে কষ্ট হইতে পারে, পিতামাতার মনে কষ্টের সংগে দুশ্চিন্তা বাড়িতে পারে, কিন্তু সে কষ্ট বেশী দিন থাকিবে না। কিন্তু যে কষ্ট চিরজীবন থাকিবে, যে কষ্ট পুত্র পৌত্রেরা ভোগ করিতে থাকিবে, তাহাকে ডাকিয়া আনা কর্ত্তব্য কি? কুরূপ, চিররুগ্ন, বিকলাংগ পুত্রকন্যার বিবাহ না হইলে পিতামাতার মন ভবিতব্য স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে। বালিকা বিধবার কষ্ট অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়াও পিতামাতার মুখে

অন্ন রুচিতেছে, কুলীন ব্রাহ্মণকন্যার দুর্দশা দেখিয়াও লোকে কুলীনত্ব ত্যাগ করে নাই। অত কথায় কি, সামাজিক প্রথার বশে, বোধ হয় কন্যার বিবাহ দুঃসাধ্য ভাবিয়া, স্নেহের কন্যা হত্যা করিতে পিতামাতা কাতর হইতেন না।

বরবিক্রয় যে ভাবে চলিতেছে এবং বরের দাম যেমন চড়িতেছে, তাহাতে আশংকা হয় নির্ধন পিতা কি জানি বা সেই নৃশংস লোমহর্ষণ পাপ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া বসে। কন্যা জন্মিলে কোন কোন পরিবার নিরানন্দ হয়; কোন কোন পরিবারে কন্যা অযত্নে লালিত হয়; শিশু কন্যার মৃত্যুতে পরিজনেরা যেন কষ্টের লাঘব মনে করে। বস্তুতঃ যে সমাজ কন্যা বিক্রয় করিতে পারে, যে সমাজ কন্যাদান পুণ্য সংচয়ের হেতু বলিয়া মনে করে, সে সমাজ যে কন্যা বিষয়ে নিষ্ঠুর না হইতে পারে এমন নয়।

এই হেতু বিবাহ প্রথার দোষ সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়াছে। রাজপুতানার রাজপুতেরা ও পশ্চিমের জাতিবিশেষ সভা করিয়া, বরোদা ও মহীশূর আইন করিয়া, দোষ সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছেন। বংগদেশেও মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, সংস্কারের আবশ্যকতা কাল্পনিক নহে।

এই ভারতবর্ষে, সেই মনুর শাস্ত্র সেই পুরাণ সেই মহাভারত ও রামায়ণ হিন্দুমাত্রের আচার ব্যবহার নিয়মিত করিতেছে। অথচ এক দিকে এক পত্নীর বহুপতি, অন্যদিকে এক পতির বহুপত্নী বিবাহে বাধা নাই। কোথাও দুই তিন বৎসরের শিশু পুত্রকন্যার বিবাহ, কোথাও ৫০।৬০ বৎসরের বৃদ্ধের বিবাহ চলিতেছে। শাস্ত্রে নিষেধ কিছুই নাই, আবার সেই শাস্ত্রে পদে পদেই নিষেধ।

সামাজিক ব্যাপার অতি সহজে পরিবর্তিত হয় না। কারণ একটার ডাল পালা অন্য দশটার সংগে জড়াইয়া বাড়িতে থাকে, এবং একটীকে কাটিতে গেলে অন্য দশটায় আঘাত পড়ে। তথাপি আদর্শ আঁকায় দোষ নাই। কারণ আদর্শ পাইলে মন খেলিবার সুযোগ পায়, এবং আদর্শের দোষগুণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। * †

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় বিবাহে বরপণ বিশেষ সমস্যার কথা। আমাদের দারিদ্র্য এবং অন্নসমস্যার জন্য এ প্রথা অল্প দায়ী নহে। এ বিষয়ে আন্দোলন ক্রমশঃ অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি এ বিষয়ে যত পতিত হয় ততই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর এই সারগর্ভ প্রবন্ধটি যদি এ বিষয়ে আলোচনার সহায়তা করে তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।—নঃ সঃ।—

† এ প্রবন্ধে অক্ষরের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে যোগেশ বাবু আমাদের যে পত্র দিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"আমি শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল অক্ষরের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আকাংক্ষায় কিছু নূতন অক্ষরে লিখিয়াছি। আমার নিজের লেখা অক্ষরগুলা ভাল একথা বলি না, যাহাতে অক্ষরের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে, সেই চেষ্টায় নিজের প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত দিতে কুন্ঠিত হইতেছি না। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত আমার বাঙগালা ভাষা নামক গ্রন্থে এই নূতন রীতি ধরিয়াছি। বাঙগালা ভাষার শিক্ষা শাস্ত্রে, ব্যাকরণ, কোষ সমস্তই ঐরূপ অক্ষর লিখিবার প্রকাশের আশায় আছি। বাঙগালা কোন কোন অক্ষরের আকার পরিবর্ত্তন বা সংশোধন শিক্ষা শাস্ত্রে আলোচনা করিয়াছি। অক্ষর পরিবর্তনের কারণ মোটামোটি এই।" * *

ভ্রমর-প্রসঙ্গ।

(কৃষ্ণকান্তের উইল)

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু রমণীর অতি সুপরিচিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সূর্য্যমুখী গড়িয়াছেন; তাঁহার কল্পনার বলে সে সৃষ্টিতে, অসাধারণ হইলেও অনেক সম্ভবপর ভাব বা ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া তাহা সুন্দর হইতেও সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার সূর্য্যমুখীকে বুঝিতে আয়াস হয় না। কিন্তু তাঁহার ভ্রমর স্বর্গের জিনিস হইলেও প্রকৃত জীবনের চিত্র সংসারের নানারূপ কারণ-স্রোতের সংঘর্ষে সে চিত্র কোথায় কিরূপ দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়া লওয়া সর্ব্বত্র সহজ নহে। গোবিন্দলাল গৃহে আসিলেন না শুনিয়া ভ্রমর অনেক কাঁদিলেন। বুঝি বা, প্রাণ হইতেও প্রিয়-সকল চিন্তার বিষয়ীভূত, ইহজীবনের সুখ-দুঃখের নিদানস্বরূপ গোবিন্দলালের সন্দর্শন-তৃষ্ণায় তাঁহার পূর্ব্বের সে ভীতি—নরহন্তার সহবাসের আতঙ্ক—ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল! বুঝি বা, তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল যে যাহা যায় তাহা আর ফেরে-না! কিন্তু সে আদরের ধন যদি আবার আসে—তবে তাহার প্রতি যেমন অত্যধিক আগ্রহে মন ছুটিয়া যায়, সমগ্র হৃদয় দিয়া যেমন তাহাকে ঘিরিয়া রাখিতে প্রয়াস জন্মে—সেইরূপ, নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গোবিন্দলাল যদি গৃহে ফিরেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, আর গৃহের বাহির হইতে দিবেন না, তাঁহার সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবতী হইবেন এইরূপ আশায় ভ্রমরের মনে গোবিন্দলালের প্রতি যে অত্যধিক আদরের সঞ্চার হইতেছিল সে আশায় বুঝি বা নিরাশ হন এই ভাবিয়া কাঁদিলেন! বুঝি বা, ভ্রমর, গোবিন্দলালের এই ব্যবহারে, তাঁহার সতীত্বের মহিমায় বিশ্বাস দেবতা-দিগের ন্যায় বিচারে বিশ্বাস তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস বিপর্য্যস্ত বোধ করিতেছিলেন, স্বামীর চরণে মতি থাকিলে, দেবতারা সহায় হইবেন, ধর্ম্ম আছে, এবং এক সময়ে আপনার স্বামী আপনি ফিরিয়া পাইবেন, এ আশা ফলবতী হইল না দেখিয়া নিরাশার কান্না কাঁদিলেন; ভাবিলেন তিনি প্রকৃতই অভাগিনী—অনাথিনী,—তাঁহার সকল ফুরাইয়াছে, তথাপি তিনি লুব্ধের ন্যায় মরীচিকার দিকে তাকাইয়া আছেন! বৎসরেক পরে গোবিন্দলালের যে এক পত্র আসিল তাহাতেও বুঝি এই ভাবই দৃঢ়ীভূত হইল, সে পত্রে গোবিন্দলালের নিজের দুষ্কৃতিজন্য অনুশোচনার কথা আত্মগ্লানির কথা আত্মাবনমনের কথা যাহাই থাকুক,—তাহাতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, শত-সহস্র বার পড়িয়া, কুত্রাপি ভ্রমর কিছু পাইলেন না যাহাতে বুঝা যায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের অকৃত্রিম পতি-ভক্তি ও ভালবাসা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে অভিলাষী; ভ্রমর বুঝিলেন গোবিন্দলাল জীবিত থাকিলেও, রোহিণীর অবিদ্যমানেও, তিনি আর তাঁহার নহেন; সকলই শেষ হইয়াছে! যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা আর গড়িবে না! তাই ভ্রমর সে পত্র পড়িতে পড়িতে সহস্র ধারায় বিগলিত হইতে

লাগিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিরাশার শেষ তলে যাইয়া তাঁহার চিত্ত স্থিরতা লাভ করিলে, তাঁহার স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধ পুনরায় জাগিয়া উঠিল। গোবিন্দলালের পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিলেন "আপনার সঙ্গে আমার ইহ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।" ভ্রমর ভুল বুঝিলেন,—প্রথমেও ভুল বুঝিয়াছিলেন, সংসার তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়াছিল—শেষেও ভুল বুঝিলেন! ভ্রমর জানিলেন না, বুঝিলেন না, গোবিন্দলাল তাঁহাকে দেখিবার তৃষায় দিবারাত্রি জ্বলিতেছেন, আবার তাঁহার স্নিগ্ধ শীতল স্নেহতরুর ছায়ায় বসিয়া আপনার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবার জন্য লালায়িত এবং সেই জন্যই তিনি রোহিণীর হাত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন!—ইহাই সংসার! সংসারে আমরা পরস্পরকে ভুল না বুঝিলে এত অনর্থ ঘটিবে কেন?

ইহার পর ভ্রমর রোগশয্যায় শয়ন করিলেন, আর উঠিলেন না। ভ্রমর একদিন বিষপানে প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সতীর স্বামীকে চির দিন কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তাঁহার স্বামী এক সময়ে আবার তাঁহার হইবে, এই বিশ্বাসে সে পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে একরূপ সংকল্প করিয়া থাকিলেও শান্তির সময়ে বিচারনিরত চিত্তে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকিবেন। এখন ভ্রমর সকল আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যমও আপনা হইতেই নিকটগত, তাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আর কোন বাধা বোধ করিলেন না; মৃত্যুর আসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিলেন। অন্তিমকাল যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। মরণে আর দুঃখ নাই, এখন মরণে ভ্রমরের আনন্দ,—তাই ভ্রমর হাস্যমূর্ত্তি। বুঝি এ প্রফুল্লতার আরও কিছু কারণ ছিল। যাহা প্রকৃত ঘটিল না, ভ্রমর তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শীতোত্তীর্ণ ফাল্গুনের শুভ্র জ্যোৎস্নাকে গোবিন্দলালের গৌর কান্তিরূপী কল্পনা করিয়া, সেই জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে মরিয়া, ইহজগতে শেষ স্বামী সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দ্বারা ফুল আনাইয়া স্বামী সম্মিলনের আয়োজন স্বরূপ, শয্যার-উপরে সে ফুল বিকীর্ণ করাইয়া বলিতেছিলেন—"দেখিতেছ না, আজ আবার আমার ফুলশয্যা?" প্রেমের আশ্চর্য্য ক্রিয়া! সতী হৃদয়ের বিচিত্র কল্পনা! যাহার কল্পিত সত্তায় ভ্রমর হৃদয়ের তৃপ্তি অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহার প্রকৃতের আশা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিবেন ইহা অসম্ভব। ভ্রমর স্বরচিত ফুলশয্যায় শুইয়া কপোলকল্পিত সম্মিলন মধ্যে বিগলিতাশ্রুধার হইয়া ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি, একটী বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে

দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম একদিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আমি যদি সতী হই—তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না! আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!" গোবিন্দলাল অন্তিমকালে ভ্রমরকে দেখা দিবার জন্য, ভ্রমরকে দেখিবার জন্য, উপস্থিত ছিলেন;—কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রমরের নিকটে আসিলেন; ভ্রমরও কাঁদিতেছিলেন,—কর প্রসারণ করিয়া স্বামীর পদরেণু লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" সতীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল, নীরবে দৃশ্য শেষ হইয়া গেল। ভ্রমরের মর্ম্মচ্ছেদী রোদনে আমরা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিয়া আসিতেছি, আসুন আমরা ভ্রমরের ইহ জীবনের দুঃখের অবসানের দিনে রোদন-ত্যাগ করিয়া সতীর জয়ে শঙ্খধ্বনি করিয়া ভ্রমর চরিত্রের সমালোচনা শেষ করি। আদর্শ সতী ভ্রমরের মূর্ত্তি বঙ্গের গৃহে গৃহে রমণীগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হউক; আর হিন্দু যুবকগণ পিতৃ পুরুষদিগের ধর্ম্মাচরণের অনুবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব জীবনে স্বগৃহের সতীলক্ষ্মীদিগকে ভ্রমরের অদৃষ্ট হইতে বিসৃষ্ট রাখিতে যত্নবান হউন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভ্রমর চরিত্রে আদর্শ হিন্দুরমণীর অনুচিত কিছু সংক্রামিত হইয়া না থাকুক হিন্দু যুবকগণ সে সভ্যতার প্রভাবে পিতৃপুরুষ প্রদর্শিত পথে স্থির থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই; এবং সম্ভবতঃ কবি সূর্য্যমুখী সৃষ্টির পর ভ্রমর সৃষ্টির প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু রমণীর আদর্শচিত্রে তেজ এবং আত্মসম্মান নিহিত করিয়াছেন।

উপস্থিত কাব্যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষাস্থল গোবিন্দলাল। সংসারে মানুষের অধঃপতন চিত্রিত করিবার জন্যই এ কাব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল; সে চিত্রের সম্পূর্ণতার জন্য অধঃপতনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য রোহিণীর আবির্ভাব, আর বৈপরিত্যে সে চিত্রের উজ্জ্বলতা সম্পাদন জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য একত্র স্থাপনে উভয়ের প্রভেদ প্রদর্শনার্থ ভ্রমরের সৃষ্টি। ভ্রমরকে বুঝিবার প্রয়োজন ভ্রমরের অনন্ত স্বর্গসম্ভূত অতুল সৌন্দর্য্যদর্শনে চিত্তে বিমল আনন্দ উপভোগের জন্য, এবং সে সৌন্দর্য্য সে আনন্দ হৃদয়ের নিত্যালোচনার সামগ্রী করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিবার অভিপ্রায়ে; রোহিণীকে বুঝিবার প্রয়োজন গোবিন্দলালের অধঃপতন বুঝিবার জন্য, যেহেতু সে অধোগমনের পথে রোহিণীই নেত্রী; আর গোবিন্দলালকে বুঝিবার প্রয়োজন—উভয়ের সুন্দর সৃষ্টি কিরূপে এ সংসারে কালিমাপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিষ্ফল করে তাহার মূলানুসন্ধান করিয়া এবং তাহার দৃষ্টান্তের ফলে সে অধোগমনের পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য। গোবিন্দলাল বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি বলিয়াই কবির স্নেহের পাত্র, এবং গোবিন্দলাল নিজ কর্ম্মফলে ইহজীবনের সুখ হইতে চিরদিনের জন্য

বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার দুষ্কৃতির জ্ঞানের সহিত অনুশোচনার সংযোগে চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া যে পর্য্যন্ত ভগবৎপাদপদ্মে মতিস্থাপন করাইয়া তাঁহাকে ইহকালে শান্তির অধিকারী এবং পরকালে স্বর্গের যোগ্য না করিতে পারিয়াছেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিতে কবি বিরত হয়েন নাই; আর কবির স্নেহবলে গোবিন্দলাল যখন পাপপঙ্কের গভীরতর প্রদেশে নিমজ্জিত না হইয়া ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন তখন তিনি সংসারেরও ক্ষমার পাত্র, যদিও সংসারের যে হিতের জন্য যে উন্নতির জন্য স্রষ্টা তাঁহাকে সদ্‌গুণসম্পন্ন করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, সংসার তাঁহার দুষ্কৃতিহেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে! কিন্তু সে বিচার-ভার ভগবানের, সংসারের নহে! বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র গোবিন্দলালের সকলই ছিল যাহার জন্য যাহারা সৎ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত যাহারা অসৎ তাঁহাকে ভয় করিত। দয়ার সাগর পরদুঃখকাতর গোবিন্দলাল দুঃখীজনের দুঃখ দূর করিয়া বিপন্নের সহায়তা করিয়া সংসারে লোকপ্রিয় হইতে পারিতেন; সূক্ষ্মদর্শী বিচারশীল তাঁহাকর্তৃক অনেক বিষয়ে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সত্য ও ন্যায়ের সহায়তা করিতে পারিত, লোকে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন; তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহার সদ্ব্যবহারে তিনি সংসারের অশেষ হিতসাধন করিতে পারিতেন, গৃহে পতিপ্রাণা প্রিয়ভাষিণী অকৃত্রিম প্রীতিপ্রদায়িনী সাধ্বী স্ত্রী, তাঁহা কর্তৃক ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সহায়তা হইত; এ সকল যেমন তাঁহার নিজের ইহকালের সুখের উপাদান এবং পরকালের মঙ্গলের কারণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিত, তেমনই সংসারের হিতকল্পে কল্পোপধারিণী হইত, কিন্তু তাঁহার মতিভ্রম সকল ব্যর্থ করিল, ইহার জন্য স্রষ্টার নিকট তাঁহার কি দায়িত্ব তাহা স্রষ্টাই জানেন! ইহ জীবনে মানুষের পাপের দণ্ড যাহা হইতে পারে তাহা তাঁহার হইয়াছিল,—মানুষের বুদ্ধি মানুষের জ্ঞান তাহা অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিতে অক্ষম!

গোবিন্দলালের অধঃপতনের মূল তাঁহার চিত্তসংযমের অভাব। পুরাতন হিন্দু সমাজে হিন্দুর দৈনন্দিন কার্য্যেই সংযম শিক্ষা হইত, শাস্ত্রশাসিত অনুষ্ঠানরত হিন্দু পাপের পথে কমই হাঁটিত। কিন্তু এখন পাশবজীবনের চরিতার্থতা যে সভ্যতার অনুসার সেই সভ্যতার প্রভাবে হিন্দু সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হিন্দুর শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহারানুযায়ী জীবন আর নাই। হিন্দুর প্রাতঃস্নান পুষ্পচয়ন পূজাহ্নিক দেবার্চ্চনা অতিথি-সৎকার ক্ষুধিতভোজন আশ্রিতপালন পরোপকার শাস্ত্রালাপ কথাশ্রবণ ইত্যাদি যাহা ব্রতস্বরূপ দিন দিন প্রতিপালিত হইত তাহা আর নাই। হিন্দু ইহকাল পরকালের কল্যাণকর বিশ্বাসে, আন্তরিকতা ও আনন্দের সহিত দেবসেবা লোকসেবা এবং অন্যবিধ আত্মার মঙ্গলকার্য্যে যে নিত্য নিয়মিত নিযুক্ত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তদ্বিধ উপায়ে পাপের প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ইহজীবনেই যে স্বর্গের পথে দণ্ডায়মান হইতে যত্নবান হইতেন, আত্মসংযমের সে

সকল উপায়ে। এখন অসদ্ভাব হইয়াছে। বিষয়ী যাঁহারা তাঁহারাও হিন্দুর নিত্য ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়কার্য্য করিতেন, এবং হিন্দু রমণীগণের জন্যও ব্রতনিয়ম এবং সাংসারিক কার্য্য নির্দিষ্ট থাকায় কাহাকেও আলস্যে সময়ক্ষেপণ করিতে হইত না। হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ কৃতানিষ্টের প্রতিপূরণ জন্য তৎতৎ স্থলে মঙ্গলকর কিছুরই সংস্থাপনা হয় নাই। এ পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয় এবং তদবধি চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান প্রকৃত হিন্দুত্বের পরিশেষ কি তাহা বলিতে পারি না। যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট, জীবিকার জন্য যাহাকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয় তাহার কথা ভিন্ন; কিন্তু ধনীর সন্তান অধুনা কর্ম্মহীন আলস্যনিরত সুতরাং পাপপ্ররোচনার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। এ পরপালিত অধঃপতিত দেশে আধুনিক সভ্যতোপদিষ্ট অন্যরূপ উচ্চাশার পথও রুদ্ধ, অথবা করিবার কার্য্য থাকিলেও বহুকালব্যাপী পরাধীনতায় অধোগত চিত্তে তাহাতে কষ্টস্বীকার স্বার্থত্যাগ বা আত্মনিগ্রহের জন্য প্রবৃত্তির অভাব। সুতরাং জীবিকা বা অন্যরূপ স্বার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে না হইলে আমাদের জীবনে কার্য্যে সময়ক্ষেপণের উপায় কম, এবং কাজ না থাকিলেই সয়তান আমাদের হৃদয়কে তাহার ক্রীড়াক্ষেত্র করিয়া লয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত রায় সেকালের হিন্দুর নিত্যকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়াদির তত্ত্বাবধান স্বহস্তে রাখিয়া, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের আরও অবসর করিয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তিনি একালের যুবকদিগের কার্য্যে প্রবৃত্তির অভাবের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপও করিয়া গিয়াছেন। কবি অবশ্য এক স্থলে বলিয়াছেন গোবিন্দলাল দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু এই দৈনিক কার্য্য তাঁহার কি ছিল অনুমান করা সহজ নহে। সম্ভবতঃ তিনি পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং পরোপকারের কোন কোন কার্য্যে সময় ক্ষেপণও করিতেন, কারণ তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু নিয়মিত জ্ঞানোপার্জ্জনে সৎকর্ম্মসাধনে বা ধর্ম্মাচরণে তিনি সময়াতিবাহিত করিতেন কবি এরূপ আভাস কুত্রাপি দেন নাই। আমরা এ কথা বলি না যে যাঁহারা কার্য্যনিরত তাঁহাদিগের রূপমোহ অসম্ভব বা তাঁহাদের হৃদয় প্রণয়স্পর্শের অতীত, কিন্তু সৎশিক্ষা এবং সদভ্যাসের প্রভাবে বিশ্বাস করিলে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ধারাবাহিক সদাচরণে হৃদয়ের যে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রবণতা জন্মে তাহার বলে প্রণয় বা মোহের সহিত পাপের সংস্রব থাকিলে তদনুসরণ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার শক্তি উদ্ভব হয়। প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির ইচ্ছা সে অবস্থায় চিত্তকে অধিক পরিমাণে অধিকার করে।

আত্মসংযমের ক্ষমতায় সংরক্ষিত না হইলে হৃদয়ের অতি উচ্চ ভাব লইয়াও অনেক সময়ে এ সংসারে আমাদিগকে বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। গোবিন্দলালেরও তাহাই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল উদ্যানভ্রমণ করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন রোহিণী

বারুণীর ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে! সন্ধ্যা উত্তীর্ণা, তিনি উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখনও রোহিণী সেই স্থানে সেই অবস্থায়। গোবিন্দলাল দয়ার সাগর পর-দুঃখকাতর;—"এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ —আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?" গোবিন্দলাল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সোপান শ্রেণী অবতরণ করিয়া রোহিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণী চমকিত হইল, তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না! রোহিণী—"গঠিত পুত্তলের মত সেই সরোবর সোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবর-জলে সেই ভাস্কর কীর্ত্তি-কল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন।" গোবিন্দলাল এইরূপ দার্শনিক চিন্তামগ্ন চিত্তে রোহিণীকে তাহার দুঃখ, নিজে জানাইতে না পারিলে, তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকদ্বারা জানাইতে বলিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শিক্ষিত সংসারজ্ঞান-বিহীন যুবকের নিকট এরূপ উচ্চ ভাবের চিন্তা করা মনোমুগ্ধকর। আমরা এরূপ ভাবে চরিত্রভ্রষ্ট যুবকদিগকে তাহাদের উচ্চ ভাবের উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিয়া থাকি। কিন্তু কেহ অধঃপতন কল্পনা করিয়া দার্শনিক চিন্তার অনুসরণ করে না। তবে দুর্জন উচ্চ ভাবের আবরণ গ্রহণ করিয়া দুষ্কর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়—সে ভিন্ন কথা। গোবিন্দলাল কার্য্যকর্ম্মে হিন্দুর সতর্কতার নীতিও অবলম্বন করিতে শিখেন নাই। রোহিণীর নিকট অগ্রসর হইবার সময়ে "এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা" এ সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল; সন্দেহ স্থলে, সতর্কতার পথে হাঁটিয়া অন্যোপায়ে রোহিণী দুঃখের কারণ অবগত হইবার এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সে কারণ অপনেয় হইলে তাহা অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিলেও করিতে পারিতেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং বিচারশীল অন্তঃকরণ হইতে আমরা এ আশাও করিতে পারিতাম যে যৌবনোপগতা বালবিধবা রোহিণীর সম্মুখে তাঁহার মত যুবা পুরুষ ঐরূপ সময় এবং অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করিলে তাহার মনে অসঙ্গত ভাবেরও উদ্রেক করিয়া দেওয়া হইতে পারে, ইহা তিনি বুঝিবেন। কিন্তু অভিজ্ঞ যুবকের হৃদয়ে উচ্চ দার্শনিক চিন্তার স্রোতে সূক্ষ্মদৃষ্টি বিচার সতর্কতাদি সকলই ভাসিয়া গিয়াছিল। গোবিন্দলাল পাপের পথে দণ্ডায়মান হইয়াও এইরূপ দার্শনিক তর্কে সে পথের সুগমতায় সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই বাদলের দিনে মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে উদ্যান গৃহে রোহিণীর সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতার পর গোবিন্দলাল ভাবতে-

ছেন—"রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত-নীল-চিত্রিত প্রজাপতিটীর রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।" অন্ধ গোবিন্দলাল, সংসার বিসৃষ্ট চিন্তায় প্রকৃত হইতে পৃথগভূত তর্কবিতর্কে প্রবঞ্চিত হইলেন; কিসে কি হয় বুঝিলেন না। তাঁহার চিন্তার শৃঙ্খল প্রকৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ফলাফলের দিকে প্রসারিত করিলেন না।

রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণে গোবিন্দলাল যখন বুঝিলেন রোহিণী তাঁহাতে প্রণয়াসক্ত তখন গোবিন্দলালের "আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।" গোবিন্দলাল রোহিণীর মৃত্যু শ্রেয়স্কর ভাবিয়াও তৎপ্রতি দয়াপ্রবণ হৃদয়ে দার্শনিক তর্কালোচনা করিতে বসিলেন;—"সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি -আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?" তিনি রোহিণীর স্থানান্তর গমন কর্ত্তব্য সিদ্ধান্ত করিয়াও আবার সেই উচ্চভাবের অনুগামী হইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে তাঁহার আপনার কল্যাণের পথে ভ্রমরের কল্যাণের পথে সংসারের কল্যাণের পথে কণ্টকস্বরূপ দণ্ডায়মান করাইতে আপত্তি করিলেন না। রোহিণীর প্রকৃত দুঃখ হইলেও সমাজধর্ম্মানুসারে আত্মনিগ্রহই তাহার কর্ত্তব্য ছিল, এবং রোহিণী সে ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যে প্রবৃত্তির অনুগামিনী হইয়াছিল তাহা স্বাভাবিক হইলেও তৎপ্রতি প্রশ্রয়দান সমাজের কল্যাণকর নহে। পরদুঃখে কাতরতা দুঃখীর প্রতি কোমলতা অতি সুন্দর রমণীয় ভাব; কিন্তু সমাজের কল্যাণের জন্য, যাহা কিছু অপবিত্র যাহা কিছু পাপসংসৃষ্ট অন্য কথায়, যাহা কিছু সমাজের কল্যাণবিরোধী তাহাতে দুঃখের সংস্রব থাকিলেও তৎপ্রতি কঠোর ভাবই ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত। দুঃখ ব্যক্তিগত; নীতি সকলের বা অধিকাংশের মঙ্গলের জন্য। স্থল বিশেষে দয়াদাক্ষিণ্যকেও নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করিবার প্রয়োজন, পাপের প্রশ্রয়ে দয়াবৃত্তি ধাবিত হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। গোবিন্দলাল এ নীতির অনুসরণ করেন নাই। অবশ্য রোহিণীর প্রতি তাঁহার হৃদয়-ভাব হইতে বিসৃষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এ নীতির প্রয়োগ করিলে তাঁহার প্রতি ন্যায়বিচার করা হয় না। কিন্তু রোহিণীর প্রতি তাঁহার দয়াতিরিক্ত কোমলতা স্বীকার করিতে গেলেই তাঁহার হৃদয় দোষস্পৃষ্ট মনে করিতে হয়। দয়া এবং ধর্ম্মনীতির এরূপ স্থলে বিরোধ আমরা স্বীকার করি এবং বলিতে পারি না কি রূপে উভয়ের সামঞ্জস্য সম্ভবপর হইলে তাহাই আদর্শ। কবি গোবিন্দলালের চরিত্রে সে আদর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া না থাকিলেও ইঙ্গিতে বোধ হয় সেই আদর্শই সংসার সমক্ষে প্রলম্বিত করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি বারুণীর ঘাটে অসময়ে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের অনুচিত করুণা প্রকাশ করাটা ভাল হয় নাই, কবি তাহাই বলিয়াছেন। রোহিণীকে স্থানান্তর পাঠানের সংকল্প গোবিন্দলাল কার্য্যে পরিণত না করিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন,

সতর্কতার নীতি অবলম্বনে গোবিন্দলালের ত্রুটির কথা এইখানেই শেষ হয় নাই। গোবিন্দলাল রোহিণীর ইচ্ছার প্রতি বল-প্রয়োগ করিবেন না, স্বয়ং স্থানান্তরিত হইয়া রোহিণীর রূপের প্রভাব প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবেন।—উত্তম কথা। কিন্তু ভ্রমরকে সঙ্গে লইলে যে সংকল্প সিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইত, তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন কেন? অবশ্য এ ত্রুটির জন্য তাঁহার মাতা কতক পরিমাণে দায়ী। কিন্তু তিনি নিজে সে বিষয়ে আগ্রহ জানাইলে তাহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা কি ছিল? যাহা ধর্ম্মের পথে সহায়তা করিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে দোষ বা লজ্জার কথাই বা কি ছিল? এ পথ অবলম্বন যে গোবিন্দলালের পক্ষে যুক্তিযুক্ত ছিল তাহা গোবিন্দলাল সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করা যাইত। গোবিন্দলালের দ্বিতীয় ত্রুটি—ভ্রমরের নিকট আত্মগোপন। পাপের পথে নামিবার পূর্ব্বে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আপনার পরমাত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিলে পাপের পথে যাইবার সম্বন্ধে বিশেষ বাধা জন্মে, নিজেরও চরিত্র-রক্ষা বিষয়ে দৃঢ়তা অন্ততঃ আন্তরিক চেষ্টা উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ গোবিন্দলাল মনে করিয়াছিলেন যে দুর্ব্বলতার কথা জানিলে ভ্রমর হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইবেন, যদি দীর্ঘকাল স্থানান্তর বাসে তাহার নিরাকরণ করিতে পারেন তবে নিরর্থক তাহা প্রকাশ করিয়া ভ্রমরকে কেন দুঃখিত করেন? কিন্তু আত্মগোপন করিয়া ভ্রমরের কৌতূহলপ্রদীপ্ত মনে সন্দেহের মেঘ সৃজন করিয়া তাঁহাকে যে অধিকতর দুঃখিত করিতে পারেন তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে সে কথা অগোচর থাকা সঙ্গত হয় নাই। যাহাই হউক, গোবিন্দলালের বুদ্ধি যে ভাবে খেলিয়াছিল, তাহা সম্ভবপর করিবার জন্য এরূপ বুদ্ধিভ্রম সংসারে ঘটিয়াই থাকে। গোবিন্দলালের বুদ্ধিভ্রম অনেক স্থলেই ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে ভ্রমরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিজের দুষ্কৃতির সমর্থন এবং "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব" বলিয়া বাক্যেও তাহার প্রতি নির্দ্দয়তা প্রদর্শন আমাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য। যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন "আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।" এবং "নহিলে আমি তোমার জন্য মরিতে বলিব কেন?" বলিয়া রোহিণী মনে মনে যে বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিল, ভ্রমরের সম্বন্ধে গোবিন্দলালের সে বুদ্ধি সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইল। অথবা মানুষের অধঃপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শন যত কিছু সৎগুণ থাকে তাহা সকলই অধঃপাতে গমন করে।

গোবিন্দলাল এই বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের পরিচয় শেষ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন, হৃতসর্ব্বস্ব গোবিন্দলাল অন্নের কাঙ্গালরূপে ভ্রমরের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ভ্রমরকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া তাহাদের উভয়ের জীবনাভিনয়ের যবনিকা পাতের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। গোবিন্দলাল লিখিয়াছিলেন—

"ভ্রমর!

ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিড়িঁয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে. বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার আমি তোমার মন রাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থে ছিলাম তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয়, তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

"তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে, খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার, আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি —দিবে না কি?" * *

অথচ এদিকে, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমর দর্শনের লালসা, গোবিন্দলালের হৃদয়ে পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া, বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে গোবিন্দলালকে দাহ করিতেছিল। ভ্রমরদর্শনে এইরূপ লোলুপ যে হৃদয়—তাহার কি এই ভাষা? গোবিন্দলাল যদি লিখিতেন,—

"ভ্রমর! তুমি কি এ পামরের কথা বিশ্বাস করিবে? যে বিনাপরাধে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইয়াছিল, এবং স্ত্রী হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে, তাহাকে তুমি বিশ্বাস করিবে এ আশা করিবার অধিকারই বা আমার কি আছে? যখন তোমায় পরিত্যাগ করিয়া বিদেশগামী হই, তুমি সতী নারীর স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলে—এক দিন তোমার জন্য আমাকে কাঁদিতে হইবে, এক দিন আমি খুঁজিব, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? আবার আমি আসিব, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিব, আবার তোমার জন্য কাঁদিব। সতীর বাক্য নিস্ফল হয় না যদি নিজমহত্বে এ অধমের সকল দোষ ভুলিয়া নিজগুণে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিকটে আসিতে অনুমতি কর, আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি। আমি অকৃত্রিম স্নেহের কাঙ্গাল, সঙ্গে সঙ্গে আজ অন্নের কাঙ্গালও হইয়াছি। আমার অন্য কথায় বিশ্বাস না কর, নিরন্নকে অন্নদানে বাঁচাইবে না কি?"—গোবিন্দলাল এরূপ লিখিলে, আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারিতাম। তাহা দূরে থাকুক, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিতেছেন, মাতা জীবিত থাকিলে তাঁহার দুঃখের দশায় মাতৃক্রোড়ে

তাঁহার স্থান হইত, তাঁহার অদৃষ্টক্রমে সে মাতারও অভাব হইয়াছে। ইহা হইতে ভ্রমরকে কি বুঝিতে হইবে,যে মাতার অবর্ত্ত-মানে ইহজগতে আর কাহারও স্নেহমমতার উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলাল শান্তির আশা করিতে পারেন না? কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও লিখিতেছেন, "আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি? পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?" ভ্রমরের সহিত তাঁহার যে কোন দিন কোন সম্বন্ধ ছিল, কোন দিন কিছু সদ্ভাব ছিল, তাহার বিন্দু-মাত্র স্মৃতিচিহ্ন ইহাতে লক্ষিত হয় না। গোবিন্দলাল যখন প্রসাদপুরে রোহিণীর সংসর্গে বিলাসতরঙ্গে ভাসমান, তখনই ভ্রমরের অকৃত্রিম স্নেহ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অতি প্রবলা। কবি বলি-তেছেন, গোবিন্দলাল যদি তখন রোহিণীর কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া ক্ষমা প্রার্থী হইয়া ভ্রমরের নিকট উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে —রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী,—বুঝি ভ্রমর তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন! কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা পারেন নাই, "কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না।" তাহার পর গোবিন্দলাল যখন হত্যাকারী তখন তাঁহার সকল ভরসাই ফুরাইল, "অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।" কিন্তু গোবিন্দলাল এখন উদরান্নের জন্য ভ্রমরের আশ্রয়প্রার্থী, পেটের দায়ে তাঁহার লজ্জা ভয় অহঙ্কার সকলই পরাভূত হইয়াছে, তিনি ভ্রমরের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন অন্নের কাঙ্গালরূপে, অন্য ভাব হৃদয়ে থাকিলেও তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছেন না। গোবিন্দলালের মন এই সময়ে অতি হীনাবস্থাপন্ন—নিস্তেজ, সাহস-হীন, বিচার শক্তিবিহীন; তাই তিনি ভ্রমরকে ওরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের দোষগুণ বিচারে তিনিনি অসমর্থ, অন্যরূপ লিখিবার অধিকারও তিনি বোধ করেন নাই, অন্যরূপ লিখিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। আত্মদুষ্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি, সর্ব্বক্ষণের জন্য তাঁহার হীনতাকে তাঁহার নয়ন সমক্ষে জাগ্রত রাখিয়া, তাঁহাকে হীনতেজ হীনগর্ব্ব হীনসাহস হীনাত্মা-দর করিয়া তুলিয়াছিল। গোবিন্দলালের নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক অধঃপতনেরও সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছিল, তাঁহার শেষ পত্র তাহাই প্রমাণ করিতেছে। অহো! কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন! চরিত্র-চ্যুতির কি শোচনীয় পরিণাম! গোবিন্দ-লালের মানসিক অধঃপতন এই খানেই সীমান্ত প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মন যখন এইরূপ নিস্তেজ এবং বিচার শক্তি বিহীন, তখন ভ্রমর মৃত্যুশয্যাশায়িনী। তিনি উপস্থিত হইয়া ভ্রমরকে ইহ জন্মের মত বিদায় দান করিলেন। তিনিই যে ভ্রমরের অকাল মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তা তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্যের যাহা কিছু ছিল অপহরণ করিল। উন্মাদ-গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার কল্পনা করিয়া যখন গোবিন্দলাল তাঁহার পাপের ভরা পূর্ণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ভ্রমরের পবিত্রতার

স্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে সে মহাপাপ হইতে বিরত করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে তাঁহার চিত্তকে ফিরাইল। মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হইলে, তাহার পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে, গোবিন্দলালের দৃষ্টান্তে মানুষকে এ কথা বুঝাইয়া দেওয়াই বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য।

মনুষ্যসম্বন্ধে চরিত্র বত্তার সহিত অনেক বিষয়ের অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। শিক্ষিত বিদ্যাও চরিত্রবত্তার অভাবে অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। জলমগ্ন ব্যক্তিতে জীবনসঞ্চারের প্রক্রিয়া গোবিন্দলাল শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এ বিদ্যায় সময়ে সময়ে লোকের হিতসাধন হইতে পারিত। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, গোবিন্দলাল এ বিদ্যা শিখিয়াছিলেন কেবল আপনার বিপদ ঘটাইয়া আনিবার জন্য। জলমগ্না রোহিণীকে বাঁচাইতে গিয়াই গোবিন্দলাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু আত্মসংযম থাকিলে কোন অনিষ্টপাত সম্ভাবিত না করিয়া এ শিক্ষিত বিদ্যা মানুষের তিনি পক্ষে ফলোপধায়িনী করিতে পারিতেন। অতএব মনুষ্যজীবনে চিত্ত সংযমের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। রূপ বল গুণ বল বুদ্ধি বল বিদ্যা বল, এক আত্মসংযম ক্ষমতার অভাবে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, মনুষ্য প্রকৃতির অতি মহৎ মহৎ গুণও সংসারের উপকারে আইসে না।

গোবিন্দলালের চরিত্র সমালোচন শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গকে বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের সহিত গোবিন্দলালকে তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিব। নগেন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে কল্পনার চিত্র, সূর্য্যমুখীর পতিভক্তি প্রকৃষ্টরূপে প্রস্ফুট করিবার জন্য কবি সে চিত্রে সাময়িক মতিভ্রম সংযোগ করিয়াছেন। গোবিন্দলাল প্রকৃত জীবনের চিত্র, প্রকৃত জীবনে লোকের পদস্খলন হইলে কিরূপ অধঃপতন ঘটে গোবিন্দলালে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইজন্য, গোবিন্দলাল বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি হইলেও, কবি তাঁহাকে নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া আঁকিয়াছেন। বস্তুতঃ রূপমুগ্ধ অবস্থায় উভয়ের ব্যবহার তুলনা করিলে উভয়ের পার্থক্য অত্যধিক বলিয়াই বোধ হয়। নগেন্দ্রনাথের সাময়িক চিত্ত-বিকলতা জনিত অনুক্ষণব্যাপী আত্মগ্লানি এবং আত্মাবনমনের ভাবে আমরা তাঁহার প্রকৃতির মহত্ত্বই অনুভব করি। তিনি চিত্ত দমনে অসমর্থ হইয়া আপনাকেই সূর্য্যমুখীর ন্যায় সহধর্ম্মিণীর অযোগ্য মনে করিতেন; মুহূর্ত্তের জন্যও সূর্য্যমুখীর দোষানুসন্ধান করিয়া আত্মসমর্থনে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে নাই। ইহা মনুষ্য প্রকৃতিতে সম্ভব, কিন্তু সাধারণ নহে। তাই এ মহত্ত্বকে অনেক পরিমাণে কল্পিত বলিতেছিলাম; কিন্তু বশে রাখিতে না পারিলে প্রকৃত জীবনে আমাদের নগেন্দ্রনাথ হওয়া সহজ নহে, গোবিন্দলাল হওয়া সাধারণ; সুতরাং গোবিন্দলালই আমাদের শিক্ষার অধিকতর উপযোগী এবং সংযম ক্ষমতা হারাইয়া তাঁহার মত আমাদিগকে অধঃপতিত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্কভাব বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ভ্রমর সূর্য্যমুখীতে এরূপ প্রভেদ কিছু বোধ হয় না। ভ্রমর বড় কি সূর্য্যমুখী বড় বলা সহজ নহে। ভ্রমর ও

সূর্য্যমুখীকে তুলনা করিলে সূর্য্যমুখীকেই স্থূল দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া বোধ হইবে, যেহেতু তিনি নীরবে তাঁহার দুর্ভাগ্য বহন করিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, স্বামীর সন্তোষার্থ প্রত্যক্ষ স্বার্থত্যাগের ক্ষমতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভ্রমর তাহা করিতে সমর্থা হয় নাই, কিন্তু অন্য দিকে দেখিতে গেলে, সূর্য্যমুখীর পরীক্ষা অল্পকাল স্থায়ী, ভ্রমরের দুঃখ আমরণ ব্যাপী। ভ্রমরকে যাহা সহ্য করিতে হইয়াছে, সূর্য্যমুখীকে সেরূপ কিছুই সহ্য করিতে হয় নাই। তথাপি ভ্রমরের পতিপ্রেম তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। মরণান্তেও ভ্রমর তাহা বহন করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন, যেহেতু স্বর্গেও ভ্রমরকে আমরা স্বামীর কল্যাণ-চিন্তান্বিত দেখিতে পাই। ভ্রমর অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিল মাত্র, তাহাও অনেকটা গোবিন্দলালের ব্যবহার তাঁহার আত্মকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল বলিয়া। নগেন্দ্রনাথের নিকট এক দিনের জন্যও সূর্য্যমুখী সেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়েন নাই। অতএব ভ্রমর সূর্য্যমুখীর পার্থক্য কতক পরিমাণে তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীর ব্যবহারের পার্থক্য হইতেও উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

কৃষ্ণকান্তের উইলের বিশেষত্ব—এবং এই বিশেষত্বেই এ কাব্যের বিশেষ মূল্য—এই যে, কবি তাঁহার এ আখ্যায়িকায় একটিও কল্পিত চিত্র সন্নিবেশিত করেন নাই, প্রকৃত জীবন অবিকল চিত্রিত করিয়া ইহা লোকশিক্ষার অধিকতর উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কাব্যের অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র—ভ্রমর, স্বর্গের ছবি হইলেও প্রকৃত জীবনের চিত্র। কবি ভ্রমরকে রাগাভিমান দিয়া, তাঁহাকে মানুষী করিয়াছেন এবং রাগাভিমানের বশীভূত হইয়া সংসারে সচরাচর আমরা যেরূপ ভ্রমে পতিত ভ্রমরকেও সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইতে, হইয়াছে। আর, তাহা হইতে যেরূপ অনিষ্টপাত হইয়া এ দুঃখের সংসারের দুঃখের ভাগ ভাগ বৃদ্ধি করে সেরূপ অনিষ্টপাতও তাহার ভ্রমের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। গোবিন্দ লালের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রোহিণীর কথার পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণকান্ত রায় মাধবী নাথ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে কয়েকটি পুরুষ চরিত্র আছে তাহাও সংসার চিত্র, পড়িলেই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু এ কাব্যের চরিত্র সম্বন্ধেই কেবল ইহাকে সংসারের চিত্র বলিতেছি না, ইহার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাই পড়িতে পড়িতে যেন বোধ হয় আমরা সংসারের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। কবি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদে ভালবাসার কথা বলিতেছেন,—"যাহাকে ভালবাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—ভাল আছ ত? হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক

বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?"—এ সংসারের ভালবাসা, সংসারের প্রেম বন্ধন, অথবা প্রকৃত ভালবাসাকে সংসার এইরূপ করিয়া তুলে। সংসার যে কিরূপে কি ঘটায় কবি তাহারও আভাস দিয়াছেন; ভ্রমর গোবিন্দলাল সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় দুই জনে একত্র থাকিলে, এ মনের মালিনা বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না"—গোবিন্দলাল গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভ্রমরের সহিত কথোপকথনে ভিন্ন তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা লক্ষিত হয় নাই। রোহিণী বন্ধনের অবস্থায় গোবিন্দলালের অন্তঃপুরে;—ভ্রমর উপস্থিত, গোবিন্দলাল গোপনে রোহিণীকে তাহার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তাই ব্যঙ্গ করিয়া ভ্রমরকে বলিতেছেন—"আমাকে কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।" ভিন্ন স্থলে গোবিন্দলাল তাঁহার প্রতি রোহিণীর অনুরাগের কথা ভ্রমরকে জানাইলে ভ্রমর জ্বলিয়া উঠিয়া রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আবাগী. পোড়ার মুখী —বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!" গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন,—এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন একমাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।" ইত্যাকার রহস্যালাপের ফলে ভ্রমর চরিত্রের রেখা বিশেষ পুষ্টতা লাভ করিয়াছে বলিয়া যদিও গোবিন্দলালের এ সকল ব্যঙ্গোক্তির মূল্য আছে, তথাপি ভাব ও ভাষার বিশুদ্ধতার বিশেষ পক্ষপাতী নৈতিকগণ এরূপ উক্তিতে রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের অপবিত্র সম্বন্ধের ইঙ্গিত আছে মনে করিয়া উহা আপত্তিজনক মনে করিতে পারেন। আমরাও কঠোর নৈতিক না হইলেও, উচ্চ পবিত্র প্রণয়ে পাত্রদ্বয়ের চরিত্রগুরুত্ব বিবেচনা করিয়া গাম্ভীর্য্যের হানিকর ভাবভাষার অন্তর্নিবেশ সঙ্গত মনে করি না। তবে গোবিন্দলাল সংসারের চিত্র; কবি সে চিত্রে কল্পিত ভাববিশুদ্ধতা নিবিষ্ট করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সংসারে যাহা সাধারণ তাহার সন্নিবেশ দ্বারা চিত্রের সাংসারিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।—তৃতীয় স্থলে, এ সংসারে অনেক সময়ে আমরা পরস্পরকে ভুল বুঝি, এবং এইরূপ ভ্রম হইতে অশেষ অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়া সংসারের দুঃখের ভার বর্দ্ধিত করে। এরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত কৃষ্ণকান্তের উইলে বিরল নহে। এ কাব্যের প্রধান চিত্রদ্বয়, ভ্রমর গোবিন্দলাল, পরস্পরকে বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই। আপনার পরম হিতৈষী জ্যেষ্ঠতাতের অতি মহৎ অভিপ্রায় না বুঝিয়া, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, তাঁহার কৃত উইলে সাক্ষীস্থানে গোবিন্দলাল নাম দস্তখত করিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন।

গোবিন্দলালের মাতাও, বৃদ্ধের কার্য্যের অনর্থক অসমর্থ করিয়া পুত্র পুত্রবধূর হিত-চিন্তায় ঔদাসীন্য দেখাইয়া তীর্থবাসী হইয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষীরোদা—ভ্রমরের অতিপ্রিয় দাসী ক্ষীরোদাও—ভ্রমরের প্রকৃতি না বুঝিয়া, তাহার সুখসাধের পথে, তাহার জীবন প্রবাহে, যে বিপ্লবের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে এ সংসারে অতি ক্ষুদ্রের ভুল হইতেও কি গুরুতর পরিবর্ত্তন সম্ভাবিত হয়, মানুষের অদৃষ্টচক্র কিরূপ অপরূপ পথে ঘূর্ণায়মান হয় তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।—তাহার পর সেই রায়বাড়ীর দাসী মহলের কোলাহল, সেই ভ্রমরের দুঃখে প্রতিবেশিনীগণের সহানুভূতি, আর গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর কলঙ্কের সম্বন্ধ ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহার কলঙ্ক রটনা—এ সকলই সংসারের ব্যাপার, এবং কবি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত এ সকল চিত্রিত করিয়াছেন। চিন্তা করিলে বুঝা যায় এই মিথ্যা রটনা অনেক ভাবেই গোবিন্দলালের অধঃপতনের সহায়তা করিয়াছিল। তাহাও সংসারের ঘটনা এবং সংসারই তাহাতে প্রদর্শিত হইতেছে। যেরূপ শুনিয়াছি, কবি তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলকে বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ মনে করিতেন। এ কাব্যের এই বিশেষত্বই হয়ত তাহার কারণ হইবে।

সমালোচ্য কাব্যের দোষের কথার উল্লেখ আমরা সমালোচনাগর্ভে একরূপ করিয়াছি। রোহিণী চিত্রের অস্পষ্টতাই তন্মধ্যে প্রধান। রোহিণী প্রকৃত কুলটার চিত্র, ভোগলিপ্সাই সে চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল রেখা। কিন্তু কবি সে চিত্রের স্থানে স্থানে প্রকৃত প্রেমানুরাগের এরূপ বর্ণপাত করিয়াছেন যাহাতে রোহিণীকে যেন কিছু উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে কবির অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিবারও আমরা চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণ মধ্যে যদি কেহ সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, কাব্যখানি প্রথমে সাময়িক পত্রে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, যদি কিছু সামঞ্জস্যের অভাব সে কারণে সে সময়ে ঘটিয়া থাকে পরবর্ত্তী সংস্করণে সে সকল সংশোধন করিবার অবসর কবির জীবনে হইয়া উঠে নাই। যাহা দোষ বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রকৃতই দোষ, এবং তাহা রহিয়া গিয়াছে। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই সামান্য দোষহেতু, রোহিণীর প্রতি এ কাব্যের পাঠকগণের যেরূপ মনোভাব হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার অন্যথা হইয়া কোন অনিষ্টের উৎপত্তি হইবে না। রোহিণীর প্রতি সহানুভূতির নিবর্ত্তক-কারণ কবি ভ্রমরচরিত্রে সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। ভ্রমরকে চিরদুঃখিনী করিবার কারণ এই যে, রোহিণীর প্রতি রাগ এবং ঘৃণা ভিন্ন অন্য ভাব হইবার সম্ভব নাই। কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভ্রমর কেবল আপনার চরিত্রসৌন্দর্য্যে পাঠকের মনে উৎকর্ষ বিধান করিতেছেন, এরূপ নহে। ভ্রমর, পাপের প্রতি আকর্ষণের পথে দাঁড়াইয়াও সংসারের হিত সাধন করিতেছেন। তাহার পর গোবিন্দলালের বুদ্ধি ও বিচার-শীলতার সহিত তাঁহার ব্যবহারের সামান্য যাহা অসঙ্গতি তাহার ব্যাখ্যা আমরা

করিয়াছি এবং তাহাই সঙ্গত কারণ বলিয়া মনে করি। পরস্ত্রীর রূপমোহে বিকৃতমনা হইয়া গোবিন্দলাল বুদ্ধি বিবেচনা ক্রমে ক্রমে হারাইতেছিলেন, এবং তাহাই তাঁহার কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। চরিত্রবান সুবুদ্ধির কার্য্যে আমরা যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেখিতে পাই, বুদ্ধিমান চরিত্রচ্যুতের ব্যবহারে তাহা লক্ষিত হয় না। হত-চরিত্র যে, সে হতবুদ্ধি। অধঃপতন নীতি-সম্বন্ধে হইলে, তাহা সর্ব্বাঙ্গীনই হইয়া থাকে; ভ্রমর সংসারের চিত্র বলিয়া, এক এক স্থলে ভ্রমরচরিত্র বুঝিয়া উঠা কিছু আয়াস-সাধ্য হইলে, তাহাতে কোথাও অসঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের অভাব দৃষ্ট হয় না। সংসারের আবিলতা হইতে মুক্ত যে চরিত্র, তাহা সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল হইবারই কথা। তবে তেজস্বিতা এবং পতিপ্রেম, উভয়ই ভ্রমর-প্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ; একের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভ্রমর যখন স্বামীর প্রতি উগ্র ভাব ধারণ করিয়াছেন তখনই অপরের প্রাবল্যে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা চরিত্রের অসামঞ্জস্য বলিয়া ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। উপস্থিত প্রবন্ধলেখকের বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভান্বিত লেখকের লেখায় বিশেষ কিছু দোষ থাকিতে পারে না। কবির অর্থ বা অভিপ্রায় আমরা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অথবা ভিন্ন ভাবে দেখিতে গিয়া আমরা এক এক এক জন এক এক ভাবে বুঝি। দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমরচরিত্রের কথা উল্লেখ করিব। আমরা সে চিত্র যে ভাবে বুঝিয়াছি, জনৈক ভিন্ন সমালোচক সে ভাবে বুঝেন নাই। আমরা ভ্রমরকে আদর্শ হিন্দুরমণী মনে করি; তাঁহার মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভ্রমরচরিত্রে আত্মসম্মানের ভাব প্রবেশ করিয়া, হিন্দু-গৃহে অশান্তির কারণ উপস্থিত করিয়াছে। দুয়ের একের বা উভয়েরই ভুল হইয়া থাকিবে, তীক্ষ্ণতর সমালোচনবুদ্ধিসম্পন্ন কেহ আসিয়া এ চিত্রের প্রকৃতার্থ বুঝাইবেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলিয়া আমরা এ সমালোচন প্রবন্ধ শেষ করিব। চন্দ্রশেখরের এক স্থলে, প্রতাপ শৈবলিনীকে বলিয়াছেন —"ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।" আর রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতাপ যখন রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নে তাঁহার গভীর শৈবলিনীপ্রেম মুখরিত করিয়াছিলেন, তখন, অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন "আমার মন কলুষিত হইয়াছে।" প্রতাপের এই দুইটী উক্তি সম্বন্ধে উপস্থিত প্রবন্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন— "আপনি প্রতাপকে অ-মানুষিক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন;—তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ দৌর্ব্বল্য প্রদান করিয়া তাঁহার দেবত্বের লাঘব করিয়াছেন কেন?" তদুত্তরে কবি লিখিয়াছিলেন, অতি মানুষিক চরিত্র লোকশিক্ষার উপযোগী নহে, সেইজন্য প্রতাপকে মানুষ বলিয়া দেখান কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কথা নৈতিক অপবিত্রতার ভয়ই অনেক স্থলে নৈতিক মহত্বের মূল, প্রতাপের এই ভয় ছিল বলিয়াই তিনি ওরূপ নীতিবীর

হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পাপস্পর্শের আশঙ্কাই দেখাইতেছে যে তিনি মানুষ—দেবতা নহেন। তদ্ব্যতীতও প্রথমোদ্ধৃত কাব্যের মূল্য এই যে, শৈবলিনীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রতাপ বরাবর যে কঠোর প্রত্যাখ্যানভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন, এ বাক্যও তাহার অংশ স্বরূপ। —কি সুন্দর উত্তর। কি সুন্দর ব্যাখ্যা!—উত্তর পাইয়া প্রশ্নকর্ত্তা কবিকে মনে মনে শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, নিজের ক্ষুদ্রত্ব বুঝিলেন। "আমার মন কলুষিত হইয়াছে" —এই কয়টি কথা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছিলেন পরবর্ত্তী সংস্করণে এই কয়েকটি কথা উঠাইয়া দিবেন। কোন সংস্করণে কথাকয়টী পরিত্যক্ত হইয়াছিল কি না জানি না। বসুমতীর সংস্করণ, যাহা দেখিয়া এই সমালোচনা লিখিত হইল, তাহাতে দেখা গেল কথাকয়টী পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। কবি হয় ত দ্বিতীয় চিন্তার পর না উঠানই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। কবি হয়ত বিশ্বাস করিতেন মনুষ্য মন প্রেমের প্রভাবকে প্রতিহত করিতে পারে না। প্রতাপ পারিলে তাঁহাকে অতি-মানুষিক করিয়া চিত্রিত করা হইত; তাহা কবির অভিপ্রেত ছিল না। কেবল তাহাই নহে। কথা কয়টী বোধ হয় অন্য কারণেও তিনি অপরিহার্য্য মনে করিয়াছিলেন। সমাজধর্ম্মের নিকট অন্যের কল্যাণের জন্য প্রতাপ আত্ম-বলিদান করিয়াছিলেন; মন কলুষিত না হইলে সে বলিদানের প্রয়োজন বোধ করিতেন না, লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার এই অসাধারণ মহত্বও প্রতিপালিত হইত না, সুতরাং প্রতাপ যে মানুষ ছিলেন এবং অসাধারণ ধর্ম্মবীর ছিলেন এতদুভয়-প্রদর্শনার্থই শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার মন কলুষিত হইয়াছিল বলিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাভারত।*

ইতিহ বা ইতিবৃত্ত

মহাভারত যে ইতিহাস ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইতিহ (Myth) পূর্ণ বলিয়া প্রাচীন ভারতে মহাভারত ইতিহাস † নাম পাইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্য-শাখার সমগ্র জাতীয় ইতিহ মালা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত। পৌরাণিক ভারতে এই ইতিহ মালা খাঁটী ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে অনেকের মনে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দূরীভূত

* মিলনীতে পঠিত।

† ইতিহঃ এবং আসীৎ ইতি যঃ উচ্যতে সঃ ইতিহাসঃ। নিরুক্ত ২।৩।১

যস্মিন্ উদাহরণঃ লক্ষ্যতে তত্র ইতিহাসং আচক্ষতে আচার্য্যাঃ। ঐ

হইতেছে। ভগীরথের স্তবে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে গঙ্গাদেবীর পতন উপাখ্যান এখন অনেকেই কাল্পনিক গল্প ভিন্ন সত্য আখ্যান বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করেন না। গরুড় কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে মর্ত্তে অমৃত আনয়ন উপাখ্যান এখন আর কেহ খাঁটী উপকথা ভিন্ন পুরাবৃত্ত বলিয়া মনে মনে ধারণা করেন না। দেব সেনাপতি কুমারের জন্ম ও তৎ কর্ত্তৃক মহিষাসুর ওরফে তারকাসুর নিধন উপাখ্যান, দেব পুরোহিত ত্রিশিরা বিশ্বরূপের হত্যা ব্যাপার, বিরোচন সুত বলির স্বর্গচ্যুতি, বলির মস্তকে বামন দেবের আরোহণ, নহুষ রাজের স্বর্গ সিংহাসন প্রাপ্তি এবং অগস্ত্য শাপে নহুষের সর্প রূপ ধারণ, এবং যুধিষ্ঠির দর্শনে শাপ বিমোচন ইত্যাদি ইত্যাদি অমানুষিক কাণ্ড ভিন্ন পুরাবৃত্ত বা ইতিবৃত্ত বলিয়া আর বড় কাহারও মনের ধারণা নাই। এ সকল জ্যোতিষিক ইতিহ মহাভারতের শাখা প্রশাখা মাত্র। এই সকল শাখা প্রশাখা পরিবেষ্টিত মূল কাণ্ডটী অর্থাৎ কুরু পাণ্ডবের উপাখ্যান ইতিহ বা ইতিবৃত্ত এই তর্কের মীমাংসা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মৎস্য গর্ভে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী ওরফে কালীর জন্ম, গঙ্গাদেবীর গর্ভে মহাব্রত ওরফে ভীষ্ম দেবের জন্ম, গান্ধারীর মাংস পিণ্ড প্রসব, ঐ মাংস পিণ্ডের একাধিক শত খণ্ড দ্বিসহস্র বর্ষ কাল কুম্ভগর্ভে অবস্থিতির পর দুর্য্যোধনাদি রূপে পরিণতি, পৃথিবীর সূর্য্য সমাগম, এবং তৎক্ষণাৎ বসুষেনের জন্ম, সবর্ম্ম-কুণ্ডল বসুষেনের ভূমিষ্ঠ ব্যাপার, দ্রোণ মধ্যে অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্যের জন্ম, শরস্তম্ভে কৃপ কৃপীর উদ্ভব, যম পবন ইন্দ্র দেব ত্রয়ের ঔরসে যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম, যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব, যুধিষ্ঠিরের তিরোভাব ইত্যাদি ইত্যাদি কাণ্ড নিসর্গাতীত বা অমানুষিক, সুতরাং সাধারণের বিশ্বাসের সীমার বাহিরে পড়িয়াছে।

হিন্দু বেশ জানেন যে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেব মূর্ত্তি সকল কল্পনা মাত্র। কিন্তু মজ্জাগত কুসংস্কার বশে হিন্দু বলেন যখন অসুর বিনাশার্থে ঝাঁকে ঝাঁকে দেবগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন তখন তাঁহাদের

যেখানে উদাহরণ আছে সেই খানেই ইতিহাস; আচার্য্যগণের এই মত।

যথা—

সায়নাচার্য্য ধৃত যাস্ক বচন।

বৃত্র সংহার উপাখ্যানে,

"কোঽয়ং বৃত্রঃ মেঘঃ ইতি নৈরুক্তাঃ ত্বাষ্ট্রঃ অসুরঃ ইতি ঐতিহাসিকাঃ

অর্থ—

এই বৃত্র কে? নিরুক্তকারগণ বলেন—মেঘ। ঐতিহাসিকগণ বলেন ত্বষ্টার পুত্র অসুর বিশেষ

মন্তব্যঃ—সাধুভাষায় ইতিবৃত্ত অর্থে ইতিহাস শব্দের যে ব্যবহার চলিত হইয়াছে এই অভিনব অর্থ—প্রাচীন ভারতে বিদিত ছিল না।

পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই সকলই সম্ভবপর। দেবগণ নিসর্গের অধীন নহেন সুতরাং তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম মরণ অমানুষিক হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। এই অবতারবাদিগণ তাঁহাদের বিশ্বাস সচ্ছন্দে ভোগ করুন তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার দরকার নাই। কারণ ঐতিহাসিকবর ব্যাসদেব স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন যে "দেবগণ স্বর্গে তবে ক্রীড়ার্থে মর্ত্তে আনীত মাত্র।" *

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই এই অবতারত্বের তর্ক করিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা বলেন মহাভারতের বীরগণের প্রতাপ বর্দ্ধন মানসে সত্য ব্যাপারের সহিত অনেক অনৈসর্গিক অতিশয়োক্তি মিশ্রিত করা হইয়াছে। মূল ব্যাপারটী খাঁটী ইতিবৃত্ত বটে।

মহাকবি বৃদ্ধ ব্যাসের মাথায় এই কবি কুল বিগর্হিত অতিশয়োক্তির বোঝা চাপাইয়া দিয়া যাঁহারা ইতিহকে ইতিবৃত্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহেন আমরা তাঁহাদের এই "আধা সাঁচ্চা আধা ঝুটা" মতের বিরোধী।

এই শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রোমকীয় ও গ্রীসীয় ইতিহাস (ইতিহ পূর্ণ গ্রন্থ) পাঠ করেন তখন তাহার উচিত অর্থ গ্রহণে বেশ পটুতা দেখান। কিন্তু যখন দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের ইতিহাস মহাভারত পাঠ করেন তখন বাংলার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি কথা তাঁহাদের মনে পড়ে অমনি জাতিগত অন্ধ বিশ্বাসের স্রোতে নির্ম্মল বিচার শক্তি নিমগ্ন হয়।

বৃহস্পতি গ্রহরাজ শনিকে রাজ্যচ্যুত করেন এই জ্যোতিষিক ইতিহ আর্য্য জাতির সাধারণ ইতিহ ভাণ্ডারের ধন।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই প্রাচীনতম ইতিহকে কেন্দ্রে রাখিয়া ভারত শাখার ইতিহ মালায় ইহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। এই মহাকাব্য হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত হয়।

সাধকের হিতার্থে পরম ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। যথা ইন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি। কল্পনা প্রসূত দেবগণ কল্পনা বলে এক এক নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।† যথা—সূর্য্যে নারায়ণ, মঙ্গলে কাম, শুক্রে উশনা ইত্যাদি। আবার কল্পনা বলে এই নক্ষত্রাধিষ্ঠিত দেবগণকে মানব-রূপে মর্ত্তে আনিয়া এই মহাকাব্যে এই প্রাচীনতম ইতিহ অভিনীত হইয়াছে। এই জন্যই এই দেব লীলার সহিত হিন্দুধর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ। নতুবা মানব সমর কীর্ত্তন হিন্দুর গৃহে স্থান পাইতে পারিত ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে।

কালবশে যখন মাধবীয় ভাষ্যের তারাহীন যাজ্ঞিক চক্ষুতে পড়িয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

* দিবি দেবাঃ মহীপাল !
ক্রীড়ার্থং অবনিং গতাঃ।
মহাভারত

† দেব গৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি—
তৈঃ ব্রাঃ

পরিব্যাপক মহান্। দেব সোমপবমান (সোম ধারা) সোম রসের ক্ষুদ্র ঝিরণীতে অবনত হইয়াছে, এবং অতিশয়োক্তির অপবাদে উদার বেদ মন্ত্র "চাষার গান" বলিয়া সর্ব্বত্র অনাদৃত হইতেছে, তখন এই মহান দেবাসুর সমর (গ্রহ যুদ্ধ) ক্ষুদ্র মানব সমরে অভিনীত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

কৌরব বীরগণের চরিত্রে যদি কুগ্রহ-গণের এবং পাণ্ডব বীরগণের চরিত্রে যদি সুগ্রহগণের গুণাগুণ স্পষ্ট উপলক্ষিত না হয় তবে ইতিবৃত্তবাদিগণ অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইলে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকে না।

কৌরব বীরগণের চরিত্রে যদি কুগ্রহ-গণের গুণাগুণ পূর্ণ প্রকাশ পায় এবং পাণ্ডব বীরগণের চরিত্রে যদি সুগ্রহগণের গুণাগুণ পূর্ণ প্রকাশ পায় তবে এই মহাকাব্য জ্যোতিবিক ইতিহ বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দেবলীলা অশিক্ষিত জনগণের সুবোধ্য করিবার জন্য দেবগণে জন্ম মরণ আদি মানবতা আরোপ করিলে দেবলীলা ওরফে ইতিহ ইতিবৃত্ত হয় না, এবং মানব লীলার মহিমা বৃদ্ধির জন্য মানবে কবিকুল বিগর্হিত অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করিলে মানব দেবতা হয় না। দেব ও মানব চরিত্র আশমান্ জমিন্ ফারাক্ এ দুয়ের অন্তর বিচক্ষণ পণ্ডিতের অবোধ্য থাকিবার নহে

শনি বৃহস্পতি সমরের ইতিহ গ্রীসে ও রোমকে বিলক্ষণ জনপ্রিয় ছিল এবং ঋক্ বেদে এই সমরের উল্লেখ আছে।

(ঋঃ বেঃ ১০।৬১।৫—৬)

ভারতের উর্ব্বরা কল্পনা ক্ষেত্রে এই প্রাচীন দেব চরিত বিশেষ পরিবর্দ্ধন পরি-পোষণ এবং লোকরঞ্জক মানবতা লাভ করিয়াছিল! অবশেষে ব্যাস হস্তে চরম প্রবীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। *

পাশ্চাত্য ইতিহ মতে এই দেব সমরে টাইটনগণ (ঋঃ বেঃ ত্রৈতন) গ্রহ রাজ † শনির পক্ষ অবলম্বন করেন। বৃহস্পতি ত্রৈতনগণকে পরাস্ত করিয়া গ্রহরাজকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন। এবং ভ্রাতৃত্রয় বৃহস্পতি (Jupiter) ঝটিকা-সহচর জলদেব নেপচুন (Neptune) এবং যম (Pluto) বিশ্বরাজ্য বিভাগমতে অধিকার করেন। ত্রৈতন শ্রেষ্ঠ চিরণ প্রিয় শিষ্য হরিকেশের (Herculis) হস্তে দৈবাৎ নিহত হইলে বৃহস্পতি তাহার দেহ রাশি-চক্রে ধনু রাশি রূপে স্থাপিত করেন।

ভারতীয় ইতিহ মতে পৃথার পুত্রত্রয় যম বায়ু এবং বৃহস্পতি ইন্দ্রের সন্তান যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন রাজা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রাদির পরিবর্ত্তে তাহাদের সন্তান কল্পনা কেবল মানবতা আরোপের উদ্দেশ্যে হইয়াছে মাত্র।

আমরা এক্ষণে এক এক করিয়া কুরু ক্ষেত্রের বীরগণের চরিত্র বিবৃত করিব।

* পালি ভাষায় লিখিত একখানি মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের নাম নাই।

† গ্রীক্ ভাষায় শনির নাম ক্রোনস্ (Kronos) এবং ক্রোনস্ (Chronos) শব্দের অর্থ কাল বা সময়।

চরিত্র গুলিতে মানবত্ব বা দেবত্ব উপলক্ষিত হওয়ার বিচারের ভার কুসংস্কার বিহীন বিচক্ষণ পাঠকের হস্তে ন্যস্ত রহিল

শনি—দুর্য্যোধন।—

দুর্য্যোধনের চরিত্রে যে গুলি বিশেষত্ব আছে তাহা এই :—

১। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে আবৃত নয়না গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনের জন্ম হয়।

২। ব্যাসদেব গান্ধারীকে শত পুত্র লাভের বর প্রদান করেন। গান্ধারী এক মাংস পিণ্ড প্রসব করেন। ঐ মাংস পিণ্ড শত খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং তাহা শত ঘৃত কুম্ভে রক্ষিত এবং ঐ শত খণ্ড হইতে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। এবং পিণ্ডাবশিষ্ট হইতে কন্যা দুঃশলার জন্ম হয়। এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসু জন্মে।

৩। দুর্য্যোধনের রথধ্বজ চিহ্ন নাগ(ক);

৪। দুর্য্যোধন কর্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত;

৫। দুর্য্যোধনের মন্ত্রী মাতুল শকুনি;

৬। দুর্য্যোধন ক্রুর ও নৃশংস কিন্তু অতিশয় প্রজাপ্রিয়;

৭। মায়া বলে দুর্য্যোধন হ্রদ জলে নিমগ্ন থাকিতে পারে;

৮। যুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন হয় এবং দুর্য্যোধন খঞ্জ হয়;

৯। কলি দুর্য্যোধন রূপে জন্মগ্রহণ করেন (মহা ৬৩)

১০। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বনবাসী ও রাজ্য ভ্রষ্ট এবং অজ্ঞাতবাসী করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধনের চরিত্র বুঝিতে হইলে শনি গ্রহের জ্যোতিষ্ক তত্ত্ব ও ইতিহাস সকল বেশ স্মরণ রাখিতে হয় :-

১। ফিনীসিয় ইতিহ মতে তমঃ ওরফে অহি এবং তৎপত্নী নিশা বিশ্ব রাজ্য অধিকার করিয়া ছিল।(খ) তৎপরে শনির রাজত্ব আরম্ভ হয়।

২। জ্যোতিষ্কগণের মতে মকর রাশি ও কুম্ভ রাশি খঞ্জ—ওরফে শনির গৃহ দ্বয়। মকরাসুর মায়া বলে সমুদ্রে লুক্কায়িত হয় * শততারকাময় শতভিষা নক্ষত্রই রাশি চক্রের কুম্ভরাশি। কুম্ভরাশি শীর্ষোদয় চরণ রহিত†।

৩। শনির নাম গ্রহরাজ খঞ্জ ‡ এবং গৃধ্র বাহন ইত্যাদি। এবং শনি ছায়াসুত।

৪। সিংহাসন গত শনিকে পণ্ডিতগণ রাহু বলেন §।

৫। শনি এবং মঙ্গল এই দুইটি গ্রহ জ্যোতিষ্কগণের মতে কুগ্রহ।

৬। শনির অধিদেবতা যম এবং প্রত্যভিদেবতা প্রজাপতি ¶

শনির কোপে নলরাজ শ্রীবৎসরাজ

(ক) মহান্ দুর্য্যোধনস্তআসীৎ নাগঃ মণিময়ঃ ধ্বজঃ। মহা ৬ ১৭

(খ) সুতরাং তমঃ ই ধৃত—রাষ্ট্র

* পদ্মপুরাণ উত্তর ৯২।

† সঃ তু শীর্ষোদয়ঃ চরণ রহিতঃ।—ষাতি জ্যোতিষং

‡ গ্রহ পঞ্চকের মধ্যে শনিগ্রহের মন্দ গতি। এজন্য শনির নাম মন্দ ও খঞ্জ।

§ সিংহাসনগতঃ কৃষ্ণঃ রাহুঃ ধীরৈঃ প্রচক্ষতে। কাঃ পুঃ ৮১

¶ যমাধিদৈবতং প্রজা-পতিপ্রত্যভিদৈবতং।

রাজ্য ভ্রষ্ট ও বনবাসী হইয়াছিলেন এবং বিকু বৎসরেক অজ্ঞাতবাসী ছিলেন।

পাঠক তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন যে—শনির চরিত্র দুর্য্যোধনে পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে।

১। দুঃশলা সমন্বিত ভ্রাতৃশত পরিবেষ্টিত ঘৃত কুম্ভ জাত দুর্য্যোধন শতভিষা নক্ষত্র সমন্বিত কুম্ভ রাশিস্থ শত তারক মধ্যস্থিত শনি গ্রহের প্রতিবিম্ব মাত্র।

২। সিংহাসন গত রাজা দুর্য্যোধনের রথধ্বজ সর্পচিহ্নে সুশোভিত। গৃধ্রবাহনের শকুনি দুর্য্যোধনের মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত।

স্বর্গ সেনাপতি মঙ্গল (Mars) কর্ণরূপে গ্রহরাজের সখা হইয়া—কুগ্রহদ্বয়ের সংযোগ হইয়াছে; মকর রাশিনিবাসী গ্রহরাজ মায়া বলে হ্রদ জলে নিমগ্ন থাকিবে তাহা বিচিত্র কি ?

৩। খঞ্জত্ব শনির প্রধান লক্ষণ। মহা কবি ঐতিহাসিকবর মহর্ষি অতি চতুরতার সহিত দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গে খঞ্জত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্রমশ

তারাদর্শক।*

ব্যাকটিরিয়া

অস্ত্র প্রয়োগের পর কোনরূপ প্রতি-বিধান না লইলে বাহিরের ব্যাকটিরিয়া ক্ষতমুখে প্রবেশ করিয়া সময়ে সময়ে ক্ষতকে ভীষণতর করিয়া অকস্মাৎ রোগীর প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত করিয়া তোলে। কিন্তু এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত মানব সমাজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রক্ত দূষণের পরে, সামান্য ক্ষত অল্পকালের মধ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে দেখিয়া অস্ত্র চিকিৎসকগণ ক্রমশঃ সিদ্ধান্ত করিলেন বাহিরের ময়লা ও জঞ্জাল কোনো প্রকারে ক্ষতে প্রবেশ করিয়া খুব সম্ভবতঃ এই ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্যাকটিরিয়া অথবা অন্য কিছু ইহার কারণ কি না, তখনও অবশ্য সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তখন হইতে জঞ্জাল ও ময়লা দূর করিবার জন্য তাঁহারা কার্ব্বলিক এসিডের সলিউসন্ উত্তাপ প্রভৃতি যে সকল ঔষধাদির ব্যবহার আরম্ভ করিলেন তাহাতে ব্যাকটিরিয়া মরিতে লাগিল এবং অস্ত্র চিকিৎসাজনিত মৃত্যুসংখ্যাও কমিয়া আসিল।

রেশমের ব্যবসায়ে ফ্রান্স বহুদিন হইতে বিখ্যাত। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা যে ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহাতে সকলেই আশা করিতেছিলেন শীঘ্রই ইহা ফরাসী

* লেখক মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য থাকিবে ভরসা করি ইহা কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু লেখক মহাশয়ের গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয়, অনেক নূতন তত্ত্ব আছে, বলিয়া সাদরে আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। বঃ সঃ

জাতির সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে। ১৮৬৫ খৃঃ অঃ হঠাৎ গুটিপোকাদের মধ্যে এক মহামারী দেখা গেল—অল্প দিনের মধ্যে রোগ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া যে ভাবে গুটিপোকার বংশ ধ্বংশ করিতে লাগিল তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ প্রমাদ গণিলেন।—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই মারীর ফলে এক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের রেশমের ব্যবসায়ে ছয় কোটী টাকা লোকসান হইয়া গেল। গভর্মেণ্ট দেশ বিদেশের সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণকে ইহার কারণ নির্ণয়ে নিযুক্ত করিয়াও কোনো ফল পাইলেন না। অবশেষে কৃষি-সচিবের অনুরোধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তর (Pasteur) এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তখন তাঁহার বিশেষ কোনোই জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা ও আবিষ্কারের ফলে তখনই তাঁহার নাম বৈজ্ঞানিক সমাজে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। পাস্তর পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াই এই রোগে মৃত গুটিপোকার স্নায়ু পেশী প্রভৃতিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক গুটিকা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকের দৃষ্টিই এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া কেহই আবশ্যক মনে করেন নাই। পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত পরীক্ষার পর পাস্তর প্রমাণ করিলেন এই সকল গুটিকা বাস্তব পক্ষে জীবিত ব্যাকটিরিয়ার স্তূপ মাত্র। কি ভাবে ইহারা নিজেদের বংশবিস্তার করে, বাড়িয়া উঠে, ক্রমে কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। সংক্রামিত রেশম গুটিকার সহিত নীরোগ গুটিকার প্রভেদ কোথায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে ক্রমশঃ তিনি তাহাও আবিষ্কার করিলেন। চির দিন যেমন হইয়া থাকে এই অভিনব আবিষ্কারে কেহই কোনো আস্থা স্থাপন করিল না, বৈজ্ঞানিক-দিগের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন! অবশেষে অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস ভঞ্জন করিবার জন্য তিনি ব্যাকটিরিয়া সংক্রামিত কতকগুলি রেশমের গুটিকার অণ্ড নির্ব্বাচন করিলেন। ১৮৬৭ সালে এই সকল ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পর ইহাদের সকলেই কেমন করিয়া কি ভাবে Pebriue রোগে প্রাণ ত্যাগ করিবে ১৮৬৬ সালে তাহা লিখিয়া শীল মোহর দিয়া তিনি গর্ভমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে দেখা গেল পাস্তরের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। তখন আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। পাস্তরের কথা মত ব্যাকটিরিয়া-সংক্রামিত গুটিকা ও অণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিয়া সুধু নীরোগ গুটিকার অণ্ড ব্যবহার করায় অল্প দিনেই আবার ফ্রান্স আপনার রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধার করিল।

মানুষের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর ইহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ফরাসী পাস্তরের এই সকল আবিষ্কার ও পরীক্ষায় উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ বৈজ্ঞানিক লিষ্টার অস্ত্র চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। ধূলার সহিত বাতাসে ব্যাকটিরিয়া উড়িয়া আসিয়া ক্ষতে প্রবেশ করে এবং তাহা হইতেই রক্ত দুষিত হইয়া উঠে সন্দেহ করিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহার পরামর্শে অস্ত্র চিকিৎসার সময় অস্ত্র-কারকের হস্তের আশে পাশে কার্ব্বলিক

এসিড ছড়াইবার এবং ব্যাণ্ডেজ অস্ত্র প্রভৃতিকে ব্যাকটিরিয়া হইতে মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল অস্ত্র চিকিৎসা জনিত মৃত্যু আশ্চর্য্যরূপ কমিয়া গেছে।

কিন্তু কোন্ ব্যাকটিরিয়াকে দূরে রাখিবার জন্য এই উদ্যোগ আয়োজন, তখনও কেহ তাহা জানিতেন না। মানুষ ও জন্তুর উপর ধৈর্য্যের সহিত বহু বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা চালাইবার পর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জানা গিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুধু দুই প্রকারের (Species) ব্যাকটিরিয়াই এ সম্বন্ধে যত অনিষ্টের মূল।

এই দুই ব্যাকটিরিয়াই গোলাকৃতি—বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই আকারের ব্যাক-টিরিয়ার নাম মাইক্রোককসি (Micrococci) ইহাদের উভয়ের বাড়িয়া উঠিবার প্রণালী বিভিন্ন—একজন নিজেকে ভাগ করিয়া শিকলের মত বাড়িতে থাকে, অন্যান্য ব্যাকটিরিয়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হয় না, অন্যটিকে বাড়িয়া উঠিবার পর দ্রাক্ষা গুচ্ছের মত দেখায়। ইহাদের প্রথমোক্তের নাম ষ্ট্রেপ্‌টোককস্ (Strepto cocus) এবং শেষোক্তের নাম ষ্টাফিলোককস্ (Staphylococus).

অস্ত্রচিকিৎসা কিম্বা সামান্য কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ যে সকল ক্ষত ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিত, তাহাদের পুঁজ সংগ্রহ করিয়া অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এই ধরণের সকল ক্ষততেই ষ্ট্রেপ্টোককস অথবা ষ্টাফিলোককস (অনেক ক্ষেত্রে উভয় বিধ) ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্ব দেখা গেল। জনবহুল স্থানে, বিশেষতঃ অপরিষ্কৃত অথবা পীড়িত ব্যক্তিদের বাসস্থানের বাতাসের ধূলার সহিত, ঘরের মেঝের কাপড় প্রভৃতি পরীক্ষা করিলে দেখা গেল এই দুই প্রকারের ব্যাকটিরিয়া সেখানেও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।—যে ক্ষত প্রায় সারিয়া আসিয়াছে তাহাতে খুব সাবধানে এই ব্যাকটিরিয়ার একটি কলোসি প্রবেশ করাইলে দেখা গেল ক্ষত স্থান দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠে, কিন্তু অন্যান্য প্রকারের ব্যাকটিরিয়া ক্ষতে প্রবেশ করিলে কোনোই ক্ষতি হয় না। এইরূপে এই প্রকারের ব্যাকটিরিয়াই যে 'রক্ত দূষণে'র কারণ বহুবিধ পরীক্ষার পর চিকিৎসক সমাজে সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই রহিল না।

কিন্তু ব্যাকটিরিয়া কি করিয়া ক্ষত স্থান আক্রমণ করে?—আমাদের শরীরের প্রায় সমস্ত জীবকোষ সমষ্টিই কোনো না কোনো বিশেষ কর্ত্তব্যের জন্য বিশেষ ভাবে গঠিত, কেবলমাত্র কতকগুলি সুধু পূর্ব্বের সেই আদিম অবস্থাতেই থাকিয়া গিয়াছে। এইরূপ (un-organized?) অগঠিত জীব কোষ-দিগের মধ্যে একটি বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহারা রক্তের শ্বেত কোষ অথবা 'লিউ কোসাইটস্' (Leucocytes) নামে পরিচিত। সাধারণতঃ ইহারা লোহিত রক্ত কোষের সহিত শিরা উপশিরার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে থাকে, কখনও বা কায়ক্লেশে রক্তশিরার বাহিরে আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী (tissue (?)) র চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কি যে তাহাদের কর্ত্তব্য আজও তাহা নিসংশয় রূপে কেহ

ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই, খুব সম্ভবতঃ শরীরের ভিতরে ইহারা আংশিকভাবে মিউনিসিপ্যালিটির সহঃ-সভাপতি ও চৌকিদারের কাজ করিয়া থাকে।—শরীরের অভ্যন্তরে বাহির অথবা ভিতরের কোনো জঞ্জাল দেখিলেই ইহারা তাহাকে নিজেদের শরীর দিয়া বেষ্টন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, কখনও বা যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া আসে

কিন্তু কোথাও কিছু কাটিয়া কুটিয়া কোনো প্রকারে শরীর ক্ষত হইলেই আবশ্যক অনুসারে অল্প বিস্তর লিউকোসাইটের দল তৎক্ষণাৎ সমস্ত কাজ ছাড়িয়া সেই দিকে ছুটিয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আশপাশের রক্তশিরার সাহায্যে ক্ষতের চারিদিক হইতে মাংস, পেশী প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে থাকে। কখন কখনও রক্তের শ্বেতকোষ অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষতের চতুর্দ্দিকে আসিয়া জড় হয় এবং পূজের আকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে থাকে।

শরীরের ভিতরকার উত্তাপ, রক্ত প্রভৃতি সমস্তই ব্যাধিকর ব্যাকটিয়ার জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সুতরাং বাহির হইতে এইরূপ কোনো ব্যাকটিরিয়া কোনো প্রকারে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। এই বৃদ্ধির ফলে অল্প পরিমাণে 'টোমেন্' উৎপন্ন হইয়া যে মুহূর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী (tissues of the body ?) মাংস পেশী প্রভৃতিকে বিষাক্ত করিতে আরম্ভ করে সেই মুহূর্ত্তে লিউকোসাইটের দল চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ব্যাকটিরিয়ার দলকে আক্রমণ করে কখনও ইহারা ব্যাকটিরিয়ার দলকে সশরীরে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে কখনও বা সকলে মিলিয়া ব্যাকটিরিয়া সমষ্টিকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরে, যে খাদ্য অক্সিজেনের অভাবে তাহারা ইহলীলা সংবরণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে কোনো ক্রমে ব্যাকটিরিয়া সবংশে নিঃশেষ হইয়া গেলে শরীর ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার পায়। কিন্তু কোনো প্রকারে ব্যাকটিরিয়ার দল না মরিলে ক্রমাগতই বাড়িয়া উঠিয়া যে বিষ উৎপন্ন করিতে থাকে তাহাতে লিউকোসাইটের দল ক্ষতের চতুপার্শ্বে শত্রুকে আক্রমণ করিতে আসিয়া ক্রমাগত মরিতে থাকে এবং শরীরে বিস্ফোটক প্রভৃতি দেখা দেয়। কখনও বা ব্যাকটিরিয়ার দল রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করিয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইতে থাকে এবং শরীরের যেখানেই তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানেই এক নূতন বিস্ফোটক দেখা দেয়। রক্ত দূষণের এই অবস্থাকেই চিকিৎসকগণ অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন।

কখনও বা এমনও হয় যে শরীরের কোনো একস্থানে নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া ব্যাকটিরিয়ার দল বিপুল বেগে বাড়িয়া উঠিতে থাকে এবং এইরূপে যে প্রচুর পরিমাণ টোমেন বিষের সৃষ্টি হয়, রক্ত প্রবাহে মিশিয়া তাহাই শরীরের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তকে পর্য্যন্ত বিকল করিয়া তোলে। ব্যাধিজনক এই সকল ব্যাকটিরিয়া প্রতিনিয়তই আমাদের শরীরের সংস্পর্শে আসিতেছে, কিন্তু কাটা কিম্বা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতের ভিতর দিয়া রক্ত স্রোতে

প্রবেশ করিতে না পারিলে ইহাদের অধিকাংশই শরীরের কোনো ক্ষতিই করিতে পারে না।

পৃথিবীতে যতলোক অকালে মরে তাহাদের সাতভাগের একভাগের মৃত্যুর কারণ যে ক্ষয় কাশ বা Consumption, সমস্ত পৃথিবীর সেনসস রির্পোট ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।—কিন্তু এই ভীষণ রোগের যথার্থ কারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কেহ কিছু জানিত না। চিকিৎসকেরা এ রোগে রোগীর রক্ষা পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই জানিয়াও সুধু আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনার জন্যই চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ আর চিকিৎসকগণ ইহাকে অসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। এখন আমরা জানি, নিতান্ত ক্ষুদ্র (Rod-shaped?) দাঁড়ির মত একপ্রকারের ব্যাকটিরিয়া কোনো ক্রমে শরীরে প্রবেশ করিয়া এই ভয়াবহ রোগের সূচনা করিয়া থাকে—ইহারা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনো প্রকারের কোনো ব্যাকটিরিয়ারই ক্ষয় কাশ জন্মাইবার সামর্থ্য নাই।— অবস্থা অনুকূল হইলে শরীরে প্রবেশ করিয়া ইহারা বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমশঃ ইহাদের চতুপার্শ্বে ছোট ছোট মাংস পিণ্ড জমাট বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। সাধারণত ফুস ফুসেই এ রোগ দেখা গেলেও কোনো একস্থানে ইহা সীমাবদ্ধ নহে, শরীরের যে কোনো স্থান ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

ক্ষয়কাশের আক্রমণ সকলের পক্ষেই সমান ভয়ঙ্কর নহে, কেহ বা ইহাদের আক্রমণ হইতে সহজেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, কেহ অত্যন্ত সামান্য কারণে পীড়িত হয়। ক্ষয়কাশ পীড়িতদের সন্তান সন্ততিদের অত্যন্ত সহজেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ আজও ঠিকমত জানা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন ক্ষয়কাশ ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে পিতামাতার শরীরের এই ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া আসে, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এ দুর্ব্বলতা সন্তান সন্ততিদের মধ্যে আসিয়াও সঞ্চারিত হয়। যাহাই হউক ক্ষয়কাশ ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করিতে না পাইলে এ সকল স্থলেও যে আপনা আপনি রোগ দেখা দেয় না, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইয়া গেছে।

টিউবার কিলোসিসের ক্ষয়কালে প্রথম অবস্থায় রোগ কখন কখনও অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে থাকে, এমন কি ব্যাধি অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেও অনেক সময়ে বাহিরে তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। এ রোগের ভয়ঙ্করত্ব এই খানেই।

গোজাতির মধ্যে এ রোগ অনেক দেশেই অত্যন্ত প্রবল, দুগ্ধ ও মাংসের সহিত ব্যাসিলস্ টিউবার কিলোসিস Basiles Tuber culosis মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্ষয়কাশ উৎপন্ন করিতে পারে সে সম্বন্ধে এখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সৌভাগ্যক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপও ইহাদের পক্ষে মারাত্মক। আমাদের দেশে রীতিমত জ্বাল দিয়া দুগ্ধ ব্যবহার করা হয়, এবং কাঁচা অথবা অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস ব্যবহারেরও

রীতি নাই সুতরাং এদিক দিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা খুবই কম।

বস্তুত পাকস্থলীতে কোনো দেশেই ক্ষয়কাশ সচরাচর দেখা যায় না, শ্বাস প্রশ্বাসে ধূলার সহিত ব্যাকটিরিয়া ফুস ফুসে প্রবেশ করিয়াই সাধারণত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যাকটিরিয়া ফুস ফুসে প্রবেশ করিয়া বংশবৃদ্ধি আরম্ভ করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড তাহার চতুর্দ্দিকে গজাইয়া উঠিতে থাকে, রক্তাভাবে শীঘ্রই তাহারা মরিয়া যায় এবং তাহার পর শুষ্ক অবস্থায় কফের সহিত শরীরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড অজস্র জীবিত টিউবারকিলোসিস ব্যাসিলেসে পরিপূর্ণ। কিন্তু যতক্ষণ ইহারা কোনো প্রকারে সিক্ত থাকে ততক্ষণ বাতাস তাহাদের উড়াইয়া ফিরিতে পারে না। এইজন্যই ক্ষয়কাশ রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসে ক্ষয়কাশের ব্যাকটিরিয়া দেখা যায় না।—কিন্তু একবার এই মাংসপিণ্ড বাহিরে আসিবার পর শুখাইয়া খড় খড়ে হইয়া উঠিলেই সহস্র কণায় বিভক্ত হইয়া বাতাসের জোরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে এক রুগ্নের নিষ্ঠীবন হইতে ব্যাকটিরিয়া অন্যের ফুস ফুসে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় বলিয়াই রোগের প্রবাহ অক্ষুন্ন ভাবে চলিতে থাকে।

এইরূপে ক্ষয়কাশের প্রকৃত প্রকৃতি অবগত হইবার পর চিকিৎসকগণ সহজেই আজ ইহার সহিত সংগ্রাম করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন। এখন আর অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিবার প্রয়োজন হয় না, অনুবীক্ষণের সাহায্যে নিষ্ঠীবন পরীক্ষা করিয়া রোগের যথাযথ অবস্থা যে কেহ আজ নির্দ্ধারণ করিতে পারে। এবং অবস্থা নির্দ্ধারিত হইলে ব্যবস্থার নির্দ্ধারণও তত কঠিন হয় না।

কলেরা অথবা ওলাউঠা সম্বন্ধেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেহই কিছু জানিত না। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে খণ্ড খণ্ড বাঁকানো সূতার মত দেখিতে এক প্রকারের ব্যাসিলসই এই ভীষণ মহামারীর কারণ। ইহারা পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে কোনো প্রকারে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে অশ্রান্ত দ্রুতবেগে সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিয়া টোমেনের সৃষ্টি করিতে থাকে এবং দুই চারি দিন, এমন কি অনেক সময়েই দুই চারি ঘণ্টাতেই সমস্ত শরীর এই বিষে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সকলেই জানেন রোগের বিশেষ এক অবস্থায় শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ইহারা বাহির হইতে থাকে এবং এই অবস্থায় জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকিলে শরীরের বাহিরে বহুদিন পর্য্যন্ত জীবন ধারণ এমন কি অবিশ্রাম বংশবৃদ্ধিও ইহাদের পক্ষে কঠিন নহে। জলের মধ্যেও অনেক দিন ইহারা বাঁচিয়া থাকে, এবং ভিজা কাপড়, ফল ও শাক সবজির জলীয় উপরিভাগ আশ্রয় করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

বিশেষ প্রকারের এই একটি মাত্র ব্যাকটিরিয়াই কলেরার কারণ এক রোগীর শরীর হইতে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অন্যের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়াই ইহারা রোগের সৃষ্টি করিতে থাকে।—কয়েক ঘণ্টা

রীতিমত শুকাইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে বস্ত্রাদিস্থিত সমস্ত কলেরা ব্যাসিলসই নিঃশেষে মরিয়া যায়, কার্ব্বলিক এসিড অথবা করোসিভ সবলিমেট (corrosive sublemate) প্রয়োগ করিয়া পুরীষ প্রভৃতির ব্যাসিলসও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা কিছুমাত্র কঠিন নহে।—সে বেশী দিনের কথা নহে—জাহাজের নাবিক প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কলেরা ব্যাসিলস ইউনাইটেড ষ্টেটসেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।—আমাদের দেশের মতই কিছু দিন ধরিয়া ওলাউঠা এখানে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞান উদ্যম ও অর্থের সাহায্যে মার্কিনবাসীরা আজ কলেরা ব্যাসিলসকে একেবারে দেশ ছাড়া করিয়া দিয়াছে। এ দেশে এখন কলেরার নামও. শোনা যায় না।—মূঢ়ের মত আজও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া যে আমরা রোগের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাহা এ দেশের লোকের বুদ্ধির অগম্য।

ব্যাধির প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় শরীরের অবস্থান্তরের সহিত রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শরীরের এক অবস্থায় যে রোগ শত চেষ্টাতেও তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না, অন্য অবস্থায় সহজেই শরীর তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়ে। অত্যাহার অনাহার অথবা কদাহারে শরীরে যখন একটা গোলমাল চলিতে থাকে কলেরা তখন সহজেই শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে, দেহের পরিপূর্ণ সুস্থ সবল অবস্থায় কলেরা ব্যাসিলস শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিউকোসাইটের আক্রমণে গোড়াতেই বিনষ্ট হয়।

বিশেষ বিশেষ এক এক ব্যাকটিরিয়া যে বিশেষ বিশেষ রোগের একমাত্র হেতু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই সে কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বসন্তের ব্যাকটিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে বসন্তই দেখা দেয়, হাম-জ্বরের বাকটিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া কলেরার সৃষ্টি করিতে পারে না।—এখনকার অনেক বিচক্ষণ ফরাসীস্ ও জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকের স্থির বিশ্বাস সর্ব্ববিধ রোগের মূল ব্যাকটিরিয়া এবং প্রত্যেক রোগেরই স্বতন্ত্র বিশেষ কোনো এক প্রকারের ব্যাকটিরিয়া আছে। একদিন এই মত-বাদ লইয়া ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করা বৈজ্ঞানিক সমাজের একটা ফ্যাসানের মধ্যে ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে পরীক্ষা ও অনুবীক্ষণের সাহায্যে যে সকল তথ্য জানা গিয়াছে তাহা এখন আর মোটেই হাস্য রসের উদ্রেক করে না।

ব্যাকটিরিয়া জন্তু না উদ্ভিদ এক সময় ইহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ চলিত। বস্তুত এ সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট কারণ ছিল। স্বেচ্ছামত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার শক্তি সুধু জন্তুদের আছে বলিয়াই সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এবং অনুবীক্ষণের নীচে ইহাদের অনেককে যে ভাবে ছুটাছুটী ও নৃত্য করিতে দেখা যায়, তাহাতে ব্যাকটিরিয়া জন্তুর সম্বন্ধে নূতন কোনো পরীক্ষকের কোনো প্রকার দ্বিধা না থাকাই স্বাভাবিক।—কিন্তু স্বেচ্ছামত নড়িবার চড়িবার শক্তি ত জন্তুর মধ্যেই

আবদ্ধ নহে, গাছ তাহার ভিতরের শক্তির জোরে মাটিভেদ করিয়া শিকড় নীচে পাঠাইতে থাকে, এবং মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তাহার মাথা উঠে উপরে। যে দিকে আলোক, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া গাছ সে দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, দিবা রাত্রি আলোকের গতি অনুসারে অনেক গাছই নিজের পাতা ডাল এবং ফুলকেও ক্রমাগত ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকে—ইহা ত আমরা সকলেই দেখিয়াছি।—ইহাদের কোনো-টিকেই অবশ্য গতি বলা চলে না, 'উচ্চশ্রেণী'র গাছ মাত্রেই একস্থানে আবদ্ধ, স্বস্থান ছাড়িয়া কণামাত্র নড়িবার শক্তিও তাহাদের নাই। কিন্তু নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তাহারা জন্তুর মতই একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে পারে। —অতএব কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়া নড়িয়া চড়িয়া নৃত্য করিয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাদিগকে জন্তু আখ্যা দেওয়া যায় না। সকল গাছের জীবকোষে সেল্যুলোস * দেখা (Cellulose) যায়, কিন্তু জান্তব জীবকোষের চতুষ্পার্শ্বে দুই এক ক্ষেত্র ছাড়া, কোথাও সেল্যুলোস নাই। কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার চতু-ষ্পার্শ্ব সেল্যুলসে আচ্ছন্ন। জীবন ধারণের জন্য যে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন কোনো জন্তুই তাহা অজৈবিক আকারে গ্রহণ করিতে পারে না—গাছেরই সুধু সে ক্ষমতা আছে। ব্যাকটিরিয়া কিন্তু প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন অজৈব আকারে গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল কারণে ব্যাকটিরিয়াকে জন্তু না বলিয়া উদ্ভিদ বলা হয়। নহিলে সৃষ্টির যে স্তরে ব্যাকটিরিয়ার স্থান সেখানে জন্তু ও উদ্ভিদ বস্তুতঃ কোনো প্রভেদ নাই।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

আমেরিকা, (U. S. A.)

ইহুদীধর্ম্ম।*

অদ্যকার এই শুভ সম্মিলনের জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। তাঁহার অসীম করুণার কালাকাল ও পাত্রাপাত্র নাই। আলোক রশ্মি যেমন চক্ষুকে আনন্দদান করে, তেমনি ইহুদীয় ধর্ম্মতত্ত্ব মানব হৃদয়ে মহত্বের বিকাশ করিয়া থাকে। মহাজ্ঞানী জর্ম্মণ কবি গেয়েটে মৃত্যুশয্যায় "আরও আলোক" বলিয়া অতৃপ্ত বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে জ্যোতিঃ সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করিতেছে, তাহারই প্রভাবে এক দিন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, এবং আমরা বুঝিতে পারিব যে মনুষ্যজাতি এক পিতার সন্তান এবং সকলে বিরাট ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ। মনুষ্য সমাজে এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিকাশ না হইলে পৃথিবীতে সুখ ও শান্তির

* বিগত ডিসেম্বর মাসের ধর্ম্মসংজ্ঞে শ্রীযুক্ত আইয়া আইজাকের পঠিত মূল প্রবন্ধ হইতে।

আশা নাই। সসীম কখনও অসীমকে ধারণা করিতে পারে না; অধিক কি, তদ্বিষয়ে তাহার নিজের যতটুকু জ্ঞান, তাহাও সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেও অসমর্থ। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়গুলি যে ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, সেই সর্ব্বশক্তিমানের জ্যোতি যখন সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বসময়েই বিকীর্ণ হইতেছে এবং যখন এমন স্থান নাই যেখানে তাহার "সাক্ষী" নাই, তখন সত্যের সন্ধান করিতে হইলে কেবল মাত্র নিজগৃহে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, বাহিরেও সন্ধান করিতে হইবে, এবং যেখান হইতেই হউক, সত্যকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ধর্ম্মসঙ্ঘকে আহ্বান করিতে আমার বিশিষ্ট আনন্দের কারণ আছে; কেন না আমি ইহুদী। প্যালেস্তাইনের গিরি নিকেতনে ইহুদীয় জ্ঞানিগণ যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অখণ্ড মানবজাতিরই মত। এত দিনে মোগল সম্রাট আকবরের স্বপ্ন সফল হইল। ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, নানা সম্প্রদায় আজ এইখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। অমর এইনহরণের ভাষায় প্রার্থনা করি "সেই দিন আসুক, যে দিন ক্ষুদ্র ইহুদী জাতি, মহাসমুদ্রে জল বিম্বের ন্যায় মানবমণ্ডলীর বিরাট পাবাবারে মিলিত হইবে।" কে এমন ভাবুক অথবা ধর্ম্মবেত্তা আছেন, যিনি মহাকবি টেনিসনের সহিত এইরূপ মনোভাব প্রকাশ না করিবেন "হে ভগবন্! আমি প্রতি মন্দিরেই তোমার দর্শনলাভকারী পুণ্যাত্মাদিগকে দেখিতে পাই, এবং প্রতি ভাষাতেই তোমারই জয়গান শ্রবণ করি?"

অতঃপর ইহুদীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। আব্রাহাম ও মুষা এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেও, ইঁহাদের নামে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। হিব্রু ও ইস্‌রেল, এই দুই জাতি ইহার আদি উপাসক বলিয়া ইহা হিব্রুধর্ম্ম বা ইস্‌রেল ধর্ম্ম নামে বিশ্রুত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসিয় ও রোমক লেখকগণ এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না। যুডিয়া দেশের নামানুসারে, ইহা য়ুদাধর্ম্ম বা ইহুদীধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ইহুদীধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন অজ্ঞেয় গূঢ় রহস্য অথবা কোন অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাই। ইহা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বতঃসিদ্ধ। এই ধর্ম্মের উপদেশাবলী সর্ব্বজন গ্রাহ্য উদার ও উন্নতিশীল। আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের রহস্য, সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার মন্ত্র এবং সত্য ও পরোপকার—ইহার উপদেশ; বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট নামক অংশ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ (Holy Scriptures)। ইহা হিব্রু, তালমুদ প্রভৃতি ভাষায় রচিত। এই ধর্ম্মের প্রধান তত্ত্ব, একেশ্বরবাদ। এই তত্ত্বের বিরোধী যে প্রসঙ্গ যখন উত্থিত হইয়াছে, ইহুদীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় তখনই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এবং স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ঈশ্বর 'আত্মা'ময়, অরূপ; "আমি আছি" —ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। ইহুদী-গণের বিশ্বাস যে তাঁহারাই একমাত্র ঈশ্বরাদিষ্ট

নৈতিক বিধি সমূহের রক্ষাকর্ত্তা। এই ধর্ম্ম ভগবৎ-শক্তির স্রোতস্বিনীরূপে' চির-প্রবহমান; ইহা এক ক্ষুদ্র নির্ঝরে উৎপন্ন হইয়া মানব-সভ্যতার বিশাল নদীসমূহ প্লাবিত করিতেছে।

যুদাধর্ম্মমতে মানব স্বাধীন জীব। ভাল মন্দ, সু—কু, সৎ-অসৎ,—যে পথ ইচ্ছা, মানব তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। "পাপ তোমার দ্বারস্থিত, তোমাকে সে প্রলুব্ধ করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য; তুমি তাহাকে পরাভব করিবে।" মুষা ঈশ্বরের নামে বলিয়াছেন "আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু এবং সু ও কু (good and evil) দুইই স্থাপন করিয়াছি, তুমি স্বীয় পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে।" আনন্দ, আশা ও স্নেহ—এই ধর্ম্মের শিক্ষা। দুঃখ ও শোকের মধ্যে ভগবানের করুণার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এক ঈশ্বর, এক নিয়ম ও এক মানবজাতি—ইহাই সার উপদেশ। "প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসিবে।" "অপরিচিত বিদেশীকে আত্মীয়বৎ স্নেহ করিবে।" তোমার ক্লেশে অপর কাহারও কষ্টানুভব হয় না, কিন্তু যাহাতে তোমার উপকার হয়, তাহাতে আর সকলের উপকার হইয়া থাকে।" "কেহ উপকার প্রত্যাশা করিলে, তোমার শক্তি থাকিতে, বঞ্চিত করিও না।" মানবাত্মা ঈশ্বরের অংশ। স্নেহ, দয়া, পরোপকার ও জ্ঞানানুশীলনে আত্মাকে ঐশ্বরিকভাবে পরিস্ফুট করা আমাদের ধর্ম্ম, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে—বিশ্ববাসিগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হইবে এবং এই বিশ্ব শান্তিময় ও জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হইবে,—ইহাই যুদা ধর্ম্মের চেষ্টা ও লক্ষ্য। জগৎ যখন অন্ধকারে লীন ছিল সেই সময় 'ভগবান, আব্রাহামকে বলিয়াছিলেন"তোমাতে জগতের সুখ নিহিত আছে",—এতদ্বারা মানবজাতি যে এক পিতার সন্তান, ইহাই সূচিত হইয়াছে। ভগবান্ ইসরেল জাতিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই সূচনা ও আভাষ আছে। জোনা'র অর্ণবযান যখন ঝঞ্ঝাবাতে ভগ্ন হইল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, যিনি ইহুদীজাতির ঈশ্বর তিনিই সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বর, সেই করুণাময় পিতার স্নেহে ইহুদী ও বিধর্ম্মিগণের (Gentiles) সমান অধিকার।

যুদাধর্ম্মের উপদেষ্টৃগণ বলিয়াছেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও, ভগবান তোমার কর্ম্মে যেন পাপ দেখিতে না পান, পাপ হইতে বিরত হও, উপকার করিতে শিখ। বিচার প্রার্থী হইবে, উৎপীড়িতকে উদ্ধার করিবে, পিতৃহীনের প্রতি কৃপা করিবে, দুঃখিনী বিধবার সহায় হইবে। ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবে; দয়া যেন তোমার প্রিয়বস্তু হয়, ভগবানের নিকট প্রণত হইয়া চলিবে

"কেবল মাত্র পান ভোজনাদি করিলেই মানব জীবনের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ভগবানের আজ্ঞানিচয় পালন করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইয়া থাকে।" ভগবান বলিয়াছেন "আমি তোমাদের ঈশ্বর; আমি পবিত্র, অতএব তোমরা পবিত্র হইবে।" পরোপকার ইহুদী জাতির অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম। "দেশ কদাপি দরিদ্রশূন্য হইতে পারে না সেইজন্য আমার আদেশ এই যে, তুমি তোমার অভাবগ্রস্ত দীন ভ্রাতার

প্রতি মুক্তহস্ত হইবে।" "কর্জ্জগ্রহীতা কোন প্রয়োজনীয় বস্তু বন্ধক দিলে, উত্তমর্ণ তাহা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিবে।" "কোন প্রতিবেশী যদি কর্জ্জ লইবার জন্য বস্ত্র বন্ধক রাখে, তবে সূর্য্যাস্তের মধ্যে তাহা প্রত্যর্পণ করিবে।" "বিধবার পরিচ্ছদ ও কুলি মজুরের যন্ত্রাদি বন্ধক লইবে না।"

মুষার বিধিনির্দ্দেশ গ্রন্থে বালক ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণের শিক্ষার, বিশেষতঃ ধর্ম্মশিক্ষার-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "আপনাকে জান", সক্রেটিসের এই উক্তি সলোমনের "জ্ঞান লাভ কর" এই বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। মুষা বলিয়াছেন "তাহারা জেকবকে তোমার বিচারনীতি জ্ঞাপন করিবে এবং ইস্রেলকে তোমার বিধিসমূহ শিক্ষা দিবে।" ইহুদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ জগতে সাম্য ও শান্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরধর্ম্মে উদার ভাব এই ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব। "কোন বিদেশীকে ক্লেশ দিবে না, উৎপীড়ন করিবে না। কেন না, তোমরাও এক সময়ে মিশরে প্রবাসী হইয়াছিলে।" "মিশরবাসীকে ঘৃণা করিওনা, কারণ মিশরে তোমরা বহু দিন বাস করিয়াছ।" "কোন বিদেশী তোমার প্রতিবেশী হইলে, তাহার সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিবে এবং তাহাকে স্নেহ করিবে।" "যে বিধি স্বদেশীর জন্য লিখিত হইবে, তাহা যেন বিদেশীর প্রতি ও প্রযুজ্য হয়।"

জোরাস্তার ধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে ইহুদীগণ ব্যাবিলনে বাস করিতেন। ব্যাবিলনকে তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ, জোরাস্তাধর্ম্মী, কনফিউসিয়ান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ই তথায় উপস্থিত হইতেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, যুদাধর্ম্মের আলোক সেই সমুদয় সম্প্রদায়ের উপর ন্যূনাধিক পতিত হইতেছিল। পার্শীজাতির উপাস্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জোরোস্তা, দানিয়েল ও ইজেকিয়েলের শিষ্য ছিলেন। খ্রীষ্টান এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মও যে যুদাধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যিশু ইহুদী জাতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পলের (Paul) ন্যায় তিনিও জনৈক ইহুদীর শিষ্য ছিলেন। যাঁহারা তালমুদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যিশুর বিদ্যা শিক্ষার ইতিহাস অবগত আছেন। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, তৎসমুদয়ই যুদাধর্ম্ম হইতে গৃহীত। বাইবেলের নিউটেষ্টামেণ্ট এবং অধিকাংশ অধ্যায়ই ইহুদীগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইউরোপ যখন প্রোটেষ্টাণ্ট সমাজের সংস্কারান্দোলনে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, তখন ইহুদীগণ তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় সকল ধর্ম্মের উপর ও প্রায় সকল সম্প্রদায়ের সহিত যুদাধর্ম্মিগণের প্রভাব ও সংস্রব পরিলক্ষিত হইবে। মধ্যযুগে ইহুদীগণ গ্রীস হইতে বলোনা, প্যারিস্ ও অক্সফোর্ড, এই সকল স্থানে বিজ্ঞান চর্চ্চা আনয়ন করেন। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন শাস্ত্রে ইবু গেব্রলের ন্যায় চিন্তাশীল ইহুদীগণের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক কি, প্রগাঢ় চিন্তাশীল স্পাইনোজার (Spinoza) যুগান্তরকারী

গ্রন্থ সকল বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদীয় লেখকগণের সাহায্য গ্রহণ না করিলে উপায় নাই। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গুরু প্লেটো জেরিমিয়ার ছাত্র ছিলেন। সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের জন্য সভ্য-সমাজ ইহুদী জাতির নিকট সবিশেষ ঋণী। জগতে প্রায় এমন কোন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয় নাই এবং এমন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় নাই, যাহাতে ইহুদী জাতির সম্বন্ধ ছিল না। জগদ্ব্যাপী ইহুদী সমাজ প্রায় সকল সভ্য দেশের জ্ঞান ও সমাজগত অভ্যুদয়ে যোগদান করিয়াছেন।

৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম যখন শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়াছিল এবং তত্রত্য মন্দির শত্রু কর্ত্তৃক ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তখন ইহুদী সাম্রাজ্য এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইলেও য়ুদাধর্ম্মের অবসান হয় নাই। বহু জাতি এই সম্প্রদায়ের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়াছে, ইতিহাসে এখন আর তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু সেই উৎপীড়িত ধর্ম্ম সম্প্রদায় অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে। ইহুদীজাতি স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া গৃহশূন্য হইয়াছে ও বহু-প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। তথাপি তাহারা চিরদিনই অতীতের অনুরাগী এবং অদ্যাপি তাহাই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। একদিন গিয়াছে যখন তাহার নয়ন সমক্ষে ব্যাবিলন, পারসিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতির দৃপ্ত লীলাতরঙ্গ জগৎকে স্তম্ভিত করিত। আজ সেই সকল অত্যাচারীর দল কোথায়? কাল বশে তাহারা বিস্মৃতির অনন্ত সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীন ইহুদীজাতি সমগ্র জগতে শিল্প, বাণিজ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিস্তার করিয়া সহস্র অত্যাচার ও উৎপীড়নের পর আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, ইহা যে পৃথিবীতে এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য বিষয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাইবেলের রচনায় প্রেরণা (Inspiration) লইয়া বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না আমরা বাইবেলকে ধর্ম্মগ্রন্থ (Sacred Book) বলি। যে গ্রন্থে ধর্ম্মোপদেশ আছে, যাহা পাঠ করিলে, মানুষ মহৎ হয়, সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির শিক্ষা বা উন্মেষ হয়, তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ। বাইবেলে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ (Revelation) হইয়াছে। কিন্তু কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থে তাহা হয় নাই? জ্ঞান মাত্রই ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ। মনুষ্য সমাজে চিরদিনই এমন পবিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের চিত্তপটে ভগবানের স্বরূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সেই চিত্র অতীব নির্ম্মল, উজ্জ্বল, মর্ম্মস্পর্শী ও জ্ঞানোন্মেষক (convincing and inspiring) হইলেও অনেকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে, যে শক্তির প্রেরণায় সুবিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াস (Phidias) শিল্পকলার অমূল্য মণি জুপিটারের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়াছিলেন, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, গ্যালি-লিও পৃথিবীর আবর্ত্তন কক্ষ পথ নির্ণয় করিয়া-ছিলেন, শেক্ষপীয়ার, মিল্টন ও কালিদাস

অপূর্ব্ব কাব্য নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, ফ্রাঙ্কলিন ধরাতলে বৈদ্যুতিক শক্তি আনয়ন করিয়া গিয়াছেন, লিনকলন, শাসনতন্ত্রে মুক্তি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ক্যাণ্ট গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, হার্ভি জীবদেহে শোণিত প্রবাহ আবিষ্কার করিয়াছেন, এডিসন প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, ফাদার ড্যানিয়েল কুষ্ঠরোগীদিগের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন এবং মারকণি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

মুষা ইস্রেল জাতিকে ভগবানের আজ্ঞা-সমূহ পালন করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা ন্যায়, সত্য ও দয়াধর্ম্মের পরিবর্ত্তে প্রতিমা ও ক্রিয়া কলাপের পক্ষপাতী, ইসায়া তাঁহা-দিগকে নিন্দা করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উৎসব অনুষ্ঠান করেন ও রবিবারে অবসর গ্রহণ করিয়া উহার পবিত্রতা রক্ষা করেন, কিন্তু ন্যায় ও দয়া ধর্ম্ম দেখাইতে কুণ্ঠিত হন তাহাদের সম্বন্ধে মুষা বলিয়াছেন—"কে তোমাদিগের নিকট এই সকল প্রত্যাশা করে? তোমার অমাবস্যার পর্ব্ব বা অন্যান্য উৎসবে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়, আমি ক্লেশ অনুভব করি।" "সাধু ব্যক্তিগণ যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, সকলের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র।" য়ুদাধর্ম্মে ধর্ম্মমত অপেক্ষা সৎ-কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেহ কোন উৎসব-অনুষ্ঠান করিলে আমাদের ধর্ম্মের মূল-নীতির কিছুই আসিয়া যায় না। সদ্গুণ ও পবিত্রতা যে কোন ব্যক্তির চরিত্রেই প্রকাশ হউক তাহা সদ্গুণ ও পবিত্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কার্য্য করিলে একজন ইহুদী সাধু বলিয়া গণনীয় হন, সেই কার্য্য করিয়া একজন হিন্দু বা খ্রীষ্টানও যে সাধু হইবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ইহুদীয় উপাসনার চরম লক্ষ্য,—পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা। ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করা এই ধর্ম্মের অভিপ্রেত নহে। উপাসনা-মন্দিরে স্বর্গের সোপান নাই, উহা পবিত্রতার দ্বার স্বরূপ। ভগবান পবিত্র, অতএব সকলে সৎ ধার্ম্মিক ও পবিত্র হও,—ইহাই ইহার উপদেশ। ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রেম, সত্যে শ্রদ্ধা, পবিত্র চিত্ত, কৃতজ্ঞহৃদয়, শান্তি ও বিশ্ব-সৌভ্রাত্র,—ইহাই উপাসনার প্রার্থিত বস্তু। "ভগবান্ আমাদের বহির্ভাব দেখেন না, অন্তরই তাঁহার লক্ষ্যস্থল। সুতরাং হৃদয়ের পবিত্রতা সর্ব্বোপরি রক্ষণীয়। তাহাতেই কর্ম্মের ফলাফল নির্ভর করে।" ইহুদীয় উপাসনার বিশেষত্ব এই কয়েকটি পংক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে;—"হে পরমেশ্বর! আমাদের আশা এই যে, একদিন অসত্য ও বিরোধের বিনাশ হইবে, এবং সমগ্র মানব জাতি এই বিশাল ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর-তোমাকে একটিমাত্র নামে ডাকিবে।" ভগ-বান্ এই বিশ্বের রাজা, প্রত্যেক মানব তাঁহার মন্দিরের পুরোহিত, প্রত্যেক দেশ তাঁহার উপাসনার বেদী এবং প্রত্যেক ভোজন-গ্রাস তাঁহার যজ্ঞ। "হে দয়াময়, আমাতে পবিত্র হৃদয় সন্নিবেশিত কর এবং অকপট-তার মধুর ভাবে আমাকে সঞ্জীবিত কর।"

কেহ কেহ মনে করেন পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম্ম বা ঈশ্বরোপাসনা আছে অন্যান্য ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। ইহা এক অতি অদ্ভুত কল্পনা। কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত কি একটিমাত্র পথ আছে? শিশুগণের শিক্ষার জন্য কি একটিমাত্র পদ্ধতি বিদ্যমান্? ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও ফল কদাপি ভিন্ন হয় না। সমদেশযাত্রী একাধিক তরণীর কর্ণধারগণ ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিলেও একই স্থানে উপনীত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম জগতেও ঠিক সেই কথা। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ! সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই সাধু ও সজ্জন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এক ব্যতীত দ্বিতীয় ধর্ম্ম থাকিবে না, ইহাই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে "সকলে নিজ নিজ ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিবে" একথা জ্ঞানীদিগের মুখে কখনও উচ্চারিত হইত না। সভ্যতা, জলবায়ু, রুচি, প্রকৃতি প্রভৃতির ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। Religion is simply a matter of education অর্থাৎ যাহার যেরূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম বিষয়ে সে তদ্রূপ অধিকারী। আমি বিবিধ সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন করিয়া একটিমাত্র ধর্ম্মমত স্থাপনের পক্ষপাতী নহি। কারণ তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। আমরা ধর্ম্মজগতে সম্প্রদায়লোপের (uniformity) পরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, মিলন ও সহানুভূতি (unity) প্রার্থনা করিতেছি। সকল অনুষ্ঠান ও পদ্ধতির মধ্যে সেই একমাত্র সত্য ও সনাতনের,—সেই চিদানন্দ অনন্ত প্রেমনিলয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। মালাচি বলিয়াছেন "আমরা সকলে কি এক পিতার সন্তান নহি? এক ঈশ্বর কি আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই? আমরা কি পরস্পরের নিকট ভ্রাতার কর্ত্তব্যের জন্য দায়ী নহি?" এই ভ্রাতৃসম্বন্ধ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইলে সকল শত্রুতা ও সকল বিরোধ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং সকলেরই হৃদয় এক অপূর্ব্ব প্রেম-ধারায় চির-বিগলিত রহিবে। বহু শতাব্দীর বিচ্ছেদের পরে আজ সকলে এই পবিত্র আত্মীয়তা অনুভব করুন। বৈরভাবের যে প্রকাণ্ড প্রাচীর আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা এতকাল পরে ভূমিসাৎ হউক। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া মনুষ্য সমাজে সার্ব্বজনিক ভ্রাতৃভাব, প্রেম ও স্বাধীনতার সুবৃহৎ মন্দির গঠন করি।*

* শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ধর্ম্ম-সংঘের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা মূল ইংরাজি প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গদর্শনে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। সম্পাদক।

শ্রীগৌরাঙ্গ

কীর্ত্তন।

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে' যায়,
পথে পথে ঐ নদীয়ায়—
ও কে নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে,
ঢলে' ঢলে' পাগলের প্রায়!
ও কে যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে;
ও কে দেবতা ভিখারী, মানব দুয়ারে,
—দেখে যারে তোরা দেখে যা—
সে যে বলে "কৈ ত কেউ পর নাই"
সে যে বলে "সবাই যে নিজ ভাই"
সে যে বলে "শুধু হেসে শুধু ভালো বেসে
ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই!"
ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়—
ইত্যাদি

ওকি প্রেমে মাতোয়ারা—চোখে বহে ধারা—
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই!
ঐ দ্বেষ হিংসা ছুটি', আসি' পড়ে লুটি'
ধূলি মাখা দুটি রাঙা পায়,—
বলে "ছেড়ে দাও মোদের মোরা চলে' যাই
নৈলে প্রভু তোমার প্রেমে গলে যাই
এযে নূতন মধুর প্রণয়ের পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই।"
ঐ নরনারী সব পিছে যায়,
ঐ জয়ধ্বনি উঠে নীলিমায়;
তোরা আয় সবে চলে' মুখে হরি বলে'
ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয়!
ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়—ইত্যাদি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বিস্মৃত জনপদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিষ্ঠা

তুঙ্গভদ্রার শস্য শ্যামল তীরে ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে যে হিন্দু সাম্রাজ্যের বিজয় কেতন উড্ডীন হইয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারত শাসন করিয়াছিল, স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসে তাহা বহু নামে সুপরিচিত। কখনো বিদ্যানগর, বিদ্যাজন বা বিদ্যাজনু; কখনো বিজনগা, বিজেনগেলিয়া বা আনগুন্দী কখনো বা হস্তিনাবতী বিজানগর বা বিজয়নগর নামে তুঙ্গভদ্রা বিধৌত শৈলমালা পরিবেষ্টিত হয় হস্তি সুসজ্জিত সৌধপরিশোভিত সেই সম্পদশালী বিস্মৃত জনপদ একদিন পৃথিবী মধ্যে পরিচিত ছিল। যে বিঠোবার মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য একদিন ভারতে অদ্বিতীয়

ছিল—তালিকোটার ভীষণ শ্মশানে স্বাধীনতা-লিপ্সু স্বদেশভক্ত হিন্দুবীরদিগের রণাহত দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিজয়োন্মত্ত যবন সেনা যে দিন দক্ষিণ ভারত হইতে হিন্দুর নাম বিলুপ্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া শুধু বীরের শ্মশানে বিজয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, সেইদিন তাহারা ধনলোভে যে বিঠোলার মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া, গুপ্ত অর্থের লোভে মন্দিরের কুট্টিমভূমি পর্য্যন্ত খনন করিয়া নিরস্ত হইয়াছিল, সেই অতুলনীয় দেব মন্দির এক দিন বিজয়নগরের শোভা ও সম্পদ ছিল। ভগ্ন জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের সহিত এখন কেবল সেই প্রাচীন কালের সমৃদ্ধি ও গৌরবের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। পরান্নভোজী যবনপদলেহী অত্যাচারক্লিষ্ট শঙ্কাকাতর স্বদেশবাসীর অবস্থা দর্শনে কাতরহৃদয় যে ব্রাহ্মণ বালক এক দিন উন্মত্তের ন্যায় কাননে কান্তারে শৈলে প্রান্তরে লতাগুল্মাচ্ছাদিত দেবী-মন্দির তলে রোদন করিয়া বেড়াইতেন, যে ব্রাহ্মণ কুমার এক দিন আপনার কর্ত্তব্য আপনি গ্রহণ করিয়া কিছু কালের জন্য শাস্ত্র তপশ্চর্য্যা পরিহার পূর্ব্বক অনলতপ্ত রৌদ্ররাগে স্বদেশের ও স্বজাতির মুক্তি মন্ত্র গাহিয়া জড়বৎ সুপ্ত হিন্দু জাতির হৃদয়ে রুধির স্রোত ছুটাইয়াছিলেন, বিজয়নগরের বিরূপাক্ষমন্দিরের ধ্বংসমধ্যে তাঁহার উপাসনাস্থান ও সমাধি আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে—আজিও তাঁহার শিষ্যগণ শঙ্করাচারী নামে ইতিহাসে প্রখ্যাত হইতেছেন।

সে আজ বহুদিনের কথা—১২৬৭ খৃঃ অব্দের এক শুভ মুহূর্ত্তে তুঙ্গভদ্রাতীরে হাম্পিপনগরের সীমান্তে এক ব্রাহ্মণ বালক জন্মগ্রহণ করিয়া মাধবাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এখন আমরা সন্ন্যাসী মাধবাচার্য্যের নাম বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি বটে কিন্তু বেদের অদ্বিতীয় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের নাম প্রতি হিন্দুর মুখে মুখে ফিরিতেছে। মাধবাচার্য্য সায়ণাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ দরিদ্র সায়ণ উভয় পুত্রকেই শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, উভয়েই শেষে বেদোপনিষদের ভাষ্যাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের তখন অতিশয় দুর্দ্দিন। দুর্দ্দমনীয় মুসলমান সৈন্য তখন চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া দক্ষিণ ভারতকে করায়ত্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজন্যবর্গ তখন তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া, রাজ্য ধন মান স্বাধীনতা এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত হারাইতেছিলেন।

ভারতের শান্তশিষ্ট প্রজাকুল তখন মুসলমান নরপতি কর্ত্তৃক এরূপ পীড়িত হইতেছিল যে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না! * সুলতান তোঘলক তখন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরিব্রাজক ইবন্ বতুতার ভ্রমণ কাহিনী

* So little did he hesitate to spill the blood of God's creatures that when anything occurred which excited him to proceed to that horrid extremity, one might have supposed *his object was to exterminate the human species altogether.—Brigg's Ferista.*

পাঠে জানা যায় যে সুলতানের রাজ্যকালে প্রতিদিন শত সহস্র হতভাগ্য প্রজা দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রাজসভায় আনীত হইত। সুলতান তাহাদিগকে যদৃচ্ছা পীড়ন করিতেন এবং বধও করিতেন। *

শোণিত-লোলুপ সুলতান দিল্লি নগর শ্মশান করিয়া † যখন আপন ভাগিনেয় বহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন তখন নিরুপায় বহাউদ্দীন প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া শৈলপ্রাচীর পরিবেষ্টিত কাম্পিল্যের রাজার চরণে শরণ লইলেন। ঐশীনরের জন্মভূমির গৌরব অটুট রাখিবার মানসে ক্ষুদ্র কাম্পিল্যের হিন্দু নরপতি শরণাগত জনপালনে অগ্রসর হইলেন। তিনি জানিতেন সুলতানের ক্রোধ প্রলয়ানল সম ভীষণ—তিনি জানিতেন সুলতানের শোণিততৃষ্ণা ততোধিক দারুণ—তিনি আরও জানিতেন যে মুহূর্ত্তে অগণিত যবন-সেনা আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র পুরী বেষ্টন করিবে, মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া তাঁহারই তপ্ত রুধিরে দুর্গতল রঞ্জিত করিবে। কাম্পিল্যপতি এ সমস্তই জানিতেন, কিন্তু যে মহান্ শিক্ষা চিরদিন ভারতে চলিত—যে ধর্ম্মবিষাণ মরণোন্মুখ কুরুপাণ্ডবের সম্মুখে ধর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়া, মহর্ষির করুণায় যেন ফাল্গুনীর পাঞ্চজন্যমুখে নিনাদিত হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে,—কাম্পিল্য-পতি সে শিক্ষা বিস্মৃত হইলেন না, তাঁহার কর্ণে ধর্ম্মের সেই গুরুগম্ভীর ভেরী-নাদ প্রবেশ করিল। তিনি স্থির করিলেন শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া যদি মরিতেও হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। প্রাণভয়ে ভীত বহা-উদ্দীনকে তিনি আপন বক্ষে স্থান দিলেন।

চরিদিকে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সৈন্যের কোলাহলে, অশ্বের হ্রেষারবে পর্ব্বত-প্রাকার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হিন্দু নৃপতি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন। মুষ্টি-মেয় হিন্দুযোধ সেই রুদ্ধদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। এক দিন গেল, দুই দিন গেল সুলতান-সৈন্য সেই দ্বার ভগ্ন করিতে পারিল না। সুতরাং দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল। দুর্গ মধ্যে যখন আহার্য্যের অভাব ঘটিতে লাগিল তখন কাম্পিল্যপতি বহা-উদ্দীনকে কহিলেন—আমার যাহা সাধ্য করিয়াছি, আপনি আনগুন্দি দুর্গে গমন করুন। যদি সুবিধা থাকিত তাহা হইলে আমিও তথায় যাইয়া শত্রুকে বাধা দিতাম।' —সুলতান-ভাগিনেয় চর সঙ্গে লইয়া আনগুন্দি দুর্গে যাত্রা করিলেন।

কাম্পিল্য দুর্গে তখন হুহু করিয়া চিতার অনল জ্বলিয়া উঠিল। চন্দন কাষ্ঠের চিতা ঘৃত সংযোগে মিলিতে মিলিতে আকাশ স্পর্শ করিল। পুরনারীগণ—আর্য্যাবর্ত্তের সতী সাবিত্রীগণ—তখন বসন ভূষণে

* Every day hundreds of individuals were brought chained into his hall of audience; their hands tied to their necks and their feet bound together. Some were killed, and others were tortured or well beaten.—*Elliot's History of India, Vol III. P.* 612 & 613.

† Elliots' History of India—vl III. p614.

সুসজ্জিতা হইয়া জন্মভূমির জয় গান করিতে করিতে অনল প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন—আকাশে দেবতা, ধরায় মানব, সেই দৃশ্য দেখিয়া নির্ব্বাক হইলেন।

* * *

মুহূর্ত্তে সব শেষ হইল! কাম্পিল্যের রাজ-লক্ষ্মী অনল মধ্যে আশ্রয় লইলেন—চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। শৈল-শিখরে গগনের কোলে জলে স্থলে সর্ব্বস্থানে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিল। শমন আলিঙ্গন করিয়া একি ভীষণ জয়োল্লাস—মরণকে বরণ করিয়া একি আনন্দ ধ্বনি! ইহা হিন্দু ভিন্ন আর কেহ জানে না—হিন্দু ভিন্ন এমন আর কেহ পারে না। যবন সৈন্য শিহরিয়া উঠিল।

কাম্পিল্য-পতি স্থির নেত্রে অকম্পিত বক্ষে সেই মহাযাত্রার স্বর্ণ মণ্ডিত পথে যথা-সর্ব্বস্ব যাইতে দেখিলেন—যখন শুধু চিতা-ভস্ম পড়িয়া রহিল তখন তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া বজ্র কর্কশ স্বরে ক্ষিপ্তের ন্যায় ডাকিলেন—'যে আসিবে এসো—আজ আমরা মরিয়া জয়লাভ করিব—স্বদেশ স্বধর্ম্ম আজ মরণ যজ্ঞের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। চল—অগ্রসর হও—শত্রু বধ কর—আজ আমরা মরিয়া অমর হইব।—ঝন্ ঝন্ শব্দে রুদ্ধ দুর্গদ্বার মুক্ত হইল—মুষ্টিমেয় বীরসেনা বন্ধন মুক্ত হইয়া আজ বিদ্যুদ্বেগে যবন-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছে—ভয় নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই! এমন দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

দেখিতে দেখিতে বীরের শোণিতে ধরণীপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইল—কাম্পিল্যের মহা শ্মশানে—শিবা-শকুনীর নৃত্যমধ্যে জনহীন দুর্গ চূড়ে যবনপতাকা প্রোথিত হইল—সুলতান দেখিলেন তিনি শ্মশান-ভূমি জয় করিয়াছেন মাত্র! তখনো দুর্গমধ্যে চিতার অনল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিতেছিল, নিবিয়া নিবিয়া পুনরায় জ্বলিতেছিল—তখনো ধূপধূমগন্ধে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত ছিল—হিন্দুর গৌরবলক্ষ্মী বুঝি তখনো একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য সেই প্রেতভূমির দিকে চাহিয়া ছিলেন!

উন্মত্ত সুলতান কক্ষ হইতে কক্ষে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিতে লাগিলেন—বহাউদ্দী-নের সন্ধান পাইলেন না। শূন্য দুর্গ—শূন্য তোরণ—শূন্য নগর—সব শূন্য! যাহারা জীবিত ছিল তাহারাও লুণ্ঠনতৎপর যবন সৈন্যের কৃপাণাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছিল। সুলতান তখন সসৈন্যে বহাউদ্দীনের অন্বেষণে অগ্রসর হইয়া অল্পকাল মধ্যেই জানিতে পারিলেন যে বহাউদ্দীন দক্ষিণাত্যের শেষ ভরসাস্থল আনগুন্দি নৃপতির আশ্রয় লাভের জন্য পলায়ন করিয়াছেন।

সুলতানের ক্রোধ আনগুন্দির উপর নিপতিত হইল। বহাউদ্দীন অবিলম্বে ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলেন। প্রাণভয়ে পলায়িত শত্রুর উপরেও সুলতানের এতটুকু দয়া ছিল না। তিনি বহাউদ্দীনকে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রমণী-সমাজে লইয়া আসিলেন—তাহার দেহে নিষ্ঠীবন পরিত্যক্ত হইল! অবশেষে সুলতান আদেশ দিলেন 'পাপিষ্ঠের দেহ হইতে চর্ম্ম উঠাইয়া লও।' আদেশ মাত্রে

বহাউদ্দীনের দেহ হইতে চর্ম্ম কাটিয়া তোলা হইল, তিনি যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সুলতানের তখনো দয়া হইল না। তাঁহার আদেশে মৃত বহাউদ্দীনের দেহ সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া তণ্ডুলের সহিত মিশ্রিত হইল এবং সেই তণ্ডুলের অন্ন রাঁধিয়া সুলতান বহাউদ্দীনের স্ত্রী ও পুত্রের নিকট উপহার প্রেরণ করিলেন!*

শরণাগতকে আশ্রয় দিতে যাইয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দু বীরগণ শমন ভবনে গমন করিলেন—কাম্পিল্য এবং আনগুন্দি † সুলতানের করায়ত্ত হইল। তিনি মালিক নায়েব নামক একজন মুসলমানকে সেই প্রদেশের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া উত্তরদিকে ধাবিত হইলেন।

সুলতানের প্রত্যাগমনের পরই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইল—অত্যাচারের স্রোত অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণকুমার মাধবাচার্য্য তখন ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিতেন—কি করিলে দেশে আবার হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে তিনি তখন তাহারই চেষ্টায় ফিরিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই উৎসাহ বাক্যে নববল প্রাপ্ত হইয়া আনগুন্দী বাসিগণ মালিক নায়েবকে সিংহাসন হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। সুলতান তোঘলক এই বিদ্রোহের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় আনগুন্দী আগমন করিলেন এবং দেশের অবস্থা বিবেচনায় আনগুন্দী রাজের বৃদ্ধ মন্ত্রী দেবরায়কে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায় রাজা দেবরায় একদিন কাননাভ্যন্তরে মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিলেন একটী শশক তাঁহার কুক্কুরকে দেখিয়া ভীত না হইয়া বরং উহাকেই দংশন করিতেছে। এই অভিনব দৃশ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে রাজা পথিমধ্যে সন্যাসী মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। মাধবাচার্য্য তপোবলে বুঝিতে পারিলেন, যে স্থানে শশক সারমেয়কে দংশন করিয়াছে তথায় রাজধানী

* He (Sultan) ordered the prisoner to be taken to the women, his relations, and there insulted him and spat upon him. *There he ordered him to be skinned alive and as his skin was torn off, his flesh was cooked with rice. Some was sent to his children and his wife*, and the remainder was put into a great dish and given to the elephants to eat, but they would not touch it.—*Elliot's History of India—Vol* III. Page 615-616.

† তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর তীরে আনগুন্দি জনপদ। ইহাই ভাঙ্গা কিষ্কিন্ধ্যা বলিয়া প্রখ্যাত। চন্দ্রবংশীয় নন্দ মহারাজ স্বীয় জন্মভূমি বাহিলা দেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া আনগুন্দী রাজবংশের সৃষ্টি করেন। তাহার পর চালুক্য মহারাজ ১০৭৬ হইতে ১১১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্রের নাম বিজয়ধ্বজ। অনেকে বলেন সম্ভবত: বিজয়ধ্বজ নিজ নামে ১১৫০ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র নরসিংহ দেবরায় বহু দিন সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তাঁহারই বংশধর জম্বুকেশ্বর যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন সুলতান তোঘলক আনগুন্দি অধিকার করেন।

নির্ম্মাণ করিলে তাহা শোভায় সম্পদে ও গৌরবে ভারতে অতুল হইবে। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে দেবরায় সেই স্থানে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না সন্দেহ। ইহা ভিত্তিহীন কিম্বদন্তী মাত্র। তবে ইহাই বিশ্বাস হয় যে স্বদেশভক্ত মাধবাচার্য্য রাজা দেবরায়ের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে এক সুবিশাল শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই রাজ্যই বিজয়নগর নামে পরিচিত।

হিন্দুর এই গৌরবের ইতিহাস এমন কুহেলি-সমাচ্ছন্ন যে তাহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী স্থির করা দুরূহ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—পর্ত্তুগীজ, ইতালিয়, রুসবাসী নানা লোকে নানা বিবরণ লিখিয়া বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। একের সহিত অপরের সাদৃশ্য অতি বিরল। নানাবিধ ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বিজয়নগরের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে বহুদিন পূর্ব্বে কয়েক জন ধর্ম্মভীরু হিন্দু ওরঙ্গল নরপতির অর্থাগারে রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৩২৩ খৃঃ অব্দে যখন ওরঙ্গল মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয় তখন তাঁহারা পলায়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য আনগুন্দিতে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহারা যখন দেখিলেন মুসলমানের অত্যাচারে দেশের লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে তখন তাঁহারা স্বদেশকে যবনশৃঙ্খলভার মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সুলতান-ভাগিনেয় বহাউদ্দীনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ১৩৩৪ খৃঃ অব্দে আনগুন্দী মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষে হিন্দুর পরাজয় এবং মুসলমানের জয় হইল—আনগুন্দী সুলতানের করায়ত্ত হইল। সুলতানের নবনিযুক্ত শাসনকর্ত্তা মালিক নায়েবের বিরুদ্ধে যখন দেশের লোক অস্ত্রধারণ করিল তখন সুলতান হিন্দুর রাজ্য হিন্দুর হস্তে অর্পণ করিয়া প্রথম হরিহর * এবং প্রথম বুক্ককে রাজ্যের কর্ত্তা করিয়া দিলেন। হরিহর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা বুক্ক মন্ত্রীর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১। বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত—শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রথম সংস্করণ, ৪৬৯ পৃঃ, ভাল বাঁধাই মূল্য ২৲।

ইহাতে রামপ্রসাদ, রামমোহন, দাশু রায়, মধু কাইন, বিষ্ণুরাম চট্টো:, ফিকিরচাঁদ বাউল, রবীন্দ্র বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বাবু, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা অন্যান্য বহু সঙ্গীতজ্ঞের অসংখ্য

* প্রথম হরিহর ইতিহাসে হক্ক নামে পরিচিত।

গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি রচয়িতার সংগৃহীত গীত ও পদগুলি একত্রে পরে পরে আছে। গ্রন্থকারের এ প্রভূত সংগ্রহ-চেষ্টা প্রশংসার বিষয়। কেবলমাত্র ধর্ম্মসঙ্গীতের একত্রে এত সমাবেশ অন্য কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সংগ্রহের মধ্যে দু'একটি স্বদেশ-সঙ্গীতও দেখিলাম।

গ্রন্থকার প্রবীণ ব্যক্তি; স্বদেশ ও প্রবাসে বিলাতে ইনি বহুদিন স্বর্গীয় কেশব বাবুর সহচর ছিলেন। ইনি এক-জন নববিধান সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম। ইনি ইঁহার এ পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে গোড়ামির বশীভূত হন নাই এবং তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্গীতেই যে স্থানদান করিয়াছেন, ইহা সুখের কথা।—এ কথা তুলিতাম না, কিন্তু বাস্তবিকই এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা এরূপ কার্য্যের মধ্যেও গোঁড়ামির গন্ধ লইয়া বেড়ান। এটা আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে প্রতি উৎকৃষ্ট গানই আমাদের জাতীয় সম্পত্তি; তাহাদের মধ্যে যে খাঁটী ভাব আছে তাহাই আমাদের উদার ভাবে গ্রহণ করিবার বিষয়। রামপ্রসাদ বা বিষ্ণুরামের পদাবলী সকলই না হয় পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে রচিত,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সহজ এবং উদার ধর্ম্মভাবটুক্ আছে সেটুকু হইতে যদি স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইতে চাই তবে তাহা আমাদেরই দৈন্য এবং ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক হইবে।

গ্রন্থের সূচীর ব্যবস্থা বেশ ভাল,—দুই প্রকার ভাগ আছে।—১। সাধারণ সূচী; তাহাতে প্রতি গানের রাগিনী তাল বিষয় ও রচয়িতার নাম আছে। ২। রাগরাগিণীর সূচী;—এক এক প্রকার রাগিণীর বিভিন্ন তাল সংযোগে গেয় গানের নাম। নূতন শিক্ষার্থী এবং অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ সঙ্গীত চর্চ্চাকারীর পক্ষে ইহাতে খুব সুবিধা হইবে। বিভিন্ন তাল সংযোগে একই রাগিণীর কয়েকটা গান আয়ত্ত করিতে পারিলেই মোটামোটি সে রাগিণী সম্বন্ধে একটা ধারণা হইবার সম্ভব।

পরিশেষে, সঙ্কলনকার মহাশয়কে একটা কথা বলিবার আছে। তিনি হয়ত প্রাদেশিকতার মায়ায় অথবা উচ্চারণের খাতিরে দিয়া কতকগুলি শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—যথা 'কেন' স্থলে 'ক্যান', 'যেন' স্থলে 'য্যান', 'কেমন' স্থলে 'ক্যামন' ইত্যাদি। Phonetik Principle এ (শ্রুতিরূপ অনুযায়ী) শব্দরূপ পরিবর্ত্তনের আলোচনা চলিতেছে বটে কিন্তু তাহার এখন কোন মীমাংসা হয় নাই;—সে বিষয় এখানে আলোচনা করারও এখন সঙ্কল্প নাই। তবে ইহা বলিতে পারি সংগ্রহপদাবলীতে সেরূপ আপনার মতে শব্দ পরিবর্ত্তনটা ঠিক সুসঙ্গত হয় নাই।

স্বদেশ-কুসুম। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত স্বদেশানুরাগমূলক ছড়া ও গান। মূল্য ৵০ আনা।

ছড়াগুলিতে মাঝে মাঝে ভাল ভাব আছে, কিন্তু ছন্দঃ, লয়, মিল নাই বলিলেই চলে। বাড়াইতে হইবে বলিয়াই যেন পুস্তিকাকার ছড়াগুলি অনর্থক দীর্ঘ করিয়া তাহার ভাবও স্থানে স্থানে নষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে পুস্তকের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে। ছেলেদের পুস্তকে—বিশেষতঃ এরূপ পুস্তকে—বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অনেকে সে কথা ভুলিয়া যান। যাহা হউক, লেখকের উদ্দেশ্য ভাল এবং সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইহার দু'একটি ছড়া বেশ সুন্দর হইয়াছে।—এরূপ পুস্তকের আমাদের এখন বিশেষ অভাব আছে। 'মলয়-পবন' 'ভ্রমর-গুঞ্জিত কুঞ্জকানন' 'চাঁদিনী রজনী' 'বিবশা ভামিনী' প্রভৃতির লীলা-নিকেতন ছাড়িয়া আধুনিক তথা-কথিত কবিগণ কি এ দিকে তাঁহাদের লেখনী পরিচালনা করিতে পারেন না?—তাহাতে তবুও কতকটা দেশের [illegible]। অন্ততঃ সে চর্চ্চাতেও লাভ আছে!

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বিস্মৃত জনপদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শক্তি সঞ্চয়।

দিনে দিনে মাসে মাসে ধীরে ধীরে হিন্দুর গৌরবভূমি বিজয়নগর সুসজ্জিত হইতে লাগিল—অরণ্য কুসুমোদ্যান হইল—প্রান্তরে অট্টালিকা উঠিল। মুসলমান অত্যাচারে প্রপীড়িত স্বাধীনতালাভের আশায় ক্ষিপ্ত হিন্দুগণ দলে দলে আসিয়া বিজয়নগরে বাস করিতে লাগিলেন—পরপদদলিত বহুলাঞ্ছিত হিন্দু বীরগণ মনে করিলেন বিজয়নগরই তাঁহাদের পবিত্র তীর্থ—মুক্তি, গৌরব ও স্বাধীনতা বিজয়নগর ভিন্ন আর কোথাও নাই। বিজয়নগর তাই ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইতে লাগিল।

বিজয়নগরের রাজসিংহাসনে যাঁহারা প্রথমে আসিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের 'রাজা' বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন নাই—তাঁহারা প্রধান বলিয়াই প্রখ্যাত হইতেন। বিজয়লক্ষ্মী তখন পতিত হিন্দু জাতির দিকে কৃপাকটাক্ষ পাত করিয়াছিলেন! তাই ১৩৮০ খৃঃ অব্দ মধ্যেই বিজয়নগরাধীপ মহামণ্ডলেশ্বর হরিহর মালপ্রভা প্রদেশের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়া বিজয়নগরের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছিলেন। নুনিজ ইঁহাদেরই দেবরায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দেবরায় কৌশলী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শক্তি সঞ্চয় না করিয়াই অপ্রমেয় শক্তিশালী মুসলমানদিগের সমরে লিপ্ত হইলে শুধু সর্ব্বনাশই হইবে। তাই তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শুধু রাজ্যের শ্রী ও শক্তিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার রাজত্বকালে দেশে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতেছিল।* ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্যের গৌরব রক্ষার্থ তিনি হাম্পিতে যে বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সৌন্দর্য্যে ও রচনাকৌশলে তাহা বহুদিন হিন্দুস্থাপত্যের গৌরবনিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে যখন হিন্দু বিদ্বেষী

---

* This king Deborao reigned seven years, and did nothing therein but pacify the kingdom, which he left in complete tranquility.—Chronicle of Fernao Nuniz.

মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংশ করিয়া সেই শ্মশানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া করতালি দিতে দিতে পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছিল, তখনও তাহারা হাম্পির মন্দির চূর্ণ করে নাই।

নুনিজ কহিয়াছেন প্রথম হরিহর (দেবরায়) যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হইয়া শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় ইহাই স্থির হইয়াছে যে ওরঙ্গল নৃপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র কৃষ্ণ ১৩৪৪ খৃঃ অব্দে বিজয়নগরে আশ্রয় লাভ করিয়া বিজয়নগরপতির সাহায্যে দক্ষিণ ভারত হইতে মুসলমানের নাম কিছুদিগের জন্য উৎখাত করিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বার সমুদ্রপতি বল্‌হোল নৃপতিগণও সহায়তা করিয়াছিলেন। সুতরাং হরিহর বা দেবরায় ১৩৪৩ খৃঃ অব্দেই স্বর্গগত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে হয়।

হরিহরের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রথম বুক্ক যখন বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন দক্ষিণভারতের হিন্দুদিগের হৃদয়ে স্বাধীনতালাভেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তখন সকলের হৃদয়মধ্যে যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল প্রথম বুক্ক সেই বহ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিয়াছিলেন। দেশ তাঁহার নিকট কি চায় স্বদেশবাসী হিন্দুগণ কিসের জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—দেশের প্রাণে কি আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ স্পন্দিত হইতেছিল তাহা প্রথম বুক্কের বুঝিতে বাকি ছিল না। প্রথম বুক্ক সমরকুশলী ও সাহসী ছিলেন। রণাঙ্গণে তাঁহার ভীমবাহু যখন দৃঢ়করে অসি ধারণ করিত তখন সৈনিক হৃদয়ে সাহস ও আশা হইত—শত্রু হৃদয় কম্পিত হইত।

দেশে যখন নবজাগরণের উদ্বোধন সঙ্গীত ধ্বনিত হয়—যখন দেশের আকাশ দেশের বাতাস সেই গান গাহিতে থাকে, স্বদেশপ্রেমিক ভক্ত যখন বিহগকূজনে পত্র মর্ম্মরে নদীকল্লোলে সেই মহান গীতি শুনিতে পায় তখন দেশে লোক সৃষ্টি হইতে থাকে। কর্ম্মবিষাণ যখন ধ্বনিত হয় তখন তাহার অনুগামী হইবার জন্য কর্ম্মীর অভাব হয় না। ইহারই নাম যুগধর্ম্মের রচনা। সে রচনা নিবারণ করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নাই—সেই উত্তালসাগর তরঙ্গ প্রতিরোধ করিতে পারে এমন হিমাচল পৃথিবী-বক্ষে আজিও দেখা যায় নাই—সে বেগের সম্মুখে বাধা বিঘ্ন যাহা কিছু সমস্তই ভাসিয়া যায়, ভাগীরথী তরঙ্গে ঐরাবত যেমন ভাসিয়া গিয়াছিল সেইরূপ ভাসিয়া যায়।

বিজয়নগরে তখন কর্ম্ম-ভেরী ঘোর নাদে বাজিয়া উঠিয়াছিল। যতদূর তাহার ধ্বনি পৌঁছিল—যতদূর সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিল ততদূর নবজাগরণের রোল পড়িয়া গেল। ভেরী নিনাদ করিল—'কে কোথায় হিন্দু আছ, উঠো, জাগো, কর্ম্ম-পথে অগ্রসর হও—বাহুতে বাহুতে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হও—মুসলমান-শৃঙ্খল পদাঘাতে চূর্ণ কর।' সমগ্র দাক্ষি-

ণাত্যে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল।* সময় বুঝিয়া ওরঙ্গলপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র কৃষ্ণনায়ক বল্‌হোল দেবের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল তাহা মুহূর্ত্তে দাবানলে পরিণত হইল—তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন 'হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু।'

অগ্নি জ্বলিল—পতিত বিজিত শঙ্কিত হিন্দুগণ জয় জয় নাদে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন—ওরঙ্গলের মুসলমান কর্ত্তা ইয়াদ-উল-মুল্‌খ দেবগিরিতে পলায়ন করিলেন। হিন্দু ও মুসুলমান সংঘর্ষে হিন্দুর জয়লাভ সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রাজ্ঞের মত হিন্দুর সহায়তা করিতে অগ্রসর হন নাই, এখন তাঁহারাও অস্ত্র ধারণ করিলেন। স্বাধীনতালিপ্সা এইরূপই সংক্রামক বটে—গৌরব-শ্রী এইরূপে ভীরুকেও আপনার চরণ তলে ডাকিয়া আনেন।

হিন্দু যে দিন মুসলমানকে পরাজিত করিল দুর্গ চূড়ায় যে দিন হিন্দুর বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল সেইদিন সমগ্র মালাবার এবং কানারা জ্বলিয়া উঠিল। ওরঙ্গল এবং তেলিঙ্গনাপতিদ্বয়ের উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত, মুসলমান শৃঙ্খল পরিত্যাগ কামনায় ব্যগ্র, হিন্দুর জয়লাভ দর্শনে পুলকিত ও গৌরবান্বিত মালাবার এবং কানারায় সমর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তাঁহারা তখন সমবেত হইয়া দক্ষিণ ভারতের মুসলমান শৈল-প্রাকার চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মুসলম্যানের তুলনায়—মুষ্টিমেয় মুসলমানের তুলনায় হৃদয়ের বলে বলীয়ান—মুসলমান-অত্যাচার হইতে স্বর্গস্বরূপা জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার মানসে দৃঢ়সংকল্পে. বদ্ধ সামান্য কয়েকজন মাত্র হিন্দু নৃপতি সমবেত হইয়া তখন কর্ম্মে অগ্রসর হইলেন।

দেখিতে দেখিতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান সিংহাসন টলিল—দেখিতে দেখিতে মুসলমান খোষগণ একে একে দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ তোমলকের বজ্রমুষ্টি হইতে দাক্ষিণাত্য খসিয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে প্রথম বুক্কের রাজ্য সুদূর উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

বহু শোণিতপাতে হিন্দুগণ যে বিজয়লাভ করিলেন তাহা অধিক দিন স্থায়ী ছিল বলিয়া বোধ হয় না কারণ আমরা ফেরিস্তার ইতিহাসে দেখিতে পাই যে ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন বামনি কুলবর্গে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই বামনি রাজবংশ ১৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। যাহাহউক তখন সকল হিন্দুই স্বাধীনতালাভের জন্য প্রয়াসী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই কয়েক বৎসর মধ্যেই যদিও আলা-উদ্দীন কর্ণাটিক প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

* It seems certain that more if not all Southern India submitted to his (Bukka's) rule probably only too anxious to secure a continuance of Hindu dominations in preference to despotism of the......followers of Islam—sewell.

আলাউদ্দীন মাত্র ৮ বৎসর সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই মহম্মদ দেখিলেন যে বামনি সুলতানের স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা বিজয়নগরের এবং ওরঙ্গলের হিন্দুগণ গলাইয়া ফেলিতেছে। মহম্মদ ক্রোধান্ধ হইয়া সেই অপরাধে কতকগুলি বণিককে হত্যা করিলেন। এদিকে বিজয়নগরাধীপ প্রথম বুক্ক ওরঙ্গল নৃপতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের রাজ্যের কিয়দংশ প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মহম্মদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ জানিতেন তখন তাঁহার সেনাবাসে যুদ্ধায়োজন ছিল না এবং তিনিও অনেককাল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অসমর্থ ছিলেন। সুতরাং কৌশল অবলম্বন করিয়া বিজয়নগরের দূতকে এক বৎসরের জন্য স্বরাজ্যে রাখিলেন এবং বৃথা কালহরণ মানসে নিজের দূতকে বিজয়নগর রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। যাহাহউক, সন্ধি হইল না। সুলতান যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব করিলেন তাহাতে সম্মত হইয়া হিন্দু নৃপতি সন্ধি করিতে পারিলেন না। এ সময়ে নাদেগন্ত মল্লিনাথ* নামে প্রথম বুক্কের সেনাপতি দক্ষিণ ভারতে বীরত্বে ও সাহসে সমর-নৈপুণ্যে ও শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মল্লিনাথের নাম শ্রবণ করিলে মুসলমান সৈনিক কম্পিত হইত।

মহম্মদের সহিত হিন্দুর যুদ্ধ উপস্থিত হইল—সেই যুদ্ধে সুলতান যদিও হিন্দুর দেশ লুণ্ঠন করিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু স্থায়ী জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ওরঙ্গলের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। মহম্মদের ক্রোধ বজ্রের ন্যায় ওরঙ্গদলের উপর নিপতিত হইয়া উহার ধন জন সম্পদ সমস্তই ধ্বংশ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। ফেরিস্তা বলেন মহম্মদ ওরঙ্গল পতির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া ভেলনপত্তনের রাজা হতভাগ্য বিনায়কদেবকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুগণ যদিও সেই সময়ে মহম্মদের গতিরোধ করিতে পারে নাই কিন্তু তাহার পাপের জন্য দণ্ড দিতে ত্রুটী করে নাই। শেষে এমনো ঘটিয়াছিল যে প্রবল প্রতাপান্বিত নৃশংস সুলতান দন্তে তৃণ ধরিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহার বিপুল সৈন্য মধ্যে মাত্র ১৫০০ জন স্বরাজ্যে (কুলবর্গে) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, সুলতান স্বয়ং আহত হইয়া কোন-প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।†

কিছুকাল পরে বুক্ক এবং ওরঙ্গল নৃপতি আবেদন জানাইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে সমরাভিযানের জন্য দিল্লী হইতে সাহায্য লাভের আশাতেই সেরূপ করা হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তখন পারি-

* রাইস সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত শিলালিপিতে মল্লিনাথের নাম পাওয়া যায়।

† After a few days' rest the Sultan retired but was followed and harassed by large bodies of hindus and *completely routed.* Only 1500 men returned to Kulbarga, and the Sultan himself received a severe wound in his arm—Sewell.

বারিক গোলযোগে একান্ত ব্যস্ত থাকায় প্রলোভন সত্বেও বিজয়নগরের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

সুলতান মহম্মদের সাহস বৃদ্ধি হইল। তিনি দেখিলেন কাফেরকে হত্যা করিলে দিল্লীশ্বর রুষ্ট নহেন। তিনি নববলে নবীন উৎসাহে সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং সেনাদল দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গোলকন্দা এবং ওরঙ্গল আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ওরঙ্গল পরাজয় স্বীকার করিল, গোলকন্দার হীরক খনি মহম্মদের রাজকোষে অর্ঘ্য প্রধান করিল, বহুমূল্য প্রস্তররাজি খচিত একখানি রাজ-সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া সুলতান স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফেরিস্তা বলেন সেই সিংহাসনের মূল্য ৪,৮,০০০,০০০ মুদ্রা ছিল!* ১৪২৪ খৃঃ অব্দে ওরঙ্গল চিরদিনের জন্য মুসলমানের হস্তগত হইয়া বামনি সম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল। ওরঙ্গলের পতনেই মুসলমানগণ কৃষ্ণানদীর তীরভাগে কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নাস্তিকবাদের সূচনা।

এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে, কোথায় ও কোন সময় নাস্তিক-বাদের প্রথম সূত্রপাত দেখা যায়।

নাস্তিক-শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া পাণিনি (৪-৪.৬০) নিজের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্বের সূচনা করিয়াছেন। মহাভারতে নাস্তিকবাদের বহু কথা পাওয়া যায়।† রামায়ণে রামের নিকট জাবালির নাস্তিক-বাদ-প্রসঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ।‡ ঐ স্থানে বহুবার নাস্তিকশব্দের প্রয়োগ আছে। মৈত্র্যুপ-নিষদে (৩.৫) নাস্তিক-শব্দ ও দেহাত্মবাদের কথা পাওয়া গিয়াছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও তাহা দেখা গিয়াছে, এবং কঠোপনিষদেও দেখিতে পাইঃ—

* 5 Briggs ii. 307.

† "নায়ং লোকোঽস্তি ন পর ইতি ব্যবসিতো জনঃ।
নালং গন্তুং হি বিশ্বাসং নাস্তিকে ভয় শঙ্কিতে" শান্তি, ১৩৩,১৪।

‡ রামায়ণ, অযোধ্যা, ১০৮; জাবালি বলিতেছেন:—
"স চাপি কালোঽয়মুপ গতঃ শনৈ।
যথা ময়া নাস্তিক বাগুদীরিতা॥" ঐ, ১০-৯০-৩৯

"মনুষ্য মৃত হইলে এই যে সংশয় আছে —কেহ বলেন 'এ থাকে', আবার কেহ কেহ বলেন 'এ থাকে না', ইহা আমি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া জানিব।"*

আরও সেখানে উক্ত হইয়াছে :—

"অবেবেকী, প্রমত্ত ও বিত্তমোহে মূঢ় ব্যক্তির নিকট পরলোক প্রতিভাত হয় না। যে মনে করে—'এই (বর্ত্তমান) লোক আছে পরলোক নাই', সে পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশে আগমন করে।।†

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে, উপনিষৎ বা ব্রাহ্মণ-সময়ে নাস্তিকবাদ বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। এখন মন্ত্রভাগে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় কি না!

বেদের স্তোত্ররূপ মন্ত্রসমূহে দেখা যায়, ঋষিগণ দেবতাদের নিকট নানাবিধ দ্রব্যের প্রার্থনা করিতেছেন। যে কোন রূপেই হউক মনোরথ পূর্ণ হইলে সেই স্তোত্র বা মন্ত্রসমূহের উপর তাঁহাদের যে একটা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া আসিবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মন্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধাই দৃঢ়তর হইয়া, কালক্রমে মন্ত্রসমূহাত্মক বেদের প্রামাণ্য স্থাপনের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিকে বেদের প্রামাণ্য যেমন শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, তদ্বিষয়ক সন্দেহও সেইরূপ আত্ম-প্রকাশ করিতে বিরত ছিল না। দেবতার স্তুতি করিয়াও যে সকল ঋষি নিজের অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই স্তুতি-সমূহের উপর তাঁহাদের ক্রমশঃ সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সেই সন্দেহই প্রবলরূপে পরিণত হইয়া কেবল স্তুতিরই প্রামাণ্য নষ্ট করে নাই, স্তুতিভাজন দেবতা-গণেরও অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছিল। এই জন্যই ঋগ্বেদে (৮. ১০০. ৩) এক জন ঋষি বলিতেছেন :—

'হে সংগ্রামেচ্ছুগণ, তোমরা সত্য ইন্দ্রের স্তুতি কর, যদি ইন্দ্র সত্য থাকে। (ভার্গব) নেম বলেন—ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে ইন্দ্রকে দেখিয়াছে? কাহাকে আমরা স্তব করিব?"‡

ইন্দ্র ইহা শুনিয়া নিজেই বলিতেছেন :— "হে স্তুতিকারিন্, এই আমি রহিয়াছি, এই তোমার নিকট স্থিত আমাকে দেখ।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্তুয়াহম্॥" কঠ-,১-১-২০।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥" ১-২-৬।

-তুলনীয়—

"যদিদং মন্যসে রাজন্নায়মস্তি কুতঃ পরঃ।
প্রতিস্মারয়িতারস্ত্বাং যমদূতা যমক্ষয়ে॥" মহাভারত, শান্তি, ১৫০-১৯।

"প্রসু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রোঽস্তীতি নেম উত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥"

আমি মহত্ত্বে সমস্ত ভুবনকে অভিভূত করি। সত্য-উপদেশক বিদ্বানেরা স্তোত্র দ্বারা আমাকে বর্দ্ধিত করেন। বিদারণশীল আমি ভুবন সমূহকে নিরতিশয় বিদীর্ণ করি।"*

আবার অন্যত্র (২. ১২. ৫) উক্ত হইয়াছেঃ—

"যে ভয়ানকের সম্বন্ধে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে—'সেই ইন্দ্র কোথায়?' তাঁহার সম্বন্ধে অন্যেরা বলিয়া থাকেন—'ইন্দ্র নাই', ইন্দ্র উদ্বেজক হইয়া অরিগণের ধনসমূহ বিনষ্ট করেন, অতএব সেই ইন্দ্র আছেন বলিয়া ইঁহাতে বিশ্বাস কর!"

আর একজন বলিতেছেন (১: ৫৫. ৫)—

'ইন্দ্র যখন মেঘসমূহের প্রতি হননসাধন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তখন তাহার পরেই দীপ্তিমান্ তাঁহাতে সকলে শ্রদ্ধা করে।'†

এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মন্ত্রসময়েই কাহারো কাহারো দেবতা-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কেহ কেহ তাহা একবারেই অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বা অপরের দেবতা-বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য চেষ্টাও করিতেছিলেন।

দেবতার উপর বিশ্বাস নষ্ট হইবার পর কালক্রমে দেবতাপ্রকাশক মন্ত্রসমূহেও অর্থাৎ বেদেও অবিশ্বাস আসিয়া পড়িল।‡ একদল স্পষ্টতই ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন যে, মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ নাই; এবং অপর আর একদল, তাহার অর্থবত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। এইরূপেই বেদের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য লইয়া তুমুল বিচারের অবতারণা শেষে দর্শনশাস্ত্রে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে যাঁহারা বেদের নিরর্থকত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের, নাম আমরা জানিতে পারি—ইঁহার নাম কৌৎস।

কৌৎস বলেন—মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ থাকিতে পারে না; কেননা, যে সকল লৌকিক বাক্য অর্থ প্রকাশ করে, তাহার সহিত বৈদিক মন্ত্রসমূহের মিল নাই। আমরা যদি বলি—'পাত্রমাহর' (পাত্র আনয়ন কর) তবে অর্থ বুঝা যায়, আবার যদি বলি—'আহর পাত্রম্' তবুও অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু মন্ত্রসমূহে তাহা হইবার উপায় নাই, তাহার পাঠ করিবার যে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম আছে তাহার ব্যতিক্রম হইলে সে আর ঐ অর্থ প্রকাশ করিবে না। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে (হে অগ্নি পানের জন্য আগমন করুন)"§ —এই না বলিয়া যদি বলি—"বীতয় আয়াহি অগ্নে," তবে আর অর্থ প্রতীতি হইবে না! তবেই অর্থযুক্ত

* ঋগ্বেদ, ৮-১০০-৪।

† দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদ, ১-১০৩-৫; ১০৪-৬; Max Muller's Lectures on the Origin of Religion pp. 140-143; 307-310.

‡ বেদে অবিশ্বাস হইবার আরও একটি কারণ ছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

§ সামবেদ, ১-১-১-১।

বাক্যের সহিত বৈদিক মন্ত্রসমূহের যখন বৈষম্য দেখা যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলা যাইবে যে, তাহাদের অর্থ আছে? আবার তাহাদের প্রকাশিত অর্থও নিতান্ত অনুপপন্ন। দেখ, কুশচ্ছেদন করিবার জন্য ক্ষুর সংযোগ করিয়া[১] বলা হইতেছে—"হে ওষধি, ইহাকে রক্ষা কর!"[২] যে অচেতন ওষধি নিজেকেই রক্ষা করিতে পারে না সে অন্যকে কিরূপে রক্ষা করিবে? আবার ঐ স্থানেই কুশ ছেদন করিতে করিতেই বলা হইতেছে—"হে ক্ষুর, ইহাকে হিংসা করিও না!"[৩] কোন লোক যদি এক বলিয়া আর এক করে, তবে তাহাকে আমরা পাগল বলি। মন্ত্রসমূহে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থও অনেক দেখা যায়। এক স্থানে বলিতেছে—"এক রুদ্র অবস্থান করিতেছে, দ্বিতীয় নাই."[৪] অন্য স্থানে বলিতেছে—"অসংখ্য সহস্র রুদ্র!"[৫] এক স্থানে বলিতেছে "ইন্দ্র শত্রুহীন;"[৬] আর এক স্থানে বলিতেছে—"ইন্দ্র শত সেনাকে জয় করিয়াছেন!"[৭] আর এক মন্ত্র বলিতেছে—"অদিতি দ্যৌ, অদিতি অন্তরীক্ষ।১৭। যেই অদিতি, সেই অন্তরীক্ষ! ইহা কে বুঝিবে? আবার এমনও কতক গুলি কথা আছে, যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, যেমন—"অম্যক্," "কানুকা," ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ নাই!

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে[৮] কৌৎসের আপত্তি সমূহ খণ্ডন করিয়া মন্ত্রের অর্থবত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। জৈমিনিও তাঁহার মীমাংসাদর্শনে (১. ২. ৩২-৫৩) কৌৎসের মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এস্থানে যাস্ক ও জৈমিনির প্রত্যুত্তর উদাহৃত হইল না।

তৃতীয় অধ্যায়।

হেতুবাদ

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এইরূপে মন্ত্রসমূহাত্মক বেদের প্রামাণ্য আক্ষেপ হইতেই ভারতে হেতুবাদ (rationalism) জন্মগ্রহণ করে. এই হেতুবাদ এক সময়ে এতদূর প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রচলিত বৈদিক পথকে নিতান্ত ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল। হেতুবাদে আকৃষ্ট হইয়া সেই সময়ের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ নূতন নূতন

১। কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র, ৭-২-১১।

২। "ওষধে ত্রায়স্ব, স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ"—যজু-বাজ-৪-১-৬।

৩। "এক এব রুদ্রোঽবতস্থে ন দ্বিতীয়ঃ" (?)

৪। যজু-বাজ- ১৬-৫৪।

৫। ঋগ্বেদ, ৮-৭-২১-২।

৬। ঋগ্বেদ, ৮-৫-২২-১।

৭। ঋগ্বেদ, ১-৬-১৬-৫।

৮। নিরুক্ত, ১-৫-১।

পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং ইহারই ফলে সাঙ্খ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান আমরা দেখিতে পাই; এই তিন ধর্ম্মই বৈদিক কর্ম্মপথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রকার যদি মনে করিতেন যে, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে চরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তবে তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র লিখিতে হইত না। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডও লৌকিক উপায়ের ন্যায় হিংসাদি-দোষে অবিশুদ্ধ, এবং তাহার ফল নশ্বর, এবং তারতম্যযুক্ত; ইহাতে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না।[১] ইহাকে হেতুবাদ ভিন্ন কি বলা যাইবে? ইহাতে কি মনে করা যায় না যে সাঙ্খ্যকার বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না? আজকালকার দিনে কেহ অনায়াসে একথা বলিতে পারেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের প্রভাব-পূর্ণ সময়ে কপিলের মত ব্যক্তিকে কত দূর সাহস করিয়া তাহা বলিতে হইয়াছিল!

সাঙ্খ্যদর্শনকার যদিও এইরূপে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে অবিশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সম্পূর্ণ ভাবে বেদকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। কতক কতক বিষয়ে তিনি বেদ অনুসরণ করিয়াই নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়াছেন। স্থূলত বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, কপিল বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে স্পষ্টত অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানকাণ্ডকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] এইরূপে বেদের এক অংশে প্রামাণ্য অস্বীকার করিলেও, কপিল অপর অংশে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এবং সেই জন্যই বর্ত্তমান সাঙ্খ্যসূত্রে (৫-৪০-৫০) বেদের প্রামাণ্য-প্রতিপাদন দেখা যায়। কপিল অংশত বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার "তন্ত্র মহাজন পরিগৃহীত" হইয়াছিল,[৩] —যদিও তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে "আত্ম ভেদ কল্পনা ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা হেতু বেদবিরুদ্ধ ও বেদানুসারী মনুবচনের বিরুদ্ধ"।[৪] পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে সাঙ্খ্যমত যেরূপ বহুলভাবে গৃহীত হইয়াছে, অপর মত সেরূপ নহে, ইহার প্রধান কারণ এই যে, কপিল আংশিকরূপেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। চিরপরম্পরাক্রমে সমাগত বেদপ্রামাণ্যের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুত্থান এইরূপ আংশিক হওয়াই খুব সম্ভব।[৫]

অংশত প্রত্যক্ষ বেদবিরোধ থাকিলেও

১। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়-যুক্তঃ"; সাঙ্খ্যকারিকা, ২।

২। "যদ্যপি চানুশ্রবিক ইতি সামান্যেনাভিহিতং, তথাপি কর্ম্মকলাপাভিপ্রায়ো দ্রষ্টব্যঃ, বিবেকজ্ঞানস্যাপ্যানুশ্রবিকত্বাৎ—"; বাচস্পতিমিশ্র, সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী, ২।

৩। "মহাজন পরিগৃহীতানি মহান্তি সাঙ্খ্যাদি তন্ত্রাণি সম্যগ দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তানীতি"—শাঙ্কর ভাষ্য বেদান্ত দর্শন, ২-২-১।

৪। "অতশ্চ সিদ্ধম্—আত্মভেদ কল্পনয়াপি কপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধং বেদানুসারি-মনুবচনবিরুদ্ধং চ, ন, কেবলং স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনয়ৈব"—শাঙ্কর ভাষ্য, বেদান্ত দর্শন ২-১ ২।

৫। ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও যজমান-পত্নী।

কপিলের তন্ত্র যে মহাজন গৃহীত হইয়াছিল তাহার আরও একটি কারণ আছে। কপিল যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মবিধির উপর লোকের শ্রদ্ধা-হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। ভূয়োভূয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও বস্তুত তাহাতে পরম পুরুষার্থের আশা না দেখিয়া লোকেরা কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর কতকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। উপনিষদে ইহার উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে উক্ত হইয়াছে :—

"যাহাদিগের মধ্যে অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, অষ্টাদশ জন-যুক্ত ৫ যজ্ঞরূপ প্লব (ভেলা)-সমূহ অদৃঢ়। যে সকল মূঢ় ইহাঁকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়"।

"মূঢ়গণ বহুপ্রকার অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া মনে ভাবে যে, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি; যে হেতু কর্ম্মিগণ আসক্তি-বশতঃ ভালরূপে জানিতে পারে না, সেই জন্য কর্ম্মফলক্ষয়ে তাহারা আবার চ্যুত হয়।"

"প্রমূঢ়গণ যাগ ও পূর্ত্ত কার্য্যকেই প্রধান মনে করিয়া অপর শ্রেয়কে জানে না; অতএব তাহার সুকৃত স্বর্গপৃষ্ঠে (কর্ম্মফল) ভোগ করিয়া এই হীনতর (মর্ত্ত্য) লোকে প্রবেশ করে।"[১]

তদানীন্তন লোকেরা এইরূপে কর্ম্মের নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কপিল যখন বৈদিক ক্রিয়াকে স্পষ্টত 'অবিশুদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সাধারণেরা তাহা শুনিয়া তত বিচলিত হয় নাই; বরং আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণই করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কপিলের নূতনত্ব এইটুকু যে, তিনি হিংসাশ্রিত দেখিয়া বৈদিক কর্ম্মকে 'অবিশুদ্ধ' বলিয়াছেন; নতুবা কর্ম্মফল যে ক্ষয়শীল ও তারতম্যচ্যুত তাহা তাঁহার নিজের উদ্ভাবন নহে, বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল।

অন্যত্র পশুবধ করিলে পাপ হইবে, কিন্তু যজ্ঞে পশুবধ করিলে পাপ হইবে না; —"আম্নায় বচনাদ্ অংহিসা প্রতীয়েত (নিরুক্ত, ১,৫,২)"—অর্থাৎ তাদৃশ স্থানে বেদের কথাতেই বুঝিতে হইবে যে, হিংসা করা হয় না। কর্ম্মবাদিগণের এই সমস্ত কথার দিকে কপিল কোন দৃক্পাত না করিয়া কেবল হেতু বা যুক্তি-বলে স্থাপন করেন যে, হিংসাশ্রিত বলিয়া বৈদিক কর্ম্মকেও অবিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বেদান্ত দর্শনও জ্ঞানপ্রধান সত্য; কিন্তু কপিল যে ভাবে কর্ম্মকাণ্ডকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বেদান্তদর্শন সেরূপ পারে

১। 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্ত মবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেহ ভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি। অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণ লোকাশ্চাবন্তে॥ "ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বে মং লোকং হীনতরং চাবিশন্তি॥" মুণ্ডক-উপনিষৎ, ১-২৭,৯,১০।

দ্রষ্টব্য—"তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে—"

নাই। জ্ঞানকে প্রধান আসন দিলেও বেদান্তদর্শন কর্ম্মকে একবারে অবজ্ঞাও করিতে পারেন নাই, তাহাকে টানিয়া লইতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কাপিল-দর্শন অপেক্ষা বেদান্তদর্শনের ইহাই বিশেষত্ব।

হেতুবাদ অবলম্বনে কপিল বেদের অর্দ্ধেক প্রামাণ্য উড়াইয়া দিয়াছিলেন, অর্দ্ধেক অবশিষ্ট ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া ঐ অবশিষ্ট অর্দ্ধেকও উড়াইয়া দেয়। বুদ্ধদেব এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"হে (কেশপুত্র নগরীর) কালামগণ, আগমন কর, অনুশ্রুতি বলিয়া নহে, পরম্পরা বলিয়া নহে, ঐতিহ্য বলিয়া নহে, কোন (প্রাচীন) পেটক হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়া নহে, তর্ক হেতু নহে, নয় (পদ্ধতি) হেতু নহে, আকারচিন্তা হেতু ?) নহে মতবিশেষের আলোচনায় ক্ষতি হেতু নহে, ভব্যরূপ বলিয়া নহে, প্রমাণ আমাদের গুরু এই বলিয়া নহে, কিন্তু হে কালামগণ, যখন তোমরা নিজেই জানিতে পারিবে যে, এই ধর্ম্মসমূহ কুশল, এই ধর্ম্মসমূহ অনবদ্য, এই ধর্ম্মসমূহ বিজ্ঞজন-প্রশংসিত, এই ধর্ম্ম সমূহ সম্পূর্ণ, এবং গৃহীত হইলে ইহারা সুখ ও হিতের জন্য হইবে, হে কালামগণ, তোমরা তখনই তাহা গ্রহণ করিয়া বিহরণ করিবে।"১

বুদ্ধদেব কিরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই প্রথার দ্বারাই সুস্পষ্ট জানা যাইবে।

হেতুবাদ অবলম্বনে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া কেবল যে সাঙ্খ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মই অভ্যুত্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; ইহাদের পূর্ব্বে ও পরেও অনেক হেতুবাদী বা হৈতুক ছিল। মহাভারতের বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। এক স্থানে লিখিত হইয়াছে "বেদ সমূহের অপ্রামাণ্য শাস্ত্রসমূহের অতিক্রম ও সর্ব্বত্র অব্যবস্থা, এই সমুদায় নিজের পাত্রতার (যোগ্যতার) বিনাশক। যে পণ্ডিতাভিমানী ব্রাহ্মণ নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইয়া বেদের নিন্দা করে, যে হেতুবাদী বিজেতা সাধুগণের নিকট হেতুবাদ সমূহ বলিয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে কঠোর বাক্য বলে, ও তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বাক্য বলে এবং যে মূঢ় সর্ব্ববিষয়ে শঙ্কাযুক্ত, মূর্খ ও কটুভাষী, তাহাকে কুক্কুরের ন্যায় জানিবে।"২

১। "এথ তুম্হে কালামা, মা অনুস্সবেন, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরায় বা মা পিটক সম্পদানেন, মা তক্কহেতু, মা নয়হেতু, অকার পরিবিতক্কেন, মা দিট্‌ঠি নিজ্ঝানক্‌খন্তিয়া, মা ভব্যরূপতায়, মা সমনো নো গরু'তি, যদা তুম্‌হে কালামা অত্তনা'ব জানেয্যাথ—ইমে ধম্মা কুসলা, ইমে ধম্মা অনবজ্জা, ইমে ধম্মা বিঞ্ঞুপসত্থা, ইমে ধম্মা সমত্তা সমাদিন্না হিতায় সুখায় সংবত্তন্তীতি,—অথ তুম্‌হে কালামা উপসম্পজ্জ বিহরেয্যা'যতি।" অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩-৬৫-১৪।

২। "অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাঞ্চাতিলঙ্ঘনম্। অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশন মাত্মনঃ॥
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম॥

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ;—

"এমনও কতকগুলি হেতুবাদী পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদিগকে সহজে কোন সিদ্ধান্ত বুঝাইতে পারা যায় না। ইঁহাদের পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ়। এই মূঢ়গণ বলিয়া থাকেন যে,—"এই কিছুই নাই।" ইঁহারা অনৃত চিন্তা করেন, এবং জনসমাজে বক্তৃতা করেন। এই বহুশ্রুত বাবদূকগণ সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে।"[১]

মহাভারতেই অপর আর একস্থানে এক জন নিজের শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ বলিতেছেন ;

"আমি নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত, বেদনিন্দুক, হৈতুক পণ্ডিত ছিলাম। আমি হেতুবাদ সমূহ বলিতাম, সভাসমূহেও আমি হেতুযুক্ত বাক্যই বলিতাম। বেদবাক্যের বিচারে আমি দ্বিজগণকে পরুষ-বাক্য বলিতাম ও আক্রমণ করিয়া বলিতাম। আমি নাস্তিক ও সর্ব্বত্র সন্দেহ-যুক্ত ও মূর্খ হইলেও পণ্ডিতাভিমানী ছিলাম তাহারই ফল স্বরূপ আমার এই শৃগালত্ব জাত হইয়াছে!"[২]

এই হৈতুকগণ কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মহাভারতের উল্লিখিত কথাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। সেই বহুশ্রুত বাবদূকগণ সমস্ত বসুধাতে বিচরণ করিতেছিল—"চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ!"[৩]

হেতুবাদান্ বদন্ সৎসু বিজেতা হেতুবাদিকঃ। আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈবহি
সর্ব্বাভিশঙ্কী মূঢ়শ্চ বালঃ কটুকবাগপি য়োদ্ধব্যস্তাদৃশস্তাত, নরং শ্বানং হিতং বিদুঃ॥"

মহাভারত, ১৩-৩৭-১১-১৪।

দ্রষ্টব্য :—

"তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিনঃ। হেতুবাদান্ বহূনাহুঃ পরস্পর জিগীষবঃ॥"

মহাভা- ১৪-৮৫-২৭।

১। "ভবন্তি সুস্বরাবর্ত্তা হেতুমন্তোহপি পণ্ডিতা। দৃঢ় পূর্ব্ব স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতি বাদিনঃ॥
তানৃতন্তাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি। চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ॥"

মহাভা-১২-১৯-২৩-২৪।

২। অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ। আক্রোষ্টা চাভিযোক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিত মাণিকঃ। তস্যেয়ং ফল নিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজঃ॥"

মহাভা, ১২-১৮০-৪৭-৪৯।

৩। তুলঃ—

"নৈরাত্ম্যবাদ কুহকৈ মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ। ভ্রাম্যল্লোকো ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরং তু যৎ॥"

মৈত্র্যুপনিষৎ, ৭-৮।

চতুর্থ অধ্যায়।

হেতুবাদের ফল।

হেতুবাদের উৎপত্তিতে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা দ্বারা উপকারও কম হয় নাই। হেতুবাদের দ্বারাই মধ্যযুগে ভারতের বুদ্ধি বৃত্তি পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হেতুবাদ অবলম্বনেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী উত্থিত হইয়া বৈদিকগণকে আক্রমণ করেন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরস্পরকে জয় করিবার জন্য সে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় যে বিশেষ ভাবে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারা যায় না। তাঁহাদের এই পরিশ্রমের ফলেই দর্শন শাস্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; সেই পরিশ্রমের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনগণের সময়ে বিবিধ দার্শনিক মত অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল; এবং সেই পরিশ্রমের ফলেই আমাদের পরম গৌরবের বিষয় প্রাচীন ও নব্য এই উভয়বিধ ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের মত ন্যায়দর্শন যদিও নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া দাবী করে, এবং যদিও তাহা বর্ত্তমান আকারে সেই উক্তির কতকটা সার্থক্য রক্ষা করিতেছে, তথাপি, তাহার মূলে যে হেতুবাদ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, ১ তাহা দ্বারাই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, আরও বুঝা যাইবে যে, সেই সময়ে আন্বীক্ষিকী নামে প্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শন নিরর্থক বলিয়া গণ্য হইত। বেদবাদিগণ তাহা অনুসরণ করিতেন না। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহাদের এতদূর পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন—ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পরজন্মে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়!

আজকাল ন্যায়দর্শন যে আকারে দেখা যায়, তাহার সম্বন্ধে ও কথা ঠিক খাটে না; ইহা ঐ পূর্ব্ব-প্রচলিত হেতুবাদের ব্রাহ্মণ-সংস্করণ। হেতুবাদিগণ নিরর্থক আন্বীক্ষিকী অবলম্বন করিয়া যেমন বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতেন, বেদবাদিগণও সেই প্রকার আন্বীক্ষিকীই অবলম্বন করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন; যে হেতুবাদে বেদের প্রামাণ্য খণ্ডিত সেই হেতুবাদের দ্বারাই তাহার স্থাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান ন্যায়দর্শনকার বুঝিয়াছিলেন যে, হেতুবাদ অবলম্বন না করিলে উপায় নাই; তাই তিনি জল্প, বিতণ্ডা ও ছলাদির তত্ত্বজ্ঞানেও নিঃশ্রেয়স অধিগম হইবে—এই অদ্ভুত কথা প্রচার করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এ কথা তাঁহার নিজের মনেই জাগিয়াছিল, এবং সেই জন্যই বলিয়াছেন—"যেমন বীজের অঙ্কুরকে সংরক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে কণ্টকশাখা দ্বারা আবরণ করা হয়, সেইরূপ তত্ত্বনিশ্চয়কে সংরক্ষণ করিবার জন্য জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োজন। বিজিগীষা প্রবৃত্ত

১। রামা-২-১০০-৩৯; মহাভা-১২-১৮০-৪৭; ১৩-৩৭-১২।

হইয়া জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা বিচার করিতে হয়।"[১] তাঁহার পরবর্ত্তী ভাষ্যকার পক্ষিল স্বামী ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকর জল্প-বিতণ্ডার দ্বারা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি না দেখিয়া বলিয়াছেন—জল্প-বিতণ্ডা "বিদ্যার পরিচালনের জন্য, লাভ খ্যাতির জন্য নহে।"[২] বাচস্পতি মিশ্র ইহাই সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"কুদর্শন বলে যাহার মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদিত হইয়াছে, এতাদৃশ কোন ব্যক্তি দুর্বিদগ্ধতা হেতু বা সদ্বিদ্যার বৈরাগ্যহেতু লাভ ও খ্যাতির প্রার্থী হইয়া জনসমূহের আধারভূত রাজগণের সম্মুখে বেদ ও ব্রাহ্মণ ও পরলোকাদির দূষণে প্রবৃত্ত হয়, আর বাদী যদি অপ্রতিভতা হেতু তাহার সমীচীন দূষণ দেখিতে না পান, তবে তিনি জল্প ও বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া জিগীষা প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত তত্ত্ববিচার করিবেন—বিদ্যার পরিপালনের জন্য। রাজাদের মতিভ্রম হেতু তদনুযায়ী প্রজাগণের যেন ধর্ম্মবিপ্লব না হয়—ইহাও জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োজন, দৃষ্টফল লাভ ও খ্যাতি তাহার প্রয়োজন নহে; কেন না পরহিতপ্রবৃত্ত পরম কারুণিক মুনি (গৌতম) পরদোষসাধক উপায়কে উপদেশ দিতে পারেন না।"[৩]

এই ত প্রাচীন ন্যায়ের কথা। নব্য ন্যায়ের সম্বন্ধেও ইহাই; নবন্যায়ের মূলেও এই হেতুবাদ। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ধারণা ছিল, সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বচিন্তামণিকার মৈথিল-পণ্ডিত শ্রীগঙ্গেশ উপাধ্যায়ই (১৪শ শতাব্দী) নব্য ন্যায়ের উদ্ভাবন কর্ত্তা। কিন্তু যখন ধর্ম্মকীর্ত্তির (৭ম শতাব্দী) ন্যায়বিন্দু আমাদের হস্তগত হইল, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল নব্য ন্যায়-উদ্ভাবনের গৌরব ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্য নহে, বৌদ্ধগণের প্রাপ্য। ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধ ছিলেন। তাহার পর তিব্বত-মিশনের কল্যাণে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রমাণ সমুচ্চয় প্রভৃতি কতকগুলি তর্কশাস্ত্রের তিব্বতীয় অনুবাদের কথা প্রচারিত হইলে জানিতে পারা গেল নব্যন্যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর অর্ব্বাচীন নহে, এবং তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তা বৌদ্ধ ভিন্ন অপর নহে।

বৌদ্ধগণ এতাদৃশ তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবনে কি জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন? তাহার একমাত্র উত্তর—যে জন্য প্রাচীন ন্যায় বা আন্বীক্ষিকীর সৃষ্টি, নব্য ন্যায়েরও সৃষ্টির তাহাই কারণ, এবং তাহা হেতুবাদের প্রভাব হইতে নিজ নিজ ধর্ম্ম বা মতকে নির্ব্বিঘ্নে স্থাপন ও রক্ষণ করা।

১। 'তত্ত্বাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থং জল্প বিতণ্ডে বীজপ্ররোহ সংরক্ষণার্থং কণ্ঠকাবরণবৎ ॥ তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনম্ ॥

—ন্যায়দর্শন, ৪ ২-৫০-৫১।

২। বাৎসায়নভাষ্য ও ন্যায় বার্ত্তিক, ৪-২-৫১।

৩। বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা, ৪-২-৫১। তুলনীয়।—

"দুঃশিক্ষিত কুতর্কাংশলেশ বাচালিতাননাঃ। শক্যাঃ কিমন্যথা জেতুং বিতণ্ডাদোষ মণ্ডিতাঃ ॥
গতানুগতিকো লোকঃ কুমার্গং তৎ প্রতারিতঃ। মাগাদিতিচ্ছলাদীনি প্রাহ কারুণিকো মুনিঃ ॥"

ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয় টীকা, ৩৩

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেতুবাদের আবির্ভাবেই আমাদের দর্শন শাস্ত্রগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভিজ্ঞগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। জীব-আত্মা, ইহলোক-পরলোক, বেদ-ঈশ্বর, প্রভৃতি যে বিষয় লইয়া হেতুকগণ বিরোধ উপস্থিত করেন, দর্শনশাস্ত্র সমূহে প্রধানত সেইগুলিই আলোচিত হইয়াছে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে এখানে আর বেশী সময় ব্যয় না করিয়া মীমাংসা দর্শনে হেতুবাদের প্রভাব বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব মীমাংসা শ্রুতি ও স্মৃতির পরম পক্ষপাতী, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন কোন স্মৃতি সম্বন্ধে ইহার মন্তব্য দেখিলে আজ কালিকার হিন্দু সমাজকে স্তব্ধ হইতে হয়। জ্যোতিষ্টোম যাগে অগ্নীষোমীয় পশুর তন্ত্র আরম্ভ হইলে বৈসর্জ্জন নামক একটি হোমের বিধান আছে। সেই সময়ে যজমান, এবং তাঁহার পত্নী, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নববস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ঐ বস্ত্রের শেষে স্রুক-দণ্ড বন্ধন করিয়া হোম করিতে হয়। সেই নববস্ত্রখানির সম্বন্ধে এক জন স্মৃতিকার বলিয়াছেন—"বৈসর্জ্জন হোমীয়ং বাসোঽধ্বর্য্যুর্গৃহ্লাতি"—বৈসর্জ্জন হোমের কাপড় খানি অধ্বর্য্যু গ্রহণ করিবেন। এই স্মৃতি বচনের প্রামাণ্য আছে কি না—এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে,[১] এ স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না, কেন না, এ স্মৃতির মূল শ্রুতি নহে। তবে কি? লোভ! "লোভাদাচরিতবন্তঃ কেচিৎ তত এষা স্মৃতিঃ; উপপন্ন তরঞ্চৈতদ্ বৈদিকবচন কল্পনাৎ।"[২] লোভবশত কেহ কেহ ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ স্মৃতির উৎপত্তি; এই স্মৃতির মূল বিষয় বৈদিকবচন কল্পনা করা অপেক্ষা ইহাই উপপন্নতর। মীমাংসা-দর্শন কি সাহস দেখাইয়াছেন! ইহা কি হেতুবাদ নহে? এরূপ দৃষ্টান্ত তাহাতে বিরল নহে। অর্থবাদবাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য খণ্ডনও ইহার অপর উদাহরণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

নাস্তিকবাদের গ্রন্থ।

এই বার আমরা নাস্তিকবাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নাস্তিকবাদের কোন পৃথক গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তাহা যে এককালে ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যে স্থানে নাস্তিক বাদের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত বচনাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল বচন কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহার নির্দ্দেশ সব সময় পাওয়া যায় না। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের রীতিই এইরূপ ছিল যে, কোনো বচন উদ্ধৃত করিলেও, কোন্ গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত, গ্রন্থকারগণ তাহা লিখিতেন না। নাস্তিকবাদ সম্বন্ধেও সেইরূপ;

১। মীমাংসাদর্শন, ১-৩-৩-৪।
২। ঐ শাবর ভাষ্য।

বহুস্থানে ইহা আলোচিত হইয়াছে, বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন্ গ্রন্থের তাহা প্রায়ই বলা হয় নাই। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে "তদুক্তং" বলিয়া গ্রন্থকার অনেক বচন তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার আকর স্থানের উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহস্পতি নাস্তিক-বাদ প্রচার করেন। এই বৃহস্পতির নামে একখানি সূত্রগ্রন্থ ছিল, এবং ইহা বৃহস্পতি সূত্র বা বার্হস্পত্য সূত্র বলিয়া অভিহিত হইত। বার্হস্পত্য সূত্রের কয়েকটি মাত্র সূত্র আমরা দেখিতে পাই। সদানন্দ যতি তাঁহার অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে বার্হস্পত্য সূত্র বলিয়া তিনটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] বেদান্ত-দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যও 'বার্হস্পত্যসূত্র' নাম দিয়া কয়েকটি সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন।[২] শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে (বে-দ-৩-৩-৫৩) "চৈতন্য বিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষঃ"—এই একটি বার্হস্পত্যসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা যে বার্হস্পত্যসূত্র তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ, সদানন্দ যতি তাঁহার অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে স্পষ্টত বার্হস্পত্যসূত্র বলিয়া ঐ সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তত্রত্য বাক্য-পংক্তি দেখিয়া বোধ হয় যে, ঐ সূত্রটির অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যটিও একটি সূত্র, বা অন্তত কোনো সূত্রের অক্ষর হইবে।[৩]

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে "তদেতৎ সর্ব্বং বৃহস্পতিনাপ্যুক্তম্" বলিয়া কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সেই শ্লোকগুলিও বৃহস্পতি-রচিত, অথবা বৃহস্পতির মতানুসারে অপর কাহারো দ্বারা রচিত গ্রন্থ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্লোকের মধ্যে দুইটি বিষ্ণুপুরাণের মহামোহ উপাখ্যানের শ্লোক দ্বয়ের সহিত অর্থে ও অক্ষরে অনেকাংশে সমান।[৪]

১। তথাচ বার্হস্পত্য সূত্রাণি—

"চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ। কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ। মরণমেবাপবর্গঃ।"

২য় মুদ্গর, ১২১ পৃঃ, (সোসাইটি সংস্করণ)।

২। বেদান্ত দর্শন, ৩.৩-৫৩। ভাস্করাচার্য্যের ভাষ্য কাশীর "চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থ বলীর" মধ্যে শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদন করিতেছেন। সম্প্রতি একখণ্ডমাত্র বাহির হইয়াছে; ইহাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষোড়শ সূত্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। See essays on the Religion and Philosophy of the Hindus by H. T. Colebrooke, 1858, p. 260.

৩। "...তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্ বিজ্ঞানং, চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহুঃ।" বে-দ ৩-৩-৫৪।

৪। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে—

"পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তি কারণম্। গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয় কাল্পনম্॥"

বিষ্ণুপুরাণে (৩-১৮-২৬ ২৭)—

"নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ। দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥"

ইহা ছাড়াও যে নাস্তিকবাদের গ্রন্থ ছিল, তাহা অদ্বৈতব্রহ্ম সিদ্ধি প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু তাহাদের নাম জানিবার উপায় নাই।

নাস্তিকবাদ সম্বন্ধে জনমধ্যে লোকগাথা বা প্রবাদ বাক্যেরও* সৃষ্টি হইয়াছিল। এতাদৃশ একটি বাক্যের সহিত আমরা পরিচিত আছি। যথা—

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥†

নাস্তিকবাদ অল্প-বিস্তর বহু দর্শন গ্রন্থেই আলোচিত হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে তৎসম্বন্ধে অনেকটা জানিতে পারা যায়—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (চার্ব্বাক-দর্শন), ষড়্দর্শন সমুচ্চয় (লৌকায়তিক-দর্শন), অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি (২য় মুদ্গর), বেদান্ত দর্শন-শারীরক ভাষ্য (৩-৩-৫৩), মীমাংসাদর্শন-শাবর ভাষ্য (১-১-৫), শাস্ত্রদীপিকা (১ম পাদ ৯৫ পৃঃ, কাশী), বৈশেষিক সূত্রোপস্কার (৩, ২-৪), ন্যায়-দর্শন (৩-২ ৩৬-৪০), মৈত্র্যুপনিষৎ (৭-৮-৯), ও নৈষধ চরিত (১৭)। নৈষধ চরিতে নাস্তিকবাদ কৌতুকপ্রদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।‡

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম।

মুক্তি সম্বন্ধে তিনটি মুখ্য তত্ত্ব।

(ফরাসী হইতে)

প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই দুইটি অঙ্গ দেখা যায়,—একটি জ্ঞান, আর একটি কর্ম্ম। প্রথমটি দার্শনিক অংশ—উহা কতকগুলি মত ও বিশ্বাস লইয়া গঠিত, দ্বিতীয়টি আনুষ্ঠানিক অংশ,—উহা কতকগুলি ক্রিয়া কর্ম্মের সমষ্টি;—এবং ইহাকেই প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম বলা যায়। গোড়ায়, প্রত্যেক ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশ খুব সাদাসিদা এবং মত ও বিশ্বাসের অংশ খুব অল্পই হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই মত ও বিশ্বাস গুলি বিকাশ লাভ

* সংস্কৃতে যাহা 'আভাণক' বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

† অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে ইহার পাঠান্তর এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রঞ্চ পীতঞ্চ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মগুণ্ঠনম্। প্রজ্ঞাপৌরুষ হীনানাং জীবোহলাভ জীবিকাম্॥"

আবার নৈষধ চরিতে (১৭-৩৯) এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্। প্রজ্ঞাপৌরুষ নিস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্॥"

‡ ইংরাজীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

H. T. Colebrooke's Essays on the Religion and Philosophy of the Hindus (1858 pp. 259-61); Max muller's The six systems of Indian Philosophy (pp. 123-37).

করে, এবং ক্রিয়াবিধিগুলি জটিল হইয়া উঠে; এইরূপ যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে এরূপ একটা আকার ধারণ করে যাহা গোড়ার ধর্ম্ম হইতে স্পষ্ট রূপে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়। কোন ধর্ম্মই এই পরিবর্ত্তনের নিয়মটিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসগুলি Niceeর ধর্ম্ম-পরিষদে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয়। ধর্ম্মমতের একতা সম্পাদনার্থ ধর্ম্মপরিষদের বহু অধিবেশন যে আবশ্যক হইয়াছিল এবং খৃষ্টসমাজের মধ্যে এত যে নূতন সম্প্রদায় ও মতান্তর উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইতেই সপ্রমাণ হয়, যে ধর্ম্মমত ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও খৃষ্ট সমাজের আচার্য্যদিগের প্রথম লেখাসমূহ—এই উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই ঐক্যস্থল আছে। খৃষ্টধর্ম্মের বড় বড় আচার্য্য—যথা S.Denys L' Areopagite, Synesius,S. Augustin,S. Thomas—ইঁহারা অ্যালেক্‌জান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের লোক। S. Denys L' Areopagite, "Mistic theology" নামক গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের যে স্বরূপ-লক্ষণ দিয়াছেন, সেরূপ স্বরূপ লক্ষণ বাইবেল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাওয়া যায় না। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন;—ঈশ্বরের মধ্যে না আছে জ্ঞান, না আছে বিজ্ঞান, না আছে সত্য, না আছে পিতৃত্ব, না আছে পুত্রত্ব। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা কিছুই স্থাপিত করিতেও পারি না; কিছুই অপনীত করিতেও পারি না, স্বীকার করিতেও পারি না, অস্বীকার করিতেও পারি না; কেন না এই সমস্ত পদার্থের যিনি সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব ও একমাত্র কারণ, তিনি সমস্ত স্বীকার অস্বীকারের অতীত, সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন, এবং সকল পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেন। অতএব, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই যে ধারণা,—ইহা পরিপূর্ণ, অগম্য, বাক্য মনের অগোচর ঈশ্বরের ধারণা,—ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও পারসিকদিগের ক্লীবলিঙ্গ ঈশ্বর। এই মত এখনকার রোমীয় খৃষ্ট সমাজের প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত মত নহে।

মতগুলির ন্যায় বিধি বাবস্থাতেও দেখিতে পাইবে এই একই প্রকার রূপান্তর উৎপন্ন হইয়াছে।

সকলেই জানে, রোমীয় খৃষ্টসমাজে, পুরোহিতদিগের অবিবাহিত থাকিবার প্রথা বরাবর প্রচলিত ছিল না। খৃষ্টের খাস শিষ্যমণ্ডলী (Apostles) ছাড়াও, প্রথম-শতাব্দী সমূহের অনেকগুলি 'বিসপ' ও পুরোহিত বিবাহিত ছিলেন ও গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন;—যথা ,চতুর্থ শতাব্দীতে, St Pierre, S. Jude, S Phillippe Synesius, S. Hilaire; পঞ্চম শতাব্দীতে S. Germain এবং ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোপ্ Adrian II। পুরোহিতদের বিবাহ যে বৈধ ছিল তাহা St. Paulএর প্রথম পত্রে অবগত হওয়া যায়।—"বিসপদিগকে তিরস্কারের অতীত হওয়া চাই, তাঁহারা একটি মাত্র পত্নী গ্রহণ করিবেন··· স্বকীয় পরিবারবর্গকে ভালরূপে শাসন

করিবেন, সন্তানদিগকে আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিবেন ;…দেখ, যদি কেহ নিজ পরিবারদের শাসন করিতে না পারে, ঈশ্বরের সমাজের তত্ত্বাবধান সে কি করিয়া করিবে ?"

কেবল দশম শতাব্দীতেই Augsbourg এর পরিষদে, পুরোহিত মাত্রেরই বিবাহ নিষেধ করা হয় (৪৭) অতএব আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম, আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে ভিন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বৌদ্ধ ধর্ম্মও রূপান্তর প্রাপ্তির নিয়মকে এড়াইতে পারে নাই, প্রত্যুত বৌদ্ধ ধর্ম্ম যতই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন আচার ব্যবহার বিশিষ্ট দেশে প্রবেশ করিল ততই উহাতে গভীরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

খ্রীষ্টের ন্যায় শাক্যমুনি বুদ্ধও কোন লেখা রাখিয়া যান নাই। গুরুদেবের মতগুলি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য বৌদ্ধাচার্য্যেরা সময়ে সময়ে পরিষদে সম্মিলিত হইতেন। শাক্যসিংহের মৃত্যুর দুই মাস পরে রাজগৃহে প্রথম পরিষদের অধিবেশন হয়। তাঁহার শিষ্যেরা পাঁচ শতভিক্ষুকে আহ্বান করেন এবং বুদ্ধের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে এবং তাঁহার উপদেশাদির সম্বন্ধে যাহা কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল তাহা এই সভায় সংশোধিত হয়। বৌদ্ধ প্রধানাচার্য্য প্রসিদ্ধ কাশ্যপ এই সভায় অধ্যক্ষতা করেন। আর এক শতাব্দী পরে, নানাবিধ মত পার্থক্য প্রকাশ পাওয়াতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের Constantine মহারাজা অশোক, পাটুলীপুত্রে দ্বিতীয় পরিষৎ আহ্বান করেন। এই পরিষদে ৭০০ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা, আদিম বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতগুলি যতটা সম্ভব বাঁধাবাধির মধ্যে আনিলেন এবং প্রামাণিক বৈধ গ্রন্থাদির একটা তালিকা করিলেন।

অশোকের আমলে, বৌদ্ধধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্মে পরিণত হইল; নব ধর্ম্মাবলম্বীর জ্বলন্ত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া, পাটুলীপুত্রের অধীশ্বর একটি বৌদ্ধ-প্রচারক-মণ্ডলী গঠনকল্পে তাঁহার সমস্ত শক্তিসম্বল নিয়োগ করিলেন। সেই প্রচারকেরাই শাক্যমুনির মতগুলি দূর দুরান্তরে লইয়া যায়। তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ উৎপন্ন হইতে লাগিল; এবং বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারি শতাব্দী পরে, ১৮টি বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আবার একটা পরিষৎ আহূত হইল; এই তৃতীয় পরিষৎটিই শেষ পরিষৎ। এই পরিষদে বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত মতগুলিই চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই তিন পরিষদ্ই খ্রীষ্টযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলি কতকগুলি পুণ্যগ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থাবলী ত্রিপিটক-নামে তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত।

সূত্র-পিটকে সূত্রগুলি আছে। সাধারণ বৌদ্ধ ও ভিক্ষুশ্রেণী উভয়েরই উদ্দেশে বুদ্ধদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সব উপদেশ বাক্য ইহাতে আছে। ইহার অনেকগুলি উপদেশেও রূপক-কথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিনয়-পিটকে, ভিক্ষুশ্রেণীর আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ ও নিয়মাদি সন্নিবিষ্ট আছে; ইহা নিয়ম শাসনের গ্রন্থ। সর্ব্বশেষে, অভিধর্ম্ম-পিটক; বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মসংক্রান্ত

ও দর্শন-সংক্রান্ত যত কিছু দুরবগাহ মত, তৎসমস্তই এই পিটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। উহাই বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম পরিষদে গুরুমুখ-নিঃসৃত বাক্য সমূহের প্রতিসংস্কার সম্পাদিত হয়। কাশ্যপ,অভিধর্ম্মের প্রতিসংস্কার-ভার, আনন্দ সূত্রসমূহের প্রতিসংস্কার-ভার এবং উপালি বিনয়ের প্রতিসংস্কার-ভার গ্রহণ করেন।

অন্যান্য ধর্ম্ম যেরূপ ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্ম ঠিক তাহার বিপরীত;—কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরের দ্বারা কিংবা কোন মধ্যবর্ত্তী দেবদূতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে—এরূপ মত বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারেই অগ্রাহ্য করে। বুদ্ধ আপনাকে মানুষের আসনেই স্থাপন করিয়াছেন; তিনি যে সকল মত সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই সকল মত তিনি দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া সাধনার বলে অবগত হয়েন। তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ সকলেরই সাধনোপযোগী—সকল মানুষই তাহার অনুসরণ করিতে পারে।

মানুষ নিজের বলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে আপনাকে উন্নীত করিতে পারে। যে কোন মনুষ্য এই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্য নিত্যকালের; এবং যে এই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সে সহজ জ্ঞানের দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে।

ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রস্থান-পথ; এবং অন্য ধর্ম্মের সহিত উহার প্রভেদ এইখানেই। পীত জাতীয় লোক যে এত সহজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার কারণই এই। বস্তুত এই সকল লোক, ঈশ্বরের ধারণাকে মনে স্থান না দিয়াও কেবল জ্ঞান ও নীতির ভাবকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বিজ্ঞানকে বহিষ্কৃত না করিয়াও, বুদ্ধ এইরূপ মত স্থাপন করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সদনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ম্ম অবস্থিত; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা বিভিন্ন হইলেও, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে সমান। জীবনের কাজে ও মুক্তি সাধনের পক্ষে, ধর্ম্ম,—ঐশ্বর্য্য কিংবা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা কিংবা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। ধর্ম্ম উহাদের হইতে স্বতন্ত্র। ইহা একটি নূতন কথা—একটি মূলস্পর্শী ধর্ম্মসংস্কার; কেন না, ধর্ম্মনীতির সমক্ষে সকলেই সমান এবং বিজ্ঞানবেত্তা অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এই মতটি ইহার দ্বারা পরিঘোষিত হইতেছে। তথাপি ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, বুদ্ধ বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করিতেন; ভিক্ষা, শুদ্ধি, বীর্য্য, ধৈর্য্য দান —এই ৬ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে বিজ্ঞানকেও ধরা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে,—শাক্যমুনি প্রদত্ত শিক্ষা—যুগপৎ অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী উভয়ই ছিল। অন্তর্ম্মুখী এই অর্থে—কেন না, তিনি বলিয়াছিলেন যে পরম জ্ঞানের দ্বারাই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন; এবং বহির্ম্মুখী এই অর্থে, কেন না

তিনি বিশুদ্ধ আচরণের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

"দিব্য অবদানের" মধ্যে "অশোক অবদান" নামক একটি গল্প আছে। Burnouf, তাঁহার ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের ভূমিকায় এই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, কতটা ধর্ম্মনীতির গুরুত্ব অনুভব করিত, বুর্ণূফ তাহা দেখাইয়াছেন। —"বহুদিন হয় নাই, রাজা (অশোক) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি একটু অনুকূল হইয়াছেন; ইহারই মধ্যে শাক্যসন্তানের সহিত যখনই তাঁহার দেখা হয়—জনতার মধ্যেই হউক, একাকী হউক—তিনি তাহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করেন। তাঁহার যশ নামে একজন মন্ত্রী ছিল, ভগবান বুদ্ধের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। যশ রাজাকে বলিলেন, 'সকল বর্ণের ভিক্ষুদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা আপনার উচিত হয় না।' বস্তুতই শাক্যশ্রমণেরা, সকল বর্ণ হইতে আসিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। রাজা তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে একদিন, সমবেত পাত্রমিত্র সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; 'বিভিন্ন পশু-মুণ্ডের মূল্য আমি জানিতে চাই; অতএব তুমি অমুক পশুর এবং তুমি অমুক পশুর মুণ্ড লইয়া আইস।' পরে তিনি তাঁহার মন্ত্রী যশকে বলিলেন; 'তুমি আমার নিকট একটা মানুষের মুণ্ড নিয়া আইস।' যখন সমস্ত মুণ্ডগুলা আনা হইল, রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন;—'একটা বিশেষ মূল্য ধার্য্য করিয়া তোমরা ঐ সকল মুণ্ড বিক্রয় করিয়া আইস।' সব মুণ্ডগুলা বিক্রীত হইল, কেবলি মানুষের মুণ্ডটা কেহই লইতে চাহিল না। তখন রাজা তাঁহার মন্ত্রীকে বলিলেন;—'যদি উহার দরুণ কোন মূল্যও না পাও, তবু—উহা যে চাহিবে তাহাকে বিনামূল্যেই দিবে।' কিন্তু যশ উহার কোন গ্রাহক পাইলেন না। তখন মন্ত্রী মুণ্ডটা কাহাকে গতাইতে না পারিয়া, লজ্জিত হইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। 'তিনি বলিলেন,—গরুর মাথা, গাধার মাথা ভেড়ার মাথা, হরিণের মাথা, পাখীর মাথা কিঞ্চিৎ রৌপ্য মূল্যে বিক্রীত হইল; কিন্তু এই মানুষের মাথার কোন মূল্য নাই, উহা বিনামূল্যেও কেহ লইতে চাহে না।' তখন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন;—'ঐ মানুষের মাথাটা কেহ লইতে চাহিল না কেন?' মন্ত্রী উত্তর করিলেন;—যেহেতু, মানুষের মাথা অতি জঘন্য। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন;—'ঐ মাথাটা জঘন্য, না—মানুষের মাথা মাত্রই জঘন্য?' যশ উত্তর করিলেন,—'মানুষের মাথা মাত্রই জঘন্য।' অশোক বলিলেন;—'কি! তবে আমার মাথাটাও কি জঘন্য?' তখন মন্ত্রী ভীত হইয়া সত্য কথা বলিতে সাহস পাইলেন না। রাজা তাঁহাকে বলিলেন;—'তোমার যাহা বিশ্বাস ধর্ম্মত তুমি তাহাই বল।' তখন মন্ত্রী বলিলেন;—'হাঁ মহারাজ।' নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিতে মন্ত্রীকে বাধ্য করিয়া রাজা তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিলেন; —'শক্তি ও সৌন্দর্য্যজনিত মদগর্ব্বের

বশীভূত হইয়া ভিক্ষুদিগের চরণে আমার মস্তক নত করিতে তুমি আমাকে নিবারণ করিয়াছিলে, যদি আমার মস্তক এমন একটা অপদার্থ জিনিষ হয় যে তাহা কেহই মূল্য দিয়া লইতে চাহে না, আর আমি যদি কোন উপলক্ষে উহাকে শোধন করিয়া লইতে পারি, এবং উহাকে শোধন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি, তাহাতে কি আমাদের ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়? তুমি শাক্য-ভিক্ষুদের কেবল জাতেরই খোঁজ লইয়া থাক, তাহাদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা তুমি দেখ না। এইজন্য জাতিগর্ব্বে স্ফীত হইয়া তুমি ও অপর লোকেরা—তোমরা সকলেই এইরূপ ভ্রমে ভুলিয়া থাক। কোন নিমন্ত্রণ কিংবা বিবাহের সময়, জাতের খোঁজ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের কাছে জাতিবিচার নাই এবং ঐ সকল সদ্‌গুণের উপরেই ধর্ম্মসাধন নির্ভর করে। উচ্চ বংশীয় কোন ব্যক্তি যখন পাপে আসক্ত হয় যখন লোকে তাহাকে কি নিন্দা করে না? তবে, কোন নীচ শ্রেণীর লোক সদ্‌গুণসম্পন্ন ও সদাচারী হইলে সে কি লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইবে না? মানুষের দৈহিক গুণের জন্য নহে, পরন্তু আত্মার গুণানুসারেই মানুষ শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে। অতএব শাক্য-ভিক্ষুদিগের অন্তঃকরণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত; কেন না, তাহাদের অন্তঃকরণ শাক্যমুনিকর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়াছে। কোন দ্বিজ যদি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন লোকে বলে ‘ও লোকটা পাপী, এবং তাহাকে সকলেই ঘৃণা করে। কোন দরিদ্র বংশের লোকও যদি সদাচারী হয়, তাহার চরণে সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। রাজা আরও এই কথা বলিলেন;—তুমি কি শাক্য বংশীয় দয়া-বীরের এই কথাগুলি শোন নাই?—যে সকল জিনিষের মূল্য নাই জ্ঞানীরা তাহার মূল্য অবগত হয়েন।—প্রভুর এই সত্য বাক্য—একজন দাস কি কখন বুঝিতে পারে? এই সকল আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলে তুমি যদি আমাকে তাহা হইতে বিমুখ কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। যখন আমার দেহ চর্ব্বিত ইক্ষুখণ্ডের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া ধরাশায়ী হইবে, যখন তাহার উঠিবার শক্তি থাকিবে না—করযোড়ে প্রণাম করিবার শক্তি থাকিবে না, তখন এই শরীরের দ্বারা আমি কি কোন ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিব? অতএব, শ্মশানে যে দেহের অবসান হয়, প্রাণ থাকিতে থাকিতে তাহার কি একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে? দগ্ধ গৃহের যে মূল্য, জলমগ্ন রত্নরাশির যে মূল্য, তাহা অপেক্ষা এ দেহের অধিক মূল্য নহে। যাহারা এই নশ্বর দেহের মধ্যে অবস্থিত তাহারা সারপদার্থটিকে চিনিতে পারে না; তাহারা জানে না, কোন্ বস্তুর মূল্য আছে এবং কোন্ বস্তুর মূল্য নাই। এই মূঢ়েরা যখন মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, তখন তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ভাণ্ডের অন্তঃস্থিত যাহা সার পদার্থ—সেই দধি, ঘৃত, ননী, দুগ্ধ, তক্র, যদি ভাণ্ড হইতে উঠাইয়া লওয়া যায়, তখন ফেন ছাড়া তাহাতে আর কি

অবশিষ্ট থাকে? তখন ভাণ্ডটা ভাঙ্গিয়া গেলে আক্ষেপের কোন বিশেষ হেতু থাকে না। কিন্তু যখন ইহলোকে মৃত্যু আসিয়া সৎকর্ম্ম-পরাঙ্মুখ গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের দেহ-ভাণ্ড চূর্ণ করিয়া দেয়, তখন দুগ্ধ দধি প্রভৃতি সারপদার্থপূর্ণ মৃদ্‌ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ মনকষ্ট হয়, তাঁহাদেরও হৃদয় সেইরূপ দুঃখানলে দগ্ধ হয়। অতএব, আর্য্য! সাধু ভিক্ষুর চরণে যদি আমি প্রণত হই তাহাতে আপনি বাধা দিবেন না। কারণ, যে ব্যক্তি সম্যক্ বিচার না করিয়া বলে,—আমি কুলমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সে ভ্রমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি, দশ-বিভূতি বিশিষ্ট সেই মহামুনির প্রজ্জলিত প্রদীপের আলোকে দেহকে পরীক্ষা করিয়া দেখে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী;—সে, প্রভুর দেহ ও দাসের দেহের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না। সকল মানুষেরই মধ্যে সেই একই চর্ম্ম, একই মাংস, একই অস্থি, একই মস্তক একই যকৃৎ রহিয়াছে! কেবল অলঙ্কার ও সাজ সজ্জাতেই এক জনের দেহ অপরের দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহলোকের যাহা সার বস্তু তাহা অতি ঘৃণিত দেহের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা যোগ্য ব্যক্তিকে প্রণাম ও সম্মাননা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করেন।”(৪৮)

এই উপাখ্যানের সারমর্ম্মটি আর কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না; তাহা এই;—সাধুব্যক্তি, নীচ জাতীয় হইলেও, তিনি রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার নিকট প্রণত হইলে রাজাকে হীনতা স্বীকার করিতে হয় না।”

(ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনাদৃতা।

(১)

মানুষ ভুল করে; ভুল করা তাহার স্বভাব। কিন্তু প্রকৃতিও যখন ভুল করেন, তখন মানুষ বিস্মিত হয়; প্রকৃতির ভুলের দৃষ্টান্ত ও যে দেখা যায় না, এমন নহে। প্রমাণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, এটর্নী গিরীশচন্দ্রের পত্নী কাত্যায়নীকে গড়িবার সময় প্রকৃতি সেনাপতি গড়িতে বাঙালীর মেয়ে গড়িয়াছিলেন। যে তেজ, যে সাহস যে কৌশল, আজ্ঞাপ্রদানের যে স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস ও সেই আজ্ঞা সম্যকরূপে প্রতিপালিত করিয়া লইবার যে ক্ষমতা নিপুণ সেনাপতিতে শোভা পাইত—সেই সকল বঙ্গগৃহে গৃহিণীর পক্ষে অনেক স্থলে গুণ হইয়া দোষ হইয়াছিল। সে তেজ গিরীশ-চন্দ্রের উপর ব্যক্ত হইত, সে সাহস স্বামীর স্বজনগণকে বিব্রত করিয়া তুলিত, সে কৌশল নানা উপায়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া মজুদ তহবিল বর্দ্ধিত করিত, সে আজ্ঞা-দানের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস নিরীহ দাস দাসীত্রয়কে বিশ্রাম দিত না, আর সেই

আজ্ঞা প্রতিপালিত করিয়া লইবার ক্ষমতায় গিরীশচন্দ্রের গৃহে মাসে দুই বার না হউক, দুই মাসে একবার পরিচারক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইত। কেবল কাত্যায়নীর সহিত তাঁহার পিত্রালয় হইতে আগত বৃদ্ধা দাসী কোনরূপে টিকিয়া ছিল। তাহার কয়টি কারণও ছিল—প্রথমতঃ ক্ষুদের মার তিন কুলে কেহ ছিল না, দ্বিতীয়তঃ সে কাত্যায়নীর একমাত্র পুত্র মোহিতমোহনকে মানুষ করিয়া মায়ায় জড়াইয়া পড়িয়াছিল; তৃতীয়তঃ সে বার্দ্ধক্যবশতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে পারিত না; চতুর্থতঃ সে আত্মরক্ষায় অনেকটা সক্ষম ছিল—কাত্যায়নীকে বালিকা বয়স হইতে দেখিয়া সে আর তাঁহাকে ভয় করিত না, সমান সমান জবাব করিত, কাত্যায়নী যত চেঁচাইতেন সেও তত গলা চড়াইত।

যাহার গৃহিণীর স্বভাবের পরিচয় এইরূপ, তাহার পক্ষে যে ছয় সহোদর—তাঁহাদিগের পুত্র কলত্র, বিধবা ভগিনী ও কয়টি ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী এই সকলের সহিত এক সংসারে, এক অন্নে বাস করা অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। গিরীশচন্দ্রের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। বিবাহের আট বৎসর পরে অর্থাৎ কাত্যায়নী বধূদশা কাটাইতে না কাটাইতে গিরীশচন্দ্র পৈত্রিক গৃহ ও একান্নবর্ত্তী পরিবার ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রবাসে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন কাত্যায়নীর প্রথম সন্তান—কন্যা, বর্ষমাত্র বয়স্কা।

গিরীশচন্দ্র কর্ম্মঠ ও চতুর ছিলেন, অর্থোপার্জ্জনের কৌশলও জানিতেন। আবার অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে কাত্যায়নীর অসাধারণ উৎসাহ ও স্পৃহা ছিল। এ ক্ষেত্রে 'মণিকাঞ্চনযোগ' হইয়াছিল, সুতরাং গিরীশচন্দ্রকে পিতৃসংসার পরিত্যাগের জন্য কোন দিন অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। তবে পত্নীর বিষম ক্রোধ ও বিষমতর বায়ুরোগ তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিব্রত করিয়া তুলিত। ইহার উপর আবার তাঁহার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই আর একটা উপসর্গ কাত্যায়নীতে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল সেটা 'শুচি বাই'। এ ঘর ধৌত করা হয় নাই, এ বাসনে ব্যঞ্জনের দাগ আছে, দাসীরা দ্বারে 'গোবর জল' দেয় নাই, কর্ত্তা 'বাসী কাপড়ে' লৌহ সিন্দুক স্পর্শ করিয়াছেন—এইরূপ নানা ব্যাপারে তিনি চীৎকার করিয়া গিরীশচন্দ্রকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। এক এক দিন গিরীশচন্দ্র মক্কেলদিগের সহিত সাক্ষাতের জন্য অন্য বাসা ভাড়া করিবার কল্পনাও করিতেন। শেষে তিনি আফিসেই মক্কেলদিগের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাত্যায়নীর বারংবার কক্ষগুলি ধৌত করানর অত্যাচারে নিম্নতলে ঘরগুলি সর্ব্বদাই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল; পুস্তকগুলির দুর্দ্দশা অনিবার্য্য বুঝিয়া গিরীশচন্দ্র সেগুলিকে আফিসে সরাইয়াছিলেন। তিনি 'সকাল সকাল' আফিসে যাইতেন, সন্ধ্যার পর ফিরিতেন। কিন্তু তিনি কখনও কাত্যায়নীর কার্য্যের মৃদু ব্যতীত তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না—কারণ, তিনি পত্নীর ক্রোধকে ততোধিক তাঁহার বায়ুরোগকে ভয় করিতেন; আবার তাঁহার মনে এ কুসংস্কারও ছিল যে, পত্নী-ভাগ্যে তাঁহার ধনলাভ হইতেছে।

সে কুসংস্কারের কথা তিনি প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু কাত্যায়নী তাহা বুঝিয়াছিলেন।

গৃহে গিরীশচন্দ্র নিতান্ত নিস্তেজ ও নিস্প্রভরূপে বিরাজ করিতেন। তাঁহার জীবজন্তু পুষিবার সখ ছিল—গৃহিনীর অনিচ্ছায় মিটে নাই, বন্ধুবান্ধবের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার ইচ্ছা ছিল—গৃহিণীর প্রতিবাদে পূর্ণ হয় নাই।

২

পঞ্চবিংশবর্ষকাল এইরূপে কাটাইয়া হৃদ্-রোগে গিরীশচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তিনি বসতবাটী ব্যতীত কলিকাতায় আরও দুইখানি গৃহের অধিকারী। তাঁহার অর্থও ছিল। অর্থের প্রকৃত পরিমাণ কাত্যায়নী ব্যতীত আর কেহ জানিত না। কোম্পানীর কাগজগুলি কাত্যায়নীর নামেই ক্রীত হইয়াছিল; টাকা কাত্যায়নীর নামেই ধার দেওয়া হইত। গিরীশচন্দ্রের উইল অনুসারে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি কাত্যায়নীর হইল। বলিয়াছি, তাঁহার অর্থের প্রকৃত পরিমাণ কাত্যায়নী ব্যতীত আর কেহ জানিত না। যেমন অন্ধকারে সকল বিড়ালকেই মসীকৃষ্ণ দেখায়, তেমনই অজ্ঞতা অপরের সম্পদকে প্রচুর দেখায়; তাই কেহ কেহ বলিত, গিরীশচন্দ্র দুই তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহারা বলিত, ব্যয়সঙ্কোচই সঞ্চয়ের উপায়—উপার্জ্জন নহে; ব্যয় সংক্ষেপে কাত্যায়নীর অসাধারণ নৈপুণ্য,—তাঁহার দৈনিক সংসার-খরচ চারি আনার সীমা অতিক্রম করে না, ঘন ঘন পরিচারক পরিবর্ত্তনে পরিচারককে পরিধেয় দিতে হয় না, ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ সে কথা অবিশ্বাস করিয়া বলিত, লক্ষ টাকা সঞ্চয় কি সহজ ব্যাপার? সে যাহাই হউক, গিরীশচন্দ্রের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যে সাধারণ গৃহস্থের স্পৃহনীয় সে কথা উভয় পক্ষই স্বীকার করিতেন। গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুতে কাত্যায়নী সে অর্থের অধিকারিণী হইলেন।

কাত্যায়নীর ব্যবহারে গিরীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়দিগের ঘনিষ্ঠতা থাকিতে পায় নাই। সেই কারণে ও কাত্যায়নীর ভয়ে গিরীশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তাঁহারা লৌকিকতা রক্ষার্থ দুঃখ প্রকাশ ও সংবাদ গ্রহণ ব্যতীত আর কিছু করিলেন না। কাত্যায়নী ভাবিলেন, "বাঁচা গেল! যে কয় বৎসর কর্ত্তা স্বতন্ত্র বাসা করেন নাই, সেই কয় বৎসরেই আমার 'হাড় ভাজা' হইয়াছিল। ও সব আপদ আমি আর ত্রিসীমায় আসিতে দিব না।" তিনি লোকের কাছে বলিলেন,—পোড়া কপাল আপনার জনের! এ বিপদের সময় দু'টা ভাল কথা কহিয়াও সান্ত্বনা দিতে পারেন না! আমি 'সাতেও নাই, পাঁচেও নাই'—সব সহ্য করি, সেই জন্যই উহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখি। আর কেহ হইলে উহাদের মুখ দর্শন করিত না।" ক্ষুদের মা বলিল, "তা সত্য"। কাত্যায়নীর পিসী মালা জপিতে জপিতে বলিলেন "তা ত বটেই।"

'দশা'র দিন শববাহকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান একটা প্রচলিত প্রথা। কাত্যায়নীকে সে বিষয়ে কোনরূপ

উদ্যোগ করিতে না দেখিয়া মোহিতমোহন একবার সে কথা তুলিল। কাত্যায়নী বলিলেন, "একি আমাদের আমোদের সময়? কর্ত্তা দেশের লোকের উপকার করিলেন, আর পাড়ার লোক শব বহিয়া আমাদের উপকার করিতে পারে না? যাহারা বাড়ীতে খাইতে পায় না, তাহারা লুচির লোভে সে সময় না আসিলেই পারিত।" কাত্যায়নীর পিসী একবার বলিলেন, "লোকে কি বলিবে?" কাত্যায়নী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি এমন লোকের গলায় মালা দিই নাই যে লোকের কথার ধার ধরিব।" পাছে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বায়ুরোগ প্রকাশ পায় সেই আশঙ্কায় পিসীমা আর কোন কথা কহিলেন না। কাত্যায়নী আপনার মনে আপনি কিছুক্ষণ গর্জ্জন করিয়া নিরস্ত হইলেন। মোহিত পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর নির্দ্দিষ্ট দিবসে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণের ভোজনব্যয় সমেত মোট সাড়ে পনের টাকা খরচে গিরীশচন্দ্রের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। লোকের কথায় কি আসে যায়?

ইহার পর গিরীশচন্দ্রের আফিসের ব্যবস্থার কথা উঠিল। গিরীশচন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র অল্প দিন পূর্ব্বে এটর্ণী হইয়া কোন আফিসে কর্ম্মচারী বহাল হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অংশী করিয়া আফিস চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। কাত্যায়নী সম্মতি প্রদান করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তাহা হইবে না। যাহা আমি বুঝি না, মোহিত ও বুঝে না—তাহা পরের হস্তে দিয়া শেষে কি বিপদে পড়িব?" গিরীশচন্দ্রের এক বন্ধুপত্নী বলিলেন, "আফিসটা তুলিয়া দিলে আয় অনেক কমিয়া যাইবে।" কাত্যায়নী তাহাতে উত্তর করিলেন, "কর্ত্তা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মোহিতের কষ্ট হইবে না। তিনি ত খাটিয়া খাটিয়াই প্রাণপাত করিলেন—সে ত মোহিতের জন্য। একজন উপার্জ্জন করে—বুঝিয়া চলিতে পারিলে পাঁচ পুরুষ বসিয়া খাইতে পারে। আমার বাপের বাড়ীতেই দেখ না।" কাত্যায়নীর পিতামহ সেনা দলের রসদ বিভাগে কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার বংশে সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ হয় নাই—সকলেই বসিয়া খাইতেছেন। আফিস উঠিয়া গেল। মোহিতমোহন কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

বাস্তবিক মোহিতমোহন জননীর কথা নির্ব্বিচারে প্রতিপালন ব্যতীত কখন তাহার প্রতিবাদ করিতে শিখে নাই। শৈশব হইতে জননীর প্রবল ক্রোধ ও প্রবলতর ব্যাধির বাহ্যিক নিদর্শন তাহার শিশুহৃদয় ভীতিকাতর করিত; শিশু যে মাতৃবক্ষ বিপদে আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করে, সে সেই মাতৃবক্ষে বিপদের আশঙ্কায় সুবিধা পাইলেই ক্ষুদের মা'র অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাহার পর বাল্যে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল, গৃহে তাহার প্রচণ্ডা জননীরই একাধিপত্য; পরিচারকবর্গ হইতে পিতা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার ভয়ে ভীত। সুতরাং

তাহার শিশুহৃদয়ে জননীর যে ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তাহা অপনীত হইল না, বরং তাহার বর্ণের গাঢ়তা বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর বাল্যকাল যৌবনে বিকশিত হইল—মোহিতমোহনের বিবাহ হইল, সে 'বার বার তিন বার' এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পরিয়া কলেজ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু জননীর সম্বন্ধে তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না। সে বাঁশবনে কলাগাছের মত নিতান্ত আওতায় বাড়িয়াছিল;—তাহার স্বাতন্ত্র্যের লেশ মাত্র ফুটিতে পাইল না। ' এখনও সংসারের সকল ভার পূর্ব্বের মত কাত্যায়নীর হস্তেই রহিল। মোহিতমোহন জননীর স্নেহ পুত্তলেরই মত বাস করিতে লাগিল।

৪

বলিয়াছি, গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মোহিতমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। কাত্যায়নী স্বয়ং দেখিয়া—অনেক বাছিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। সুরমার পিতা অল্প বেতনে চাকরী করিতেন; আয় অল্প, পরিবার বৃহৎ, কাযেই অনেক চেষ্টায় তিনি আপনাকে দারিদ্র্য ও স্বচ্ছন্দতার সীমা-রেখায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। সুরমার পিতার অর্থের অভাব সুরমার রূপে পূরণ হইয়াছিল,—কাত্যায়নী সুন্দরী দেখিয়া সুরমাকে স্নুষা করিয়াছিলেন। তিনি যৌতুকের দাবী করেন নাই; কিন্তু সুরমার পিতা যে যৌতুক দেন নাই—সে কথাটা তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। সুরমা কাঁদিত। গিরীশচন্দ্র জানিতে পারিলে, সময় সময় কাত্যায়নীকে বলিতেন, "তুমি ত দেখিয়াই—জানিয়াই বধূ করিয়াছ; তবে আর ও কথা বল কেন?"—কাত্যায়নী বলিতেন, "কি বলিয়াছি? শাঁখা হাতে দিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, সে ত সত্য কথা। আমি বলিয়াই তাহাতে কথাটি বলি নাই।" গিরীশচন্দ্র আর কোন কথা বলিতেন না; সুরমাকে ডাকিয়া—কাছে বসাইয়া তাহার সহিত নানা কথা বলিতেন, সুযোগ পাইলে বধূকে বলিয়া দিতেন—তাহার শাশুড়ীর 'বাতিকের ধাত,' তাঁহার উগ্র কথায় সে যেন মনে দুঃখ না করে।

বাস্তবিক গিরীশচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার স্নেহে সুরমার একটা জুড়াইবার স্থান ছিল। শাশুড়ীর অকারণ শাসনে সে তথায় যাইয়া শান্তি ও সান্ত্বনা পাইত।

মোহিত পত্নীকে ভাল বাসিত। কিন্তু বলিয়াছি, তাহার স্বাতন্ত্র্যের লেশমাত্র ছিল না। তাই তাহার প্রেমে অভয় বা আশ্রয় ছিল না, সুখ ছিল কিন্তু শান্তির বা সান্ত্বনার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষ মাতার ব্যবহার-বিচারের সাহস তাহার ছিল না। শাশুড়ীর অকারণ তাড়নায় মর্ম্মপীড়িতা সুরমা যখন তাহার নিকট কাঁদিত, তখন হয় ত তাহারও নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত; কিন্তু সে কি বলিয়া সুরমাকে সান্ত্বনা দিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, হয় ত সে কেবল বলিত, "জান ত, মা'র স্বভাবই ঐরূপ।" সুরমার ব্যথিত—পীড়িত হৃদয়ে এ সান্ত্বনা পর্য্যাপ্ত বোধ হইত না; সে স্বভাবতঃ স্বামীর নিকট আরও কিছু আশা করিত।

সে আশায় হতাশ হইলে—সেই হতাশ-বেদনা তাহার ব্যথিত হৃদয়কে আরও বেদনাবিধুর করিয়া তুলিত।

এই অবস্থায় যখন গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুতে সেই সংসারে সুরমার সান্ত্বনার এক-মাত্র সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন সুরমা বড়ই বিপন্না হইল। শাশুড়ীর অকারণ তাড়না বিষদৃষ্ট বাণের মত তাহাকে অহরহঃ বিদ্ধ করিতে লাগিল।

এরূপ হইলে যাহা হয়, সুরমার তাহাই হইতে লাগিল;—কাত্যায়নীর যে ব্যবহার এতদিন সে কোনরূপে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা একান্তই অসহনীয় মনে হইতে লাগিল। দিবারাত্রি সে সেই ব্যবহারের কথা মনে করিতে লাগিল;—যতই মনে করিতে লাগিল, ততই বেদনা বাড়িতে লাগিল—ততই সে আপনার দুর্ভাগ্য একান্তই অসহনীয়—আপনার জীবন একান্তই দুর্ব্বহ বিবেচনা করিতে লাগিল। এই সময় সে এক একবার মনে করিত, মৃত্যুর ফুৎকারে এ ম্লান জীবন-দীপ নিবাইলে কেমন হয়? কিন্তু সে চিন্তা তাহার হৃদয়-গগনে বিদ্যুদ্বিকাশেরই মত ক্ষণস্থায়ী হইত। সে মোহিতকে ভালবাসিত। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না; ভালবাসা প্রবল আকর্ষণে তাহাকে প্রেমাস্পদের দিকে আকৃষ্ট করে। সুরমা মোহিতমোহনকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। তাই সে ভাবিত, তাহার অপেক্ষা দুখিনীও জগতে আছে,—তাহারা স্বামীরও অনাদৃতা,—তাহারা ত বাঁচিয়া থাকে! সে ভাবিত,—"দেখি, ইহার শেষ কোথায়।" কিন্তু সে কেবলই ভাবিত। বিশেষ তাহার সন্তান ছিল না—অন্য কার্য্যে মন দিবার সুযোগ ছিল না—অগাধ সান্ত্বনার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় তাহার ছিল না। সে কেবলই ভাবিত।

এ অবস্থায় সহ্য-সীমা সহজেই অতিক্রান্ত হয়। যখন বেদনায় সান্ত্বনার শেষ সম্ভাবনাও থাকে না—জীবন-পথ যতদূর দেখা যায় কেবল বেদনা-কঙ্কর-কণ্টকিত দৃষ্ট হয়, তখন অন্যায় অত্যাচার, হাসি মুখে দূরে থাকুক, নীরবে সহ্য করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়—প্রতিবাদের প্রবল প্রবৃত্তি তখন সংযমবন্ধ বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এক এক দিন আত্ম-সংবরণে অসমর্থা হইয়া সুরমা শাশুড়ীর অন্যায় তাড়নার প্রতিবাদ বা আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিত। কাত্যায়নীর মত শাশুড়ীর নিকট সে কার্য্যের ফল কিরূপ ফলিত তাহা সহজেই অনুমেয়। কাত্যায়নী চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে জানাইয়া দিতেন যে, তিনি কুক্ষণে 'ছোট লোকের' মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলেন, তাঁহার 'সোনার সংসারের' সর্ব্বনাশ করিয়া তবে সে বন্ধ্যা ডাকিনী ক্ষান্ত হইবে। সুরমার নিতান্ত নিরপরাধ ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কাত্যায়নীর গালির ভাজন হইতেন। কিন্তু বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে জলস্রোত বাহির হইতে আর বাধা থাকে না;—এক দিন, দুই দিন প্রতিবাদের পর ক্রমে সুরমার পক্ষে কাত্যায়নীর অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ

সহজ হইয়া আসিল। কাযেই কাত্যায়নীর ক্রোধও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শেষে কাত্যায়নী এক দিন তাঁহার পিসীকে আনাইয়া সুরমাই যে সকল দোষের মূল তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, "ডাকিনী আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আমি ছেলের আবার বিবাহ দিব।"

পিসী বলিলেন, "ছেলে কি স্বীকার হইবে?"

কাত্যায়নী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ছেলে আবার কি বলিবে? আমার ছেলে তেমন নহে যে, আমার অবাধ্য হইবে।"

পিসী বলিলেন, "তা'সত্য। অমন ছেলে আজকালকার দিনে পাওয়া যায় না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমি 'সাতেও নাই, পাঁচেও নাই', সব সহ্য করি;—আর কেহ হইলে অনেক দিন আগেই ছেলের আবার বিবাহ দিত।"

পিসী বলিলেন, "তা'ত বটেই।"

ইহার পর কাত্যায়নী সত্য সত্যই পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিত্রালয় হইতে সে আয়োজন হইতে লাগিল।

সুরমা সে কথা শুনিল। সে বুঝিত, কাত্যায়নীর পক্ষে এরূপ কার্য্য অসম্ভব নহে। তবুও বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে মোহিতমোহনকে ভালবাসিত, সেই ভালবাসা তাহাকে স্বামীর প্রেমে নির্ভর করিতে শিখাইত। সে কিছুতেই বুঝিত না—সে আশা একান্তই অন্তঃসারশূন্য।

মোহিতও সে কথা শুনিল। সে ও বিশ্বাস করিল না।

পাত্রী নির্ব্বাচন হইয়া গেল। কাত্যায়নীর নির্দ্দেশমত তাঁহার দুই ভ্রাতা যাইয়া পাত্রীকে 'আশীর্ব্বাদ' করিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতে কন্যাপক্ষীয়গণ কাত্যায়নীর ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পাত্রকে 'আশীর্ব্বাদ' করিতে আসিলেন।

সে কথা শুনিয়া মোহিত অন্তঃপুরে আপনার শয়নকক্ষে যাইয়া বসিল। সে মনে করিল, সে কিছুতেই বাহিরে যাইবে না।

মোহিত শয়ন কক্ষে আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া সুরমা তথায় আসিল; স্বামীকে দেখিয়া তাহার চরণে পতিতা হইয়া বলিল, "তুমি বিবাহ করিও না।" সে আর কিছু বলিতে পারিল না। আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার উন্মাদবৎ মূর্ত্তি,—বিস্রস্ত কেশপাশ,—রোদনারুণ নয়ন,—আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর মোহিতমোহনকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল।

মোহিত পত্নীকে উত্তোলিত করিয়া বলিতে যাইতেছিল,—সে বিবাহ করিবে না, এমন সময় দ্বার হইতে কাত্যায়নী বজ্রকণ্ঠে ডাকিলেন—"মহি!"

মোহিতের এক বার ইচ্ছা হইল সে বলে, সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না; কিন্তু তাহার মুখে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশু শিক্ষককে ভালবাসে না—ভয় করে। সে শিক্ষককে হিংসা করিবে, মনে করে; কিন্তু শিক্ষক সম্মুখে উপস্থিত হইলে সংস্কারে পরিণত ভীতি

বশতঃ একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে—তাহার আজ্ঞা অমান্য করিতে সাহস করে না—তাহার আদেশে চালিত হয়। মোহিত-মোহনের ও তাহাই হইল। সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না; জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সুরমা খাটের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, মোহিত জননীর সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে দিবসের আলোক যেন নিবিয়া গেল; তাহার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল; তাহার হৃদয়ে আশার লেশমাত্র রহিল না। দারুণ মর্ম্মব্যথায় পীড়িতা—অনাদৃতা সুরমা যেন বিষম আঘাতে আহতা হইয়া সেই শয্যায় পড়িয়া গেল,—বেদনার—যাতনার আতিশয্যে সে কিছুক্ষণ কিছু ভাবিতেও পারিল না।

তাহার পর—আঘাতের প্রথম সংজ্ঞাহারী ভাব অপনীত হইলে সুরমা দেখিল, তাহার জীবনের নিশীথ অন্ধকারে আলোক বিকাশের সম্ভাবনা মাত্র নাই; তাহার জীবন একান্তই দুর্ব্বহ ভার।

সন্ধ্যার পর ক্ষুদে'র মা যখন কাত্যায়নীকে বলিল, "বৌদিদির গা আগুনের মত তপ্ত"—তখন কাত্যায়নী পিসীকে বলিলেন, "দেখিলে, রাগে আর বাঁচিতেছেন না?" তিনি যাইয়া সুরমার কক্ষদ্বার হইতে উচ্চ স্বরে বলিলেন, "বলি ওগো বড়-মানুষের ঝি, সকলে কি তোমার দাসী যে ডাকিয়া খাওয়াইবে? অত যদি ঘুম হয়, তবে ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য বাপের বাড়ী হইতে দাসী আনিতে হয়।"

সুরমা উঠিবার চেষ্টা করিল—পারিল না।

কাত্যায়নী যাইয়া পিসীকে বলিলেন, "দেখ-আবার কি অকল্যাণ ঘটায়।"

পিসী মালা জপ বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, "'ষাট্! ষাট্!' মঙ্গলের দিন কি ওকথা বলিতে আছে?"

কাত্যায়নী আপনার মনে আপনি বকিতে লাগিলেন।

অনাদৃতা, অভাগিনী সুরমা রোগযন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ক্ষুদে'র মা ব্যতীত আর কেহ তাহাকে দেখিল না।

৭

মোহিত মোহাবিষ্টের মত শয়নকক্ষ হইতে জননীর অনুসরণ করিয়াছিল; তাহার পর জননীর আদেশে জড়পুত্তলের মত জননীর ভ্রাতৃদ্বয় যেমন চালাইয়াছিলেন, তেমনই চলিয়াছিল। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক —যেন বুদ্ধিহীন।

দুই দিন পরে বিবাহ এ দুই দিন সুরমার সহিত মোহিতের সাক্ষাৎ হইল না। নিপুণ সেনাপতির মত কাত্যায়নী সম্ভাবিত বিপদের আগমন পথগুলি পূর্ব্বেই সযত্নে রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দুই দিন মোহিত কেবল ভাবিতে লাগিল।

বিবাহের দিন ক্ষুদে'র মা একবার সুযোগ পাইয়া মোহিতকে জানাইয়া গেল, "বৌদিদির জ্বর যেন বিকারে দাঁড়াইয়াছে।" শুনিয়া মোহিত হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিল,—আবার একবার মনে করিল, যাইয়া কাত্যায়নীকে বলিবে, সে বিবাহ

করিবে না; কিন্তু পারিল না। সে একবার অন্তঃপুরে গেল; দেখিল, কাত্যায়নীর পিসী তাহার শয়ন কক্ষের সম্মুখে দালানে বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন। সে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সে তাহার জ্যেষ্ঠ মাতুলের পুত্রকে সুরমার পীড়ার কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "আমি ডাক্তার আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।" তিনি কাত্যায়নীর পিসীকে সে কথা বলিলেন। পিসী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সে কথা বলিতে সাহস করিলেন না।

অন্যমনস্ক ভাবে মোহিত বিবাহ করিতে গেল

শেষ রাত্রিতে লগ্ন। এ বিবাহে বর বা কন্যা কোন পক্ষেই অধিক লোক নিমন্ত্রিত হয়েন নাই। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; কেবল বারান্দায় বর পক্ষে মোহিতের বড় মামা কন্যা পক্ষে পিতৃহীনা কন্যার মেসোর সহিত কথা বলিতে বলিতে থেলো হুকায় ধূমপান করিতেছেন। বালক-গণ দুরন্তপনার পর শ্রান্ত হইয়া বরের বসিবার ঘরে শুভ্র ফরাসের উপর পানের দোনার কদলীপত্র ও ছিন্ন মালার বিক্ষিপ্ত কুসুমরাশির মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। :পল্লী নিস্তব্ধ। সেজে বাতির আর অল্প অংশই আছে। মোহিত বসিয়া ভাবিতেছে।

সহসা নিঃশব্দ পল্লীর নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে শববাহীদিগের কণ্ঠে 'হরিবোল' ধ্বনিত হইল। কণ্ঠ যে পরিচিত! ঘরের পার্শ্বেই পথ। বাতায়ন মুক্ত ছিল। মোহিত মুক্ত বাতায়ন পথে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই শব বাহীরা বাতায়ন-সম্মুখে আসিল। মোহিত চিনিল; —বুঝিল—সব ফুরাইয়াছে!

মোহিত উন্মাদের মত কক্ষত্যাগ করিল। তাহার চরণের আঘাতে একটা সেজ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহিত শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গেল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ নিবারণ করিতে সাহস করিল না। শব চিতায় শায়িত হইল। মোহিত যথারীতি মুখাগ্নি করিল একজন বলিল, "স্বামীকে সিন্দুর তুলিয়া লইতে হয়।" মোহিত ভ্রুকুটি করিল। তাহার পর সে যে কখন শ্মশান হইতে চলিয়া গেল, কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

৯

'বার বেলা' পড়িবার পূর্ব্বেই পুত্র পুত্রবধূ আসিবে সুতরাং "ডাকিনী যাইবার সময়ও জ্বালাইয়া গেল, মঙ্গলের দিন গৃহে অমঙ্গল আনিল"—এই কথা বলিতে বলিতে কাত্যা-য়নী যথাসম্ভব সত্বর সমস্ত গৃহ গোময় জলে শুদ্ধ করাইয়া—কক্ষ প্রাঙ্গন সব ধৌত করাইয়া, প্রাঙ্গনে আলিপনা দেওয়াইয়া বরবধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে প্রকৃত কথা জানাইতে সাহস করিল না।

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। কাত্যায়নী ব্যাকুলা হইতে লাগিলেন। 'বার বেলা' পড়িল—তিনি উদ্বিগ্না-উৎকণ্ঠিতা হইলেন। তিনি পিসীর কাছে নূতন কুটুম্বের 'আক্কেলের' নিন্দা করিয়া ভৃত্যকে

সংবাদ দিতে পাঠাইলেন, যেন 'বার বেলা' না কাটাইয়া বরবধূ বাহির না হয়। ভৃত্য বাহির হইয়া গেল; আর ফিরিল না।

কাত্যায়নী আপনার মনে আপনি বকিতে লাগিলেন।

ক্রমে, যখন সন্ধ্যা হয়—তখন কাত্যায়নী দেখিলেন, তাঁহার দারুণ দুর্ব্বল ব্যবহারের মূর্ত্তিমান প্রায়শ্চিত্তের মত উন্মাদ পুত্র গৃহে প্রবেশ করিল। নগ্ন চরণ ক্ষত বিক্ষত, বিস্রস্ত কেশ ধূলিধূসর, কর্দ্দমাক্ত বরবেশ ছিন্ন, শুষ্ক মুখ রক্তাক্ত, ভাবহীন নয়ন জবাকুসুমলোহিত!

কাত্যায়নী বজ্রহতার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। উন্মাদ মোহিতমোহন আপনার মনে আপনি কি বকিতে বকিতে অস্থির পদে অনাদৃত সুরমার পূত শয়নগৃহের দিকে চলিল।

সে দ্বারে দাঁড়াইয়া একবার সুরমাকে ডাকিল; উত্তর না পাইয়া আবার অস্থির পদে গৃহত্যাগ করিল।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

মেরু প্রান্তে।

(সূচনা)

সে কোন্ অজানা দেশ—যেখানে কত নাবিক আবিষ্কারের প্রলোভনে জীবন হারাইয়াছেন। দুস্তর মহাসমুদ্রের পর পারে সেই দেশ, যেখানে, না জানি, সৃষ্টির কত অমূল্য তত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। জ্ঞান-পিপাসু মনুষ্যের স্বপ্নরাজ্য সেই দেশ—যাহা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় মেরু প্রান্ত। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু মণ্ডলের উপরিভাগ ও নিম্নভাগকে মেরুদেশ বলা হইয়া থাকে। উত্তরে—সাইবেরিয়ায় উত্তর সীমা, ল্যাপল্যাণ্ড, উত্তর অন্তরীপ, নোভা জেম্বলা, স্পিটস্ বারজেন, গ্রীনল্যাণ্ড, বেফিন দ্বীপ ও উপসাগর গ্রেটল্যাণ্ড, পারীদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এবং দক্ষিণে—সাউথ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড, এ্যালেকজাণ্ডার দ্বীপ প্রভৃতি মেরু দেশের অন্তর্গত। মেরু সন্নিহিত স্থান কতকাংশে আবিষ্কৃত হইলেও মেরুদ্বয়ে অদ্যাপি কেহ পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। সৃষ্টির এই অংশ আবিষ্কার করিবার জন্যই বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রে নাবিকগণের কত বিনিদ্র রজনী ও হতাশপূর্ণ দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, সামুদ্রিক কুজ্ঝটিকায় ও বাত্যা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গে কতবার তাঁহাদের জীবন সংশয় হইয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিবে? কোন স্বর্গীয় আনন্দে তাঁহারা এইরূপ দারুণ দুঃখকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা গৃহ সুখ বিলাসী পদ-পল্লব-প্রেমলোলুপ বাঙালীর ধারণার অতীত।

মেরুপ্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক ঘটনা—ইহার সুদীর্ঘ দিবা ও সুদীর্ঘ রজনী। পৃথিবীর আর সকল অংশেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে তাহা হয় না। কারণ মেরুদ্বয় ছয় মাস কাল সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে। ১০ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত (কর্কটক্রান্তি হইতে মকরক্রান্তি) উত্তর মেরুতে দিন ও দক্ষিণ মেরুতে রাত্রি এবং অবশিষ্ট ছয় মাসকাল দক্ষিণ মেরুতে দিন ও উত্তর মেরুতে রাত্রি হয়। কেহ কেহ মেরুস্থানকে নৈশসূর্য্যের দেশ বলিয়া অভিহিত করেন। দিবাকালে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টাকাল সূর্য্য চক্রবালের সন্নিকটে বিরাজ করে। তখন তাহার তেজও অত্যন্ত মন্দীভূত হয়। এই সময়টা মেরুবাসিগণের রাত্রিকাল বলা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ১২ ঘণ্টা সূর্য্য ঊর্দ্ধে অবস্থান করে এবং সেই সময় তাহার কিরণও প্রখর হইয়া উঠে। উপরে যে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কেহ মনে করিবেন না যে মেরুদেশীয়গণ ঐ সুদীর্ঘ দিবাকাল অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করে এবং ঐ সুদীর্ঘ রজনী নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহারা কুম্ভকর্ণের বংশধর নহে। মেরুবাসীরা কি দিবালোকে কি রজনীযোগে জীবনধারণোপযোগী পরিশ্রম করিবার পর নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় এবং কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। নিশীথকালে চন্দ্রমা ও কেন্দ্রীয় ঊষালোক তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের সহায় হয়।

ষণ্মাসব্যাপী দিবা ও রাত্রি হিন্দু জাতির নিকট একটা নূতন বা অদ্ভুত কথা নহে। মনুসংহিতায় দেখিতে পাই,—

> "অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে।
> রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মনামহঃ॥
> পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
> কর্ম্ম চেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥
> দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
> অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥"

'সূর্য্য দ্বারা মানুষ ও দেবতাগণের অহোরাত্রির বিভাগ হয়; রাত্রি নিদ্রাকাল এবং দিন কর্ম্মকাল। মানুষের একমাসে পিতৃলোকের এক দিন রাত্রি; কৃষ্ণপক্ষ দিন এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। মানুষের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র, উত্তরায়ণ দিনমান এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রিমান।' ভৌগলিক তত্ত্বজ্ঞেরা মেরুস্থানকে শাস্ত্রোক্ত দেবলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন কি না বলিতে পারি না। তবে দেখা যাইতেছে যে দেবলোকে ১০ই আষাঢ় হইতে ছয় মাস কাল রাত্রি এবং অবশিষ্ট কাল দিন। অপিচ কর্কটক্রান্তি অথবা মকরক্রান্তিতে কদাপি উত্তরায়ণ অথবা দক্ষিণায়ণ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব শাস্ত্রে যে দেবলোকের ষণ্মাসব্যাপী দিবা ও ও রাত্রির কথা বলা হইয়াছে তাহা মেরুস্থানের দিবা ও রাত্রি নহে। তবে শাস্ত্রবিশ্বাসিগণ এই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে পারেন যে আর্য্যঋষিদিগের উক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহ একেবারে আরব্য উপন্যাস বা কল্পনাবিজৃম্ভিত কাব্য-কথা

নহে। অনন্ত রত্নাকর হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোন্ সুদূর অতীতের কাহিনী গুপ্ত রহিয়াছে কে তাহা বিচার করিবে?

প্রাচীন যুগে মেরুপ্রদেশ এখনকার মত দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় ছিল কি না, তাহা বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচার্য্য বিষয়। পণ্ডিতাগ্রগণ্য অসাধারণ বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাঁহার *Arctic Home of the Aryans* নামক স্বরচিত গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে মেরুদেশে বাস করিতেন। কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের বংশধরগণ সেই আদিবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করিতেছেন। বহু প্রাচীন যুগে মেরুপ্রদেশের এরূপ মনুষ্যবাসোপযোগিতা অসম্ভব নহে। পরন্তু সৌর জগতের গতি তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে সংশয়ের কোন কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্য ও তদীয় পারিপার্শ্বিক গ্রহনিচয় (Satelites) অপর কোন গ্রহকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। পৃথিবী এইরূপে সূর্য্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্ত বিশ্বের নূতন নূতন স্থানে উপনীত হইতেছে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যে নক্ষত্রপুঞ্জ অবলোকন করি ইহা অসম্ভব নয় আমরা হয়ত এককালে ঐ সকল নক্ষাধিকৃত কোন কোন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে নক্ষত্র সকল এক, একটি তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য। পৃথিবীর উপর ঐ সকল নক্ষত্রের প্রভাব অনিবার্য্য ও অপরিমেয়। তাহারই ফলে পৃথিবীর শৈত্য ও উষ্ণতা অনেকটা নিয়মিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে মেরুপ্রদেশে আমরা যেমন শৈত্যের আতিশয্য অনুভব করি যুগান্তরে যে ঐ স্থান গ্রীষ্মপ্রধান ও জনপদপূর্ণ ছিল না এবং শ্যামল তরু লতা ও শস্যসম্ভারে রমণীয় শ্রী ধারণ করিত না, ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং মেরু প্রদেশ অনন্তকাল ধরিয়া মানবজাতির অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে এ কথা বলিলে মূঢ়তা প্রকাশ করা হয়।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ মেরুদেশ সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না রামায়ণে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বানররাজ সুগ্রীব সীতান্বেষণের নিমিত্ত শতবলনামা বানরকে শত সহস্র সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া উত্তর দিকে অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। যে সকল দেশে তাহাদিগকে যাইতে হইবে তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই সকল স্থানের বর্ণনাস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি দৃষ্ট হইয়া থাকে;—

"তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্য লক্ষ্মাভি বিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা॥
ভগবাংস্তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ॥
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ চ।
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ॥
স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ।
তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রমুপাবর্ত্তিতুমর্হথ॥

এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥”

রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

‘সেই মৈনাক পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই, উত্তর মহাসমুদ্র; সেই খানে সুবর্ণময় সোমগিরি বর্ত্তমান। সেইস্থান সূর্য্যহীন হইলেও সোমগিরির প্রভা দ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয়, যেন সূর্য্যালোকেই আলোকিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তথায় বিশ্বাত্মা বিষ্ণু, একাদশরুদ্ররূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষি পরিবেষ্টিত ব্রহ্মা বাস করেন। তোমরা কদাচ তথায় যাইবে না, এবং কোন প্রাণীই তথায় যাইতে সক্ষম নয়। সেই সোমগিরি দেবতাগণেরও দুর্গম, সুতরাং দূর হইতে উহা দেখিয়া সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ইহার পর যে স্থান আছে তথায় তোমরা যাইতে পারিবে না। সেই দেশ সূর্য্যবিহীন এবং তাহার বিষয়ে আমিও জ্ঞাত নহি।” উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে উহা যে মেরুদেশের বর্ণনা, তাহাতে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে। এই সোমগিরি সুপ্রসিদ্ধ Aurora Borealis এর নামান্তর। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী তট হইতে পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বানরগণের পর্য্যটন অলীক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় না। মহর্ষি বাল্মীকি যে মেরুপ্রান্ত পর্য্যন্ত দেশসমূহের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য। উক্ত সমগ্র অধ্যায়টি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে উত্তর দিকে হিমালয়ের পরবর্ত্তী স্থান সমূহের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনানুসারে, হিমালয়, সোমাশ্রম, কালগিরি, দেবসখা, শত যোজন বিস্তৃত বৃক্ষ ও জীবশূন্য দেশ, কৈলাস পর্ব্বত, ক্রৌঞ্চ গিরি ও মৈনাক যথাক্রমে অতিক্রম করিলে উত্তর মহাসমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়। এই ভৌগলিক বিবরণ একে বারে ভ্রমপূর্ণ নহে। উপরি উক্ত ‘শত-যোজন-বিস্তৃত বৃক্ষ ও জীবশূন্য দেশকে আধুনিক সাইবিরিয়ান মরু ভূমি—(Siberian Deserts) বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। এই অনুমান যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে সোমগিরি যে কেন্দ্রীয় উষালোকের (Aurora Borealis) বর্ণনা তাহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে। কারণ সাইবিরিয়াস্থ মরুভূমি হইতে উত্তর মহাসমুদ্র অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

দেখা গেল যে প্রাগাধুনিক যুগে মেরু প্রদেশ ভারতবর্ষীয় আর্য্যঋষিগণের ভৌগলিক জ্ঞান-সীমার বাহিরে ছিল না। কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। সেই অজানা পুরীর জ্ঞাতব্য বিষয়ে অসম-সাহসিক ইউরোপীয়গণই একমাত্র গতি। বাস্তবিক কত ক্লেশ ও কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া ইউরোপীয়গণ মানবজাতির জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়।

উত্তর ও দক্ষিণাশার পথে মেরুপ্রান্ত দিয়া কোনও নাবিক অদ্যাপি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সক্ষম হন নাই। পৃথিবীর এই দুই দ্বারে প্রকৃতি বিকট মূর্ত্তিতে প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার মানবের নয়নান্তরালে সুরক্ষিত করাই যেন ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বভাবের

এই প্রচ্ছন্ন লীলানিকেতন অমিতোৎসাহী পাশ্চাত্যগণের অনুসন্ধিৎসার নিকট কত কাল অর্গলাবদ্ধ রহিবে? তাঁহারা উত্তর মেরুর সন্নিহিত অনেকগুলি দ্বীপ ও লোকালয় একে একে আবিষ্কার করিয়াছেন। দক্ষিণ প্রান্তেও তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। কালক্রমে, দক্ষিণমেরুর কতকাংশও যে অদম্যপ্রয়াস নাবিকগণের নয়নপথবর্ত্তী না হইবে এমন বলা যায় না।

বাতঝঞ্ঝাপূর্ণ চিরতুষারময় অনুর্ব্বর মেরুপ্রদেশ বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-নিকেতন। অস্তগামী সূর্য্যের নানাবর্ণাভা ময়ূখমালা যখন তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতশৃঙ্গে ও নভোমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, অথবা চন্দ্রকরোদ্ভাসিত ষণ্মাসরূপিনী রজনীর শোভাসম্পদ যখন মাঠ প্রান্তর ও সমুদ্রতট ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠে, তখন যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু সেই বিশ্ব-বিমোহন অরোরা বা কেন্দ্রীয় উষালোকের দৃশ্য সত্য সত্যই বর্ণনাতীত ও অতুলনীয়। জনৈক লেখক বলিয়াছেন "Of all the magnificent spectacles that relieve the monotonous gloom of the Arctic winter there is none to equal the magical beauty of the Aurora." অর্থাৎ মেরুপ্রদেশে যে সকল চমৎকার দৃশ্য আছে তন্মধ্যে অরোরার সৌন্দর্য্যের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। বস্তুতঃ অরোরা-সৌন্দর্য্য জগতের মুকুটমণি। যাঁহারা অরোরার অনুপম রূপলহরী দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে মুগ্ধনেত্রে বলিতে হইয়াছে, "তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।" সুদীর্ঘ ষণ্মাসব্যাপী দিবালোকের অবসানে যখন রজনী সমাগতা হয় এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অস্ফুটালোক ঈষৎ অন্ধকারে ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিতে পারে না, তখন সুদূর উত্তর দিগন্তে বৃত্তাংশাকার বা কার্ম্মুকাকার এক দিব্যজ্যোতি সহসা প্রকাশ হয়। ইহাই অরোরা। এই আলোক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দুস্থানে (zenith) গিয়া উপনীত হয়। তখন অনন্ত জ্যোতিঃপ্রবাহ নির্গত হইতে থাকে। এই সকল আলোকচ্ছটা কখনও প্রভাময় বৃত্তাংশ হইতে কখনও চক্রবালের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সময় নভোমণ্ডলে এক বিরাট অগ্নি-সমুদ্রের আবির্ভাব হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমুদয় প্রভারাশির তরঙ্গমালা ক্রমে ক্রমে মিলিত হইয়া এক রমণীয় জ্যোতির্ম্মুকুট সৃজন করে। ইহাতেই অরোরার চরম সৌন্দর্য্যের বিকাশ। উপরে যে জ্যোতিঃপ্রবাহের কথা বলিলাম, উহার পাদদেশ রক্তবর্ণ, মধ্যাংশ হরিৎ (emerald green) এবং শিরোভাগ (বিন্দুস্থানে) ঈষৎ পীতবর্ণ। ঊর্দ্ধে, আকাশে, এই জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য, নিম্নে তুষারাবৃত পৃথিবীবক্ষে অরোরার শুভ্রালোক, আর সম্মুখে নিবিড় কৃষ্ণ অনন্ত জলধি;—বিধাতার এই কাব্যজগৎ দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কিছুই চিরন্তন নহে। উদয় হইলেই অস্ত, বৃদ্ধি হইলেই হ্রাস, সৃষ্টি হইলেই লয়,—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অরোরার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মুকুট পূর্ণতা প্রাপ্তির পর ক্রমে ক্রমে ম্লান হইতে থাকে। এই বিচিত্র প্রভারাশি ধীরে ধীরে গগনপট হইতে অপসৃত হইলে মেরুস্থান পুনরায় ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হরিদ্বার।

আজ আমি হরিদ্বারে। এখানে এ সময়ে এক মেলা। উত্তর পশ্চিম ভারতের রূপসী-বৃন্দে স্থানটি এখন একটি বৃহৎ পুষ্পোদ্যানের শোভা ধারণ করিলেও তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত গৃহাবলী নরকে পরিণত হইয়াছে। নাসিকা রুমালে আবৃত করিয়া বহু গৃহ ঘুরিয়া শেষে গঙ্গার উপর একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল কক্ষে আমার নীড় বাঁধিলাম; নীড়,—কারণ উহা একটা কবুতরের খোপ বিশেষ। এই খোপটি হরিদ্বার নগরের শীর্ষ দেশে, একরূপ আকাশে অবস্থিত। অতএব এই কক্ষে উঠিয়াই নগরাজ হিমালয়ের এবং নগররাজ হরিদ্বারের এবং উভয় মধ্যবর্ত্তিনী নগেন্দ্রনন্দিনী জাহ্নবীর যে শোভা আমার নয়ন সমক্ষে খুলিল তাহা অবর্ণনীয়। নগবালা বহুদূর নগাঙ্কে স্নেহময়ী কন্যার মত বিহার করিয়া এবং বহু কল্পনাতীত পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করিয়া শেষে এই হরিদ্বারে ভারত-বক্ষে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে এই স্থান মহাতীর্থ। তিনি যে দিন প্রথম এখানে পদার্পণ করেন জানি না, সেই দিন মহাকালের কোন চিন্তাতীত সুদূর অতীত গর্ভে এরূপ মহাতীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। সে দিন ভারতের ও জগতের মহাদিন। জাহ্নবীধারা ভারতের জীবনধারা। জননীর কৃপায় গণনাতীত কাল হইতে ভারত স্বর্ণ-প্রসবিনী। জননীর এই জীবনদায়িনী পতিতপাবনী ধারার সহিতই ভারতের ধর্ম্ম ও জাতীয় ইতিহাস প্রবাহিত হইয়াছে। জননী এখানে নিতান্ত শীর্ণকলেবরা তুষারশীতলনীলামৃতভরা। তাঁহার এক তীরে দীর্ঘ প্রস্তর-সোপানাবলি শোভিত হরিদ্বার নগর। অপরতীরে গগনভেদী স্বয়ং নগরাজ হিমাচল। তাঁহার জাহ্নবী তীরস্থ এক উচ্চ শৃঙ্গে শ্বেত শতদলের মত চণ্ডিকার মন্দির, অপর তীরে রক্ত-ধ্বজ সূর্য্যকুণ্ডের পর্ব্বত। হিমাচলের সেই বিরাট ললিত ভৈরব দৃশ্য বহুক্ষণ স্তম্ভিত হৃদয়ে দর্শন করিয়া কক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাটে ঘাটে বেড়াইতে লাগিলাম। অসংখ্য নর নারীতে আজ সোপানাবলি সমাচ্ছন্ন, এবং হর হর বম বম নিনাদে হিমালয় মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত। স্নানরতা ও সদ্যস্নাতা রমণীবৃন্দে নদীগর্ভ ও সোপানশ্রেণী হিমাচল পদতলে একটি প্রকাণ্ড পুষ্পপাত্রের মত শোভা পাইতেছে। শত শত নরনারী সুললিত গঙ্গোষ্টক আবৃত্তি করিতে করিতে অবগাহন করিতেছে। সোপানের স্থানে স্থানে বহু সন্ন্যাসী, কেহ বা ছত্রতলে, কেহ বা শূন্য গগনতলে, ভক্তিভরে ভজন করিতেছেন, গীতা পাঠ করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, অথবা গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন।

এক যুবা পাণ্ডা আমাকে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছিল। —খাঁটি ব্রাহ্মণের সন্তান, দেখিতে যেমন

সুন্দর, তেমনি চতুর। পাণ্ডা জাতির মধ্যেও চতুর, শিষ্টাচারী ও সদালাপী। দক্ষযজ্ঞের ও সতীর দেহত্যাগের স্থানই এখানে অন্যতর তীর্থ। কোনো কার্য্য বশতঃ সে নিজে যাইতে পারিল না বলিয়া তাহার বয়সী আর একটা পাণ্ডাকে আমার সঙ্গে দিল। তাহার নাম ঠাণ্ডারাম। তাহাকে দেখিবা মাত্র বুঝিলাম তাহার বুদ্ধিখানিও ঠাণ্ডারাম। সে আমাকে পশ্চিম ভারতের পৌরাণিক রথ 'একায়' আরোহণ করাইয়া দক্ষযজ্ঞের স্থান দেখাইতে চলিল। 'এক্কার' মধুর সঞ্চালনে সে একবার আমার অঙ্গে পড়িয়া তাহার অঙ্গ সুবাসে আমাকে মোহিত করিতেছে, আমি একবার তাহার অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছি; কখন বা চিৎ হইয়া কখন বা দুজনেই দুজনের উপর পড়িতেছি। বসিয়াছি—চরণ দুখানি আকাশে তুলিয়া। ইহার উপর 'এক্কার' নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র 'ঝাঝর' নানা অবতারে নানা শব্দে সমস্ত দেশটা সঙ্গীতপূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। এ যন্ত্রনা নিবারণ করিবার জন্য আমি ঠাণ্ডারামের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম। মনে করিলাম—

"রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা;

এ বিষম জ্বালা যদি পারি ভুলিবারে।"

ঠাণ্ডারাম! আমরা কি দক্ষিণ দিকে যাইতেছি? গম্ভীরভাবে সে উত্তর করিল 'ঠিক

'ঠাণ্ডারাম! না, আমরা উত্তরদিকে যাইতেছি?' আবার সেরূপ উত্তর করিল—'ঠিক।' 'ঠাণ্ডারাম! উত্তরদিকও নহে বোধ হয় আমরা পশ্চিমদিক যাইতেছি।' উত্তর—'ঠিক!' 'ঠাণ্ডারাম! বোধ হয় যেন, পূর্ব্বদিক যাইতেছি। উত্তর—'ঠিক।' হাসিতে হাসিতে আমি এক্কা হইতে পড়িবার উপক্রম হইলাম। 'ঠাণ্ডারাম! ঐ যে দেখা যাইতেছে ওটাই কি হিমালয়?'—সে দিকে পর্ব্বতের গন্ধও নাই! উত্তর—'ঠিক'। 'ঠাণ্ডারাম!—ওই যে কি দেখা যাইতেছে উহা কাহার বাড়ী? উহাই হিমালয়।' উত্তর—'ঠিক।' আমার বোধ হইল মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া অবধি সে এই এক 'ঠিক' কথা মাত্র শিখিয়াছে। এমন মানুষ-গরু আমি দেখি নাই। যাহা হউক তাহার 'ঠিক' কথা শুনিতে শুনিতে পথ কষ্ট ভুলিয়া আমরা একটা কদর্য্য স্থানে পঁহুছিলাম। মধ্যে একটা গর্ত্ত, তাহার আশে পাশে কতগুলি পাথর, ছোট বড়, পড়িয়া আছে। ঠাণ্ডারাম বলিলেন, এই গর্ত্তই দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড,এখানেই সতী-মাই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আর পাথর সকল উক্ত যজ্ঞে সমবেত দেবতাবৃন্দ! হায়, হিন্দুধর্ম্মের পরিণতি! মোট কথা, দক্ষ-যজ্ঞটা বোধ হয় আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্মের বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘর্ষণের একটা রূপক মাত্র। মহাযোগী মহাদেব অনার্যদের দেবতা, কিম্বা মহাযোগী বুদ্ধদেব এবং বিকৃত মূর্ত্তি প্রমথগণ অনার্য্যজাতি বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মহাদেবের সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সতী দেহের দ্বারা তীর্থ সৃষ্টি,—পুরুষের স্কন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টির প্রারম্ভে আবর্ত্তন ও তাহার খণ্ড খণ্ড আবর্ত্তণে কুম্ভকারের যন্ত্র বিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। অথবা সতীদেহ

মৃত বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহার দ্বারা সৃষ্ট বৌদ্ধ তীর্থ সকলই এখন হিন্দু-তীর্থ। গয়া যে বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ এবং গয়াসুর বধ যে এরূপ একটা রূপক রাজেন্দ্রলাল তাঁহার "বৌদ্ধ-গয়া" গ্রন্থে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই রূপকের মূল অর্থ— বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, বুদ্ধদেব এখন হিন্দুদের অষ্টম অবতার এবং জগন্নাথদেব এখনও বুদ্ধাবতার বলিয়া শ্রীক্ষেত্রে পরিচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হরিদ্বার এখনও উত্তর ভারতের 'কেনেলের দ্বার।' এখান হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা পতিত অনুর্ব্বর ক্ষেত্র সকল পাবন বা উদ্ধার করিতে 'কেনেলে' প্রবাহিত হইয়া আবার কানপুরে গিয়া মূল গঙ্গায় পড়িয়াছেন। যজ্ঞ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে আমার পূর্ব্ব পাণ্ডা লচমনের সঙ্গে এই 'কেনেল' গঙ্গার গঙ্গোত্তরী দেখিতে গেলাম। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! এই কেনেলই রুর্কির সেই সেতুর উপর দিয়া কানপুরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

তাহার পর সমস্ত রাত্রি নির্ম্মল-জোৎস্নালোকে প্রায় সমস্ত রাত্রি হিমালয়, গঙ্গা, ও হরিদ্বারের শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া পর দিন প্রাতে নিতান্ত অনিচ্ছায় হরিদ্বার ত্যাগ করিলাম! মেলার দরুণ হরিদ্বার যেরূপ নরকে পরিণত হইয়াছিল, এখানে আর এক দিন থাকাও নিরাপদ মনে করিলাম না। অন্যথা আরো ২।১ দিন থাকিয়া কিছুদূর হিমালয় বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতাম। ষ্টেশনের পথে শৈলপাদ মূলে একটি সুন্দর আশ্রম দেখিয়া গেলাম। এ স্থানটি আমার কাছে বড়ই শান্তিপ্রদ বোধ হইল। লাসকর ষ্টেশনে পঁহুছিয়া লাহোরাভিমুখে ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা করিবার সময়ে দুই পঞ্জাবিনী মাতা কন্যার সহিত পরিচিত হই। উভয়ে পরমাসুন্দরী। এ উপাখ্যান স্থানান্তরে বলিব। সাহারণপুর ট্রেণ পঁহুছিলে মধ্যভারতের ট্রেণ হইতে দু'জন পঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার কক্ষে আসিলেন। ট্রেণ খুলিলে তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। একজন পণ্ডিত জীবানন্দ, যোধপুরের সহকারী মন্ত্রী। দ্বিতীয় জন আম্বালার কমিসেরিয়েটের কর্ম্মচারী। দুজনেই আদর্শ ভদ্রলোক। কয়েক মিনিটের আলাপেই তাঁহারা আমাকে এরূপ পাইয়া বসিলেন যে পণ্ডিত জীবানন্দ এবং সেই মাতা কন্যা তিন জনেই আমাকে জলন্ধরে আসিয়া কেবল সেই রাত্রিটা মাত্র তাঁহাদের অতিথি হইতে জিদ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক আম্বালায় নামিতে সেরূপ করিলেন। পর দিন প্রাতে লাহোরের খ্যাতনামা উকিল এবং সহপাঠী বন্ধু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন বলিয়া আমি অনেক কষ্টে তাঁহাদের এই স্নেহ হইতে অব্যাহতি লাভ করি। কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম বিষয়টি কি? একজন অপরিচিতের প্রতি ইহাদের এতাদৃশ স্নেহ কেন? আমি এই ভারত-ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমার গুরুদেবের চট্টগ্রামস্থ উচ্চপদাসীন শিষ্যকে গুরুদেবের সমাধি কোথায় জানিবার জন্য পত্র লিখিয়া

ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁহার উগ্র তান্ত্রিকতার পক্ষপাতী নহি বলিয়া—তিনি তখন ধান্যেশ্বরীর স্রোতে চট্টগ্রাম ভাসাইতেছিলেন,—তিনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই। এই ভ্রমণের পর আমার শৈশবসুহৃৎ চন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে এই জগন্নাথেই গুরুদেবের সমাধি। তখন কি যে মনস্তাপ হইল বলিতে পারি না। গুরুদেব! তবে তুমিই কি তোমার এই শিষ্যকে এরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলে? হায়! আমি তোমার পুণ্যতীর্থ সমাধি দর্শন করিবার অযোগ্য বলিয়াই বুঝি আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।*

নবীনচন্দ্র সেন।

মহাভারত

ইতিহ বা ইতিবৃত্ত

আমরা এক্ষণে কুরুসেনাপতি ভীষ্মদেবের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিব।

মার্ত্তণ্ড দেব—ভীষ্মদেব।

ভীষ্মদেবের চরিত্রের বিশেষত্ব গুলি এই:—

১। গঙ্গাদেবীর অষ্টম গর্ভে মহাব্রত ওরফে ভীষ্মদেবের জন্ম হয় (১)। প্রথম জাত সপ্তপুত্র জাতমাত্রেই গঙ্গাদেবী একে একে জলে নিক্ষেপ করেন। মহা ১-৯৮।

২। গঙ্গানন্দন "সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ" (মহা ১-১৮০)

৩। ভীষ্মদেবের রথধ্বজ তারাপঞ্চক-রঞ্জিত তাল ফলে সুশোভিত। (২)

৪। ভীষ্মদেব দশ দিন কুরু-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। (মহা ৬-১১৬-১০)

৫। ভীষ্মদেব প্রতিদিন দশ সহস্র শত্রু বিনাশ করিতেন। (মহা)

৬। দশম দিনে শিখণ্ডী দর্শনে ভীষ্মদেব ধনুত্যাগ করিলেন।

৭। ঐ দিন সায়ংকালে অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাবৃত ভীষ্মদেবের দেহ রথ হইতে পতিত হইল, কিন্তু ধরণী স্পর্শ করিল না, শরশয্যায় ভীষ্মদেব পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ান রহিলেন। (মহা ৬-১১৬)

৮। তৎকালে দিবাকর দক্ষিণ দিগ-বলম্বী হইলেন। (মহা-ঐ)

৯। ভীষ্মদেব উত্তরায়ণ কাল প্রতীক্ষায় ছয়মাস কাল শর-শয্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। (মহা-ঐ)

১০। গঙ্গাদেবী ভীষ্ম সমীপে মহর্ষিগণকে হংসরূপে প্রেরণ করিলেন। (মহা-ঐ)

* কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় স্বর্গারোহণের কয়েক মাস পূর্ব্বে এতদিনের লিখিত এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। বঃ সঃ

(১) দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ স্বামীর জন্ম হয়।

(২) তালেন মহতা ভীষ্মঃ পঞ্চতারেণ কেতুনা বিমলাদিত্য সঙ্কাশঃ তস্থৌ কুরু চমূপতিঃ।

(মহা ৬-১৭।১৮)

১১। শরতল্পে শয়ান ভীষ্মদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে অর্জ্জুন কর্তৃক শরবিদ্ধ পৃথিবী হইতে উত্থিত বারিধারার অমৃত তুল্য জল কুরু পিতামহ পান করিলেন।

ভীষ্মচরিত্র বুঝিতে হইলে মার্ত্তণ্ড দেবের জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহগুলি সম্যক্ অবগত থাকা প্রয়োজন। এই সকল জ্যোতিষিক ইতিহের অঙ্কুর বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের হস্তে ইতিহগুলি শাখা প্রশাখা সমন্বিত ও পল্লবিত হইয়া প্রকাণ্ড আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পূজ্যপাদ সায়ণ ও মোক্ষমূলার (৩) আদি য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের তারাহীন চক্ষুতে নক্ষত্রপূঞ্জক প্রাচীন ঋষিগণের রচিত বেদাদি হিন্দুশাস্ত্র—বহু স্থলে "অর্থ বিহীন বাগাড়ম্বর" বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি জ্যোতিষিক জ্ঞান ভিন্ন কোন হিন্দু শাস্ত্রের সদর্থ হইবে না। জ্যোতিষিক জ্ঞান ভিন্ন মহাভারত পাঠ করিতে যাওয়া বৃথা সময় নষ্ট ও পণ্ডশ্রম মাত্র। আমরা পাঠকগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন গ্রহগণের রাশি চক্রের, নক্ষত্র চক্রের ও তারামণ্ডলগণের জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহগুলির প্রতি একটু কৃপা কটাক্ষপাত করেন।

১। মার্ত্তণ্ড দেবের জন্ম বিষয়ে ঋক্‌বেদে (১০-৭২-৮) আমরা দেখিতে পাই যে ঃ—

অদিতি আটটী সন্তান প্রসব করেন, সাতটী লইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং অষ্টম পুত্রকে আকাশে ফেলিয়া গেলেন। সায়ণাচার্য্য বলেন এই অষ্ট পুত্র অষ্ট বসু এবং এই অষ্টম পুত্র সূর্য্য—মার্ত্তণ্ড।

ঋক্ মন্ত্রোক্ত এই ইতিহটী বিস্তৃতরূপে মহাভারতে (১-৯৬—১০০) ভীষ্মোৎপত্তি-নামে বিবৃত হইয়াছে।

অধ্যায় কয়েকটী পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিবেন মার্ত্তণ্ড দেবই ভীষ্মদেব। কেবল বেদোক্ত অদিতি ইতিহাসে গঙ্গাদেবী নাম পাইয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে অদিতি ভাগীরথী গঙ্গা নহে, আকাশগঙ্গা (সোমধারা)।

২। বেদ মতে (ঋঃ বেঃ ২।২৭।৪) (অথর্ব্ববেদ ৮।২৪।১, ১০।৮।৪২) সূর্য্যদেবই ঋতবান্ বা সত্যধর্ম্মা। অন্য কোন দেব ঋতবান্ বা সত্যধর্ম্মা বলিয়া বেদে উল্লেখ নাই।

সুতরাং মার্ত্তণ্ড—ভীষ্ম দেবই 'সত্যধর্ম্ম পরায়ণ।'

৩। তারা-দর্শক জানেন যে প্রাচীনগণ বুধাদি পাঁচটী গ্রহ মাত্র চিনিতেন এবং এই পাঁচটী গ্রহ হইতে "গ্রহ পঞ্চক" পদের অবতারণা হইয়াছে; তাঁহারা আরও জানিতেন যে সূর্য্যবিম্ব এই গ্রহপঞ্চকে আকৃষ্ট (৪) ও পরিবেষ্টিত থাকে সুতরাং মার্ত্তণ্ড-

৩ "The planets were never noticed by the ancient Rishis." Max Muller.

(৪) পঞ্চরশ্মিন্ (ঋঃ বেঃ ২।৪০।১ ; ঐঃ ব্রাঃ ৪।৩ ১৯)

পুষ্পিকাঃ—সায়ণাচার্য্য পঞ্চরশ্মি অর্থে—পঞ্চ ঋতু বোঝেন কিন্তু পাঠক ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে দেখিবেন যে পঞ্চরশ্মি পঞ্চগ্রহ ভিন্ন কিছুই নহে। পাঠকের সাহায্যার্থে আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উক্তিটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "তস্যাঃ বৈ দেবাঃ আদিত্যস্ত স্বর্গাৎ লোকাৎ অপাতৎ অভিভয়ুঃ। তম্ পঞ্চভিঃ রশ্মিভিঃ উদরয়ম্।"

ভীষ্মের ধ্বজ-চিহ্ন সূর্য্যবিম্ব সদৃশ মহান তাল ফল এবং ঐ তাল-ফল তারাপঞ্চকে খচিত।

৪। জ্যোতিষিকগণের মতে তুঙ্গস্থ গ্রহ বিশেষ বল ধারণ করে এবং সূর্য্য মেষ রাশির দশ অংশে তুঙ্গে এবং সুতুঙ্গে থাকেন অর্থাৎ বৈশাখের প্রথম দশ দিন তুঙ্গে থাকেন। এই জন্য মহাকবি মার্ত্তণ্ড ভীষ্মের দশ দিন প্রাধান্য কল্পনা করিয়াছেন।

৫। বেদ মতে (ঋঃ বেঃ ৮।৮৫।১৩, অঃ বেঃ ৬।৫২।১) দশ সহস্র রাক্ষস প্রতি সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকে আক্রমণ করে এবং সূর্য্য তাহাদিগকে নিধন করেন (ঋঃ বেঃ ১।৩৫।১০) এই বেদোক্তির উপর বিষ্ণুপুরাণ বলেন :—

সন্ধ্যাকালেতু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরম দারুণে
মন্দেহাঃ রাজসাঃ সর্ব্বে সূর্য্যং ইচ্ছন্তি খাদিতুম্।
ইত্যাদি (বিঃ পুঃ ২।৮।৪৭—৭)

পাঠক বুঝিয়া লইবেন কি জন্য ঐতিহাসিক-বর ভীষ্মের দশ সহস্র শত্রু বিনাশের কল্পনা করিয়াছেন

৬। শিখণ্ডী দর্শনে ভীষ্ম ধনুত্যাগ করেন।—শিখণ্ডী কে? তাহার নারীত্ব কিরূপে হইল! এবং ভীষ্মই বা কেন দ্রুপদ-সুত শিখণ্ডী দর্শনে ধনুত্যাগী হইলেন? বিচক্ষণ পাঠক একটু সহিষ্ণুতার সহিত আমাদিগের বক্তব্য বুঝিতে চাহিলে অনায়াসে এই জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পাঠক জানেন যে—সপ্তর্ষিগণ (Great Bears) অমরকোষ মতে চিত্র শিখণ্ডিগণ। এবং সপ্তর্ষি সন্তান বৃহস্পতি অমরকোষ মতে চিত্র শিখণ্ডিজ। অমরসিংহ এ কথা কোথায় পাইলেন?

মহাভারত মতে (১২।৩৩৬) ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ (সপ্তর্ষি) চিত্র শিখণ্ডিগণ (পুং ময়ূরগণ।) ভাল কথা, ঐতিহাসিকবর ব্যাসদেব এ কথা কোথায় পাইলেন যে চিত্র শিখণ্ডিগণের নারীমূর্ত্তি ছিল? এ কথা ঋক্‌বেদে আছে—সপ্ত ময়ূর্য্যঃ (ঋঃ বেঃ ১।১৯১।১৪) সপ্ত ময়ূরীগণ।

চিত্র শিখণ্ডী ওরফে সপ্তর্ষিগণ দর্শনে মার্ত্তণ্ড ভীষ্ম ধনুত্যাগী হইবার প্রকৃত কারণ কি?

পাঠক জানেন যে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমান পঞ্জিকা প্রকটিত হয় তখন বিষ্ণুপদ চতুষ্টয়—মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু, উত্তরায়ণান্ত বিন্দু, জলবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু, এবং দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু এই বিন্দু চতুষ্টয়—যথাক্রমে মীনরাশির, মিথুন রাশির, কন্যা রাশির এবং ধনু রাশির অন্ত্য বিন্দুতে অবস্থিত ছিল। এজন্য চৈত্র আষাঢ় আশ্বিন এবং পৌষ সংক্রান্তি চতুষ্টয় "বিন্দু-পদী সংক্রান্তি" খ্যাতি পাইয়াছিল। পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, চৈত্র সংক্রান্তিতে সূর্য্য-নারায়ণ বিষুপ রেখায় উপনীত হইতেন, আষাঢ় সংক্রান্তিতে সূর্য্য-নারায়ণের উত্তরায়ণের শেষ হইত, এবং দক্ষিণায়নের বা দক্ষিণগতির আরম্ভ হইত

( ) বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ। নিরুক্ত ধ্যায়েৎ সদা সবিত্রি মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ।

"It originally represented the kneeling Sun God, sometimes overcoming the Lion, ...g at the Demon birds. R. Brown p 31

অর্থাৎ সূর্য্য-নারায়ণের শয়ন আরম্ভ হইত। আশ্বিন সংক্রান্তিতে বর্ষার অবসান হইত এবং সূর্য্য-নারায়ণ বিষুপ রেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ গোলার্দ্ধে আশ্রয় করিতেন।

প্রায় ৪৫০০ বৎসর পুর্ব্বে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু চিত্র-শিখণ্ডি মণ্ডলের দক্ষিণস্থ মঘা-নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। তৎকালে মার্ত্তণ্ড-ভীষ্ম শিখণ্ডীর তলে পূর্ব্বার্জ্জুনি নক্ষত্রের পার্শ্বস্থ মঘানক্ষত্রে উত্তরায়ণান্ত বিন্দুতে উপনীত হইলে উত্তর গতির শেষ হইত এবং দক্ষিণগতি বা শয়ন আরম্ভ হইত।

এই জ্যোতিষিক তত্ত্বের উপর শিখণ্ডীর সমীপবর্ত্তী অর্জ্জুন সন্নিহিত ভীষ্মের শর-শয্যায় শয়ন কল্পিত হইয়াছে.

৮। দক্ষিণগামী সূর্য্য না হইলে ভীষ্মের শয়ন অসম্ভব হয়।

৯। দক্ষিণায়ণের শেষে উত্তরায়ণের প্রারম্ভে সূর্য্য নবজীবন প্রাপ্ত হয়। এজন্য সূর্য্যের নাম বর্ষজীবী (অঃ বেঃ ৯।৯।৫) আবার সূর্য্য প্রতিদিন ঊষাকালেও নবজীবন প্রাপ্ত হয় (ঋঃ বেঃ ১০।৫৫।৫) সুতরাং ভীষ্ম দক্ষিণায়ণের শেষ ভিন্ন কি রূপে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন? উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়া সূর্য্য-ভীষ্ম শরতল্পে জীবিত থাকিতে বাধ্য হইলেন।

১০। তারা-দর্শক জানেন যে সৌম্য ধ্রুবের সন্নিহিত আকাশগঙ্গা মধ্যে তারা হংস (Lygnus) অধিষ্ঠিত আছে। বেদব্যাস এই হংস মণ্ডলকেও সপ্তর্ষি বলেন। প্রতি মন্বন্তরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সপ্তর্ষি ছিল ইহাই পৌরাণিক মত। শ্রীমৎভাগবত দেখ।

১১। তারা-দর্শক জানেন যে হরি-কুলেশ মণ্ডলই (Hercules) তারা জগতে মার্ত্তণ্ড দেবের প্রতিরূপ। পাঠক এক-বার খ-গোলে হরিকুলেশ মণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিবেন যে ভীষ্ম হরিকুলেশের দক্ষিণ পার্শ্বে অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত বাণ মণ্ডল (Sagitta) আকাশ গঙ্গার মধ্যে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং ভীষ্ম-হরিকুলেশ মণ্ডলের ঈশান কোণে ভীষ্মের দক্ষিণ কর্ণের অনতি দুরে হংস চঞ্চু জাজ্বল্য-মান রহিয়াছে। বেদমতে (অঃ বেঃ ৯।৯।৫) সূর্য্য ঊর্দ্ধগামী জল পান করেন সুতরাং ভীষ্ম উৎক্ষিপ্ত জল পান করিলেন।

খ-গোলের এই দৃশ্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ব্যাসদেব যে ইহাকে অবিকল চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

ক্রমশ

তারা-দর্শক।

নীলকণ্ঠ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একে একে, দিনে দিনে, মন্মথ ও ষোড়শীর মধ্যে প্রীতি-বন্ধন, উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ এতদুর বাড়িয়া গেল যে এক বেলা দেখা সাক্ষাৎ না হইলে দু'য়েরই যেন "পলকে প্রলয় জ্ঞান" হইত, আবার দর্শন মাত্রেই, নয়নে নয়নে "হাস্য অমৃতের সিন্ধু" উথলিয়া উঠিত।

একদিন ষোড়শী যখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিল, তখন পুস্তক ও খাতা পত্র দেখিতে দেখিতে ষোড়শীর সেই "ব্যথা" মন্মথের দৃষ্টিপথে পড়িল; মন্মথ অতি আগ্রহের সহিত কবিতাগুলি পড়িতে লাগিলেন, তাঁহার নিকট সে ব্যথা বড় মধুর, বড় হৃদয়স্পর্শী মনে হইল। আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া ষোড়শী তাড়াতাড়ি মন্মথের নিকট আসিল, এ কথা সে কথার পর সাহিত্য আলোচনা আরম্ভ হইল; সেদিন মন্মথ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনের ভক্তি মাখা "বাছা বাছা" কবিতাগুলি ষোড়শীকে শুনাইতে লাগিলেন, মন্মথের মধুর কণ্ঠে বৈষ্ণব কবিদিগের মধুর রসের মধুর কবিতার আবৃত্তি বড় মধুর লাগিতেছিল, শুনিতে শুনিতে মধুর-হৃদয়া-ষোড়শী মুগ্ধ হইয়া পড়িল। মন্মথ মধ্যে একবার পড়া বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ঠান্‌দিদি আজ ভাই তোমার লুকান 'ব্যথা' ধরা পড়েছে।" "মন্মথ এ কি বলে?" ষোড়শী প্রথমে সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে-ছিল, আর নারী-সুলভ লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময় মন্মথ ষোড়শীর সেই খাতা দেখাইলেন।—"ও আবার তুমি কোথা হতে টেনে বের কল্লে" বলিয়া মহা অপ্রতিভ হইয়া ষোড়শী মন্মথের হাত হইতে খাতাখানি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, তখন মন্মথ বলিলেন—"আমি ত সব দেখিছি, তা এতে আর লজ্জা কি? আমি গুরু, আমাকে কি বিদ্যা লুকাইতে আছে? সত্যই তোমার কবিতাগুলি বড় মিঠে"—আমরা জানি ষোড়শীর এ কবিতা গুলি কোন পুরুষের হাতে পড়ে ষোড়শীর এ ইচ্ছা "কোন পুরুষে" ছিল না।

মন্মথ ষোড়শীর খাতা হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

*   *   *   *

"কোথাকার লোক লাজ
কুলেতে কি আছে কাজ
কি ডর কলঙ্কে আর, ভয় বল কায়—
সঁপেছি যৌবন মন ওই রাঙ্গা পায়!"

ইত্যাদি—

ছি, ছি, ছি, মন্মথ কি মনে করিয়াছে? ষোড়শী বড় লজ্জিতা হইল, মুখ তুলিয়া আর মন্মথের পানে চাহিতে পারিল না। তাহার সেই গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত গণ্ডদ্বয় লজ্জায় আরও রক্তাভ হইয়া উঠিল, বিশাল

নয়ন পল্লব দুটী লজ্জাবতী লতার মত নিমীলিতপ্রায় হইল। মন্মথ তখন সেই লজ্জারুণ ব্রীড়ানত অনিন্দ্য-সুন্দর সুধাংশু-বদনের মাধুর্য্য সুধা "নয়ন-অঞ্জলি ভরি" পান করিতে লাগিলেন, সে সৌন্দর্য্য-মদিরা-পানে মুহূর্ত্তের জন্য মন্মথের মানসিক মত্ততা জন্মিল; সেই প্রমত্ত অবস্থায়—কম্পিত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল 'ষোড়শি'—"ষোড়শি"!—আজ মন্মথের একি সম্বোধন! ষোড়শীর বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাত্রি জোৎস্না-ময়ী; মলয় সমীর ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের ফুল্ল কুসুমের সুবাস উন্মুক্ত কক্ষে বহিয়া আনিতেছিল; দুরে পাপিয়ার গান পরদায় পরদায় সপ্তমে উঠিতেছিল—"সব গেল, সব গেল!"—মন্মথ তখন উদ্দাম হৃদয়ে আবার ডাকিলেন, 'ষোড়শি!' কি মিষ্ট সম্বোধন! এমন মধুর কণ্ঠে এমন আহ্বান, ষোড়শী জীবনে বুঝি কখনও শুনে নাই! কিন্তু মুহূর্ত্তে ষোড়শীর ভাবান্তর হইল। সে সদাহাস্যময়ী প্রফুল্ল মূর্ত্তি সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাপুলকিত আকাশ যেন নিমেষে মেঘে ঢাকিল! "আজ পড়া শুনা থাক্ শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না" বলিয়া ষোড়শী মন্মথের দিকে না চাহিয়াই, দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল এবং শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া ত্বরিতহস্তে অর্গলবদ্ধ করিল। তাহার পর হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—হে মা দুর্গা আজ আমার এ কি হইল—আমি গৃহের গৃহিণী, কুলের কুলবধু, স্বামীর আদরের আদরিণী, আমার আজ একি হইল মা! পর পুরুষের সম্বোধন আমার আজ কেন এত মধুর লাগিল—কেন সে সম্বোধনে—হইলই বা সে মুহূর্ত্তের জন্য—মনে অন্য ভাবের উদয় হইল? কেন মা আমার হৃদয়ে কলঙ্ক স্পর্শ করিল;—ওমা পতিতপাবনি বল মা আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বল মা! ছি, ছি, ছি, কেন আমি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইলাম? নরকেও যে আমার স্থান হইবে না"—রুদ্ধ গৃহে, ক্ষুব্ধ মনে, ষোড়শী এইরূপে অকপটে কাঁদিতেছে—তাহার হৃদয়ে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে! এদিকে মন্মথও মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। মুহূর্ত্তের এই অসংযমের জন্য, মুহূর্ত্তের সেই ভাব সেই সম্বোধনের জন্য, দারুণ অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল! নিজের দৌর্ব্বল্য সে ত আগে এতটা বুঝিতে পারে নাই—প্রীতির অমৃত মন্থনে যে এমন হলাহল উঠিবে, তাহা সে ত স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই!—এ হলাহল নীলকণ্ঠের কণ্ঠেই শোভা পায়, মন্মথের তাহাতে মৃত্যু নিশ্চয়! অতএব, আর না; মন্মথ এ সমরাঙ্গন হইতে পলায়নই শ্রেয় মনে করিল।

* * * *

সেই রাত্রেই ষোড়শী কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া দুইখানি পত্র লিখিল—স্বামীকে যেখানি লিখিল সেখানি এইরূপ, (আজ আর তাহাতে শ্রীচরণে প্রণামের বাহুল্য বা আপনি ইত্যাদির বাড়াবাড়ি ছিল না।)

প্রিয়তম,

আমাকে আর একা ফেলিয়া রাখিও না, একবার এস, আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।—

দ্বিতীয় পত্র মন্মথকে ; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকগুলি পত্র ছিঁড়িয়া শেষ পত্র এইরূপ দাঁড়াইল—

"কল্যানীয়,

অসুস্থতা বশত আমার কিছু দিন লেখা পড়ার চর্চ্চা বন্ধ রাখিতে হইতেছে। আপনি আমার শিক্ষার ভার লইয়া অবধি অকাতরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন— এ কয়দিন আপনাকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে পারিতেছি এজন্য আমি আহ্লাদিত।"

(ক্রমশঃ)

ভুলভাঙ্গা।

কাঁদিয়া ফিরিতেছিনু এ পূর্ণ ভুবনে
চারিদিক শূন্যময় ভেবেছিনু মনে,
সে ভুল ভেঙ্গেছে প্রভু, বুঝেছি এবার,
তুমি পূর্ণ করে আছ অন্তর সবার।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নালতা দেবী।

দশপদী কবিতা।

একে একে ঢেউয়ের মত চলে' যাচ্ছে দিবসগুলি এসে ;
মাসের পরে আসে মাস, আর বর্ষের পরে আসে বর্ষ ধীরে ;
কভু রৌদ্র, কভু বৃষ্টি, কভু আছে কুজ্ঝটিকায় ঘিরে—
দীর্ঘ যাত্রা ক্রমে ক্রমে সাঙ্গ ত ঐ হ'য়ে আসছে শেষে।
তবু জানিনাক আমি কিছুমাত্র কোথায় যাচ্ছি ভেসে ;
জানিনাক আছে সেথায় অরণ্য কি গিরি কিম্বা নদী ;
কিম্বা সবই মরু, কিম্বা ধূ ধূ করে অনন্ত জলধি—;
জানিনাক আছে কি না মানুষ কিম্বা যক্ষ সেই দেশে।—
এমনি অন্ধ মানব ! এমনি গাঢ় ধূমে আচ্ছন্ন এ শিখা !
একি ভ্রান্তি ? একি স্বপ্ন ? একি সত্য ? একি প্রহেলিকা ?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বিস্মৃত জনপদ।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম বুরুজ।

সন্ধ্যা। আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল। সেই নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণ-চন্দ্র হাসিতেছে। সুলতানের সুরম্য প্রাসাদের প্রতি কক্ষ গন্ধতৈলদীপালোকোদ্ভাসিত। উদ্যানের লতামণ্ডপে কুসুমভারাবনত বৃক্ষে ফলে পত্রে সকল স্থানে শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়া ধরায় পরি-রাজ্য রচনা করিতেছে। সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বলা-কুসুমগন্ধময়ী সন্ধ্যায় সুলতানের সুসজ্জিত বিরাম-কক্ষ হইতে স্তরে স্তরে বীণার সুর বাজিয়া উঠিল। সুন্দরী কামিনীর কম কণ্ঠে আমির খুস্রুর অমৃতময়ী গীতি ধ্বনিত হইতে লাগিল—নূপুর শিঞ্জনে প্রাসাদ মুখরিত হইল—উন্মাদিনী সুরা সুলতানকে প্রমত্ত করিবার জন্য কণকাধারে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সুলতান ডাকিলেন—"মালেক সৈফ-উদ্-দীন ঘোরী!"

সৈফ-উদ্‌দীন যুক্ত করে দণ্ডায়মান হইলে সুলতান কহিলেন—"আমার তিন শত নর্ত্তক নর্ত্তকীদের আমি যে বখ্‌শিষ ফরমায়েস করিয়াছি তাহার জন্য বিজয়নগরের রাজকোষে পরওয়ানা পাঠাও—সে টাকা সেইখান হইতে আদায় হইবে।"

'যো হুকুম' বলিয়া সৈফ-উদ্-দীন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন সুরার উন্মত্ততায় সুলতান এরূপ আদেশ দিয়াছেন, নহিলে যে সাম্রাজ্যের উপর তাঁহার এতটুকুও অধিকার নাই তাহার রাজকোষে অর্থের জন্য আদেশ প্রেরণ বাতুলের কার্য্য। সৈফ-উদ্-দীন সুলতানের আদেশ অমান্য না করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিজয়নগরের রাজার উপর আদেশ পত্র লিখিলেন বটে, কিন্তু উহা তখন প্রেরিত হইল না।

পরদিন প্রভাতে সুলতান যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাঁহার বিজ্ঞ বৃদ্ধ অতিসাবধান মন্ত্রী বিজয়নগরে আদেশ পত্র প্রেরণ করেন নাই, তখন তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"মন্ত্রী! সুলতান কখনো নিরর্থক কথা কহেন না। সুরার মত্ততায় আমি

ওরূপ আদেশ দিই নাই,ইহার ভিতর গুরুতর অভিসন্ধি আছে। তুমি অবিলম্বে আদেশ-পত্র বিজয়নগরে প্রেরণ কর।*"

মন্ত্রী আর কালবিলম্ব করিলেন না—সুলতানের মোহর ছেপ্ত করিয়া সেই আদেশ-পত্র বিজয় নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

* * * * *

বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদে প্রথম বুক্ক বা দেবরায় পাত্র মিত্র লইয়া অধিষ্ঠিত এমন সময় সুলতানের দূত তথায় উপস্থিত হইল। সুলতানের অবিমৃষ্যকারিতা দেখিয়া রাজ-সভায় কোলাহল উপস্থিত হইল। দেবরায় বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই সুলতান এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।—তখন ঝন্ ঝন্ শব্দে কোষ মধ্যে অসি বাজিয়া উঠিল। দেবরায় দৃঢ় গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন—'সৈন্য প্রস্তুত কর, আমি অদ্যই যুদ্ধ যাত্রা করিব। যদি ভাম্‌নি বংশের উদ্ধত সুলতানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে না পারি তাহা হইলে অস্ত্র ত্যাগ করিব।"—চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তিন সহস্র অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী এবং এক লক্ষ পদাতিক রণসাজে সজ্জিত হইল। হিন্দু রাজ শক্তির গৌরব রক্ষার্থ দেবরায় আদোনির শিলাদুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই বিজয়োল্লাস রণবাদ্য ও কোলাহলের মধ্যে সকলে সুলতানের দূতকে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর পরিক্রমণ পূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া দিল!

বিজয়নগরের উন্মত্ত সৈন্য তখন কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে স্থিত রাইচুড় দোয়াবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর মুদ্‌কল অবরোধ করিল, কতক বা আদোনি-দুর্গ সন্নিকটস্থ মুসলমান রাজ্য ধ্বংশ করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। সেকালে মুদ্‌কল লইয়া হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে দুই শত বর্ষের বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। দুর্দ্দমনীয় হিন্দু সৈন্যের বজ্র তুল্য বেগ প্রহত করিতে না পারিয়া মুসলমানগণ মুদ্‌কল রক্ষা করিতে অসমর্থ হইল। শোণিত স্রোত নদীস্রোতের সহিত মিশিয়া গেল। সেই পরাজয় বার্ত্তা বহন করিয়া যখন দূত কুলবর্গে উপনীত হইলেন—যখন তিনি সুলতানকে কহিলেন "জাঁহাপানা, সব গিয়াছে, আমি শুধু একা পরাজয় বার্ত্তাবহ হইয়া কোন প্রকারে এখানে আসিয়াছি," তখন ক্রোধান্ধ সুলতান কহিলেন—'কে আছ, দুরাত্মাকে এখনই বধ কর—যাহার সম্মুখে এতগুলি বীর পুরুষের জীবন গিয়াছে আমি তাহার মুখাবলোকন করিব না!'

সুলতান মহম্মদ শাহ মনে করিয়াছিলেন মুসলমানের নাম শ্রবণ মাত্রেই হিন্দু নৃপতি ভীত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিবেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন হিন্দু মরণে ভীত নহে, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু সৈন্য মরিতে জানে, মারিতে জানে। তিনি হিন্দুমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য বহু সৈন্য লইয়া ধাবিত হইলেন।† তুঙ্গভদ্রা তীরে হিন্দু ও মুসলমানে যে তুমুল যুদ্ধ হইল তাহাতে উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য নিহত হইল। এই

* Firista (Scott) 1, 23

† ফেরিস্তা বলেন যে মুসলমানদিগকে নদী উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, সহস্র সহস্র সৈন্য সঙ্গে থাকিতেও

যুদ্ধ ১৩৬৬ খৃঃ অব্দের ২৩ জুলাই তারিখে হইয়াছিল। রণোন্মত্ত সুলতান সৈন্য গ্রামে ও নগরে প্রবেশ করিয়া বালক যুবক বৃদ্ধ কাহাকেও কৃপা করে নাই—এমন কি গর্ভবতী রমণী পর্য্যন্ত মুসলমান সেনার কৃপাণাঘাতে ইহলোক সংবরণ করিয়াছিল—স্তন্যপায়ী শিশুর রক্তেও ধরণীপৃষ্ঠ কলঙ্কিত হইয়াছিল!*

সুলতান বিজয়নগর অবরোধ করিলেন বটে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। হিন্দু-সৈন্য পদে পদে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে কিছুদিনের জন্য শান্তি আসিল। ফেরিস্তা গৌরব করিয়া বলেন এই যুদ্ধাভিযানে ৫০০০০০ কাফের নিহত হইয়াছিল! ফেরিস্তার অতিরঞ্জিত এই স্বার্থপর বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে উভয় পক্ষেরই অনেক বল ক্ষয় হইয়াছিল।

বিজয়নগর ও ভামনি সাম্রাজ্যের সন্ধির পর সুলতান ৭।৮ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৩৭৫ খৃঃ অব্দ ২৯ এপ্রিল) ঊনবিংশবর্ষবয়স্ক মুজাহিদ্ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রথমে বিজয়নগরের সহিত কলহ এবং পরে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুজাহিদ্ হিন্দু সংঘর্ষে বিশেষ ফললাভ করিতে না পারিয়া শেষে হিন্দুর দেব মন্দিরাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হিন্দু এবং মুসলমানের সংঘর্ষ বর্ণনা কালে ফেরিস্তা সর্ব্বদাই হিন্দু বীরদিগকে ভীরু এবং কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার আত্মসিদ্ধান্তকে প্রবল করিবার জন্য তিনি এরূপ অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন যে সে সমুদয় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মুজাহিদ্ এবং দেবরায়ের যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি কহিয়াছেন—যুদ্ধাভিযান কালে মুজাহিদ্ একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া একটী তীরদ্বারাই একটী নরখাদক ব্যাঘ্র বধ করেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিবামাত্রই পুত্তলিকা-পূজকগণ অতিমাত্র ভীত হইয়াছিল।'

যে মুষ্টিমেয় হিন্দুবীরগণ সে কালে অগণিত মুসলমান সৈন্যের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল, এক তীরে একটী ব্যাঘ্র বধ করিতে দেখিয়া তাহারা মুজাহিদের ভয়ে যে আদৌ

বিজয়নগরপতি প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। ফেরিস্তার কাহিনী যতদূর বিশ্বাসযোগ্য সে সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—

"We must *never forget* that the narative of Firishtah is *necessarily tinged with bias in favour of the Musalmans* and that it was not compiled till the *end of the sixteenth or beginning of the seventeenth* century A. D.'—Sewell.

কথিত যুদ্ধ ১৩৬৬ খৃঃ অব্দের ১৪ জানুয়ারী হইতে ১৩ ফেব্রুয়ারী মধ্যে কোন এক সময়ে ঘটিয়াছিল।

* They were executed *with such strictness that pregnant women, and even children at the breast did not escape the sword.*—Firista (Scott) I, 27.

ভীত হইবে এরূপ কাহিনী কে বিশ্বাস করিবে?

যাহা হউক, সুলতান মুজাহিদ্ অল্পকাল মধ্যেই জীবলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য দায়ূদ পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য একদিন নিশাযোগে মুজাহিদ্‌কে হত্যা করিয়া ভামনি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। ভ্রাতৃপুত্রহন্তা দায়ূদ এক মাস মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের শাণিত ছুরিকায় বিদ্ধ হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।* এদিকে ভামনি রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে দেবরায় দোয়াবখণ্ড অধিকার করিয়া লইলেন এবং রাইচূড় দুর্গ অবরোধ করিলেন।

দায়ুদের মৃত্যুর পর মুজাহিদের সহোদরা দায়ূদের অষ্টম বর্ষীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া লইয়া সিংহাসনের কণ্টক দূর করিয়া দিলে (!) আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ (প্রথম) ভামনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভামনি সাম্রাজ্যের আপামর সাধারণ মহম্মদকে সিংহাসনে বরণ করিয়া লইল। এমন কি দেবরায় পর্য্যন্ত মহম্মদকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাইচূড় দুর্গ হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে রাজকর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

প্রথম বুক বা দেবরায়ের জীবনযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি যখন স্বর্গে গমন করিলেন তখন গোয়ার বন্দর বেলগ্রামের দুর্গ মালাবার উপকূলে তুলু প্রদেশ বিজয়নগরের অধীন ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য তখন জনপূর্ণ ছিল। প্রজাগণ রাজার আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্ম করিত। মালাবার এবং সিংহলের নৃপতিগণ বিজয়নগর রাজসভায় আপন আপন অমাত্য রাখিতেন এবং প্রতি বর্ষে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন।†

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* May 21, A. D. 1378.

† The seaport ofGoa, the fortress of Mangalore............belonged to the roy of Beejanuggur, and many districts of Tulghut were in his possession. His country was well peopled, and his subjects submissive to his authority. The roies of Malabur, Ceylon, and other islands and other countries kept ambassadors at his court, and sent annually rich presents.—Firishta.

দীন তপস্বিনী

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বঙ্গদর্শনে "রাজ-তপস্বিনী" নাম দিয়া পুটিয়ার মহারাণী প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরীর জীবন-কাহিনী লিখিতেছিলেন। লেখক অকালে পরলোকে গমন করায় এই জীবনী শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। মহারাণী শরৎসুন্দরীর ন্যায় দয়াবতী, দানশীলা, এবং দেবস্বভাবা নারী জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্র চরিত্র এবং দান প্রবৃত্তির সহিত অতুল সম্পদের সংযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সুতরাং শরৎসুন্দরীর ন্যায় আদর্শ জীবন পৃথিবীর সকল দেশেই দুর্লভ। ভারতের সৌভাগ্য এই যে এ দেশে রাজতপস্বিনী অধিক না থাকিলেও এখানে সময়ে সময়ে আমরা "দীন তপস্বিনী" দেখিতে পাই। বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র হিন্দুর গৃহে এখনও এমন অনেক দেবী আছেন তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র এবং পুণ্যময় কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়; মনে হয় যেন ইঁহারা লোক শিক্ষার্থ এবং জীবের মঙ্গলার্থই আর্য্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা বঙ্গদর্শনের পাঠকদিগকে এইরূপ একটী দীন-তপস্বিনীর কাহিনী উপহার দিতেছি।

বঙ্গ সাহিত্যে জীবিত সামান্য ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। পাশ্চাত্য সাময়িক সাহিত্যের অনুকরণে সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে দেশের সুপরিচিত লোকদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু অপরিচিত লোকের ভাগ্যে এরূপ সম্মানপ্রাপ্তি ঘটে না। এই প্রবন্ধে আমরা যাঁহার জীবন সম্বন্ধে দু' চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, তিনি এখনও জীবিত আছেন; আর তিনি যে দরিদ্র ইহা "দীন তপস্বিনী" নামেই সূচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে দরিদ্রের আদর দরিদ্রের সম্মান চিরকালই অধিক। ধনবান ব্যক্তি পরার্থে প্রচুর অর্থ উৎসর্গ করিয়াও যে ফল না প্রাপ্ত হন, অবস্থাবিশেষে দরিদ্র অতি অল্পমাত্র দান করিয়াও সেই ফল লাভ করেন, ধর্ম্মজগতে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। মহাভারতের নকুল কহিয়াছিল "ভক্তিমান উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবিত শক্তুভোজী অতিথির উচ্ছিষ্ট পাত্রে গাত্রমর্দ্দন করিয়া আমার অর্দ্ধশরীর সুবর্ণময় হইয়াছে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে আহূত শত শত ব্যক্তির ভোজন পাত্র স্পর্শ করিয়া আমার অঙ্গের একটি মাত্র লোম সুবর্ণে পরিণত হইল। অতএব সেই ব্রাহ্মণের শক্তুদান এ যজ্ঞ অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ।"* শতাধিক

* এই উপাখ্যানটী মহাভারত পাঠকের অবিদিত নহে এবং সম্প্রতি এডুকেশন গেজেট্ ও বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিলাম না।--লেঃ

বর্ষ পূর্ব্বে দেশপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সমাধান করিয়াছিলেন, বোধ হয় তখনকার দিনের ত্যাগশীল বঙ্গেও তাহা অতুলনীয়। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধের কিছুকাল পরে এক পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাগোবিন্দকে দেখিবার জন্য কাঁদি অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত এক জন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি পথিকের কাঁদি যাইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ব্রাহ্মণ বলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে এরূপ লোক দর্শনেও পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঐ ভদ্রলোকটী কহিলেন "তাহা হইলে আপনার কাঁদি যাইবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমাদের গ্রামের যদু ময়রাকে দেখিয়া যান, তাহাতেই পুণ্য হইবে।" দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রচুর অর্থ; তিনি তাহার অংশ মাত্র ব্যয় করিয়াছেন; এখনও তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি রহিয়াছে। আর যদু তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছে। এমন কি সে তাহার ভদ্রাসনটী বিক্রয় করিয়া এখন এক আত্মীয়ের আলয়ে আশ্রয় লইয়াছে।"

ধনী ও দীনের পুণ্যের এই পরিমাণ ঠিক হইলে আমাদের দীন তপস্বিনীর জীবনী পত্রস্থ করিতে বিশেষ সঙ্কোচের কারণ নাই।

বর্দ্ধমান জেলায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে কোন এক পল্লীগ্রামে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী বাস করেন। ইনি অপত্যহীনা বিধবা। ইঁহার স্বামী একজন অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। আঠার বৎসরের অধিক হইল তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভাগীরথীর অনতিদূরে একটী পুরাতন পাকা বাটী, এক বিঘা নিষ্কর ভূমি, আর কতকগুলি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ইহাই ব্রাহ্মণীর পতিত্যক্ত সম্পত্তি।—ইহাই লইয়া ইনি পতিবিয়োগের পর হইতে স্বামিগৃহে একাকিনী বাস করিতেছেন। শ্বশুরকুলে ইঁহার সম্পর্কিত পুরুষ কিম্বা রমণী কেহই নাই। তবে বাড়ীর অতি নিকটে ইঁহার পিত্রালয়; সেখানে ইঁহার ভ্রাতা ভ্রাতষ্পুত্র প্রভৃতি আছেন।

এই দরিদ্রা এবং অশিক্ষিতা বিধবা ব্রাহ্মণী সংসারে থাকিয়াও যেরূপ ভাবে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন তাহাতে ইঁহাকে তপস্বিনী নামে অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার বাসগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী কুড়ি পঁচিশখানি গ্রামের অধিবাসী আপামর সাধারণ লোক ইহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম করিয়া থাকে। এই সকল গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট ইনি "মা ঠাকুরাণী" নামে পরিচিতা। লোকে যেমন কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবতাকে মা নামে সম্বোধন করে, তেমনি (এই ব্রাহ্মণীর পরিচিত সম্পর্কিত লোক ব্যতীত) সমস্ত নর নারীই ইঁহাকে "মা ঠাকুরাণী" বলিয়া ডাকেন। পিতাপুত্র, মাতাপুত্রী, শ্বশ্রূ বধূ প্রভৃতি সকলের নিকটই ইঁহার একই নাম;

"মা ঠাকুরাণী।" এমন কি ইঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরাও ইঁহাকে মাঠাকুরাণী বলিয়া ডাকেন এবং প্রণাম করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ইঁহার বাসগ্রামের কিঞ্চিত দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর বাটীতে ইঁহার কথা উত্থাপন করিবামাত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "মা ঠাকুরাণী" এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিতে করিতে ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া এই সাধ্বী রমণীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, এবং কহিলেন "উনি ত প্রাতঃস্মরণীয়া; এখনকার দিনে উঁহার ন্যায় স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায় না।" ফলতঃ মাঠাকুরাণীর নাম করিলে তাঁহার পরিচিত বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেই এইরূপ ভক্তি-বিহ্বল হইয়া পড়েন। দরিদ্র বিধবা কিসে এমন ভক্তির পাত্রী হইয়াছেন আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

এক কথায় বলিতে গেলে, মাতাঠাকুরাণীর নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং পরদুঃখকাতরতাই তাঁহার এই অনন্যসুলভ সম্মানপ্রাপ্তির কারণ। হিন্দু বিধবার পক্ষে যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবার কথা, পতি বিয়োগের পর হইতে ইনি ঠিক সেই ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, ইহার উল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন, কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই দেবস্বভাবা রমণী সংসারে থাকিয়াও ব্রহ্মচারিণী। শাস্ত্রে হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া যে সমস্ত ব্রতাদির ব্যবস্থা আছে ইনি তৎসমুদয়ই সম্পন্ন করিয়াছেন। দুষ্কর সর্ব্বশ্রেষ্ঠব্রতাদিও এই দরিদ্র বিধবা কর্ত্তৃক যথারীতি অনুষ্ঠিত ও উদ্যাপিত হইয়াছে। ইঁহার বাড়ীতে দেবসেবার এবং পূজা পার্ব্বনের যেরূপ ব্যবস্থা আছে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে সেরূপ নাই। মা ঠাকুরাণীর স্বামীর সময় হইতে তাঁহার বাড়ীতে শিবমূর্ত্তি এবং শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন। মা ঠাকুরাণী নিজে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই পূজা এবং নিত্য সেবা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মা ঠাকুরাণীর বাড়ীতে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাস, দোল, রথ, ঝুলন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমস্ত পূজা পার্ব্বনই রীতিমত সম্পন্ন হয়। দুর্গোৎসবের সময়ে ইনি ইঁহার বাসগ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের প্রায় দুই তিন শত লোককে নিমন্ত্রণ করেন এবং পূজার তিন দিনে ইঁহার বাড়ীতে পাঁচ ছয় শত লোক আহার পায়। গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা বলেন ইহার স্বামী জীবিত থাকিতে যে ভাবে ক্রিয়া কাণ্ডগুলি সম্পন্ন হইত, মাঠাকুরাণীর সময়েও তাহা ঠিক সেই ভাবে নিষ্পন্ন হয়। কেবল ইহাই নহে, মাঠাকুরাণী বাড়ীতে থাকিলে, বৎসরের যে কোন দিনে যে কোন সময়েই হউক, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি তাঁহার দ্বারে আসিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এমন শুনা যায় নাই।

মাঠাকুরাণীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তাঁহার বাড়ীর বাহিরের ঠাকুর-ঘর গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত, পূজা পার্ব্বণের দিনে কোন অপরিচিত

পথিক ভারবাহী লোকও যদি ক্ষণেকের নিমিত্ত ঠাকুর দেখিবার নিমিত্ত সেইপথে দাঁড়ায়, মাঠাকুরাণী অমনই তাহার সম্মুখীন হইয়া বলেন "বাবা, দুটী প্রসাদ পেয়ে যাও।" বলা বাহুল্য দীন তপস্বিনীর এই অনুরোধ কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না, এবং এইরূপ বহু অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

মাঠাকুরাণী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যা; কিন্তু তাঁহার বাটীতে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন মাঠাকুরাণী সকলেরই উপাস্য দেবতার ন্যায় ভক্তির পাত্রী।

মাঠাকুরাণীর প্রতিবেশী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি মাঠাকুরাণীর বাড়ীতে ভোজনের ব্যবস্থা অতি পরিপাটি, এবং তাঁহার প্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য অমৃতোপম। একজন ব্রাহ্মণ কহিলেন—মহাশয়, একশত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে আমরা কিছুতেই বেলা একটার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ভোজনে বসাইতে পারি না কিন্তু মাঠাকুরাণী ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সকলকে আহারে বসাইয়া দেন। গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীই রন্ধনে ও পরিবেশনে মা ঠাকুরাণীর সাহায্য করেন বটে, কিন্তু আমরা ঐরূপ সাহায্য লইয়াও তাঁহার ন্যায় শীঘ্র এবং সুচারুরূপে আমাদের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারি না।

মাঠাকুরাণীর বাটীর ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিকটস্থ অনেক ধনী এবং অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে; মাঠাকুরাণী কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই বাদ দেন না, আর তিনি নিমন্ত্রণ করিলে কাহারও না আসিয়া নিস্তার নাই। এ সম্বন্ধে মা ঠাকুরাণীর অভিমান অত্যন্ত অধিক। তাঁহার স্বামী নিঃস্ব ব্রাহ্মণ হইলেও পাণ্ডিত্যের জন্য সমাজে অসীম প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মাঠাকুরাণী তাঁহার আদর্শ এবং পবিত্র চরিত্রের বলে নিজেও এই প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ রূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ধনী কিম্বা মধ্যবিৎ যিনিই হউন, নিমন্ত্রণ পাইয়া মা ঠাকুরাণীর বাড়ীতে না আসিলে অনুপস্থিতির পর প্রথম দর্শনেই মাঠাকুরাণী তাঁহাকে কহিবেন "গরীব বলিয়া আমার বাড়ীতে আসা হইল না?" মাঠাকুরাণীর মুখের এই অনুযোগ অসহ্য বলিয়া, অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত কেহই তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত হন না।

পাঠকের মনে স্বতঃই হয় ত এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে যে, যাঁহার একবিঘা মাত্র জমি সম্বল, তিনি এত লোক খাওয়াইবার নিমিত্ত অর্থ কোথা হইতে পান? এ প্রশ্নের উত্তর পরে দিতেছি। এতক্ষণ আমরা মা ঠাকুরাণীর দেবসেবা, অতিথিসেবা এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা বলিয়াছি। এইবার তাঁহার পরার্থপরতা সম্বন্ধে দু চারিটি কথা বলিব।

হিন্দুগৃহের অনেক অপত্যহীনা সাধ্বী বিধবার হৃদয় সংসারের সকলের জন্যই যেন মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ; মাঠাকুরাণী এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে আদর্শ স্থানীয়া।

তিনি বস্তুতই সকলকে সন্তানের ন্যায় দেখিয়া থাকেন, এবং যে কোন প্রকারে হউক কাহারও কোনরূপ উপকার করিতে পারিলে কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখী নহেন। গর্ভধারিণী জননী যেমন পুত্র কন্যার সহিত সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচে কথা বার্ত্তা কহেন, তেমনই মাঠাকুরাণীরও কাহারও সমক্ষে কথা কহিতে কোনরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। লোকের বিপদে আশ্বাস এবং শোকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত এই দেবী-মূর্ত্তি স্বগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী আট দশখানি গ্রামের অনেক বাড়ীতেই যাইয়া থাকেন। কোন বাড়ীতে কাহারও কোন পীড়া হইয়াছে সংবাদ পাইলেই ইনি পীড়িত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে যাইয়া সাধ্যমত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেন। পল্লীবাসী অশিক্ষিত অনেক লোকের বিশ্বাস যে মাঠাকুরাণীর পদধূলি এবং আশীর্ব্বাদ রোগমুক্তির এক মহৌষধ।

মাঠাকুরাণীর যে অবস্থা, তাহাতে অর্থ দিয়া অন্যের সাহায্য করা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই কি ভাবে পরের উপকার করিতে প্রস্তুত, আমরা তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত দুইটী বিদেশী ভদ্রলোকের মুখের কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

মাঠাকুরাণীর বাসগ্রামে একটী পুলিস-থানা আছে। অল্পদিন পূর্ব্বে এই থানায় দুইজন কায়স্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের একজনের বাড়ী মালদহে, অন্যের নিবাস ঢাকা জেলায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্প্রতি স্থানান্তরিত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী গিয়াছেন। স্থানান্তরে থাকিয়া একদিন আমাদিগকে কহিয়াছিলেন,—'মহাশয়, মাঠাকুরাণী প্রকৃতই দেবী। আমি যখন এখানে আসিবার আদেশ পাই, তখন আমার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া আসা বিপজ্জনক অথচ বাসায় তেমন আত্মীয় পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক কেহই নাই, সেখানেই বা কিপ্রকারে রাখিয়া আসি, এই ভাবিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। মা ঠাকুরাণী ইহা জানিতে পারিয়াই আমাকে আসিয়া কহিলেন 'বাবা, তুমি বউ-মাকে এখানে রাখিয়া যাও, কোন চিন্তা নাই, আমি দেখিব। আমি ত তোমার এক মা!'. আমি অন্যের নিকট মাঠাকুরাণীর অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, এবং নিজেও তাঁহার দেবী-চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমার স্ত্রীকে বাসায় ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার বাসা মাঠাকুরাণীর বাড়ী হইতে অধিক দূর নহে। মাঠাকুরাণী প্রত্যহ আসিয়া সংবাদ লইয়াছেন, আর প্রসবের সময় স্বয়ং সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রসূতির সেবা করিয়াছেন। আমার স্ত্রী মৃতবৎসা, এপর্য্যন্ত তাঁহার একটী সন্তানও বাঁচে নাই; এবার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া এখনও জীবিত আছে ইহা বোধ হয় মাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদের ফল।" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই বক্তার চক্ষে জল আসিল।

দ্বিতীয় কর্ম্মচারীটি কহিলেন,—"মহাশয়, মাঠাকুরাণীর ঋণ এ জীবনে কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। আমার স্ত্রীকে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন! আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে তিনি ঠিক

আপন সন্তানের ন্যায় ভাল বাসেন। আমার স্ত্রী দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় শয্যাশায়িনী ছিলেন। মাঠাকুরাণী নিজে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া চিকিৎসককে দেখাইয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। চিকিৎসক মাঠাকুরাণীর পরিচিত। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে গিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন আপনার স্ত্রী যে লোকের সঙ্গে আসিয়াছেন তাহাতে অর্থের কথা মুখে আনিবেন না। এই উপলক্ষে আমি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় বসিয়া যে মাঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইয়াছি তাহাতেই ধন্য হইয়াছি।'

মাঠাকুরাণীর জীবনের এমন শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কহিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আশা করি যাহা লিখিত হইল, ইহাতেই পাঠক তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাইবেন। বস্তুতঃ মাঠাকুরাণী উপযাচিকা হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া পরের প্রতি পুত্রবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া সকলের নিকট এই আকাঙ্ক্ষনীয় চির-মধুর "মাঠাকুরাণী" নাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া মা-ঠাকুরাণী যখন পুষ্প চয়নার্থ বাটীর বাহির হন, তখনই তিনি তাঁহার প্রতিবেশিগণের সংবাদ লইয়া থাকেন। এই সময়ে মাঠাকুরাণীকে সত্য সত্যই তপস্বিনীর ন্যায় দেখায়। তিনি যে বাড়ীর নিকট দিয়া যান, সেই বাড়ীর সকল নরনারীই ভক্তি-বিনম্রচিত্তে তাঁহার চরণ-তলে প্রণত হয়। মাঠাকুরাণী সকলকেই আশীর্ব্বাদ করেন। এ দৃশ্য বড়ই হৃদয়স্পর্শী। আমরা একদিন জাহ্নবী-তীরে ইহা দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলাম, পুলকে শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। তখন মনে মনে কেবল ইহাই ভাবিয়াছিলাম, মানুষ যতই কেন না পদ বিদ্যা অর্থ প্রভৃতির গৌরব করুক, জগতে চরিত্রের মহিমা এবং সাধুতার সম্মান কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে।

মাঠাকুরাণীর অর্থ কোথা হইতে আসে, আমরা এ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিই নাই। তাঁহার গ্রামবাসী এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলেন "কিরূপে তাঁহার অর্থাগম হয় আমরা কেহই বলিতে পারি না; দেখিলে মনে হয় যেন ভগবান উঁহার অর্থ যোগান।" বস্তুতঃ মাঠাকুরাণীর কার্য্যকলাপ দেখিলে এইরূপই মনে হয় এবং সেই ব্রাহ্মণ ও নারদের পুরাতন গল্পটী মনে পড়ে। গল্পটী পুরাতন হইলেও আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু অর্থের অভাব হেতু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারেন নাই এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে কালযাপন করেন। সৌভাগ্যক্রমে একদিন তিনি মহামুনি নারদের দর্শন পান, এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া অতিশয় অনুনয় বিনয় করিয়া কহেন, 'ঠাকুর, আপনি ত সর্ব্বদাই বৈকুণ্ঠে যান, দয়া করিয়া ভগবানকে অনুরোধ করিবেন যে আমার ভাগ্যে যদি কিছু অর্থপ্রাপ্তি থাকে তাহা যেন আমি একবারেই পাই,

তাহা হইলে আমি জন কয়েক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারিব।" নারদ তাঁহার সৎকার্য্যে আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কহিলেন —'আচ্ছা আমি ভগবানকে তোমার প্রার্থনা জানাইব।' মহর্ষি সেই দিনই ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে নারায়ণ কহিলেন—নারদ, এই ব্রাহ্মণের ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি অধিক নাই। কেবল মাত্র ষোলটী টাকা আছে, তাহা একবারে দিলে ইহার পর উহাকে দিব কি? নারদ কহিলেন—প্রভু, আমি একরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি অতএব ব্রাহ্মণকে ষোলটী টাকা একেবারে দিতে আজ্ঞা হয়। ভগবান তাহাই আদেশ দিলেন,—নারদের উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণ এক ধনবান লোকের বাড়ীতে ভিক্ষার্থী হইয়া ঐ পরিমাণ অর্থ পাইলেন। দ্বিজবর মহা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিলেন, এবং ঐ ষোলটী টাকার সহিত নিজের ঘটী বাটী যাহা কিছু ছিল তৎসমুদয়ের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ যোগ করিয়া যতগুলি সম্ভব ব্রাহ্মণকে আন্তরিক ভক্তির সহিত ভোজন করাইলেন। এই ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিন অপরাহ্লেই নারায়ণ নারদকে ডাকিয়া কহিলেন, —ব্রাহ্মণ রিক্তহস্ত হইয়াছে, তুমি উহাকে পঞ্চাশটী টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া আইস। নারদ হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, সে দিন কহিলেন যে ব্রাহ্মণের ষোল টাকার অধিক প্রাপ্য নাই, আজ আবার তাহাকে টাকা দিবার আদেশ করিতেছেন? ভগবান কহিলেন—'নারদ, ব্রাহ্মণ যে ভাবে ঐ ষোল টাকা ব্যয় করিয়াছে তাহাতেই উহার পুনরায় অর্থ প্রাপ্য হইয়াছে।' ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বার পঞ্চাশ টাকা পাইয়া নারদকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন,—এক দিনেই সমুদয় টাকা নিঃশেষ হইল। এইবার ভগবান নারদকে কহিলেন, ব্রাহ্মণকে পাঁচ শত টাকা দিয়া আইস। নারদ সহাস্য বদনে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ব্রাহ্মণ এই অর্থ পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং বাড়ীতে সদাব্রতের ব্যবস্থা করিলেন। টাকা নিঃশেষ হইতে অধিক দিন লাগিল না। ভগবান পুনরায় কহিলেন—'ব্রাহ্মণের পুনরায় অর্থ প্রাপ্তি আছে।' নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রাহ্মণের প্রাপ্য যে ক্রমশই বাড়িতে লাগিল?' ভগবান বুঝাইলেন—'নারদ, যাহারা এ ভাবে অর্থ ব্যয় করে, আমি তাহাদের নিকট সতত ঋণী। জগতে অর্থের ব্যবহার অনেক প্রকার। কেহ বা অর্থের দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার করে কেহ বা অর্থের সদ্ব্যবহারে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মণ তাহাই করিতেছে। তুমি উহাকে বল, ও সিন্দুকে চাবি লাগাইবার ব্যবস্থা করুক নিজের ভোগ বিলাসাদিতে অর্থ ব্যয় করিতে থাকুক, তাহা হইলে উহার জন্য আর আমাকে ভাবিতে হইবে না। সৎ-অর্থ ব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত হইলেই আমি তাহাকে অর্থ যোগাইতে বাধ্য।

বিংশ শতাব্দির পাঠক এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইবেন কি? আয় না থাকিলে ব্যয় হওয়া অসম্ভব। মাঠাকুরাণীর আয়ের উপায় জানিতে চাহিলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে ভগবানের অনুগ্রহে ইঁহাকে অনেকেই

অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহার স্বামীর বহু ছাত্র আছেন এবং শিষ্যও অনেক আছেন। ইঁহাদের ত কথাই নাই, মাঠাকুরাণীর পরিচিত হিন্দু নরনারী মাত্রেই তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন; অথচ কেহই সে দান প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইঁহারা ভাবেন মাঠাকুরাণীকে কিছু সাহায্য করা আর দেবতার উদ্দেশে দান করা একই কথা।

এ সম্বন্ধে মাঠাকুরাণীর নিজের মুখের দু'টী কথা আমরা পাঠককে শুনাইতেছি। কথা দুইটী তাঁহার অটল বিশ্বাস ও অসামান্য পতিভক্তির পরিচায়ক। মাঠাকুরাণী এক দিন আমাদিগকে দেবতার প্রসাদ দিতে দিতে কহিলেন—"আমি যে কর্ত্তার ক্রিয়া কাণ্ড গুলি বজায় রাখিতে পারিয়াছি সে কেবল তাঁহারই পুণ্যের বলে এবং আশীর্ব্বাদের ফলে। দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন 'আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে ভগবানকে স্মরণ করিয়া তুমি যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে।' এই আশীর্ব্বাদের ফল আমি সর্ব্বদা পাইতেছি। তোমাকে বলিব কি, আমার হাতে দুটী চারিটী টাকার অধিক কখনই থাকে না, কিন্তু আমি একশত টাকা ব্যয়ের কাজ আরম্ভ করিলেও তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যায়। ঘরে অতি অল্প মাত্র দ্রব্য সামগ্রী থাকিলেও আমি তাহাই দিয়া অনেক লোক খাওয়াইতে পারি। ইহা নিশ্চয়ই কর্ত্তার আশীর্ব্বাদের ফল।"

মাঠাকুরাণী আর যে একটি কথা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। অতি সরল ভাবে মাঠাকুরাণী আমাদিগকে কহিলেন "কর্ত্তা দ্বিতীয় পক্ষে আমাকে যখন বিবাহ করিলেন তখন হইতেই আমার মনে হইল, যে আমি ইঁহার শেষ সময়ে সেবা শুশ্রূষা করিব এই আশাতেই ইনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম যদি ইঁহার পূর্ব্বে আমার দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে ইনি শেষ জীবনে ক্লেশ পাইবেন। আমার ভাই ভগ্নী প্রভৃতি সকলকেই বলিতাম দেখ, যদি আমি কর্ত্তার আগে যাই, তোমরা উঁহার অসময়ে উঁহাকে দেখিও।—কর্ত্তা আমার পূর্ব্বে গিয়াছেন বলিয়া আমার দুঃখ নাই; কেন না আমি তাঁহার শেষ সময়ে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছি। আমি আগে চলিয়া গেলে হয়ত তিনি কষ্ট পাইতেন।" নারী-হৃদয়ে স্বামীর হিত চিন্তা কতদূর প্রবল হইলে তাহাতে এমন ভাব আসিতে পারে পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। পতির মঙ্গলার্থে সতীর এ বৈধব্য-কামনা বোধ হয় কবি-কল্পনারও অনুপযুক্ত নহে।

মাঠাকুরাণীর স্বামীর সম্বন্ধে একটী কথা বোধ হয় এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বা পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না। পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় এক দিন আমাদিগকে কহিলেন "মহাশয়, মাঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ইহাই বলিলে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়। ইঁহার

স্বামী এক জন দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোলে কুড়ি পঁচিশটী ছাত্র পড়িত। পণ্ডিত মহাশয় এতদূর সরল সদাশয় এবং সুবিবেচক লোক ছিলেন যে কখনও কোন ছাত্রকে সাধ্যপক্ষে নিজের কোন কাজ করিতে দেন নাই। ছাত্রদিগকে তিনি সত্য সত্যই পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। একটী ভৃত্য ছিল; সে কেবল তাঁহার গো-সেবা করিত। পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যহ বাজরা লইয়া বাজারে যাইতেন এবং ক্রীত দ্রব্যে পূর্ণ হইলে উহা স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া বাড়ীতে আনিতেন। কেহ উহা দেখিয়া কোন কথা কহিলে তিনি বলিতেন 'ভৃত্যকে সঙ্গে আনিলে গো-সেবার ব্যাঘাৎ হয়; আর তাহাকে একাকী পাঠাইয়া দিলেও সে আমার ইচ্ছামত দ্রব্যাদি কিনিতে পারে না।'—মাঠাকরুণও তাঁহারই সহধর্ম্মিণী, উনি যে পরোপকারার্থ শরীরপাত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?"

এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করিয়া যদি মাঠাকুরাণীর পরিচয় জানিবার জন্য পাঠকের কৌতুহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইঁহার পরিচয় প্রদানে আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। বঙ্গ দর্শনের প্রবন্ধের বিষয় এই নিরক্ষরা নারীর কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অথচ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও যদি এই দেবী মূর্ত্তি দর্শনের বাসনা হয়, তাহা হইলে তিনি ইঁহাকে দেখিতে পারেন, এই ভাবিয়া আমরা মাঠাকুরাণীর বাস-গ্রাম ইত্যাদির নাম প্রকাশ করিলাম।

নবদ্বীপের বায়ু কোণে অবস্থিত দু'তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুপরিচিত পল্লীগ্রাম 'পূর্ব্ব-স্থলী'তে মাঠাকুরাণীর বাস। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত এবং জোতির্ব্বিদ পণ্ডিত স্বর্গীয় দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহার স্বামী ছিলেন। ইনি পূর্ব্বস্থলীর অলঙ্কার এবং পণ্ডিত সমাজের মুকুট-মণি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় বলেন "আমার অধ্যাপকের ন্যায় পণ্ডিত আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। স্মৃতি এবং জ্যোতিষে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। চরিত্রে এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চায় তিনি অতি উচ্চ এবং মহান্ ছিলেন; তাঁহার ব্যবস্থায় বিশেষ বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার সহধর্ম্মিণী যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহাতে মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না।" মাঠাকুরাণীর সময়ে স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা সকলেই বলেন যে গুরুগৃহে অবস্থিতি কালে গুরুপত্নী তাঁহাদিগকে যে ভাবে যত্ন ও স্নেহ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের মনে হইত যে তাঁহারা যেন গর্ভধারিণী জননীর কাছে রহিয়াছেন।"

যে গৃহে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বাল্যে শিক্ষাভ্যাস করিতেন সেই গৃহের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে স্বতই যেন নতশির হইয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। মাঠাকুরাণীর ন্যায় নির্ম্মলচরিত্রা নারী এই গৃহে বাস করিতেছেন বলিয়া ইহার প্রতি লোকের ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের ত কথাই নাই। আমরা এ স্থলে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

এক দিন মাঠাকুরাণীর বাড়ীতে একজন

ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাঠাকুরাণী বাড়ীতে নাই, শীঘ্রই আসিবেন। এই সময়ে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সেখানে আসিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটী ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। ভদ্রলোকটি মাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়াই ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার তামাক খাওয়া আছে কি?" তিনি 'আছে' বলিয়া উত্তর করিলে পণ্ডিতপ্রবর স্বয়ং তামাক প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাঁহাকে হুকা দিলেন। আগন্তুক তামাকু সেবন করিতেছেন এমন সময়ে সহসা এক তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে আসিয়া ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়কে প্রণাম করিয়া মস্তক নত করিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকটীর তখন বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তিনিই সেই দেশ-প্রসিদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত হইতে হুকাটী নামাইয়া একান্ত অপ্রতিভের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলে ন্যায়-পঞ্চানন কহিলেন "আপনি তামাক খান ইহাতে কোন দোষ নাই। এ আমার তামাক-সাজারই বাড়ী;—পঠদশায় প্রতিদিন তামাক সাজিয়াছি।"

বলা বাহুল্য মাঠাকুরাণীর অতিথির এইরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া ন্যায়-পঞ্চানন নিজের মহত্ব এবং অকৃত্রিম গুরুভক্তিই পরিচয় দিয়াছেন। গুরুপত্নীকে তিনি জননীর ন্যায় দেখেন। বঙ্গের এই বয়োবৃদ্ধ বিদ্বৎ-সমাজ-শিরোমণিকে নাম ধরিয়া ডাকিবার অধিকার কেবল এই "দীন-তপস্বিনীর"ই আছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যদি কেবল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে একমাত্র ছাত্র রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেই তাঁহার অধ্যাপক-বৃত্তি সার্থক হইত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাঠাকুরাণীও কৃষ্ণনাথের গুরুপত্নী বলিয়া যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়ের অসংখ্য শিষ্য এবং ছাত্র মণ্ডলী "দীন তপস্বিনী"কে দিদিমা বলিয়া ডাকেন।

ধন্য তুমি মা! তুমি * দরিদ্রা হইয়াও অনেক অর্থবান কর্ত্তৃক অর্চ্চনীয়া, অশিক্ষিতা হইয়াও অনেক সুশিক্ষিত লোকের শিক্ষয়িত্রী-স্বরূপা এবং অপরিচিতা পল্লীবাসিনী হইয়াও অনেক সুপরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভক্তি ও সম্মানের পাত্রী. সন্দেহ নাই। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী অরুন্ধতী প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই এ দেশে আমরা এখনও ধনীর অট্টালিকায় মহারাণী শরৎ-সুন্দরীর ন্যায় রাজ-তপস্বিনী এবং দরিদ্রের ভগ্নকুটীরে তোমার ন্যায় দীন-তপস্বিনী দেখিতে পাই। আমরা ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে তোমার জাহ্নবী-প্রবাহবৎ পবিত্র চরিত্র ক্ষুদ্র লেখনী-তুলিকায় যথাসাধ্য চিত্রিত করিয়া ধন্য হইলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-সমাজে যেন তোমার স্বর্গীয় স্বামীর ন্যায় ঋষিকল্প অধ্যাপক এবং তোমার ন্যায় দেব-দেবী এবং জীব-সেবায় সর্ব্বস্বোৎসর্গকারিণী তপস্বিনীর কখনও অভাব না হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

* ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় দেবীদাস তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী।

মূক বধির কি বধির মূক ?

বিবর্ত্তনের পর্য্যায়ানুসারে জীবের ইন্দ্রিয় শক্তির তীক্ষ্ণতা ও পরিচ্ছন্নতার ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি পঞ্চেন্দ্রিয়-সমন্বিত জীবদিগের মধ্যেও কাহারও কাহারও ইন্দ্রিয় বিশেষের ক্ষমতা খুব বেশী ও কোনও কোনও জীবে খুব কম; কিন্তু মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তির মধ্যে একটা সাম্য ভাব দৃষ্ট হয়। অপর প্রাণীতে তাহা নাই। জীব শ্রেষ্ঠ মানবও ইন্দ্রিয় বিশেষের কোনও বিশেষ ক্ষমতাতে সামান্য কীট পতঙ্গের নিকট পরাজিত। ফলতঃ এই প্রকার বৈষম্য মহামহিমান্বিতা প্রকৃতির কার্য্য কুশলতারই পরিচায়ক। যে ভীষণ অশনি গর্জ্জনে মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব চমকিত ও ভীত হয়, ক্ষুদ্র কীটাদির নিকট সেই ধ্বনির ক্ষুদ্র স্পন্দন অনুভূত হয় না। নতুবা এই পৃথিবীতে তাহাদের জীবন ধারণ করা অতিশয় কঠিন হইত। অপর পক্ষে, যে সকল কোমল ধ্বনির স্পন্দন ক্ষুদ্র কীটাদির শ্রবণগোচরীভূত হইয়া তাহাদিগকে বিমোহিত করে সেই শব্দ উচ্চ শ্রেণীর জীবের শ্রুতি স্পর্শকরে না, করিলে, পার্থিব কোলাহলের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় জীবগণের জীবনধারণ দুরুহ হইয়া পড়িত।

যে পরিমাণ শ্রুতি শক্তি থাকাতে আমরা শ্রুতিষ্মান সেই পরিমাণ শ্রুতি শক্তির অভাবকেই বধিরতা কহে। শ্রুতির ন্যায় বধিরতারও বহু পর্য্যায় আছে। সকলের শ্রুতিশক্তি সমান প্রখর নহে। যাহারা শ্রুতিষ্মান তাহাদিগের মধ্যেও যেমন শ্রবণশক্তির বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বধির দিগের মধ্যেও সেই প্রকার বধিরতার ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। শ্রুতিষ্মান ও বধিরগণের শ্রবণশক্তির মধ্যে পার্থক্য সবিশেষ সীমাঙ্কিত না থাকিলেও এমন একটি অবস্থা আছে যাহার ন্যূনাধিক্যে বধিরতা ও শ্রুতিমত্তা প্রকটিত হইয়া থাকে।

আমরা সচরাচর বহুবিধ বধির দেখিতে পাই; আমাদের প্রচলিত ভাষায় যাহাদিগকে দেশ বিশেষে কালা, ঠকা ও বয়রা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয় তাহারা, এবং মূক বধির অর্থাৎ হাবাকালা বা বোবারা উভয়েই। তবে, উভয় শ্রেণীর বধিরতার মধ্যে পার্থক্য অতি কম হইলেও তাহাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য বাহ্যতঃ প্রভেদ এত বেশী যে বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তাহাদিগকে সমশ্রেণী বলিয়া অনুমান করিতে কুণ্ঠা বোধ হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে কালারা কথাবার্ত্তা দ্বারা মনোভাবের আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের সহিত আলাপ করিতে একটু অতিরিক্ত উচ্চতা সহকারে বাক্যোচ্চারণ করিলেই চলিতে পারে; কাহারও সহিত বা কথাগুলি বেশ ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারন করিলেই চলে, বেশী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে হয় না। কিন্তু মূকদিগের সহিত কথা বলিবার উপায় নাই।

বজ্রনিনাদ শব্দে অনেকে একটু চমকিত হয় বটে, কিন্তু তূর্য্যধ্বনির ন্যায় উচ্চ চীৎকারে কথা কহিলেও সেই কথা তাহাদের শ্রুতিগোচর হয় না। আকার ইঙ্গিতের সহায়তা গ্রহণ না করিলে তাহাদিগের নিকট মনোভাব প্রকাশ করা যায় না, বা তাহাদের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। স্থূলতঃ আমরা সাধারণ ভাবে দেখিতে পাই যে কালারা ত কালাই, হাবারাও কালা। আমাদিগের সাধারণ ধারণা এই যে হাবা হইলে তাহাকে কালা হইতেই হইবে অর্থাৎ বধিরতা মূকত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কথাটা কি বাস্তবিক তাই? মূক হওয়াই কি তাহাদিগের বধিরতার কারণ? বাস্তবিক তাহা নহে। অপিচ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাহায্যে মূকদিগের বাকযন্ত্রে এমন কি শারীরিক গঠনের মধ্যেও নানা প্রকার অঙ্গহীনতার কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক ধ্রুব সত্য মনে করিয়া স্থল বিশেষে ঈদৃশ নির্বাক দুর্ভাগাদিগের দুর্গতি দূর করিবার অভিপ্রায়ে দয়াপরবশ হইয়া অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। এমতাবস্থায় কর্মকর্ত্তা তাঁহার দয়াপ্রাণতার জন্য যথেষ্ট প্রশংসার্হ কিন্তু তাঁহার অজ্ঞতা নিবন্ধন যখন দেখিতে পাই যে নিজের মনোভাব প্রকাশে অক্ষম কোন হতভাগা মানব বৃথা যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছে, তখন তাঁহার দয়ার প্রশংসা না আসিয়া মূর্খতার জন্য আক্ষেপে হৃদয় অভিভূত হয়।

একটু বিচার পূর্ব্বক দেখিলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে যাহারা জন্মাবধি অথবা অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বধির তাহারাই মূক হইয়া থাকে পরন্তু বেশী বয়সে বধির হইলে তাহারা মূক হয় না, বধিরই থাকে। অনেক বালক বালিকা জন্মাবধিই কালা আর অনেকে আঁতুরেই ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া বধিরতা প্রাপ্ত হয়; ফলতঃ যাহারা ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বেই বধিরতা প্রাপ্ত হয় তাহারাই মূক হইয়া থাকে। একবার ভাষা আয়ত্ব হইয়া গেলে তাহার পর বধির হইলেও কেহ মূক হয় না। তাহার কথায় স্বরের সামান্য বিপর্য্যয় ঘটে মাত্র।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার বিষয়ালোচনার জ্ঞান আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ শিশুর ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে কার্য্যের প্রখরতা বেশী থাকে না, বয়োবৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ ক্রমশ তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমূহের আকর্ষণ শিশুকে ক্রমশ পার্থিব জীবনের অভিনব জ্ঞানসোপানে আরোহণ করাইয়া দেয়। মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণই শিশুর ভাষা শিক্ষার আদি গুরু। তাহাদের সেই ও আদর মাখান কথাগুলি সহস্র চুম্বনরসে অভিষিক্ত হইয়া যখন শিশুর সমীপবর্ত্তী হয় ও আদরের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের ভাষা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেই সময় হইতেই তাহার ভাষা-জ্ঞানের 'হাতে খড়ি' আরম্ভ হয়। এই আদর ও স্নেহরসাভিস্নাত ভাষা জন্মসময়াবধিই তাহার শ্রবণ সমীপে উপনীত হয় কিন্তু তাহার অস্ফুট বোধশক্তির নিকট প্রথমতঃ কিছুই গ্রাহ্য হইতে পারে না। একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন শিশুর বোধ-শক্তির উন্মেষ হইতে থাকে সেই সময়ে যেমন কুটুম্বগণের আদর ও যত্ন তাহার

উপলব্ধি হইতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষাও আসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। তাহাদের আদরের ও ভাষার প্রতিদানে ভাষা ব্যবহারের প্রবৃত্তি ক্রমশ তাহার শৈশব হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠে ও এই প্রবৃত্তির তাড়নায় তাহার জীবনের এই মুহূর্ত্ত হইতেই অন্যান্য শিক্ষার সহিত ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম কেবল প্রযত্ন নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বর-সুলভ ধ্বনি ও পরে দা দা মা মা, বা বা প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ ও তদন্তর অর্থযোযক শব্দে আধ আধ ভাষায় কথা বলিয়া পিতা-মাতা ও স্বজনগণের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত করিয়া তোলে।

কিন্তু হায় যাহারা এমন সময় হইতে শ্রুতিশক্তিবিহীন তাহারা কি শিক্ষা করিবে? দৃষ্টি এবং শ্রুতি—ভাষা শিক্ষার দুইটি উপায়। শ্রুতির পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ, সুতরাং তাহাদের প্রযত্ননিরপেক্ষ-কণ্ঠস্বরের সহিত দৃষ্টিজ্ঞানলব্ধ ওষ্ঠাধরের আন্দোলনের সংমিশ্রনে যে কয়টি বর্ণ উচ্চারিত হওয়ার সম্ভব, বড় জোর তাহাদের তাহাই হইতে পারে; এই অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষা-সম্পদ লইয়াই তাহারা প্রত্যাখ্যাত অতিথির মত যথা প্রাপ্ত লাভে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ এক প্রকার অজ্ঞতার আনন্দে জীবন পথে অগ্রসর হয়। তখন তাহারা মনোভাব অভিব্যক্তির জন্য নানা প্রকার ইসারা ইঙ্গিত ব্যবহার করিতে থাকে।

জন্মাবধি কোনও শিশুকেই কণ্ঠস্বর বিহীন দেখা যায় না, ভূমিষ্ঠ হইয়া সকল শিশুই চীৎকার পূর্ব্বক রোদন করে। শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের জীবন। শ্বাস বায়ু কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরস্থ বাকযন্ত্রের ভিতরে প্রবাহিত হইয়া স্বর উৎপাদন করে। বাকযন্ত্র (larynx) শ্বাস যন্ত্রের মুখাবরণ সদৃশ; সুতরাং বিকল বাকযন্ত্র বিশিষ্ট লোক কদাচিত দৃষ্ট হয়। তাই প্রায় কোনও মূকই কণ্ঠস্বর বিহীন নহে। কণ্ঠ স্বরের সাহায্যে তাহারা শ্রুতিমান ব্যক্তিদিগকে ডাকিতে বা তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে মূকত্ব তাহাদিগের বধিরতার কারণ নহে। পরন্তু বধিরতাপ্রযুক্ত বাক্য এবং ভাষায় জ্ঞান জন্মে না বলিয়াই তাহারা স্ব স্ব মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয় না। আমরা শ্রুতি শক্তির সাহায্যে পৌন পৌনিক প্রযত্ন দ্বারা বাক এবং অর্থে ও নাম এবং নাম প্রতিপাদ্য বস্তুতে —অভিন্নত্ব অনুভব অভ্যাস করিয়া লই। সেই অভ্যাস আমাদের এতাদৃশ স্বাভাবিক হইয়া যায় যে পরে আমরা নাম ও বাক্যের পার্থক্য কল্পনাও করিতে পারি না। আমরা নাম, রূপ ও স্পর্শ দ্বারা বস্তু ও ক্রিয়ার স্বরূপ অনুভব করি এবং বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করি। চির-বধিরদিগের শব্দজ-জ্ঞানের পথ রুদ্ধ; কাযেই তাহারা কেবল-মাত্র রূপ ও স্পর্শ দ্বারাই বস্তুর জ্ঞান লাভ করে ও বস্তুর রূপের অনুকল্প ইসারা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

বধির অনেক প্রকার। অনেকে রীতিমত ভাষা শিক্ষার পরে বধিরতা প্রাপ্ত হয়; এবম্বিধ বধিরগণ অপরের কথা শুনিতে না পারিলেও নিজের মনোগত ভাবগুলি

কথায় বলিতে পারে এবং বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষিত হইলে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ভাষার সম্পদ বাড়াইয়া লইতে পারে। ইহারা নিজেদের স্বরের উপযুক্ত উচ্চতা ও খর্ব্বতা বুঝিতে না পারায় ইহাদের স্বর একটু মৃদু ও কোমল হইয়া পড়ে। মোটকথা যাহারা যে যে পরিমাণ ভাষা শিক্ষার পর বধির হয় তাহাদের সেই পরিমাণ ভাষাজ্ঞান কিছু দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। তাহাও অভ্যাস দ্বারা উন্নীত ও অবনীত হইতে পারে। কেবল এই কারণেই আমরা অনেক বধির দেখিতে পাই যাহারা মূক নহে। ফলতঃ মূকবধির ও কেবল মাত্র বধিরদিগের মধ্যে বধিরতা সম্বন্ধে কোনও বিশেষত্ব নাই। যাহারা ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বে বধির হয় তাহারাই মূক ও বধির হয়। কারণ তাহারা কোনও ভাষাই শুনিতে পায় না, কাযেই বলিতেও পারে না। যাহারা অতি সামান্য দুই একটি কথা বলিতে শিক্ষার পর এমন কি ৮।৯ বৎসর বয়সের সময়ও বধির হয় তাহারাও ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ ভাষা ভুলিয়া যাইতে থাকে এবং একটু বয়স বেশী হইলে একেবারে হাবা হইয়া উঠে। তাহারা কখনও কখনও পূর্ব্ব স্মৃতি বশে দুই একটা কথা উচ্চারণ করিতে পারে বটে কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদের নিজের কথিত কথার অর্থ নিজেই বুঝিতে পারে না, অপরকে বুঝান ত দূরের কথা। ফলতঃ বাকযন্ত্রের বৈলক্ষণ্যবশতঃ মূক বড় দেখা যায় না। সেই প্রকার, মূক হইলে তাহার শ্রুতি শক্তি লুপ্ত হইবার কোনও কারণ নাই। এই প্রকার মূক অবশ্য অতি বিরল। কিন্তু অতি বিরল হইলেও যে একেবারে নাই তাহা নহে। অনেক সময়ে ক্ষীণ মস্তিষ্কশালী বুদ্ধিবৃত্তিহীন ব্যক্তিগণও মূক বধির সংজ্ঞান্বিত হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বোধহীন। তাহারা সকল প্রকার ইন্দ্রিয় কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। তাহাদিগকে মূক বধির সংজ্ঞাতে আনয়ন করা মূক বধিরদিগকে অবনত করা মাত্র। পরন্তু ইহাও মনে হয় "হাবা" কথাটী বোধ হয় কোনও কালে মস্তিষ্ক বিহীন (idiot) লোকদিগের বুঝাইত; কাল ক্রমে উহা মূক বধিরের সংজ্ঞার সহিত যুক্ত হয়। "হাবা" কথাতে আমরা যাহা বুঝি মূক বধিরেরা সে প্রকার হাবা নহে। তাহাদিগের একমাত্র শ্রুতি শক্তির ক্ষীণতা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের দোষই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের বুদ্ধি কর্ম্মপটুতা প্রভৃতি সকলই অপরাপর লোকের ন্যায়। একমাত্র বধিরতা নিবন্ধন তাহারা ভাষাজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, এবং সামাজিক শিক্ষাতে শিক্ষিত হইতে পারে না। সভ্যসমাজের অশিক্ষিত মূক বধিরগণ শ্রুতিমান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তুলনায় অনেক হীন হইলেও তাহারা অসভ্য সমাজের শ্রুতিমান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। পরন্তু হাবারা অর্থাৎ যাহারা বোধশক্তিবিহীন তাহারা সকল সমাজেই জড়বৎ। মূক বধিরদিগকে হাবা সংজ্ঞায় অভিহিত করা তাহাদিগকে হীন করা মাত্র। এই মূক বধিরগণও শিক্ষিত হইলে শেষে আর মূক-বধির থাকে না। কেবল মাত্র বধিরই থাকিয়া

যায়। কারণ তাহারা কথাবার্ত্তা দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করিলে তাহাদিগকে মূক বলা অসঙ্গত। ইহারা শিক্ষা দ্বারা যে কত দূর উন্নত হইতে পারে কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্ত মোহিনী বাবুর মূক-শিক্ষা গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বহু মূক বধির, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। কেবল মাত্র সপ্তদশ বৎসরেরও অনধিক কাল যাবৎ সংস্থাপিত কলিকাতার মূক বধির বিদ্যালয়ের বালকেরাও যে কথা কহিয়া অনেক মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে ইহা বোধ হয় অনেক বাঙালীরই অবিদিত নাই। পরন্তু তিন বৎসর যাবৎ এই স্কুলের ছাত্রগণ অপরাপর ছেলেদের মত নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কালে যে ইহারা ছাত্রবৃত্তি মাইনর পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে। অতএব অবস্থা বিশেষে, বধিরতা যখন মূকত্বের কারণ নহে এবং যখন মূকত্ব শিক্ষা দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে তখন এই অক্ষমতাকে একটী স্বাভাবিক বা ব্যধিজাত দোষ বলিয়া গ্রহণ করা কোনও মতেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

মূক-শিক্ষক।

অক্ষয় মিলন।

দেশ-ভ্রমণে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কবিত্বশক্তির স্ফূর্ত্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দেশভ্রমণকালে যদি সঙ্গে সঙ্গে এক গাছা ৬৬ ফীট দীর্ঘ "চেন"কেও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে হয়, তাহা হইলে সে সম্ভাবনা যে বড় বেশী থাকে তা নয়! কিন্তু নগেন্দ্রনাথের হৃদয়-নিহিত খরতর কবিত্বস্রোত ইহাতেও বিশুষ্ক হয় নাই। "সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া"—বিভাগে কর্ম্ম পাইয়াও সে আপনার কুঞ্চিত কুন্তল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি এবং বেশের পারিপাট্য সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

১৯০—সালের ভাদ্রমাসে ঘুরিতে ঘুরিতে সে "চেন" লইয়া রাঁচি ও হাজারিবাগের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গিরিকাননসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা তাহাকে মুগ্ধ করিল। দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ নিকটবর্ত্তী অনুচ্চ গিরিশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া দূর-প্রবাহিতা সুবর্ণরেখার রজতধারা চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—জ্যোৎস্না ধবলিত লাল ও পলাশের উচ্চ শির তাহার নিকট রত্ন-খচিত রাজমুকুটের ন্যায় প্রতিভাত হইত।—দূরাগত পক্ষীকুলের কল-নিনাদ তাহাকে পুলকিত করিত। নগেন্দ্রনাথ যেখানে আসিয়াছিল সে "কোলে"দের গ্রামে। সে সময়ে

"করম" পূজার মহোৎসব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছিল।

এক দিন জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল রজনীতে গিরিশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া দূরাগত "মাদ-লের" ধ্বনি এবং রমণীকণ্ঠের কলনিনাদ শ্রবণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ বিচলিত হইল। সে ভাবিল ব্যাপারটা একবার দেখিয়া আসা প্রয়োজন।

সান্ধ্য-আহার সংক্ষেপে সারিয়া সে আপনার "চেনম্যান"কে সঙ্গে লইয়া সেই কল সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গ্রাম প্রান্তে এক দীর্ঘ "চালা"ঘরের কৌমুদী-প্লাবিত প্রাঙ্গনে নৃত্য ও সঙ্গীতের মহোৎসব চলিতেছিল। দুইজন কোল যুবা-পুরুষ আনন্দোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া "মাদোল" বাজাইতেছিল এবং তাহাদের ঘিরিয়া অন্যূন বিংশতি কোল-যুবতী মৃদঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিতে-ছিল—সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের মধুর লহরী সেই কলকণ্ঠ ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীলাকাশকে মুখরিত করিতেছিল।

নগেন্দ্র আসিয়া এই আনন্দ চঞ্চল জন-সংঘের একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইল।

রজত-ধবল জ্যোৎস্নালোকে সুগঠিত যুবতী দেহে এই রূপের হিল্লোল তাহার কবি-হৃদয়কে স্পর্শ করিল। নগেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে এই সৌন্দর্য্য-হিল্লোল এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত নীলাকাশ, মধুরমৃদঙ্গনিনাদ, মধুরতর নারী-কণ্ঠোদ্ভূত স্বরলহরী, সাগরতরঙ্গের ন্যায় আন্দোলিত সৌন্দর্য্যপ্রবাহ, সকলে মিলিয়া এক মায়া-বিভ্রম সৃজন করিতেছিল।

সেই অননুভূতপূর্ব্ব চিত্তবিভ্রমে দেখিতে দেখিতে এই নৃত্যগীতিনিরতা বিংশতি সুন্দরীর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ একজনকে বড়ই সুন্দর দেখিল। সুদক্ষ শিল্পী-গঠিত সেই কৃষ্ণ-মর্ম্মর-প্রতিমার চতুর্দ্দিক ফিরিয়া চিত্ত তাহার অজ্ঞাতসারে লুব্ধ ভৃঙ্গের মত গুঞ্জরিয়া ফিরিতে লাগিল।

ভৃত্য ডাকিল "বাবু রাত্রি অনেক হইয়াছে।" শিহরিয়া নগেন্দ্রনাথ সেই মোহ-বিভ্রম হইতে চিত্তকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষু তুলিতেই নগেন্দ্র-নাথের সতৃষ্ণ চক্ষু যুবতীর আনন্দ প্রোজ্জ্বল বিশাল নয়নের সঙ্গে মিলিত হইল। তখন ক্ষণেকের জন্য সঙ্গীত থামিয়াছে। দ্বিতীয় সঙ্গীতের আরম্ভের জন্য যুবতীবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছে। সহসা কি এক তাড়িতস্পর্শ নগেন্দ্রনাথের হৃদয়কে কম্পিত করিয়া দিল। যুবতীরও নীলোৎপলবৎ নেত্রযুগ অজ্ঞাতে যেন মুদিয়া আসিল।

শুভ অবসর দেখিয়া মন্মথদেব বুঝি বা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন!

২

বাঙ্‌লা দেশের মধ্যে সুবর্ণরেখার জল-প্রপাতই বোধ হয় সমধিক প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকে পাহাড়ের নামানুসারে ইহাকে "হুড্রু" কহে। নগেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে হুড্রুর নাম শুনিয়া আসিতেছিল। কাজেই এত নিকটে আসিয়া সে প্রকৃতির এই মহান দৃশ্য দর্শনের লোভ হইতে আবেগপূর্ণ চিত্তকে অধিক দিন বিরত রাখিতে পারিল না।

প্রথম অবসর প্রাপ্তি মাত্রেই নগেন্দ্রনাথ "হুড্রু" দর্শনে যাত্রা করিল। সঙ্গে দুইজন "চেন-ম্যান" রহিল।

প্রভাতের স্বর্ণ কিরণ-খচিত, স্তরে স্তরে সুসজ্জিত বিটপীশ্রেণী, ফলে ফুলে মনোহর বিচিত্র দৃশ্য লতা বিতান, বিচিত্রবর্ণ কূজন নিয়ত ক্ষুদ্র বৃহৎ কলকণ্ঠ বিহগরাজি—নগেন্দ্রনাথ যত দেখিতে লাগিল ততই মুগ্ধ হইতে লাগিল। বিবিধবর্ণ উপলখণ্ড গিরিনদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনান্তরাল হইতে কলকণ্ঠে পরিহাস-পরায়ণা কিশোরীর মত তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল—কূজন-রত ঘুঘু পক্ষী মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সাদরে তাহাকে অভিবাদন করিতেছিল—বাত্যান্দোলিত শ্যামল অঞ্চল নাড়িয়া প্রকৃতি দেবী স্নেহভরে তাহাকে আহ্বান করিতেছিলেন—আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে নগেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে গিরি কানন অতিক্রম করিতেছিল।

সহসা দূরশ্রুত সাগর গর্জ্জনের মত এক গম্ভীর নিনাদ নগেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। অনুচর বলিল উহাই প্রপাতের শব্দ। বর্দ্ধিত-কৌতূহল নগেন্দ্রনাথ আরও দ্রুত চলিল। ক্ষণকাল পরে নগেন্দ্রনাথ প্রপাতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।—সে এক বিরাট মহান্ দৃশ্য! বিধূনিত তুলারাশির ন্যায় ফেন-শুভ্র জলরাশি ভীষণগর্জ্জনে বনস্থলী বিকম্পিত করিয়া পর্ব্বতের চূড়া হইতে লম্ফ দিয়া সহস্র হস্ত নিম্নে পড়িতেছিল। যেখানে পড়িতেছিল, সেখান হইতে শরতের শুভ্র জলদরাশির ন্যায় শীকররাশি গিরিমূল সমাচ্ছন্ন করিয়া অবিরাম উত্থিত হইতেছিল। এই ফেনায়মান জলরাশির উপরে প্রতিফলিত সৌরকররাশি—"রজত গিরি নিভ" চন্দ্রশেখরের গলদেশে লম্বিত বিচঞ্চল সুবর্ণবর্ণ ফণীরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছিল—কৃষ্ণ পাষণময়ী চণ্ডিবলরূপিণী প্রকৃতি দেবী, যেন তাণ্ডব নৃত্য পরায়ণ চন্দ্রচূড়কে সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত কলঙ্ক বিমোচন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। পুলকোৎফুল্ল নগেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইল, এই ঘূর্ণায়মান ভীষণ দৃশ্য জলরাশি ভেদ করিয়া এক তুষার-শুভ্র কপোতদম্পতী শূন্যে উড়িয়া গেল, আবার ক্ষণকাল পরে ঘুরিয়া জলরাশির অতল তলে নিমগ্ন হইল। বিস্মিত নগেন্দ্রনাথ নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া দেখিল যেখানে পুলক-বিহ্বল "ফেনিলোচ্ছ্বাস" জলরাশি অট্টহাস্যে গিরিকানন ধ্বনিত করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছিল, ঠিক তাহারই নিম্নে গিরিগাত্রে একটী ক্ষুদ্র গহ্বরে এই কপোত-দম্পতী আশ্রয় লাভ করিল।

নগেন্দ্রনাথ মনে করিল এমনি উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল মকরনক্রবহুল আন্দোলিত সংসার-সাগরের অন্তরালে এমনি করিয়া দুইটী প্রাণী আপনাদের নিবিড় মিলনানন্দে প্রেমের ক্ষুদ্রনীড় রচনা করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে না কি?

মনে করিতেই অজ্ঞাতসারে এক অকলঙ্ক নীলোৎপল মূর্ত্তি তাহার মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল উৎসব নিশায় পরিদৃষ্টা সঙ্গীতপরায়ণা সেই কোলবালিকার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য ছিল কি? * *

কিন্তু কবিত্ব জিনিসটাকে বড় কষ্টে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। পূর্ণপ্রস্ফুটিত

কুসুমের মত ঈষৎ দুঃখের বায়ু স্পর্শেই তাহার দলগুলি অকালে ঝরিয়া পড়ে। নগেন্দ্রনাথ যখন বাহির হইয়াছিল তখন নবোদিত দিবাকরের স্বর্ণ রশ্মি চ্ছটা, সুখস্পর্শ প্রভাত বায়ু, নব জাগরিত বিহগের কলকূজন তাহার কবিত্ব-লতিকার মূলে জলসেচন করিতেছিল। সেই আনন্দের উন্মাদনায় নগেন্দ্রনাথ দুরারোহ দুর্ভেদ্য বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন গিরিগাত্র অবহেলায় অতিক্রম করিয়া প্রপাত পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে, স্তব্ধবায়ু-সঞ্চার পার্ব্বত্য প্রদেশের ভীষণ উত্তাপে, পাকস্থলী মধ্যে অনুভূত ক্ষুধা ও পিপাসার বৃশ্চিক-দংশনে সে উন্মাদনা রবিকর-শুষ্ক শিশির বিন্দুর মত ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নগেন্দ্রনাথ পর্ব্বতা-রোহণে প্রবৃত্ত হইল। আপনার বুদ্ধি বৃত্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও মানুষ অনেক বিষয়েই প্রতারিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের ব্যাপার ইহার আদর্শ স্থল। দূর হইতে হরিৎ-তৃণ-শোভিত শ্যামল তরুলতা-খচিত পর্ব্বতকে কি মনোরমই মনে হয়—কিন্তু ইহার নিকটে উপস্থিত হইলে এই রমনীয়তা সহসা সুগভীর গহ্বর, কণ্টকাকীর্ণ তরুগুল্ম এবং শিথিলমূল বিরাট প্রস্তর খণ্ড মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ললাটে ঘর্ম্ম এবং হৃদয়ে কম্প আনয়ন করে।

নগেন্দ্রনাথেরও সেই দশা ঘটিল। লুপ্ত-কবিত্ব নগেন্দ্রনাথ কিয়দ্দূর আরোহণ করিয়া রুমালে মুখ মুছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বোধ হয় পথ হারাইয়াছিলেন। দুই ঘণ্টা কাল নিদারুণ পরিশ্রম করিয়াও নগেন্দ্রনাথ গিরি শিরে উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

নগেন্দ্রনাথ যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন সে অতি ভীষণ স্থান, উর্দ্ধে মসৃণ বিরাট প্রস্তরস্তূপ সরল ভাবে সমুত্থিত—নিম্নে জল-সিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতখণ্ডের নিম্নে তীক্ষ্ণ উপলখণ্ডবহুল সুগভীর গিরি-নির্ঝর!

পিপাসায় কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অবসন্ন পদদ্বয় ক্লান্তি ও উদ্বেগে থর থর কাঁপিতেছিল, হস্তদ্বয় ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—নগেন্দ্রনাথ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। সঙ্গীদ্বয় উপরে বসিয়া বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—নগেন্দ্রনাথের বিপদের কথা তাহাদের জানিবার উপায় ছিল না। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যাপন করার পর ভ্রান্তি উদ্বেগ ও আশঙ্কায় নগেন্দ্রনাথের হস্তপদ অবশ হইয়া গেল—মস্তিষ্কের ক্রিয়ারও ব্যাঘাত জন্মিল। ভীষণ বিপদের অস্পষ্ট আশঙ্কামাত্র বক্ষে লইয়া অস্পষ্টচেতন নগেন্দ্র-নাথের অবশ দেহ পর্ব্বতগাত্র হইতে খসিয়া পড়িল। ক্ষীণচেতন নগেন্দ্রনাথ পতনান্তে অস্পষ্ট অনুভব করিল যে পতনের পর পর্ব্ব-তের নিকট যে দুঃসহ এবং জীবনান্তকর স্পর্শের সে আশঙ্কা করিতেছিল বর্ত্তমান স্পর্শ তাহার যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ব্যাপার কি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার অবশিষ্ট চৈতন্যটুকু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিল!

৩

মূর্চ্ছাভঙ্গে নগেন্দ্রনাথ ভাবিল সে তখনো স্বপ্ন দেখিতেছে।

সে যেন সুকোমল শষ্প শয্যায় শয়ান—শিয়রে তাহার অঞ্চলদ্বারা বীজন-নিরতা বনদেবী! নগেন্দ্রনাথ দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিল। তথাপি সেই দৃশ্য! নগেন্দ্রনাথ ভাবিল একি 'স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু!'

নগেন্দ্রনাথকে সচেতন দেখিয়া দেবী মস্তক নত করিল—কম্পিত-কণ্ঠে নিজ ভাষায় সুধাইল "বাবু ভাল আছ?" নগেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। এ যেন পরিচিত মূর্ত্তি—কিন্তু কোথায় এ মূর্ত্তি দেখিয়াছে নগেন্দ্রনাথ সহসা তাহা মনে করিতে পারিল না। ভাবিতে ভাবিতে শেষে নগেন্দ্রনাথের কি যেন মনে পড়িল—অজ্ঞাত আবেশে তাহার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সেই-ত—সেই-ত—সে-ই বটে! তখন নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত-কণ্ঠে কহিল "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?" যুবতী উত্তর না দিয়া মুখ নত করিয়া মৃদু হাসিল। ক্ষণকাল পরে বলিল "তুমি একা যাইতে পারিবে না। চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দি।"

নগেন্দ্রনাথের প্রাণে সহস্র তরঙ্গ উথলিতেছিল—সে এক দৃষ্টে যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিল। অপরাহ্নে নগেন্দ্রনাথ বাটী পৌঁছিল। কিন্তু সেই এক দিনে তাহার হৃদয়ে অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সেই দিন হইতে নগেন্দ্রনাথকে তাহার অবসর কাল আর একা যাপন করিতে হয় নাই। "ভীমা" তাহার নিত্য সহচরী হইয়া উঠিয়াছিল। কৌমুদী সেই দিন হইতে তাহার চক্ষে শুভ্রতর দেখাইতেছিল—তরু-রাজি চারুতর সুষমা ধারণ করিয়াছিল—সুবর্ণরেখার কলকণ্ঠের সঙ্গে কে যেন অপ্সরা কণ্ঠ মিলাইয়া দিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ বাঁশী বাজাইত—ভীমা বাঁশীর সুরে গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিত। কুসুমিতবল্লরীপ্রতিম তাহার যৌবনসন্নদ্ধ দেহে সুধাকর হাসিয়া হাসিয়া অকলঙ্ক মুক্তাকলাপ দুই হস্তে বর্ষণ করিতেন—স্নেহভরে তাহার কৃষ্ণ কাদম্বিনী তুল্য কুন্তলদামে তাড়িতোজ্জ্বল পুষ্পমালা অবহেলায় ছড়াইয়া দিতেন। কেমন করিয়া দ্বিপ্রহর নিশা অতিবাহিত হইয়া যাইত, নগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিত না।

তাহারা রাশি রাশি ফুল তুলিত। ভীমা নগেন্দ্রনাথকে বনদেবতা সাজাইত এবং নিজেও পুষ্পাভরণভূষিতা নগ-নন্দিনীর মত হাসিয়া হাসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিত।

কোন দিন পৃষ্ঠে ধনু-শর বাঁধিয়া দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া সুবর্ণরেখার-তীরে কিরাত বেশধারী হরপার্ব্বতীর মত তরুণী স্রোতস্বিনীর কল-হাস্য শুনিতে শুনিতে যথেচ্ছ বিচরণ করিত। নগেন্দ্রনাথের আজন্মের কবি-কল্পনা যথাসম্ভব পরিতৃপ্ত হইতেছিল। নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল "কি ছার ইহার কাছে রত্ন-সিংহাসন!"

এক মাস কাটিয়া গেল। জরিপের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দুই দিন পরে নগেন্দ্রনাথকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ কৌমুদী প্রফুল্ল রজনীতে পর্ব্বত পৃষ্ঠে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল। আজ নগেন্দ্রনাথ একা। ভীমার মাতুল কন্যার বিবাহ—তাই সে আজ আসিতে পারে নাই।

নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল—আপনার মনে

কত কি ভাঙিতেছিল, কত কি গড়িতেছিল! কখনো মুখ তার সুবর্ণরেখার আরক্ত তট-ভূমির ন্যায় লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল —কখনো বা সুবর্ণরেখার ইন্দুকিরণোজ্জ্বল উর্ম্মিরাজির ন্যায় পুলকপ্রদীপ্ত হইতেছিল—কখনো বা বিশাল বটবৃক্ষের তীরস্থিত প্রগাঢ় ছায়ার ন্যায় বিষাদে অন্ধকার মনে হইতে-ছিল।

নগেন্দ্রনাথের—দ্বাবিংশতিবর্ষবয়স্ক নগেন্দ্র-নাথের কল্পনা-কুশলী কবি নগেন্দ্রনাথের—সকল মনোভাব আমি এই জরাজীর্ণ লেখনী-মুখে কেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিব?

নগেন্দ্রনাথ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিল। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে আসিয়া সে যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

কোন প্রতিবেশীর কন্যার সহিত নগেন্দ্র-নাথের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সেই বালিকার ক্ষীণ স্মৃতি ভীমার প্রদীপ্ত স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়া বড় গোল বাধাইতে-ছিল। নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল—কে ভাল? কে সুন্দর? ভীমার এই উন্মুক্ত ফুল্ল কুসুমশোভা, না সেই কিশলয়মধ্যশোভী মুকুলিত সুষমা? এই মেঘমুক্ত শশধরের স্ফুটতর ছবি, না সেই ব্রীড়াময়ী উষারাণীর লজ্জারুণ গণ্ডের অস্ফুট আভা? এই রবি-কর ফুল্ল কলনাদিনা স্রোতস্বিনীর কলকণ্ঠ-ধ্বনি, না বনান্তরালবাহিনী ক্ষীণা নির্ঝরিণীর ঈষৎ গুঞ্জনাভাস? নগেন্দ্রনাথ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না তবু মন যেন অজ্ঞাতে এই অপরিচিতার দিকেই ঝুঁকিতেছিল। পরিচিত ও অপরিচিতে বিবাদ বাধিলে অনেক সময় অপরিচিতেরই জয় হয় ইহা দার্শনিক সত্য। রহস্য সৌন্দর্য্যের এক প্রধান উপকরণ। সাধে কি সুরসিক বাঙালী প্রিয়তমার বদন চন্দ্রমা অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া রাখে? কিন্তু এই অজ্ঞাতকুলশীলা অপরিচিতা কোন রমণীর জন্য, জনক জননী স্বদেশ সমাজ সব কি ভুলা যায়? না, এ স্মৃতি মুছিতে হইবে! জীবন অন্ধকার হইবে হোক, কিন্তু নিজের সুখের জন্য, পরের জন্য, আপনার জনদের অসুখী করা হইবে না,—তা বেশ! তবে, কেন এ সরলা মুগ্ধা বালিকার চিত্তহরণ করিলাম? কেন ইহাকে ভাল বাসিয়া ভালবাসা শিখাই-লাম! হায় এই বালিকা যে আমারই জন্য—

"ঘর করিল বাহির আপন করিল পর"

সে যে আমাকেই ভাল বাসিয়া তাহার প্রণয় মুগ্ধ কোন যুবকের প্রণয়প্রার্থনা অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মীয় বন্ধুদের বিরাগের পাত্রী হইয়াছে, তাহার আপনার বলিতে আর যে কেহ নাই –"তাহার যে ফিরিবার, পথ রাখি নাই!" আর যদি শেষ রক্ষাই করিতে না পারিব, তবে কেন?—"সহসা কলহাস্যে শান্ত বনভূমি মুখরিত করিয়া ভীমা আসিয়া নগেন্দ্র নাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। নগেন্দ্র নাথ তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু সে আবাহনে যেন আজ প্রাণ নাই আবেগ নাই। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভীমা তাহা লক্ষ্য করিল,—কহিল "কি ভাব্‌চ নগ্‌ বাবু?" নগেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর বিষাদার্দ্র করিয়া কহিল "আর ত তোমাদের ছাড়িয়া চলিলাম ভীমা! আর দুদিন পরেই এখানকার সুখস্বপ্ন ফুরাইবে!" ভীমা চম-কিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল "কিন্তু সুখ-স্বপ্ন ফুরাইবে কেন? তুমি যেখানে যাইবে

আমি তোমার সঙ্গে যাইব—আমায় সঙ্গে লইবে না নগ্‌ বাবু?" একটু অপ্রস্তুত হইয়া নগেন্দ্র বলিল "আমি যে বাড়ী যাইব ভীমা!" "আমায় কি তোমায় বাড়ী যাইতে নাই নগ্‌বাবু?" বিপন্ন নগেন্দ্রনাথ নীরবে মস্তক অবনত করিল। ভীমা বুঝিল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন রজনীর মত ঘনান্ধকার হইয়া গেল। এই ভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ভীমা দ্রুতবেগে পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। উদ্বিগ্ন নগেন্দ্রনাথ ডাকিল "কোথা যাও ভীমা?" ভীমা উত্তর করিল না, বিদ্যুৎ গতিতে সম্মুখস্থ বনপার্শ্বে অন্তর্হিত হইয়া গেল। চিন্তাকুল চিত্তে নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিল।

৫

রাত্রি প্রহর অতীত হইয়া গেছে। নগেন্দ্রনাথের আজ এ গ্রামে শেষ রাত্রি। কাল প্রাতে নগেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে।

নগেন্দ্র নাথ সেই চিরপরিচিত গিরিশৃঙ্গে পাদ-চারণা করিতেছিল। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে চিরপরিচিত শৃঙ্গকে আবার তাহার চির নূতন বলিয়া মনে হইতেছিল। সুষমাময়ী বনপ্রকৃতির অদৃশ্য বন্ধন, আজ যেন নিবিড় করিয়া হৃদয়ে সে অনুভব করিতেছিল। সুবর্ণ রেখার রজত ধারা—পলাশের উচ্চ শির, চন্দ্রকরসুপ্ত মৃৎ-কুটীর—সকলেই তাহাকে আজ অব্যক্ত বেদনায় আকর্ষণ করিতেছিল। নগেন্দ্রনাথের চক্ষে জল আসিতেছিল। সেই পূর্ব্ব নিশা হইতে নগেন্দ্রনাথ আর ভীমার সাক্ষাৎ পায় নাই। সে কি করিল, কোথায় গেল, ভাবিয়া নগেন্দ্রনাথ অধীর হইতেছিল, কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কা ও উদ্বেগে হৃদয় তাহার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সহসা কলকণ্ঠে নৈশ আকাশ মুখরিত করিয়া, ভীমা আসিয়া নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল, অজ্ঞাতে নগেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

ভীমা তেমনি পুষ্পাভরণ-ভূষিতা, হাস্যময়ী, কৌতুকময়ী, সঙ্গীত মুখরা! যেন কিছুই হয় নাই। ভীমা আসিয়া আবেগভরে নগেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিল।

করস্পর্শে নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িতস্পর্শবৎ স্পন্দন অনুভব করিল। ভীমা বলিল "আজ শেষ দিন নগ্‌ বাবু, এস প্রাণ ভরিয়া আমোদ করি।" ভীমার মুখ হাস্যোজ্জ্বল, কথাবার্ত্তা আবেগ পূর্ণ—তবু যেন সেই আপাতোজ্জ্বল হাস্যরাশির অভ্যন্তরে কৌমুদী-প্রফুল্ল জলরাশির তলদেশস্থ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় কি এক অজ্ঞাত ভীষণতা অদৃশ্যে বিরাজ করিতেছিল। নগেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না—উল্লাস ভরে আমোদে যোগদান করিতে তাহার মন সরিতেছিল না।

নগেন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই কিন্তু ভীমা নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সযত্ন সজ্জিত কমনীয় দেহে সৌন্দর্য্য আজ উথলিয়া উঠিতেছিল। কৌমুদী-স্নাত নীলোৎপলের ন্যায় তাহার অকলঙ্ক রূপ-রাশি নগেন্দ্রনাথ অন্যমনে চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছিল। ক্ষণকাল পরে নৃত্যগীতে বিরত হইয়া ভীমা বলিল "কেমন সুন্দর রাত্রি! চল নগ্‌ বাবু একটু বেড়াইয়া আসি।" ভীমা নগেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া সুবর্ণরেখার

তীরে তীরে চলিল। হাস্যপরায়ণা বালিকা বধূর মত কৌমুদী-প্লাবিতা সুবর্ণরেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া হাসিতে ছিল। থাকিয়া থাকিয়া সুকণ্ঠ পক্ষী কলকণ্ঠে তাহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গাহিতেছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের কর্ণে বুঝি এ সকল কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না—নগেন্দ্রনাথ যন্ত্রচালিতের মত ভীমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল—মন তাহার সেখানে ছিল না।

বহুক্ষণ চলিয়া সহসা গম্ভীর গর্জ্জন-শব্দে নগেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইল। সবিস্ময়ে সে দেখিল, তাহারা প্রপাত-পাদ-মূলে উপস্থিত হইয়াছে!

বিস্মিত নগেন্দ্রনাথ সুধাইল "একি ভীমা আমরা কি হুড়ু আসিয়া পৌঁছিলাম?" সহাস্য মুখে ভীমা বলিল "হুড়ুর উপরে এক মহাদেব আছেন—তিনি বড় জাগ্রত। বিদায়ের দিনে তাঁর চরণে একবার প্রণাম করিয়া যাইবে না?" অন্যমনস্ক ভাবে নগেন্দ্র বলিল "বেশ চল।" বিদায়ের ক্ষণে ভীমার কোন প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। তখন বন কুরঙ্গিণীর মত লম্ফে লম্ফে প্রস্তররাশি অতিক্রম করিয়া ভীমা পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথকেও সে টানিয়া লইয়া চলিল। সেই সুকুমার দেহে অমানুষিক শক্তি দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা গিরিশিরে উপস্থিত হইল।

পর্ব্বতের প্রান্তভাগে যেখানে সুবর্ণরেখা দীর্ঘ লম্ফে অতলস্পর্শ গহ্বর চুম্বন করিতে ছুটিয়াছে—ঠিক সেই থানে, এক বিরাট শিলাখণ্ডোপরে দেবাদিদেবের অনাদিলিঙ্গ। সুবর্ণরেখার খরস্রোত প্রস্তরলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ সেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া দাড়াইল!

গহ্বরমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল এবং তাহারই সম্মুখে বিরূপাক্ষের অট্টহাস্যের ন্যায় জলরাশি হা হা রবে দূর শূন্যে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। সেই ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র নাথের বক্ষস্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া আসিল।

আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ভীমা বলিল "এস নগ্ বাবু, ভক্তি ভরে মহাদেবের শ্রীচরণে প্রণাম কর। ইনি বাঞ্ছাকল্পতরু; ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।" নগেন্দ্রনাথ ভীমার সঙ্গে দেবাদিদেবের শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। ভীমা কম্পিত কণ্ঠে কহিল "বল নগ্ বাবু! আমাদের এই মিলন অক্ষয় হোক্।" নগেন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই বলিল। বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণে এই অক্ষয় মিলন-প্রার্থনা তাহার কাণে পরিহাসের মত শুনাইতেছিল!

নগেন্দ্র ও ভীমা উঠিয়া দাড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীমার বিশাল লোচনদ্বয় যেন কি এক প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে জ্বলিয়া উঠিল। প্রাণপণ বলে নগেন্দ্রনাথকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে ভীমা কহিল "দেবাদিদেবের আশীর্ব্বাদ কথনো নিষ্ফল হয় না। নগ্ বাবু আমাদের এই ক্ষণিক মিলন একদিন অক্ষয় হইবেই।" কথা শেষ হইতে না হইতে নগেন্দ্রনাথের বক্ষবিযুক্ত হইয়া ভীমা বিদ্যুৎগতি সেই প্রপাত মধ্যে লাফাইয়া পড়িল! প্রপাত হা হা রবে হাসিয়া, কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সাহিত্য-সম্মিলনী। *

আমাদের এ সম্মিলন সাহিত্য-সম্মিলন। এখন সাহিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং আমরা কি অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তৎসম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করা আবশ্যক। সাহিত্য-শব্দ অধিকাংশ বাঙলা শব্দের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। বিখ্যাত শব্দ কল্পদ্রুমকার তাঁহার অভিধানে সাহিত্যকে "মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিতবর স্বর্গীয় বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার সুবিস্তৃত অভিধানে সাহিত্য "পদ্যাত্মকেকাব্যে" এই কথা বলিয়াছেন। শব্দতত্ত্ববিৎ মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ মহোদয়ের কৃত সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানেও সাহিত্য শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যাই আছে; অধিকন্তু তিনি সাহিত্যকে literary Composition ও বলিয়া গিয়াছেন। আবার ইংরাজী ভাষায় literature শব্দের অর্থ একটু ভিন্ন, সংস্কৃত সাহিত্য শব্দ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত ভাবাপন্ন। সংস্কৃত সাহিত্য শব্দ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ভাবাপন্ন সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য শব্দকে ইংরাজী literature শব্দের ঠিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে না। ইংরাজী literature শব্দে যাহা বুঝায়, সংস্কৃত সাহিত্য শব্দ তাহার অংশ মাত্র। আমরা আধুনিক বাংলা ভাষায় সাহিত্য শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে দেখিতে পাই তাহা কতকটা ইংরাজী literature শব্দেরই অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বগুড়ায় আমাদের সাহিত্য-সমিতি নামে যে সমিতি সংগঠিত হইয়াছে, যে সমিতির সভ্যস্বরূপে আমি আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সমিতি যে সাহিত্য আলোচনা করিবেন তাহা সম্পূর্ণ ইংরাজী literature শব্দের অর্থবোধক নহে; কারণ ইংরাজী রাজনৈতিক সাহিত্য, ব্যবহারজিবগণের সাহিত্য প্রভৃতি, তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। এখানে রাজনৈতিকগণের জটিল রহস্যময় প্রসঙ্গ, ব্যবহারজিবগণের কুটতর্কাদি আদৌ স্থান পাইবে না। সে প্রহেলিকাপূর্ণ প্রদেশ হইতে দূরে থাকিয়া, মাতৃভাষার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন দ্বারা আত্মোন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভ আমাদের উদ্দেশ্য; আমাদের লক্ষ্য,—জ্ঞান ধর্ম্ম, ও শান্তি। এ ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতা নাই, বিদ্বেষ ভাব নাই, জাতি ভেদ, ধর্ম্ম ভেদ, বর্ণ ভেদ নাই, সমগ্র বাঙালী জাতি এ মাতৃ সেবার অধিকারী; তাই সকলকেই আহ্বান করিতেছি। পুরাকালে আর্য্যঋষিগণ আপদপরিবৃত সৌধমালা-শোভিত নগর পরিত্যাগ করিয়া দূরে পর্ণকুটীরে সামান্য ফলমূল আহারে পরিতুষ্ট থাকিয়া যে সাধনা করত এ জীবনে প্রকৃত সুখশান্তি এবং জীবনান্তে

* উত্তর-বঙ্গে সাহিত্য-সাম্মিলনের ২য় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বগুড়ায় গত ১৮ই মাঘ যে সভা হয় তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, সেই সাধনার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি। যিনি কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্য-রাজ্যের একছত্র সম্রাট ছিলেন আজি পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল যাঁহার সুমধুর বীণাধ্বনি নীরব হইয়াছে, যাঁহার সর্ব্বতোমুখী অলৌকিক প্রতিভা বঙ্গ ভাষাকে অমূল্য রত্ন মালায় বিভূষিত করিয়া গিয়াছে, বঙ্গের সেই বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন "রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না ?" "মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইয়াছে ?" "বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে চল, আবার উন্নত হইবে"। তাই সকলকে জ্ঞানোন্নতির উপায় চিন্তার জন্য আহ্বান করিতেছি। এখানে ভয়ের কিছুই নাই। আমাদিগের এ স্থান দাবানল পরিবেষ্টিত গভীর অরণ্য নহে, শান্তি সমীরণের মৃদুহিল্লোলস্নিগ্ধ মনোহর কুঞ্জবন ; ইহা শ্বাপদ-ভীষণ কণ্টকময় বন্যপথ নহে, কোমল কুসুমাবৃত সুরম্য রাজবর্ত্ম ; ইহা ঝটিকা-প্রহত ভীতিপ্রদ সমুদ্রবক্ষ নহে, ইহা অমর-বাঞ্ছিত পীযূষপ্রবাহী মন্দাকিনী নির্ঝর। আমরা সরস্বতীর শান্তি নিকেতনে শান্তি লাভের আশায় আপনাদিকে আহ্বান করিয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য সেবা আবশ্যক বটে, কিন্তু সম্মিলনের আবশ্যকতা কি ? নীরবে নির্জ্জনে কি এ সেবা হইতে পারে না ? আড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন কি তাহা একবার পশ্চাতে, বিলুপ্ত গৌরব প্রচীন ভারতের দিকে, আর একবার সম্মুখে, নবীন গৌরবোন্নত ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানালোক অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, আধুনিক ইউরোপে জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত, অবারিত। ফল দেখিতেই পাইতেছেন। সহজে জ্ঞানের বিস্তার, সহজে পরস্পরের হৃদয়ের ভাব বিনিময়, করিতে হইলে সকলে একত্র মিলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে যে দীক্ষা শিক্ষা ও সাধনা আবশ্যক, তাহা এক সঙ্গে হইতে পারে না, আগে দীক্ষা তার পর শিক্ষা এবং সর্ব্বশেষে সাধনা ইহাই নিয়ম। প্রথমত দীক্ষা ও শিক্ষা ব্যতীত সাধনা হয় না। আবার দীক্ষা ও শিক্ষা, অন্যের সাহায্য সাপেক্ষ। অন্যের সাহায্য আবশ্যক হইলে তাহার সহিত মিলিত হওয়াও প্রয়োজন। সুতরাং সম্মিলনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়াই ইউরোপে সম্মিলনের এত বাহুল্য, এবং বাহুল্য বলিয়াই ইউরোপ আজ এত উন্নত।

এখন বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই একটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের ভাষা অতি প্রাচীন না হইলেও একেবারে নূতন ভাষা নহে। পূর্ব্বে যখন বৈষ্ণব কবিদিগের ললিত মধুর পদাবলী এবং কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় কোবিদগণের গ্রন্থাদি ব্যতীত অধিক সংখ্যক

সুপাঠ্য গ্রন্থ এ ভাষায় আছে বলিয়া জানা ছিল না, তখন লোকের ধারণা ছিল আমাদের ভাষা কেবল ঐ শ্রেণীর ললিত মধুর পদাবলীরই উপযোগী। কিন্তু কবি হেমচন্দ্রের তুর্য্যনিনাদ সে ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে, আমাদেরই জীবনকালের মধ্যে দেখা গিয়াছে আমাদিগের মধ্যেই অনেকে বলিতেন বাঙলার আবার পড়িব কি? বাংলা ভাষায় পড়িবার শিখিবার কি আছে? অনেকে মাতৃভাষাকে একটু ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন; কেহ কেহ মাতৃভাষার আলোচনা করা যেন একটু অপমানজনকও মনে করিতেন বলা বাহুল্য এই ভাব আমাদের অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ। কিন্তু সুখের বিষয়, এখন স্রোত ফিরিয়াছে, এখন বাঙালী বুঝিয়াছে বাংলা ভাষার উন্নতি ভিন্ন বাঙালী জাতির উন্নতি নাই। মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে বাঙালী এখন বদ্ধপরিকর হইয়াছে, সুখের দিন আসিতেছে। কালের কঠোর শাসন দণ্ডের নির্ম্মম আঘাতে যে মঙ্গলঘট চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছিল আবার তাহা সংস্থাপিত হইয়াছে। আপনারা যথাযোগ্য উপায়ে পূজার আয়োজন করুন। দেশ দেশান্তরের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সকল মহামূল্য রত্ন আছে, তাহা আহরণ করিয়া নিজের মাতৃভাষাকে সজ্জিত করুন; এ অপহরণের জন্য দণ্ডনীয় হইতে হইবে না। নিজ গৃহে অন্ধকারের আবরণে কত অমূল্য মণিমুক্তা লুকায়িত রহিয়াছে, উদ্ধার করিয়া আদর করিয়া মাতার কণ্ঠে ভূষিত করুন। পশ্চাৎপদ হইবেন না; হইলে, চিরকাল অন্ধকারেই থাকিতে হইবে। কি কি উপায়ে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহা আপনারা বিশেষ বিবেচনার সহিত পর্য্যালোচনা করিবেন। কারণ উপায় বা পন্থা ঠিক না হইলে বিপদের সম্ভাবনা, অবনতির আশঙ্কা; কিছু পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্য খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রধানতঃ তাহাদের প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য বাংলা গ্রন্থাদি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে, সেই সকল গ্রন্থে যে প্রণালীর ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ের সাহিত্য সেবকগণ ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। আমি সেই প্রচারকগণের যত্ন ও উদ্যমের যথেষ্ট প্রশংসা করি; কিন্তু বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহাদের সেই সময়ের প্রণীত গ্রন্থাদির ভাষা এখন অপাঠ্য। সুখের বিষয় বাংলা ভাষা এখন সে শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ স্থানে বলিতে হইতেছে যে অধুনা শিক্ষা বিভাগের পাঠ্য স্বরূপ যে রাশি রাশি বাংলা গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অনেক গুলির ভাষাদি দেখিয়া আবার আমাদিগকে ব্যথিত ও চিন্তাযুক্ত হইতে হইয়াছে। ভরসা করি আমাদের সাহিত্য রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় মহাত্মাগণের দৃষ্টি সে দিকে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইবে।

কাহারও কাহারও মুখে এখনও শুনিতে পাই, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ভালরূপে লিখিত হইতে পারে না।

কথাটী আমার নিকট সম্পূর্ণ অসার বলিয়া বোধ হয়। আমার বোধ হয়, দোষ ভাষার নহে, দোষ লেখকের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব কবিগণের ললিত মধুর পদাবলী পড়িয়া যেমন অনেকে একদিন বলিতেন বংলা ভাষায় ওজস্বিনী কবিতা সম্ভবপর নহে, তেমনই এখন আবার অনেকে বলিতেছেন বাংলা ভাষা :বিজ্ঞান দর্শনাদির উপযোগী ভাষা নহে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের ভাষায় তেজ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই দেশের সাহিত্যিক মহানুভবগণের লেখনী হইতে এই ভাষায় বিজ্ঞানের স্রোতও প্রবাহিত হইবে এবং উপরোক্ত ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা প্রমাণীকৃত হইবে।

আর একটী কথা বলিতে চাই। ভরসা করি, এবার রাজনৈতিকগণ, ঔপন্যাসিকগণ ব্যবহারাজিবগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন; কারণ কথাটী তাঁহাদের নিকট হয়ত প্রীতিপ্রদ হইবে না। আমরা দেখিতে পাইতেছি আজ কাল বাঙলা ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইতেছে,তাহার অধিকাংশ হয় রাজনৈতিক প্রবন্ধ, না হয় ডিটেক্‌টিভের গল্প বা সেইরূপ একটা কিছু। আমি এরূপ বলিতেছি না যে ঐ সকলের আবশ্যকতা নাই। এরূপ লেখকেরা তাঁহাদের আপনাদের কার্য্য করুন, তাহাতে আমার, কিছু আপত্তি নাই; সংসারে যিনি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছেন তিনি তাহা করিবেন। কিন্তু আমার কথা এই যে, কেবল এক অঙ্গের পুষ্টিসাধনেই যত্নবান হইলে সমস্ত শরীর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না বরং তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। কেবল উপন্যাস বা রাজনীতি লইয়া বসিয়া থাকিলে, অন্যান্য অনেক অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুশীলনের অবকাশ থাকে না। আজকাল মাসিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক দৈনিক সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতেই হয় রাজনীতির না হয় উপন্যাসের গন্ধ। এবং তাহার এতই ছড়াছড়ি যে সুবাসিত কেশতৈলের বিজ্ঞাপন প্রচার উপলক্ষেও উহারই অবতারণা হইতেছে। হউক; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব কোথায়? জীবন চরিত কোথায়? জাতীয় উত্থান পতন উন্নতি অবনতির বিবরণ সকল কোথায়? ধ্বংসের ভিতর দিয়া আবার নূতন সৃষ্টির প্রবাহ কিরূপে নিঃসৃত হয় তাহার নিগূঢ় তথ্য সকল কোথায়? দর্শন কোথায়? ন্যায় কোথায়? বিজ্ঞান কোথায়? শিল্প কোথায়? আশা করি যখন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তখন পূজা সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন হইবে।

আর একটী কথা বলিয়াই শেষ করিব। কথাটী উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধে নহে, আমাদের সাহিত্য-সমিতি সম্বন্ধে। কথাটী একটু দুঃখেরও বটে, কেহ কেহ আমাদিগকে প্রতিযোগিতা করা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিতে চান, শুনিতে পাই।

প্রতিযোগিতা ভাল কি মন্দ তাহা আদৌ বিচার করিব না, প্রতিযোগিতা স্থল বিশেষে ভাল, স্থল বিশেষে মন্দ হইতে পারে। কিন্তু কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নহে। বিশেষত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে যে সমস্ত উপকরণ থাকা আবশ্যক, আমাদের তাহা কিছুই

নাই। যাহার ক্ষমতা নাই, সে আবার প্রতি যোগিতা করিবে কি দিয়া? আমরা শিক্ষা লাভ করিতে চাই, জ্ঞান লাভ করিতে চাই। আমাদের পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা এই রূপ সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের অনুগামী, পদাঙ্ক অনুসরণকারী। বিশেষ কারণ জন্য একটু পৃথক হইলেও তাঁহাদেরই একজন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা অনেক আশা করি। অকৃতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুণবান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের যে স্নেহ ভালবাসা উৎসাহ ও সাহায্য প্রত্যাশা করে, আমরা তাহাই তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করি; এবং ভরসা করি, সেজন্য উপেক্ষা ও অবহেলার পাত্র হইব না। আর আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা তাঁহাদের কোন রূপ সাহায্য করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। যদিও আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্রশক্তি, তথাপি মনে হয় এক দিন ক্ষুদ্র প্রাণী কাষ্ঠ বিড়াল দ্বারাও সাগরবন্ধন রূপ মহৎ কার্য্যের কথঞ্চিত সাহায্য হইয়াছিল।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি পুনরায় আমাদের ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এখন উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমাদের এস্থান ক্ষুদ্র বটে কিন্তু অতি প্রাচীন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পুরাণে স্বচ্ছসলিলা করতোয়ার তীরবর্ত্তী "লোহিনী" মৃত্তিকাময় যে দেশের উল্লেখ আছে, এ সেই দেশ। এ দেশে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের অনেক ভগ্নাবশেষ চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নগরের তিন ক্রোশ মাত্র উত্তরে সুবিস্তৃত মহাস্থানগড় এখনও মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। যে ভূখণ্ডে পবিত্র সতী দেহের বাম গুল্‌ফ বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই ভূভাগ ইহার দক্ষিণে; পশ্চিমে মঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে বাদলস্তম্ভ নামধেয় অতীতের এক প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে, অনেকে তাহাকে অশোকস্তম্ভ বলিয়াও অনুমান করেন। তদ্ভিন্ন অগণ্য দীর্ঘিকা, অসংখ্য স্তূপ, মনোহর কারুকার্য্য বিশিষ্ট দেব দেবীর মূর্ত্তি,কত ভগ্নাবশেষ চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমস্তই এ দেশের প্রাচীনতা সপ্রমাণ করিয়া অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই ভূমিই পণ্ডিতবর গদাধর; পুণ্যময়ী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবাণী, কবি জীবন মৈত্রেয় প্রভৃতির প্রসূতি। আজ সমস্তই বিধ্বস্ত। আর কিছুই নাই, আছে কেবল অতীত গৌরবের বিলুপ্ত প্রায় স্মৃতি। আজ সেই পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে, প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির এক প্রান্তে, সেই সমস্ত অতীত গৌরবের শ্মশানক্ষেত্রে, স্তূপীকৃত চিতা ভস্মের নিকট দাঁড়াইয়া, সেই ভস্ম রাশি উপহার দিয়া আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আসুন, নষ্ট রত্ন সকল উদ্ধার করুন। নির্ব্বাক শিলাখণ্ডের মধ্য হইতে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করুন; জীর্ণ ইষ্টক স্তূপের অভ্যন্তরে প্রোথিতা, কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্টা শিল্পবিদ্যার সজীবতা সম্পাদন করুন। ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া, একাগ্রতার সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। যাঁহার ইচ্ছানুসারে এই অনন্ত বিশ্ব রাজ্য রক্ষিত শাসিত ও পরিচালিত, যাঁহার ভ্রূভঙ্গে কোটি কোটি ধ্বংস, কোটি কোটি সৃষ্টি,প্রতি-

নিয়ত সংসাধিত হইতেছে, তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া মাতৃভাষার উন্নতির চেষ্টা করুন; চেষ্টা ফলবতী হইবে। আমাদিগের অনাদৃতা মাতৃভাষা অচিরে পূর্ণাবয়বে, পূর্ণগৌরবে, সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করিবেন; তাঁহার বিমল অলোকে দিগদিগন্তর, দেশ দেশান্তর, উদ্ভাসিত হইবে। আমরাও সেই আলোকে বসিয়া আত্মোন্নতি ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিব। আপনাদিগের নিকট আমাদের ক্ষুদ্র সমিতির এই বিনীত নিবেদন

শ্রীবেণীমাধব চাকী।

নীলকণ্ঠ।

(উপন্যাস)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখন একবার প্রবাসী নীলকণ্ঠের তত্ত্বটা লইতে হইতেছে। পরগণায় গিয়া তিনি যে বহু চেষ্টায় বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন সে সংবাদ ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে পাওয়া গিয়াছে সম্প্রতি তিনি জমাবন্দীর কার্য্যে ব্যস্ত। দুই মাস পরগণায় আছেন, আরও অন্ততঃ এজন্য দুই মাস থাকার প্রয়োজন। কর্ত্তব্যের গুরু ভার মাথায় লইয়াছেন সুতরাং কার্য্যটী সুসম্পন্ন না করিয়া ত ফিরিতে পারিতেছেন না। কিন্তু মন তাঁর গৃহ পানে ছুটিয়াছে; আসিবার দিনে ষোড়শীর সেই বিষণ্ণ বদন, ছলছল নয়ন, যখনই তাঁর মনে পড়ে, তখনই কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন শিথিল হইয়া আসে, গৃহে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া উঠে! কিন্তু আবার মন স্থির করেন। প্রথম প্রথম আসিয়া ষোড়শীর পত্র খুব ঘন ঘন পাইতেন, প্রতি পত্রেই শীঘ্র গৃহে ফিরিবার নিমিত্ত তাগিদ থাকিত। কিন্তু তার পর ক্রমে পত্রের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছিল। সে সকল পত্রও নিতান্ত সংক্ষেপ, নীলকণ্ঠ বুঝিলেন ষোড়শী অভিমান করিয়াছে; সে, তা ত করিতেই পারে! ছেলে মানুষ, একাকী রাখিয়া আসিয়াছি, ফিরিতেও বিলম্ব হইতেছে। হায়! "পরসেবা", এই সকল ভাবিয়া নীলকণ্ঠ ষোড়শীকে সান্ত্বনা করিয়া পত্র দিতেন। নীলকণ্ঠ যখন জমাবন্দীতে বন্দী হইয়া আছেন সে সময় সহসা এক দিন একখানি পত্র পাইলেন; ষোড়শীর সেই পত্র! নীলকণ্ঠ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ষোড়শীর অমন অনুরোধ, উহা কি অবহেলা করিবার? কিন্তু ষোড়শী অমন করিয়া পত্র লিখিল কেন? ছেলে মানুষ একা একা আর থাকিতে পারিতেছে না, বুঝি তাই এ পত্র। তখন তিনি তাড়াতাড়ি কয়েক জন প্রধান প্রধান প্রজাদের ডাকাইয়া তাহাদের রশদের

মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়াইতে স্বীকৃত হইয়া, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আরব্ধ নিরীখ বৃদ্ধি শেষ হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া গেলেন, শেষে স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে যথোচিত উপদেশ দিয়া ষোড়শী-বল্লভ, বল্লভপুর অভিমুখে রওনা হইলেন, বলিয়া গেলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ তেমন অগ্রসর হইতেছেনা বুঝিলেই, তিনি আবার আসিবেন।

ষোড়শী তাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছেন আজ সহসা বিনা সম্বাদে তিনি যখন ষোড়শীর সম্মুখে উপস্থিত হইবেন তখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—বিষ্ণু! বারি বরিষণে তৃষিতা চাতকিনী ষোড়শী কতই না পুলকিতা হইবেন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি গভীর, মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণবর্ণ আকাশ গুর গুর গুরুম, চড়, চড়, চড়াৎ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে, বায়ু স্বনিয়া স্বনিয়া প্রবলবেগে হু-হু-হু বহিতেছে, বৃক্ষশাখা সোঁ-সোঁ-সোঁ ঘন অন্দোলিত হইতেছে। চঞ্চলা চপলা থাকিয়া থাকিয়া চকিত প্রভায় চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে.—প্রকৃতির কি ভীষণ মূর্ত্তি! যেন কৃষ্ণা করালবদনা কালিকা প্রলয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীম গর্জ্জনে সশস্ত্র কর চতুষ্টয় প্রসারণ করিয়া অসুর দলনে অবতীর্ণা—তাঁহার সেই বিদ্যুৎ-বরণ-লোল-জিহ্বা যেন লক্ লক্ খেলিতেছে।

ভীত চকিত জনগণ আপনাপন গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু ষোড়শীর মন বড় চঞ্চল, সে হৃদয়ে ভয়ের লেশ মাত্রও নাই সে যেন কাহার আশায় পথ চাহিয়া আছে, এই ঘোর দুর্য্যোগেও সে একবার ঘর এক বার বাহির করিতেছে। বায়ু বহে, গাছ নড়ে, সে ভাবে—কে যেন তাকে ডাকিতেছে, তখন অমনি বাহিরে ছুটিয়া আসে, কৈ কেহত নয়! এমনই করিয়া কতক্ষণ বহিয়া গেল, কেহ আসিল না, মুষলধারে বৃষ্টি আসিল, ষোড়শী তখন অগত্যা দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহে আশ্রয় লইল। কিন্তু শয়ন করিল না, যদি এখনও সে আসে; কিন্তু তবু কেহ আসিল না! হায় নিঠুর! দুপ্, দাপ, দুপ্ কে আসে ঐ? শেষে সত্যই যে, কে ষোড়শীর দ্বারে আঘাত করিল, ডাকিল, ষোড়শী, ষোড়শী ষোড়শী।

তবেত সে ভাল বাসে, এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া, এই অন্ধকারে পিচ্ছিল পথে, ভিজিতে ভিজিতে সে ত এসেছে, তবেত সে সত্যই ভাল বাসে! তখন ষোড়শীর সেই স্ফীত বক্ষ আনন্দে গর্ব্বে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, "তবে নিদয়, মনে কি পড়েছে তোমার" উচ্চ কণ্ঠে আবার সেই ডাক,—ষোড়শী, ষোড়শী, ষোড়শী! কে ডাকে ওই, কার স্বর এ।

"এ ত বুঝি নহে শ্যাম রায়" তবু সে আগ্রহে ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিল "তুমি অ্যাঁ তুমি! ষোড়শীর মুখে আর কথা সরিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ দীর্ঘ প্রবাসের পর আজ গৃহের দ্বারে উপস্থিত। নীলকণ্ঠের আসার সংবাদ কেহ জানিত না সুতরাং ষ্টেশনে তার জন্য কোন বন্দোবস্তও ছিল না, রাত্রিতে নীলকণ্ঠ যখন ষ্টেশনে নামিলেন—আকাশের অবস্থা তখনও ভাল

ছিল না। দুর্য্যোগের সূচনা তখন হইতেই হইতেছিল, সকলে নীলকণ্ঠকে সে রাত্রিটা ষ্টেশনেইঃবাস করিতে বলিল। স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টারও অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ সে অনুরোধ কাণে তুলিলেন না, পাল্কী বা গাড়ী কিছুই মিলিল না, তবু নীলকণ্ঠ একমাত্র লোক সঙ্গে, পদব্রজে রওনা হইলেন, দ্রব্যাদি সব ষ্টেশনে পড়িয়া রহিল, কেবল তাঁহার অন্ধের যষ্টী, ষোড়শীর অধিক প্রিয় সেই অহিফেনের কৌটাটী লইতে ভুলিলেন না। "মৌতাতের" সময় সরিষা তোর অহিফেন বিরহে চক্ষে যে সরিষার ফুল দেখিতে হয়! পথে আসিতে আসিতে মেঘের গতিক ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল, সঙ্গী আলোকধারী পাইক বলিল, "কর্‌তা, সাম্‌নে ঐ 'বামুণবেড়ে' আজ "আত্তিরটে" ওখানে "পরবাস" করলে হয় না। "ঢ্যাবতা" যেন "কান্না ক্যান্না ক'চ্চে" সে কথাও নীলকণ্ঠের শ্রবণে পশিল না। বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল, ঝড় আসিতে না আসিতে পাইকের হাতের 'হ্যারিকেন' নিবিয়া গেল—কিন্তু তবু নীলকণ্ঠ চলিলেন, ষোড়শীর বদন চন্দ্রিমার কল্পিত প্রভায় পথের অন্ধকার দূর করিয়া দিল। ঝম্, ঝম্, ঝম্ মুষলধারে বৃষ্টি, তবু ছত্রহীন নীলকণ্ঠ ভিজিতে ভিজিতে চলিলেন—ষোড়শী যে তাঁর 'বরিষার ছত্র'। আর পথে দুই একবার আছাড়ও খাইলেন, কিন্তু সে ব্যথা গায়ে লাগিল না। কারণ এ সব যে ষোড়শী-স্বর্গ লাভের সোপান! "দীন যথা ধায় দূর তীর্থ দরশনে" নীলকণ্ঠ আথি বিথি ষোড়শী সন্দর্শনে ছুটিয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠের ন্যায় 'পাইক' বেচারার কোন চুম্বকের আকর্ষণ ছিল না—তাই তার পা আর উঠিতে চায় না!

এইরূপে আর্দ্রবস্ত্রে, বিক্ষতচরণে গভীর রাত্রে নীলকণ্ঠ গৃহে পৌঁছিলেন, নীলকণ্ঠ উপস্থিত হইয়া যেন গলিয়া গেলেন, বৃষ্টিতে নহে, আহ্লাদে! সম্মুখে ষোড়শীকে দেখিয়া! ষোড়শীকে তখন বলিলেন 'ভাল ছিলে' "হুঁ"—ষোড়শী বড় অন্যমনস্ক—আর কিছু বলিল না, যুবতী ভার্য্যার অভিমান কি সুন্দর!

গৃহতলে সুচারু আসন বিস্তৃত, রূপার থালে বিবিধ আহার্য্য সুবিন্যস্ত, সুগন্ধ কক্ষ দীপালোকে উদ্ভাসিত,রূপসী ষোড়শী সজ্জিত, তবে কি ষোড়শী পূর্ব্বাহ্নে তাহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়াছিল—অথবা কে জানে সতীর মন বুঝি অন্তর্য্যামী, শ্মশানে শ্রীমন্ত কাঁদে আর কৈলাসে সতীর মন উচাটন হয়! ঐ যা, নীলকণ্ঠের উপমাটা যে কেমন তর বেতর হইল।

যাহা হউক নীলকণ্ঠ প্রথমত একটু ইতস্ততে পড়িয়াছিলেন, শেষে বুঝিয়া ফেলিলেন, ষোড়শী তাঁকে পত্র লিখিয়া তাঁর আসিবার দিন অনুমানে স্থির করিয়াছে!

ষোড়শী বিনা বাক্যব্যয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য বস্ত্র বাহির করিয়া দিল, মাথা মুছিবার জন্য গামছা দিল, পা ধুইবার জল দিল কিন্তু তবু অন্যমনস্ক! এও বুঝি মানের জের, বৃদ্ধ হাত পা ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সেই আসনেই বসিলেন—আহ্নিক সমাপন করিলেন—আর কথা বলিতে বলিতে কতকটা যেন অজ্ঞাতসারে আহারে মনোযোগ দিলেন। এ যে নানাবিধ আয়োজন! নীলকণ্ঠ ষোড়শীকে দেখিতে দেখিতে অতি আরামে আহার করিতে লাগিলেন। ক্রমশ

ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নাস্তিক দর্শনের মত

নাস্তিক দর্শন সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটি মোটামুটি মত ভিন্ন আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, এবং জানিবারও কোন উপায় নাই। যে কয়টি মত সাধারণে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে দুই একটি ভিন্ন অপর গুলির সর্ব্বাঙ্গীণ যুক্তি আমরা জানিতে পারি না। নাস্তিকবাদিগণ শেষে যে সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, তাহারই কিয়দংশমাত্র আজকাল প্রচলিত আছে। বেদবাদিগণের গ্রন্থে যে যে নাস্তিকবাদ উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা দ্বারা সর্ব্বাংশে তাহা জানা যায় না, সাধারণতঃ তাহার দুর্ব্বল অংশগুলিই ঐ সকল গ্রন্থে খণ্ডন করিবার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি কোন দিন সম্পূর্ণ মূল বার্হস্পত্য সূত্র বা জাতীয় অপর কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়, তবেই নাস্তিকদর্শনের মতামত সমূহ বিশেষরূপে জানা যাইবে, নতুবা তাহার আর কোন আশা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

তথাপি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ও অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থে তদ্বিষয়ে যাহা জানিতে পারা যায়, নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিলাম।

'রামায়ণে'১ জাবালি রামচন্দ্রকে নাস্তিকবাদ অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার একটি চিত্র প্রকাশ পায়, এবং এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

"ভাল রাম, তুমি আর্য্যবুদ্ধি ; সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। কে কাহার বন্ধু ? কোন ব্যক্তিরই বা কোন সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে ? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে ও একাকী বিনষ্ট হয়। অতএব যে ব্যক্তি মাতা পিতা বলিয়া আসক্ত হয়, সে উন্মত্ত, কেন না কেহ কাহারো নহে। যেমন কোনো লোক প্রবাসে গমন করিবার সময় গ্রামের বহির্দেশে বাস করে ও পরদিন সেই আবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, পিতা মাতা গৃহধনও সেইরূপ আবাস মাত্র ; হে কাকুৎস্থ, সজ্জনগণ ইহাতে আসক্ত হন না। অতএব তুমি পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিষম বহুকণ্টকাবৃত দুঃখজনক কুপথে গমন করিবার যোগ্য নও। তুমি সমৃদ্ধ অযোধ্যায় নিজেকে অভিষিক্ত কর। সেই একবেনীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। হে পার্থিবাত্মজ, তুমি অযোধ্যায়

১। অযোধ্যা ২।১০৮।

মহার্হ ভোগ সকল অনুভব করিয়া দেবলোকে শক্রের ন্যায় বিহরণ কর। দশরথ তোমার কেহ নহেন, এবং তুমিও তাঁহার কেহ নও, সেই রাজা অন্য, তুমি অন্য। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা কর। জন্তুর জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্ত মাত্র, ঋতুমতী মাতাতে যে শুক্র-শোণিত সংযুক্ত হয়, তাহাতেই লোকের জন্ম হইয়া থাকে। সেই নৃপতি (দশরথ) যেখানে যাইবার গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের (স্বাভাবিক) প্রবৃত্তি। কিন্তু তুমি বৃথা বিনষ্ট হইতেছ! যে যে ব্যক্তি অর্থের জন্য ধর্ম্মপরায়ণ হয়, আমি তাহাদের জন্য শোক করি তাহারা এখানে দুঃখ ভোগ করে ও মরিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অনর্থক অন্ন নষ্ট করা হয়। যে মরিয়া গিয়াছে, সে আর কি খাইবে? যদি এখানে এক জন ভোজন করিলে তাহা অন্যের শরীরে যায়, তবে প্রবাসী ব্যক্তির জন্য শ্রাদ্ধ করাই উচিত, এবং পথে তাহার কিছু ভোজন করা সঙ্গত নহে! যে সকল গ্রন্থ বলিয়া থাকে যে, "যাগ কর দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, ও ত্যাগ কর" নিশ্চয়ই, মেধাবিগণ লোককে দানক্রিয়ায় বশীভূত করিবার জন্য সেই গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন। হে মহামতে, তুমি এই বুদ্ধি কর যে, পরে আর কিছুই নাই; যাহা প্রত্যক্ষ দেখ তাহা গ্রহণ কর, এবং পরোক্ষকে পশ্চাতে রাখ। অতএব ভরত তোমাকে প্রসাদিত করিয়েছে, তুমি সর্ব্বলোকের নিদর্শন স্বরূপ সজ্জনগণের বুদ্ধিকে পুরস্কৃত করিয়া রাজ্য গ্রহণ কর।

মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নাস্তিক মতের সংগ্রহ স্বরূপ কতকগুলি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নাস্তিক মত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

"স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, পারলৌকিক আত্মা নাই, এবং বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ক্রিয়া-সমূহও ফলদায়ক নহে।

"অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড ২ ভস্ম গুণ্ঠন এই সমুদয়কে, বিধাতা বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন ব্যক্তিগণের জীবিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

"পশু যদি জ্যোতিষ্টোমে নিহত হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করে, তবে যজমান সেখানে নিজের পিতাকে বধ করেন না কেন?

"শ্রাদ্ধ যদি মৃত পুরুষগণেরও তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে যে সকল লোক স্থানান্তরে গমন করে, তাহাদের পাথেয় গ্রহণ করা ব্যর্থ? দান করিলে স্বর্গস্থিত পুরুষেরাও যদি তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, তবে যে সকল লোক প্রাসাদের উপরে থাকে তাহাদের জন্য এখানে (অর্থাৎ নীচে) খাদ্য দেওয়া হয় না কেন?

"যতকাল বাঁচিবে সুখে বাঁচিবে। ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে, ভস্মীভূত দেহের আবার আগমন কোথায়?

"যদি এ (জীব) দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধু স্নেহে

২। "এয়ো দণ্ডা যত্র তৎ ত্রিদণ্ডং পাশুপতব্রতম্"— ইতি নৈষধ টীকা ১৭।৩৯,

সমাকুল হইয়া আবার আগমন করে না কেন?"

অতএব ব্রাহ্মণেরা ইহা জীবিকার উপায় করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তিগণের প্রেতকার্য্য করিতে হইবে, নতুবা ইহার অপর কোন প্রয়োজন নাই।

"বেদের কর্ত্তা তিন জন—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর, কেন না, 'জর্ভরী' 'তুর্ভরী' ইত্যাদি পণ্ডিতের কথা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ৩।

"ইহাতে (বেদে) উক্ত হইয়াছে যে (যজমান) পত্নী অশ্বে * * গ্রহণ করিবেন। ৪ (অতএব ইহা ধূর্ত্তের রচনা)। ভণ্ডের ও সেইরূপ (উত্তম গ্রহণীয় বস্তু সমূহকে দেয় বলিয়া) পাঠ করিয়াছে এবং নিশাচরগণ কর্ত্তৃক মাংস ভোজন উক্ত হইয়াছে।"

বেদবাদিগণের প্রতি এই সকল কথা যে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। নৈষধ চরিতে (১৭ সর্গে) এতাদৃশ বহু কথা আস্তিক-বাদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে। বেদ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বৈদিকগণকে এতাদৃশ ভাল মন্দ অনেক কার্য্য দ্বারাই তীব্র উপহাস করিতে পারেন।

উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে নাস্তিকবাদের মত অনেকটা জানা গিয়াছে এখন নাস্তিক-বাদের দর্শনাংশ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, নাস্তিকবাদে এই সমস্ত রহিয়াছে;—

১। (ক) বেদের প্রামাণ্য স্বীকার,
(খ) প্রচলিত অন্যান্য শাস্ত্রের ও
(গ) আশ্রম-ধর্ম্মের উল্লঘন,
২। পরলোক অস্বীকার,
৩। ঈশ্বর অস্বীকার
৪। দেহাত্মবাদ,
৫। সর্ব্বত্র সন্দিগ্ধতা ও
৬। প্রত্যক্ষেরই একমাত্র প্রমাণতা।৫

দেখা যাউক এ বিষয়ে নাস্তিকবাদিগণের কিরূপ যুক্তি আমরা পাইয়া থাকি।

দেহাত্মবাদ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—চৈতন্য বিশিষ্ট এই দেহই আত্মা; ইহা ভিন্ন অপর আত্মার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। আমরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণ মানি না, এবং মানিবার কারণ ও দেখি না। পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্নি এই চারি ভূত একত্র সংসৃষ্ট হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। এক একটী ভূতে পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাদের সম্মিলনে চৈতন্য জন্মিতে পারে, যেমন মদ্য বীজ (যাহা হইতে মদ্য উৎপন্ন হয়) সমূহ পৃথক

৩। অর্থাৎ যদি পণ্ডিতের কথা হইত তাহা হইলে ঐরূপ অপার্থক বাক্য বেদে প্রযুক্ত হইত না। শবর স্বামী বেদের অর্থবত্ত্ব প্রতিপাদনের সময় (মীমাংসা দর্শন, ১, ২, ৩৮, ৩৯) পূর্ব্বপক্ষের মধ্যে এই শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার সমাধানও করিয়াছেন। 'জর্ভরী' অর্থ 'ভর্ত্তারৌ' এবং 'তুর্ফরী' অর্থে 'হন্তারৌ'। ইহা ঋগ্বেদে আছে।

৪। ইহা অতি অশ্লীল। অশ্বমেধ প্রকরণে ইহার বিধান আছে; দ্রষ্টব্য—শতপথব্রাহ্মণ; ১৩, ৫, ২, ২; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র,২০, ৬, ২৫—১৬।

পৃথক থাকিলে তাহাতে মদশক্তি উৎপন্ন হয় না কিন্তু তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলে মদশক্তি জন্মায়, ভূত সমূহ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তিও সেইরূপ। দেহ আত্মা বলিয়াই আমরা বলিয়া থাকি—"আমি গৌর" বা "আমি কৃষ্ণ।" গৌর বা কৃষ্ণ কে? এই দেহই নহে কি? অতএব দেহই আত্মা।

বলিতে পারা যে যদি দেহই আত্মা হয়, তবে "আমার দেহ" এই জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? দেহই যদি "আমি" (আত্মা) হয় তবে সে ওরূপ কথা বলিতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, সেখানে যদিও "আমি" ও 'দেহে' বস্তুত কোন ভেদ নাই, তথাপি একটা কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়া ঐরূপ বলা হইয়া থাকে। যেমন "রাহুর মস্তক;" রাহু ত কেবল মস্তক মাত্র, সেখানে "রাহুর মস্তক" কিরূপে বলা চলে? আরও, তোমরা বলিয়া থাক "পুরুষের চৈতন্য;" বস্তুত যে পুরুষ সেই চৈতন্য, তবে কি প্রকারে তোমরা অভেদ স্থানেও এইরূপ ভেদ ব্যবহার করিয়া থাক? অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাদৃশ স্থলে উপচারিক বা কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়া ঐরূপ ব্যবহার করা হয়। "আমার শরীর," এ ব্যবহারও সেইরূপ উপচারিক।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষের বা পুরুষ প্রয়োজনের মধ্যে নাস্তিক-বাদে অর্থ ও কামই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। স্রকচন্দন-বনিতাদির সম্ভোগ-জনিত সুখের নামই কাম। যদিও এতাদৃশ সুখ সম্ভোগে সময়ে সময়ে দুঃখ সংযোগ আছে, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। যেমন কেহ মৎস্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার শল্ক (আঁস) কণ্টক প্রভৃতি বর্জ্জনীয় অংশ বর্জ্জন করিয়া মাংস মাত্র গ্রহণ করে, অথবা যেমন কোন তণ্ডুলাদি পলাল (পোয়াল) ও তুষ-যুক্ত ধান্য আনিয়া পলাল ও তুষ পরিহার পূর্ব্বক তণ্ডুল গ্রহণ করে, সেইরূপ সুখার্থী ব্যক্তি সুখদুঃখ-মিশ্রিত বিষয় হইতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখ গ্রহণ করিবে। দুঃখ আছে এই ভয়ে সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভিক্ষুক আসিতে পারে এই ভাবিয়া কি পাক করিবার জন্য হাঁড়ী চাপান হয় না? যদি কোন ভীরু দুঃখ দেখিয়া সুখকে পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুর ন্যায় মূর্খ! দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া যে ব্যক্তি বিষয় সুখকে বর্জ্জনীয় মনে করে, তাহার তাহা মূর্খ বিচার! কোন মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তুষকণা-চ্ছাদিত ধবলোত্তম তণ্ডুলশালী ব্রীহিসমূহকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে?

অগ্নিহোত্রাদি পারলৌকিক ফলপ্রদ কর্ম্মের কোন প্রামাণ্য নাই। ঐ সমস্ত কর্ম্ম অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তাদি দোষদুষ্ট। বিশেষত বৈদিকম্মন্য ধূর্ত্তবকগণ পরস্পরই ঐ সমস্ত কার্য্যকে খণ্ডিত করিয়াছেন; জ্ঞান-কাণ্ডবাদী কর্ম্মকাণ্ডকে, এবং কর্ম্মকাণ্ডবাদী জ্ঞানকাণ্ডকে নিন্দা করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল শাস্ত্র সুন্দ উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিজেই পরাহত!

* পূর্ব্বোক্ত রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত অংশে—"প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু," অযোধ্যা ১০৮,২৭।

অতএব কণ্টকবেধাদিজন্য দুঃখই নরক; অপর কোন নরক নাই। লোক প্রসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর; অপর কোন ঈশ্বর নাই। এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এবং কে বা এই জগৎকে এরূপ বিচিত্র করিল? ইহার মীমাংসার জন্যও ঈশ্বরকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা, স্বভাবের দ্বারাই তাহা হইয়াছে। অগ্নি উষ্ণ, জল শীত, এবং বায়ু ও শীত, কে এই সমস্তকে বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে? স্বভাবের দ্বারাই এই সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে

নাস্তিকগণ এইরূপে স্বকল্পিত ব্যবস্থার সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান শব্দ ইত্যাদি অন্যান্য প্রমাণকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করে; শাঙ্খ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি; ন্যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান এই চারিটি, এইরূপ বিশেষ বিশেষ দর্শনে অধিকাধিক প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। নাস্তিকবাদী দেখিলেন, তিনি যদি কোন প্রকারে অনুমানকে উড়াইয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহার আর কণ্টক থাকিবে না, কেননা, আর আর প্রমাণের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির প্রয়োজন হইবে, তাহা বৈশে· ষিক প্রভৃতিই প্রদর্শন করিবেন; স্বয়ং তিনি কিছু না বলিলেও পারেন। এইজন্য নাস্তিক বাদিগণকে অনুমানেরই প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বিশেষ সচেষ্ট দেখা যায়। তাঁহাদের এই বিষয় তর্কপ্রণালী অতি জটিল বলিয়া এখানে লিখিত হইল না; তবে তাঁহাদের মোটামুটি কথা এই যে, অনুমানে ব্যাপ্তি— জ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত নাস্তিকবাদের যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে ঐ মত অনুসরণ করিয়া চলিলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতে হয়, এবং তাহা হইলে নাস্তিকের সুখের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। বস্তুত একটা নিয়মের মধ্যে না থাকিলে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে না। এই জন্য, নাস্তিকবাদিগণ যদিও বহুবিধ বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া- ছেন, তথাপি একটি বন্ধন ছেদন করিতে পারেন নাই, এবং তাহার নাম নীতিশাস্ত্র। নীতি অবলম্বন করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নাস্তিকের অভিমত। ৬

গ্রীসেও এপিকুরসের প্রবর্ত্তিত নাস্তিক বাদের মধ্যে এই নীতিশাস্ত্রের স্থান বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এপিক্যুরস একস্থানে বলিয়াছেন—

"যে সর্ব্বসমক্ষে নিঃশঙ্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সকলের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিবে। যাহাদের সহিত বন্ধুতা সম্ভব নহে, অন্তত তাহাদের সহিত যাহাতে শত্রুতা না জন্মে এরূপ ভাবে যত্ন করিয়া চলিবে। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সংশ্রবে আসিবে না।" ৭

কিন্তু এপিক্যুরস যতই কেন উপদেশ

৬। "নীতি কামশাস্ত্রানুসারেণ অর্থ কামাবেব পুরুষার্থৌ।"—মাধবাচার্য্য

৭। গ্রীক ও হিন্দু।

দিন না, তাঁহার পরবর্ত্তী আরিষ্টিপুস প্রভৃতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতেও তাই—যদিও নাস্তিকবাদে নীতিশাস্ত্র অনুসরণীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি তাহার যে স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা, তাহা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, এবং করিতে পারে না।

'যত দিন বাঁচিবে সুখে বাঁচিবে'—ইহাই নাস্তিকের শেষ উক্তি, এবং শারীরিক সুখকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হয়। কেবল শারীরিক সুখকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করিলে যাহা হওয়া সম্ভব এপিকুরসের তাহা হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তিনি বলিতেন যে, যে কোন উপায়ে সুখ বা প্রমোদ লাভ করাই পুরুষার্থ, এবং তাহা যদি কোন অপকৃষ্ট বা ঘৃণিত উপায়ে করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। তিনি আরও বলিতেন—যে শারীরিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শারীরিক দুঃখ মানসিক দুঃখ অপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ এই দ্বিবিধ পদার্থ আছে; যে কোন দ্রব্য সুখজনক লোকে তাহা আহরণ করিবে, এবং দুঃখ জনক দ্রব্য পরিহার করিবে।'

উচ্ছৃঙ্খলতা যথেচ্ছাচার প্রভৃতি নিবারণের জন্যই নাস্তিকবাদিগণ নিয়ামকস্বরূপ নীতিশাস্ত্রকে অবলম্বনীয় করিয়াছেন। কিন্তু শারীরিক সুখ লাভই যেখানে চরম পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে নীতিশাস্ত্র অধিকক্ষণ স্থান পাইতে পারে না। সুখার্থীকে নীতিশাস্ত্র মানিয়া সুখলাভ করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে সুখলাভের কিছু ব্যাঘাত হইবে। একমাত্র শারীরিক সুখলাভই যখন পুরুষার্থ, এবং নীতিশাস্ত্র না মানিলেও যখন তাহা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাদৃশ সুখপ্রার্থীর নীতিশাস্ত্র অনুকরণ করিতে বোধ হয় প্রবৃত্তি হয় না, এবং তাহা না হইলে পশুস্বভাব প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব নীতিশাস্ত্রকে অনুকরনীয় বলিলেও নাস্তিকবাদ বস্তুত তাহার অনুকরণ করে না।

সম্পূর্ণ।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

কাশীরাম দাসের জন্ম স্থান।

গত বৈশাখ মাসে কাটোয়া অঞ্চলের কয়েকজন সাহিত্য সেবী বাংলা মহাভারতকার কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"বাংলা পদ্য মহাভারত প্রণেতা মহাত্মা কাশীরাম দাসের জন্মস্থান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে। যে স্থানে কবিবর ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, যে স্থানে লালিত পালিত বর্দ্ধিত শিক্ষিত হইয়াছিলেন, যে স্থানে অবস্থিতি করিয়া, আমাদের মাতৃভাষার

অতি শৈশবে গোমুখীর অমর নির্ঝরের ন্যায় ভাব-গঙ্গার পবিত্র উৎস প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই স্থান বঙ্গভাষাভাষীজন-গণের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। * * * যাঁহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বীণার মধুর ঝঙ্কার আজি প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া ধণীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত বিমোহিত রাখিয়াছে, সেই মহাপুরুষের বাসগৃহের ভিটার চিহ্ন বিলুপ্ত হইতেছে। * * * * যে স্থানে তিনি বীণাপাণির উপাসনা করিতেন, যে ক্ষুদ্র কুটীর হইতে তিনি কাব্যরসের অমিয় প্রবাহ দেশময় প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন—সেই কুটীররূপ সারস্বত-মন্দিরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য আমরা প্রয়াসী হইয়াছি। * * * এ কার্য্য অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত কঠিন। বঙ্গের প্রত্যেক নরনারীই কবিবরের নিকট ঋণী। * *

কাশীরাম দাসের স্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টায় বাঙ্গালীর নিকট এই আবেদন পত্রের ফল কি হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা পড়িতে পড়িতে অনেক কথা মনে আসিল। বাল্যকালে সুদূর পল্লীগ্রামে আমাদের এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া দ্বিপ্রহরে ছায়া-সুশীতল গৃহের বারান্দায় বসিয়া এই মহাভারত পড়িতেন এবং গ্রামের বৃদ্ধা প্রৌঢ়া এবং বধূমণ্ডলী বসিয়া শুনিতেন—পাণ্ডবদিগের বিপদে অশ্রুপাত করিতেন, সম্পদে উল্লসিত হইতেন—শৈশবের সেই পবিত্র দৃশ্য আজ যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে এবং ঘরে ঘরে বাংলার প্রিয় কবি কেমন করিয়া বাংলার নরনারীর চরিত্র গঠনে সাহায্য করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমার ত মনে হয় এই কাশীরাম দাসের জন্যই গান্ধারী, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পবিত্র চরিত্র আমাদের দেশে আজ ঘরের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের এমন আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। তাই যাঁহারা এই কবিবরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কিন্তু—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—ইহার মধ্যে আবার এক খটকা উঠিল কাশীরাম দাসের জন্মভূমি যে সিঙ্গিগ্রামে তাহার নিশ্চয়তা কি? কেহ কেহ কাশীরামের জন্মভূমি যে অন্যত্র তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাই আমরা আজ এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজকালকার এই ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের দিনে বহু পুরাতন কথাও নূতন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন বিশ্বাস আর আপনার স্থান রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এখন "ইহা বহু পুরাতন" বলিলে আমাদের কাছে তাহা যথেষ্ট বিবেচিত হয় না; পুরাতনকে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হয়। ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের ঝোঁকে আমরা পুরাতনকে উল্টাইয়া নূতন থিওরি স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি।

মহাভারতের আদি পর্ব্বের শেষাংশে কাশীরাম দাস নিজের পরিচয় দিয়াছেন,

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ নামেতে তীর্থ গঙ্গা ভাগিরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম নাম সিঙ্গিগ্রাম।*
প্রিয়ঙ্কর দাস সুত সুধাকর নাম॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা
কৃষ্ণদাসানুজ গঙ্গাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

কাশীরাম দাসের নিজ পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে ইন্দ্রাণী প্রদেশের (পরগণা) সিঙ্গিগ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। যাঁহারা কাটোয়া অঞ্চলের সহিত পরিচিত তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রাণী পরগণা দ্বাদশতীর্থ বা বারঘাট কোনটারই বিশেষ বিবরণ দিতে হইবে না। এদেশে একটি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে ;—

বারঘাট তের হাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।

কাশীরাম দাস আত্মপরিচয়ে যে দ্বাদশ তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই ঘাট। তিন ঘাট ব্যতীত বাকী সমস্তই বর্ত্তমান কালে ভাগিরথী গর্ভে বিলীন। তাঁহার উল্লিখিত ইন্দ্রাণী প্রদেশ—বর্ত্তমান ইন্দ্রাণী পরগণা।

কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গঙ্গাধর তাঁহার "জগৎ—মঙ্গল" কাব্যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

ভাগিরথী তটে বাটি ইন্দ্রাইণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥

* *

কমলাকান্তের হ'ল এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তদীয় কনিষ্ঠ দীন গঙ্গাধর দাস
জগত মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

কাশীরাম দাস নিজ বাসভূমের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার অর্থ লইয়া কোন গোল ছিল না। কিন্তু জগতমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত প্রথম দুই লাইনের অর্থ ধরিয়া সিঙ্গি গ্রাম সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে জন্য আমরা উক্ত দুইটী ছত্রের আলোচনা করিব।

আমরা সাধারণতঃ বাসস্থানের পরিচয় দিতে হইলে বলিয়া থাকি—"আমাদের বাড়ী অমুক পরগণায়, অমুক গ্রামে।" গদাধর দাসও সেই ভাবে লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের 'বাটী' ভাগিরথী তটস্থিত ইন্দ্রাণী পরগণায় সিঙ্গিগ্রামে। কিন্তু আধুনিক সমালোচক এই অর্থে সন্দিহান। গদাধর দাস যখন লিখিয়াছেন যে 'ভাগিরথী তটে বাটী' তখন ভাগিরথীর ধারে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। এদিকে সিঙ্গি গ্রাম ভাগিরথী হইতে দূরে। অতএব ইন্দ্রাণীর ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী অন্য কোন গ্রামে তাঁহাদের বাস স্থান ছিল। সিদ্দি গ্রামকেও একবারে বাদ দেওয়া চলে না। তখন 'সিঙ্গি' স্থলে 'সিদ্দি' পাঠ ধরিয়া এই কাল্পনিক গ্রামে কাশীরামের জন্মস্থান ধরিয়া লওয়া হইল। পুরাতন পুঁথির লেখাও তাঁহাদের এই কল্পনার কতকটা সাহায্য করিল কেন না পুরাতন পুঁথিতে 'ঙ্গ' এবং

* মূল গ্রন্থে কি আছে ? বঃস

'দ্দ' একই প্রকারে লিখিত হইত। অতএব এই সিদ্দিই কাশীরাম দাসের জন্মস্থান স্থির হইল।

উপরিউক্ত মত বা থিওরি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। জগতমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত প্রথম দুই লাইনের যে সহজ অর্থ আমরা লইয়াছি তাহার কি দোষ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বরং কাশীরাম দাসের লিখিত পরিচয়ের সহিত মিলাইলে দুইয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন পুরাতন অধিকাংশ পুঁথিতে 'দ্দ' এবং 'ঙ্গ' একই প্রকারে লিখিত, তখন অন্য প্রমাণের অভাবে 'সিঙ্গি' না ধরিয়া সিদ্দিই বা কেন ধরিব তাহা বুঝিলাম না; বিশেষতঃ যখন ইন্দ্রাণী পরগণায় 'সিদ্দি' বলিয়া কোন গ্রাম নাই। এক গ্রামে আছে তাহার নাম 'সিদ্ধান্তবাটী'—তাহাকে গ্রাম না বলিয়া একটা পাড়া বলিলেই হয় এবং তাহাও কোন পণ্ডিতের উপাধি অনুসারে নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়! এই সিদ্ধান্তবাটী যে বহুদিনের পুরাতন ইহাও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। তা ছাড়া সিদ্ধান্তবাটী কাশীরাম দাস ও গঙ্গাধর দাসের জন্মস্থান হইলে কোন না কোন স্থানে এই গ্রামের পূরা নাম দেখা যাইত—এমন সংস্কৃত নামের উল্লেখের লোভ সংবরণ পুরাতন কবিরা করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। এখানে বলা উচিত সিদ্ধান্তবাটীকে কেহ সিদ্দি বলে না; সিদ্দি নাম এ প্রদেশে অপরিচিত। এ সকল বিষয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি সাধারণতঃ বিশেষ প্রমাণ স্বরূপ চিরকাল গণ্য হইয়া আসিতেছে। সিঙ্গি গ্রামই কাশীরাম দাসের জন্মভূমি। সিদ্ধান্তবাটী বা সিদ্দি এ সম্বন্ধে কখনও কোন দাবী উত্থাপন করে নাই। এখনও সিঙ্গিগ্রাম ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সকল লোকই উক্ত গ্রামে কবিবরের বাস গৃহের ভিটা দেখাইয়া থাকেন এবং গ্রামের "কেশে পুকুর"টী তাঁহারই খনিত বলিয়া পরিচিত। অনেকে আবার এই জনশ্রুতিকেও অবিশ্বাস করিয়াছেন—তাঁহারা বলেন যে এ জনশ্রুতি আধুনিক—ইহার মূল আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাস গ্রন্থ;* এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গেই এ প্রবাদের উৎপত্তি—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ কথার সাপক্ষে আমরা কোন প্রমাণ পাইলাম না। ৬০।৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধদের মুখেও এই জনশ্রুতি শুনিয়াছি—এই সকল লোকের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর এবং কাহারো বিদ্যা কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অধিক অগ্রসর হয় নাই—আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাসের কথা তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিয়াছে বলিয়া কোন প্রকার সন্দেহ করিবারও উপায় নাই। তা' ছাড়া জিজ্ঞাস্য এই যে বাংলা ভাষার ইতিহাস লেখক কি কল্পনার সাহায্যে এই সিঙ্গিগ্রামে কাশীদাসের জন্মস্থান স্থির করিয়াছেন? তাঁহার এই সিদ্ধান্তের দুইটি মূল থাকিতে

* স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত

পারে। (১) কাশীরাম ও গদাধর দাসের লিখিত আত্মপরিচয়। (২) কাহারো নিকট শুনিয়া লেখা। শেষোক্ত কথা যদি ঠিক হয় তবে উক্ত লেখকের পূর্ব্বেই এই জনশ্রুতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সম্প্রতি কাটোয়া হইতে প্রকাশিত "প্রসূন" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এ আলোচনার মধ্যে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। পত্র লেখক প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ পত্রে 'সিঙ্গি' গ্রাম 'সিদ্দি' গ্রাম বলিয়া উল্লিখিত আছে। এ সকল পত্র বহু পুরাতন বলিয়া প্রকাশ। আমাদের সে সকল পত্র দেখা হয় নাই, আশা করিতেছি প্রসূন-সম্পাদক মূল পত্রের নকল এবং প্রতিলিপি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া এ আলোচনার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে সাহায্য করিবেন।

কাশীরাম দাসের বংশ যদিও নাই, কিন্তু সিঙ্গির পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠিগণ আজিও বাস করিতেছেন এবং কবিবরের পরিচয় দিয়া তাঁহারা গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন--সিদ্ধান্তবাটিতে কাশীরাম দাসের বা তাঁহাদের কোন জ্ঞাতির বাস ছিল বলিয়া তাঁহাদের জানা নাই।

আমরা আর একটা কথা উত্থাপন করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। আলোচ্য সিঙ্গিগ্রাম বহুদিন হইতে বহু পণ্ডিতের আবাসস্থল এবং শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ অঞ্চলের মধ্যে সিঙ্গিই মহাভারতকারের শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও অন্যান্য অনেকে বহু অনুসন্ধান করিয়া চির প্রসিদ্ধ জনশ্রুতিকে প্রমাণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—আমরা তাহারই পোষকতায় এই কয়টি কথা লিখিলাম। আশা করি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা হইবে।

মহাভারত।

গুরু বৃহস্পতি—গুরু দ্রোণ।

দ্রোণ চরিতের লক্ষণ গুলি এই :—

১। হরিদ্বারে ঘৃতাচী দর্শনে বৃহস্পতি-তনয় মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণ কলস মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়—(মহা ১।১৩১)

১ কাশীরাম দাসের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সাহায্য "কাশীরাম দাস স্মৃতি সংরক্ষণী ভাণ্ডারের" ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি, এ, S. D. O. কাটোয়া— এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

২ কাটোয়া অঞ্চল হইতে এই সম্বন্ধে আমরা অনেক চিঠি পত্র পাইয়াছি। আবশ্যক বিবেচিত হইলে সংখ্যান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে। বংস।

২। কোদণ্ড সমন্বিত বেদি ও কমণ্ডলু দ্রোণের রথধ্বজ—(মহা ৪।৫৫—৫৭)

৩। দ্রুপদরাজ ও দ্রোণ উভয়ে মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। (মহা—১।১৩১)

৪। দ্রোণ মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা—কৃপীর পাণি গ্রহণ করেন। এই দম্পতীর সন্তান অশ্বত্থামা।

৫। কৌরব রাজকুমারগণ, পাণ্ডুতনয়-গণ, বৃষ্ণি অন্ধক ও অন্যান্য রাজকুমারগণ এবং কর্ণ দ্রোণ গুরুর নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু নিষাদপতি হিরণ্যধনুর পুত্র এক-লব্যকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে দ্রোণ গুরু অস্বীকার করিয়াছিলেন। দ্রোণ অতি গোপনে অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামাকে অমোঘ অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। (মহা ১।১৩৪)

৬। ব্যাধরাজপুত্র দ্রোণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তৎসকাশে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইলেন। এক কুক্কুর একলব্যের জটাভার ও মৃগচর্ম্ম দর্শনে চীৎকার করিলে একলব্য এক এক করিয়া পঞ্চশরে তাহার মুখ বিদ্ধ করিলেন। শর-বিদ্ধ কুক্কুর দর্শনে অর্জ্জুন শরক্ষেপকের অতুল লঘুহস্ততা ও শব্দভেদকতার পরিচয় পাইলেন এবং মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। দ্রোণপ্রিয়-শিষ্যের ক্ষোভ দূরীকরণার্থে—কিতবতা পূর্ব্বক ব্যাধরাজপুত্রের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ গুরু দক্ষিণার ব্যপদেশে গ্রহণ করিলেন। এক-লব্যের লঘুহস্ততা বিনষ্ট হইল। (মহা—১।১৩৪)

৭। গুরু দ্রোণের আজ্ঞামতে অর্জ্জুন দ্রুপদরাজ যজ্ঞসেনকে বন্দী করিয়া দেন। (মহা—১।১৪০)

৮। পরাজিত যজ্ঞসেনের রাজ্যের উত্তরার্দ্ধ (অহিচ্ছত্র রাজ্য) দ্রোণ গুরু গ্রহণ করেন।

৯। যজ্ঞসেন রাজের যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণ গুরু শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাকে অস্ত্র শিক্ষা দেন। (মহা—১।১৬৭)

১০। নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্বধন গ্রহণে দ্রোণ গুরু দ্যূতক্রীড়াকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রচার করেন এবং অর্জ্জুনের প্রতি-যোদ্ধা হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। (মহা—২। ৭৯)

১১। "অর্জ্জুনশরে ছিন্নজ্যা ধনুর কোটি গুরুর সপ্ততালু ভেদ করে" (কাশীদাস) শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গাঘাতে দ্রোণ গুরুর শিরচ্ছেদ হয়। (মহা—৭।১৯০)

১২। অশ্বত্থামার নিধন শ্রবণে যোগ-বলে দ্রোণাত্মা নক্ষত্র মণ্ডলে গমন করে। (মহা—৭।১৯০)

১৩। কুরুক্ষেত্র হইতে দ্রোণ দেহ অন্ত-র্হিত হয়। (মহা—৭।১৯০)

দ্রোণ গুরুর চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে এবং তাঁহার আদর্শ পুরুষ আবিষ্কার করিতে হইলে কয়েকটী জ্যোতিস্তত্ত্ব ও বৃহস্পতি গ্রহের কয়েকটী ইতিহ স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব।

সমাজের খাতিরে বলিতে হয় যে দেব-গুরু বৃহস্পতি গ্রহ না চেনেন এমন হিন্দু বিরল। বৃহস্পতি গ্রহ রাশি চক্রের নবম রাশি বা ধনু রাশিতে অধিষ্ঠিত আছে। ধনু রাশি বিষুবতী রেখার দক্ষিণে ভগোলের অসুর ভাগে স্থিত। এবং উহার অধিদেবতা "ধনুর্দ্ধারী পুরুষ।" ধনুরাশির ধনুক সোমধারার মধ্যে অবস্থিত।

ধনু রাশির পশ্চিম দেশে যে প্রকাণ্ড শরস্তম্ভাকৃতি সোম পরমান (Milky way) প্রলম্বমান আছে, উহাই মহর্ষি শরদ্বানের শরস্তম্ভ এবং উহাই রামায়ণের ও প্রহ্লাদ চরিত্রের স্ফটিকস্তম্ভ। ঐ শরস্তম্ভ মধ্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সৃষ্ট (রামায়ণ ১।৬০) ভগোলার্দ্ধ, বিধির সৃষ্ট উত্তর ভগোলার্দ্ধের মিথুন রাশিস্থ মিথুন তারাদ্বয়ের প্রতিকৃতি বিচূত নক্ষত্রের তারা দ্বয় আছে, এই দুইটী তারা ২ ও ৭ বৃশ্চিকশ্ব নামে খ্যাত। ইহারাই যমদেবের বেদোক্ত কুক্কুর যুগল। এই তারামিথুন রামায়ণের শুক সারণ এবং এই তারামিথুন মহাভারতে কৃপ কৃপী নাম ধারণ করিয়াছে।

বৃষ রাশির দক্ষিণে যে কালপুরুষ মণ্ডল (Orion the hunter) অবস্থিত আছে তাহার শিরোদেশে ধনুকাকৃতি তারকারাজি বিরাজমান আছে এবং তাহার অগ্নি কোণে মৃগব্যাধ মণ্ডল ওরফে শ্বন্—মণ্ডল (অঃ বেঃ ৭।৫৫।২) পাশ্চাত্যের বৃহৎ কুক্কুর (Canis Major) দেদীপ্যমান আছে। গ্রহ জগতে যেমন বৃহস্পতি ও মঙ্গলে সতত কক্ষতা, তারা মণ্ডল জগতে তেমনি তারা ব্যাধে ও তারা শ্বাতে চিরকক্ষতা।

জ্যোতিষিক ইতিহ।

বেদ মতে দেবগুরু বৃহস্পতি কেবল নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং (ঋঃ বেঃ ২।২৩।১) গণপতি নামে পূজিত নহে। (১) বেদমতে (ঋঃ বেঃ ১।৪০।৮) গুরু বজ্রধারী, বেদমতে (ঋঃ বেঃ ২।২৪।৮) গুরু ক্ষিপ্র ধনুর্ধারী, এবং বেদমতে (ঋঃ বেঃ ৪।৫০।৭) গুরু রাজা বলিয়া বর্ণিত।

আবার অসুর ভাগস্থ ধনুরাশিতে অধিষ্ঠিত বলিয়া বৃহস্পতি অসুর বলিয়া বর্ণিত। প্রবাদ মতে এই বৃহস্পতি "বাক্-বিশারদ নৃশংস" চার্ব্বাক নামে খ্যাত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক মতে (৪।৭) ধনুষ্কোটি দ্বারা যজ্ঞ পুরুষের শিরশ্ছেদ হইয়াছিল। (২)

উপপত্তি।

দ্রোণ চরিত্রে তত বেশী বিশেষত্ব নাই। দ্রোণ গুরুর গ্রীসীয় ভ্রাতা টাইটন শ্রেষ্ঠ চাইরন্ (Chiron) মহা বিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি তাহার সমকালীয় গ্রীসীয় যুবকগণকে শীকার ব্যায়াম সঙ্গীত আদি বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এইরূপে হরিকেশ (Heraklis) একিলিস্ (Achiles) আদি যাবন্ত গ্রীসীয় বীরগণ চাইরণের শিষ্য ছিলেন। হরিকেশ হস্তে চাইরন্ দৈবাৎ নিহত হইলে জিউস্‌দেব (জীবঃ দেবঃ) তাহার মৃত দেহ বিমানে ধনুরাশি রূপে স্থাপিত করেন। আমরা দেখিতেছি যে দ্রোণ গুরু ও ভারত বীরগণকে অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। স্বশিষ্য হস্তে তাঁহার ও নিধন হয়; এবং মরণান্তে দ্রোণ গুরুও গুরু চাইরণের দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভূতপূর্ব্ব রূপে তাঁহার মৃত দেহ রণস্থল হইতে অদৃশ্য হইল। ধনুরাশির ধনুক তাঁহার ধ্বজচিহ্ন ছিল। সত্য বটে যে চার্ব্বাকের চরিত্র দ্রোণে সুপরিস্ফুট হয় নাই কিন্তু দ্রোণ চরিত্র চার্ব্বাকত্ব বিহীন নহে। দেবগুরুর রাজা উপাধি নাম মাত্র, দ্রোণ গুরুর ও তথৈব চ। যজ্ঞ পুরুষের চরম দশা যদিও বিসদৃশ বোধে বেদব্যাস দ্রোণগুরুতে আরোপিত করেন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ সেই ত্রুটি কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়াছেন। দ্রোণ, যজ্ঞপুরুষদের গুরুর প্রতিকৃতি না হইলে এরূপ আরোপণ অসম্ভব হইত।

তারা দর্শক।

(১) গণেশবীজং তম্ ইদম্ গুরো মন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ (কালিকাপুরাণ ৮১)।
(২) ধনুষ্কোট্যা যজ্ঞপুরুষস্য শিরঃচ্ছিন্নম্। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৪.৭)

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গদর্শন।

নীলকণ্ঠ।

উপন্যাস।

নবম পরিচ্ছেদ।

ষোড়শী আজ কাল একা, নিতান্তই একা! সেই, সে দিন হইতে মন্মথ ত আর আসেনা, তারও শরীরটা ভাল নাই! সে আসেনা বটে, কিন্তু লোক দ্বারা প্রত্যহ খোজ খবর তত্ত্ব তল্লাস লয়, কিন্তু ষোড়শীর কাজটা কি ভাল হইয়াছে? মন্মথকে তেমন ভাবে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া, তার পর আবার সেই চিঠি লেখা—কাজ কি ভাল হইয়াছে?—না, ষোড়শীর বড় অন্যায়! নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, তাতে আর ভাগবত এমন কি অশুদ্ধ হইয়াছে? একে সমবয়সী, তায় নাতি, সকলের উপর আবার শিক্ষক, তা সে ত নাম ধরিয়া ডাকিতেই পারে;—এতেই এত? আরে বাপরে! দেখে শুনে যে আর বাঁচা যায় না! তা, পাপ যদি তোর মনে লুকান থাকে, তবে তার দোষ কি বল ত? আর তোরই বা পাপ কি? ফুল ত সুন্দরই, তাকে সুন্দর দেখিলে দোষ কি? পূর্ণিমার চাঁদ ত মনোহরই, তাহাতে কার না মন মুগ্ধ হয়? বাঁশীর স্বর ত মধুরই, সে স্বর কার না মিষ্ট লাগে? মানুষকে ভাল লাগিলেই কি দোষের হয়? অত ন্যাকামি রাখ্! আর স্বামীর নিকট অবিশ্বাসী হওয়ার কথাই বা এ থেকে কোথা হ'তে আসে? তুই কি পাগল? —ষোড়শীর অন্তর হইতে কে যেন এই সকল কথা রাত্রিদিন বলিতে লাগিল; শুনিতে শুনিতে ষোড়শী বুঝিল, সত্যই তার কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে, মন্মথকে ডাকিয়া ক্ষমা চাওয়াই উচিত! ক্ষমা?—তা আবার কি বলিয়া চাহিব?—ছি—সে যে কেমন বাধবাধ ঠেকে!

স্বামীকে অমন ব্যস্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছিল, সেজন্যও ষোড়শী মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইয়াছে! দরকারী কাজকর্ম্ম ফেলিয়া সত্যই যদি তিনি চলিয়া আসেন! তবে ত বড় অন্যায় হইবে! কিন্তু না, তা তিনি কেন আসিবেন? সে পত্র তিনি নিশ্চয়ই ছেলেমানুষী ভাবিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাক্, এই বারের চিঠিতেই সে ত্রুটি সারিয়া লইলেই গোল চুকিবে!

সাত পাঁচ ভাবনায় একদিন গেল, দুই দিন গেল, কিন্তু আর যে দিন কাটেনা! ষোড়শী না হয় না বুঝিয়া একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তা বলিয়া কি মন্মথের রাগ করিয়া

থাকা উচিত?—ও হো! ভাল কথাই ত! —মন্মথকে ষোড়শী ত আসিতে নিষেধ করে নাই, সে ত শুধু পড়াশুনা বন্ধের কথাই লিখিয়াছিল, তবে সে আসা বন্ধ করিল কেন? এতক্ষণে ষোড়শীর বুক হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া গেল;—এই ছল পাইয়া,তাহার মনের ভার কতক লঘু হইল–যাহা খুঁজিতেছিল,তাই সে যেন সম্মুখে পাইল—দোষ মন্মথেরই, তার ত নয়! মন্মথই ত তার পত্রের অর্থ ঠিক বুঝে নাই, সে কথা তাকে খোলসা করিয়া লিখিলে ত আর কোন বালাই থাকে না, সেই ভাল! ষোড়শী তখন পত্র লিখিতে বসিল—কিন্তু না, সে দিন আর পত্র লেখা হইল না, হাত কাঁপিতে লাগিল! তার পর আরও দুই এক দিন গেল, লিখি লিখি করিয়া পত্র আর লেখা হয় না, "কেন, আমি ত তাকে আসিতে নিষেধ করি নাই, তবে সে আসেনা কেন? না আসিয়া সে ত বেশ আছে, তবে আর তাকে আসিতে বলিয়া বিরক্ত করি কেন?" অভিমানে ষোড়শীর হৃদয় ভরিয়া উঠে, হাতের কলম হাতেই থাকে, পত্র লেখা হয় না! তার মনে যদি এতই ছিল, তবে তেমন স্নেহ কেন সে দেখাইল, কেন তবে সে তত আদর যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইল, তত আকিঞ্চন করিয়া কে তাকে 'আপনার জন' হইতে বলিয়াছিল—ষোড়শীর এখন এই সকল চিন্তাই জপমালা! তারই চিন্তা, তারই প্রসঙ্গ, আর কিছুই ভাল লাগে না; হা নিষ্ঠুর! তোমার মনে শেষ এই ছিল?—মন যখন বড় অধীর হয় ষোড়শী তখন আপন মনে বৈষ্ণব কবির কবিতা পড়ে—এ সব তারই মনের কথা! কে যেন ছন্দে ঠিক তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছে—

"সকলই আমার দোষ; হে বন্ধু—
সকলই আমার দোষ,
কাহারে করিব রোষ?
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে,
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইবে এতেক দুখে!"

তা মান অভিমান ষোড়শী যাই করুক, শেষে ষোড়শীরই কিন্তু হার হইল! সে মন্মথকে পত্র লিখিয়া ঝি'র হাতে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় সহসা মনে পড়িল, কাল যে তার পিতার স্বর্গারোহণের তিথি! সে প্রতিবৎসরই ঐ তিথিতে কয়জন ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। তখন তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণভোজনের ও নিমন্ত্রণের ব্যবস্থার জন্য সরকারকে ঝি'র দ্বারা সংবাদ দিল এবং মন্মথকেও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিল। লিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া পরদিন আর একখানি পত্রে লিখিল—"দিবসে হয় ত সকলের সহিত আহার করা আপনার পক্ষে অসুবিধা হইবে, তাই আপনার আহারের ব্যবস্থা সন্ধ্যার পর করিয়াছি, আশা করি, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।" প্রথম পত্র লিখিয়া ষোড়শী বড় সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল;—আজ এই উপলক্ষে পত্র লিখিবার সুযোগ হওয়ায় ষোড়শী যেন বাঁচিয়া গেল। ব্রাহ্মণ যথাসময়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, প্রাতে ঝি'র হস্তে এই পত্র পাইয়া মন্মথ একটু হাসিল—হাসিয়া ঝিকে বলিয়া দিল—"আচ্ছা সন্ধ্যার পরই যাব, রাঙ্গা দিদিকে বলিস্।" ঝি সে হাসি দেখিয়াছিল, তাই সাহস পাইয়া হাসিয়া, আপনার মন হইতেই বলিল—"অবিশ্যি যাবেন কিন্তু, গিন্নি বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন!"

কথা বলিতে বলিতে সে মন্মথকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল—ও হরি, এ কি! এই কয়দিনে যে, বাবুর সোনার অঙ্গে কে কালি ঢেলে দিয়েছে!—ওদিকে আমাদের গিন্নি ঠাকুরাণীটীও যেন ঝরা ফুলটি, কে জানে বাপু, বড় ঘরের বড় কথা! কিন্তু এতদিন আমার চোখে ধূলো, এরা ত বড় 'কেও কেটা' নয়! আচ্ছা এবার দেখা যাবে!" তার পর, দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে ঝি ষোড়শীর প্রধূমিত বহ্নিতে ঘৃতাহুত দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে কথা—পরে।

দশম পরিচ্ছেদ।

"যে ডরে মূঢ় সে নর!" – মন্মথের সেই কথাই তখন মনে হইতেছিল। লাইয়া বাঁচিতে হইবে? কেন, সে কি এতই দুর্ব্বল! "মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা" কাহার চরিত্রে দেখা না দেয়! কিন্তু সেই দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করাই ত বীরের ধর্ম্ম,—যে পলায়ন করিয়া বাঁচিতে চায়, সে ত কাপুরুষ! মন্মথ কাপুরুষ নহে! লোকে নিন্দা করিতেছে, করুক! অত ঘনিষ্ঠতার জন্য পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতেছে, বলুক!—মন্মথ দেখাইবে সে কলঙ্কের বহু উর্দ্ধে। আজ যদি সে নীলকণ্ঠের গৃহে গমনাগমন বন্ধ করে, তবে এ সন্দেহের ভিত্তি লোকের মনে দৃঢ়তরই হইবে! মন্মথ তা করিতে দিবে না। কিন্তু তার সে দিনের ব্যবহারে ষোড়শী যে বিরক্ত হইয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছে! তবে? তার পর ষোড়শীর এই পত্র পাইয়া সে বাধা কাটিয়া গেল! ষোড়শী নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়া রাগ করিয়াছিল, এখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে, তাই এ ভাবে পত্র লিখিয়াছে! যদি এখনও কিছু ভুল থাকে, তবে কথাবার্ত্তায় সে ভুল নিশ্চয়ই দূর হইবে। কিন্তু বেলা যে আর যায় না! তা বেলা থাকিতে থাকিতে গেলে হয় না? না, এখন হয়ত ষোড়শী রন্ধনে ব্যাপৃতা। আচ্ছা, সন্ধ্যার পরই যাওয়া যাবে—কিন্তু সন্ধ্যার বুঝি এখনও অনেক বিলম্ব!—আজ মন্মথের মনে এই সব চিন্তাই তোলাপাড়া করিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল—মন্মথ নিমন্ত্রণে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ যা, সব যে মাটি! কোথা হইতে কাল মেঘ উঠিল—দেখিতে দেখিতে মেঘ ঘোর হইয়া আসিল, মহা দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল! এমন বৃষ্টি ত বহুদিন হয় নাই। মুষল ধার ত মুষল ধারই বটে! বৃষ্টি যে আর থামেনা! এক একবার বৃষ্টি কমিয়া আসে, মন্মথ ভাবে ঐ বুঝি ধরিল—কিন্তু না, বৃষ্টি আবার যে ঝম্ ঝম্ রবে নামে! রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। মন্মথ সন্ধ্যার পূর্ব্বে অন্তঃপুরে গিয়াছিল,—নিমন্ত্রণে যাওয়া দূরে থাক, বাহির বাটিতেও সে আসিতে পারিল না। মন্মথের মাতা, রাত্রি হইতেছে দেখিয়া মন্মথের আহার বাটিতেই প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। 'আজ এত রাত্রি আর এদুর্য্যোগে দেওয়ানজির বাটিতে নিমন্ত্রণে যাওয়া হবেনা' বলিয়া মাতা মন্মথকে আহারে বসাইলেন; বলিলেন—সেত আমাদের ঘর, আর এক দিন খেলেই হবে—এ বৃষ্টিতে শেয়াল কুকুরে বাহির হয় না, আজ নিমন্ত্রণে না গেলে বৌমা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে না।" মায়ের সঙ্গত কথায় মন্মথর বলিবার কিছু ছিল না, বরং সে যে এদুর্য্যোগেও নিমন্ত্রণে যাইতে ব্যস্ত, মা ইহা বুঝিয়াছেন, তাঁহার কথার ইঙ্গিতে এটুকু অনুমান করিয়া

মন্মথ কিছু অপ্রতিভই হইল! কিন্তু, তবু ফলাহার!—ব্রাহ্মণের মন সহজে সে প্রলোভন ভুলিতে পারে কি? আর বেচারী ষোড়শীই বা কি মনে করিবে? সে যে মন্মথের আশায় পথ চাহিয়া থাকিবে—হয়ত অনশনে, অনিদ্রায়, রাত্রি কাটাইবে! তা একবার বলিয়া আসিতে পারিলেও যে হইত!

* * * * *

না, মন্মথের নিদ্রা আর আসে না—এপাশ ও পাশ—যেন শয্যা-কণ্টক উপস্থিত হইল। কিন্তু পাছে মন্মথের বালিকা পত্নী এ অস্থিরতা বুঝিতে পারে তাই সে সাবধান হইল; ঘুমের ভাণ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া সরলা বালিকাও ঘুমাইয়া পড়িল! বালিকা যখন গাঢ় সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন, তখন মন্মথ ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চোরের মত গৃহ ত্যাগ করিল! সে মহালে দ্বিতলে অন্য কেহ থাকিত না, সিঁড়ির দরজায় কুলুপ লাগাইয়া, বাহিরের দেউড়ির দ্বারবানকে সতর্ক করিয়া দিয়া, মন্মথ একাকীই দেওয়ানজির গৃহাভিমুখে চলিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ

তখনও আকাশ তেমন পরিষ্কার হয় নাই। যাইতে যাইতে কোথাও জলে, কোথাও কর্দ্দমে কোথাও বা খানায় মন্মথের গতি সংহত হইতেছিল, কোথাও সঙ্কীর্ণ কোথাও দুর্গম কোথাও বা 'পিচ্ছিল পথে' মন্মথ বড় অসুবিধা অনুভব করিতেছিল—মার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, নিদ্রিতা বালিকা পত্নীকে একা ফেলিয়া অন্ধকারে একা সে ভাবে আসা যে কত অন্যায় হইয়াছে, মন্মথ বার বার তাহা অনুভব করিতেছিল; শেষে, অনেক কষ্টে, মন্মথ নীলকণ্ঠের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু এত রাত্রে বাহিরে বসিয়া,—ও কে ও!—ষোড়শী বুঝি, তাহারই জন্য লোক বসাইয়া রাখিয়াছে? কিন্তু না, এ ত দেওয়ানজির ভৃত্যদের মধ্যে কেহ নহে, এ যে অচেনা লোক, 'কেরে তুই,'—একটু ব্যস্ত হইয়া মন্মথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'কেরে তুই?'—'আমি এই বাটীর বাবুর সঙ্গে এসেছি—আমি ষ্টেশনের মুটে!' 'কোন বাবুর সঙ্গে এসেছিস তুই'—'ঐ যে দেওয়ান বাবুর সঙ্গে, এবাড়ীর আবার আর কোন বাবু আছে?' 'কখন এসেছিস তোরা?' 'এই আসচি গো', তা আপনারা—তোমরা?—' মন্মথ কোন উত্তর না দিয়া ফিরিল। মুটে অন্ধকারে তাকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, সে আপন মনেই বলিল 'কেও চৌকীদারের ব্যাটা বুঝি! বাবা আমরা ভাল মান্‌ষের ছাওয়াল, চোর বদমাস্ লই গো!' সে কথা মন্মথের শ্রবণে বুঝি পশিল না! সে দ্রুতবেগে ফিরিতেছিল, নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে এভাবে নিষ্ক্রান্ত হইতে আজ মন্মথের হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাতের প্রবল তরঙ্গ বহিতেছিল! মন্মথ মনে মনে ভাবিতেছিল—কেন আমি এত কষ্ট সহিয়া, মাতৃ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, সরলা বালিকা পত্নীর নিকট অবিশ্বাসী হইয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া এত রাত্রে আসিয়াছি! যাহার জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিতে বসিয়াছি, কে সে? যাহার জন্য মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, শরম সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছিলাম, কে সে? কে সে যাহার জন্য পরগৃহে—ভৃত্যের গৃহে—চোরের মত প্রবেশ করিয়াছি, যাহার জন্য গৃহের সুখ হৃদয়ের

শান্তি সব বিসর্জ্জন দিয়াছি, কে সে? কে সে যাহার জন্য সেই প্রেমমুগ্ধা পতিপ্রাণা সরলা বালিকার হৃদয়ে শেল বিঁধিতে বসিয়াছি? যাহার জন্য, অবিশ্বাসী আমি, সেই সরলা সুষুপ্তা বালিকাকে একাকী এই ভীষণ নিশীথে ফেলিয়া আসিয়াছি, সে আমার কে? সে যে পরের রমণী, তাহার উপর আমার কিসের অধিকার? —তখন অনুতপ্ত মন্মথ ক্ষিপ্রপদে গৃহে ছুটিলেন অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে শয়ন কক্ষে গমন করিলেন।—তখন আকাশের মেঘ কাটিয়াছে, জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, তখনও বালিকা নিদ্রিতা, তাহার সেই সরল মুখচ্ছবিখানিতে যেন কি একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, যেন কি এক দুঃস্বপ্ন বালিকার কোমল প্রাণকে ব্যথিত করিতেছে, বুঝি বালিকার স্ফুরিত অধর স্বামীর উদ্দেশে বলিতে চাহিতেছে "দৃষ্টং স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি!" আহত মন্মথ শয্যায় বসিয়া সেই বিষাদ ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিতে লাগিলেন! উন্মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবিষ্ট পূর্ণচন্দ্রের রজত কিরণ সে সুন্দর মুখের শোভা আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, মন্মথ তখন দেখিতে দেখিতে আপনার অজ্ঞাতেই বলিয়া উঠিলেন—এওত সুন্দর! মূর্খ আমি, কেন সুবর্ণলতাকে পায়ে দলিয়া কণ্ঠের মাণিক দূরে ফেলিয়া এ কলঙ্ক সাগরে ঝাঁপ দিতেছি! এও ত পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা, ইচ্ছা করিলে ইহাকেও ত মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারি, তবে আর কেন পরের রমণীর শিক্ষার জন্য এ কলঙ্ক? কেন সে স্মৃতি? হৃদয় কঠিন হও! এস তুমি প্রিয়তমে, আমার বিক্ষত অনুতপ্ত হৃদয়ে এস, এস আমার তৃষিত-তাপিত পাষাণ-পরাণে এস!' মন্মথ তখন সেই স্বপ্ন-ব্যথিতা বালিকা পত্নীকে আলিঙ্গন করিলেন।

সে গাঢ় আলিঙ্গনে বালিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বালিকা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল!

ক্রমশঃ।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

উল্কাপিণ্ড।

মেঘহীন পরিষ্কার রাত্রিতে অল্পক্ষণের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে আমরা প্রায়ই দুই একটি উল্কাপাত দেখিতে পাই। আকাশের সমস্ত নক্ষত্রের আমরা হিসাব রাখি না, তাই মনে হয়, অগণ্য তারকার মধ্য হইতেই বুঝি তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য, উল্কাপাত নক্ষত্রপাত নয়। প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ জ্যোতিষ্ক। কতকগুলি আবার সূর্য্য অপেক্ষাও শত শত গুণ বৃহৎ। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাইল দূরে থাকিয়া ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ-উপগ্রহময় জগৎ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে। কাজেই নক্ষত্রের ন্যায় বৃহৎ এবং অতি দুরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কগুলিকে টানিয়া আনা আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী বা সূর্য্যের সাধ্যাতীত।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে উল্কাপিণ্ডগুলি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহারা

আমাদের পৃথিবীর মত এক এক নির্দ্দিষ্টপথে দলে দলে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বৃহৎ দূরবীণেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। পৃথিবী নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ঐ সকল উল্কাপিণ্ডের ভ্রমণপথের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে কতকগুলি পিণ্ড ভূপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই প্রায় পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুর আবরণে মণ্ডিত রহিয়াছে। কাজেই পৃথিবীর দিকে আসিতে হইলে উল্কাপিণ্ডগুলিকে সেই গভীর বায়বীয় আবরণ ভেদ করিয়া আসিতে হয়। বায়ু অত্যন্ত লঘুবাষ্প হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া কোন বস্তু দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে ঘর্ষণে গরম হইয়া পড়ে। কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলাগুলি ছুটিয়া বাহির হয়, তখন প্রথমে সেগুলি শীতলই থাকে। তার পর বায়ুর ভিতর দিয়া চলিবার সময় তাহারা বায়ুর সংঘর্ষণে উত্তপ্ত এবং শেষে প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে। উল্কাপিণ্ডসকল বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া নামিবার সময় ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রজ্বলিত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এই প্রজ্বলিত অবস্থাতেই উহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যে গুলি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যেই তাহারা নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবল বৃহৎগুলিই পুড়িতে পুড়িতে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। উল্কাপিণ্ডের এই প্রকার দগ্ধাবশেষ পৃথিবীর নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। অদ্যাপি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচটি করিয়া উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর নানা অংশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। কলিকাতার কলা-ভবনেই (Museum) অনেকগুলি উল্কাপিণ্ডের দগ্ধাবশেষ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রতিদিন আমাদের বায়ুমণ্ডলে কতগুলি উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করে, অধ্যাপক নিউটন্ সাহেব তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ প্রকার গণনা কখনই নির্ভুল বা সূক্ষ্ম হয় না। যাহা হউক, নিউটন্ সাহেবের হিসাবে দিবারাত্রিতে গড়ে প্রায় দুই কোটি উল্কাপিণ্ড আমাদের বায়ুমণ্ডলে আসিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া স্থির হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল উল্কাপিণ্ডের মধ্যে বৎসরে কেবল চারি পাঁচটি পুড়িতে পুড়িতে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে, এবং অবশিষ্ট সকলই নীচে নামিবার সময়ই নিঃশেষে পুড়িয়া যায়। পুড়িয়া গেলেও ইহাদের ভস্ম চিরকাল আকাশে ভাসমান থাকিতে পারে না, উল্কাদাহে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, সকলই ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। মেরুপ্রদেশ এবং সমুদ্রতল হইতে উল্কাভস্ম সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রতি বৎসর তিন হাজার মণ ওজনের উল্কাভস্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণার আকার গ্রহণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে আসিয়া সঞ্চিত হয়।

উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি কথা লেখা হইল, গত শতাব্দীর মধ্যভাগের জ্যোতিষিগণ তাহার অধিক আর বিশেষ কিছুই জানিতেন না। পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণই উল্কাপিণ্ডের গতিবিধি লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল গবেষণার ফলেই ইহার স্থূলতত্ত্বগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

যাঁহারা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটু খবর রাখেন, তাঁহাদিগের নিকট সুপ্রসিদ্ধ বায়েলার (Biela's comet) ধূমকেতুর পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। গত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়াবাসী জ্যোতিষী বায়েলা সাহেব এই ধূমকেতুটির আবিষ্কার করেন। গণনায় তাহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-কাল সাড়ে ছয় বৎসর বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং হিসাব মত ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ সালে ধূমকেতুটি যথাসময় দেখা দিয়াছিল; কিন্তু ১৮৪৫ সালে তাহাকে আর পূর্ব্বের আকারে দেখা যায় নাই। কোনও অজ্ঞাত কারণে * দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সেটি যুগল ধূমকেতুর আকারে আকাশে উদিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ্কটির এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, পরবর্ত্তী উদয়কালে তাহার অবস্থা কি প্রকার দাঁড়ায় দেখিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ উৎগ্রীব হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে উভয় ধূমকেতুরই উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব লক্ষাধিক মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে ১৮৫৭ সালে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে, বৃহৎ দূরবীণেও তাহাদের একটিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। বায়েলার ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ-পথ এখনো নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালের পর প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের পৃথিবী যখন ঐ পথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়, তখন লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড বৃষ্টির ধারার ন্যায় পৃথিবীর দিকে পড়িতে আরম্ভ করে।

বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসের পর ঐ প্রকার নির্দ্দিষ্ট সময়ে উল্কাপাতের সংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া, উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সেই সময়ের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে স্থির হইয়াছিল, বায়েলার ধূমকেতুই চূর্ণিত হইয়া ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি সেগুলি সেই ধূমকেতুরই পথে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। কাজেই সেই পথের নিকটবর্ত্তী হইলেই পৃথিবী তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে টানিয়া নিজের আকাশের ভিতর আনিয়া ফেলে।

বৎসরের সকল দিনে উল্কাবর্ষণ সমান হয় না। প্রতি বৎসরই এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবেম্বর মাসের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে উল্কাপাতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইতে দেখা যায়। বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উল্কাপাতের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধটি আবিষ্কৃত হইলে, এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবেম্বরের বর্ষণের সহিতও কোন কোন ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঐ তিন সময়ে তিনটি নির্দ্দিষ্ট ধূমকেতুর ভ্রমণপথ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। কাজেই ঐ সাময়িক উল্কাবর্ষণগুলি যে, ধূমকেতুর অঙ্গচ্যুত খণ্ড-জ্যোতিষ্ক দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

সাময়িক উল্কাবর্ষণের পূর্ব্বোক্ত কারণটী আজও সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

* বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংস হওয়ার অনেকগুলি কারণ সাধারণ জ্যোতিষিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। অনেক জ্যোতিষীই বৃহস্পতির আকর্ষণকেই প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত কারণ কিনা, তাহা এখনো বিচার্য্য বলিয়া মনে হয়।

বরং আকাশ-পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী নানা উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ায় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটির সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র সন্দেহ ছিল, তাহা এখন একে একে দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট উল্কাবর্ষণ ছাড়া মাঝে মাঝে আকাশে যে দুই একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের (Meteorite) আবির্ভাব হয়, তাহাদের উৎপত্তিরহস্য আজও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। সাময়িক বর্ষণের উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া নামিবার সময় নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া পড়ে, কিন্তু শেষোক্ত পিণ্ডগুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, একেবারে পুড়িয়া যায় না। উহাদের কিয়দংশ প্রায়ই ভূতলে আসিয়া পতিত হয়। এই সকল দগ্ধাবশেষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে কতকগুলিতে কেবল লৌহ ও নিকেল এবং অবশিষ্টগুলিতে কেবল প্রস্তরের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। আমাদের পৃথিবী যে সকল উপাদানে গঠিত, উল্কাদেহে তাহারি সন্ধান পাইয়া, এককালে এই বৃহৎ পিণ্ডগুলি পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল বলিয়া আজকাল জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অনুমান করিতেছেন।

কিপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত শিলা ও ধাতুপিণ্ডগুলি পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আধুনিক পণ্ডিতগণ তাহারও আভাস দিয়াছেন। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর উপরে অসংখ্য বৃহৎ আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল। এইগুলি যখন ভীমবেগে অনল উদ্গিরণ করিত, তখন নানা বায়বীয় পদার্থের সহিৎ বৃহৎ বৃহৎ শিলা ও ধাতুখণ্ডও আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইত। কোন বস্তুকে সবলে আকাশের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলে সেটি যদি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়, তবে তাহার ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় তাহাকে ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের ন্যায়ই আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলিতেছেন, প্রাচীন যুগের সেই বৃহৎ আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে যে সকল শিলা উৎক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি, নিশ্চয়ই আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। কাজেই তাহারা আর পৃথিবীতে না ফিরিয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ সুরু করিয়া দিত। পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত এই শিলাগুলিকেই পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ বৃহৎ উল্কাপিণ্ড বলিতে চাহিতেছেন।

চন্দ্রমণ্ডল যে এককালে সহস্র সহস্র ছোট বড় আগ্নেয়পর্ব্বতে আচ্ছাদিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটখাটো দূরবীণ দিয়া দেখিলেও চন্দ্রমণ্ডলে এখন নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরিগুলির বিবর সুস্পষ্ট চিনিতে পারা যায়। ইহা দেখিয়া আর একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন, কেবল পৃথিবীরই আগ্নেয়গিরি উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি করে নাই। চন্দ্রের অসংখ্য পর্ব্বত-শিখর হইতে যখন অগ্ন্যুদ্গম হইত, তখনও লক্ষ লক্ষ প্রস্তরখণ্ড ঊর্দ্ধে উঠিয়া চন্দ্রের আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিত। সেগুলিও এখন বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের আকারে নিশ্চয়ই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিলেই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের আকারে ভূপতিত হইতেছে।

বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আধুনিক জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান

পাইলেও, সেগুলিকে অবিসম্বাদে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলিতেছে না। সম্প্রতি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পিকারিঙ্ সাহেব, প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে পৃথিবী এবং চন্দ্রের আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপণ-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ সাত মাইল এবং দুই মাইল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকারের ভীমবেগসম্পন্ন আগ্নেয় গিরির অস্তিত্বের কোন চিহ্নই ভূপৃষ্ঠে বা চন্দ্রমণ্ডলে দেখা যায় না। কাজেই প্রচলিত সিদ্ধান্তে কথনই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না।

ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ডারুইনের বংশধর জর্জ ডারুইন্ সাহেব (Sir G. H. Darwin) গাণিতিক প্রমাণ প্রয়োগে চন্দ্রের যে উৎপত্তিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, চন্দ্র এককালে পৃথিবীরই কুক্ষিগত ছিল। তা'র পর পৃথিবী হইতে ছিন্ন হইয়া জোয়ার ভাটার (Tides) প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়া, এখন প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে পড়িয়াছে। পিকারিঙ্ সাহেব ডারুইনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে মানিয়া লইয়া উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তির এক নূতন কারণ দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, যে দিন হঠাৎ পৃথিবীর কতক অংশ ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিয়াছিল, সেদিন পৃথিবীর উপরকার চাপও হঠাৎ কমিয়া গিয়া ভূপৃষ্ঠের রুদ্ধ বায়ু বা অপর বায়বীয়-পদার্থগুলিকে অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল। কাজেই ইহাতে ভূপৃষ্ঠ আর পূর্ব্বের ন্যায় অচঞ্চল থাকিতে পারে নাই। নূতন শক্তিতে পৃথিবীর উপরকার কঠিন স্তরগুলি ছিন্ন হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই অতি প্রাচীনকালের নির্জীব পৃথিবীর অবস্থাটা এখন নিঃসন্দেহে স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। তথাপি পিকারিঙ্ সাহেব বলিতেছেন, সেই চাপনির্ম্মুক্ত অবস্থায় পৃথিবীর কঠিন অংশগুলির অতি ঊর্দ্ধে উত্থান কথনই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রকারে ঊর্দ্ধে ধাবিত অসংখ্য শিলা ও ধাতুখণ্ডের মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, ইনি তাহাদিগকেই এখনকার উল্কাপিণ্ড বলিতে চাহিতেছেন।

ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার পর কি প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া সেই শিলাখণ্ডগুলি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, পিকারিঙ্ সাহেব গণিতের সাহায্যে তাহাও দেখাইয়াছেন। এই সকল গাণিতিক হিসাব দেখিলে, এবং তাহার সহিত উল্কাপিণ্ডগুলির আধুনিক অবস্থা মিলাইয়া লইলে, পিকারিঙের নূতন সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক সাময়িক উল্কাবর্ষণের পিণ্ডগুলি যে ধূমকেতুরই দেহচ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, তাহাতে আর এখন সন্দেহ করা যায় না; এবং বৃহৎ পিণ্ডগুলির গঠনোপাদান নির্ণয় করিয়া পরীক্ষা করিলে, সেগুলি যে এককালে পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল না, তাহাও কোনক্রমে বলা চলে না। আমরা এ পর্য্যন্ত ভূস্তরে যতগুলি মূল পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, উল্কাপিণ্ডে তাহার মধ্যে প্রায় ২৯টির অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। অদ্যাপি কোন অপার্থিব বস্তুই উহাতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বৃহৎ

উল্কাপিণ্ডগুলিকে পৃথিবীরই সামগ্রী ব্যতীত অপর কিছুই বলা যায় না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, কি চন্দ্রের জন্মকালে, কখন্ এগুলি পৃথিবীচ্যুত হইয়াছিল—তাহা এখনো বিচার্য্য।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারিগণের ইতিহাস।*

("রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভা" স্থাপনার্থ আহূত সভায় পঠিত)।

সৌভাগ্য-শিখর-সমারূঢ় শ্রীর বরপুত্রগণ আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দুর্ভাগ্যের অতি নিম্নস্তরে নিপতিত। তাঁহাদের মস্তকদেশ হইতে লক্ষ্মীর আশীর্মাল্য অপহৃত হইয়াছে। এখন আর তাঁহারা ধূলিমুষ্টি ধরিলে তাহা স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত হয় না। তাঁহাদিগের সঙ্কুচিত হৃদয়ের প্রতপ্ত শ্বাসে রম্যনিকেতন দগ্ধ হইতেছে, সুরভি কুসুম শুকাইয়া যাইতেছে। পাল-পার্ব্বণের সুমধুর আনন্দরোল আর তেমন ভাবে উঠিবার অবকাশ পাইতেছে না। দেউল-গুলির চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের অযুত কীর্ত্তিকলাপ লোপ পাই-তেছে। বৃহৎ বৃহৎ দেবালয়ে আর সান্ধ্য আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টারোল উত্থিত হয় না। তথায় চর্ম্মচটীগণ আশ্রয় লইয়াছে; বটবৃক্ষ, শিখর গাড়িয়া বসিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ-গুলি শৈবাল-সমাচ্ছন্ন, আর সেখানে লোক স্নান বা বারিপান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। সমুচ্চ পাড়গুলি বনাকীর্ণ, তাহাতে পেচক-কুল আশ্রয় লইয়া মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকারে তথাকার গভীর নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করিতেছে। ঘাটের সোপানাবলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিষধর সর্পকুল তাহাতে আশ্রয় লইয়া নিরাপদে বাস করিতেছে।

প্রতিপালিত আশ্রিতজনেরা একে একে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যে যাহার জীবিকা অর্জ্জন করিতে ভিন্নস্থানবাসী হইয়াছে। বুভুক্ষিত অতিথিগণ আর সমাদৃত হইতেছে না। যেখানে উদর পূরিয়া আহার করিবে এবং নগদও কিছু পাইবে এরূপ আশা করিয়া আসিয়াছিল, সেখান হইতে হয় রিক্ত-হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, নয় নগদ কিছু পাইয়া উদরের উপরে হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক কোন মুদীখানায় গিয়া আশ্রয় লইতেছে।

অযুতৈশ্বর্য্যশালী লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ কি কারণে এরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইলেন? কোন্ কুগ্রহ-বশে তাঁহাদের আলয় হইতে শ্রী বিদায় গ্রহণ করিলেন, কেহ কি অনুসন্ধান করিয়াছেন? তাঁহারা এখন আর প্রকৃতই "শ্রীযুক্ত" নহেন, "বাবু"-আখ্যাধারী হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় দেহভার মাত্র বহন করিতেছেন এবং মোহের ঘোরে মধ্যে মধ্যে অসার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শূন্যগর্ভ গৌরবে স্ফীত হইতে-

* গত ২২শে বৈশাখ রবিবার, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, শ্রীযুক্ত রাজা জানকীবল্লভ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে উপরোক্ত সভা এই তৃতীয়বার স্থাপিত হইয়াছে।

ছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে এরূপ ছিলেন কি না, দেখা যাউক।

রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিগণের কোন্ সময়ে উত্থান এবং কোন্ সময় হইতে তাঁহাদের পতন আরম্ভ হয়, তাহার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, তাহারও আলোচনা পরে করিব। ভূম্যধিকারিগণের এই অতীত গৌরবকাহিনী তাঁহাদের মোহনিদ্রাভঙ্গের সহায়তা করিবে বলিয়া আশা হয়।

রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারিগণের উৎপত্তির বিবরণ জানিতে হইলে আমাদিগকে এ দেশের পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপেই এ কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস শুনাইব।

পুরাকালে রঙ্গপুর বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (১)। মহারথ ভগদত্তের বিলাসভবন এই রঙ্গপুরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধিও আছে।

ভগদত্ত-বংশীয় রাজগণের পর অন্যান্য বংশীয় রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত উহা খেণ রাজগণের শাসনাধীনে থাকে। এই খেণবংশের শেষ রাজার নাম নীলাম্বর। গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের হস্তে ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে নীলাম্বরের পতনের সঙ্গে কামরূপের তদানীন্তন রাজধানী কামতাপুরে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আহম রাজগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিছু কাল কামরূপে অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল। এই বৃহৎ রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া কয়েকটীমাত্র ভূঁইয়া দ্বারা শাসিত হইতেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক নবশক্তি রঙ্গপুরের উপকণ্ঠেই জাগিয়া উঠে। সেই শক্তিপ্রভাবে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য আবার শান্তির সুশীতল ছায়ায় কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিতে অবসর প্রাপ্ত হয়। কোচবংশীয় তৃতীয় রাজা নরনারায়ণ ১৫৮৭খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র উত্তর বঙ্গ, আসাম, সুদূর মণিপুর কাছাড় প্রভৃতি রাজ্য কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। নীলাম্বুধি সসম্ভ্রমে নরনারায়ণ-রাজ্যের পাদ ধৌত করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিগাথা তরঙ্গে তরঙ্গে পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত করিত। পণ্ডিতপ্রধান পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ তাঁহারই রাজত্বকালে "প্রয়োগ রত্নমালা" নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া কালের কঠোর শাসন হইতে আপন নামের সহিত নরনারায়ণ বা মল্লদেবের অশেষকীর্ত্তির শেষ নিদর্শন রক্ষা করিয়াছেন। সেই অমূল্য গ্রন্থ আজও সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে :—

> শ্রীমল্ল-দেবস্য গুণৈক সিন্ধো
> র্মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
> যত্নাৎ প্রয়োগত্তম রত্নমালা
> বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন॥

রত্নমালা-ভূমিকার ৩য় শ্লোক।

নরনারায়ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে কোচবিহারের আধিপত্যও ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। নববিজিত বিস্তৃত ভূভাগের উপরে, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের দুর্ব্বল হস্ত শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে অক্ষম হইলে, দিল্লী-

(১) Martin's Eastern India, Book II Chapter II page 403.

শ্বর আকবরের সেনাপতি সের আফগান বঙ্গের রাজধানী গৌড় পুনরায় অধিকার করেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে মানসিংহ মোগল-বাহিনী সহ কোচবিহার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া মোগল-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্রে মোগল-পতাকা এইরূপে প্রোথিত হইতেছে দেখিয়া বলদৃপ্ত সন্নিহিত রাজন্যবর্গ কোচ-বিহারাধিপতির উপরে বিরক্ত হন, এবং বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন। কোচ-বিহারাধিপতি কাপুষের ন্যায় মোগল-পতাকার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া গৌড়ের মোগল-রাজপ্রতিনিধির নিকট দূত প্রেরণ করেন। এইরূপে স্বদেশদ্রোহিতার প্রণালী দিয়াই কুম্ভীর, স্বাধীন কোচবিহারে প্রবেশপূর্ব্বক স্বাধীনতাকে গ্রাস করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়; উত্তর বঙ্গের গৌরব-সূর্য্যের উজ্জ্বল প্রভা মলিন হইতে আরম্ভ করে। বঙ্গের মোগল-শাসন-কর্ত্তার প্রেরিত জেহাদ্‌-খান্‌ কোচবিহারে প্রথম পদার্পণ করেন এবং বিদ্রোহ দমন করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন-পূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

আকবরের পর দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সময় গৌড়ের মোগল-শাসনকর্ত্তা দ্বিতীয়বার কোচ-বিহার আক্রমণ করিয়া ঘোড়াঘাট ও আর কয়েকটী স্থান অধিকার করেন। এবারেও লক্ষ্মীনারায়ণ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপাত-নিগ্রহের হস্ত হইতে রক্ষা পান। লক্ষ্মী-নারায়ণের পরে বীরনারায়ণ ও তৎপরে প্রাণনারায়ণ কোচবিহার সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। ইহাদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া বিজিত রাজ্যগুলি একে একে কোচবিহারের বশ্যতা ত্যাগ করিতে থাকে। ভূটান কর প্রদানে বিরত হয়। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরা রাজছত্র ধারণে এবং কর প্রদানে অসম্মত হন। ধনলোলুপ মোগলেরা ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের (ইস্‌লামাবাদের) শাসনকর্ত্তা ইস্‌-লাম খানের অধীনে এই সময়ে আবার কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং লুণ্ঠন—লব্ধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মীরজুম্লার অধীনে এক বিরাট মোগল-বাহিনী কোচবিহারে স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন জন্য শ্যেন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কোচবিহারেশ্বর প্রাণভয়ে পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগলবাহিনী রাজ-ধানী আক্রমণপূর্ব্বক তথায় নির্ব্বিবাদে মোগ-লের বিজয়-পতাকা রোপণপূর্ব্বক হিন্দুদেবদেবীর দেউল গুলি ভাঙিয়া তৎস্থানে মুসলমানদিগের ভজনালয় স্থাপন করিতে উদ্যত হন। সৈয়দ মহাম্মদ সাদক, মীরজুম্লা কর্তৃক কোচবিহারের প্রথম শাসন ভার পাইয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের শোণিত তখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নাই। মহম্মদীয়গণ ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া উত্তরবঙ্গীয়গণ জীবন পণ করিয়া উত্থিত হয় এবং পলায়িত নরপতি প্রাণনারায়ণকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করে। প্রাণনারায়ণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি ভুটিয়া ও অন্যান্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রজাবৃন্দের আহ্বানে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করেন। মোগল বাহিনী সহ সৈয়দ মহম্মদ কোচবিহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। হিন্দুর রাজত্ব পুনরায় হিন্দু নরপতির সুশাসনে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সুখ-সমৃদ্ধ

হইয়া উঠে। প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মদনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে বাসুদেব নারায়ণ, ও তৎপরে প্রাণনারায়ণের পৌত্র, পঞ্চম বর্ষীয় মহেন্দ্র নারায়ণ ১৬৮২ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করেন।

প্রকৃতির লীলা নিকেতন কোচবিহার রাজ্যে অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর প্রভৃতি প্রদেশে মহারাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর হইতে অন্তর্বিপ্লবের যে দাবাগ্নি মৃদু মৃদু জ্বলিতে হয় ক্রমেই তাহা ভীষণাকার ধারণ করিয়া রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহ গুলিকে একে একে দগ্ধ এবং রাজ্যকে মহা শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। দাবাগ্নির দুঃসহ তাপে উত্তর বঙ্গের করতোয়া নদীর পূর্ব্ব দিকস্থ বিস্তৃত ভূভাগের স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য্য গৌরব ভস্মীভূত হইয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে কোচবিহার হইতে ঘোড়াঘাট ও তৎসন্নিহিত কয়েকটী স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া মোগলদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়। এই হইতেই রঙ্গপুরে প্রথম মুসলমান-আধিপত্যের সূচনা। মোগল-কেশরী আকবরের সময়ে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গালার প্রথম বিভাগ ও বন্দোবস্ত করেন, তাহার ১৯ সরকার মধ্যে ঘোড়াঘাট অন্যতম। এই সরকার ঘোড়াঘাট ত্রিস্রোতা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এবং স্বাধীন কোচবিহারের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রদেশের অধিকাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। উহাতে মাত্র ৮৪টী পরগণা ছিল।"(১)

সম্রাট্ সাহাজাহনের সময়ে বাংলার সুবেদার সা সুজা ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয়বার বাংলার হিসাব প্রস্তুত করেন। তখন তিনি বাংলার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তসীমার যে সমস্ত ভূভাগে তৎকালে মুসলমান-আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া সরকার ঘোড়াঘাট ব্যতীত সরকার কোচবিহার নামে একটী বিভাগ গঠন করেন।

বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রদেশের ও প্রাচীন ফকীর কুণ্ডী জমীদারীর অধিকাংশ এই সরকার কোচবিহারের অন্তর্গত ছিল। (২)

বাংলার তৃতীয়বার স্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭২২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মহাম্মদ সাহের সময়ে সুবা বাংলার দেওয়ানী প্রাপ্ত মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে হইয়াছিল। তিনি সমগ্র বাংলাকে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া প্রধানতঃ পঞ্চবিংশ জমীদারী ও ত্রয়োদশ জায়গীরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমগ্র সরকার ঘোড়াঘাট, পিঞ্জরা, কোচবিহার, বাজুহা ও বার্ব্বাকাবাদের অধিকাংশ ভাগ লইয়া ঘোড়াঘাট নামক একটী চাকলা গঠিত হয়। এই ঘোড়াঘাট চাকলার নিম্নলিখিত জমিদারীগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যথা;—নাটোরের ভাতুড়িয়া জমিদারী, দিনাজপুর জমিদারীর অধিকাংশ, ইদ্রাকপুর জমিদারী, ফকীর কুণ্ডী বা রঙ্গপুর জমিদারী, ও সালবাড়ী, বড়বাজু

(১) মুরশিদাবাদের ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় ৪২০ পৃঃ।

(২) মুরশিদাবাদের ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২৩ পৃঃ।

আটিরা, কাগমারী প্রভৃতি পরগণা। সমগ্র চাকলায়, ৪৫১ পরগণা ও ২১,৮০,৪১৫ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল। (৩)

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালভূম, দক্ষিণ কোল, ধুবড়ী, কামরূপ প্রভৃতি কোচবিহার ও আসাম হইতে বিজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরস্থ সরকার বাজুয়ার কতকাংশ লইয়া চাকলা কড়াই বাড়ী গঠিত হয়। সুসঙ্গ জমিদারী ও বাহিরবন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা এই চাকলার অন্তর্গত ছিল। (৩)

মোগল-শাসনাধীন রঙ্গপুর ভূভাগে দুইটী মাত্র প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমীদারীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ১ম ইদ্রাকপুর। ইদ্রাকপুরের জমিদারগণকে সাধারণতঃ বর্দ্ধনকুঠীর জমিদার বলে। রাজা রাজেন্দ্র ইহার প্রথম জমিদার। তাঁহার কয়েক পুরুষ নিম্নে রাজা ভগবানের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার বুদ্ধিমত্ত্ব তদ্রূপ না থাকায় তন্নামখ্যাত দেওয়ান নিজনামে ঢাকা হইতে ইদ্রাকপুরের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া লন। এই প্রবঞ্চনা প্রকাশ হওয়ার পরে বহু গোলযোগ ঘটে এবং রাজা ও দেওয়ানের মধ্যে জমিদারী নয় আনা ও সাত আনা ভাগ হয়। রাজা ভগবানের পুত্র মনোহর পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ইনি সা সূজার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মনোহর-পুত্র রঘুনাথ ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে সমগ্র ইদ্রাকপুরের জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কুণ্ডী, সেরপুর, পলাশী প্রভৃতি পরগণা এই জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। রঘুনাথের পর তৎপুত্র রামনাথ জমিদারী প্রাপ্ত হন। রামনাথের পুত্র হরিনাথ ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে আরঙ্গজেবের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে আর এক নূতন সনন্দ লাভ করেন। এই হরিনাথের পুত্র বিশ্বনাথের সহিত সা সূজা ইদ্রাকপুর জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের পুত্র গৌরীনাথ ইদ্রাকপুরের কোম্পানীর আমলের জমিদার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইদ্রাকপুরের তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস আর জানিতে পারি নাই, তবে ইদ্রাকপুর বা বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারী ক্রমেই যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে পূর্ব্বনামের স্মৃতি মাত্র রক্ষা করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। (ক)

দ্বিতীয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদারীর নাম ফকীর কুণ্ডী বা রঙ্গপুর জমিদারী। সম্রাট্ সাহাজাহানের সময়ে কোচবিহার রাজ্য হইতে যে অংশ বিজিত হইয়া সরকার কোচবিহার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অংশ ও সরকার বাজুয়ার অন্তর্গত কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা লইয়া চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ফকীর কুণ্ডী বা রঙ্গপুর জমিদারী গঠিত হয়। এই জমিদারীর বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। ইহার ২৪৪ পরগণার ২,৩৯, ১২৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়, তাহা জানা যায়। যে যে নামে এই বিস্তৃত জমিদারীটী পরিচিত সেই

(৩) মুরশিদাবাদের ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২৬ পৃঃ এবং ৪৩৪ পৃঃ।

(ক) মুরশিদাবাদের ইতিহাস নবম অধ্যায় ৫০৬ পৃঃ এবং Rungpur Reports 1872—73 by G. C. Das, page 80.

(খ) মুরশিদাবাদের ইতিহাস নবম অধ্যায় ৫১০ পৃঃ।

বিখ্যাত কুণ্ডী পরগণা কোন্ সূত্রে উহার বর্ত্তমান ভূম্যধিকারিগণের পূর্ব্বপুরুষ কেশব চন্দ্র রায় চৌধুরীর হস্তে আসিয়াছিল, তাহা একটী আলোচনার বিষয়। কেশবচন্দ্র রাজা মানসিংহের সমসাময়িক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। যাহা হউক, এই কুণ্ডী পরগণাটীই জমীদারীর বর্ত্তমানে বিস্তৃত ফকীর কুণ্ডী বা রঙ্গপুর নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দের রঙ্গপুরের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে:—"The principles on which the rents were collected in chaklas Kazirhat, Kakina, and Futtehpur, seem also to have prevailed in pergunnah Coondi, where the Mohomedans made their first conquest"১ কোচবিহারের হিন্দু নরপতিগণের শাসন দণ্ড রঙ্গপুরের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কুণ্ডী হইতেই অপসারিত হইয়াছিল। এজন্য কুণ্ডীর সহিত কোচবিহারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া যায় না। কোচবিহারের ইতিহাসেও উহার বিষয় কোন উল্লেখ নাই।

রঙ্গপুরের অন্যান্য জমিদারীর উৎপত্তির নিম্নলিখিত বিবরণ উপরোক্ত রিপোর্টে এবং কোচবিহারের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহারাজা মহেন্দ্র নারায়ণের সময়ে অর্থাৎ ১১৯৪ সালে বা ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে মুরশিদাবাদের নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে মোগল বাহিনী এবাদৎখাঁর অধীনে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার প্রধান তিন চাকলা ফতেপুর কাকিনা ও কাজীর হাট অধিকার করেন। অবশিষ্ট তিনটী চাকলা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগও আক্রান্ত হয় বটে কিন্তু বিষম বাধা প্রাপ্ত হইয়া মোগল সৈন্য তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রকৃতি দেবী যেন নিজহস্ত দ্বারা এই তিন ভূখণ্ডকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক বাধাই বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগে পঞ্চবিংশবর্ষ ধরিয়া বিজাতীয়গণের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিল।

কোচবিহার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে প্রথমোক্ত তিনটী চাকলা এবং টেপা, মন্থনা, ঝোরী প্রভৃতি পরগণা গুলি কোচবিহাররাজের অধীনস্থ যে সকল কর্ম্মচারীবর্গের দ্বারা শাসিত হইত তাঁহাদের চক্রান্তেই এত শীঘ্র বিজিত হইয়া মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সেই সকল রাজকর্ম্মচারীগণ বিজেতাগণের নিকট হইতে আপনাপন শাসনাধীন পরগণার কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক এক একটী পৃথক জমিদার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে পাঙ্গার রাজা ও বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরাও মুসলমানদিগের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক কিছু কিছু কর প্রদানে সম্মত হন। স্বাধীন কোচবিহারের পতন এইরূপে পূর্ণরূপে সাধিত হয়। ২

মোগলদিগের রাজ্যলিপ্সা ইহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ চাকলার উপরে যে লোলুপদৃষ্টিপাত করিতেছিল, তাহার ফলে মহেন্দ্রনারায়ণের পরবর্ত্তী ভূপতি রূপনারায়ণের সময়ে ১৭১১ খৃঃ অব্দে ঐ তিন চাকলা সম্বন্ধে একটী সন্ধি হইয়া স্থির হয় যে রাজার প্রধান মন্ত্রী শান্তনারায়ণের নামে মুসলমানগণের অধীনে উহা ইজারা

১। Report on the Statistics of Rungpur 1372—73 P. 39.

২। Cooch-Behar state and its Land Revenue settlement chap VI page 240.

লওয়া হইবে। মুসলমানগণ তজ্জন্য করপ্রাপ্ত হইবেন। আজ পর্য্যন্ত ঐ তিন চাক্‌লা কোচ-বিহারের জমিদারী হইয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মোগলরাজত্বের প্রারম্ভে ও শেষে রঙ্গপুরে ভূম্যধিকারিগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। তৎকালে আধুনিক কালের ন্যায় সুসভ্য প্রণালী সম্মত সুশাসনের ব্যবস্থা না থাকিলেও যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাবর্গ অন্নবস্ত্রের কোনরূপ কষ্ট পাইতেন না তাহার প্রমাণ, বিখ্যাত ঐতি-হাসিক গ্রন্থ রিয়াজুস্ সালাতিনের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেই পাওয়া যাইবে।

"বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁয়ের শাসন কালে শস্যাদি এতদূর সস্তা ছিল যে, এক দামরীতে (৩২০ দামরীতে ১ টাকা) এক সের চাউল বিক্রয় হইত। তিনি রাজধানীতে (দিল্লীতে) প্রতিগমন করিবার সময় জাহাঙ্গীর নগরস্থিত দুর্গের পশ্চিমদ্বার রুদ্ধ করিয়া শস্যাদির মূল্য পুনর্ব্বার তত্তুল্য সস্তা না লইলে উহা উদ্ঘাটন করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া-ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীনের শাসনকাল পর্য্যন্ত উক্ত পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ ছিল। সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইলে এই দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়।" ১

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা গেল যে, বাংলায় তৎকালে এক টাকায় আট মণ চাউলও মিলিত, আর আজ সেই বাংলায় সভ্যতা-সম্মত সুশাসনের মধ্যেও টাকায় আট সের চাউল মিলিতেছে না। ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

প্রাচীন ইদ্রাকপুর জমিদারী, ফকীরকুণ্ডী বা রঙ্গপুর জমিদারী এবং কোচবিহার হইতে গৃহীত ছয়টী চাক্‌লা হইতেই রঙ্গপুরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আদি জমিদারীগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। সরকার কড়াই বাড়ীরও অনেকাংশ এই জেলার জমিদারীভুক্ত হইয়াছে। উহা হইতে উৎপন্ন জমিদারীর মধ্যে বাহারবন্দের নামই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বাহারবন্দের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত নিখিল চন্দ্র রায় প্রণীত মুরশিদাবাদের ইতি-হাসের পরিশিষ্টে এবং ১৮৭২ ও ৭৩ খৃঃ অব্দের রঙ্গপুর রিপোর্টে দ্রষ্টব্য। সমগ্র বাহারবন্দ পরগণা এবং ভিতরবন্দ ও গয়বাড়ী পরগণার কতকাংশ লইয়া রঙ্গপুরের মধ্যে আধুনিক কালেই এই বৃহৎ জমিদারী গঠিত হইয়া-ছিল। উহার আদি জমিদার চাঁদরায়। তৎপুত্র রঘুনাথ রায় পিতার জমিদারী ভোগ করিয়া স্বর্গগত হইলে, রঘুনাথ-পত্নী রাণী সত্যবতী ঐ জমিদারী প্রাপ্ত হন। রাণী সত্যবতীর পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব। তিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদিতে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। রাণী সত্যবতীর হস্ত হইতে নাটোরের রাজা রামকান্ত ও তৎপরে তৎপত্নী সুপ্রসিদ্ধা রাণী ভবাণীর হস্তে এই জমিদারী চলিয়া যায়। পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ কান্তবংশাবতংশ লোকনাথ নন্দীর হস্তে ১৭৯০ খৃঃ অব্দে বা ১১৯৭ সালে উহা ছিল। লোক-নাথ নন্দীর বংশধরেরাই উহার বর্ত্তমান মালিক। ২

১১৯৭ সালের রঙ্গপুরের রাজস্বের তৌজীতে মোট ৭২টী জমিদারীর সংখ্যা পাওয়া যায়। ঐ ৭২টী জমিদারীতে ৮, ১৮, ৩৬০৲ টাকা

১। রিয়াজুস্ সালাতিনের বঙ্গানুবাদ ৩য় উদ্যান ২১০ পৃঃ।

২। 1872 73 Reports on Ruegpur by G. C. Das page 44.

খাজানা আদায় হইত। ১৮৭২—৭৩ খৃঃ অব্দে রঙ্গপুর কালেক্টরীর তৌজীতে ছোট বড় জমিদারীর সংখ্যা ৫৬৩টী হইয়াছে উহাতে ৯, ৭৪, ৩৮৯৲ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। (২) ইহাতে দেখা যাইতেছে যে রঙ্গপুরের জমিদারী প্রথমে কয়েকটী মাত্র ছিল, তাহা হইতে ১৭৯০ খৃঃঅব্দে ৭২টীতে পরিণত হয়, ঐ ৭২টী হইতে ১৮৭২—৭৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ৮৩ বৎসর পরেই আটগুণ অর্থাৎ ৫৬৩টীতে দাঁড়াইয়াছে। আর ৮০ বৎসর পরে রঙ্গপুরে জমিদারী নাম থাকিবে কিনা সন্দেহ, কেন না এই হারে জমিদরীগুলি বিভক্ত হইয়া,—অধীনস্থ জোৎদারেরা জমিদার অপেক্ষা অধিক মুনাফাশালী হইয়া উঠিবেন। তাঁহাদের নিকটে জমিদারগণ কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। জমিদারীগুলিকে এরূপ ভাবে বিভক্ত করিতে দেওয়ার বিষময় ফল তখন গবর্ণমেণ্টও উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। ইহাকেই জমিদারদিগের হীনাবস্থা প্রাপ্তির মুখ্য কারণ বলিয়া The Zemindari Settlement of Bengal নামক সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"By the Subdivision of Zemindaries under the Hindoò laws of inheritance, which Sub-division has already, to a great extent, impoverished the class of Zemindars, and in two generations more may complete the work." মুসলমানদিগের সময়ে দেশের শোণিতশোষণকারী অবাধ বাণিজ্যনীতির ন্যায়, এরূপ অবাধ জমিদারী বিভাগ-প্রণালী জমিদারদিগকে হীনবল করিয়া দেশের বল ক্ষয় করিত না। জমিদারীগুলি অবিভক্ত থাকিত উহার মালিক মাত্র পরিবর্ত্তিত হইত। এই মালিক পরিবর্ত্তনপ্রথার যতই কোন দোষ আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না উহাতে দেশের সমৃদ্ধিনাশের আশঙ্কা খুবই কম ছিল।

রঙ্গপুর জমীদারীর সৃষ্টির বিবরণ একরূপ সংক্ষেপে বলা হইল বারান্তরে আমরা জমিদারগণের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

সারস্বত ভবন। *

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে সাহিত্য-সভা, নাগরীপ্রচারিণী সভা এবং সাহিত্য-পরিষদের নানা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অবশেষে সাহিত্য-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবন-ক্ষেত্রে সাহিত্যকে সার্ব্বভৌমত্বের আসনে সম্মানিত করিবার উপক্রম করিতেছে। কোন অভিনব ক্ষেত্রে কোন নূতন বীজের চাষ হইবে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে অনেক স্থলে বহু

২। গ্লেজিয়ারের রঙ্গপুর রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশ ১৮৭২—৭৩ রঙ্গপুর রিপোর্ট ৪২ পৃঃ by G. C. Das,

গবেষণা এবং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়; আবার কোন স্থলে একটি ফসলেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়। সাহিত্য-চর্চা বাঙ্গালীর জীবনে নূতন নহে—বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্থানে ইতিহাসের অভাব এই সাহিত্যই বরাবর পূরণ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু সমস্ত সাহিত্য-সেবীর এক সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া সমবেত ভাবে জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন। আরম্ভে যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে এ ক্ষেত্র এ শস্যের অনুকূল বলিয়াই আশা করা যায়—আশা করা যায়, সভ্য জগতে সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী বিশেষরূপে স্মরণীয় হইবে।

একটা শুভ লক্ষণ এই, বাঙ্গালীর চরিত্রে অন্য বিষয়ে যতই অনৈক্য লক্ষিত হউক, এ ক্ষেত্রে অনৈক্যের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। প্রথম যখন সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সাহিত্য-সভা নামে আর এক শাখা বাহির হইল, তখন মনে করিয়াছিলাম, এ বুঝি বা "যদুবংশের মুষল" হইল; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তা নয়। এই সেদিন রাজসাহী এবং বগুড়ায় পাশাপাশি একদিনে সাহিত্যের দুইটা সম্মিলনী হইয়া গেল। ভাবিলাম, এই বুঝি কুরুক্ষেত্রের সূচনা; কিন্তু এখন বুঝিতেছি সে আশঙ্কা বৃথা; বরং রাজসাহী-সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় তাহার অল্পদিন পরেই রঙ্গপুরের বার্ষিক সাহিত্যোৎসবে সভাপতিত্বের গৌরবে সম্মানিত হওয়াতে সে আশঙ্কার স্থলে আশাই দেখা দিয়াছে।

বাঙ্গালী কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই একতার প্রয়োজন বুঝে নাই; নরমপন্থী চরমপন্থী বাঙ্গালী মাত্রেই যে এক সুরে মিলিয়া জাতীয় মহাসমিতির সার্ব্বজনীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চীৎকার করিতেছে, ইহা রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহার একতার সামান্য পরিচয় নহে।

কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যেন এই একতার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি অনুভূত হইতেছে। ইহার এক প্রমাণ এই, সাহিত্য-সম্বন্ধে কেহ কোন সঙ্গত প্রস্তাব করিলে প্রায় তাহা বিফল হইতে দেখা যাইতেছে না, উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরে পরিণত হইতেছে।

সারস্বত-ভবন-প্রতিষ্ঠার এইরূপ একটি প্রস্তাব সংপ্রতি মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে, এবং অনেকেই আগ্রহের সহিত তাহার পরিণতির প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাহিত্য-রাজ্যে যাহা কিছু দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য, যাহা কিছু আদরের, গৌরবের এবং প্রদর্শনের যোগ্য, সে সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং সাজাইয়া রাখা; যাঁহারা চিন্তা-জগতে এবং ভাব-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের মস্যাধার এবং লেখনী, তাঁহাদের তৈল-চিত্র, আলোক-চিত্র এবং প্রতিমূর্ত্তি, এমন কি, তাঁহাদের ছত্রদণ্ডাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কোন মন্দিরকে তীর্থভূত করা, ইহা নিতান্তই আনন্দের ব্যাপার। তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেই প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া কালীঘাটে আগে মার পূজা দেয়, তাহার পরে গন্তব্য তীর্থে গমন করে। সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকে যেমন কালীঘাটে যাইয়া কালী মাকে দর্শন করিবে, সেইরূপ স্বদেশ এবং স্বজাতির গৌরব-স্বরূপ এই সারস্বত মন্দির দেখিতেও দলে দলে আসিবে, যাহা কিছু দিনের মধ্যেই

অতীতের স্বপ্ন-রাজ্যে কল্পনা-কুহেলিকায় পরিণত হইয়া পড়িত, তাহা চির দিনের জন্য বাস্তববৎ নয়নের প্রত্যক্ষীভূত রহিবে, ইহার অধিক আহ্লাদের ব্যাপার আর কি হইতে পারে? অনিত্যকে নিত্যতা প্রদান, অজীবের সজীবতা-বিধান, সর্ব্বধ্বংসি-সময়-স্রোতে সাধ্যানুসারে বাধা জন্মান, ইহাই মানুষের প্রধান পুরুষকার এবং সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই কার্য্যে যে জাতি যত কৃতকার্য্য, সেই জাতি তত শ্রেষ্ঠ।

এই আনন্দজনক প্রস্তাবের অনুশীলন করিতে করিতে সহসা মনের মধ্যে একটা বিতর্ক আসিয়া উপস্থিত হইল, এদেশে এরূপ সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় বাস্তবিকই উপস্থিত হইয়াছে কিনা? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে এ শ্রেণীর অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সন্দেহ নাই। আমাদের অনেক কার্য্যই বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল দেশের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং অনেক কার্য্যেরই উপযোগিতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবের দূরদর্শিতায় আমাদের সন্দেহ হইতেছে। দূরদর্শী মহাজন যথাসর্ব্বস্ব এক জাহাজে বোঝাই করে না, বিজ্ঞ ধনী সমস্ত ধন এক সিন্দুকে পুরিয়া রাখে না, অভিজ্ঞ সেনানী সমস্ত সৈন্য একযুদ্ধে নিযুক্ত করে না, বুদ্ধিমান জুয়ার টাঁকের সমস্ত টাকা একই ক্ষেপে বাজি ধরে না। তবে আমাদের যদি কিছু থাকে, সে সমস্ত সাধ করিয়া নিজের হাতে ধ্বংসের মুখে ধরিয়া দিই কেন? ধ্বংস যে নিশ্চয়ই হইবে, এমন কথা বলিতেছি না; তবে একটা সম্ভাবনা ত আছে? মানুষ দিব্য চক্ষে দেখিয়া কিছুই করিতে পারে না, সকল কাযই সম্ভাবনা দেখিয়া করে। সাবধানে থাকিলে বিপদ ঘটিবে না, একথা বলিলে বড়ই সাহসের পরিচয় দেওয়া হইবে।

জগতের ইতিহাসে এমন বিপদ অনেক স্থলে ঘটিয়াছে। আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়ার গ্রন্থাগারে যে যুগযুগান্ত-সঞ্চিত জ্ঞান-রাশি ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, মানব-সমাজ আর তাহা লাভ করিতে পারিল না। ভাণ্ডালেরা রোমান সমৃদ্ধির যে ক্ষতি করিয়াছিল, তাহার পূরণ হইয়াছে কি? সোমনাথ, নগরকোট, মথুরা প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন ছাড়া প্রতিকার আর কি আছে? যাঁহারা ঐ সকল স্থানে নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ কার্য্যের উপযোগিতা আমাদের মতনই বুঝিয়াছিলেন, ঐ সকল কার্য্যে তাঁহারাও আমাদেরই মত অর্থব্যয়, পরিশ্রম, উৎসাহ এবং মানবপ্রীতি, কিছুরই ত্রুটি রাখেন নাই। কিন্তু সেই সকল পুরুষ-সিংহের মধ্যে কেহ যদি সেই সময়ে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে সেই ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, কতকটা কল্পনা করা যায় না কি? তিনি তখন অবশ্যই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া থাকিবেন, "হায়, এ সব রত্ন যদি সমস্ত দেশে বিক্ষিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে একযোগে এক মুহূর্ত্তে এমন সর্ব্বনাশ হইত না!" মানুষ কেবল কল্পনা লইয়াই চলে না, অতীতের অভিজ্ঞতারও ব্যবহার করে।

অনেকে হয়ত বলিবেন, "এখন আর সে বর্ব্বরতার প্রাধান্য নাই; সভ্যদেশে কত স্থানে কত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল দেশের জাতীয় গৌরবের কত সামগ্রী তথায়

একত্র সঞ্চিত থাকিয়া যুগপৎ শিক্ষা এবং আনন্দ দান করিতেছে। এক ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের তুলনা বুঝি জগতে নাই। ঐ সকল মহত্ত্বের নিদর্শন যাহারা দেখিতে যায়, তাহারা কতকটা মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না লইয়া, নিজে কতকটা মহত্ত্বলাভ না করিয়া ফিরিতে পারে না।*

আদর্শ উচ্চ হওয়াই ভাল, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কিস্মৎটাও স্মরণ রাখা মন্দ নয়। বড়লোকের সঙ্গে চলিলে নজর বড় হইয়া যায়, এ একটা দোষ। আমাদেরও নজর বড় হইয়া গিয়াছে; আমরা দৈনিক খবরের কাগজ পড়ি, আর কথায় কথায় লণ্ডন, পারিস, বার্লিন, ওয়াশিংটনের কথার তুলনা করি, দৃষ্টান্ত দেখাই। আমরা যে কোন্ স্তরে আছি, কোন্ স্রোতে ভাসিতেছি, কিরূপ ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়াছি, তাহা এখনও বুঝি ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারকে রক্ষা করিবার জন্য যত বন্দুক, যত কামান, যত ড্রেড্‌নট্ আছে, আমাদের সে সব কিছু আছে কি? জামালপুর এবং বিডন-স্কোয়ারের অভিনয় আমাদের এক দণ্ডও ভুলিয়া থাকিবার জিনিস নয়। ঐরূপ অভিনয় যে কোন দিনে যে কোন স্থানে উপস্থিত হইতে কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। ঐরূপ সময়ে ঐ সকল স্থানে একটা সারস্বত-ভবন থাকিলে তাহার কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা কল্পনায় ধারণা করিতে অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার যে সাধনার সিদ্ধিক্ষেত্র, আগে আমাদের সে সাধনা হউক।

অতএব আমার বক্তব্য এই, আমাদের আদরের ধন যদি কোথাও কিছু থাকে, তাহা যেখানে আছে, সেখানে থাকিয়াই পুষ্পচন্দনে পূজিত হইতে থাকুক। এবং সাধারণের অবগতি ও স্বদেশ-সেবকের পরিতৃপ্তির জন্য তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত হউক; আর সারস্বত-ভবনের প্রয়োজন যদি একান্তই অনুভূত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ঐ সমস্ত দ্রব্যের এক এক প্রস্ত নকল সংগৃহীত হউক। নকল গেলে আসল থাকিবে, কিন্তু আসল গেলে তাহা চিরদিনের মত যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

মহাভারত।

কর্ণ।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত

মঙ্গলগ্রহ—কর্ণ।

মহাভারতের পাঠকগণ জানেন যে—কর্ণ-চরিতের বিশেষত্বগুলি এই :—

১। নরকাসুর (মৃত্যুদেব—যম) কর্ণ-মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন (মহা ৩।২৫১) (১)

২। কুমারী স্থিরযৌবনা পৃথার (২) গর্ভে সূর্য্যদেবের বা সূর্য্যনারায়ণের সমাগমে তৎক্ষণাৎ কর্ণের জন্ম হয়। (মহা ১।১১১)

* এই প্রবন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নূতন ও চিন্তনীয়। সাধারণের মতের সহিত এই মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও ইহা আলোচিত হইবার যোগ্য।

(১) হতস্য নরকস্য আত্মা কর্ণমূর্ত্তিম্ উপাশ্রিতঃ (মহা ৩।২৫১।২০)

(২) পৃথিবী দেবীর ঐতিহাসিক নাম পৃথা। (মহা ১।৫১)

৩। সহজাত কবচ কুণ্ডল পরিধান করিয়া কর্ণ ভূমিষ্ঠ হইলেন।

(মহা ১।১১১)

৪। ঐ কবচ কুণ্ডল অমৃত হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

(মহা ৩।২৯৮ ও ৩০৮)

৫। কর্ণের জন্মমাত্র পৃথা শিশুকে জলে নিক্ষেপ করেন।

(মহা ১।১১১)

ঐ জল অশ্ব নদীর ওরফে আকাশ-গঙ্গা নদীর জল।

(মহা ৩।৩০৭)

৬। প্রসবান্তে পৃথা সূর্য্যনারায়ণ-বরে পুনঃ কুমারীত্ব লাভ করেন।

(মহা ১।১১১)

৭। কর্ণের বৈয়াঘ্র রথ।

(মহা ৮।৩৮)

৮। সর্প-সদৃশ এবং ইন্দ্র ধনুকাকৃতি রত্নসারময়ী হস্তিকক্ষা (হস্তিবন্ধন-রজ্জু) কর্ণের রথধ্বজ।

(মহা ৮।৮৮)

৯। "সুরগণের মধ্যে আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর"। (৩)

(মহা ৮।৩২)

১০। কিন্তু ভীষ্মের মতে কর্ণ অর্দ্ধরথী মাত্র।

(মহা ৫।১৬৮)

১১। কর্ণের ধনুর নাম বিজয়।

(মহা ৮।৩২)

১২। মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথি।

১৩। কর্ণ দুর্য্যোধনের সখা।

১৪। দুর্য্যোধন কর্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত।

১৫। ভীষ্মদেব প্রকাশ্যে কর্ণের বিদ্বেষী, কিন্তু নির্জ্জনে কর্ণের প্রতি ভীষ্মদেবের প্রগাঢ় বাৎসল্য ভাব ছিল।

(মহা ৬।১১৯)

১৬। কর্ণ বহুপত্নীক এবং বহুপুত্রক।

১৭। কর্ণ সতীতমা দ্রৌপদীর মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

(মহা ১১।২৭)

১৮। স্বভাবে কর্ণ উগ্রপ্রতাপশালী এবং রণপ্রিয়; কিন্তু কর্ণ কর্কশভাষী এবং ক্রোধী।

১৯। দানে কর্ণ কল্পতরু। এজন্য কর্ণের উপাধি "দাতা"।

(মহা ১।১১১)

২০। অর্জ্জুন-বধে কর্ণ কৃতপ্রতিজ্ঞ। কিন্তু পিতৃদেবের পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া কর্ণ অর্জ্জুন-হিতৈষী ইন্দ্রদেবকে অভেদ্য কবচ কুণ্ডল চর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক দান করিয়া নিজ পরাভব ও মরণ-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

(মহা ৩।৩০৮)

২১। কর্ণের আদি নাম বৃষ ও বসুষেণ। কর্ণ, বৈকর্ত্তন, রাধেয়, অধিরথ এবং অঙ্গাধিপ।

(মহা ৩।৩০৭)

২২। ভীষ্মদেবের সেনানীত্ব আমলে কর্ণ ধনুত্যাগী হইয়াছিলেন।

(মহা ৫।১৫৫)

২৩। কর্ণ পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে কেবল অর্জ্জুনেরই-প্রতিদ্বন্দ্বী।

(৩) অস্ত্রৈঃ মৎসমো নাস্তি কশ্চিৎ দেবঃ ধনুর্দ্ধরঃ।

(মহা ৮।৩২)

২৪। কপিধ্বজে ও হস্তিকক্ষাধ্বজে সমর সুরু করে। কর্ণার্জ্জুন-চরম-সমরে ধরণী দেবী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিলেন; এবং তৎকালেই কর্ণ পরাভূত ও নিহত হন।

মহা ৮।৯১)

২৫। দুর্য্যোধনের জয়াশা কর্ণে নিহিত ছিল, কিন্তু কর্ণ শর্ম্ম বর্ম্ম জয়াশা সহ ইহলোক ত্যাগ করেন। (৪)

(মহা ৮।৯৫)

যদি মহাভারতের মধুর রসাস্বাদনে কাহারও মন ব্যাকুল হয়, যদি মানব-বেশ-পরিচ্ছন্ন সমরদেব কর্ণের চরিত্র অনুশীলনে কাহারও মনে কৌতূহল জন্মে, তবে সমরদেব ওরফে মঙ্গল গ্রহের জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহগুলি একবার চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া মহাভারত পাঠ করিতে হইবে। তাহা করিলেই সুবিমল মঙ্গল বিম্বে নিরম্বর কর্ণমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিবেন; এবং ঐতিহাসিক মহাকবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রচনা-চাতুর্য্য—হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকারী হইবেন। নতুবা সমরদেব ছদ্ম-মানব-বেশে এমন ভাবে আচ্ছাদিত আছেন যে, কোন ক্রমেই কর্ণ-চরিত্রের গূঢ় রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিবেন না। মহাভারতে মহাকবি সঙ্কেতে ও ইঙ্গিতে কুরুক্ষেত্রের বীরগণের মূল তথ্যগুলি অপরিস্ফুট রূপে কেবল তারা-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য এক একটি করিয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তারা-দর্শক ভিন্ন তাহার মর্ম্ম গ্রহণে অন্যের অধিকার নাই। এই কারণেই এত দীর্ঘ কাল মহাভারত প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব।

মঙ্গল গ্রহ।

মঙ্গল গ্রহের বহুনাম-মধ্যে মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, অঙ্গারক, ভৌম, যম (৫), নরক এই কয়েকটি নাম স্মরণ রাখিতে হইবে।

রাশিচক্রের মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে এবং নক্ষত্রচক্রের অপভরণী ও মূলবর্হণী নক্ষত্রে মঙ্গল গ্রহ অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এজন্য তারা জগতে তারা মেষ, তারা বৃশ্চিক, তারা অপভরণী, এবং তারা মূলবর্হণী মঙ্গল গ্রহের প্রতিকৃতি।

তারা-বৃশ্চিক-মুণ্ডে তারা চতুষ্টয়ময় সর্পাকৃতি মিত্রদৈবত অনুরাধা নক্ষত্র, তারা-বৃশ্চিক-বক্ষে তারা-ত্রয়াত্মিকা কুণ্ডলাকৃতি ইন্দ্র-দৈবত জ্যেষ্ঠা, নক্ষত্র, এবং তারা-বৃশ্চিক পুচ্ছে তারা-পঞ্চকাত্মিকা শঙ্খাকৃতি নির্ঋতি-দৈবত (৬) মূলবর্হণী নক্ষত্র অবস্থিত আছে।

তারা-বৃশ্চিক (Scorpio) তলে ব্যাঘ্র নক্ষত্র সম্পন্ন তারা শার্দ্দুল মণ্ডল (Lupus)

(৪) যম্ আশ্রিত্য কৃতং বৈরং সুতঃ তে সঃ গতঃ দিবম্। আদায় তব পুত্রাণাম্ জয়াশাং শর্ম্ম বর্ম্ম চ॥
(মহা ৮।৯৫।৪৬)

(৫) অঙ্গারকঃ যমঃ চৈব সর্ব্ব রোগাপহারকঃ। (স্কন্দপুরাণ)

(৬) নির্ঋতি অর্থে যম বা রাক্ষসেশ্বর। (শব্দকল্পদ্রুম)

এবং তাহার উর্দ্ধ দেশে মহারজ্জুবৎ তারা সর্প মণ্ডল (Serpens) বিরাজমান আছে। বর্ম্মরূপে সোমধারা (Milky way) তারা বৃশ্চিক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

উজ্জ্বলতায় মঙ্গল গ্রহ একটি কামরূপ তারা। মঙ্গল যখন পৃথিবীর নিকটে আসিতে থাকে, তখন উহার গতি ক্রমে হ্রাস হয়, কিন্তু উহার তেজ ক্রমে বাড়িতে থাকে। আরও অগ্রসর হইলে মঙ্গল গ্রহ স্থিরগতি প্রাপ্ত হয়। বিপরীত পদে (in opposition) উপনীত হইলে মঙ্গল বিম্ব পূর্ণিমারূপ ধারণ করে এবং মঙ্গল জ্যোতিষ্মান্ হয়। তখন মঙ্গল অগ্নিবর্ণ হয়। এবং তখন অঙ্গারক ও প্রদ্যুম্ন নাম সার্থক হয়।

উপপত্তি।

বেদমতে (ঋ: বে: ১।১৫৯।২) দ্যাবা পৃথিবী দেবগণের পিতামাতা। সূর্য্যনারায়ণের ঔরসে পৃথা—পৃথিবী দেবীর গর্ভে মঙ্গল গ্রহ, নরক, বীরভদ্র ও কর্ণবীরের জন্ম হইল। ভৌম ধরাত্মজ আদি নাম মঙ্গল গ্রহের নাম এবং মঙ্গল গ্রহের প্রতিকৃতিগণই ঐ সকল নাম ধারণে অধিকারী।

মঙ্গলের প্রতিকৃতি তারা বৃশ্চিক, নরক ও কর্ণ সকলেই কুণ্ডল-চিহ্নিত। কামদেব বর্ম্মময় বলিয়া এবং তারা বৃশ্চিক কবচ কুণ্ডলে বিভূষিত বলিয়া কর্ণবীর সহজাত কবচ কুণ্ডল পরিধান করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন এবং কামদেব সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া অশ্বনদীর জলে কর্ণ ভাসমান এবং রাধা নক্ষত্রের ক্রোড়ে তারা বৃশ্চিক অবস্থিত বলিয়া কর্ণ রাধাপুত্র। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক বীরগণ সকলেই পরভৃৎ। তারা বৃশ্চিক তারা ব্যাঘ্র রথোপরি অধিষ্ঠিত বলিয়া কর্ণের বৈয়াঘ্র রথ। "ব্যাঘ্রচর্ম্মে কর্ণের রথ পরিবৃত" এরূপ অর্থ—কষ্টকল্পনা মাত্র; এবং তারা বৃশ্চিকের উর্দ্ধে মহান্ তারা সর্প বিরাজমান বলিয়া সর্প-সদৃশ রত্নসারময়ী হস্তি-বন্ধন-রজ্জুতে কর্ণের রথধ্বজ অলঙ্কৃত। যুদ্ধ দেব মঙ্গল সমরে অজেয় ও অপরাজিত, সুতরাং কর্ণ দেবসমাজে অদ্বিতীয় ধনুর্ধর। তবে প্রতি দ্বিতীয় বর্ষে মঙ্গল অদৃশ্য থাকে বলিয়া কর্ণ অর্দ্ধরথী।

শনিগ্রহ যমদৈবত। সুতরাং শনি দুর্য্যোধন নরক-কর্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত। শনি-মঙ্গল কুগ্রহদ্বয়ে সম্প্রীতি স্বভাব-সিদ্ধ।

সূর্য্যসুত কর্ণ স্বভাবতঃ মার্ত্তণ্ড-ভীষ্মের প্রিয় পাত্র বটে। বাহিরে শত্রুভাব না দেখাইলে ইতিহ সরস হয় না।

সূর্য্য-সন্নিহিত মঙ্গল অদৃশ্য থাকে। অতএব ভীষ্ম রণনেতা বর্ত্তমানে কর্ণ অদৃশ্য ও ধনুত্যাগী না হইলে চলে কৈ।

বেদমতে "কামঃ দাতা" তাই মঙ্গল-কর্ণের দাতা উপাধি এবং সেই বেদ বাক্যের খাতিরে কর্ণ-চরিত্রে কল্পতরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। নতুবা রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া অর্জ্জুনবধে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াও পিতৃ-আদেশ না মানিয়া অর্জ্জুন-হিতৈষী ইন্দ্রদেবকে নিজ চর্ম্মচ্ছেদনানন্তর অভেদ্য কবচ কুণ্ডল দান করা কি মানবের সাধ্য?

বেদমতে (অথর্ব্ব ৯।২।১৬) কামদেব শর্ম্ম-

বর্ম্মের অধীশ্বর। এজন্য কর্ণ-নিধনে কৌরব-গণের শর্ম্ম-বর্ম্মের লোপ বর্ণিত হইয়াছে। সগৌরবে মহাবাক্যের পুনরুদ্দীপন সুকবির সেবকোচিত মহাব্রত

সতীতমা দ্রৌপদী কাম-কর্ণের ফুলবাণে বিচলিত হইবেন, ইহা বিস্ময়কর নহে। কামদেব মানব-দেহ-রাজ্যের অধীশ্বর, এজন্য কর্ণ অঙ্গাধিপ। ইতিবৃত্তবাদিগণ! ঐতিহাসিকের রচনা-চাতুর্য্যজালে পড়িবেন না পড়িবেন না। বিপরীত পদ ত্যাগ করিয়া মঙ্গল যেমন সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করে, অমনি ক্রমে উহার তেজোহীনতা হইতে থাকে; এবং তখন মঙ্গল গ্রহের যম নামের সার্থকতা হয় (৭)। অবশেষে সূর্য্যনারায়ণের নিকটস্থ হইলে মঙ্গল অদৃশ্য হয় এবং প্রতি দ্বিতীয় বর্ষ এই রূপে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। আবার প্রতি পঞ্চদশতম বর্ষে বিপরীত পদস্থ ক্ষুদ্র মঙ্গল গ্রহ ঔজ্জ্বল্যে তাহার প্রতিবাসী প্রকাণ্ড বৃহস্পতি গ্রহের সমকক্ষ হয় এবং কখনও বা তাহাকে পরাস্ত করে। এই জ্যোতিষিক ঘটনাই মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের ভ্রাতৃব্যতার মূল কারণ। মঙ্গল কুগ্রহ-শ্রেষ্ঠ এবং বৃহস্পতি সুগ্রহ-শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই কর্ণার্জ্জুনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মঙ্গল গ্রহে কামদেব মৃত্যুদেব-যম-নরক (বিচারপতি যম স্বতন্ত্র) এবং যুদ্ধদেব (স্কন্দ, বীরভদ্র এবং কর্ণ) অধিষ্ঠিত আছেন।

জ্যোতিষিক ইতিহ।

মঙ্গল গ্রহ।

পুরাণ-পাঠকগণ জানেন যে, পৃথিবী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন (বিষ্ণু পুরাণ ৫।২৯) "হে নাথ! যখন তুমি শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার এই পুত্র জন্মে। কুণ্ডল সহ এই পুত্র পালন কর। এই পুত্র ভৌম, নরক নামে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি।"

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (২।৮) লিখিত আছে, "বরাহযুগে বরাহকে ব্রহ্মা স্তব করিলে বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শ্রুতি-মতে পৃথিবী দেবী বিষ্ণুর বরাহ মূর্ত্তির পত্নী। এবং তাঁহার পুত্র মঙ্গল গ্রহ"।

বেদ মতে (অথর্ব্ব ৩।২৯।৭) "কামদাতা।" "কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" এবং (অথর্ব্ব ৩।২১।৪) অগ্নিকে কাম বলে, কাম শ্রেষ্ঠ ও অজেয়"। কাম (অথর্ব্ব ৯।২।১৬) ত্রিবিধ রূপে রক্ষক এবং শর্ম্মবর্ম্মে ত্রাতা।

নরক অসুরের ষোড়শ শত রমণী শ্রীকৃষ্ণ হরণ করেন। (এই নরক ভৌম নরকের পিতা)।

দেব-সেনাপতি স্কন্দদেব ভৌম গ্রহের অধিদেবতা (৮)।

---

(৭) তু। উদয়োন্মুখ নিস্তেজ সূর্য্য এবং অস্তোন্মুখ নিস্তেজ সূর্য্য বেদমতে যমনাম ধারণ করে।

(৮) স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতং।

সরলকথায় স্কন্দদেব ভৌম গ্রহের রূপ-বিশেষ এবং কুজ গ্রহ কার্ত্তিকেয় স্কন্দ দেবের অনুরূপ (৯)।

(পদ্মপুরাণ ১।২৪)

আবার মহেশ্বরের সেনাপতি বীরভদ্রও অঙ্গারক গ্রহই। শিব দক্ষযজ্ঞ-বিনাশান্তে বীরভদ্রকে বলিতেছেন (পদ্মপুরাণ ১।২৪) "হে বীরভদ্র! তুমি দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ সাধন করিয়াছ, আর লোক-দাহে প্রয়োজন নাই। সকলের শান্তিবিধানে গ্রহগণের অগ্রণী হও। হে ধরাত্মজ! তোমার খ্যাতি অঙ্গারক হউক। (১০)

ধরাত্মজ বা ভৌম এক ভিন্ন দুইটি নাই। জন্ম-বিবরণ পাঠেই দেখা যায় যে, নরক ও মঙ্গল গ্রহ একই বীরভদ্র (বীরশ্রেষ্ঠ) ও মঙ্গলের নাম-বিশেষ।

বৃশ্চিক রাশিস্থ তারা কুণ্ডল মঙ্গল গ্রহের নিশানা। ঐ নিশানা নরকাসুরেও উপলক্ষিত হয়।

কর্ণে বৈদিক দেব কামের পূর্ণ বিকাশ আছে; কিন্তু ইদানীন্তন কুরুচিময় কামদেবের আভাস মাত্র আছে। কর্ণে নরকাসুরত্ব অস্ফুট রহিয়াছে বলিলেও চলে। না হ'লে নয় বলিয়া কর্ণের বহুপত্নী ও বহুপুত্রের উল্লেখ হইয়াছে।

কর্ণে সমরদেবত্বও সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। বিপরীতপদে উপনীত হইতে পারিলে অর্জ্জুন-জয়ে সমর্থ হইবেন এই ভরসায় স্থির-গতি প্রাপ্তিকালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভাষায় ধরণীদেবী রথচক্র গ্রাস করিলে বিপন্ন কর্ণ অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রবিরাম ভিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কর্ণ-মঙ্গল বিপরীত পদস্থ হইলে কর্ণার্জ্জুন-সমরে জয় পরাজয় অনিশ্চিত দৈবায়ত্ত হইবে, এ জন্য তৎপূর্ব্বেই স্থিরগতি বর্ত্তমানে অর্জ্জুন-হস্তে কর্ণের পরাভব কল্পিত হইয়াছে! এই কল্পনায় ঐতিহাসিক অতি সুনিপুণ ভাবে জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। রথচক্রগ্রাস দৈবঘটনা নহে। তদ্বিষয় পূর্ব্বে কর্ণের বিদিত ছিল (মহা ৮।৪৩) কর্ণ-চরিতে অতিশয়োক্তির লেশও নাই।

ফলিত জ্যোতিষ মতে পাপগ্রহ মঙ্গল :—

উগ্রপ্রতাপী ক্ষিতিপাল মন্ত্রী
রণপ্রিয়ঃ বক্রবচঃ সরোষঃ।
সত্ত্বান্বিতঃ শূরগণপ্রণেতা
কুজস্য বারে প্রভবঃ মনুষ্যঃ॥

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)।

মহাভারতের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, কর্ণ চরিত্রের একটী দৃশ্য কেমন নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

অতএব মহাভারতে মঙ্গল গ্রহ কর্ণ-বেশ ধারণ করিয়াছে। কর্ণের ভারতীয় ভ্রাতা মঙ্গল-রাবণে মদনদেবের যে পূর্ণ বিকাশ উপলক্ষিত হয়, তাহার অভাবে কর্ণচরিত্র অতীব শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছে।

ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল ভিত্তি উদ্ঘাটনের প্রতি লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য এবং মূল ভিত্তি উদ্ঘাটিত হইলেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র শাখা পল্লব কবিপরম্পরার কল্পনা-প্রসূত। সুতরাং তাহার মর্ম্মভেদ সতত অনিশ্চিত থাকিবে। এজন্য আমরা কর্ণ-

(৯) কুজায় লোহিতাঙ্গায় গ্রহমধ্য স্থিতায় চ। কার্ত্তিকেয়ানুরূপায় সুরূপায় নমোনমঃ॥

(১০) "অঙ্গারক ইতি খ্যাতিঃ ধরাত্মজ! গমিষ্যসি।"

চরিত্রের সূক্ষ্ম সূত্রগুলিতে হস্তক্ষেপ করা সুবিহিত বা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি না ; যথা, কর্ণ নামের সার্থকতা কি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে যদি ইতিবৃত্তবাদিগণের অপ্রত্যয় হইতে আমাদের উপপত্তি নিষ্কৃতি লাভ না করিতে পারে, তবে আমরা নাচার। কিন্তু নাচার হইলাম বলিয়া কোন ক্ষোভ নাই। কারণ স্বয়ং ব্যাসদেব লিখিয়াছেন :—

ইন্দ্রদেব স্বর্গগত যুধিষ্ঠিরকে দেখাইতেছেন, "এই তোমার পূর্ব্বজ ভ্রাতা কুন্তিসুত অগ্নিপ্রভ সূর্য্যতনয় অগ্রজ শ্রেষ্ঠ রাধেয় নামে খ্যাত আদিত্যের ন্যায় গমন করিতেছেন, এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখ।" তাহা পড়িয়াও ইতিবৃত্তবাদিগণের চৈতন্য হয় নাই। (১১)

তারাদর্শক।

বিস্মৃত জনপদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের অভিযান।

সে আজ কত দিনের কথা। মুদ্‌কলের এক দরিদ্র কৃষকের পর্ণ-কুটীরে নন্দনের পরিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সকলের অলক্ষিতে সকলের অজ্ঞাতে সেই নন্দন-কুসুম বর্ণে ও গন্ধে প্রতিদিন হাসিয়া উঠিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত পিতা নীরস ও কঠিন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন কন্যার মুখের দিকে চাহিলেই তাহার সকল শ্রান্তি দূর হইত।

বালিকা নেহাল * দিনে দিনে মাসে মাসে পূর্ণাবয়বা হইতে লাগিল—শেষে তাহার রূপ-কাহিনী কৃষকের জীর্ণ কুটীর ছাড়াইয়া নৃপতির প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিল। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা পর্য্যন্ত এক দিন সে রূপের প্রশংসা করিয়া কহিয়াছিলেন—বালিকা বিধাতার সকল নৈপুণ্যের সারভূতা। †

পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত রমণীর রূপকাহিনী রুধিররঞ্জিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে। হিমালয়ের নিভৃত যোগারণ্যে যে দিন পার্ব্বতীর চরণস্পর্শে অকালে বসন্ত-সমাগম হইয়াছিল, সে দিন হরকোপানলে দুরন্ত মদন ভস্মীভূত হইল ; দণ্ডকারণ্যে দুঃখিনী জানকীর রূপচ্ছটায় দুর্দ্দম রাবণ বিদগ্ধ হইয়া স্বয়ংও মজিয়াছিলেন—সৌধকিরীটিনী কনক লঙ্কাকেও মজাইয়াছিলেন। সেইরূপ আবার রুক্মিণী-হরণে, অষ্টবক্রসম্মিলনে রমণীর রূপকাহিনী শোণিতের অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভারতের পুরাণাদি গ্রন্থে—পৃথিবীর ইতিহাসে কোন-না-কোন-রকমে কৃষ্ণকুমারীর বিষপানের ইতিহাসের অভাব নাই।

---

(১১) আদিত্যসদৃশঃ যাতি পশ্য এনং পুরুষর্ষভম্॥ (মহা ১৮।৪।১৬—১৭)

* কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন বালিকার নাম 'পরতাল'।

†...The creator seemed to have united all his powers in making her perfect.

—Firista.

বালিকা নেহাল যখন আর বালিকা রহিল না, তখন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। অল্পকাল-মধ্যেই কৃষক-দুহিতা অশেষগুণসম্পন্না হইল। তাহার স্বর্গীয় রূপলাবণ্য এবং অসীম গুণপনা ব্রাহ্মণকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ভাবিলেন, এ রত্নহার ভূপতির কণ্ঠেই শোভা পায়। ব্রাহ্মণ কালবিলম্ব না করিয়া বিজয় নগরে প্রস্থান করিলেন।

বিজয়নগরপতি ব্রাহ্মণের মুখে নেহালের কাহিনী শুনিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন—তাঁহার অন্তরে বাহিরে নেহালের মূর্ত্তি জাগিতে লাগিল। তিনি ব্রাহ্মণের হস্তে রত্ন-কণ্ঠ-হার ও নানাবিধ ভূষণাদি প্রদান করিয়া কহিলেন—'আমি নেহালকে বিজয়নগরের রাণী করিব। হে ব্রাহ্মণ! সদয় হও—নেহালকে আনিয়া দাও।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলেন, নেহালের পিতা-মাতার নিকট সহর্ষে শুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। ভিখারিণী রাজরাণী হইবে—পিতা-মাতার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল; কিন্তু নেহাল বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'না—তাহা হইবে না—বিজয়নগরের রাজঅন্তঃপুরমধ্যে আমি কিছুতেই বন্দিনী হইয়া থাকিব না। এই জীর্ণ-কুটীর-মধ্যে তোমাদের কোলে মাথা রাখিয়া থাকিতে পারিলেই আমি সুখী হইব।' নেহালের গণ্ড বহিয়া মুক্তা-ফলের ন্যায় স্বচ্ছ দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নেহাল রাজদত্ত উপহার স্পর্শও করিল না।

* * * *

ব্রাহ্মণ ক্ষুন্নমনে বিজয়নগরে গমন করিলেন—বিষন্ন হৃদয়ে রাজসদনে সকল কথা নিবেদন করিলেন। রাজার রুদ্ধ প্রেম-প্রবাহ যেন অকস্মাৎ মুক্ত হইল। নেহাল তাঁহার নিকটে আরও স্পৃহণীয় হইল, আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, কল্পনা নেহালকে আরও মাধুরীময়ী করিয়া তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আনিয়া ধরিল। দেবরায় কালবিলম্ব না করিয়া, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বহু-সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে খরস্রোতা তুঙ্গ-ভদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন; মনে মনে স্থির করিলেন, আবশ্যক হইলে নেহালকে হরণ করিবেন, তাহাতে যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে!

সেকালে মুদ্‌কল লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে বিষম বিরোধ চলিতেছিল। উভয়েই মুদ্‌কল করায়ত্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। যদিও ললনা-ললামভূতা নেহাল সেই বিরোধীয় জনপদে বাস করিত, দেবরায় সে কথা বিস্মৃত হইলেন, তিনি বিস্মৃত হইলেন, যে, প্রেমের অভিনয় করিবার সময় তখন তাঁহার ছিল না—তখন শক্তি সঞ্চয় করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। রমণীর রূপমোহে ভুলিয়া দেবরায় আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রাজধানী হইতে বিংশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত মুদ্‌কলে যাইয়া উপনীত হইল। তাহারাও জানিত না যে, মুদ্‌কলে প্রেমের অভিনয় করিবার জন্যই তাহারা আসিয়াছে, যুদ্ধ করিতে নহে—মুদ্‌কলবাসি-গণও তাহা জানিত না। তাহারা যখন শুনিল, বিজয় নগরের বীর নৃপতি সৈন্যসামন্ত লইয়া মুদ্‌কল অবরোধ করিতে আসিয়াছেন, তাহারা মনে করিল, ইহা আর কিছুই নহে, হিন্দু ও

মুসলমানের চিরাগত রাষ্ট্রবিদ্বেষ। তাহারা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ধনরত্ন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যে যেখানে পারিল, প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। নেহাল এবং তাহার পিতা-মাতাও অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিল।

সসৈন্যে মুদ্‌কলে আসিয়া রাজা দেখিলেন, সব শূন্য—নেহাল নাই—তাহার পিতা-মাতা নাই—নেহালের চিহ্নমাত্রও নাই। ব্যর্থ প্রেম তখন রোষের আকারে দেখা দিল! রাজসৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন-কালে যদৃচ্ছা লুণ্ঠনাদি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রক্তনদী বহিল—মুসলমানের সহিত হিন্দুর যুদ্ধ বাধিল। সেই অকারণ সমরে বিজয়নগরের দু সহস্র অশ্বারোহী সেনা চির-নিদ্রায় অভিভূত হইল!

সুলতান ফিরোজ শাহের সঞ্চিত ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেবরায়ের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অবিরাম যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বিজয়শ্রী সুলতানের দিকে কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেন। দেবরায় দেখিলেন, মুসলমান তাঁহার বড় আদরের বিজয়নগর অবরোধ করিয়াছে।

চারমাস অবরুদ্ধ থাকিয়াও বিজয়নগর আত্মসমর্পণ করিল না। হিন্দু-সৈন্য হৃদয়ের রক্ত দিয়াও বিজয়নগর রক্ষা করিতে লাগিল। সুলতান-সৈন্য তখন বঙ্কাপুর দুর্গ জয় করিয়া ৬০,০০০ হিন্দুর চরণে বন্দীর শৃঙ্খল পরাইয়া দিলেন। এ সঙ্কট-সময়ে দেবরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি ঘটিল বটে, কিন্তু তাহা বিজয়নগরের উজ্জ্বল রাজসিংহাসনে কালিমা লেপন করিল। দৃঢ়দুর্গ বঙ্কাপুর সুলতানকে অর্পণ করিয়া প্রভূত ধনরত্নে তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিয়াও যদি দেবরায় নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন! কিন্তু সুলতানকে তুষ্ট করিবার জন্য, শত্রুর কবল হইতে বিজয়নগর রক্ষা করিবার জন্য দেবরায় স্বীয় কন্যাকেও সুলতানের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন—রাজকুমারীর সহিত সুলতানের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল!

* * * *

বিবাহের আয়োজন হইল। সুলতানের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিজয়নগর সুসজ্জিত হইতে লাগিল—নগরতোরণ হইতে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ পথ বহুমূল্য সাটিন ও মখমলে এবং স্বর্ণসংযুক্ত কিংখাপে মণ্ডিত হইল। বহু যত্নে ও বহু সম্মানে অভিনন্দিত হইয়া সুলতান ফিরোজ শাহ দিবসত্রয় রাজ-প্রাসাদে অতিবাহিত করিলেন। বিদায়ের দিনে দেবরায় জামাতাকে বহু বহুমূল্য উপ-ঢৌকন প্রদান করিয়া দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইলেন। সুলতান ইহাতেই বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রধান অমাত্যকে কহিয়াছিলেন—'ছাউনি পর্য্যন্ত আমার অনুগমন করা বিজয়নগরপতির উচিত ছিল। একদিন না একদিন এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ লইবই লইব!*

দেবরায় যখন একথা শুনিলেন, তখন অপমানে, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া শোণিত বহিতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন—আর নহে, অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—সুলতানের সহিত যুদ্ধই করিব।'

* That he (sultan) would one day have his revenge for the *affront* offered him by such *neglect*. —Firista.

এদিকে বিজয়ী সুলতান রাজ্য, রাজ্ঞী ও অর্থ সমভিব্যাহারে রাজধানী কুলবর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সুন্দরী নেহালের সহিত স্বীয় পুত্র হাসন খাঁর বিবাহ দিলেন।

দেবরায়ের সোণার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। রূপ-মোহের প্রায়শ্চিত্ত হইল। দাক্ষিণাত্যের সমগ্র হিন্দুসমাজ সে প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাল নির্ণয়।

দেবরায় নগর সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। সুদৃঢ় প্রাচীর সুগভীর প্রাকার উচ্চ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেবরায় দেখিলেন, নগর বারিহীন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে পাষাণ প্রাচীর দিয়া নদীর গতি ফিরাইয়া দিলেন—দূরবর্ত্তী স্রোতস্বিনী বিজয়নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। বহু পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া সেই স্বাদু সলিল নগরের নানা স্থানে লইয়া গিয়া দেবরায় ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকরও বৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে নানাবিধ ফলফুলের উদ্যানে নগরের চতুর্দ্দিক্ সুশোভিত হইল। *

হিন্দুর গৌরবভূমি দাক্ষিণাত্যের প্রহরী বিজয়নগর যখন ফলে ফুলে পূর্ণ হইল, যখন তাহার শত সহস্র উদ্যানে সুগন্ধ কুসুম ফুটিল, সুস্বাদু ফল পাকিল, যখন দ্রাক্ষালতা পত্রে ও ফলে সুশোভিত হইয়া ধীর সমীরে দুলিতে লাগিল, তখন দেবরায় একদিন অকস্মাৎ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন—হৃদয়ের অপমান ক্ষত হৃদয়ে রহিয়া গেল।†

দেবরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীরবিজয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছয় বর্ষ ব্যাপী রাজত্বকাল কর্ম্মহীন কাটিয়া গেল—তিনি পিতার অপমানের প্রতিশোধও লইলেন না, রাজ্যেরও কোনও উন্নতি করিলেন না। ‡

বীরবিজয় ও তৎপুত্র দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকাল-নির্ণয়ে অনেক মতভেদ আছে। প্রচলিত সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থে সে ভেদের মীমাংসা হয় নাই। শিলাফলক দৃষ্টে ইহাই জানা যায় যে, দেবরায় ১৪১২-১৩ খৃঃ

* This water proved of such use to the city that it increased his revenue by more than three hundred and fifty thousand *pardaos.* By means of this water they made round about the city a quantity of gardens and orchards and great groves of trees and vineyards ......and many plantations of lemons and oranges and roses and other trees. Chronicle of Fernao Nuniz.

† দেবরায় ১৪১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ১৪১২—১৪১৩ খৃঃ অব্দের যে ফলক লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাই তাঁহার শেষ ফলকলিপি কারণ পরবৎসরের অর্থাৎ ১৪১৩—১৪ খৃঃ অব্দের ফলকলিপি তাঁহার পুত্র বীরবিজয়ের। পর্ত্তুগীজ নুনীজ তাঁহাকেই "*visaya*" নামে পরিচিত করিয়াছেন।

‡ He lived six years and during this time did nothing worth relating. Chronicle of Farnao Nuviz.

অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৪১৩-১৪ খৃঃ অব্দের ফলক-লিপিতে বীরবিজয়ের নাম উল্লেখ আছে। সুতরাং তিনি যে সেই সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় দেবরায়ের নামাঙ্কিত যে ফলক-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৪২৪-২৫ খৃঃ অব্দের। তৎপূর্ব্বের কোনও ফলক-লিপি বা অন্য নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন, কুলবর্গের সুলতান ফিরোজ সাহের সহিত তেলিঙ্গনার হিন্দুদিগের ১৪১৯ খৃঃ অব্দে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে সুলতান দুই বর্ষ ধরিয়া পাঙ্গুল দুর্গ অবরোধের পর শেষে সৈন্যমধ্যে মড়কের আবির্ভাব হওয়ায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "উচ্চপদস্থ অমাত্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। দেবলরায় এই সুযোগে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু-নৃপতিবৃন্দের এবং তেলিঙ্গনাধিপতির সাহায্যে দেবলরায় বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।" *

এইরূপ বীরত্বের কাহিনী, স্বদেশরক্ষার্থ এইরূপ অধ্যবসায়, উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে এইরূপ ঐকান্তিকী ইচ্ছা বীরবিজয়ের ইতিহাসে লিখিত নাই। তিনি অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন। ইহা হইতে এইরূপই অনুমান হয় যে, বীরবিজয়ের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দেবরায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া উক্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দেবরায় যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি অল্প বয়স্কছিলেন। কারণ, তাঁহার পিতামহ প্রথম দেবরায় রাজ্যারম্ভ করিয়াই (১৪০৬ খৃঃ অব্দে) যখন নেহালের প্রেম-মোহে পতিত হইয়া প্রেমের অভিযান করিয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার বয়স অধিক ছিল এরূপ অনুমান হয় না। বয়স অধিক হইলে বুদ্ধিও পরিণত হইত। যাহার সিংহদ্বারে শত্রুর জয়োল্লাস সে কি কখনো প্রেমের অভিনয় করিতে পারে? তিনি সপ্ত বর্ষের অধিক কিছুতেই রাজ্য করেন নাই। তৎপুত্র বীরবিজয়ের রাজত্বকাল ছয় বর্ষ মাত্র। সুতরাং সিংহাসনারোহণকালে দ্বিতীয় দেবরায়ের বয়স অধিক ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়।

একটা কথা হইতে পারে, দ্বিতীয় দেবরায় অল্প বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে কিরূপে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন?

প্রাচীন বিজয়নগরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া সত্য নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ, কারণ পথ অতি দুর্গম এবং আলোক-বিরহিত। এমতাবস্থায় সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমানের বলে অগ্রসর না হইলে উপায় নাই।

যখন আমরা জানিতে পাই যে, দেবরায় সুলতানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে সমাজ ও চিরাচরিত কুলপ্রথা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া মুসলমানের হস্তে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন যে দাক্ষি-

* Many of the first nobility deserted the camp and fled with their followers to thier Jaghie‹s. At this crisis Dewal Ray cellected his army, and having obtained aid from the surrounding princes, even to the Rajah of Telingana (Warangal) marched against the Sultan with a vast host of horse and foot. Firista.

ণাত্যের হিন্দু-রাজন্য-সমাজের প্রাণে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা হীনবল ছিলেন বলিয়াই সেই মুহূর্ত্তে সুলতানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিজয়নগর তখন হিন্দু-সামন্তবর্গের শিক্ষার ও সম্মানের স্থান ছিল; দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা তখন বিজয়নগরের দিকেই চাহিয়া থাকিতেন। সেই বিজয়নগরের অপমান নিজেদের অপমান জ্ঞান করিয়া তাঁহারাই উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। সে উপযুক্ত সময় বীর-বিজয়ের অকর্ম্মণ্য রাজত্বকালে আসে নাই। তাহা দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়েই আসিয়াছিল। বিজয়নগরের নৃপতি বালক হইলেও বিজয়-নগরের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নামে সাহায্য ভিক্ষা করিলে কে না সাহায্য দিবে, তাঁহার নামে যুদ্ধাভিযান করিলে কোন্ রাজভক্ত হিন্দু তরবারি না ধরিবে? তাই হিন্দু সামন্তগণ ও হিন্দু অমাত্যগণ সুযোগ পাইয়া দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালের সূচনাতেই বিজয়নগরের চিরশত্রু সুলতানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

এই স্থলে আর একটী কথা বলা উচিত। বিজয়নগরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন; উহা বিস্মৃত অতীতের তমসাচ্ছন্ন কুক্ষিমধ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু সেই অন্ধকার-মধ্যেও দুই একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি কোন প্রকারে প্রবেশ পথ পাইয়াছে। নুনিজের রচিত কাহিনীতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় দেবরায়ের পুত্র যুবরাজ পিন্না-রাও * তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক গোপনে আহত হইয়া ছয় মাস মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নুনিজ লোক-মুখে জনরব শুনিয়া এই ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিব্রাজক আবদুর রজ্জাক যে সময়ে বিজয়নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। আবদুর রজ্জাক বলিয়াছেন, নৃপতি দ্বিতীয় দেবরায় তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক গোপনে আহত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৪৪২–১৪৪৩ খৃঃ অব্দের ঘটিয়াছিল।

আবদুর রজ্জাক ১৪৪৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনো তিনি দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহাই অনুমান হয় যে দ্বিতীয় দেবরায় ১৪৪৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবদুর রজ্জাক ঘটনার স্থলে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বলিয়া নুনিজ অপেক্ষা তাঁহার কথাই অধিক প্রামাণ্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে একটী ফলক-লিপি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে দেবরায়ের নামাঙ্কিত আছে। প্রস্তর-ফলক ১৪৪৯ খৃঃ অব্দের। এই দেবরায় তবে কে? এইখানেই অন্ধকার এত অধিক যে, ভেদ করা অসম্ভব। হয়ত এমন সময় আসিবে, যখন নূতন প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হইয়া এই অন্ধকার দূর করিয়া দিবে।

[ক্রমশ]

শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য।

* পিন্না-বা-'চিন্না'-বা-'চিকা' 'ক্ষুদ্র' অর্থে ব্যবহৃত হয় দক্ষিণ ভারতে যুবরাজকে চিন্না রাও বা চিকারাও বা পিন্না রাও বলে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

রাজসাহী-নিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ,—

আপনারা দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া এ বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যসেবকগণের পরিচর্য্যার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং রাজসাহীর রাজোচিত আতিথ্য-ভারের উপর আর একটা গুরুভার চাপাইতে সাহসী হইতেছি; তাহা এই:—

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি-তত্ত্ব-নিরূপণের জন্য উত্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক—এতদর্থে রাজসাহীতে অনুরোধ করা হউক, এবং আগামী বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত তথ্য উপস্থিত করা হউক।

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বোঝার উপর এই নূতন আর একটা বোঝাকে আপনারা নিতান্তই শাকের আটি করিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের আদেশ লঙ্ঘনে আমার ক্ষমতা নাই। আজ যাঁহাকে আপনারা সভাপতির পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমি আমাকে তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তী অনুচর মধ্যে গণ্য করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহার আদেশেই আমাকে বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি যে কঠোর আদেশ হইয়াছে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি মহোদয় সেই আদেশ পালনে আমার যোগ্যতাটুকুও বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং আলোকবর্ত্তিকা হাতে লইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের অজ্ঞানাচ্ছাদিত যে পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আমিও অতি দূরে থাকিয়া সেই পথে তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করি; সেই পথের উপযুক্ত কোন একটা আদেশ দিলে বরং আমি সাহস করিয়া দুইটা কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু সহসা তিনি আমাকে এমন পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন, যেখানে কোন কথা উচ্চারণ করিতে গেলে আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চার ধৃষ্টতা আসিয়া পড়ে। কাজেই আমি অতি সভয়ে ও অতি সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইব।

এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আমার সামান্য একটু অধিকার আছে। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কতিপয় সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর সহিত আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; সেই সাহিত্য-পরিষৎ সভা এক্ষণে আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। এই রাজসাহী নগরে সেই সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আছে, এবং আপনাদেরই মান্য ব্যক্তিগণ সেই শাখার পরিচালনা করিতেছেন। সেই সাহিত্য-পরিষদের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পথ দিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন বিভাগ মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধন স্থাপন দ্বারা জাতীয় ঐক্য স্থাপন। আমরা আমাদের দেশকে ও আমাদের জাতিকে নিতান্ত আত্মীয় ভাবে জানিতে চাই। বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি আছে ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পৎ কোথায় কি আছে, কোথায়

কি ছিল, তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্য আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে,এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান। আমরা কে, আমরা কি, আমরা কোথা হইতে কিরূপে কোন সময়ে কি জন্য আসিয়াছি, এই জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে আবশ্যক, বিধাতা কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা সেই জ্ঞান লাভ হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব এবং তখনই আমরা আমাদের সামর্থ্য বুঝিয়া আমাদের যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া জগতে আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মিয়াছে, আমি এই গোঁড়ার তত্ত্বনিরূপণকেই তন্মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের ব্যগ্রতা, এই জন্য আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ করিয়া বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় ছুটাছুটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি এবং এ বৎসর আপনাদের দ্বারদেশে আঘাত করিয়া আপনাদের শান্তি ভঙ্গ করিতেছি। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আমরা যে দেশের পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক, সেই মহাদেশের—সেই হিন্দু মুসলমানের মহাদেশের—আমরা যে জাতির জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই মহাজাতির—সেই হিন্দু-মুসলমান মহাজাতির—সম্যক্ পরিচয় জানি না—আমাদের কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে, আমাদের কোথায় কি বল আছে, তাহা আমরা জানি না—পৃথিবীর নিকট আমাদের আত্মপরিচয় পূরা সাহসের সহিত আমরা দিতে পারি না। আমরা কোথা হইতে এদেশে আসিলাম, আমাদের আদিপুরুষ কে ছিলেন, তাঁহারা কবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা আমরা জানি না—আমাদের নিজের পরিচয় জানিবার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিকের মুখের দিকে চাহিতে হয়—হণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টি-ক্যাল্ গ্রন্থ খুঁজিতে হয়.—বিদেশী রাজপুরুষের সংগৃহীত সেন্সাসের খাতার পাতা উল্টাইতে হয়। ইহা ক্ষোভের বিষয়—ইহা পরিতাপের বিষয় —ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয়ত্বের মূল কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেই মূল হইতে কিরূপে মহীরুহ নির্গত হইয়া শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে; তবে আমরা আমাদের জাতীয়তা লইয়া জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব। নতুবা আমাদের জাতীয়তার স্পর্দ্ধা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপহাস্য আস্ফালনমাত্র হইবে। আমরা স্বদেশের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বদেশীয় ভাবের অভিনয় করিলে—বাহিরের জগৎ আমাদের অভিনয় দেখিয়া হাসিবে ও করতালি দিবে।

রাজসাহীর নিকট আমরা কি প্রার্থনা করিতেছি, একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। আমার পরম স্নেহভাজন আপনাদের আদরের পাত্র শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় আজ প্রাতে আপনাদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। এই রাজসাহী সেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের এক খণ্ড মাত্র।

স্থূলতঃ এখন বরেন্দ্রভূমি বলিলে যাহা

বুঝি, এককালে তাহা পৌণ্ড্রভূমি ছিল। সেই পৌণ্ড্ররাজের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল কি মহাস্থানে ছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা বিতণ্ডা করিতেছেন; কিন্তু এই দেশ যে এক কালে পুণ্ড্রজাতির দেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই পুণ্ড্রজাতি এখন কোথায়? আধুনিক পুঁড়ো, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাক্ষ কি তাঁহাদেরই বংশধর? পুণ্ড্রজাতি এখন লুপ্ত হইয়াছেন অথবা এই বরেন্দ্র জনপদ এখনও পৌণ্ড্রজাতিরই ভূমি রহিয়াছে, কি পৌণ্ড্রক রীতি নীতি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা না জানিলে আমরা বরেন্দ্রভূমি ও বরেন্দ্র-সমাজ চিনিব কিরূপে?

এখনকার রাজসাহী মুসলমানপ্রধান বা হিন্দুপ্রধান—তাহা লইয়া তর্ক করিয়া আপাততঃ লাভ নাই। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া রাজসাহীকে হিন্দুমুসলমানপ্রধান বলিয়াই দেখিব এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনকে বাঙ্গালার হিন্দুমুসলমানের অন্যতম সম্মিলনোপায় বলিয়াই জানিব। কিন্তু এমন দিন ছিল, তখন রাজসাহীতে মুসলমান ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না। সে বহুদিনের কথা; তখন এই ভূমি অনার্য্যভূমি ছিল—অনার্য্যভূমিতে আর্য্যাধিকার প্রসারের পরে ইহা হিন্দুর দেশ এবং আরও পরে হিন্দু মুসলমানের দেশ হইয়াছে! কিন্তু সেই অনার্য্য আদিম নিবাসী এখনকার হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন?—এই হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে কতটুকু অনার্য্যত্ব কতটুকু আর্য্যত্ব মিশ্রিত আছে? এককালে যে পুণ্ড্রজাতির এখানে অবিসংবাদী অধিকার ছিল, তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন কি আর্য্য ছিলেন?

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ও সমাজতাত্ত্বিকগণের সকল মত আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তকে উপহাসে উড়াইতে সম্প্রতি আমাদের অধিকার নাই। অন্ততঃ যতদিন হাণ্টারের গেজেটিয়ার ও রিজ্‌লির সেন্‌সাস্ বহির পাতাই আমাদের আত্মপরিচয় লাভের একমাত্র অবলম্বন থাকিবে, ততদিন সেইরূপ উপহাসে আমাদিগের অধিকার নাই। ইংরেজ লেখকেরা বলিতে চাহেন, বঙ্গদেশের সমাজ মুখ্যতঃ অনার্য্য সমাজ—বাঙ্গালীর শোণিতের চৌদ্দ আনা অনার্য্যরক্ত। এমন কি অনেকে ইহাও বলিতে চাহেন যে, আধুনিক বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহেন, সে ভাষা সংস্কৃত আর্য্যভাষার পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিলেও উহা মূলে অনার্য্য ভাষা; উহার অস্থিমাংস আর্য্য উপকরণে গঠিত হইলেও উহার মজ্জামধ্যে অনার্য্যত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। বিদেশী পণ্ডিতদের এই সকল সিদ্ধান্ত আমাদের রুচিকর হয় না। অথচ এই সকল সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ জন্য যে প্রমাণের প্রয়োজন, অবশ্য সে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, আমরা সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। প্রাচীন পৌণ্ড্রজাতিই অনার্য্য ছিল, কি আর্য্য ছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। অতি প্রাচীনকালে আমরা পৌণ্ড্রক জাতির আধিপত্যের নিদর্শন পাই। বৈদিক সাহিত্যে এই জাতির উল্লেখ আছে, মহাভারতে পুরাণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্রক নরপতি বাসুদেব ভগবান্ দ্বারকাপতি বাসুদেবের রাজচিহ্ন ধারণে সাহসী হইয়া তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্দ্ধা করিতেন এই কাহিনী পুরাণমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে জাতির এক

সময়ে এইরূপ প্রভাব ছিল, তাঁহারা আর্য্য না অনার্য্য? আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদের সভ্যতার অধিকার পাইয়াছি, না বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিজস্ব অপহরণ করিয়াছি, এই মূল তথ্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসনের পর পূর্ব্বদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া দস্যুর সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন এই আখ্যায়িকার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্যজাতির মধ্যদেশের আর্য্য-সমাজ হইতে দূরে সরিয়া শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপহেতু নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,এই উক্তির মধ্যেই বা কতটুকু সত্য আছে? ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা হয়ত একবাক্যে বলিবেন, পৌণ্ড্রজাতি অনার্য্য জাতি, কিন্তু আমরা এই সকল প্রাচীন কিংবদন্তীকে একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সাহিত্য-সম্মিলনের বৈজ্ঞানিক সভাপতি মহাশয় আমাকে সমর্থন করিবেন, যে বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি কোন পণ্ডিতেরই বাক্যকে অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে—সেই পণ্ডিতের গায়ের চামড়া কালই হউক আর ধ'লই হউক।

আমরা রাজসাহীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসার পথ একটু প্রশস্ত করিয়া দিন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-ক্রমে সেই উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় কিমিয়া বিদ্যাকে আপনার বশীভূত করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে শিখাইতেছেন, কিরূপে উৎকট যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন মূল উপকরণগুলি বাহির করিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবল কিমিয়া বিদ্যার একচেটিয়া নহে। ঐতিহাসিকেরাও সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া আমাদের এই যৌগিক সমাজকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অন্তর্গত মূল উপাদান গুলি আবিষ্কারে সমর্থ হইতে পারেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপে এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইবেন কিরূপে পদ্মা মহানদীর তীরদেশের মাটি খুঁড়িয়া প্রচ্ছন্ন জীবাস্থির বা উদ্ভিজ্জদেহের আবিষ্কার দ্বারা দেখান যাইতে পারে, পদ্মাদেবী কিরূপে এবং কত বৎসরে হিমালয়ের বুক চিরিয়া হিমাদ্রি পাষাণকে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবীভূত পাষাণের স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া এই সুজলা সুফলা বরেন্দ্র ভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কোন ইতিহাস লেখক এই পদ্মাদেবীর এই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার ভূতত্ত্ববিৎ বন্ধু পদ্মাদেবীর কত লক্ষ বৎসরের ইতিবৃত্ত এক নিশ্বাসে আপনাদিগকে শুনাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। সেইরূপ আমি বলিতে চাহি আপনাদের বর্ত্তমান এই বরেন্দ্র সমাজের অভ্যন্তরে প্রাচীণ সাহিত্য, প্রাচীন ভাষা, প্রাচীণ রীতিনীতি আচার ব্যবহার, গ্রাম্য গীত ও লৌকিক বচন উপকথা ও ব্রতকথা ছেলে ভুলান ছড়া ও দিদি মায়ের রূপকথা মধ্যে যে সকল প্রাচীন নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ প্রচ্ছন্নভাবে

নিহিত আছে তাহার আবিষ্কার দ্বারা শত শতাব্দ ধরিয়া স্তরের উপর স্তর গাথিয়া যে মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের আশা দুরাশা নহে।

এই ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমরা অতিথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের দ্বারদেশে আজ আঘাত করিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যেথায় যে জেলায় উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঘাত করিবে, তখন সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের প্রার্থনা জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমাদের জাতীয়তা কলনাদিনী স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার প্রাবৃট্‌কালের বিপুলকায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের সুরম্য হর্ম্ম্য গগনমূলে উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। এক বৎসরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন যদি শতবৎসর জীবিত থাকে, তবে সেই শতবৎসর পরে আমাদের প্রপৌত্রগণ এই রাজসাহী নগরে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্যের আংশিক সফলতা দেখিয়া আনন্দলাভ করিবেন। আমরা সেই কার্য্যের আরম্ভ করিয়া যাইতে পারিলেই চরিতার্থ হইব এবং বঙ্গদেশের সাহিত্যিক সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা যে কয়জন আপনাদের সাদর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের বোঝার উপর এই শাকের আটি চাপাইতে বসিয়াছি, তাঁহারাও কৃতার্থম্মন্য হইবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মেরুপ্রান্তে।

(২)

গতবারে মেরুমণ্ডলের অভিনব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব লীলাকৌশল অনাবশ্যক বিলাস-মণ্ডন নহে। মেরুবাসীরাও উপভোগ্য বস্তু জ্ঞানে ইহার সমাদর করে না। তাহাদের জীবন-মরণের সহিত এই শোভাসম্পদের সম্বন্ধ। রজনীর সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন আবরণ ইতর প্রাণীদিগের পক্ষে যাহাই হউক, কদাপি মানবজীবনের অনুকূল নয়। বিদেশী নাবিক ও পর্য্যটকগণের মুগ্ধ প্রীতি প্রয়োজনাবধানে হয় না, তাহা সৌন্দর্য্যলিপ্সার পরিতৃপ্তি-জনিত। পক্ষান্তরে মেরুবাসিগণ উষালোক ও বালার্করাগের জন্য যেরূপ আশা, আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় কালযাপন করে, তাহা বর্ণনাতীত। "The day when the sun re-appears is one of general rejoicing, the first who sees the great luminary proclaims it with a loud voice

and everybody rushes into the street to exchange congratulations with his neighbour.* সূর্য্যোদয়ের দিন মেরুবাসীরা মহোল্লাসে মত্ত হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতিষ্করাজের দর্শন লাভ করে, সে উচ্চৈঃস্বরে সাধারণে ইঁহার উদয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া থাকে। তখন জনমণ্ডলী দলে দলে পথে ছুটিয়া আসে এবং পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। এই মহোল্লাসের পশ্চাতে যে অভাব ও অতৃপ্তি বিদ্যমান, তাহা কোন বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে সম্ভাবনীয় নহে। মেরুমণ্ডলে এমন স্থান আছে, যেখানে কোন বিশেষ দিনমান নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আলাস্কায় ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্য একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট কাল চক্রবালের উর্দ্ধে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় মেরুবাসিগণ যে তৃষিত চাতকের ন্যায় অরোরা ও সূর্য্যালোকের জন্য অপেক্ষা করিবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সৃষ্টিকর্ত্তার এমনই করুণা যে, আলাস্কায় ২১শে ডিসেম্বরের ক্ষুদ্র দিনমান অবসান হইতে না হইতেই অরোরার অপূর্ব্ব ছটায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হয়। কোন দর্শক ইহার যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এই :—"It was not the conventional arch but a graceful undulating everchanging snake of pale electric light; evanescent colors pale as those of a lunar rainbow, ever and again flitting through it, and long streamers and scintillations moving upward to bright stars which shone distinctly through its hazy ethereal form". অরোরা এখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রকাশ হয় না। পাণ্ডুর বৈদ্যুতিক দ্যুতিময় একটি সর্প যেন গগনগাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার বিলাসতরঙ্গভঙ্গিমঠাম অবিরাম নবীনভাবে পরিবর্ত্তনশীল; এবং চান্দ্রমসী ধনুর্লেখাবৎ ছটাসমূহ নিয়ত সঞ্চরমাণ। এই সর্পাকার জ্যোতিস্তম্ভ হইতে স্ফুলিঙ্গ ও ধ্বজাকৃতি কিরণরেখা নির্গত হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের অভিমুখে উত্থিত হইতে থাকে। তাহাতে নক্ষত্র সকল অরোরার অর্দ্ধস্ফুটমূর্ত্তি ভেদ করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

আলোক ও ছায়া, মধুর ও ভয়ানক এবং প্রেম ও বিরহের এরূপ বিচিত্র সন্নিবেশ প্রকৃতির আর কোন লীলাক্ষেত্রে আছে বলিয়া জানি না। এক দিকে যেমন অপূর্ব্ব উষালোক, অপর দিকে তেমনি সুদীর্ঘ তমস্বিনী; একদিকে যেমন সুনীল অপার জলধি, অপর দিকে তেমনি প্রাণান্তকর হিমানীরাশি; একদিকে যেমন প্রলয়ঙ্করী আগ্নেয়গিরিশ্রেণী ও তুষার তরঙ্গিণী, অপর দিকে তেমনি মনোরম নির্ঝর ও তরুলতা বেষ্টিত হ্রদশোভা,—একাধারে এত বৈচিত্র্য চিরনিন্দিত মেরুপ্রকৃতিকে সম্পৎশালিনী করিয়াছে।

আইস্‌ল্যাণ্ডের হেক্লা, ওরেফা, স্ক্যাপ্টার প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। ইহাদিগের সংহার-মূর্ত্তিতে কতবার কত লোকালয় যে ভূগর্ত্ত-প্রোথিত অথবা কঙ্কর-ভূমিতে পরিণত

হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু সৃষ্টির এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, যাহাতে একের মৃত্যু তাহাতে অপরের জন্ম; একের নিবৃত্তিতে অন্যের উৎপত্তি। অন্য কথা কি, সমগ্র আইসল্যাণ্ড দ্বীপটা অগ্নেয়গিরির উদ্গারণে আবির্ভূত। অপিচ, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আইস্‌ল্যাণ্ডের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর নির্ঝর, উষ্ণপ্রস্রবণ ও জলপ্রপাতের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রেট গেইসার (Great Geysir) নামক উষ্ণপ্রস্রবণ তাহাদিগের অন্যতম। ইহা এমনই মনোহর যে, পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে—which is not merely one of the curiosities of the country, but one of the wonders of the Earth.। একটি পর্ব্বতের পাদমূলে প্রস্রবণটী অবস্থিত। গিরির সানুদেশ বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী রজতরেখাকারে প্রবহমানা। এই রমণীয় স্থানে প্রায় ছত্রিশ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া গ্রেট গেইসার বিরাজিত। প্রায় ছাপ্পান্ন ফিট ব্যাস বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার কূপ বা জলাশয় (basin); উহার গর্ভে একটি প্রকাণ্ড গহ্বর নলাকারে ভূমিভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে প্রায় সত্তর ফিট পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। জলাশয় হইতে যুগ-যুগান্তরের সিলিকা (Silica) সঞ্চিত হইয়া ৩০ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ গঠন করিয়াছে। গেইসারের স্ফটিক-সন্নিভ স্বচ্ছ জল নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ ও কানায় কানায় পরিপূর্ণ। উচ্ছ্বাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে বজ্রনিনাদবৎ একটি শব্দ হয়, তাহাতে সেই সমগ্র স্থানটী কম্পিত হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জল উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকে। ক্রমশঃ বৃহৎ বুদ্বুদ-সমূহ নল হইতে আসিয়া উপরিভাগে বিদীর্ণ হয়। এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়ার এইখানেই শেষ। পুনরায় জলাশয় পূর্ব্ববৎ স্থির ভাব ধারণ করে। প্রতি আশী, নব্বই মিনিট অন্তর এইরূপ উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। উত্তরোত্তর শব্দ প্রভৃতি বর্দ্ধিত তেজে প্রকাশ হইতে থাকে, শেষে একটী সুবৃহৎ রমণীয় উচ্ছ্বাস-স্তম্ভ সত্তর, আশী ফিট পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, তাহার চাকচিক্যময় শুভ্রতায় চক্ষু ঝলসিয়া যায়। উচ্ছ্বাসস্তম্ভ হইতে ধূম ও তপ্তজলকণা নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিনটি উচ্ছ্বাসের পর কূপ বা জলাশয়টী একপ্রকার শূন্য হইয়া পড়ে। কারণ, ছয় ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত জল শুষ্ক হইয়া যায়। ত্রিশ, চল্লিশ, মিনিট পরে পুনরায় জল উঠিতে থাকে এবং কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কূপটী পূর্ণ হইয়া উঠে। অতঃপর জল কূপ ছাপাইয়া উপরিউক্ত silica স্তূপের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হয়। আবার ঘণ্টাধিক কাল পরে সেই 'বজ্রধ্বনি-বৎ শব্দ, সেই ভূকম্পন, সেই জলোত্তাপ, সেই বুদ্বুদ-বিদারণ, সেই উচ্ছ্বাস;—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই রমণীয় প্রস্রবণলীলার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। কেন, বা কি উদ্দেশ্যে, কে বলিবে ?

আইস্‌ল্যাণ্ডে এইরূপ চমৎকার দৃশ্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। উপরিবর্ণিত উষ্ণপ্রস্রবণের সন্নিকটে কতিপয় ক্ষুদ্র হ্রদ

আছে। উঁহাদিগের স্বচ্ছ জলরাশির উপরি-ভাগে অতি সামান্য মাত্র গতিস্পর্শ ঘটিলে তলদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। কোন পর্য্যটক বলিয়াছেন, বর্ণনা অথবা চিত্রের দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য অন্যের হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। ভ্রমণকারিগণ এই স্থানের একটী গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অতি চমৎকার দৃশ্য নয়ন-গোচর করিয়া থাকেন। ইহা সার্টার (Surter) গুহা নামে বিখ্যাত। গুহাটি নিবিড় অন্ধকারে পূর্ণ। ইহার স্ফটিকময় অধোদেশ হইতে মন্দিরাকৃতি তুষারস্তম্ভ-শ্রেণী দণ্ডায়মান। ঊর্দ্ধে ছাদ হইতে দোদুল্য-মান হীরকোজ্জ্বল সুবৃহৎ বরফস্তূপ-সমূহ স্তম্ভশ্রেণী পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছে। দর্শক-দিগের দীপশিখা স্ফটিকময় প্রাচীরগাত্রে ও তুষার-নির্ম্মিত খিলান ও স্তম্ভশ্রেণীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সমগ্র গুহাটীকে অপূর্ব্ব দ্যুতি-ময় করিয়া তুলে। সুবিখ্যাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ প্রেয়ার (Preyer) এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সেই চিরতুষারাবৃত মেরু-স্থানে প্রকৃতির হরিৎ-শ্যামল মূর্ত্তি একেবারে দুর্লভ নয়। ক্ষুদ্র ট্রমসো দ্বীপটী ইহার প্রমাণস্থল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া উত্তুঙ্গ শৈলমালা উত্থিত হইয়াছে। স্থানটী তরঙ্গাকারে বিস্তৃত বলিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চভূমিসমূহ দৃশ্যমান হয়। মেরুমণ্ডলান্তর্গত আর কোন দ্বীপে এরূপ প্রচুর তৃণবল্লী ও গুল্মশ্রেণী দৃষ্ট হয় না। মাঠ ও পর্ব্বতগাত্রসমূহ নানা জাতীয় ফলপুষ্পে সুশোভিত। বিবিধ বর্ণের অজস্র 'বেরি' ফলিয়া স্বভাবের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ট্রমসো ও হ্যামারফেষ্ট দ্বীপের আঁকা বাঁকা সমুদ্রতটবাহী পথগুলি দুইপার্শ্বের গৃহশ্রেণী লইয়া নাগরিক শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতিদেবী এই কৃত্রিম শোভায় ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই। স্বচ্ছন্দজাত তৃণসমূহে গৃহছাদগুলি এরূপভাবে আচ্ছাদিত যে, এখানকার লোকদিগকে গৃহবাসী না বলিয়া ভূগর্ত্তবাসী অথবা কবরবাসী বলা যাইতে পারে।

ডাক্তার স্কোর্সবি (Dr. Scorseby) স্পিট্‌জবার্‌জেন্‌ দ্বীপপুঞ্জের একটি পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া মেরু-উপকূলের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"পর্ব্বত-শিখর হইতে অতি চমৎকার দৃশ্য নয়নগোচর হয়। পূর্ব্বে ও উত্তরে একটি উপসাগর এবং পশ্চিমে স্থির প্রশান্ত নীলাম্বুরাশি অনন্ত বিস্তৃত। স্থানে স্থানে ভাসমান তুষার শৈল উন্নত-শিরে গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার দুই পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী; সৌর-কিরণ-রাশি এই সকল উন্নত শিখরদেশে প্রতিহত হইয়া নিম্নে পৌঁছিতে পারে না। এই দিকে দিগ্বলয় পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি চলে, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ দেখা যায়। উহাদিগের সানুদেশ হইতে অসীম উপত্যকা-ভূমি তুষার-শুভ্র কলেবরে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ঊর্দ্ধদিকে প্রখর রবিকরোদ্ভাসিত নির্ম্মেঘ গগনের আর এক মনোহর দৃশ্য! এই সময় গিরিশৃঙ্গোপরি নিজের সঙ্কটাবস্থা স্মরণ করিলে যে মনোভাব উপস্থিত হয়, তাহা এই দৃশ্যকে আরও বিচিত্র ও অদ্ভুত করিয়া তুলে।"

এই সকল স্থানের নির্জ্জন গম্ভীর ভাব দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতি দেবী যেন একান্তে

বসিয়া পরম পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন। সেই প্রগাঢ় নির্জ্জনতা শিতশিথ-সূচিকা-সম অথবা মেরু-শৈত্যের তীব্রতার ন্যায় মর্ম্মভেদ করিয়া বিদ্ধ হয়। ভন বেয়ার (Von Baer) নামক জনৈক জার্ম্মান (Nova Jembla) নোভা জেম্‌লা দ্বীপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "As if the dawn of creation has just begun and life were still to be called into existence" অর্থাৎ এই স্থানটী দেখিলে মনে হয়, যেন সৃষ্টির প্রাক্কাল উপস্থিত; এবং জীব সৃষ্টি হইতে এখনও বিলম্ব আছে। ভন বেয়ারের এই উক্তি প্রলাপবাক্য নহে। কারণ, যে দুই চারিটি লতাপত্র আছে, তাহা এক প্রকার নিষ্পন্দ। যে কয়েকটী বিহগ ও পতঙ্গ আছে, তাহাদের অস্ফুট পক্ষধ্বনি অথবা ক্ষীণ কলকণ্ঠ এই দ্বীপের প্রগাঢ় নীরবতাকে কদাচিৎ ভঙ্গ করিতে পারে। প্রকৃতির এই মৌনভাব পর্য্যটকের হৃদয়ে যে অনুভূতি সঞ্চার করে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ডবলিউ-হার্টন প্রসিদ্ধ উত্তর অন্তরীপের একটি দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া এইরূপ বর্ণনা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন:—"সেই অত্যুচ্চস্থানে পদার্পণ করিবার পর আমার মানসিক অবস্থা যে প্রকার হইল, তাহা বর্ণনা করিতে সক্ষম নহি। এই মাত্র আমার স্মরণ হয় যে, আমি শৈশবের স্বপ্ন সফল হইল দেখিয়া ভক্তিভরে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। নিদারুণ শীত ও ঝটিকা সত্ত্বেও আমি গরম কাপড়-গুলি জড়াইয়া সেইখানে উপবেশন করি-লাম। এই অবস্থায় আমি বহুক্ষণ প্রকৃতির সেই অপূর্ব্বভাব নিরীক্ষণ করিলাম। সেখানে আমি একেবারে সঙ্গীহীন, একাকী; একটী মাত্র প্রাণী দেখিলাম না। বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে একটি কি দুইটী নৌকার পাল দেখা যাইতে-ছিল। শব্দের মধ্যে ঝটিকার বেগধ্বনি ও মাঝে মাঝে দুই একটি সামুদ্রিক পক্ষীর কাতরতাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ। তদ্ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। কি জানি, কোথা হইতে একটী মধুমক্ষিকা গুঞ্জন করিয়া আমার সমীপস্থ হইল। তথায় তৃণপত্র একেবারেই ছিল না; তবে, একটিমাত্র শুষ্ক শৈবালগুচ্ছ দেখিলাম। আমি অবতরণকালে সেই স্থানের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ শুষ্ক শৈবালগুচ্ছটি লইয়া আসিলাম।" উত্তর অন্তরীপের তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গে মধুমক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনি আকাশ-কুসুম-সম অলীক কল্পনা বলিয়া মনে হয় না কি? ভগবানের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে?

মেরুমণ্ডলের প্রাকৃতিক চিত্রে যেরূপ আলোক ও ছায়ার প্রতিকৃতি, সেইরূপ সামাজিক দৃশ্যপটে মানব-সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ দর্শকের চিত্তরঞ্জন করে। এস্কুইমো ও আইসল্যাণ্ডার, ল্যাপ ও নরওয়েবাসী, —উভয়ের মধ্যে দুস্তর-পারাবারব্যাপী ব্যবধান। একজন পাশবিক জীবলীলায় জীবন অতিবাহিত করে, আর এক জন সভ্যতার অরুণালোকে জ্ঞানানু- শীলনে রত। এক জনের ইতিহাসে শিকার, ধীবরবৃত্তি ও বর্ব্বর-সুলভ আচারকাহিনী, আর একজনের ইতিহাসে শাসনতন্ত্র, জ্ঞান-চর্চ্চা ও সামাজিক সৌষ্ঠব-চেষ্টা বিবৃত হইয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই ক্রমিক স্তরোন্নতি পরি-লক্ষিত হইবে। কিন্তু বৈষম্যের (Hetero-

geneity) মধ্যে যে সমতা (Homogeneity), অনৈক্যের মধ্যে যে একভাব দার্শনিকেরা বিবর্ত্তনবাদের মূলসূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই সামাজিক ক্রমবিভাগে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অসভ্যতার মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, বর্ব্বরতার মধ্যে সরলতা এবং কুসংস্কারের মধ্যে ভগবদ্ভক্তি, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা রাখে। এই পরিচয়-স্থলে অনেক ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সকে যে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।*

আইসল্যাণ্ড প্রধানতঃ নরওয়েবাসীদিগের একটি উপনিবেশ। জনৈক নরওয়েবাসী জলদস্যু প্রতিকূল বায়ুতে দৈবক্রমে এই দ্বীপের উপকূলে উপনীত হয়। তৎপূর্ব্বে আইসল্যাণ্ড দ্বীপে মনুষ্যের পদচিহ্ন পতিত হয় নাই। আটশত উনসত্তর খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের রাজনৈতিক দুর্যোগে তথাকার বহু অধিবাসী জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়া এই দ্বীপে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, স্কটলাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে বহু নরনারী আসিয়া এই উপনিবেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপ আইসল্যাণ্ডে একটি স্বতন্ত্র জাতি ও সমাজের সৃষ্টি হইল। উপনিবেশীরা প্রধানতঃ নরওয়ে দেশের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও দেবতা গ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। ইহার পরবর্ত্তী কাল আইসল্যাণ্ডের গৌরবের ইতিহাস। খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বীপে গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। সেই সময়ে আইসল্যাণ্ডবাসীদিগের বিদ্যানুরাগের সূত্রপাত। ক্রমশঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক

* শীত তুষারময় মেরুমণ্ডলের জীববাসোপযোগিতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, বিষুবরেখাস্থ সমুদ্রবারি প্রখর রবিকিরণে উত্তপ্ত হইয়া লঘু হয়। এই উষ্ণ ও লঘু জলরাশি কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া বিষুবরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ অনেকগুলি সমুদ্রপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। Gulf stream নামক প্রবাহ সুপ্রসিদ্ধ। সমুদ্র-প্রবাহের ফলে শীত ও উষ্ণমণ্ডলের উভয় স্থানের তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। বিষুবরেখাস্থ সমুদ্রবারি উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া মেরু-অভিমুখে ধাবিত হইলে, সেই উত্তপ্ত ও লঘু বারিরাশির স্থান শীতল বারি অধিকার করে। তাহাতে উষ্ণমণ্ডলের তাপ হ্রাস হয়। আর শীতমণ্ডলের যে অংশ দিয়া উত্তপ্ত বারিরাশি প্রবাহিত হয়, সেই অংশের তাপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সমুদ্র-প্রবাহের ফলে শীতমণ্ডলের শৈত্য ও উষ্ণমণ্ডলের উষ্ণতা অনেকটা প্রশমিত হয়। ইহাই মেরু-শৈত্যের মধ্যে জীববাস-সম্ভাবনার অন্যতম কারণ। Gulf stream নামক যে প্রবাহের কথা বলিলাম, উহা দক্ষিণ আমেরিকার নিকট উত্থিত হইয়া মেক্সিকো উপসাগর দিয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্য্যন্ত উত্তরবাহী হইয়াছে। তার পর ইহা পূর্ব্বমুখী হইয়া পুনরায় পূর্ব্বোত্তর পথ অবলম্বন করে। তাহাতে স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে ও স্পিটজ্‌বারজেন্ এই সমুদ্রপ্রবাহের ফল লাভ করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডের গমের চাষ ও ফ্রান্সের দ্রাক্ষার চাষ Gulf stream না থাকিলে হইত না। Curo Siwo বা জাপান-প্রবাহ নামে আর একটি সমুদ্রপ্রবাহ ভারত মহাসমুদ্রে উত্থিত হইয়া বেরিং প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হয়। তাহাতে আলাস্কা, অরিগণ প্রভৃতি দেশের শীতাধিক্য নিবারিত হইয়া থাকে।

অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। আইস্‌ল্যাণ্ডারদিগের জাতীয় বিবরণে দেশ জয় অথবা প্রবল শত্রু আক্রমণের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না সত্য, তথাপি তাহাদের প্রাচীন ইতিহাস গৌরবশূন্য নহে। সেই সুদূর অতীতে আইসল্যাণ্ডবাসিগণ প্রজাতন্ত্রে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। স্বতন্ত্র শাসনের সুশীতল ছায়ায় এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক উৎকৃষ্ট কবি, বক্তা ও ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে গিস্সুর (Gissur) নামক এক ব্যক্তি ইউরোপে যাইয়া বহু ভাষায় অধিকার লাভ করেন। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ধর্ম্মে, শিল্পকলায়, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপ এক কালে অশেষ সুখ-শান্তিতে ও মহিমা-গৌরবে দিন অতিবাহিত করিত। এইরূপ সাড়ে তিন শত বৎসর স্বতন্ত্র শাসনের পর যে যবনিকা পাত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি উত্থাপিত হয় নাই। পূর্ব্বের চিহ্ন-মাত্র এখন আর নাই, পূর্ব্বতন রাজধানী ও সুবৃহৎ ভজনালয় (Cathedral), প্রাচীন বিদ্যামন্দির ও ধর্ম্মাধিকরণ, সমস্তই নূতনকে স্থান দিয়া কাল সাগরে বিলীন হইয়াছে। ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্র নরওয়ে রাজমুকুটের অধীনতা পাশে বদ্ধ হয়। তার পরে মহামারী (Black Death), দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আসিয়া যথাবিধি দেখা দিল। স্ক্যাপটার প্রভৃতি আগ্নেয়গিরিসমূহ বৈদেশিক দস্যুর আক্রমণের সঙ্গে স্ব স্ব প্রতাপ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিল না। আইস্‌ল্যাণ্ডের গৌরবের দিন ক্রমে অস্তমিত হইল।

যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর আসে নাই। এক রাজা গিয়াছে, পুনরায় অন্য রাজা আসিয়াছে। আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীকে আর রাজদণ্ড ধারণ করিতে হয় নাই। এক্ষণে ডেন্‌মার্ক (Denmark) এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। দিনেমাররাজের নিযুক্ত এক জন গবর্ণর জেনারল বা শাসনকর্ত্তা আইস-ল্যাণ্ডের শাসন-কার্য্য পরিচালন করেন। পরাধীন হইলেও আইস্‌ল্যাণ্ডের ইদানীন্তন কাহিনী সভ্য জগতের চিত্তাকর্ষণের যোগ্য। পূর্ব্বের সেই বিদ্যানুরাগ ও উদ্যমশীলতা এখনও আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীর মজ্জাগত রহিয়াছে। পূর্ব্বের সেই ধর্ম্মভীরুতা ও নীতিপরায়ণতা অদ্যাপি তাহাদিগের পরিচয় প্রদান করে।

বর্ত্তমান রাজধানী রেইকজাভিক (Reykjavik) সমুদ্রতটে অবস্থিত। এই অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র সহরটি নিশ্চিতই কোন ইংরেজ বা ফরাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিবে না সত্য, কিন্তু ইহা উন্নতিশীল বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে যে ভবিষ্যতে রাজ্যের ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত একতালা অট্টালিকাগুলি ইতস্ততঃ কঙ্করময় পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান। দুইধারে বৃক্ষশূন্য বিস্তৃত কঙ্কর-ভূমি ; বহু দূরে পর্ব্বতচূড়ার অস্পষ্ট দৃশ্য,—বহির্ভাগে অন্য কিছুই চক্ষে পড়ে না। পথগুলি একেবারে নীরব, কোন প্রকার চক্র-যানে শব্দায়মান নহে। কারণ প্রায়শঃ লোক অশ্বারোহণে গমনাগমন করে। ক্ষুদ্র পতাকা-শোভিত গৃহগুলি দেখিলেই বণিক্-পল্লী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। গৃহস্থদিগের জানালায় ফুলগাছের টবগুলি পথ হইতে পরদার ভিতর দিয়া দেখিলে মনে হয়, রুচি-পারিপাট্যে ইহারা জগতের কোন সভ্য জাতির অপেক্ষা হীন নয়। Free trade বা অবাধ বাণিজ্যের প্রচলনে

ব্যবসায় ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই দ্বীপটি ইদানীন্তন রাজজাতি দিনেমারগণের একটি প্রধান ব্যবসায়-স্থল। তাহারা যে মাসে এখানে আগমন করে এবং শীত পড়িলেই চলিয়া যায়। যে কয় মাস দিনেমার বণিক্‌গণ না আসে, আইস্‌ল্যাণ্ডারগণ বহির্জগতের কোন সংবাদ শুনিতে পায় না। যে মাসে বসন্ত-সমাগমে দিনেমার জাহাজ ইউরোপের সংবাদ লইয়া নোঙ্গর করিলে তাহাদিগের আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পরাধীন আইস্‌ল্যাণ্ডারগণ বিদেশী বণিক্‌দিগের হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে নাই। হতভাগ্য ভারতবাসীদিগের ন্যায় তাহাদিগকে "পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না; অথবা তাহারা "হীরার বদলে জীরা" লইয়া "পরিবর্ত্ত-ধনে দুরভিক্ষ" গ্রহণ করে না। আইসল্যাণ্ডারগণ বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইয়া দিনেমারদিগের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়। কৃষকটি পর্য্যন্ত চূড়ান্ত দর দস্তুর না করিয়া বিদেশী বণিক্‌দিগকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে না। আমদানি ও রপ্তানি উভয়বিধ বাণিজ্যই সেখানে প্রচলিত। কাষ্ঠ, লৌহ, শণ, লবণ, কয়লা প্রভৃতি আমদানি হয়, এবং পশম, মোজা, দস্তানা, মেষচর্ম্ম মৎস্য (লবণাক্ত) ও ঘোটক প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গোল আলু, কপি, টর্ণিপ (মূল বিশেষ), পালি (শাক) অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শীতকালের পূর্ব্বে ঘাস কাটা (Hay making) কৃষকদিগের প্রধান কর্ম্ম।

অর্থসঞ্চয়ে আইসল্যাণ্ডারদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাহারা কর, বেতন প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রদান করে।

তাহাদিগের বিক্রয়লব্ধ রৌপ্যমুদ্রা সিন্দুক-জাত না হইলে, রৌপ্যালঙ্কারে (প্রধানতঃ চন্দ্রহার) রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ব্যারো (Barrow) নামক জনৈক পর্য্যটক বলিয়াছেন, এই সকল অলঙ্কারের গঠন ও কারিগরী শ্রেষ্ঠ ইংরেজ জহুরীদিগের যোগ্য। আজ কাল আমাদের দেশে যাঁহারা গৃহলক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য স্বর্ণকারের উদরপূর্ত্তি করিয়া লজ্জিত হন, তাঁহারা এই নজীরটা উদ্ধৃত করিতে পারিবেন।

কৃষক ও ধর্ম্মযাজকদিগের অবস্থা প্রায় সমান। উভয় সম্প্রদায়ই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে পীড্যমান। কৃষকপল্লীর ঘরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি। ৪ ফিট পাথরের গাঁথনির উপর কাষ্ঠের ছাদ;—তৃণ ও মাটির চাপড়ায় আচ্ছাদিত। ক্ষুদ্র পরিসরে বাসগৃহ, ভাণ্ডার, কর্ম্মশালা, গোশালা প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেওয়াল ও ছাদ। বাসগৃহের ছাদে ধূম নির্গমনের জন্য চিমনির পরিবর্ত্তে ছিদ্র থাকে। বায়ু প্রবেশের পথ রাখা হয় না। একটি মাত্র ঘরে পরিবার শুদ্ধ (কোন কোন স্থলে ১৮।২০ জন) লোক শয়ন করে। আবার অতিথি, অভ্যাগতগণ সময়ে সময়ে এইখানেই রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। ধর্ম্মযাজকদিগের অবস্থা কোনও অংশে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়। প্রত্যেক পল্লীতে একটি করিয়া ভজনালয় অবস্থিত। এই সকল ভজনালয়ে মাত্র ৩০।৪০ জনের স্থান হয়। বিদেশীয় পথিকগণও প্রয়োজন হইলে এই উপাসনা-গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে

ধর্ম্মযাজকগণের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। যে মাসহারা বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে সংকুলান হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগকে উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া অনেক হীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহারা কৃষক, রাখাল, কর্ম্মকার প্রভৃতি অনেকের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধা তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট কর্ম্ম। কিন্তু এই সকল দারিদ্র্যের আবাস-কুটীর সরস্বতীর অনুগ্রহ লাভে কখনও বঞ্চিত নহে। জনৈক লেখক তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,"Learing. virtue and even genius are but too frequently buried under this squalid poverty." বাস্তবিক, এই দারিদ্র্যের মলিনতাময় কুটীরে কত পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব লুক্কায়িত থাকে, তাহা কে সন্ধান করিবে? একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

জন থরল্যাক্‌সন (John Thorlackson) একটি ক্ষুদ্র পল্লীর পুরোহিত। তাঁহার বার্ষিক আয় ৯০৲ টাকা মাত্র। সুতরাং উদরান্নের জন্য তাঁহাকে উপরি-বর্ণিত সর্ব্ববিধ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। তিনি নিজের অবস্থার সম্বন্ধে স্বদেশীয় ভাষায় যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এক স্থানে আছে, "জন্মাবধি আমি দারিদ্র্যের সহচর। আমার এই সঙ্গীটি সত্তর বৎসরকাল আমাকে তদীয় বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়াছে। জানি না, বিধি কত দিনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবেন।" এই দরিদ্র ধর্ম্মযাজক জন্ম-কবি। দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়াও ইনি প্রাণের আরাধ্য দেবতা বীণাপাণিকে একদিনের জন্য বিস্মৃত হন নাই। পোপের মনুষ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ (Pope's Essay on Man) এবং মিল্টনের সমগ্র প্যারাডাইজ লষ্ট (Milton's Paradise Lost) ইনি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স, তখন প্যারাডাইজ লষ্টের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। তাঁহার কৃত অনুবাদের প্রথম তিন খণ্ড (first three books) ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের সাহিত্য-সমিতি মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র অনুবাদগ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। অনুবাদ গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার অনেকগুলি স্বরচিত কবিতা ও কাব্য আছে। সেগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 'ব্রিটিশ ও বিদেশীয় বাইবেল সভার প্রতিনিধি মিঃ হেণ্ডার্সন আইসল্যাণ্ডে গমন করিলে এই কবি ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হেণ্ডার্সন গিয়া দেখিলেন, প্যারাডাইজ লষ্টের অনুবাদক কবি কৃষকদিগের সঙ্গে ঘাস কর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বৃদ্ধ যথাশক্তি তৎপরতার সহিত বাটীতে আসিলেন এবং অভ্যাগতের সাদর আহ্বান করিলেন। হেণ্ডার্সন বলিয়াছেন, ৫॥ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ ক্ষুদ্র ঘরে একটি শয্যা ও ১॥০ হাত পরিমিত একটি টেবিল বিরাজ করিতেছিল। এই ক্ষুদ্র টেবিলটি কবির আরাধ্যা বাণীর কমলাসন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বীণাপাণির এইরূপ ভক্তসন্তান পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। দারিদ্র্যের বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিয়া এরূপ ভাবে বাগ্দেবীর চরণসেবা করিতে কয়জন পারেন? হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।"

কবির এই উক্তির সার্থকতা কি পৃথিবীর

সর্ব্বত্রই ? এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বগৃহের কথা মনে পড়ে। তিন্তিড়ী পত্রে জীবন ধারণ করিয়া যাঁহারা জগতে স্বজাতীয় সাহিত্য-দর্শনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠককে স্মরণ করিতে বলি হেণ্ডার্সন ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে "সাহিত্যিক ভাণ্ডার" নামক সভা থরলাক্সনকে (Thorlackson) ৩০ পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দেন। বৃদ্ধ কবি সভাকে সুন্দর লাটিন ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, এবং তৎসঙ্গে প্যারাডাইজ লষ্টের একখানি সমগ্র অনুবাদ উপহার দেন।

আইস্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্য-চর্চ্চার পরিচয় দিতে গেলে এইরূপ অনেক থরল্যাকসনের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। অবশ্য এই বিদ্যানুরাগ উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসন্তান, ধর্ম্মযাজক ও রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভাবের সহস্র তাড়না ও লাঞ্ছনার মধ্যে আইস্‌-ল্যাণ্ডবাসিগণ কিরূপ আগ্রহ ও উৎসাহে ভার্জিল (Virgil) হোমর (Homer) প্রভৃতির রস গ্রহণ করে, তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিবে। শুধু গ্রীক ও লাটিন কেন, ইংরাজী জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগের অল্প উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। যদিও সমগ্র দেশে একটি মাত্র বিদ্যামন্দির আছে, তথাপি কোনও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকতর বিস্তার লাভ করে নাই। আইসল্যাণ্ডের সন্তানগণ স্ব স্ব জননীর নিকট লিখিতে ও পাঠ করিতে শিখিয়া থাকে, এবং পিতা-পিতৃব্যের নিকট নীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যে সকল বিদ্যার্থী রাজধানীতে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া বৃত্তি লাভ করে, তাহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য কোপেনহেগেন (দেন-মার্কের রাজধানী) নগরে গমন করিয়া থাকে। সহজে মনে হয়, এই বৃহৎ নগরের দৃশ্যাবলী দরিদ্র আইস্‌ল্যাণ্ডার ছাত্রদিগের বুদ্ধি বিচলিত করিতে পারে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। বিদ্যার্জ্জন সাঙ্গ করিয়া দরিদ্র আইস্‌ল্যাণ্ডার বালকগণ শত অভাবগ্রস্ত জন্মভূমির ক্রোড়ে মহানন্দে ফিরিয়া আসে। ইহাদিগের বিদ্যানুরাগের আরও প্রমাণ আছে। রাজধানীতে Public Library বা সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে দ্বাদশ সহস্রাধিক পুস্তকের সংগ্রহ হইয়াছে। আর একটি অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি সাহিত্য-সমিতি আছে। এই সমিতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ গ্রন্থাবলী স্বজাতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেনমার্কের রাজধানীতে ইহার একটি শাখা আছে। দিনেমার গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে বার্ষিক ২৪ পাউণ্ড সাহায্য দান করেন। তদ্ভিন্ন সভ্যদিগের চাঁদা দ্বারা সমিতির ব্যয় সংকুলান হয়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সংবাদপত্রেরও অভাব নাই। সাকল্যে তিন খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।*

এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিগণের জাতীয় চরিত্র অনেক সভ্যতর সমাজের অনুকরণীয়। এখানে 'শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা'—চুরি শব্দটা আছে বটে, কিন্তু চোর নাই। আলস্য কাহাকে বলে, ইহারা জানে না। শীতকালে যখন কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, তখনও

* ক্ষুদ্র ট্রমসো দ্বীপেও একখানি সংবাদপত্র ও একটি লাটিন স্কুল আছে।

তাহাদিগকে সর্ব্বদা কর্ম্মলিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। কোথাও বালিকাগণ সূতা নির্ম্মাণ করিতেছে; কোথাও বয়স্কা রমণীগণ সীবনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কোথাও বালকেরা কৃষিযন্ত্র ও অন্যান্য গৃহসামগ্রীর সংস্কারে রত; কোথাও শিল্পকারগণ অলঙ্কার অথবা কাষ্ঠ, গজদন্ত ও রৌপ্য-নির্ম্মিত নস্যকৌটা লইয়া শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে যত্নবান্ সর্ব্বত্রই কর্ম্ম, চেষ্টা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সন্ধ্যার পরে কেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না। চর্ব্বির আলোকে বসিয়া পরিবারশুদ্ধ লোক একজনের মুখে জাতীয় ইতিহাস অথবা সাহিত্যিক পত্র পাঠ শ্রবণ করে। কখনও কখনও ভ্রমণকারী কথকের দল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের লোভে বাড়ী বাড়ী যাইয়া জাতীয় গৌরব-গাথা কীর্ত্তন করে। নব্য আইস্‌ল্যাণ্ডারগণ পিতৃপুরুষের সেই সকল গৌরবকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বদেশ-হিতৈষণায় উৎসাহান্বিত হয়। এই ক্ষুদ্র-দ্বীপবাসিগণের অশেষগুণসমুচ্চয় দারিদ্র্যের 'গুণ-রাশি নাশি" কলঙ্ককে পদাঘাত করিয়া সভ্য জগতের সমাদর লাভ করিতেছে।

মেরুমণ্ডলে সভ্যতালোক দেখিবার দ্বিতীয় স্থান নরওয়ে। এই দেশ ইউরোপের অংশ বলিয়া সভ্য সমাজের অনুষ্ঠান-নিচয় অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নরওয়ের অধুনাতন সমৃদ্ধি, শাসনতন্ত্রের গুণে। এখানে Constitutional Government প্রচলিত; অর্থাৎ ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে সীমাবদ্ধ রাজ-শক্তিমিশ্রিত প্রজাতন্ত্র। প্রজাসমিতির মধ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। রাজার মঞ্জুরী ভিন্ন কোন আইন বলবৎ হয় না বটে, কিন্তু যদি প্রজাসমিতি উপর্য্যুপরি তিনটি অধিবেশনে কোন বিধি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে রাজমতের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় নরওয়ে বাসীরা শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রতিগ্রামেই বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্থানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, সেখানে শিক্ষক- গণকে গৃহে গৃহে যাইয়া শিক্ষা দান করিতে হয়। প্রতি সহরে Public Library বা সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকস্থলে নরওয়ে কৃষকগণ ধর্ম্মযাজকের নিকট গ্রন্থসংগ্রহের জন্য চাঁদা পাঠাইয়া দেয়। ধর্ম্মযাজক তদ্দ্বারা গ্রন্থসংগ্রহ করিয়া পাঠার্থীদিগের নিকট প্রেরণ করেন। লেখাপড়া না শিখিলে কেহই নর-ওয়ের অধিবাসী বলিয়া আইনানুসারে গণনীয় হয় না এবং আইন সঙ্গত অধিবাসী ব্যতীত কেহ বিবাহ করিতে পারে না। যদি বিশ বৎসর বয়সে কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত নরওয়েবাসী বলিয়া গণনীয় না হয় তাহাকে 'সংশোধনাগারে' (Houseof correction) প্রেরণ করা হয়। এইরূপে নরওয়ে দেশে মূর্খতার শাসন হইয়া থাকে। আর কোন সভ্য সমাজে মূর্খতা দণ্ডার্হ অপরাধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কিনা সন্দেহ।

নরওয়েবাসীদিগের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। ইউরোপের অন্যান্য জাতি হইতে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য অধিক পরিলক্ষিত হয় না। তবে 'নরওয়ে কৃষক' সম্প্রদায়ের নাম সুবিখ্যাত। পৃথিবীর অতি দূর দেশ হইতে 'নরওয়ে' কৃষকের খ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। উপকূল-বাসী কৃষককুলের জীবন বড়ই ক্লেশসঙ্কুল। শীত-কালে খাদ, পাহাড় প্রভৃতি দ্বারা প্রতিবেশীদের

নিকট হইতে ইহারা এত বিচ্ছিন্ন হয় যে সহজে পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই সময় ছোট ছোট নৌকা তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। কিন্তু যতই ক্লেশপূর্ণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত করি না কেন, তাহাদিগের চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইবার যোগ্য। কৃষকেরা স্ব স্ব পৈতৃকভূমিতে স্বাধীনতার সহিত বিচরণ করে। এই অত্যল্প স্বাধীনতার আস্বাদনে তাহারা মনুষ্যত্বের অশেষ গুণে অধিকারী হইয়া থাকে। ধর্ম্মে তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও অকপট বিশ্বাস। প্রতি কুটিরে বাইবেল পঠিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ তাহাদিগকে অলস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদের উৎসাহের সীমা থাকে না। সাহস ও স্বদেশভক্তি 'নরওয়ে কৃষকের' চরিত্রের অলঙ্কার; ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিরহ।

আড়ানা—একতালা।

হেরি অহরহ তোমার বিরহ
　　ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
　　আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লব দলে শ্রাবণ ধারায়
　　তোমারি বিরহ বাজে হে॥
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়
　　কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
　　আমার হিয়ার মাঝে হে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

হরিদ্বার।

১

হেরিলাম হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড, হরির চরণ,
মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনখল, দক্ষ প্রজাপতি,
হেরিনু শ্রবণনাথে ভক্তিরসে রঞ্জিয়া নয়ন,
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্ডিকার অপূর্ব্ব মূরতি
শঙ্খধ্বনি, দেবার্চ্চনা, ওম্‌ধ্বনি—উদার ভারতী
শুনিলাম পথে ঘাটে সুমধুর "নমোনারায়ণ"
দেবকন্যা শান্তি হাসে, যোগনেত্রে কি বিচিত্র জ্যোতি!
মঠগুলি কি সুন্দর! কোথা লাগে দেবেন্দ্র ভবন?
কল কল তর তর যান গঙ্গা বাজায়ে কিঙ্কিনী
এ সুন্দরী নাগরীরে ভুজপাশে মেখলিত করি
গিরিকুঞ্জে কি উৎসব! বিহঙ্গেরে বিহঙ্গিনী মরি
শুনাইছে কলকণ্ঠে মনানন্দে মোহিনী সোহিনী!
বসুধার চারু বক্ষে হরিদ্বার স্বর্ণ-হারাবলী!
সৌন্দর্য্য-নির্ঝর আহা চারিধারে পড়িছে উছলি!

২

সৌন্দর্য্য বিভোর হয়ে—প্রাতে যবে দেবের অর্চ্চন
হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,—
গঙ্গাতীরে বসি ধীরে ভাবি আমি বিস্ময়ে মগন,
একি রূপ? মরি মরি কোন র‍্যাফেলের বর্ণসাজে
পুলকে জাগিল ছবি সুফলকে বিশ্বে অতুলন?
লাজে হারে কাশী কাঞ্চী! দেবের মালঞ্চ যেন রাজে!
এতোগো নগরী নয়। কল্পনার কুঞ্জবন মাঝে
সুকবি হয়েছে যেন অপরূপ সৌন্দর্য্য-স্বপন!
সৌন্দর্য্যের চিরউপাসক আমি—আঁখিমুদে আসে—
কে বা হরি? কেবা হর? নাহি থাকে নামরূপজ্ঞান!
পলকে পলকে আসি ঝলকিয়া নেত্রপটে ভাসে
সুন্দরের শত মূর্ত্তি! শতনেত্রে করি আমি পান
সেই লাবণ্যের ধারা!—সুন্দরের চরণ বাহিনী
সৌন্দর্য্যের পূতগঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী!
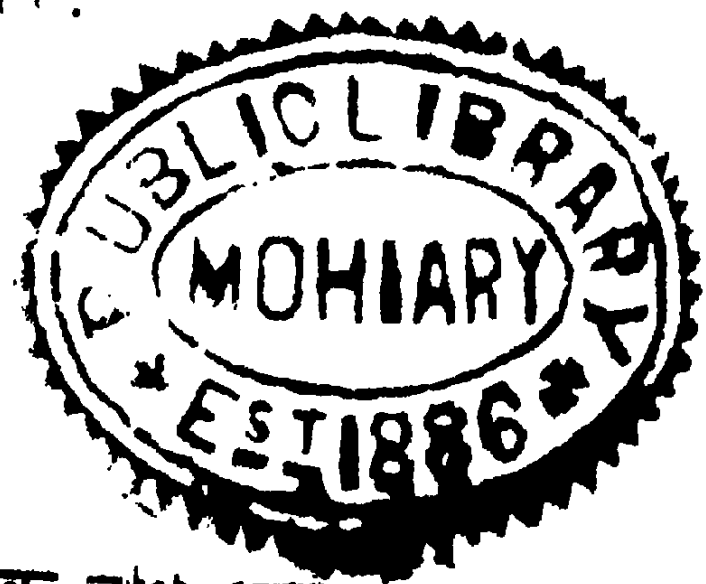
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন।

বঙ্গদর্শন।

পথ প্রান্তে।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"অসহায় দেবতাগণের নিকট যাচ্ঞা করিও না। স্বীয় আত্মার ভিতর মুক্তি অনুসন্ধান কর। মানুষ নিজ হস্তে আপনার নিগড় প্রস্তুত করে।"

প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাপ-ক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারের জন্য অমৃতময় এই মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। যোগমগ্ন শাক্যসিংহ দেখিয়াছিলেন মানুষের মুক্তির অন্য পন্থা নাই। মানুষ বৃথা ক্রন্দন করে, বৃথা তপ, জপ করে; বৃথা দেবার্চ্চনা করে। দুঃখ জগতের প্রকৃতি গত। দুঃখ সৃষ্টির নিয়ম। মানুষ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। দেবতা ও মানুষ এ বিষয়ে সমান অসহায়। তপ, জপ, পূজা, অর্চ্চনা সমান নিষ্ফল। নিয়ম লঙ্ঘিত হইতে পারে না। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে সৃষ্টি লোপ পাইবে। দেবতা ও মানুষ নিয়মের অধীন। তাই জ্ঞানের অবতার বুদ্ধদেব, দেবতাগণকে অসহায় বলিয়াছিলেন, তাই তাহাদের পূজা সংসার-তাপ-দগ্ধ মানুষের প্রাণে কখন শান্তিবারি সেচন করে না।

মানুষ মুক্তি চায় কেন? বন্ধনে তাহার আনন্দ নাই, তাহার জীবনের সার্থকতা সাধিত হয় না বলিয়া। মানুষ মনে করে তাহার সমুদয় কষ্ট এই বন্ধনের জন্য। বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য তাই তাহার এত আকাঙ্ক্ষা, এত প্রয়াস। মা পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, মনে করেন সেই পুত্র তাঁহার জীবনের সার্থকতার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। পুত্রের বিয়োগে তাই মা বুঝাইতে পারেন না কেন তাঁহার শোক, কেন তাঁহার এত কষ্ট। পুত্রের প্রতি স্নেহ ও তাহার মৃত্যুতে শোক, একই জিনিষের নামান্তর, একই ভাবের অবস্থাভেদ। প্রকৃতির নিয়মকে জয় করিতে চায় বলিয়াই ভাল বাসা এত দুর্জ্জয়, এত কঠোর। দেশ ও কালের ভেদ দূর করিয়া আত্মা আত্মার সহিত মিলিত হইতে চায়। এই জন্য মিলনে অতৃপ্তি ও বিয়োগে বিকার। সংসারের শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া

আত্মা যখন আত্মার সহিত মিলিত হইতে চায়, তখন জীবন মরণের নিয়ম উপেক্ষা করিতে সে সঙ্কুচিত হয় না, তখন সে যেন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে—"জড় নিয়মের অধীনতাই আত্মার একমাত্র ক্লেশের কারণ; নিয়ম জয় করিতে পরিলে জীবনে ও মরণে মানুষের অনন্ত সুখ।" মানুষ জড় আবরণ ভেদ করিয়া শুদ্ধ, পবিত্র আত্মার আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একত্ব উপলব্ধি করিতে চায়। তাহার সকল চেষ্টা, সকল সাধনা এই চরম লক্ষ্যের দিকে ধাবিত। যে পরিমাণে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ ও সিদ্ধি সীমাবদ্ধ, মানুষ সেই পরিমাণে অশান্ত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত। জীবনের সকল দুঃখ, সকল দৈন্য এই এক অনাদি, সনাতন সাধনার অভিব্যক্তি ও পরিচয়। ইহাকে আমি দুঃখ বলি না। ইহা ক্ষোভের কারণ নহে। বস্তুতঃ ইহাই জীবন। দুঃখ বল আপত্তি নাই; কিন্তু এ দুঃখ ব্যতীত জীবন কর্ম্মশূন্য মহা অন্ধকার, —বিপন্ন ব্যর্থতা।

জড় জগৎ মানুষের বুদ্ধি বিভ্রমের কারণ। এই জড় আকর্ষণে মানুষ যখন মুগ্ধ হয়, তখন মনে করে এই শরীরী জগৎ তাহার পরিণাম। আত্মাকে ভুলিয়া তখন সে শরীরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ও শরীরের সুখ, দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরীরের সুখ, দুঃখ মানুষের পরিণতি নহে। শরীরের ধ্বংসে তাহার ধ্বংস। জড় নিয়মের দুঃখ নিরাকরণের অন্য উপায় নাই। মনুষ্য জাতি যুগে যুগে নানা উপায় আবিষ্কার করিয়া দুঃখ দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখ জয় করা দূরের কথা, নুতন নুতন দুঃখ সৃজন করিয়াছে। বস্তুত জড় উপায়ে দুঃখ দূর করা অসম্ভব। দুঃখ জড় প্রকৃতির অঙ্গীভূত। যে পুত্র চিতানলে ভস্মীভূত হইতেছে, তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার প্রয়াস চিরদিনই ব্যর্থ হইয়াছে, এবং চিরদিনই হইবে। বিজ্ঞান এখনও এ সত্য উপলব্ধি করে নাই; তাই তাহার চেষ্টা এত উদ্দাম, এত ব্যর্থতাপূর্ণ এক দিন এমন আসিবে যখন নিজ ভ্রম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

মানুষ বিজ্ঞানের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, কখন বসিয়া থাকে নাই। সে অন্য পন্থা খুঁজিয়াছে, এবং অন্তরের অন্তরে জানিয়াছে "মুক্তি স্বীয় আত্মার ভিতর বিরাজিত।" তাই এক দিন ভারতের নিভৃত তপোবনে ঋষি গাহিয়াছিলেন—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

গীতা

তথা—

"কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তু কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যস্য সাধু সমাচরণ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

তথাচ—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" গীতা।

যে মানুষ মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত, মৃত্যু যাহার সমস্ত আশা ও আনন্দ হরণ করে,

সে এই বাণী শুনিয়া যেন আশ্বস্ত হইল। বুঝিল মানুষ মরে না, মানুষ অমর, নিত্য, শাশ্বত, ব্রহ্মস্বরূপ। তাহার ভয় দূর হইল। সে আত্মায় অমরত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিল। দেখিল সর্ব্বত্রই আত্মা প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ড আত্মায় বিরাজিত। তখন ক্ষোভ মোহ দূরে গেল। মহাভারতে অর্জ্জুনের এই দিব্যজ্ঞান লাভের কথা বর্ণিত আছে। সেই শুভ্র জ্ঞানলোকে অর্জ্জুনের ক্লীবত্ব দূর হইয়াছিল। অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন পৃথিবীতে পাণ্ডব, কৌরব, ভেদ নাই; দুর্য্যোধন, ভীম নাই; আত্মীয় পর নাই; জ্ঞানী, অজ্ঞান নাই; স্থাবর জঙ্গম নাই; জীবন, মৃত্যু নাই; দেখিয়াছিলেন পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, নিখিল বিশ্ব এক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, চৈতন্যময়; দেখিয়াছিলেন—

"অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্ত বাহুং শশি সূর্য্য নেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশ বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥" গীতা

কিন্তু এ দিব্যজ্ঞান সহজে হয় না। পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহারা বিশ্বে আত্মহারা হইয়াছিলেন, সকলকে সমান ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত ভারতের অমূল্য সম্পত্তি। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে এ শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। অনেকে এ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা শুধু জ্ঞান নহে। ইহা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম পরিণতি। এ বিদ্যার আলোকে ভারতের তপোবন দীপ্তিমান ও প্রোজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ তাহার মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিস্ময় ও অন্ধভক্তির ভারে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিয়াছে। অনেক সময় বালকের মত সরল, অকপট কণ্ঠে এই মহামন্ত্রের আবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু সে আলোক তাহার চিত্তের অন্ধকার দূর করে নাই। আলোক দুর্গপ্রাচীরের বহির্দ্দেশে অবস্থিত হওয়ায় ভিতরের অন্ধকার বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাই এ দেশে এত কুসংস্কার, এত জড়তা আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে কঠোর সাধনা দ্বারা ঋষিবাক্যের সত্য অবধারণ করিতে পারিয়াছিল, সে তাহাতে মজিয়া গিয়াছিল—সমাজের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই। তাই সমাজ ঋষির তপোবন হইতে বহু দূরে পিছাইয়া পড়িয়াছিল। এবং কালে তপোবনের আলোক সমাজে পোঁছিতে না পারায় সমাজ শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। এ বিচার আমার বক্ষ্যমান বিষয়ের অন্তর্গত নহে। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের ঋষিগণ জীবন রহস্যের মূলোৎঘাটন করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইলেও, ভারতীয় সমাজ শুধু তাহাদের অন্ধভক্তি করিয়াছে মাত্র, সত্যাবধারণ করে নাই।

আজ বহু শতাব্দীর পর আমরা পুনরায় সেই সত্যের আভাস পাইয়াছি। মুক্তির পথ এখনও সমান দুর্নিরীক্ষ ও বন্ধুর। কিন্তু আমাদের প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আজ

নূতন আকারে জাগ্রত হইয়াছে। আমরা আজ প্রাণের অন্তরালে অনুভব করিয়াছি মুক্তি আমাদের চরম পরিণতি—আমরা কখন চিরদিন পশুত্বের অভিশাপ বহন করিয়া মনুষ্যজাতির কলঙ্কস্বরূপ হইয়া থাকিব না। আরও বুঝিয়াছি মুক্তি শুধু ধ্যানের বিষয় নহে। মুদিত নয়নে কেবল মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি লাভ করা যায় না। মুক্তি সাধনার সামগ্রী, সাধনা ব্যক্তিগত হইলেও সমষ্টিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। জ্ঞান মুক্তির পথ প্রদর্শক বটে, লক্ষণ নহে। আবহমান কাল অনুষ্ঠিত সাধনার ফলে মনুষ্য সমাজ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, আমরা আজ অনায়াসে তাহার অধিকারী। কিন্তু তাই বলিয়া মুক্তি আমাদের করতলগত নহে। সে জন্য আমাদের কঠোর, একাগ্র সাধনা করিতে হইবে। হাইড্রোজেন, অক্‌সিজেন মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন হয় শুদ্ধ এই জ্ঞান আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে না। সে জন্য সেই জ্ঞানের সাহায্যে স্বতন্ত্র চেষ্টা করা আবশ্যক। সেই রূপ জ্ঞানের আলোকে মুক্তির অজ্ঞাত বন্ধুর পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান ভারত সেই পথ উন্মুক্ত করিয়া ভবিষ্যৎ মনুষ্য-সমাজের নিকট চির সম্মানিত হইবে। এ পথ জ্ঞানালোকদীপ্ত কর্ম্মের পথ। যে এই পন্থা অবলম্বন করিবে, তাহাকে রাগ, হিংসা শোক, দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি সমস্ত বিকার দূর করিয়া শুদ্ধ, অমল আত্মার সেবা করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম। নব্যভারত এই ধর্ম্ম পালন ও প্রচার করিয়া সমগ্র মনুষ্য জাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে। ইহা অন্য দেশের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্য জাতি কখন এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই। ইহা আর্য্যভূমির রত্নগর্ভসম্ভূত। এ দেশেই ইহার সার্থকতা সাধিত হইবে। অন্য দেশে মনুষ্য প্রীতি, ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে প্রীতি, আত্মাভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তাহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে না। তাই দেখি ভগবান যীশুর উপদেশ খ্রীষ্টীয় জগতে পদে পদে উপেক্ষিত ও অবমানিত। বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্ম কল্পিত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আর্য্যভূমি সমস্ত কল্পিত ভেদ উন্মূলিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবে। দেখাইবে ধর্ম্মের ভিত্তি জীবনের মৌলিক একত্বে। আমরা মানুষ, আমরা জীব, আমরা চৈতন্যস্বরূপ, আমরা ব্রহ্মের অবতার। আমাদের সুখ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, আমরা নিত্য, সত্য আনন্দ স্বরূপ। মৃত্যু আমাদের নিকট অলীক। আমাদের নিকট হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান, সকলেই সমান, সকলেই এক। বর্ত্তমান ভারতের জীবন এই মহান আদর্শে গঠিত হইতেছে। নগর, উপ-নগর, গ্রাম, বন, আজ—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো-মে ভক্তঃ স মে
প্রিয়ঃ॥"

এই মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ ভারতবাসী ব্যক্তিগত সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা

সঙ্কুচিত স্বার্থপরতার নামান্তর বলিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহান সার্ব্বভৌম আদর্শের দিকে ছুটিয়াছে। এ সাধনা যেমন কঠোর, তেমনই মধুর। কারণ ইহার প্রতিপদে ব্যর্থতার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, ইহাতে অপূর্ব্ব শক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হয়। মানুষ ব্যর্থতাকে জয় করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। জীবনে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে; মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয়, এবং জীবন সেই ভূমা, মহান্ আত্মার মহিমায় পরিপূর্ণ হয়; তখন সুখ দুঃখ থাকে না, শোক তাপ থাকে না, বন্ধন, দীনতা ঘুচিয়া যায়; মুক্তির ও শান্তির আলোকে জীবন পবিত্র ও কল্যাণময় হইয়া উঠে। পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়।

শ্রী

সাগর মাহাত্ম্য।*

কবিবর স্বর্গীয় হেমচন্দ্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"আস্‌চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, বুদ্ধির মিহির,
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু, শিষ্ট, সদালাপী,
দীক্ষা পথে বুদ্ধ ঠাকুর স্নেহ-জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল বিধবা বন্ধু, অনাথের নড়ি!
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম দাতাকর্ণ দানে
স্বাতন্ত্র্যে সেকুল কাঁটা পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরাজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্,
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্!"

কবি অল্প কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সিদ্ধ তুলিকার দুই চারিটি রেখা সম্পাতে বিদ্যাসাগরের যে চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে প্রস্ফুট করিয়াছেন, আমরা শত চেষ্টাতেও শত পৃষ্ঠাতেও সে ছবি ফুটাইতে পারিব না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিভার আধার, দয়ার অবতার, তিনি বিপন্নের ত্রাতা, দুর্ব্বলের বল, অনাথের আশ্রয়, তিনি দরিদ্রের সহায়, গৃহস্থের বন্ধু, ধনীর রক্ষক, তিনি বাঙলা ভাষার, বাঙলা সাহিত্যের বাঙালী জাতির বাঙালা দেশের গৌরব—শুধু বাঙলার কেন ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানব জাতির গৌরব ছিলেন। তাঁহার সে গৌরব কোথায়, তাঁহার সে বিশেষত্ব, সে মহত্ব, সে মনুষ্যত্ব কিসে, তাহারই আলোচনা আজ আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয়।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন "অনেক নদী, নালা, বিল খাল পার হইয়া শেষে সাগরে উপনীত হইলাম। এ গৌরবের অনধিকারী না হইলেও

* বিদ্যাসাগর ইউনিয়নের বিশেষ অধিবেশনে লেখক শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক পঠিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাহা মনিয়া লইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি অকৃত্রিম বিনয় সহকারে সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, আসিয়াছেন ত খানিকটা নোনাজল আর গোটাকত শামুক লইয়া যান।" পরমহংস দেবও কিন্তু লোকটি বড় সাধারণ নন, এ ক্ষেত্রে ঠিক উত্তরটিই তাঁর মুখে জোগাইয়াছিল, না, না, তা হবে কেন, এযে ক্ষীরের সাগর, তায় আবার রত্নাকর। পরমহংস তিনি, তিনি যে সাগরের নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণে সক্ষম হইবেন ইহা কঠিন নহে; আবার তিনি মহাজন ও জহুরি, সে সাগরতল হইতে মণি মাণিক্য রত্ন জহরত সংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু সে ত মহাজনের কথা, সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেই কেহ একবার যদি ভক্তিভরে সে সাগরে অবগাহন করে, তবে সেও অনায়াসে অসংখ্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং চিরদিনই সে, সে সাগরে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

এই অনন্ত, উদার, অপরিমেয় দয়ার সাগর, বিদ্যাসাগরের পরিচয় ক্ষুদ্র-শক্তি আমি, আমি কি করিয়া দিব ?

কূপে পশ্য পয়োনিধাবিব জলং
গৃহ্লাতি তুল্যং ঘটঃ।

সাধ খুব বেশী হইলেও আমার সাধ্য বড়ই অকিঞ্চিৎকর, আমি আমার সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ঘটে, সেই অতল অপরিসীম সাগরের ক্ষীর এবং রত্নের কোন অংশ দেখাইব ? ভক্ত, ঐশ্বর্য্যের অধিকারী না হইলেও ঈশ্বর পূজায় অনধিকারী হয় না, এবং ভক্তজনের পক্ষে কণিকা প্রসাদও হেয় নহে;--ভরসা আমার ইহাই, এই সাহসেই আমি আজ সাগর মাহাত্ম্য সুধীও ভক্ত-সমাজে কীর্ত্তন করিতেআসিয়াছি।

সাগর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে কোন কোন পুণ্যতোয়া প্রবাহিনীর প্রবাহে এ সাগরের পরিপুষ্টি, একবার তাহার মূল অনুসন্ধান করা যাক্।

যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতী এই ত্রিধারার সম্মিলন আমরা এ সাগরে দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ ও পিতার এবং মাতামহ ও তাঁহার জননী দেবী এবং জননীর মাতামহ পরিবারের চরিত্র প্রভাব এ সাগরে যমুনা ও গঙ্গা প্রবাহের কাজ করিয়াছে। সরস্বতী তাহার ধীশক্তি এবং অর্জ্জিত বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য।

"যমুনা" শুনিয়া আপনারা বৃন্দাবন বিহারিণী, কুলু কুলু প্রবাহিনী, প্রেমাশ্রুপ্লুতা বিরহশীর্ণা কাব্যের যমুনাটিকে কল্পনায় আনিবেন না, এ সেই ভীম-নিনাদিনী বিপুল-পরিধি, তেজস্বিনী উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গময়ী যমুনার কথা বলিতেছি, যে যমুনা—কতশত নগরী ভাঙ্গিয়া গড়িল এ সেই যমুনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ দেব রামজয় তর্কভূষণের পরিচয় না দিলে এ উপমার সার্থকতা বুঝা না যাইতেও পারে। আমরা এক্ষণে তাঁহার প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতেছি। প্রধানত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত ও সহোদর শম্ভুচন্দ্রের রচিত বিদ্যাসাগর চরিত হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃমাতৃ-কুলের এবং বাল্যকালের পরিচয় গ্রহণ করিতেছি।

"তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান ও নিরতিশয় সাহসী এবং সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন, এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহায় ছিল।" তিনি একা, একাধিকবার আক্রমণকারী দস্যুদল দলন করিয়া, নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি উপযুক্ত আক্কেল সেলামী পাইয়া সে অঞ্চলের দস্যুরা তাঁহাকে "দুর হইতে করি নমস্কার' বেশ একটু তফাতে থাকিত।

আর একবার এক ভল্লুকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইঁহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু আক্রমণকারী ভল্লুকও তাঁহার হস্তে উত্তম মধ্যম শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, ভল্লুক জন্ম হইতে অব্যাহতি পায়। সে ভল্লুক যদি, সে শিক্ষা পাইয়াও বাঁচিয়া থাকিত এবং সুসভ্য মনুষ্যের ন্যায় তাহার ঘটে যদি সুবুদ্ধির সঞ্চার থাকিত, তবে সে নিশ্চয়-নিশ্চয়ই সে, পুনরায় সেই লৌহদণ্ডধারী তর্কভূষণ মহাশয়কে দেখিলেই, "তোম্‌ভি মিলিটারি ম্যান জ্যানে," আর "অদ্য যুদ্ধ ত্বয়াময়া", ঘোষণা না করিয়া "সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির ন্যায় সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসী" হইত। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি পশু ইঁহারা সকলেই গরিবের মা বাপ। নিরীহের মিঠা রক্ত পানের প্রবল পিপাসা ইহাদের উৎকট রোগ। হায়, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের সনাতন শিক্ষা বা যিশুর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা এ মুর্খগুলার আদৌ নাই, ইহাদের এরোগ দুর করিবার ঔষধ কেবল তর্কভূষণের ন্যায় চিকিৎসক গণেরই হস্তে।

কেবল শারীরিক বল নয়, তর্কভূষণ মহাশয়ের মানসিক বলও অসাধারণ ছিল। পিতৃ বিয়োগের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরদের সহিত সামান্য কারণে তাঁর কথান্তর উপস্থিত হয়, কথান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইলে, সাধারণ-লোকের মত, ভ্রাতাদের সহিত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া তর্কভূষণ মহাশয় দেশত্যাগী হইলেন। বহু দিন দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া, দেশে ফিরিয়া ভ্রাতাদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি অনিচ্ছায় শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে বাস করেন। তখনকার অবস্থা শোচনীয় হইলেও সমৃদ্ধ সহোদরদের নিকট পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য দাবীও বিবাদে অনিচ্ছুক বলিয়া তর্কভূষণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

নূতন বাটীর জমী লাখেরাজ পাওয়ার অযাচিত সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্বেও পরের দান গ্রহণে স্বাভাবিক্ অনিচ্ছাবশত, বসত বাটীর খাজনা দিয়াই বাস করা সঙ্গত মনে করেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের চরিত্র বর্ণনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, "তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোন অংশে কাহারও নিকটে অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোন প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি সকল স্থলে সকল বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন তদীয় স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোন কারণে তিনি কখন পরের উপাসনা বা আনুগত্য করেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগ করা ভাল।

তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য তাঁহার পক্ষে কস্মিন কালেও আবশ্যক হয় নাই। (আত্ম চরিত ৩১ পৃ) পক্ষান্তরে তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন, কি ছোট কি বড় সর্ব্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না, তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না, তিনি যেমন স্পষ্টবাদী ছিলেন, তেমনি যথার্থবাদী ছিলেন, কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে অথবা অন্য কোন কারণে তিনি কথনও কোন বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্র লোক বলিয়া গণ্য করিতেন, আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্র লোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।"

পিতামহের এই যে বিশ্লেষণ, ইহা বিদ্যাসাগরের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক খাটে বলিয়াই আমরা তর্কভূষণ মহাশয়ের কথা কিছু বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি, তর্কভূষণ মহাশয়ের চরিত্রে যে সকল গুণ বা বিশেষত্ব অঙ্কুরিত ছিল, সে গুলি প্রায় সমস্তই বিদ্যাসাগর চরিত্রে ফল ফুলে সুশোভিত দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব কি ? এক কথায় ভবভূতির সেই "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।" তাহা বজ্র হইতে কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল, তাহা উজ্জ্বলে মধুরে, তাহা কালিদাসের সেই "ভীম-কান্ত"। এই দুই বিপরীত প্রকৃতির সমবায় সংসারে বড় দুর্ল্লভ। এক দিকে হরের রুদ্র তেজ, অপর দিকে ভগবতী অন্নপূর্ণার মাতৃভাব, হরগৌরীর এ প্রকট মূর্ত্তি, দেবকুলের মধ্যেও কেবল মহাদেবেই সম্ভব! কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে আমরা এ মর্ত্তভূমে বিদ্যাসাগরের সে মূর্ত্তি, দেখিতে পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার সেই মূর্ত্তির তেজের পূর্ণাংশ, পিতামহ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন, আর সেই কোমলতা বা মাতৃভাব তাহা মাতা ভগবতীর কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের অনেক বিশেষত্ব বিদ্যাসাগর বিশেষ ভাবে পাইয়াছিলেন সেই জন্যই তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য যে সমস্ত শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অধিক দিন লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই! হিন্দু বিধবার জন্য যে ফণ্ড আজও অসংখ্য অনাথার অশেষ উপকার করিতেছে তাহার সৃষ্টি কর্ত্তা বিদ্যাসাগর। এই ফণ্ডের উন্নতি কল্পে তিনি কত না পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার সংস্রবে তিনি থাকিতে পারেন নাই, কারণ গণ্ডায় আণ্ডা মিলাইবার লোক তিনি ছিলেন না। বেথুন কলেজের স্থায়িত্ব এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধও তিনি ছাড়িয়া ছিলেন। সংসারে যেখানে কপটতা কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীনতা অসরলতা, ভণ্ডামি

কি স্বার্থপরতা চরিত্র হীনতা বা নীচতা দেখিয়াছেন, বিদ্যাসাগর সেখান হইতে অমনি শত হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার এই বিশেষত্বের জন্যই পাঁচ জনার রায়ে রায় দিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় তিনি কোন কাজেই আপনাকে ভাসাইয়া দেন নাই। যাহাকে যে মুহূর্ত্তে অন্যায়চারী বলিয়া বুঝিয়াছেন, হইলেই বা সে প্রিয়তম সন্তান, হইলেই বা সে প্রিয়তম জামাতা, হইলেই বা সে প্রিয়তম বন্ধু বা আত্মীয়, তাহাকে সেই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিয়াছেন। সে ত্যাগে, সে কুসুম কোমল হৃদয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে ত্যাগে সে স্নেহভরা বুকে শেল বিদ্ধ হইয়াছে, সে ত্যাগে,সে প্রফুল্ল মনে চির দিনের জন্য কালিমা লিপ্ত হইয়াছে, তবু, তবু বিদ্যাসাগর সেই ক্ষেত্রে হিমাচলের ন্যায় অটল ও দৃঢ়। সে অন্যায়চারীর পক্ষে সে করুণার সাগর মুহূর্ত্তে যেন কঠিন তুষারাবৃত হইয়া উঠিয়াছে।

পিতামহ তর্কভূষণ মহাশয়ের চরিত্রের আর একটা দিক বড় উজ্জ্বল ছিল, সে তাঁর রহস্য প্রিয়তা। তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধান পক্ষেরা "নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রী কাতর ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে ইঁহারা নিতান্তই নির্ব্বোধের মত কার্য্যও করিতেন। সেজন্য তর্কভূষণ মহাশয় ইঁহাদিগকে আন্তরিক অশ্রদ্ধা করিতেন এবং মনুষ্য মধ্যেই গণ্য করিতেন না। একদিন তিনি এক স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে লোকে মল ত্যাগ করিত, প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয় ঐ স্থানটা দিয়া যাইবেন না, বিষ্ঠা আছে, তর্কভূষণ মহাশয় তার উত্তর দিলেন কৈ বিষ্ঠা, এযে দেখি সবই গোবর, এ গ্রামে মানুষ কোথায় যে বিষ্ঠা থাকিবে?" আর একদিনের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই বলি—"আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না, কুমারগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্ম সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের একটি গাই গর্ভিণী ছিল তাহারও আজ কাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা * * পিতৃদেব এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য গোয়ালের দিকে চলিলেন, তখন পিতামহদেব হাস্য মুখে বলিলেন,'এদিকে নয় এদিকে এস * * এই বলিয়া সুতিকা গৃহে লইয়া গিয়া এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।" বিদ্যা সাগর মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন জন্ম সময়ে পিতামহদেব "আমাকে এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনানুসারে বৃষ রাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে কার্য্যদ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।" কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিহাস-প্রিয়তার কথা। একদিকে তাঁহার অদম্য তেজ এবং দৃঢ়তা, অন্যদিকে পরিহাস-রসিকতা, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কিছু ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারাই জানেন, বিদ্যাসাগর চরিত্রে, অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে পিতামহদেবের তেজও দৃঢ়তার ন্যায় রহস্যপ্রিয়তাও কিরূপ পরিস্ফুট ছিল। পাঠ্যাবস্থায়

অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার "গোপালায় নমোঽস্তমে" এই চতুর্থচরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কবিতা লিখিতে তাঁহাকে জিদ করিয়া ধরিলে, ঈশ্বরচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন—"কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব। এক গোপাল আমাদের (শিক্ষকরূপে) সম্মুখে উপস্থিত, আর এক গোপাল বহুকাল পূর্ব্বে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে কাহার লীলা বর্ণনা আপনার অভিপ্রেত।" আর একবার তিনি শিক্ষক মহাশয়ের অনুরোধে সরস্বতীর বন্দনা লিখিয়াছিলেন। সরস্বতীর স্তব প্রণয়ন বড় কঠিন সমস্যা। সরস্বতীর বর পুত্র স্বয়ং কালিদাসও যে তাঁর স্তব রচনা করিয়া শাপগ্রস্ত হন! বালক ঈশ্বরচন্দ্র সে কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় এই স্তবের অনুরোধে পড়িয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। চরণ কি মস্তক সরস্বতীর কোন অঙ্গ হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিবেন? কারণ মা যখন কালিদাসের অপরাধ লইয়াছেন, তখন—"অন্যপরে কা কথা।" বোধ হয় এই জন্যই দেবী সরস্বতীর স্তবের কথা মনে করিলে পুরোহিত মহাশয়দের মনেও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। নতুবা প্রতি বৎসর মার চরণে অঞ্জলি দিবার সময় বিদ্যাস্থানে "ভয়ে ব চ" এরূপ উক্তি অনেকের মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে কেন? তা সে কথা যাক্। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বুঝিলেন, দেবীর বর্ণনা বড় কঠিন, এ যেন-'না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ' তখন তিনি একটি নিরাপদ শ্লোক রচনায় মন দিলেন, সে শ্লোকটি এই—

লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্
যস্যা প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তা নিরন্তরম।

এত লুচি কচুরিতেও কি দেবতার পরিতৃপ্তি হইবে না? বোধ হয় বালকের এই সম্ভোগ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বাগবাদিনী বীণাপাণী বর দিয়াছিলেন—ঈশ্বর তুমি দিগ্বিজয়ী হও। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র ও পৌত্র নারায়ণ বাবুকে একটু বেশী মাত্রায় আদর দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াও কোন ফল পান নাই। তখন তিনি তাঁহার নিরামিষ-ভোজী পিতৃদেবকে রহস্যের অবতারণা করিয়া এ দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য হাস্যমুখে বলিয়াছিলেন, "বাবা আপনি যখন প্রত্যহই এরূপ ভাবে পুত্র পৌত্রের মস্তক ভক্ষণ করিতেছেন, তখন আর নিরামিষ ভোজনে কি ফল হইতেছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতা, শিক্ষক বা দেবতা সকলের সহিত নির্ম্মল রহস্য করিতে জানিতেন। অথচ তাঁর মত পিতৃ ও শিক্ষক ভক্ত কয়জন? অন্যদিকে তিনি আবার পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি-দিগের সহিতও রহস্যালাপ করিতেন। তাঁহার মেট্রোপলিটন কলেজের কোন শিক্ষক দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পরে অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দ্বিতীয় পক্ষটা বাপু কিছু গুরুপাক, ওটা প্রথম প্রথম সকলের বড় সহ্য হয় না।" এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে

সে সব উদ্ধৃত করিলে, ঐ দ্বিতীয় পক্ষের ন্যায়ই গুরুপাক হইবে, সুতরাং অলমিতি বিস্তরেন।

এখন সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃদেবের কথা বলি। পিতা ঠাকুরদাস, নিতান্ত বাল্যকালে মাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের কষ্ট নিবারণের জন্য বাল্যকালেই প্রবাসে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে কলিকাতায় তাঁহাকে বহুদিন একাহার, কতদিন বা অনাহারের ক্লেশ পর্য্যন্ত সহিতে হইয়াছে। চৌদ্দ পনের বৎসরের বালকের পক্ষে মায়ের দুঃখ নিবারণের জন্য এত কষ্ট সহ্য করা, বড় সহজ কথা নহে। বিদ্যাসাগরও পিতার নিকট হইতে মাতৃ-ভক্তি শিখিয়াছিলেন। মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কি গভীর ভক্তি ছিল তাহা একটি মাত্র উদাহরণে বুঝা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখন নূতন চাকরী, ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে, জননী দেবী গৃহে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সাহেব প্রথমে ছুটি দিতে রাজী হন নাই। শেষে বিদ্যাসাগর ছুটি না পাইলে কাজ ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত বুঝিয়া, বিদায় মঞ্জুর করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃ দর্শনে ছুটিলেন। তখন রেল ছিল না, পথ দুর্গম, বিদ্যাসাগর পদব্রজে দামোদর তীরে পৌঁছিলেন, কিন্তু তখন পারের নৌকা অপর পারে, এদিকে দামোদরে বন্যা আসিয়াছে, নৌকার অপেক্ষায় থাকিতে গেলে, যথাসময়ে বাটি পৌঁছান যায় না, মার আদেশ প্রতিপালিত হয় না, মার সাধ পূর্ণ হয় না। বিদ্যাসাগর তখন কি করিলেন? জননী দেবীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সেই ভীষণ দামোদরের প্রখর স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। যাঁহারা পারে বসিয়া সাবধানী ব্যক্তির ন্যায়, পারের নৌকার অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা হাঁ হাঁ করিয়া বিদ্যাসাগরের এ কার্য্যে বাধা দিলেন, এ পাগলামীর প্রতিবাদ করিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কথাই মানিলেন না ;—

মার আকুল আহ্বান যাঁর শ্রবণে পশিয়াছে, সে কি উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গময় দামোদরের বন্যাকে ভয় করে? মাতৃভক্ত মায়ের দুঃখ মোচনে ছুটিলে, প্রলয়ের ঝটিকা তাহাকে রোধিতে পারে না. খাণ্ডবদাহের অগ্নি তাহাকে দাহ করিবার ক্ষমতা রাখে না, মদমত্ত মাতঙ্গও তাহাকে পদদলিত করিতে সাহসী হয় না। শত বাধা বিপত্তি, সহস্র অন্তরায়, তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে সক্ষম নহে। ভক্ত প্রহ্লাদের মত, তাহার ক্ষয় নাই, তাহার জয় সর্ব্বত্র।

বিদ্যাসাগর প্রকৃত মাতৃভক্ত, মায়ের প্রতি অকপট অনুরাগ তাঁহাকে যে দৈব শক্তি দিয়াছিল, তাহাতে তিনি সেই প্রবল বন্যার অনায়াসে সন্তরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। দামোদরের সেই ভীষণ তরঙ্গিত বক্ষও স্নেহভরা মাতৃ-বক্ষের মত বিদ্যা সাগরকে স্নেহের আলিঙ্গন দিয়াছিল।

ঠাকুরদাসের গুণগ্রামের কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। বিদ্যাসাগরকে মনের মত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতৃদেব ঠাকুরদাস কি কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু পুত্র লেখা পড়া

শিখিয়া তাঁর কষ্ট দূর করিবে, সাধারণ লোকের ন্যায় এ আশার ছলনে তিনি ভুলেন নাই। পুত্র সর্ব্ব-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করিবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা ছিল, অবস্থা বৈগুণ্যে, দারিদ্রের পীড়নে, তিনি নিজে লেখাপড়া শিখিবার সাধ মিটাইতে পারেন নাই, সে আক্ষেপ তাঁহাকে সদাই উদ্বেলিত করিত, সে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার তৃষিত হৃদয়ে সদাই জাগ্রত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার পিতার সেই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের উপাদেয় ফল। পুন্নাম-নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রত্যাশায় বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের পিতৃদেব এ প্রার্থনা করেন নাই, তাহাপেক্ষা মহত্তর আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার এ পুত্র কামনা। নিজের সর্ব্বপ্রকারে অপরিপূর্ণতা যে পূর্ণ করিতে পারিবে, সেই ত পুত্র। সেই পুত্রই ঠাকুরদাস কামনা করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁর সে সাধ, সে প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। যাঁহার যে প্রকার ভাবনা ও সাধনা, ভগবান তাঁহাকে সেইরূপ সিদ্ধিই দান করেন।

এখন সেই জাহ্নবীরূপিনী সাক্ষাৎ ভগবতী তুল্যা বিদ্যাসাগর-জননী এবং তাঁহার পিতা ও মাতামহ পরিবারের কথা। ভগবতীদেবীর পিতা রামকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের বুদ্ধি, বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, অধ্যাবসায় অসাধারণ ছিল। ইনি কিছু দিন অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং সাংসারিক সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনে তাহাতে সিদ্ধ হন। একদিন শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতে করিতে 'মঞ্জুর' বলিয়া গাত্রোত্থান করেন, এবং তাহার পর হইতেই উন্মাদ রোগ গ্রস্থ হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গর্ভে ছিলেন তখন তাঁহার জননীও স্বীয় পিতার ন্যায়বায়ু রোগে আক্রান্ত হন। সংস্কৃত কলেজে গভীর রাত্রে তন্ময় ভাবে শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে, বিধবা বিবাহের অনুকূল অভীষ্ট শ্লোক পাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই 'পাইয়াছি পাইয়াছি' আর তাঁর মাতামহের 'মঞ্জুর' 'মঞ্জুর' কথাটার সাদৃশ সহজে অনুমেয়। তবে মাতামহের সাধনা শবে, আর দৌহি-ত্রের সাধনা জীবে, কিন্তু সে কথা পরে।

ভগবতীদেবীর মাতামহ ও মাতুল মহাশয়দিগের দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, অতিথিসেবা, অভ্যাগত পরিচর্য্যা, এবং আত্মীয় বন্ধু প্রতিপালনের চেষ্টা অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকালে বহু দিন ইঁহাদের স্নেহে ও যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তিনি আত্মজীবনীতে এই পরিবারের প্রশংসা শত মুখে করিয়া গিয়াছেন এবং এ আদর্শও চিরদিন আত্ম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সেই পথে চলিয়া ছিলেন।

এই প্রকার পিতা ও মাতামহ বংশে জননী ভগবতী দেবীর জন্ম ; কিন্তু সে পুণ্য-কথা বারান্তরে।

(ক্রমশ)

মেরুপ্রান্তে।

(৩)

জ্ঞান সভ্যতার মানদণ্ড। যে দেশে ও যে সমাজে জ্ঞানের যাদৃশ বিস্তার হইয়াছে সেই দেশ ও সমাজ সেই পরিমাণে সভ্য। সাহিত্য ও শিল্পকলা, সমাজ বন্ধন ও শাসন নীতি যেমন জ্ঞানের বিকাশ-বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে, তেমনই আহার ও পরিচ্ছেদ, আমোদ-প্রমোদ ও আচার ব্যবহার দেশ ও জাতি বিশেষের জ্ঞান সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। শুধু মানদণ্ড বলি কেন, জ্ঞান সভ্যতার জনক। জ্ঞানের অমৃতাস্বাদ ব্যতীত কাহারও অভ্যুদয় সম্ভাবনীয় নহে। বলা বাহুল্য, যে জ্ঞান প্রাণী-সাধারণ-সুলভ আমি তাহার কথা বলিতেছি না। "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে"। জীব মাত্রেরই জ্ঞান আছে, সে জ্ঞান সহজ ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় জনিত। যে জ্ঞানের বিকাশে এককালের ভূগর্ভবাসী ও বল্কলধারী মানব সমুন্নত সভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাই আমাদের লক্ষ্য। আইসল্যাণ্ডে ও নরওয়েবাসী যে ল্যাপ ও এস্‌কুইমোদিগের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জাতি বলিয়া সমাদর লাভ করে,তাহার মূল কারণ জ্ঞানের পার্থক্য। যে কারণে প্রাচীন ব্রিটন ও আধুনিক ইংরেজে প্রভেদ, যে কারণে গল ও ফরাসীতে অথবা রেড ইণ্ডিয়ান ও আধুনিক মার্কিনবাসীতে পার্থক্য, সেই কারণ বশতঃ এস্‌কুইমো ও আইস্‌ল্যাণ্ডারে এবং ল্যাপ ও নরওয়েবাসীতে মনুষ্যত্বের তারতম্য। আইস্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্য ও শিল্পকলা যেমন গ্রীনল্যাণ্ড বাসীর কল্পনার অতীত, নরওয়ের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজসৌষ্ঠব তেমনি ল্যাপল্যাণ্ডবাসীর বুদ্ধির অগম্য। আমরা এই দুই চিত্রের একটি দেখিয়াছি, একটি বাকী আছে।

ল্যাপজাতি প্রধানতঃ স্কাণ্ডিনেভিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী। মেরুসমুদ্রের উপকূলেই ইহাদিগের জীবন অতিবাহিত হয়। ল্যাপজাতির সংখ্যা বিশ বা পঁচিশ সহস্রের অধিক হইবে না। অধুনা ইহারা রুষ, নরওয়ে ও সুইডেনের শাসনাধীন। ল্যাপগণ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ; অধিকাংশ লোক ৪ ফিটের অনধিক দীর্ঘ। রমণীগণ আরও ক্ষুদ্রাকার। ল্যাপগণ ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ; বিশাল বক্ষের পরিধি দৈর্ঘ্যের সমান হইবে। তাহাদের অঙ্গের মধ্যে হাত দুইটি খুব সুন্দর। কেহ কেহ বলেন যে পুরুষানুক্রমে তাহারা পরিশ্রমে অনভ্যস্ত, ইহাই তাহার কারণ। দাড়িতে অতি সামান্য পরিমাণ কেশ বহির্গত হয়। যুবকেরা মুখশ্রী সুন্দর করিবার জন্য তাহাও উঠাইয়া ফেলে। সুতীক্ষ্ণ ঘোর কৃষ্ণ চক্ষু কুক্ষিগত। নেত্রপীড়ার প্রকোপ খুব বেশী, অনেকেই প্রৌঢ় হইবার পূর্ব্বেই চক্ষুহীন হয়। মুখশ্রী এমনই কদর্য্য যে ডাক্তার ক্লার্ক বলিয়াছেন ইহাদিগকে নর ও বানরের মধ্যবর্ত্তী স্তর বা সোপান (lost ink between man and ape) বলিয়া

গণনা করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে ইহারা পশমী বস্ত্রের একপ্রকার আলখাল্লা পরিধান করে, উহাকে পোয়েস্ক (poesk) বলে। ইহা কটিদেশে কোমরবন্ধ দিয়া বাঁধা থাকে এবং হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে। মাথার পশমী টুপী লাল থোপ ও ফিতা দিয়া চারিধারে ঘেরা। জুতা কাঁচা হরিণ চর্ম্মে নির্ম্মিত, অত্যন্ত পাতলা এবং উপরিভাগ লোমে আচ্ছাদিত। মোজার চলন নাই, কিন্তু তাহারা জুতার উপর একপ্রকার চওড়া তৃণ বা পত্র আঁটিয়া রাখে তাহাতে অনেকটা মোজার কাজ হয়। ইহা দ্বারা পায়ের উপরিদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হয়। ল্যাপ-গণ হাতে দস্তানার উপরেও ইহা ব্যবহার করে। এই তৃণ বা পত্র অ-তাপ বাহক (non conductor of heat)। এই গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের ভিতর দিয়া তাপ সঞ্চরণ করিতে পারে না। এই জন্য জুতা ও দস্তা-নার উপরিস্থিত পশমের উষ্ণতা সর্ব্ব-সময়ে সমান থাকে। এই অ-তাপ বাহক তৃণ বা পত্রের জন্য শীতকালে হাতেও পায়ে ঠাণ্ডা লাগে না এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপেও ক্লেশ হয় না। ল্যাপ-রমণীদিগেরও পরিচ্ছদ এই প্রকার। তবে তাহাদের কটিবন্ধের বাহার খুব জাঁকাল। শীতকালে স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই লোমশ চর্ম্ম পরিধান করে, তাহাতে সর্ব্বশরীর এরূপ-ভাবে আচ্ছাদিত হয় যে, তাহাদিগকে ঠিক ভল্লুকের মত দেখায়।

ল্যাপগণ পার্ব্বতীয়, বন্য ও ধীবর শ্রেণীতে বিভক্ত। পার্ব্বতীয়গণের সংখ্যা সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক। পার্ব্বতীয় ও বন্যদিগের অবস্থা প্রায় একইপ্রকার। ধীবরদিগের সংখ্যা অতি অল্প। সকল শ্রেণীর চালচলন ও অভ্যাস সমান, তাহাতে ইতর বিশেষ লক্ষিত হয় না। পার্ব্বতীয় ল্যাপগণ আমাদের দেশের বেদিয়া জাতির ন্যায় টোল ফেলিয়া বাস করে। এইজন্য ইহাদের গৃহ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে যে, ইচ্ছামাত্রেই অনা-য়াসে ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত করা যায়। মোটা কাপড়ের তাঁবু, চর্ম্ম, আর কয়েকটী খুঁটী, পাড়,—ইহাই গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদিগের গৃহে কাষ্ঠ সিন্দুক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পোষাকী বস্ত্রাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। রেন ডিয়ার নামক হরিণ (rein deer) ইহাদিগের চিরসঙ্গী। প্রতি গৃহেই এই গৃহপালিত হরিণ দেখা যায়। এই জাতীয় হরিণ প্রধানতঃ মেরু স্থান ও উত্তর আমেরিকার অরণ্যে বাস করে। ল্যাপ প্রভৃতি জাতি ইহাদিগকে গৃহপালিত করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অন্য হরিণজাতিতে হরিণীর শৃঙ্গ থাকে না; কিন্তু এই জাতীয় হরিণ ও হরিণী উভয়েরই শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল হরিণের ঘ্রাণশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে ইহারা বরফাবৃত শৈবাল অনায়াসে সন্ধান করিয়া লয়। ল্যাপগণ তুষারের উপর দিয়া গমনাগমন করিবার জন্য (sledge) একপ্রকার যান ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাকে তুষার-তরণী বলা যাইতে পারে; কারণ, উহা দেখিতে ঠিক নৌকার ন্যায় এবং চক্রহীন। আরোহী একটি দণ্ডহস্তে উহাতে উপবেশন করে। এই যান রেন-

ডিয়ার হরিণের দ্বারা টানা হয়। ল্যাপগণ যখন তুষারাবৃত শ্বেত ধরণীবক্ষে, অরোরার শুভ্রালোকে উল্লিখিত যানে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে ইতস্তত ধাবিত হয় তখন সে দৃশ্য বড়ই চিত্তহারী হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও বৃক্ষ আছে, সেজন্য স্থানটী তুষার-তরণীর পক্ষে বিপদ-সঙ্কুল; এই আশঙ্কায় আরোহী হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা (নৌকার ক্ষেপনীর ন্যায়) বরফাবৃত ভূমি পরীক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে তরণীর গতি পরিবর্ত্তন করে। দণ্ড দ্বারা আরও এক কার্য্য হয়। চক্র না থাকায় এই তুষার যান আমাদের দেশের ডোঙ্গা ও পান্সীর মত বড় টলমল করিতে থাকে। কোন প্রকারে "এক পেশে" হইয়া উল্টাইয়া গেলে আরোহীর প্রাণসংশয় ঘটিতে পারে। আরোহীর হস্তস্থিত দণ্ড তৎপক্ষেও সাহায্য করিয়া থাকে। ল্যাপগণ শীকারে বাহির হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। তাহাদের যানও যেমন লঘু, জন্তুটিও তেমনিই ক্ষিপ্রগতি। বাস্তবিক এই সকল হরিণ এরূপ পরিশ্রম পটু ও কষ্ট সহিষ্ণু যে, একবার দম না লইয়াও ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত পথ দৌড়িয়া যায়।

শীকার ল্যাপদিগের প্রধান কর্ম্ম। ব্যাঘ্র ও ভল্লুক ইহারা শীকার করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রের উৎপাতে হরিণ রাখা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য উহার বিনাশ সাধনে তাহাদের এত আগ্রহ। ভল্লুকশীকারের হেতু এই যে, ইহার মাংস তাহাদের সুস্বাদু খাদ্য এবং চর্ম্ম ও লোম মূল্যবান পন্য দ্রব্য। ল্যাপগণের ভল্লুকশীকার একটা বৃহৎ ব্যাপার। তাহাদের বিশ্বাস যে ভল্লুকেরা সকল কথা শুনিতে পায় ও বুঝিতে পারে। এই জন্য কদাপি তাহারা ভল্লুকের নিন্দা করে না। নিদ্রিত ভল্লুককে হনন করা অতীব নিন্দনীয়। দেশাচার এই যে, ল্যাপগণ শীকারে বহির্গত হইলে, রমণীগণ একটি গৃহে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। প্রত্যাগমনকারী শিকারীগণের উচ্চ ধ্বনি শুনিতে পাইলে রমণীগণ ভল্লুকের যশোগীতি গায় এবং ভল্লুকহননকারী দিগের নিন্দা করে। দ্বার দেশ দিয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না; গৃহের প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া তাহারা প্রবেশ করে। তার পর ল্যাপগণ ভল্লুকের মাংস ও চর্ম্ম কর্ত্তন করিবার পর মুণ্ড ও অন্যান্য অংশ যথারীতি কবর দিয়া থাকে।

ল্যাপগণ ভল্লুক মাংস খাইলেও হরিণ মাংস (rein deer) তাহাদের প্রধান খাদ্য। গ্রীষ্মকালে ইহারা দুগ্ধ, মাখম ও রুটি আহার করে। হরিণরক্ত ল্যাপদিগের নিকট পরম উপাদেয় সামগ্রী। তাহারা ইহার সহিত চর্ব্বি ও ময়দা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এক বিন্দু হরিণ-রক্ত নষ্ট হইলে তাহাদের যেন সর্ব্বনাশ হয়। মাদক দ্রব্যের মধ্যে ব্রাণ্ডি ও তামাকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অভ্যাগত ও কুটুম্বদিগকে ব্রাণ্ডি বা তামাক দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইয়া থাকে। ইহাদের ন্যায় মদ্যপায়ী জাতি পৃথিবীতে বিরল। মদ্য পাইলে ইহারা আর কিছুই চাহে না। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলেই মদ্যাসক্ত। অধিক কি ল্যাপজননী শিশু সন্তানের মুখে

স্বহস্তে মদ্য ঢালিয়া দেয়। কিন্তু মদ্যপায়ী হইলেও ল্যাপজাতি অতি শান্তিপ্রিয়। সভ্যজাতিদিগের মধ্যে সাধারণত ঘর-সংসার করিতে যে এক আধটু অভিমানের স্রোত বহিয়া থাকে, ল্যাপদিগের মধ্যে কদাচিৎ তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ইংরাজ পর্য্যটক ল্যাপগণের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া বলিয়াছেন "ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব একেবারেই নাই। এ সম্বন্ধে আমার স্বজাতীয় নরনারীগণ ল্যাপগণের নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারেন।" অভিমান যে একেবারে প্রকাশ হয় না, তাহা বলিতে পারি না। তবে তাহার ঝাঁঝ সভ্যদেশসুলভ তীব্রতায় অসহনীয় নহে। ল্যাপরমণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে স্বামীকে "Loddad sham" (my littie bird) বা 'ছোট পাখী' বলিয়া সম্বোধন করে। সাধারণত অভিমান এইরূপ পরিহাসেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমরা ল্যাপদিগের হরিণ মাংস আহার করিবার কথা বলিতেছিলাম। যে জীব তাহাদিগের সুখে দুঃখে একমাত্র সহায়, যাহার উপর ল্যাপজাতির জীবন নির্ভর করে, সেই মঙ্গলের হেতু হরিণ গুলিকে হনন না করিলে তাহাদের উদর জ্বালার নিবৃত্তি হয় না। এদিকে হরিণের গাড়ী, হরিণ চর্ম্মের তাঁবু ও শয্যা, হরিণ শৃঙ্গের ছুরি, কাঁটা চামচ প্রভৃতি গৃহ-সামগ্রী ;—হরিণের অঙ্গে তাহাদের কি না হয়? হরিণ তাহাদিগের সকল প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়া থাকে হরিণ ল্যাপজাতির সর্ব্বস্ব।

ল্যাপগণ অদৃষ্টবাদী। এই কারণে ল্যাপদিগের দেশে অদৃষ্টগণনার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গণনা করে। তাহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক বলা হয়। ল্যাপদিগের বিশ্বাস, ঐন্দ্রজালিকগণ নিদ্রামগ্ন হইলে তাহাদের আত্মা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। তাহাতে অনেক অভাবনীয় ঘটনা তাহারা অবগত হয়। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও গণনার ব্যবসায় করিয়া থাকে। অদৃষ্ট-গণনার দুই প্রকার প্রণালী প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের ন্যায় অবশ্য সামুদ্রিক শাস্ত্র নাই বটে, কিন্তু কররেখা দেখিয়া অদৃষ্ট বিচার করা হয়। দ্বিতীয় প্রণালী এই যে গণনাকারী এক পেয়ালা জল, দুগ্ধ বা মদ্য (মদ্য হইলেই ফলের সম্ভাবনা অধিক হয়) লইয়া উপবেশন করে এবং উহা স্থির-নয়নে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর অদৃষ্ট-ফল বলিয়া দেয়। ল্যাপ ঐন্দ্রজালিকদিগের আর একটি বিদ্যা আছে। তাহারা না কি ইচ্ছামাত্র ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে। বহু পূর্ব্বকালে এই ল্যাপ ঐন্দ্রজালিকগণের এরূপ খ্যাতি ছিল যে নাবিকগণ সমুদ্র পথে যাইতে যাইতে বায়ু ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইত, এই কিম্বদন্তী অদ্যাপি ল্যাপল্যাণ্ডে শুনিতে পাওয়া যায়।

ল্যাপ চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণের কথা বলিতেছি। স্বদেশ হিতৈষণা বা প্যাট্রিয়টিজম্ (patriotism) নাই বটে, কিন্তু তাহাদের স্বদেশের প্রতি মায়া অতীব প্রশংসনীয়। ল্যাপগণ জন্মভূমিকে পার্থিব স্বর্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। জন্মভূমির বাহিরে কোথাও তাহারা স্বচ্ছন্দ অনুভব করে না। জনৈক

রুষীয় জমিদার একটি ল্যাপ রমণীকে রুষ রাজধানী সেন্টপিটার্সবর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাহাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। রমণীও স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার ফলে অল্প কাল মধ্যেই সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিল। শিক্ষার ফলে রুষ দেশ তাহার নিকট আর বিদেশ বলিয়া অনুভূত হইত না। কয়েক বৎসর পরে একটি ভদ্রলোক কয়েকটী ল্যাপদেশীয় হরিণ ক্রয় করিয়া আনয়ন করিলেন। পথে হরিণগুলির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি ল্যাপ পরিবার সঙ্গে আসিয়াছিল। তখন শীতকাল, সুতরাং ল্যাপগণের সঙ্গে তুষারযান, তুষারপাদুকা ও তাঁবু ছিল। ল্যাপদিগের এই সমুদয় বিচিত্র আসবাব অনেকেরই কৌতুহল উদ্দীপন করিল। রুষগণ দলে দলে তাহাদিগের তাঁবুতে আসিতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বোক্ত জমিদার মহাশয়ও একদিন শিক্ষিতা ল্যাপরমণীকে তাঁবুতে লইয়া গিয়া তাহার স্বদেশীয়গণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। অতঃপর শিক্ষিতা ল্যাপরমণীর মন এমনই বিষাদগ্রস্ত হইল যে কিছুতেই আর তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা দৃষ্ট হইল না। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন কি বিষম চিন্তায় সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, একে একে, মন্দীভূত হইতে লাগিল। শত যত্ন সত্ত্বেও রমণী দিনে দিনে শীর্ণা হইয়া পড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন তাহাকে আর পাওয়া গেল না। জমিদার মহাশয় পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে রমণী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। আর একটি ল্যাপ পুরুষ সুইডেনের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ব্যক্তি প্রথমতঃ সৈনিকের কর্ম্ম করিত, তার পর সার্জ্জেন্টের পদে উন্নীত হয়। এই ল্যাপ সৈনিক বহু ক্লেশে যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া বিশ বৎসর পরে সুইড সৈন্যের কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এমনই ভবিতব্যতা যে, এই ল্যাপ সেনাধ্যক্ষকে ঘটনাচক্রে কয়েকদিনের জন্য স্বদেশে অবস্থান করিতে হয়। বিশ বৎসর কাল বিদেশে অতিবাহিত করিবার পর এই ল্যাপ জন্মভূমির স্নেহময় ক্রোড় আরও স্নেহময় ও শান্তিময় বলিয়া অনুভব করিল। তাহার শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, সেই বনশোভা ও গিরি শ্রেণী,সেই উপকূল ও উপত্যকা ভূমি তাহার চিত্তকে সম্মোহিত করিল। শিশু যেমন বহুক্ষণ বিচ্ছেদের অবসানে জননীর অঙ্কে উঠিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং উল্লাসভরে মায়ের উচ্ছ্বসিত অমৃত ধারা পান করিতে থাকে, তেমনি এই সৈনিক বিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর জন্মভূমির অমৃতরস পান করিয়া জীবন ধন্য মনে করিল। জীবনের অবশিষ্ট দিন আর প্রবাসে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হইল না। পুত্রের উপর জননীর স্নেহ যেমন স্বাভাবিক তাহার পক্ষেও জননীর স্নেহময় ক্রোড় তেমনি চিরমধুর, চিরলোভনীয় ও চিরামৃতময় শতস্বর্গ-নিন্দিত সুখভূমি। সে অমৃতের আস্বাদনে আকৃষ্ট হয় না, সে আনন্দের ধারায় দ্রবীভূত হয় না, এমন প্রাণী বিশ্ব চরাচরে নাই। তাই ভারতের ঋষি বলিয়াছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আর কবিবর রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে গাহিয়াছেন ;—

"তোমার এই খেলা ঘরে
শিশু কাল কাটিল রে
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
"তুই দিন ফুরালে, সন্ধ্যাকালে *
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥
(আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।")

এই জগতে সকলেরই কামনা, জীবনের শেষ দিনে যেন জন্মভূমির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করি। কবি গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন ;—

"I still had hopes, my latest
hours to crown,
"Amidst these humble bowers
to lay me down.

আমি আশা করিয়াছিলাম যে, জীবনের শেষ কয়দিন এই ক্ষুদ্র পল্লী কুটীরে থাকিয়া সুখে ও শান্তিতে যাপন করিব। তাঁহার জীবনের শেষ বাসনা ছিল, "Here to return and die at home at last", যেন অন্তিম কালে জন্মভূমিতে আসিয়া মরিতে পারি। মাতৃভক্ত সন্তানের পক্ষে ইহাপেক্ষা উচ্চতর কামনা আর নাই। পূর্ব্বোক্ত ল্যাপ সৈনিক জন্মভূমির মমতা আর ছিন্ন করিতে পারিল না। তাহার নিকট সুইড্ সৈন্য বিভাগের কর্ম্ম অপেক্ষা স্বজাতীয় বেদিয়া জীবন (Nomad life) অধিকতর সুখকর বোধ হইল। বলা বাহুল্য, এই ল্যাপ অতঃপর আর কখনও স্বদেশ পরিত্যাগ করে নাই।

ইতর জীব হইতে মনুষ্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে মানুষ এই জগৎ সংসারের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহার নিকট স্বীয় কর্ম্মের দায়িত্ব অনুভব করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি অসভ্যতার মধ্যে সহস্র কুসংস্কার থাকিলেও ভগবৎপ্রীতি বীজস্থ অঙ্কুরবৎ তাহাতে সংবদ্ধ থাকিবেই। জ্ঞানের আলোকপাতে অঙ্কুরোদ্গমের অবস্থা সমাগত হয়। অসভ্য ল্যাপগণ আবহমান কাল হইতে ভগবানে বিশ্বাসী। এককালে তাহারা স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও দেবতাদিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিল। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের একাধিপত্য বলা যাইতে পারে। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ল্যাপল্যাণ্ডে খ্রীষ্টানধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। খ্রীষ্টান ল্যাপগণ স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ভজনালয় স্থাপন করিয়াছে। এই সকল ভজনালয়ে ধর্ম্মযাজকেরা অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ডাক্তার ক্লার্ক এইরূপ একটি ধর্ম্ম বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন উচ্চৈঃ-স্বরে উপদেশ না দিলে ধর্ম্ম যাজকের উপর কাহারও শ্রদ্ধা হয় না। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ল্যাপগণ যে পৈতৃক দেবতা সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা বলা যায় না। কারণ অদ্যাপি অনেকেই সংগোপনে পৈতৃক দেবতাগণের পূজা করিয়া থাকে।

* সন্ধ্যাকালে, অর্থাৎ জীবনের সায়ংকালে, এই অর্থ উৎকৃষ্ট ধ্বনি সঙ্গত।

এইবার এস্কুইমোদিগের কথা কিছু বলিব। পৃথিবীতে যত অসভ্য জাতি আছে, ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্রীনল্যাণ্ড, ল্যাব্রাডার, উত্তর আমেরিকার উপকূল ও এসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা বাস করিয়া থাকে। অনেকেই স্বাধীন; কেহ কেহ রুষ, দিনেমার অথবা ব্রিটিশ জাতির শাসনাধীন। কিন্তু দেশ ভেদে বা রাজ বিশেষে ইহাদিগের প্রকৃতি ও ব্যবহার গত কোন পার্থক্য দেখা যায় না। গ্রীনল্যাণ্ডবাসী এস্কুইমো আপনাদিগের ইন্নুইট (Innuit or man) বা মানুষ নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বত্রই মেরু উপকূলে (Polar sea coast) গৃহ নির্ম্মাণ করে। ইহাদের আকৃতি মোঙ্গলীয় ধরণের। মুখখানা হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড ও চ্যাপ্টা, ললাট সরু ও লম্বা, চক্ষু ক্ষুদ্র, বর্ণ প্রায় সাদা, স্কন্ধ প্রশস্ত, হাত-পা সুগঠিত; পুরুষগণকে দীর্ঘাকার বলা যায় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি। রমণীগণ কস্মিন্‌কালে স্নান ও দন্তধাবনাদি করে না। কিন্তু হাসিলে তাহাদের শুভ্র দন্ত পাঁতি সুন্দর দেখায়। বোধ করি বিলাসিতা মনুষ্য প্রকৃতির সহজাতগুণ। সভ্য অসভ্য সকলেই অল্পবিস্তর বিলাসপ্রয়াসী। যাহার সৌন্দর্য্য জ্ঞান যেরূপ ভাবে বিকসিত তাহার বিলাস বিভ্রম তদনুসারে নিষ্পন্ন হয়। চীনরমণী সুন্দর দেখাইবে বলিয়া পা ছোট করিতে কত না ক্লেশ স্বীকার করে! আমাদের নারীসম্প্রদায় নথ ও কুণ্ডলের জন্য নাসিকা ও কর্ণবেধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, বিলাসিতার স্রোতে বাঙ্গালী এক্ষণে জোয়ারের তৃণের মত ভাসিতেছে। কাহাকে রাখিয়া কাহার দৃষ্টান্ত প্রদান করিব? আদালতের উকিল ও আফিসের বাবুদিগের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয় যখন গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটাটি সুচারু করিয়া অঙ্কিত করিতে লালায়িত হন তখন তাঁহাকে ছাড়িতে পারি না। আর ভক্তচূড়ামণি বৈষ্ণবগণের অঙ্গে যে হরিনামের ছাপ দেখা যায় তাহার শিল্পপটুতা কে না প্রশংসা করিবে? বিলাসিতা ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধি অনেকটা অন্যোন্যাপেক্ষী। সৌন্দর্য্য বুদ্ধির উপর যেমন বিলাস নির্ভর করে, তেমনি বিলাস চেষ্টার ফলে সৌন্দর্য্য বুদ্ধি বিকসিত হয়। তথাপি যে বিলাসের এত নিন্দা সে কেবল পবিত্র ও ধর্ম্ম জীবনের পরিপন্থী বলিয়া এবং বিলাসীর অবস্থা উদ্দেশ্য ও অভিরুচি লইয়া। যাহা হউক, অসভ্যতার গভীরতম গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াও ইন্নুইটগণ সুন্দর সাজিতে অভিলাষী। পুরুষগণ অধরের দুই পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া একপ্রকার নীল বা হরিৎ মণি (blue or green quartz) বা গজদন্তনির্ম্মিত এক প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে। অনেকের নাসিকাতেও গজদন্তের সূচ বা ঝিনুক ঝুলিতে দেখা যায়। সকলেরই জ্যাকেটে ও কোমরবন্ধে, শৃগাল, ব্যাঘ্র বা কস্তুরিকা মৃগের Musk-ox এর দন্তের মালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রমণীগণ কেশ সংস্কারে বিশেষ মনোযোগী। তাহারা সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশ পাশে বেণী বাঁধিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পায়। ইহাদের মধ্যে

উল্কির প্রচলনও আছে, তাহা দুই গণ্ড ললাটে ও অধরের নিম্নদেশে সূক্ষ্ম রেখাকারে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

ইনুইট জাতির পরিচ্ছদ মেরুমণ্ডলের ঋতু ও জলবায়ুর উপযোগী করিয়া হরিণ ও সিল চর্ম্মে নির্ম্মিত হয়। সকলেই দুই জোড়া ব্রিচেস বা পাজামা (breeches) পরিধান করে, তন্মধ্যে উপরিস্থ পোষাক লোমে পূর্ণ। সিল-চর্ম্মের বুট পাখীর পালক দিয়া ভূষিত এবং এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। হাতে দস্তানা থাকায় ঠাণ্ডা লাগে না। গ্রীষ্মকালে ইহারা সিল বা সিন্ধুঘোটকের অন্ত্র নির্ম্মিত জামা পরিধান করে। স্ত্রী-লোকদিগের জ্যাকেটে এক প্রকার ঢাকনি (hood) থাকে, তাহাতে শিশু সন্তান ও প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি বহন করা যায়। জুতা সার্ট প্রভৃতি সকলই স্ত্রীলোকেরা প্রস্তত করিয়া থাকে। জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন এই সকল জুতা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কারিকর-দিগের হস্তে প্রস্তুত বলিয়া ভ্রম হয়। ইনুইট গণ হাতে অঙ্গুরীয় এবং মস্তকে একপ্রকার পিত্তলের পাত ব্যবহার করে।

বিস্ময়ের বিষয় এই, ইনুইট-গণ বরফের গৃহে বাস করে তাহারা শীতকালে সুকঠিন বরফস্তূপ হইতে গৃহ খোদাই করিয়া লয়। পর্ব্বতগাত্রে যেরূপ স্বাভাবিক গুহা আছে কঠিন তুষারস্তূপে সেইরূপ কৃত্রিম গুহা খোদাই করা হয়। এই তুষার গৃহে দরজা জানালা সমস্তই থাকে। দেওয়াল এইরূপ পাতলা করিয়া কাটা হয় যে আলোকরশ্মি কাচের ন্যায় দেওয়াল ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। দরজা নির্ম্মাণের কৌশলে বাহির হইতে হিম ভিতরে যাইতে পারে না। গৃহের আসবাব পত্র সমস্তই বরফে নির্ম্মিত। বরফের গৃহে অবশ্য অগ্নি প্রজ্বলিত করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাতে ইনুইটদিগের কোন অসু-বিধা হয় না। কারণ তাহারা কাঁচা মাংস ও চর্ব্বি ভক্ষণ করিয়া থাকে। অনেক ইনুইট মিলিয়া একত্র বাস করে। সকলেই গৃহের ভিতরে এরূপ দরজা রাখে যে তদ্দারা তাহারা প্রতিবেশীর গৃহে গমনাগমন করিয়া থাকে। ডাক্তার স্কোর্সবি গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে এইরূপ একটি তুষার গৃহ দেখিয়াছিলেন। রেলওয়ে লাইনের জন্য পর্ব্বত মধ্যে যেরূপ টানেল (tunnel) কাটা হয়, ডাক্তারস্কোর্সবি প্রথমতঃ সেইরূপ একটী তুষার টানেল দেখিতে পান। তার পর তিনি দেখেন যে টানেলের ভিতরের মুখে উপরি বর্ণিত তুষার গৃহ রহিয়াছে। টানলের মুখে তুষার গৃহের দ্বার এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে গৃহের ভিতরের বায়ু কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না। ইনুইটদিগের ইঞ্জিনিয়ারিংএর আর এক পরিচয় তরণী নির্ম্মাণে। সরু ও লম্বা কাষ্ঠ নৌকাগুলি সিলচর্ম্মে মোড়া। ইনুইট ধীবর তাহাতে স্বচ্ছন্দে হাত পা ছড়াইয়া উপবেশন করে। রমণীরা পুরুষদিগের নৌকায় উঠে না। তাহাদের নৌকায় বেঞ্চ থাকে। তাহাতে ১০।১২ জন বসিতে পারা যায়। সিল-অন্ত্রে নির্ম্মিত পাল তুলিয়া ইনুইট রমণী গান করিতে করিতে সমুদ্র তরঙ্গে দাঁড় ফেলিয়া থাকে। পুরুষেরা কদাচ রমণী-

দিগের নৌকায় আরোহণ করে না। তাহাতে তাহাদের সম্ভ্রমের হানি হয়।

ইনুইটগণ গ্রীষ্মকালে প্রধানতঃ হরিণ ও হাঁস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমরা যেমন গরম দুগ্ধ পান করি, তাহারা তেমনি সিল-রক্ত পান করিয়া থাকে। তাহারা কখন অসিদ্ধ তিমিচর্ম্ম—মাংস নয়—খায়, কখন আবার সিদ্ধতিমিচর্ম্ম ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করে। চার্লস ফ্রান্সিস্ হল, সুবিখ্যাত সার জন ফ্রানক্লিনের * অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া অনেক দিন ইনুইটদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একদিন জনৈক ইনুইট শিকারী একটী মৃতহরিণদেহ আনয়ন করিয়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিল। ফ্রান্সিসও এই ভোজে নিমন্ত্রণ পাইলেন। ফ্রান্সিস বর্ণনা করিয়াছেন "নিমন্ত্রিতবর্গের সহিত যথাক্রমে আমি হরিণ মাংস পাইতেছিলাম। শেষে শাঁসের মত একটা পদার্থ পাইয়া আমি আগ্রহসহকারে খাইতে লাগিলাম। ইহা বেশ সুস্বাদু ও

* ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ খৃষ্টাব্দীতে আমেরিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে স্পেনের একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল। তখন স্পেনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বাণিজ্য ক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দিগণ স্পেনের ভ্রূভঙ্গভয়ে আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগরের পথে যাতায়াত করিতে সাহসী হইত না। এই সময় ইউরোপের অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা হয় যে, উত্তর মহাসাগর দিয়া পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহাই ইতিহাসে উত্তর পশ্চিম সমুদ্রপথ-আবিষ্কার বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে মাস্কোভাইট• (Muscovite) কোং হেন্‌রি হাড্‌সনকে প্রেরণ করেন। ইহার আবিষ্কৃত উপসাগর হাডসনস্ বে নামে পরিচিত। হাডসনের পূর্ব্বে দশম শতাব্দীতে আইসল্যাণ্ডবাসিগণ গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাড্‌সন্ আর একবার উত্তর মহাসমুদ্রে যান তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে Bering বহির্গত হন। তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালী বেরিং ষ্ট্রেট নামে বিখ্যাত। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করেন যে, যিনি উত্তর পশ্চিম সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি উত্তর মেরুর এক ডিগ্রি পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। অতঃপর অনেকের চক্ষু এই দিকে পতিত হইল; ক্রমে বানিজ্য পথের উদ্দেশ্য লোকে ভুলিয়া গেল। উত্তর মেরু আবিষ্কারের খ্যাতি লাভ করিবার জন্য বহু নাবিক ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে স্কোর্সবি সমুদ্র যাত্রা করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রস্ ও পারি (Ross and Parry) বহির্গত হইলেন। এই বৎসরেই (Sir John Franklin) সার জন ফ্রানক্লিন উত্তর মহাসমুদ্রে যাত্রা করেন। তখন তিনি লেফটেন্যাণ্ট ফ্রান্‌ক্লিন ছিলেন। রস ও প্যারী কয়েকটী স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সার জন ফ্রানক্লিনকে মেরু সমস্যা (Arctic mystery) মীমাংসা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যাত্রাতেই তাঁহার মানবলীলা শেষ হয়। ফ্রানক্লিনের কোন সংবাদ না পাইয়া অনেকে তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানে অনেককে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে সার ফ্রান্সিস্ হল অন্যতম। ইনি প্রথমবার বহির্গত হইয়া উত্তর মহাসমুদ্রের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় যাত্রাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। উত্তর মেরুর আবিষ্কার চেষ্টায় কুক, কেন, হেস, ও র‍্যাঙ্গেলের নাম সর্ব্বজনবিদিত।

সুগন্ধি বোধ হইল। কি খাইতেছি জানিবার জন্য আমার কৌতুহল হইল। আমি ভিড় ঠেলিয়া দেখিলাম যে হরিণের অন্ত্রাংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রদত্ত হইতেছিল। তখন ঘৃণায় আমার বমি হইবার উপক্রম হইল, আমি আর খাইতে পারিলাম না। অধিক কি, সে রাত্রিতে আমি উপবাসী ছিলাম"। ফ্রান্সিস বলিয়াছেন, অসিদ্ধ মাংস ভক্ষণে ইনুইটদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এক্ষণে অনেকেই পশুজাতির ন্যায় অসিদ্ধ মাংস ভক্ষণের পক্ষপাতী। ম্যান্সফিল্ড পার্কায়ার (Mantfield Parkyor) অসিদ্ধ গো মাংস খাইয়া বলিয়াছেন "যাহারা ইহা সিদ্ধ করিয়া খায় তাহারা ইহার উপাদেয়তা জানে না।" আধুনিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষে এই প্রকার আরও কত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

ফ্রান্সিস্ হল এক দিন দেখিলেন যে তাঁহার জাহাজে ১০।১২ জন ইনুইট রমণী ডেকের উপরে বসিয়া রহিয়াছে। দুই জন নৌকায় পাল মেরামত করিতেছে, কয়েকজন জুতার তলা প্রস্তুত করিবার জন্য সিলচর্ম্ম চর্ব্বণ করিতেছে, আর একজন দুরন্ত শিশুকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি বুঝিলেন যে ইহারা কৌতুহলবশে জাহাজে উঠিয়াও কর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। রমণীগণ দুরন্ত শিশুটিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানাপ্রকার দড়ির ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছিল। দড়ি গাছটা কখনও হরিণাকারে কখনও তিমি বা অন্য মৎস্যাকারে শিশুর সম্মুখে প্রদর্শিত হইতেছিল। হল বলিয়াছেন দড়ির এত বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া আর কোন জাতি জানে না। তিনি আর একদিন স্বীয় কেবিনে বসিয়া লিখিতেছিলেন একজন ইনুইট স্ত্রীলোক Good morning sir বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। হল দেখিলেন স্ত্রীলোকটি সভ্যজাতির ন্যায় পরিচ্ছদে ভূষিতা, ইহার নাম টুকুলিটো, জনৈক সিল-শিকারী ও মাঝির পত্নী। সাত বৎসর পূর্ব্বে এক ব্যক্তি ইহাদিগকে বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় এই ইনুইট দম্পতী প্রিন্স আলবার্টের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ারও সহিত ইহাদের পরিচয় হয়। টুকুলিটো তাহার স্বামীর অপেক্ষা দ্রুত ইংরেজী বলিতে পারিত। ইহাদের নিকট হল বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন।

মানুষ যত দিন অসভ্য থাকে তত দিন শান্তি ও সন্তোষে কালযাপন করে। ইনুইট জাতি ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। ইহারা এরূপ নিরীহ যে ইহাদের শাসনের জন্য কোন আইন বা শাসনকর্ত্তা নাই। কদাচিৎ কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবদমানদিগের ঘুষি-যুদ্ধে তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে। এঞ্জিকক (Angekok) নামীয় একশ্রেণীর ইনুইট বিচার করে। বিচার কার্য্য ব্যতীত অদৃষ্ট গণনা, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যই তাহারা করিয়া থাকে। ইনুইট জাতির বিশ্বাস, এই জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তিনি কেবল জড় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার একটি কন্যা আছেন, তিনি উদ্ভিদ ও জীব সৃজন করিয়াছেন। মানুষ কর্ম্ম-

ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। স্বর্গ ঊর্দ্ধদিকে এবং নরক পৃথিবীর নিম্নদেশে অবস্থিত। স্বর্গ চিরআলোকময় সেখানে তুষারপাত বা ঝটিকা হয় না। নরক চির অন্ধকারময়, সেখানে নিয়ত তুষারপাত ও ঝটিকা হইতেছে। এই অসভ্য জাতির কেবলমাত্র এতটুকু ভ্রান্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস যে মনুষ্যত্বের দাবী করিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তর মেরু লইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি ; আশা করি, পাঠক, তাহাতে পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইবার দক্ষিণ প্রান্তের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় স্থলভাগ উত্তরদিকে বিস্তৃত ও দক্ষিণাভিমুখে সঙ্কীর্ণ, ইহাতেই অনুমান হয় যে পৃথিবীর স্থল ভাগ অধিকাংশই উত্তর দিকে অবস্থিত। বাস্তবিকও তাই। বিষুবরেখার নিম্নে স্থলভাগ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের প্রবাদ বাক্য এই যে, দক্ষিণ দিকে যমদ্বার। ভগবান্ জানেন এ কথার মূল্য কি। কিন্তু যাহা দেখি তাহাতে এ প্রবাদে নিতান্ত অবিশ্বাসও হয় না। পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে শুধু অনন্ত জলধি ধূ ধূ করিতেছে। যত দূর যাও, ঊর্দ্ধে অনন্ত শূন্য, আর সম্মুখে অনন্ত জলরাশি, বই কিছুই নাই। উত্তর মেরুমণ্ডলের ন্যায় দক্ষিণ প্রান্তেও উষালোক প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহার নাম অরোরা অষ্ট্রালিস (Aurora Australis). এই উষালোকে কোন লোকালয়ের উপকার হয় কি না তাহা অদ্যাপি কেহ বলিতে সক্ষম হন নাই। উত্তর মেরুমণ্ডলের স্থানে স্থানে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা চিরশীতময় ; উত্তাপ কোথাও ২৭, কোথাও ৩০ এবং কোথাও খুব অধিক ৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখুন দক্ষিণপ্রান্তে প্রকৃতির কি ভীষণ মূর্ত্তিই প্রকট হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইউরোপীয়গণের বিপুল উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসার ফলে মেরুসন্নিহিত স্থান গুলি কালক্রমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। অবশ্য উত্তর প্রান্তে যেরূপ চেষ্টা হইয়াছিল দক্ষিণ দিকে সেরূপ হয় নাই। তথাপি নাবিকগণ যে একেবারে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ডার্ক ঘেরিজ (Dirk Gheritz) নামক এক ব্যক্তির জাহাজ বাত্যাতাড়িত হইয়া দৈবক্রমে নিউশেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে নীত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কার হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কুক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৭১ ডিগ্রি (latitude) পর্য্যন্ত গমন করেন। কিন্তু অত:পর ভীষণ তুষার ঝটিকা ও কুজ্ঝটিকায় তাঁহার গতিরোধ হইতে থাকে। তিনি সঙ্কট বুঝিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। পঞ্চাশ বৎসর পরে এক দল রুষ নাবিক কর্তৃক পল ও আলেকজান্দার দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। এই সময় হইতে নাবিকগণ পুনরায় আশা ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কয়েকটী মরুময় স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধন্য নাবিকগণ, ধন্য তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহ! রণবিজিগীষু সৈন্য যেমন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াই যাত্রা করে ইহারাও তেমনি বিপদকে সম্মুখীন জানিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। বিশেষত মেরুসাগরযাত্রী দিগের অবস্থা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার নয়। আমি সার জেমস্ রসের অভিজ্ঞতা হইতে এই বিপদসঙ্কুল জীবনের চিত্র প্রদর্শন করিতেছি। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তারিখে কাপ্তেন জেমস্ রস ও তাঁহার সঙ্গিগণ টেরর ও ইরিবস নামক দুইটি জাহাজে দক্ষিণ মেরুমণ্ডল রেখা ছাড়াইয়া আরও দক্ষিণে যাইতে লাগিলেন। তুষারপাত ও কুজ্ঝটিকায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের গতি রোধ হইতে লাগিল। এইরূপ দশ দিন যাইবার পর তাঁহারা ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ডের পর্ব্বত চূড়া দেখিতে পান। ক্রমশ তাঁহাদের উভয় পার্শ্বেই পর্ব্বত শ্রেণী দৃষ্ট হইল। তাঁহারা এই পর্ব্বত শ্রেণীর উপকূল ধরিয়া যাইতে লাগিলেন! রসের ইচ্ছা হইল সুবিধামত স্থান পাইলে নোঙ্গর করেন কিন্তু সেই গিরির উপকূলে অবতরণ করা দুঃসাধ্য। জাহাজ চলিতে লাগিল। দশবার দিন পরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হইল নাবিকগণের আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা সেই তুষারাবৃত স্থানটীতে পদার্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অবতরণের কোন উপায় না দেখিয়া রস এক লম্ফে সেই দ্বীপের পর্ব্বতময় তীরে পতিত হইলেন। অন্যান্য সঙ্গীরা তখন দড়ি ধরিয়া অবতরণ করিল। রস তুষারপিচ্ছিল ভূমি হইতে সাগর গর্ভে পড়িয়া যান। সঙ্গীরা নৌকা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। এখানে অবতরণ করিয়া রস নিরাশ হইলেন। কারণ এই দ্বীপে তৃণ মাত্রও তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। পুনরায় জাহাজ চলিতে লাগিল। পর দিবস একটি সুবৃহৎ গিরি-শ্রেণী নয়ন গোচর হয়। ইহাই অদ্যাপি দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ভূমিখণ্ড বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে। রস এই গিরি দ্বীপের প্যারী (Parry) নাম দিয়া গিয়াছেন। জগতে নাম ও যশের প্রার্থী নয় কে? আর যে নামে অমরতা সম্ভাবিত, তাহা কে উপেক্ষা করিতে পারে? কিন্তু কৃতজ্ঞতা যখন চিত্তকে তাহার পবিত্র ও মধুর ভাবে দ্রবীভূত করে, তখন বাসনার রশ্মি সংযত হইয়া যায়। সুবিখ্যাত নাবিক প্যারি উত্তর মেরু সাগরের একটি দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া তাহা কাপ্তেন রসের নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন রস আজ তাহার প্রতিদানের অবসর পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। এই সকল দ্বীপে কেবল মাত্র উচ্চ গিরি চূড়ার অভ্রভেদী দৃশ্য। তন্মধ্যে একটি আগ্নেয় গিরি বর্ত্তমান, ইহা ইরিবস্ নামে পরিচিত। রস ইহার উদ্গীরণ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করেন। সেই সুদূর সুনীল সাগরবক্ষে প্রলয়দূত সদৃশ ধুমরাশি ও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া রসের নির্ভীক হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত ও বিচলিত হইয়াছিল। তিনি এই দৃশ্য জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই।

রস ও তদীয় সঙ্গিগণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইলেন না। সম্মুখে সুবিশাল তুষারশৈল পথরোধ করিয়া বিরাজমান। জাহাজ ইহার কিনারা ধরিয়া

পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিল। বায়ু বেগে পোত দুইটি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও দুরান্তরিত হইতে ছিল। সেই সঙ্কটপূর্ণ স্থানে আশ্রয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্মুখস্থ তুঙ্গ তুষার প্রাচীর ও ভাসমান তুষার স্তূপ সমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে অজ্ঞাত ভাবে তাঁহাদিগকে চূর্ণ করিতে পারে, রস পদে পদে এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বিপদ বুঝিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু ফিরিবেন কোন পথে? পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারস্তূপ সমুদ্রতরঙ্গে ইতস্ততঃ ভাসিতেছিল। তথাপি নাবিকগণ পশ্চাদ্দিকে জাহাজ ফিরাইলেন। সহসা বায়ু বন্ধ হইল। পোত দুইটি তরঙ্গ প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে এক ভীষণ স্থানে আসিয়া পড়িল। সম্মুখে তুষার পাহাড় শ্রেণী দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইয়া কখনও তুষার শৈলে শীর্ষে, কখনও পাদদেশে, আবার কখনও ইতস্তত সমুদ্র গর্ত্তে পতিত হইতেছিল। রস বলিয়াছেন "এই মনোহর দৃশ্যের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে জাহাজ তখন অত্যন্ত দুলিতেছিল। বিপদ ক্রমশ ঘনীভূত বলিয়া বোধ হইল। তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনে এবং বরফ স্তূপের বিদারণ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। সেই সঙ্কট কালে আমরা জীবনের সকল সুখ দুঃখ ও আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া কাতর কণ্ঠে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম। বোধ হয় করুণাময়ের চরণে আমাদের কাতর ধ্বনি পৌঁছিয়াছিল। কারণ অত্যল্প কাল মধ্যেই মৃদু মন্দ বায়ু ভরে জাহাজের পাল উঠিল জাহাজ আমাদের দেশে চলিতে লাগিল।" এইরূপে সে যাত্রা তাঁহারা কোন প্রকারে জীবন লাভ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া উসমানিয়ায় আসিয়া নোঙ্গর করিলেন। শীত ঋতু অতীত হইলে, রস ও তদীয় সঙ্গিগণ আর একবার নিষ্ফলা চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রঙ্গপুরের জমীদার।

নবাব সরফরাজ ও আলীবর্দ্দীর রাজত্বকালে ১৭৪০-৪১ খৃঃ অব্দে সমগ্র রঙ্গপুর জমিদারী হইতে ৩,৩৬,০০০ টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় হইত। ঐ সময় হইতে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত কিছু কম ঐ হারে রাজস্ব আদায় হইয়া ১৭৬১ খৃঃ অব্দে দেওয়ান সেতাবচাঁদ নামক জনৈক হিন্দু ১১,৪৮,৯৮৬ টাকায় এই সমগ্র জমিদারী ইজারা গ্রহণ করেন। জমিদারদিগকে ইজারাদারের অধীন করার প্রথা এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গের প্রকৃত শোণিতশোষণ আরম্ভ হইল।

দেওয়ান সেতাবচাঁদ চারিগুণ বৃদ্ধি হারে রঙ্গপুর ইজারা লইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও সরফরাজ ও আলীবর্দ্দীর নির্দ্ধারিত রাজস্বের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক কর আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি ৭,৯১,০০০ টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় করেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব প্রদানকারীকে কতকগুলি জমিদারী একত্রে ইজারা দেওয়ার সনাতন প্রথা, বঙ্গে ইংরেজরাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিতেছি। কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াই রঙ্গপুরের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিলেন। সেতাবচাঁদ যে উচ্চ কর স্বীকার করিয়া রঙ্গপুর ইজারা লইয়াছিলেন, কোম্পানির নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ, তাহাই ঠিক রাখিলেন। কিন্তু জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বিশেষ কড়াকড়ি করা সত্ত্বেও ১১৬৯ সাল হইতে ১১৯৩ সাল পর্য্যন্ত ৭,৩৯,২৪৪ টাকার বেশী কর কিছুতেই আদায় হইল না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের লুটপাটে এবং রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়িতে ১১৭৬ সালের বিখ্যাত মন্বন্তর বাঙ্গালায় পদার্পণ করিল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শূন্য হইল। দেশে এই সর্ব্বপ্রথম যে হা অন্ন, হা অন্ন রব উঠিল অধুনা তাহার নিত্য সাহচর্য্যে আমাদিগের নিকটে উহার আর কিছুই নূতনত্ব নাই।

প্রজা না খাইয়া দলে দলে মরিতেছে, জমিদারের উপর খাজানা আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য তথাপি পৈশাচিক উৎপীড়নের বিরতি নাই। কিন্তু যতই কেন বলপূর্ব্বক শোষণ করা হউক না শরীরে যে টুকু রক্ত আছে তাহা অপেক্ষা অধিক রক্ত কোথা হইতে বাহির হইবে? বৈকুণ্ঠপুরকে রঙ্গপুর জমিদারী ভুক্ত করা সত্ত্বেও রাজস্বের কোন উন্নতিই হইল না। ইহা দেখিয়া ১১৮৪ সালে ইজারা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া প্রত্যেক জমিদারের সহিত জমিদারীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইল এবং তাঁহারা নিজ নিজ রাজস্ব একাকেক কোম্পানীর খাজনাখানায় দাখিল করিবেন এইরূপ স্থির হইল। ১১৮৭ সাল পর্য্যন্ত চারি বৎসর এই নিয়মে কার্য্য চলিল, কিন্তু তাহাতেও কোম্পানীর আশানুরূপ রাজস্ব সংগ্রহ হইল না। দেশে অর্থ না থাকিলে আদায় হইবে কোথা হইতে? বিশেষ সে সময়ে শস্যের মূল্য আজকালকার মত আগুণ হয় নাই। জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত তাহার বিনিময়ে কৃষক যে অর্থ পাইত, তদনুপাতে সরফরাজ ও আলীবর্দ্দী, রঙ্গপুরের যে রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট। তাহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ রাজস্ব আদায় করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। অর্থলোলুপ কোম্পানী ইহা না বুঝিয়া জমিদারগণের উপর অকর্ম্মণ্যতার কলঙ্ক আরোপ করিলেন। ১১৮৮ সালে নরদানব দেবীসিংহ দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর রঙ্গভূমিতে পৈশাচিক অভিনয় করিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অনেক মুসলমানের বেনামীতে আবার বর্দ্ধিতহারে রাজস্ব স্বীকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য রঙ্গপুর ইজারা গ্রহণ করিলেন। কৃষ্টপ্রসাদ, দেবী সিংহের অধীনে রঙ্গপুরের দেওয়ান

বা কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ঐ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া হররামকে দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল। জমিদারদিগের উপরে পৈশাচিক অত্যাচারের অভিনয় পূর্ণ মাত্রায় চলিতে লাগিল। হররাম ১১৮৯ খৃঃ অব্দের প্রথম তিনমাস স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়ীত্ব নিজের উপর গ্রহণ না করাতে, ১১৮৯ সালের আষাঢ় মাসে সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল হইতেছে না দেখিয়া অগ্রহায়ণ মাসে দেবী সিংহ, স্বীয় ভ্রাতা বৃকোদরসিংহকে রঙ্গপুরের কালেক্টরী পদ প্রদান করিলেন, সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার অধীনে দেওয়ান মাত্র রহিলেন। দেবীসিংহের উপযুক্ত ভ্রাতা রঙ্গপুরে যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ মহামতি বার্ক হেষ্টিংসের বিচার কালীন পার্লিয়ামেণ্টে বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আমরা রঙ্গপুর রিপোর্ট হইতে তাহার একটু আভাস মাত্র দিতেছি :—

"The Corporal punishment was the best and most used by the collecting officers. It was sometimes attended with most cruel atrocities ; the defaulters in hot season were exposed in the sun and in winter in the water, their ears were squeesed with two pieces of *khupra* (burnt flat clay), and dragged along to and fro in front of the cutcherry to the exposure of the public. A pair of shoes three feet long, one named *Sumjaon* and the other *Bujbowon*, were constantly suspended in the cutcherry as a terror to the defaulters ; tying of fingers tightly and forcing bamboo wedges between them, forcing iron pegs at the extremity of the nails, applying *tobras* (bags) filled with ashes to the mouth, confining in a room with chilly smoke, beating of the toes till the nails drop off, rolling of bamboos on the breast, hanging by the feet, applying *bechati* (poisonous plant) on the person, etc, were measures usually adopted." ১

মানুষে মানুষের উপরে ইহার অধিক কি অত্যাচার করিতে পারে তাহা আমরা জানি না। ইহাই শেষ নহে। মহিলাগণের উপরেও খাজনা বাকীর জন্য পিশাচগণ অত্যাচার করিত। কোমলাঙ্গী পুরমহিলাগণের উপরে অত্যাচারের কঠোর হস্ত পতিত হইলে, আদ্যাশক্তি আর স্থির থাকিতে পারেন না, তিনি রণবেশে ধরণীবক্ষে স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া অতি দুর্ব্বলের হৃদয়েও অত্যাচারের ভীষণ প্রতিশোধ লইতে যে উত্তেজনা জাগাইয়া দেন, তাহার ফলে

১। Rungpur Reports 1872-73 by G. C. Das, page 6.

সবল অত্যাচারীও নিষ্পেষিত হইয়া যায়, ধরাতলে শান্তি বারি সিঞ্চিত হইয়া থাকে।

দেবীসিংহের এই সকল অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কাকিনা ও টেপার জমিদারগণ আপন আপন জমিদারী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের জমিদারী সূর্য্যনারায়ণকে ইজারা বিলি করা হয়। ১

জমিদারগণের উপরে অত্যাচারের ভীষণ প্রতিশোধ লইতে প্রজামণ্ডলী বদ্ধপরিকর হওয়ায় রঙ্গপুর ভূমিতে ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল। প্রথম বিদ্রোহের সূচনা কাকিনা, কাজির হাট ও টেপায় হইয়াছিল। প্রজাসাধারণ ইজারদারের অধীনস্থ গোমস্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া দিল, খাজনা দেওয়া এককালীন বন্ধ করিল। পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল হইতে বিদ্রোহানল ফতেপুরে ছড়াইয়া পড়িল। ঐ স্থানে তাহারা সমবেত হইয়া কোচবিহারের প্রজাগণকে বিদ্রোহী হইতে বাধ্য করিল এবং একদল দিনাজপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তথাকার প্রজা সাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, দেশময় দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ডিমলার ও টেপার নায়েব সহচরাদিসহ হত হইল। হিন্দু মুসলমান এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া "অত্যাচারীর কাল নিকট" (The days of a tyrant are short) ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। বঙ্গে এরূপ বিদ্রোহ পূর্ব্বে আর কখন ঘটে নাই।

"Mr. Goodlad represented it to Mr. Hastings' Revenue Committee to be (what it was) the greatest and most serious disturbance that ever happened in Bengal."*

ডিমলার নূরল মহম্মদ ও দয়াল শীল এই ভীষণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট্ ম্যাকডোনাল্ডের অধীনে এক দল সৈন্য ও বরকন্দাজ এই বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরিত হইল। তাঁহাকে অনেক স্থলে অনেক যুদ্ধ করিতে হয়। রঙ্গপুরভূমি প্রজাশোণিতে ধৌত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে লাগিল। বহু কষ্টে ৮০০ প্রজাকে বন্দী করা হইল, দয়াল শীল স্বীয় মাতৃভূমির পরিত্রাণের জন্য আপন প্রাণ এই ভীষণ আহবে বিসর্জ্জন দিলেন। মহাম্মদ আহত হইয়া মৃত হইলেন, ইংরাজের বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিবার পূর্ব্বেই মহাশক্তি তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। ধন্য দয়াল, ধন্য নূরল, ধন্য তোমাদের দেশপ্রীতি! তোমাদের আপন হৃদয়ের রক্তদান করিয়া তোমরা প্রজাসাধারণের যে হিতসাধন করিয়াছ, অত্যাচারীর অত্যাচারের যেরূপ প্রতিশোধ লইয়াছ, সেরূপ করিতে বঙ্গের বাক্‌পটু স্বদেশীগণের এখনও বহু বিলম্ব আছে। ১১৯৪ সাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১১৯২ সালে বহুসংখ্যক প্রজা রঙ্গপুর হইতে বিশ মাইল দূরবর্ত্তী এক প্রান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কেন না নির্দ্দিষ্ট খাজনার উপরে ইজারদারের লোকেরা কাজীরহাটের প্রজার উপর

১। Paterson's Report May 1783.

* Burke's Speech vol i. page 263. (Bangabasi edition)

টাকা প্রতি আড়াই আনা অধিক কম ধার্য্য করেন। ১১৯৪ সালে এক বন্দনিয়ার অধীনে রঙ্গপুরে তৃতীয়বার বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল।

এত দিন প্রপীড়িত জমিদার ও তাহাদের দুস্থ প্রজাদিগের, যে করুণ ক্রন্দন রাজপুরুষদিগের উৎকোচ দ্বারা বধির কর্ণে প্রবেশ করে নাই, রঙ্গপুরের প্রজার শোণিত তর্পণে রাজপুরুষগণের সে বধিরতা দূর হইল, নিদ্রাভঙ্গ হইল। সমগ্র বঙ্গ অদ্যাপি তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। ইজারা বিলির ব্যবস্থা যদি আজও প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে বঙ্গদেশ যে শ্মশানে পরিণত হইত, আমাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিত না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কোর্ট-অব-ডিরেক্টারের আদেশ ক্রমে মিষ্টার পিটারসন্ এই প্রজা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান জন্য রঙ্গপুরে উপস্থিত হন। তৎকালে মিষ্টার গুড্ল্যাড্ রঙ্গপুরের কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"Mr. Peterson observes ;—Upon my first arrival the ryot of Futtehpur complained against the article of Bhatta and Duruvilla. I referred them to Mr. Goodlad as I had none of my people with me ; and he referred them back to the Rajah (Devi Singh) who immediately put the Zamindar Sheeb Chandra Choudhury in irons charging him with exciting the ryots to complain to Ameens. This was my reason when I requested your orders what measures I should take if any one was punished for complaining to me."

মিষ্টার পিটারসনের নিকট প্রতিকারের জন্য আসিয়া শিবচন্দ্র চৌধুরী, ফতেপুরের জমিদার, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। দেবী সিংহের প্রতাপের ও অত্যাচারের ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পরিচয় আর কি আছে? যাহা হউক রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহের পর হইতেই দুরাচারের পতন আরম্ভ হইল। মিষ্টার পিটারসন্ নিরপেক্ষ ভাবে এই বিদ্রোহের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এক মন্তব্য মুরশিদাবাদে পেশ করিলেন। ইহার পরে ১১৯৭ সালে জমিদারদিগকে আহ্বান করিয়া দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইল। উহাকেই "দশ-সালা বন্দোবস্ত" কহে। দশ-সালা বন্দোবস্তই শেষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। রঙ্গপুরবাসীর শোণিতেই রাজাপ্রজার মধ্যে চির শান্তির বীজ উপ্ত হইল। সমগ্র বঙ্গবাসী আজ রঙ্গপুরের সেই ক্ষুদ্র নগণ্য কৃষক নূরল মহাম্মদ, দয়ালশীল, ও মহানুভব শিবচন্দ্রের ন্যায় ভূম্যধিকারীর নিকট ঋণী। সে ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা কি করিয়াছি? প্রতাপাদিত্য উৎসব করিয়া আমরা আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিতেছি কিন্তু প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা উপরোক্ত তিন জন রঙ্গপুরবাসীর ঋণভার কি কোন অংশে কম? এ ঋণ সত্যই অপরিশোধনীয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে বর্ত্তমান

পূর্ব্বকালের জমিদারগণ সুখে দুঃখে ও অনেকটা নিরুদ্বেগে কাল কাটাইয়াছিলেন। কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতরাজ্য ভারতেশ্বরীর হস্তে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা রঙ্গপুরে যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনারল বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া উইলিয়াম এডাম সাহেব বাঙ্গালার শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন তাহা হইতে জানা যায় যে ১৮২৩ খৃঃঅব্দে রঙ্গপুর এবং তাহার নয়টী মহকুমায় ৪১টি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। উহার প্রত্যেকটীতে ৫ হইতে ২৫ জন পর্য্যন্ত ছাত্র পাঠ করিত। ঐ সকল ছাত্র ব্যাকরণ সাহিত্য কাব্য এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রঙ্গপুরের জমিদারগণ ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ দান করিয়াছিলেন। বঙ্গের অপর কোন জেলাতে এত অধিক সংস্কৃতের চর্চ্চা তৎকালে ছিল না। তথাপি এ স্থানের মানবের সহিত সরস্বতীর নিতান্ত বিরোধ ইহা বলিয়া আজও অনেকে আমোদ উপভোগ করেন। (১)

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর বঙ্গের অন্য জেলাসমূহে নূতন পদ্ধতির শিক্ষালাভ করিবার কথা যখন মনেও উদয় হয় নাই তখন রঙ্গপুরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জমিদারদিগের উদ্যোগেই রঙ্গপুরে একটী ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।২

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে ঐ বিষয় লিখিত হইয়াছে "দূর দেশীয় লোকদিগেরও অগোচর না থাকিবেক, যে এই রঙ্গপুর জেলার ছোট বড় প্রায় তাবৎ ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা চান্দা দ্বারায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ১৮৩২ সনে এই জেলার সদর স্থানে রঙ্গপুর স্কুল নামে ভারি এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এ পর্য্যন্ত তাহা স্থায়ী রাখিয়াছেন "ইত্যাদি।

বার্ত্তাবহের ৪র্থ ভলিউমের ১৯১ সংখ্যায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ ১লা এপ্রিল ১২৫৭ সালে লিখিত হইয়াছে—

"এথাকার দাতব্য চিকিৎসালয় যাহা পূর্ব্বে এথাকার পূর্ব্ব সিবিল ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত টমাস আমরূস্‌সা সাহেব ও বিখ্যাত ভূম্যধিকারী বাবু রাজমোহন শর্ম্মরায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে ও অর্থব্যয়ে ও অন্য বহু ধনাঢ্য লোকের অর্থানুকূল্যে সংস্থাপিত হইয়াছিল, নানা কারণে তাহা রহিত হইয়া যাওয়াতে পুনরায় এক্ষণে তাহার পুনরারম্ভ হইল" ইত্যাদি। পরে লিখিত হইয়াছে "এ জেলার সদর আমীন খাঁ বাহাদুর ও কুণ্ডী পরগণার এক ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরী ও কালেক্টরীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ মজুমদার এবং স্বয়ং সেসন জজ সাহেব এই চারি ব্যক্তি সমাগত হইলে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে চিকিৎসালয়ের

১। Adam's Reports on Vernacular Education of Bengal p. 72.

২। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ ৫ম ভলিউম, ১৮৫ সংখ্যা ইং ১৮৫১ সাল ১৩ই মে, বাঙ্গালা ১২৫৮ সাল ১৩ই বৈশাখ মঙ্গলবার দেখ

কার্য্যারম্ভ ও তদ্বিষয়ে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা নির্দ্ধারিত হয়।" উপরোক্ত বিবরণ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসালয়ের প্রথম স্থাপন এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল ২য় বার স্থাপনের বিবরণ পাওয়া গেল।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ কলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রই ৫০ টাকা বেতনে রঙ্গপুর চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত হইয়া আসেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর রঙ্গপুর স্কুল গৃহে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ সভা আহুত হইয়াছিল। এই সভায় জমিদার, গবর্ণমেণ্ট অফিসার, নীলকর, মহাজন প্রভৃতিতে ৫০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন কালেক্টর শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেব এই সভায় সভাপতিত্বে বৃত হন।

সভাস্থলে এক কালীন ৫০০০ টাকা এবং মাসিক ২৫ পঁচিশ টাকা দান স্বাক্ষরিত হইল।

রঙ্গপুর জমিদারদিগের উদ্যোগে আর একটি সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। মফঃস্বলের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের প্রচার ইং ১৮৪২ খৃঃ অব্দে রঙ্গপুর কুণ্ডীর জমিদারদিগের দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছিল।

এত গুলি দেশহিতকর কার্য্যে মন প্রাণ ও অর্থ ঢালিয়া দিয়া তৎকালে আর কোন স্থানের ভূম্যধিকারিগণ অগ্রসর হন নাই। আজ আমি ভূম্যধিকারী মহোদয়গণকে তাঁহাদের সেই সকল অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই সকল কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ—ভূম্যধিকারীগণের আজ সে দিন গিয়াছে, তাঁহারা কোন্ মোহে ভুলিয়া নিজেদের উপর আর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেছেন না; ভিন্নস্থানবাসী কয়েকটী লোকের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছেন; আপন গৌরব আপনি নষ্ট করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়া, নিজের জন্মভূমির উন্নতি কল্পে কোন চেষ্টা না করিয়া, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভেই উৎসুক হইয়াছেন। এ প্রতিষ্ঠা লাভ ক্ষণস্থায়ী ও অসার। পূর্ব্বতন ভূম্যধিকারীগণের কীর্ত্তির নিদর্শন গুলি রঙ্গপুর ভূমিতে আজও সগৌরবে মাথা তুলিয়া আছে। ঐ কীর্ত্তি ছাড়া আধুনিক ভূম্যধিকারীগণ উল্লেখযোগ্য আর কোন কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? তাঁহাদের রুচির বিকৃতি ঘটিয়াছে এতদ্ব্যতীতও প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন। এক্ষণে সময়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভূম্যধিকারীগণকে দাঁড়াইতে হইবে নতুবা তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের সহিত যুদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বে দুই বার হইয়াছিল এই আজ তৃতীয় বার হইতেছে। আমরা পূর্ব্বের যুদ্ধায়োজনের বিষয় এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের এবং রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারীগণ সেই আসন্ন দুর্দ্দিনে কিরূপে রক্ষা পাইবেন তাহার আলোচনার

১। ১২৬১ সালের বার্ত্তাবহ ইং ১৮৫৪, ৮ম ভলিউম ৩৩১ সংখ্যা ও ৩৩২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জন্য মহাত্মা রাজমোহনের নেতৃত্বে রঙ্গপুরে প্রথম ভূম্যধিকারী সভা স্থাপিত হয়।

এই মহাত্মা রঙ্গপুরের যাবতীয় সাধারণ হিতকর কার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার মৃত্যুতে উদ্যোগী লোকের অভাবে ও অন্যান্য নানা কারণে সে সভা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠা ১২৫৬ সালের ১১ই ভাদ্র তারিখে হইয়াছিল। এই সভার বিস্তৃত বিবরণ ১২৫৬ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে প্রকাশিত হয়।

এই সভার অধ্যক্ষেরা কিরূপ স্বাধীন-চেতা ছিলেন তাহা রঙ্গপুর অঞ্চলের অন্যতম জমিদার কালী চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:—

"আমাদিগের স্বজাতীয় হিন্দু রাজাদিগের রাজ্যশাসন যদ্রূপ প্রজাপালক ছিল, বর্ত্তমান বিজাতীয় ব্রিটিশ রাজ্যশাসন তদ্রূপ প্রজানাশক হইয়াছে; আপনাদিগের উচিত হয় যে এই কথা সর্ব্বদা অন্তরে চিন্তা করতঃ তাহার প্রতিকার, তদর্থ যত্নশীল হওন এবং এক বাক্যে ও এক মত হইয়া গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আইন সকলের প্রতিবাদ করুন।"

আজ আমরা স্বাধীন চেতা ও স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে যাইতেছি কিন্তু ষাট বৎসর পূর্ব্বে কালী চন্দ্র প্রকাশ্য ভূম্যধিকারী সভায় কিরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন!

বাঙ্গালীর জাতিগত দোষ যে, যিনি উদ্যোগী হইয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করেন তাঁহার অভাব হইলে সে স্থান প্রায় কেহ অধিকার করে না—কার্য্যটী পণ্ড হইয়া যায়। আমাদের রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভা কালীচন্দ্রের মৃত্যুতে সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আজ আবার সেই ভূম্যধিকারী সভার পুনরুজ্জীবনের জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি। ইহার আবশ্যকতা অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইতেছে তাহা আনুষ্ঠানিক পত্রেই লেখা হইয়াছে আমি তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাহিনা। তবে এই মাত্র বলিতেছি আমাদের একতা স্থাপন না হইলে আর মঙ্গল নাই।

নিজের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া আমরা যদি অগ্রসর না হই, তবে আজ হোক বা কাল হোক একে একে সকলকেই ধ্বংস হইতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

অক্ষম।

কেন সাধ দিলে নাথ, সাধ্য নাহি দিয়া,
অশ্রু না মুছাতে পারি, শুধু কাঁদে হিয়া।
কেন দিলে আকিঞ্চন, না দিলে সম্বল,
কেন নাথ, আঁখি হীনে, দিলে আঁখি জল।

শ্রী—

মহাভারত।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত।

মিত্র দেব—শল্যরাজ।

শল্য রাজ চরিতের লক্ষণ গুলি এই ঃ--

১। শল্যরাজ মদ্রদেশাধিপতি। (১)

২। মদ্ররাজশ্বসা মাদ্রীদেবী নকুল সহদেবের মাতা।

৩। মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের অভ্যর্থনায় কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন। (মহা ৫।৮)

৪। কিন্তু তিনি ভাগিনেয় যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে "প্রতিকূল ও অহিত' বাক্যাবলিবিন্যাস দ্বারা কর্ণকে হতদর্প ও নষ্টতেজ করিয়া" অর্জ্জুনের কর্ণবধের সহায়তা করিবেন। (মহা ৫।৮)

৫। শল্যরাজ কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করিলেন কিন্তু "নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।" (মহা ৮।৩৩)

৬। শল্যরাজের বাক্‌শল্যে ব্যথিত হইয়া এবং তাহাকে বৃশ্চিক সম্বোধনে কর্ণ অথর্ব্ববেদোক্ত বৃশ্চিক বিষসাহের মন্ত্র প্রয়োগে শল্যরাজের "বিষক্ষয়" করিলেন। (মহা ৯।৪১)

৭। কর্ণের পর শল্যরাজ কৌরব সেনাপতি হইলেন

৮। শল্য রাজ কেবল যুধিষ্ঠিরের বধ্য ছিলেন (মহা ৯।৭)

৯। এবং যুধিষ্ঠিরের শক্তিশস্ত্র শল্যরাজের বক্ষ বিদীর্ণ করিল। (মহা ৯।১৭)

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

১। সোমধারা পরিপ্লুত তারা বৃশ্চিকের হৃদয়স্থ রক্তবর্ণ ১ বৃশ্চিকস্থ (Antares) তারার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে বোধ হয় যেন তারাবৃশ্চিকের বক্ষ হইতে রক্তস্রাব হইতেছে।

২। ৩৭৫০ বর্ষ পূর্ব্বে কার্ত্তিকী সংক্রান্তি দিনে সূর্য্য বৃশ্চিক সংক্রমণ করিলেই—সুমেরুস্থিত ঋষিগণের ষান্মাসিক রাত্রি উপস্থিত হইত এবং ছয় মাস কাল সূর্য্য তেজোহীন বা যম ভাবে কাল কাটাইতেন।

৩। কর্ণ চরিতের জ্যোতিস্তত্ত্ব স্মরণ রাখিলেই শল্য চরিত বুঝা যাইবে।

জ্যোতিষিক ইতিহ।

১। মঙ্গল গ্রহে দেবত্রয় ঃ--কাম-মৃত্যু-সমরদেব—(২) অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া বেদে মঙ্গল গ্রহ ত্রিত নামে পূজিত। এবং

(১) পরাশর তন্ত্রে ও বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতায় (মহা ৯।৪১) 'কম্বলাবৃত মদ্যপায়ী মদ্রগণের' নিবাস ভারতের "নবখণ্ডের" উত্তর খণ্ডে নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু শব্দ বিদ্যার জোরে সুদূর দক্ষিণে গ্রীষ্মময় মান্দ্রাজে মদ্র দাখিল হইতেছে। সে কথায় আমাদের দরকার নাই।

(২) "A mysterious anceint deity" Griffith Com. 2nd. Thrita.

ঋগ্বেদে (১।১৫৮।৫) ঐ মঙ্গলের বাহন তারা বৃশ্চিক ত্রৈতন (গ্রীক-টাইটান) নামে খ্যাত। (৩)

২। বেদ মতে (৯।৩৪।৪) ত্রিত দেব সোমশোধক। এবং তদর্থে (৯।১০২।২) ত্রিত দেবের পাষাণদ্বয়(৪) মধ্যে সোম সমাগত হয়। ত্রিতদেবের (৯।৩৮।২) রমণীগণ ঐ পাষাণদ্বয় দ্বারা ইন্দ্রাভিমুখে সোমসঞ্চালন করেন।

৩। তারা দর্শক জানেন যে তারা ব্যাঘ্র ও তারা বৃশ্চিকের প্রতি লক্ষ্য করিলেই—নিত্যই দেখা যায় যে মূলাধিপতি নিঋ'তি-যম-কর্ণের সারথি ভাবে অনুরাধাধিপতি মিত্রদেব তারা বৈয়াঘ্র পৃষ্ঠে বিমানে গমনাগমন করিতেছেন।

৪। ঐতিহাসিক ভাষায় দীর্ঘকাল স্থায়ী যম (সূর্য্য) ই দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমা বৃশ্চিক-ত্রৈতন স্পর্শ করিলেই বৃশ্চিক দংশনে তেজোহীনতা বা যমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বেদ মতে (১।১৫৮।৫) দীর্ঘতমা ও ত্রৈতনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ত্রৈতনের বক্ষ ও স্কন্ধ আহত ও রক্তাক্ত হয়।

উপপত্তি।

আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারি যে ঃ—অনুরাধা নক্ষত্রাধিপতি মিত্র দেব ইতিহে মদ্রপতি ও শল্য নাম কিরূপে পাইলেন।

এবং তিনি তারা বৈয়াঘ্র পৃষ্ঠে কর্ণের সারথি হইয়া কর্ণের তেজ হরণে কিরূপে সমর্থ হইলেন।

এবং কর্ণই বা কেন অথর্ব্ব বেদোক্ত বৃশ্চিক দংশন মন্ত্রে মদ্ররাজের বিষবাক্যের বিষ সাহ্য করিলেন।

এবং ত্রৈতনরূপী মিত্রদেব—শল্য কেনই বা কেবল যম—যুধিষ্ঠিরের বধ্য বলিয়া পরিকল্পিত হইল।

এবং যম—যুধিষ্ঠিরের শক্তিশস্ত্র আঘাতে কেনই—শল্য রাজের হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

এবং অসুরভাগস্থ অনুরাধা নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত বলিয়া মিত্রদেব অসুর কৌরব পক্ষে দণ্ডায়মান।

বেদে যাহা প্রকাশিত আছে ঐতিহাসিক বা পুরাণপ্রণেতা তাহারই অনুসরণ করিবেন।

রাহু-অশ্বত্থামা।

১। দ্রোণগুরু ও কৃপী অশ্বত্থামাকে পুত্রলাভ করেন। (মহা ১।১৩১)

২। দুগ্ধ পান জন্য শিশু অশ্বত্থামা রোদন করিলে পিতা দ্রোণ দুগ্ধবতী গাভী সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি পাইলেন না পিষ্টক-মিশ্রিত জল পান করিয়া "আমি দুগ্ধ পান করিলাম" বলিয়া বালক নৃত্য করিতে লাগিল। (মহা ১।১৩৩)

৩। অশ্বত্থামা অমর (মহা ৮।৮৯) অশ্বত্থামার রথধ্বজ কোদণ্ড ভূষিত (মহা ৪।৫৫)

৪। অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য "ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কবচ ত্যাগ করিব না" এই প্রতিজ্ঞা অশ্বত্থামা করিয়াছিলেন (মহা ৮।৫৮)

(৩) A man called Traitana "Griffith Com. 2nd. Thraetaona.

(৪) বৃশ্চিকের হুল স্বরূপ তারা দ্বয় ২ ও ৭ বৃশ্চিকস্থ তারা।

৫। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা কৌরব সৈন্যের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন (মহা ৯।৬৬)

৬। কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে পাণ্ডব শিবির দ্বারে রাখিয়া অশ্বত্থামা মহাদেবদত্ত খড়্গ হস্তে অন্যস্থান দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। (মহা ১০।৮)

৭। এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে উপনীত হইয়া অশ্বত্থামা পার্দ দ্বারা তাহাকে প্রবোধিত করিলেন এবং পাদ দ্বারা তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া বধ করিলেন এবং দ্রৌপদীর পঞ্চকুমার হত্যা করিয়া শিখণ্ডীকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। (মহা ১০।৮)

৮। পুত্র শোকাতুরা দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের নিকট অশ্বত্থামার বধ এবং তাহার মস্তকস্থিত স্বভাবসিদ্ধ মণি প্রার্থনা করিলেন। (মহা ১০।১১)

৯। ভাগীরথী তীরে অশ্বত্থামা বেদব্যাস সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন ভীমসেন তাহার রথচক্র চিহ্ন অনুসরণে ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির ও কেশবার্জ্জুন তাহার অনুগমন করিলেন। (মহা ১০।১১—১৩)

১০। বেদব্যাসের মধ্যস্থতায় বিরোধ শান্তি হইল। অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করিলেন। (মহা ১০।২৬)

১১। শ্রীকৃষ্ণ আদেশে ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয় শোণিত গন্ধময় হইয়া অশ্বত্থামাকে দুর্গম কাননে নিরন্তর পর্য্যটন করিয়া দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতে হইল। (মহা ১০।১৬)

১২। বেদব্যাস সহ অবস্থান করিবার কল্পনা ও প্রস্তাব করিয়া অশ্বত্থামা অরণ্য পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। (মহা ১০।১৬)

১৩ অশ্বত্থামার শিরস্থিত স্বভাবসিদ্ধ মণি দ্রৌপদী—যুধিষ্ঠিরকে মস্তকে ধারণ করিতে দিলেন। (মহা ১০।১৬)

জ্যোতিষিক তত্ত্ব।

১। বিমানে ও ভগোল চিত্রে দেখা যায়—যে ধনুকাকৃতি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র তলে হ্রদসর্পমণ্ডলের মুণ্ড (Caput Hydrae) এবং তাহার ধড় বৃশ্চিক মণ্ডল (Scorpio) পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

২। ঐ তারা সর্প—বিষুবতী রেখা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত রহিয়াছে। বিষুবতী রেখার উত্তরে তারাসর্পের মুণ্ড এবং দক্ষিণে ঐ তারাসর্পের ধড়।

৩। তারা জগতে রাহু ও কেতু গ্রহ হ্রদসর্প মণ্ডলে অধিষ্ঠিত আছে। ঐ সর্পমুণ্ড রাহু গ্রহের প্রতিকৃতি, এবং ঐ ধড় কেতু গ্রহের প্রতিকৃতি। এজন্য মুণ্ডের নাম রাহু ও ঐ ধড়ের নাম কেতু বলিয়া তারা জগতে বিদিত।

৪। ভচক্রের একটী ব্যাসের এক ব্যাসার্দ্ধে রাহু ও অপর ব্যাসার্দ্ধে কেতুগ্রহ অবস্থিত থাকিয়া ১৮বৎসরে একবার হিসাবে নিরন্তর রাশিচক্র পর্য্যটন করিতেছে।

৫। ঐ হ্রদসর্পের মধ্যভাগের উর্দ্ধে কাংস্য মণ্ডল (Cratena the Cup) ও হস্তা নক্ষত্র এবং তদূর্দ্ধে তারাকন্যা (Virgo) বিরাজ করিতেছে।

৬। তারা রাহুর অনতিদূর পশ্চিমে আকাশ গঙ্গা ওরফে ভাগীরথী (Milky Way) বিরাজমান আছে।

৭। আগ্নদেবের মধ্যস্থান মূর্ত্তি বিদ্যুৎ-

দেব। বিদ্যুতাগ্নি নক্ষত্র জগতে রাধানক্ষত্রে * নামজাদে বিশাখা নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছে। বাক্যান্তরে, রাধা ওরফে বিশাখা নক্ষত্রের দেবতাদ্বয়ের মধ্যে এক জন অগ্নি। বিদ্যুতাগ্নি ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পাণ্ডব সেনাপতি। হ্রদসর্পের পদতলে অর্থাৎ লাঙ্গুলাগ্রে রাধা নক্ষত্র অবস্থিত।

৮। তুলা রাশিস্থ স্বাতি ও বিশাখা এই দুইটী নক্ষত্র মধ্যে স্বাতি নক্ষত্র অধুনা তুলা রাশির বহু উর্দ্ধে ভূতেশ মণ্ডলে (Bootes) অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

জ্যোতির্ষিক ইতিহ।

১। সমুদ্র মন্থনের ইতিহ ভারতের হিন্দু সমাজে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত আছে। সমুদ্র মন্থন জাত অমৃতের ভাণ্ড, মোহিনী মূর্ত্তি, করে ধারণ করিয়া দেবগণকে অমৃত পরিবেশন করিতে ছিলেন। দেব বেশপরিচ্ছন্ন অসুর রাহু, দেব সমাজে বসিয়া অমৃত পানে উদ্যত হইলে,চন্দ্র সূর্য্যের ইঙ্গিতে মোহিনী দেবী রাহুর ছলনা টের পাইয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া দিলেন। কিন্তু অমৃত মুখে দিয়া স্বাদ গ্রহণ মাত্র করিলেও রাহু অমরত্ব লাভে জীবিত রহিল। রাহুর গলদেশ ও কেতুর স্কন্ধদেশ শোণিতাক্ত রহিল।

২। ফলিত জ্যোতিষ মতে রাহুর অধিদেবতা কাল।

৩। প্রবাদ মতে সর্পশিরে স্বভাব সিদ্ধ মণি থাকে। তদ্ভিন্ন মস্তকে স্বভাব সিদ্ধ মণি অপর কোন প্রাণীর ভাগ্যে ঘটে না।

উপপত্তি।

রাহু মুণ্ডের উর্দ্ধে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র-ধনু তাই অশ্বত্থামার রথধ্বজ কোদণ্ড লাঞ্ছিত।

রাহু সর্প অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করে এজন্য মর্ত্ত্য মানবদেহ ধারণ করিয়াও অশ্বত্থামা অমর বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।

রাহু অমৃত পানার্থে লালায়িত বলিয়া রাহু অশ্বত্থামা দুগ্ধামৃত পানার্থে রোরুদ্যমান। কিন্তু প্রকৃতার্থে অমৃত পান রাহুর ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই পিতা দ্রোণ দুগ্ধবতী গাভীর বহু অন্বেষণে অকৃতকার্য্য। বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ না হইলে এরূপ সামান্য ঘটনা মহাকাব্যে স্থান পাইবে কেন?

তারা রাহুর অমৃত ভোজনের ও শিরশ্ছেদনের ইতিহ ভগোলে অবিনশ্বর অক্ষরে তারাকাংস্যে ও তারা হস্তে ও তারা মোহিনীতে এবং তারা সর্পে ও বিষুবতী রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে। জাতিগত আলস্য ত্যাগে নেত্র উন্মীলন করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

নিশাচর শিকারী জন্তু মাত্রেই নিশাকালে পরাক্রমশালী হয়, এজন্য রাহুসর্প অশ্বত্থামা নিশাকালে অলক্ষিতপূর্ব্ব বিক্রম প্রকাশে অধিকারী হইল।

বিদ্যুতাগ্নি অস্ত্র শস্ত্রে বিনষ্ট বা নির্ব্বাপিত হইবার নহে, কেবল ধরাস্পর্শ মাত্র পৃথিবীতে বিলীন হয়। সুতরাং বিদ্যুতাগ্নি দেব ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র শস্ত্রের অবধ্য হইলেও ধরাতলে পাতিত ও পদ দলিত হইয়া রাহু অশ্বত্থামার বিক্রমে বিধ্বংস হইল।

প্রাণীগণ মধ্যে সর্প ই নিরাহারে জীবিত

* রাধা বিশাখা (অমরকোষ)।

থাকিতে পারে। স্বরূপ নিরাকরণ উদ্দেশ্যেই অশ্বথামার মস্তকে ক্ষুৎনাশক স্বভাব-সিদ্ধ মণি অর্পিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ কুমার ও গুরুপুত্র বলিয়া মহাকাব্যে অশ্বথামার শিরশ্ছেদ বর্ণিত হয় নাই কৌশলে মণিপ্রদান কল্পিত হইয়াছে, তবে এই ত্রুটি পূরণার্থে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গণ অশ্বথামার শিরোমণি অর্জ্জুনান্ত্রে কর্ত্তিত কল্পনা করিয়া কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন (কবি কাশীদাস দেখ)।

এই শিরোমণির ইতিহ স্যমন্তক মণির ইতিহ রূপে হরিবংশে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শোণিতাক্ত রাহু মুণ্ড রাশিচক্রের ব্যাসলগ্ন হইয়া বিমান বনে চির পরিভ্রমণ করিতেছে। গতিকে ব্যাস সমভিব্যাহারে রক্তাক্ত অশ্বথামার নিরন্তর বন পর্য্যটন কল্পিত হইল। এমন হৃদয়গ্রাহী নিগূঢ় ব্যঙ্গোক্তি কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বুঝি বা এতাদৃশ গূঢ়োক্তিই ব্যাসকূট নামে গণপতি দেবের লেখনী স্তম্ভিত করিত।

সত্য বটে যে মহাভারত পাঠে দেখা যায় যে অশ্বথামার কানন পর্য্যটন প্রথমে তিন সহস্র বর্ষ কল্পনা করিয়া পরক্ষণেই—নিরন্তর পর্য্যটন আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণদেব প্রচার করিলেন এবং অমর অশ্বথামা চিরনির্ব্বাসনে স্বীকৃত হইয়া অরণ্যে গমন করিল। তিন সহস্র বর্ষ পরিমাণ কলির শেষ সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উল্লেখ করা না হইয়া থাকিলে উহার অন্য তাৎপর্য্য গ্রহণে আমরা অক্ষম।

রাহু অশ্বথামা চরিত্রে চার্ব্বাকের নৃশংসতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ্যে বলিলেন "মনীষিগণ তোমাকে পাপাত্মা কাপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন।" রাহু অশ্বথামা বচনে দেবতা (মহা ৮।৮৯) কিন্তু কার্য্যে ঘোর নৃশংস অসুর। অসুরের অমৃত পানের ফল এই।

তারাদর্শক।

বিস্মৃত-জনপদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দেবরায়।

দ্বিতীয় দেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন কুল্‌বর্গের সুলতান লেলিহান লোল জিহ্বা মেলিয়া ওরঙ্গল দখল করিবার প্রয়াসী। দেবরায় তখন বালক না হইলেও পরিণত বয়স্ক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তরুণ হৃদয়ে হিন্দু বীরত্বের অমরগীতি ধ্বনিয়া উঠিল—তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিজয় শঙ্খের গুরু গম্ভীর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। হিন্দু যোধগণ প্রতিহিংসা সাধনের জন্য মুসলমান সুলতানের রাজ্যলিপ্সাকে পদদলিত করিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে বিজয়নগরের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন বিজয়নগর আপন কর্ত্তব্যপালনের

জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, যখন তাঁহারা বুঝিলেন বিজয়নগরে রণসজ্জার বিপুল আয়োজন দেখা দিয়াছে, তখন তাঁহারাও মুক্ত অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।

ফিরোজ শাহ প্রমাদ গণিলেন এমন আত্মত্যাগ, এমন অকুতোভয়, এমন করিয়া শমনকে বরণ তিনি আর কখনো দেখিয়াছিলেন না। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিন্দু এবং মুসলমানের তপ্ত শোণিতে শুষ্কভূমি আর্দ্র হইয়া উঠিল। হিন্দু জীবন ও ধর্ম্মের জন্য, আর সুলতান পররাজ্যগ্রহণ ও হত্যার জন্য যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত সেনাদল হিন্দুর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল—হিন্দুর জয় হইল। স্বয়ং সুলতান সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক যশস্বী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইলেন! *

সুলতান পলায়ন করিলেন বটে কিন্তু হিন্দু সৈন্য ফিরিল না, তাহারা সেই পলায়ন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে অতিমাত্র ব্যস্ত করিয়া তুলিল। যুদ্ধে বিজয় লাভের আশাও পূর্ব্বেই গিয়াছিল, সুলতান এখন জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিলেন। জয়দৃপ্ত হিন্দু সৈন্য সুলতানের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইল—ধর্ম্মমন্দির ভূমিসাৎ করিল—অনল সংযোগে গৃহাদি ভস্মীভূত করিতে লাগিল। তখন চারিদিকে ধ্বংস—চারিদিকে মৃত্যু—চারিদিকে প্রলয়! সুলতান প্রমাদ গণিলেন। কাতর কণ্ঠে গুজরাটের নবীন সুলতানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। গুজরাট-সুলতান স্বেচ্ছায় অনল মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে চাহিলেন না।

কিছুকাল 'পর সমর কোলাহল যখন নিবৃত্ত হইল তখন ফিরোজ শাহের মন অবসন্ন ও দেহ বলহীন হইয়াছে। সুলতান অসি চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শয্যা লইলেন এবং অল্পকাল পরই ভবসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল প্রিয়পুত্র হাসনকে সিংহাসনে বসাইবেন, কিন্তু ভ্রাতা আহম্মদ খান্‌খানান্ সিংহাসনলোভে বিদ্রোহী হওয়ায় মরণোন্মুখ ফিরোজ শাহ তাঁহার শিরেই রাজমুকুট অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। খান্‌খানান্ ভামনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রথম আহম্মদ শাহ নামে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেন।

অপমান ক্ষত শুষ্ক হইতে না হইতেই আহম্মদ শাহ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজয় নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই দুদ্দিনেও হিন্দুগণ শত্রুর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন এবং

---

* The Sultan was defeated, and with the utmost difficulty, by the most surprising and gallant efforts, made his escape from the field. The Hindoos made a general massacre of the Mussalmans, and erected a platform with their heads on the field of battle.—Firista.

শেষে জয়াশা না দেখিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সুলতানের প্রমত্ত সৈন্যগণ ওরঙ্গল করায়ত্ত করিয়া লইল (খৃঃ অঃ ১৪২৪)।* ওরঙ্গলের হিন্দুরাজের নাম সেই দিন হইতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল।

বিজয় নগর বহুমূল্যে যে সন্ধি ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা প্রায় দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিল। কিন্তু দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বালক দেবরায় তখন পরিণত বয়স্ক হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন সৈন্য সংগঠন না করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সুতরাং আলাউদ্দীনকে তুষ্ট করিয়া পুনরায় সন্ধি ক্রয় করিলেন। সন্ধি হইল বটে কিন্তু মুসলমানের অত্যাঘাতে ও পীড়নে হিন্দুজনপদ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল।

আলাউদ্দীনের ভ্রাতা মহম্মদ এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন। আপন সৈন্যের সমর-কুশলতা দেখিয়া এবং বিজয়লাভে উল্লসিত হইয়া তিনি অবিলম্বে সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং মুদ্‌কল, রাইচুড়, শোলাপুর ও বিজাপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান নিজেই অধিকার করিয়া বসিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই আত্মকলহের অনলে ইন্ধন সংযোগ করিবার মানসে দেবরায় মহম্মদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেশে যখন শান্তি সংস্থাপিত হইল তখন দেবরায় প্রধান প্রধান হিন্দু বীরদিগকে আহ্বান করিয়া একটী মন্ত্রণা-সভা করিলেন। সেই বিশাল মন্ত্রণা-সভার হিন্দু স্বাধীনতার অন্যতম পুরোহিত দেবরায় বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—আমার সাম্রাজ্যসুদূর বিস্তৃত। ইহার তুলনায় ভামনি রাজ্য গোষ্পদতুল্য। আমার সৈন্য সংখ্যা মুসলমান সৈন্যের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু জানি না কি কারণে আমাকে অর্থ দিয়া সন্ধি ক্রয় করিতে হয়। হিন্দু বীরগণ! আপনারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে সুলতানের অশ্বগণ অধিক কর্ম্মঠ এবং সুলতানের সুশিক্ষিত তীরন্দাজই তাঁহার জয়লাভের কারণ। রোগ নির্ণয় করিয়াই দেবরায় তাহার প্রতিকারে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে মুসলমান সৈন্যগণ রাজ-সৈন্য মধ্যে পরিগৃহীত হইল। তিনি তাহাদিগকে জায়গীর দিয়া তুষ্ট করিলেন এবং উপাসনার জন্য মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাঁহার রাজসিংহাসন সম্মুখেও কোরাণ রক্ষিত হইল। হিন্দু সৈন্যগণ শিক্ষিত অস্ত্রগুরুর নিকটে লক্ষ্যবেধ শিক্ষা করিতে লাগিল। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন সে কালে দেবরায়ের অধীনে দুই সহস্র মুসলমান এবং ৬০ সহস্র হিন্দু তীরন্দাজ, ৮০ সহস্র অশ্বসাদী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য বীরদর্পে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইত। ফেরিস্তার বর্ণনায় অত্যুক্তির প্রভাব আছে বলিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন। কিন্তু এক দিন হিন্দু-

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই ঘটনা ১৪২২ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল

দিগের এইরূপই গৌরব ও শক্তি ছিল। সেই অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করিতেও আনন্দ আছে—তাহার আলোচনাতেও লাভ আছে।

সৈন্য সংগঠন মানসে দেবরায় যে বৎসর (খৃঃ অঃ ১৪৪১) মন্ত্রীসভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার পর বৎসরই তাঁহার একটী আত্মীয় * তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সময়ে আব্দুর রজাক পারশ্যের রাজদূত স্বরূপ কালিকটে অবস্থান করিতেছিলেন।

রাজভ্রাতা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেবরায় ও তাঁহার প্রধান প্রধান পার্শ্বচরদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার গৃহে ভ্রাতার নিমন্ত্রণ, সুতরাং কাহারো মনেই সন্দেহের কারণ ঘটে নাই। অভ্যাগতগণ একটী কক্ষে সমবেত হইলে পর, রাজার ভ্রাতা একে একে পার্শ্বচরদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী ভোজনকক্ষে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই সেই কক্ষদ্বারে দুই জন ঘাতক শাণিত অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত ছিল। নিঃশঙ্ক অভ্যাগত ভোজন গৃহের দ্বার প্রান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই অলক্ষিত হস্তের তরবারি আঘাতে তাহার ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল! চতুর্দ্দিকের বাদ্যভাণ্ডের রোল মধ্যে হতভাগ্যের শেষ আর্ত্তনাদ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে সকলকে নিহত করিয়া রাজভ্রাতা রাজার সমীপে গমন করিয়া গুবাকপূর্ণ স্বর্ণ থাল হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন "প্রাসাদে সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" মহারাজ দেবরায় কহিলেন "আমি একটু অসুস্থ হইয়াছি।"

পামর রাজহন্তা দেখিল তাহার সকল কৌশল জাল ছিন্ন হইয়া গেল। সে আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া কোষনিবদ্ধ অসি মুক্ত করিয়া দেবরাজকে আক্রমণ করিল। সেই আকস্মিক আঘাতে দেবরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িলেন। রক্ত পিপাসু গুপ্তহন্তা দেবরায়ের মস্তক কাটিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া চিৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—'আমি দেবরায়কে হত্যা করিয়াছি—আমিই এখন বিজয়নগরের নৃপতি! এই দেখ আমার হস্তে রাজার শোণিত—এই দেখ আমার বসনে রাজপার্শ্বচরদিগের শোণিত।

এদিকে তাহার ভৃত্য যখন দেবরায়ের শির কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পাপিষ্ঠকে ভূপাতিত করিয়া নিহত করিলেন এবং স্বয়ং প্রাসাদের অপর চূড়ায় যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিস্মিত জনসঙ্ঘ তাঁহাকে দেখিয়া পুলকে গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজহন্তা দস্যুকে শত ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

রাজভ্রাতা আপন পাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন বটে কিন্তু যে মন্ত্রীর দুষ্ট বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া তিনি এই ঘৃণিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন সে পলায়ন করিয়া ভামনি সুলতানের নিকট যাইয়া সকল কথা প্রচার

* কেহ বলেন ভ্রাতা, কেহ বলেন ভ্রাতৃপুত্র।

করিল। সুলতান দেখিলেন এই সুসময় —রাজ্যে অশান্তি—রাজা স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে কাতর এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান বীরকুল রাজভ্রাতার গুপ্ত খড়্গাঘাতে নিহত! সুলতান আর কাল বিলম্ব না করিয়া দেবরায়ের নিকট বহু অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন। দেবরায় ঘৃণায় ও ক্রোধে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই পক্ষের সেনাপদভরে সীমান্ত প্রদেশ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দেবরায় মুদ্‌কল দুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ বিজাপুর পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দুই মাস মধ্যেই তিনটী ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল—সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান বীরদিগের মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হইয়া সেই ভীষণ সমরের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলিল। শেষে একদিন মুসলমান সেনাপতি খাঁ রেমান কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে দেবরায়ের পুত্র বীরের ন্যায় মৃত্যুলাভ করিয়া অমর হইলেন। হিন্দু সৈন্যগণ ভীত ও বিচলিত হইয়া মুদ্‌কল দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। কিন্তু তাহারা যখন দুর্গে প্রবেশ করিতেছিল সেই সময় দুইজন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্ম্মচারী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইয়া বন্দী হইলেন।

পুত্রশোকবিধুর দেবরায় সুলতানের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন, সুলতান যদি প্রতিজ্ঞা করেন আর কখনো হিন্দুর রাজ্য আক্রমণ করিবেন না তাহা হইলে তিনি বন্দীদ্বয়কে মুক্তি দিতে পারেন। সুলতান অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। দেবরায়ের বীরপুত্রের হৃদয়শোণিতপাতে সে দিন হিন্দু ও মুসলমানে যে সন্ধি হইয়াছিল দেবরায়ের জীবনকাল মধ্যে কেহ তাহা ভঙ্গ করে নাই।

পুত্রশোকে, জর্জ্জরিত হইয়া দেবরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য স্বাধীনতার পূজা কিছুই বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহার এক পুত্র সমরে নিহত হইল বটে কিন্তু তিনি সহস্র সহস্র পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকাল মধ্যে বিজয়নগরের যে শোভা ও সম্পদ ছিল তাহা স্মরণ করিলে এতকাল পরেও গৌরব করিতে ইচ্ছা হয়।

দেবরায় যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাহার অল্প কাল পরেই নিকোলোকণ্টি নামক একজন ইতালিয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া প্রথমে ক্যাম্বে নগরে ও পরে বিজয়নগরে আগমন করেন। তল্লিখিত লাটিন ভাষায় লিখিত বিজয়নগর কাহিনী পর্তুগীজ, ইতালিয় ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ণনারম্ভেই কণ্টি বলিয়াছেন:—'বিশাল বিজয়নগরের পরিধি ৬০ মাইল। নগর প্রাচীর সুদূরস্থিত পর্ব্বতমূল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় নগরের আয়তন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই নগরে অস্ত্রধারী পুরুষের সংখ্যা ৯০ সহস্র।'

'এ দেশবাসীরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীগণ স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়। এ দেশের নৃপতিই ভারতীয় সকল নৃপতি

অপেক্ষা শক্তিশালী। তাঁহার দ্বাদশ সহস্র * পত্নী আছে। রাজা যেখানেই গমন করেন তাঁহার ৪ সহস্র পত্নী পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করেন। ইঁহারা কেবল রন্ধনশালার কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। চারি সহস্র পত্নী সুন্দর বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে নৃপতির অনুগমন করিয়া থাকেন; অবশিষ্ট রমণীগণ শিবিকারোহণে গমনাগমন করেন।'

সেকালের নানাবিধ অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিকোলো হিন্দুদিগের নববর্ষ, দীপালী এবং দোললীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে কহিয়াছেন :—দাক্ষিণাত্যের যোদ্ধাগণ সমরক্ষেত্রে প্রস্তর গোলার ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা যে সকল অস্ত্রকে Bombardas বলি ইহারা নগর অবরোধ কালে সেরূপ অস্ত্রও ব্যবহার করে।

নিকোলোকণ্টির বিংশ বর্ষ পরে পারসিক অবদর্ রজাক বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত মাত্‌লাউস্‌সাদিন (Matla-u-s-Sadin) নামক গ্রন্থে সেই ভ্রমণ কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। †

তিনি লিখিয়াছেন :—

অকস্মাৎ একদিন বিজয়নগরে দূত সামুরী রাজের নিকট (কালিকটের নৃপতি) একখানি পত্র লইয়া আসিল। আমাকে বিজয়নগরে প্রেরণ করিবার জন্য সামুরী রাজের উপর আদেশ ছিল। সামুরীরাজ যদিও বিজয়নগরের অধীন ছিলেন না কিন্তু তথাপি তিনি বিজয়নগর নৃপতিকে অত্যন্ত সম্মান ও ভয় করিতেন। বিজয়নগর নৃপতির অধীনে তিন শত বন্দর আছে। তাহার প্রত্যেকটীই সম্পদে কালিকটের তুল্য। তাঁহার রাজ্য এতদূর বিস্তৃত যে একাদিক্রমে তিন মাস গমন না করিলে তাহার সীমন্তে উপনীত হওয়া যায় না।

বিজয়নগরের অধীন প্রত্যেক বন্দরই সমৃদ্ধিতে ও সৌভাগ্যে কালিকটের ন্যায় ছিল। ইহা হইতেই দেবরায়ের শাসন সময়ে হিন্দুর গৌরবভূমি, স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, আত্মত্যাগের পুণ্যতীর্থ বিজয়নগরের সমৃদ্ধি অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে কালের কালিকটের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া আবশ্যক। আবদর্ রজাক

* এই বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝা যায় ইহা অতিরঞ্জিত। নিকোলো রাজপুরীতে যে রমণীকেই দেখিয়াছেন তাহাকেই হয়ত রাজার পত্নী বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিবেন। আবদর্ রজাকের বর্ণিত কাহিনীতে এরূপ বর্ণনা নাই।

† কমাল্ উদ্দিন আবদর্ রজাক সমরকন্দ নিবাসী জলাল্ উদ্দিন ইসাখের পুত্র। ইনি ১৪১৩ খৃঃ অব্দে হিরাট নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সুলতান সারুখের বিচার সভায় ইমাম ও কাজির কার্য্য করিয়াছিলেন। সুলতান সারুখের শাসনাবসান কালে আবদর্ রজাক সুলতানের দূত স্বরূপ বিজয়নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কালিকট বন্দরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন চৌর্য্যভীতি নাই। নানা দিগ্দেশের বণিক বহুমূল্য পণ্য আনিয়া বিক্রয়ের জন্য কালিকটের রাজপথে এবং পণ্য বীথিকায় রাখিয়াই নিশ্চিন্ত মনে দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করিত। রাজকর্ম্মচারীগণ সেই সকল পণ্যসম্ভার রক্ষা করিতেন। রাজ নিযুক্ত প্রহরী দিবা রাত্র তথায় পাহারা দিত।

নিজেই বলিয়াছেন যে কালিকটের সামুরী রাজের শক্তি ও সমৃদ্ধির কথা শুনিয়াই পারস্যের মহিমান্বিত নৃপতি তাঁহার জন্য বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন।* শুধু ইহাই নহে, পারস্য সম্রাট বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জলও স্থলের রাজন্য বর্গ সামুরী রাজসভায় আপন আপন দূত প্রেরণ করিতেন—সামুরী রাজসভাই তাঁহাদের অবসরের চিন্তা ছিল।

হায়রে সে কাল!

হিন্দু নৃপতি দ্বিতীয় দেবরায়ের আদেশে আবদর্ রজাক কালিকট হইতে বিজয়নগর যাত্রা করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

'আমি কালিকট হইতে প্রথমে বন্দান বন্দরে ও শেষে তথা হইতে মালাবার উপকুলস্থিত মঙ্গলুর বন্দরে আসিয়া উপনীত হইলাম। মঙ্গলুর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। তথায় আমি দুই তিন দিন ছিলাম। মঙ্গলুর হইতে স্থলপথে আসিতে আসিতে এমন একটী সুন্দর মন্দির দেখিলাম যে তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মিলে না। মন্দিরটী গলিত পিত্তলে নির্ম্মিত। মন্দিরাধিকারী দেবমূর্ত্তি একটী পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্যের সমান। দেবদেহ সুবর্ণনির্ম্মিত—তাঁহার নয়ন মধ্যে রক্তবর্ণ মরকত জ্বলিতেছে। এই দেব মূর্ত্তিটীর গঠননৈপুণ্য শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ সূচিত করিতেছে।'

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে আবদর্ রজাক বেদলের † নগরে এত উচ্চ একটী মন্দির দেখিয়াছিলেন যে তাহার চূড়া বহু ক্রোশ দূর হইতেও পথিকের নয়ন গোচর হইত। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আবদর্ রজাক কহিয়াছেন—এই নগরের গৃহগুলি রাজপ্রাসাদ তুল্য। ইহার প্রকৃত বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তির জন্য দোষী হইব বলিয়া আশঙ্কা হয়। ‡

* His Majesty, the Khakan-I-Said had sent to the ruler of Kalikot horses and pelisses, robes of golden tissue, and caps, such as are presented at the festival of the New Year. The reason of this was that the ambassadors of that emperor, on their return from Bengal, had been forced to put in at Kalikot, and the report which they made of the greatness and power of His Majesty reached the ear of the ruler of that place. He learnt from trustworthy authorities that the Sultans of the 4th inhabited quarter of the globe, both of the east and of the west, of the land and of the sea, despatched embassies to that monarch, and regarded his court as the Kibla of their necessities, and the Kaba of their thoughts.—Elliot's History of India—vol iv, p 99.

† ইলিয়ট সাহেবের ইতিহাসে বিদ্নর ও সিউপ্রাস সাহেবের গ্রন্থে 'বেদুর' আছে। ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহা 'বেদলোর'।

‡ I arrived at the city of Bidner of which the houses were like palaces and its beauties like Houries ....It is impossible to describe it without fear of being charged with exaggeration.

—Matla' u-s Sa'din from Elliots' History of India vol iv, p. 101.

আবদর্ রজাকের বিজয়নগর কাহিনী পাঠ করিতে করিতে ইহাই মনে হয় যে তাঁহার মত পর্য্যটক এবং রাজদূতের হিন্দু-বিদ্বেষ একান্তই অশোভন ছিল। হিন্দুর দেবমন্দিরকে তিনি "ধর্ম্ম হীনের দেব-মন্দির" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 'পরমেশ্বর ইহাদের পূজা গ্রহণ করেন না।' * যাহা হউক, ধর্ম্মমতের আলোচনার জন্য আমি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করি নাই, ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ ও প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের গৌরব ঘোষণা করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছি। তবে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে সেকালের হিন্দুগণ কখনো এরূপ ভাবে মুসলমানের মসজেদের উপর কটাক্ষ করেন নাই। যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে দ্বিতীয় দেবরায় স্বরাজ্য মধ্যে মসজেদ নির্ম্মাণ করিতেন না এবং রাজ সিংহাসন সম্মুখে মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ রক্ষা করিতেন না।

আবদর্ রজাক যখন বিজয়নগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন তখন তাঁহাকে অভি-নন্দিত করিয়া বিজয়নগরে আনিবার জন্য সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি অগ্রসর হইল। আবদর্ রজাক হৃষ্টচিত্তে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বাস ভবন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, পারস্য রাজদূত তথায় গমন করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

দোসর।

(জাপানী গল্প)

(১)

এক বিজন বন। তার মাঝে একটি ভাঙা কুঁড়ে ছিল। সেই কুঁড়ের ভিতর এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা আর কমলকলির মত এক বালিকা থাকিত। কুঁড়ের সামনে এক ঝরণা, তারই পাড়ে তিনটি গাছ ছিল—দুইটি বুড়ো একটি চারা। বুড়োবুড়ীর দেহ যেমন শুষ্ক—বুকের কাছে প্রাণটুকু শুধু ধুক্ ধুক্ করিত, বুড়ো গাছ দুইটিরও ঠিক তেমনি অবস্থা। আর বালিকার অঙ্গে যেমন লাবণ্য ঝরিত, চারা গাছটিরও তেমনি সবুজ পাতায় সুন্দর ফুলে দেহ ভরা ছিল। বুড়ো গাছ দুটির মাথায় দুটি বুড়ো পাখী এবং চারাগাছটির ঝোপে একটি ছানা পাখী বাসা বাঁধিয়াছিল।

---

* In that temple, night and day, after prayers *unaccepted by God*, they sing &c...... In the opinion of those *irreligious* men, it is the *kaba* of the infidels.

—Matla'u-s Sadin Elliots' History of India, vol iv, p 105.

বর্ষাকাল—অন্ধকার রাত। ষোলো বছরের একটি ছেলে ঘোড়ার পিঠে সেই বনের মধ্য দিয়া যাইতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি;—ঘন ঘন বজ্রের হাঁকনি, বিদ্যুতের চম্‌কানি, যেন প্রলয় উপস্থিত!

ছেলেটির শরীর অবসন্ন। ঘোড়াটা নির্জ্জীব। অন্ধকারে পথ আর চেনা যায় না। সামনে ভাঙা কুঁড়ে খানি দেখিয়া ছেলেটি যেন বল পাইল। ঘোড়া হইতে নামিয়া কুঁড়ের দরজায় ঘা দিল।

বুড়ী আসিয়া দরজা খুলিল। ছেলেটির গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া বলিল—"আহা কার বাছা এই দুর্য্যোগে বনের মাঝে একা বেরিয়েছ!"

বুড়ীর মুখে আদরের কথা শুনিয়া, তাহার স্নেহ-মাখা হাত বুলানোতে ছেলেটির সকল কষ্ট যেন এক নিমেষে দূর হইল। আজ তাহার মনে অনেক-দিনের-পাওয়া মার স্নেহ হঠাৎ জাগিয়া উঠিল;—সে মা আজ কোথায়! ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ভাঙা কুঁড়ে। ঝর ঝর করিয়া জলে ঘরের চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে। ছেলেটির জন্য একটু শুক্‌নো জায়গা বুড়ী খুঁজিয়া পাইল না। ভিজে কাকের মত বুড়োবুড়ী দুজনে মুখোমুখী বসিয়া রাত কাটাইতেছিল। একটা কোণে একটু শুক্‌নো জায়গায় মেয়েটি ঘুমাইতেছিল। বুড়ী সেইখানে ছেলেটিকে বসিতে বলিল।

মেয়েটির শিয়রে মিট মিটে প্রদীপ। তারই আলোর একটু রেখা মেয়েটির চাঁদ মুখে পড়িয়াছে

বাহিরের অন্ধকার আকাশে যেমন বিদ্যুৎ, ছেলেটি দেখিল এই অন্ধকার কুঁড়ের ভিতরও তেমনি বিজলী খেলিতেছে। তার জ্যোৎস্নার মত গায়ের রঙে ঘর-আলো!

কড় কড় করিয়া বাজ পড়িল। তারই শব্দে চমকিয়া মেয়েটি জাগিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় ভাঙা চালের ছিদ্র দিয়া বিদ্যুতের একটু আলো ঘরে আসিয়া পড়িল;—সেই আলোটুকুতে চারি চক্ষে মিলন হইল!

(২)

বুড়োবুড়ীর আদরযত্নে, মেয়েটির মিষ্ট কথায় ছেলেটির সে রাত অতি আনন্দেই কাটিয়া গেল।

তাহারও এমনি এক বৃদ্ধ পিতা, এক বৃদ্ধা মাতা, একটি ছোট বোন ছিল। অনেক দিন তাহাদের স্নেহ হইতে সে বঞ্চিত। আজ হঠাৎ সেই স্নেহ পাইয়া তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে বাদলার হাওয়া, জলের ছিটা, অনাহার ও অনিদ্রাতেও সে একটা বিপুল আনন্দ পাইল।

পর দিন সকালে আকাশ পরিষ্কার;—সূর্য্যের সোণার কিরণে বন জাগিয়া উঠিয়াছে।

বালক বিদায় চাহিল;—কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। এই কুঁড়ের মধ্যে সে যে সুখ পাইয়াছে তাহার মত বাপ-মা-হারার ভাগ্যে তাহা কি আর কোথাও মিলিবে! তবু বিদায় চাই।

বিদায়ের পূর্ব্বে ছেলেটির মনে একটা ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। এই পরিবারটির দৈন্য সে কি কিছুমাত্র মোচন করিতে

পারে না? মোহরের থলি বাহির করিয়া সে বৃদ্ধার পায়ের তলায় ঢালিয়া দিল। বলিল—"মা, আমি তোমার ছেলে আমার প্রণামী লও।"

বৃদ্ধা ছেলেটির মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

মোহর গুলি ভিজামাটির কাদার মধ্য হইতে পূর্ব্বের চেয়ে চক্ চক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এই ভাঙা কুঁড়ের মাটিতেই যেন তাহাদের বেশি আনন্দ!

বৃদ্ধা মোহর গুলি না তুলিয়াই বলিল—"বাবা, তোমাদের কাছে ও গুলো অমূল্য, কিন্তু এই বনের মাঝে ওর আদর কেউ বোঝে না! পয়সায় এখানে কিছু মেলে না।"

এই কথা শুনিয়া বালকের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

বৃদ্ধা তাই দেখিয়া বলিল—"তুমি যদি সত্যই আমাদের উপকার করিতে চাও, তাহ'লে এক কাজ কর—এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও। বাছাকে আমরা ভালো করে খেতে পরতে, ভালো জায়গায় শুতে দিতে পারি না। আমাদের সকল কষ্ট স'য়ে গেছে; বাছার কষ্ট দেখে আমাদের বুক ফেটে যায়। মার আমার গায়ে একখানা গহনা নেই, পরবার একখানা শাড়ী নেই!"

"আমরা আর ক দিন? তার পর বাছার কি হ'বে? সে-ই আমাদের ভাবনা। তুমি যদি ওকে আদর যত্নে রাখো তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারি।"

বৃদ্ধার মুখে এমন কথা শুনিবে ছেলেটি স্বপ্নেও ভাবে নাই। আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিল।

মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠে বসাইয়া ছেলেটি যাত্রা করিল। বুড়ো ও বুড়ী যত দূর পারিল সঙ্গে সঙ্গে গেল। শেষে, ছেলে ও মেয়েটি সহরের দিকে এবং বুড়ো ও বুড়ী বনের দিকে চলিয়া গেল;—কেবল সেই জায়গায় চার জনের চার ফোঁটা চখের জল পড়িয়া রহিল।

(৩)

ছেলেটি নিজের বাড়ীতে মেয়েটিকে আদরযত্নে রাখিয়া দিল। সোণাদানায় তাহার অঙ্গ মুড়িয়া দিল। কিন্তু বনের পাখী খাঁচায় আসিয়া যেমন ছট্ ফট্ করে মেয়েটিরও ঠিক সেই অবস্থা হইল। সোণার কাঁকন, জরীর শাড়ী তাহার অঙ্গে বিঁধিতে লাগিল। বনে বনে কাঠ কুড়ানো, হরিণ শিশুর সহিত খেলা, ঝরণার গান, পাখীর মুখে গল্প—এই সব পুরানো কথা মনে করিয়া দিনের মধ্যে সহস্র বার সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিত!

বালিকা দিন দিন ফুলের মত শুকাইতে লাগিল।

বনের মাঝে কুঁড়ের সামনে চারা গাছটিরও পাতা ঝরিতে লাগিল।

বুড়োবুড়ীর দ্বারে মৃত্যুর দূত আসিয়াছে,—গাছ দুটিও ধরাশায়ী হইবার জন্য শুধু অপেক্ষা করিতেছে।

* * * *

আর এক দিন ঘোর বর্ষা। মেয়েটি রুগ্ন শয্যায়। ছেলেটি পাশে বসিয়া। ঘরে মিট মিট করিয়া দীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু তার আলো আজ আর মেয়েটির মুখে পড়ে নাই;—কেমন-এক-রাশ অন্ধকার সেই মুখের উপর খেলা করিতেছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস জানালা ভেদ করিয়া ঘরে আসিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল! ঘর অন্ধকার হইল! আজও বাহিরের আকাশে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, কিন্তু ঘরে তার আলো পড়িতেছে না—ঘর আঁধার।

ছেলেটি আবার প্রদীপ জ্বালিল, কিন্তু মেয়েটির আয়ুর প্রদীপ কই আর জ্বলিয়া উঠিল না!

সেই রাত্রেই ছেলেটি সন্ন্যাসীর বেশে গৃহ ত্যাগ করিল। সেই বনের মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

তখনও বৃষ্টি ঝরিতেছে—তখনও বিজলী খেলিতেছে। হঠাৎ একবার বিদ্যুতের আলোয় ছেলেটি দেখিল, ভাঙা কুঁড়েটিকে বুকে করিয়া বুড়ো গাছ দুটি মাটিতে পড়িয়া আছে—চারা গাছটি তাদের চাপে দলিত! বাতাস হায় হায় করিতেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মরণোন্মুখ জাতি।

(সমালোচনা।)

ডাক্তার লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ইউ, এন্, মুখার্জ্জি সম্প্রতি একখানি প্রায় একশত পৃষ্ঠার, ক্ষুদ্র পুস্তক ইংরাজিতে প্রকাশিত করিয়াছেন; নাম দিয়াছেন,—"A Dying Race" ভাব হইতেছে, এই বাঙ্গালার হিন্দু জাতি মরণোন্মুখ জাতি, ইহারা মরিতে বসিয়াছে। গ্রন্থকারের শেষ কথা কয়টি আমরা অগ্রে উদ্ধৃত করিব।

"The Mahomedans have a future and they believe in it—we Hindus have no conception of it. Time is with them—time is against us. At the end of the year they count their gains, we calculate our losses. They are growing in number, growing in strength, growing in wealth, growing in solidarity, we are crumbling to pieces. They look forward to a united Mahomedan world—we are waiting for our extinction.

The wages of sin is death. We Hindus have sinned deeply, damnably against the laws of God and nature, and we are paying the penalty."

ভাব এই,—(বাংলার) মুসলমানদের সকল রূপ উন্নতি হইতেছে; আমরা মরিতে বসিয়াছি; পাপে মৃত্যু নিশ্চিত; আমরা-হিন্দুরা মহাপাপে পাপী; ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা মহাপাপ করিতেছি; সেই পাপের ফলে এখন আমাদের মরণ নিশ্চয়।

এ সকল কথায় কাহারও বিরোধ হইতে পারে না। আমাদের ত নয়ই। অধর্ম্মে হিন্দুর অধঃপতন—ওকথা মিছা করিয়া বলিলেও আমরা কৃতার্থ হই। গ্রন্থকার যে ভাবে অধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা যদিও সে ভাবে বলি না, কিন্তু অধর্ম্মে হিন্দুর অধঃপতন এ কথাটা ঠিক। সাধারণ ভাবে বুঝিলে, মুসলমান আমাদের অপেক্ষা স্বধর্ম্মপরায়ণ। কাবুলের আমীর হইতে সামান্য

মাটী কাটা কুলি পর্য্যন্ত, যে অবস্থারই মুসলমান হউক, নেমাজের সময় হইলে নেমাজ করিবেই, তা যেথানেই যে ভাবেই থাকুক; আর আমাদের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী অপ্পরাহ্ণে সভায় গিয়া, রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সভায় অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিবেন,—ইচ্ছায় সায়ং সন্ধ্যা বন্ধ করিয়া। মুসলমান আপনার ধর্ম্ম, আপনার আচার রক্ষা করিতে জানেন, সে মুসলমানের উন্নতিতে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেরই মর্যাদা রক্ষা হইতেছে; আমাদের অনাচারী সম্প্রদায় এ সকল দেখিয়াও শিখিতে পারেন।

কিন্তু আর একটা কথা বুঝিবার ও বুঝাইবারও জন্য আমরা এই কথা তুলিয়াছি একটু পিছাইয়া না গেলে, সে কথা ফুটিবে না।

স্বদেশীরা সাধারণত বলেন, আমরা দেশের লোকের (ঐহিক) উন্নতির চেষ্টা করিব, কাহার কি ধর্ম্ম সে কথা ভাবিব না, ধর্ম্মের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। সুরেন্দ্র বাবুর 'বেঙ্গলি' পত্রে ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা ছিল, এখনও মধ্যে মধ্যে থাকে; যে আমরা হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া আহার বিহার করিব; করিলে স্বদেশীর বাঁধন দৃঢ়তর হইবে। ইহাতে যদি কাহারও ধর্ম্মে বাধে, তবে সেই ধর্ম্ম দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, করিয়া স্বদেশী দৃঢ়তর করিতে হইবে।

আমাদের গ্রন্থকার এক জন বিলাত হইতে পাশ করা বড় ডাক্তার, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল। এই পুস্তিকা প্রবন্ধাকারে বেঙ্গলি পত্রেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলায় হিন্দু মুসলমানকে যে তিনি পৃথক্ চক্ষে দেখিবেন, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থের আগাগোড়াই কেবল হিন্দু মুসলমানে তুলনা, মুসলমানের উত্থানের ও হিন্দুর অধঃপতনের বার্ত্তা। তিনি জলের মত অতি প্রাঞ্জল ইংরাজিতে, নানা ভাবে সরকারি নানা বিবরণী হইতে, নানা ইতিহাস হইতে সংকলন করিয়া অতি দক্ষতা সহকারে এই বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছেন। ইংরাজি নবীশ বাঙালী যদি এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমাদের শুভ গ্রহের উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। দেশের জল ভালরূপ নিকাশী হয় না বলিয়া আমরা ছয় মাস কাল ভিজা মাটীতে বাস করিতে বাধ্য হই; নদী, খাল, পুষ্করিণী, কূপ কাটান হয় না বলিয়া, আমরা স্নান পানের জল ভাল পাই না, আমাদের আলস্যে বাস্তুদেশে জঙ্গল বাড়িয়াছে বলিয়া, আমরা প্রচুর রৌদ্রতেজ পাই না, বায়ু চলাচল ভাল হয় না, বাঙ্গালার আকাশ পর্য্যন্ত দূষিত বিষে পরিপূরিত হইয়া উঠে; তাহার উপর পুরাপেট আহার আমরা কেহই পাই না, কাজেই আমরা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি। এ সকল কথা যদি ইংরাজি নবীশ বাঙালী বুকের ভিতর বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে এই সকল রাজনীতির আন্দোলনের দায় হইতে আমরাও রক্ষা পাই; আর আমাদিগকে অন্য দিকে নিবিষ্টমনা দেখিলে সরকার বাহাদুরও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বাংলার হিন্দু বাঙালীকে মরণের দিকে অগ্রসর বুঝিয়া কি স্বদেশী কি স্বধর্ম্মী কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্বদেশী যে

মনে করিবেন, বেশ ত মুসলমানের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতেই আমাদের লাভ, তা কেহ মনে করিতে পারেন না; এই গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। মানব ঘোরতর স্বদেশী হইলেও যে স্বধর্ম্মীর দিকে এক একটু টান থাকে, তাহা দেখা যাইতেছে।

তবে প্রকৃত বিশ্বাসী হিন্দু একরূপ মনে করিতে পারেন বটে যে, আমরা সংখ্যায় কমিতেছি, তাহাতে কি হইল? আমরা পুরাণে শুনিয়াছি দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতি কয়জন প্রজাপতি হইতেই এই বিশ্বসংসারের মানব সৃষ্টি। ইতিহাসে দেখিতেছি, বড় জোর হয়ত ৮।৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতেই এই কুলীন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী বাঙ্গালা ছাইয়া রহিয়াছেন। কাব্যে শুনিয়াছি, যখন ব্রাহ্মণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, 'তখন তাঁহারা ক'জন ছিল?' অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যায় তাঁহারা নাকি ভারতে আসিয়াছিলেন। বায়রণ, তাঁহার কাব্যের উদ্দীপনার ভাষায় লিখিয়াছিলেন।

"Of the three hundred, grant but three
To make another Thermopolæ."

সুতরাং সংখ্যায় কমিলে আমাদের ভয় কি? সমগ্র জগতে এক লক্ষের কিছু বেশী পার্সী আছেন; সমগ্র ভারতে ৭৫ হাজার; বোম্বাই প্রদেশে ৫৫ হাজার, কিন্তু তাহারা কেমন প্রবল জাতি। সার জেম্‌সেটজি জিজিভাই, রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ, টাটা প্রভৃতি মহাত্মাগণের দাতৃত্ব গুণে এই মুষ্টিমেয় জাতি কেমন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের কথা অতি বিশদ ইংরাজীতে প্রসিদ্ধ লেখক রস্কিন বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে আত্মরক্ষার (আমরা বলি ধর্ম্মরক্ষার) ক্ষমতা কখনই সংখ্যার উপর নির্ভর করিতে পারে না। সংখ্যায় হয় না, একতায় হয়; এবং সে একতা ধর্ম্মবন্ধনের একতা হওয়া চাই। অধর্ম্মের একতায় কোন কাজই হয় না। রস্কিন লিখিতেছেন,—

"And then, observe further, this true power the power of saving, depends neither on multitude of men, nor on extent of territory. We are continually assuming that nations become strong according to their numbers. They indeed become so if those numbers can be made of one mind; but how are you sure you can stay them in one mind, and keep them from having north and south minds? Grant them unanimous, how know you they will be unanimous in right? If they are unanimous in wrong, the more they are, essentially the weaker they are. Or, suppose that they can neither be of one mind, nor of two minds but can only be of *no* mind? Suppose they are a mere helpless mob; tottering into precipitant catastrophe, like a waggon load of stone when the wheel comes off. Dangerous enough for their neighbours, certainly, but not 'powerful.'"

মানুষের মত মানুষ দশজন থাকিলে যাহা হয়, আমাদের মত শত সহস্র অকর্ম্মণ্য লোক থাকিলে, তাহার শতাংশ হয় না। তবে কিনা আমাদের দেশে ধর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্য গঠনের শক্তি অন্য কোন পদার্থের নাই। নাই বলিয়াই এত কথা কহিতে হইতেছে। আমাদের মত অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা কমিলে ক্ষতি ত নাইই, বোধ করি লাভ আছে। প্রকৃত হিন্দু কখন মরিবে না; তাহাদের ধর্ম্ম সনাতন, সমাজ সনাতন, সেই ধর্ম্মে সেই সমাজে থাকিয়া মানিলে জাতিও অমর।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দিনান্তে।

মিশ্র পূরবী। ঠুংরি।

আর, নাইরে বেলা, নাম্‌ল ছায়া
ধরণীতে।
এখন চল্‌ রে ঘাটে, কলস খানি
ভ'রে নিতে॥
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে
সেই ধ্বনিতে।
নাইরে বেলা নাম্‌ল ছায়া
ধরণীতে॥
এখন বিজন পথে করেনা কেউ
আসা-যাওয়া।
ওরে প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ,
উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফির্‌ব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
নাইরে বেলা, নাম্‌ল ছায়া
ধরণীতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীলকণ্ঠ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাল শেষ রাত্রি হইতে মন্মথের শরীরটা যেন কেমন ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি আজ অন্তঃপুর ত্যাগ করেন নাই। জননীর আদেশে, বালিকা পত্নী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা সরলা, পাশে বসিয়া মন্মথের সেবা করিতেছে।

বাঙলা দেশের কোন কোন প্রদেশে এখনও, প্রবীণা গৃহিণী বর্ত্তমানে, স্বামীর সহিত দিবসে বধূর সম্বন্ধ অন্যরূপ। সে অঞ্চলে কেবল গভীর নিশীথেই দম্পতি স্বামী আর স্ত্রী। কিন্তু আজ প্রাতে গৃহিণী গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গেলেন "বউমা" তুমি মন্মথের নিকট একটু ব'স, আমি গঙ্গাস্নানটা সেরে' আসি। গঙ্গা তাঁদের গৃহ হইতে প্রায় এক ক্রোশ-ব্যবধান। গৃহিণী প্রত্যহ পাল্কীযোগে স্নান করিতে যাইতেন, গঙ্গাতীরে স্নান আহ্নিকে তাঁহার দুটা ঘন্টা কাটিত।

আজ এই দীর্ঘ সময় সরলা দিবসে স্বামীর নিকট বসিয়া আছে! আগেকার কথা ছাড়িয়া দাও, মন্মথ তখন প্রায়ই কলিকাতায় পড়া শুনা করিতেন, ন'মাসে, ছ'মাসে পত্নীর সহিত গভীর নিশীথে দেখা সাক্ষাৎ হইত মাত্র। সরলা তখন নিতান্ত বালিকা ছিল, লজ্জায় স্বামীর সহিত, ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিত না। তা ছাড়া, প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত, তাহার পর শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে, একটী বৎসর তীর্থে তীর্থে কালা-শৌচে কাটিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসর স্বামীর সহিত সরলার দুই একটা কথাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তবু এই একটী বৎসর স্বামীর সর্ব্বদা চোখে চোখে ছিলেন, সরলারও ক্রমে বয়স হইতেছিল! স্বামী সম্ভাষণ তাঁহার ভাগ্যে না ঘটিলেও দিনে দিনে অজ্ঞাতে তাঁহার প্রেম মুকুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে সকলে বল্লভপুরে ফিরিলেন, বল্লভপুরে আসিয়া সরলার বল্লভ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে সব পুরাতন কথা আর এখন তুলিবার প্রয়োজন নাই।

আজ সরলা দিবসে এই প্রথম এত দীর্ঘ কাল স্বামীকে কাছে পাইয়াছে, আজ স্বামীর শরীর ভাবান্তর হওয়ায় সরলা উদ্বিগ্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তবু আজ "বড় দুঃখে সুখ।"

সরলার এমন সৌভাগ্য আর কোন দিন হয় নাই, তার এই নূতন যৌবন, নূতন আশা, নূতন প্রেম, কিন্তু এই অঙ্কুরেই সরলা বড় দাগা পাইয়াছে। মন্মথের ও ষোড়শীর কথা রূপান্তর হইয়া তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছে। সরলা তবু এক দিনের জন্য স্বামীকে অনুযোগ করে নাই, এক দিনের জন্যও সে নিজের দুঃখ মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলে নাই, সে শুধু ভাবিত "আমি বুঝি তাঁর যোগ্য নহি, কিন্তু ইচ্ছা করিলে তিনিত আমার চেয়ে সুন্দরী গুণবতী দাসী গ্রহণ করিতে পারেন, তবে তা না করিয়া এ কলঙ্ক কিনিতেছেন কেন? লোকে কত বলে, কত নিন্দা করে সে সব কি সহা যায়!" সরলা স্বামীকে মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু তার বুকে দিবা রাত্রি রাবণের চিতা জ্বলিত, তাই দিনে দিনে সে সোনার কমল শুকাইয়া উঠিতেছিল! মাতৃসমা-স্নেহ-শালিনী শাশুড়ী, বধূর এ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কলঙ্ক কথায় তাঁর বিশ্বাস হয় নাই,—তাহা হইলে তিনি বধূর এই "দারুণ শেল" দূর করিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিতেন। সরলা স্বামীকে বেশী কথা বা নিজের কথা বলিতে

পারিত না বটে কিন্তু তবু মাঝে মাঝে সময় বুঝিয়া অতি-বিনীত ভাবে বলিত "যাহাতে লোকে নিন্দা করে তা করা কি ভাল?" কিন্তু তখন যে 'চোরে না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!'

কিন্তু কথা হইতেছিল—আজ সরলা জীবনে স্বামীকে এই প্রথম এত দীর্ঘ কাল নিকটে পাইয়াছে, মন্মথ আপনার উত্তমাঙ্গ, সরলার উৎসঙ্গে স্থাপিত করিয়া কত কথা কহিতেছেন, সরলা স্বামীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে উত্তর দিতেছে। তাইত, সরলার কথাত বড় মধুর! মন্মথ তাহাকে যতটা "সেকেলে" ভাবিতেন, সেত ঠিক তেমনটী নয়, এওত কথা জানে, রসিকতা বুঝে, ফল্গু নদীর মত ইহারও অন্তরে অন্তরে ত রসের প্রবাহ বহে। তবু সরলার সহিত কথা কহিতে কহিতে মন্মথ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছিলেন—না জানি কাল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না যাওয়ায় ষোড়শী কি মনে করিতেছে! ষোড়শী—আবার ষোড়শী? মন্মথ তখন চিন্তা রশ্মি সম্বরণ করিয়া উদ্দাম মন-অশ্বের বেগ ফিরাইলেন।

আর মুগ্ধা সরলা, সে তখন জীবনে এই প্রথম স্বামীর আদর পাইয়া মনে মনে স্বর্গ সুখের কল্পনা করিতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নীলকণ্ঠ—আকণ্ঠ নৈশভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে ছেঁচা চর্ব্বন এবং তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে পদতলে আসীনা পত্নীর সহিত আজ অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর মিলনানন্দে গল্প করিতেছিলেন, আর ষোড়শী কোমল করকমলে স্বামীর শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথিত চরণ দুটির সেবা করিতে করিতে সে গল্প শুনিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা প্রশ্নও করিতেছিল। আজ এই সেবাসুখে নীলকণ্ঠ বিশেষ আরাম উপভোগ করিয়াও "থাক্, থাক্" করিয়া মধ্যে মধ্যে ষোড়শীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। তবে সে চেষ্টায় অবশ্য তেমন আগ্রহ ছিল না। স্বামীর এ প্রকার আজ্ঞা অবহেলা অপরাধে ষোড়শী মাঝে মাঝে অপরাধী হইয়া থাকে। সে জন্য প্রতিবেশিনী মহলে শ্লেষের তরঙ্গও যে এক আধটু না উঠে এমন বলিতে পারি না।

* * *

"আর না" অনেক রাত হয়েছে, বলিতে বলিতে নীলকণ্ঠ সত্যই উঠিয়া বসিলেন, সে নিষেধে এবার আন্তরিকতা ছিল, কারণ ষোড়শী যে এখনও আহার করে নাই; এ কথাটা ত এতক্ষণ মনে পড়ে নাই!

ষোড়শী আহার করিতে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আহারে অনিচ্ছা জানাইল।

নীলকণ্ঠের আগমনের আহ্লাদে বুঝি ষোড়শী ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছে! "না, না তাকি হয়, খাবে বই কি" বলিয়া নীলকণ্ঠ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—ষোড়শী তখন তাহার অবেলায় আহারের জন্য ক্ষুধার অভাব জানাইল।—একথায় বৃদ্ধের কল্পনার একটা সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল না ত?

নীলকণ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্য একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।

"তা অবেলায় খেলে কেন?"

"আজ যে বাবার স্বর্গারোহণের তিথি! তাই ব্রাহ্মণভোজন ছিল।"

"ও হো, তাইত বটে, আমার মনে ছিল না, তাই—আমাকেও বুঝি সেই দলে ফেলিয়াছিলে—আচ্ছা ব্রাহ্মণভোজন ত করালে, এবার ভোজন দক্ষিণা—

অপ্রতিভ হইয়া ষোড়শী ব্রীড়ানত মুখ খানি সরাইয়া লইল—বলিল,

"তোমার আসার কথাত আমি জানিতাম না।" "অনুমানে বুঝে ছিলে বুঝি"—

"না, তাও নয়"

"তবে"—নীলকণ্ঠের যেন ভাবান্তর হইল—"তবে আসন বিছাইয়া আহারের যে উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলে" বৃদ্ধের কণ্ঠ কি সহসা ধরিয়া গেল" স্বরটাও যেন কাঁপিয়া উঠিল!

ষোড়শী তাহা লক্ষ্য করিল,—তাহার মুখে বিষাদের হাসি আসিল—কিন্তু সে হাসি ফুটিবার পূর্ব্বেই যেন টুটিয়া গেল—ষোড়শী অবিচলিত ভাবে বলিল—

"সাধারণ ব্রাহ্মণের সহিত আহারে অসুবিধা হইবে বলিয়া মন্মথকে সন্ধ্যার পরে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, দুর্য্যোগের জন্য মন্মথ আসিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে শুইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময় তুমি এলে"।

তবে ত, ষোড়শী নীলকণ্ঠের আগমন অনুমানে আহার্য্য প্রস্তুত রাখে নাই—বৃদ্ধের আর একটি প্রফুল্ল-কল্পনা-কুসুম কি ঝরিয়া পড়িল!

বটে—বড় অন্যায় হয়েচে ত! আগে আমায় কেন বল্লে না, আমি মন্মথ ভায়াকে ডেকে খাওয়াতেম!

নীলকণ্ঠের এই "বড় অন্যায় হয়েছে ত" কথাটা ষোড়শীর প্রাণে সহসা বিঁধিল—ষোড়শী মনে করিল তার "এমন সময় তুমি এলে," এই কথায়—বুঝি নীলকণ্ঠ "বড় অন্যায় হয়েছে ত" বলিলেন! কিন্তু ষোড়শী শীঘ্রই বুঝিলেন, সে সন্দেহ অমূলক। কাহার জন্য সেই আহার্য্য ছিল, তাহার খোঁজ খবর না লইয়াই আহার করায় বরং স্বামীকে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত—এমন কি সেই রাত্রিতেই তাঁকে মন্মথের সংবাদ লইবার জন্য যাইতে প্রস্তুত বুঝিয়া, ষোড়শী,—"সেই দুর্য্যোগে মন্মথ নিশ্চয়ই বাটীতে আহার করিয়াছেন সুতরাং সে জন্য কুণ্ঠার কোন' কারণ নাই এবং কাল প্রাতে খোঁজ লইলেই হইবে„ ইত্যাদি বলিয়া বৃদ্ধের অস্বস্তি দূর করিলেন।

এতক্ষণে নীলকণ্ঠের সেই স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি আবার রহস্যালাপ আরম্ভ করিলেন! বলিলেন "আজত তা'হলে নাতিকে বড় ফাঁকি দিয়েছি„---

ষোড়শীর ভাবান্তর হইল, স্বামীকে কি একটা বলিবার জন্য তার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু বলি বলি করিয়া সে কথা আর বলা হইল না।

অন্য মনস্ক ভাবে নীলকণ্ঠ আবার পা ছড়াইয়া, অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় ছিলেন, ষোড়শী ও অভ্যাস বশতঃ তাঁর চরণ সেবা করিতেছিল, সহসা ষোড়শীর নয়নপ্রান্তে

অশ্রু দেখা দিল। এ কি, নীলকণ্ঠের চরণে এ তপ্ত বারিবিন্দু কোথা হইতে পড়িল,—বিন্দু, বিন্দু, বিন্দুর পর বিন্দু, তবে কি ষোড়শী কাঁদিতেছে? কেন? ওঃ আজ যে তার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের দিন! এ অশ্রু বুঝি তাঁরই স্মৃতির উপাসনার, ইহা বুঝিয়া নীলকণ্ঠ পত্নীকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে অশ্রু বাধা মানিল না। নীলকণ্ঠের আদরে, সোহাগে, স্নেহে, ষোড়শী আরও অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল,—নীলকণ্ঠ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও পত্নীর সন্নিকটে সরিয়া গেলেন, অনুতপ্তা ষোড়শী তখন তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিল!

ক্রমশঃ

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

হে কৃষ্ণ, হে জনার্দ্দন, প্রাণসখা, হৃদয়বিহারী।
তব পদ-অরবিন্দ বন্দি আমি, রাত্রি আর দিবা,
জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে উঠে তাই মোর কাঙাল প্রতিভা
জ্যাতির্ম্ময়! তোমার জ্যোতির স্পর্শে, চৌদিকে প্রসারি
অপূর্ব্ব লাবণ্য-শিখা!—স্বর্ণকান্ত, রবিকরহারী,
হাসে যথা, উগারিয়া দীপ-শিখা, অপরূপ বিভা!
কুরূপা শ্যামাঙ্গী আহা, মরি মরি, গৌরাঙ্গিনী-নিভা
হয় যথা, হাসে যবে সুহাসিনী, পতিরে নেহারি!
আমারে কটাক্ষ করি', কহে কোনো রসিক ধীমান,
রঙ্গভরে, ব্যঙ্গস্বরে, সম্বাদরে পাইতে “বাহবা”;—
“তোমার প্রতিভা এবে কৃষ্ণপ্রাপ্ত। হে কবি-প্রধান!”
সে কৌতুকে মহাহর্ষে হেসে উঠে হৃদিহীন সভা!
উহারা হাসুক উচ্চে,—চন্দ্রোদয়ে শ্যামাঙ্গী নিশার
বাড়ে রূপ; কৃষ্ণপ্রাপ্ত হোক্ নিত্য প্রতিভা আমার!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

দুর্গোৎসব।

সম্বৎসর পরে বঙ্গে আবার দুর্গোৎসব। দৈন্যক্লিষ্ট বঙ্গবাসীর প্রাণে আনন্দের মন্দাকিনী ধারা ছুটিয়াছে। বাঙ্গালার স্থল, জল, গগন, পবন পূত, পরিস্কৃত করিয়া প্রকৃতি পরমেশ্বরীর আবাহন করিতেছেন। কয় দিনের জন্য রোগ, শোক, তাপ পলায়ন করিয়াছে; দৈন্য, আলস্য, অবসাদ দূরীভূত হইয়াছে। আজ বঙ্গের প্রতি গৃহ দীপাবলীতেজে সমুজ্জ্বল নাট্যশালাসম প্রতিভাত হইতেছে। শরচ্চন্দ্রমরীচিগৌরা কুমুদকমলশেফালিকাময়ী বঙ্গভূমি জগজ্জননীর চরণরেণুস্পর্শে ধন্যা ও বরেণ্যা।

যত দিন হিন্দুজাতি, যতদিন হিন্দু সভ্যতা, ততদিন দেবী শ্রীদুর্গার উপাসনা; যত দিন বেদ-পুরাণ, যত দিন স্মৃতি-ইতিহাস, যত দিন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি, তত দিন পূর্ণব্রহ্মময়ীর পূজা; যত দিন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, যত দিন বাসনা ও বৈরাগ্যের সংগ্রাম, যত দিন জন্ম ও কর্ম্মপরম্পরার স্রোত, তত দিন হিন্দুর দুর্গোৎসব। এ উৎসব শুধু বাঙ্গালীর নয়, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া ইহার অনুষ্ঠান। বঙ্গে দুর্গোৎসব, অন্যত্র দশেরা; জননী কোথাও মৃন্ময়ী, কোথাও ঘটপটময়ী।

হিন্দুধর্ম্ম বেদমূলক। হিন্দুর পূজা-ব্রত, অনুষ্ঠান—উপাসনা, সমস্তই বেদ সম্মত। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে আদৌ বেদকে মান্য করিয়া চলিতে হয়। নিরুক্ত এবং উহার পরিশিষ্ট ও ব্যাখ্যা স্বরূপ স্মৃতি ও পুরাণ, সর্ব্বত্রই ভগবতী দুর্গার তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবীর যে কল্পনা বেদে অঙ্কুরিত, পুরাণ তন্ত্রে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই দুর্গাগায়ত্রী আছে; "কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নোদুর্গি প্রচোদয়াৎ।" সায়নাচার্য্য ইহার টীকায় লিখিয়াছেন "পশ্চাদ্দুর্গাগায়ত্রী। হেম প্রখ্যামিন্দুখণ্ডাঙ্কমৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে কাত্যায়নায় ইতি"। অর্থাৎ সুবর্ণোজ্জ্বল, অর্দ্ধেন্দুশেখরা তন্ত্রোক্তমূর্ত্তিধারিণী কাত্যায়নী দুর্গাকে প্রার্থনা করিতেছে। কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার এইরূপ বিবরণ আছে। "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্" ব্রহ্ম বহু শোভমানা হৈমবতী উমারূপ ধরিয়া সেই আকাশ পথে আগমন করিলেন। অতএব,

ভগবতী দুর্গা যে বেদ-প্রমাণিতা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের নিমিত্ত অকালে দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামায়ণে ইহার প্রমাণ নাই। তবে এই প্রবাদবাক্যের মূল কোথায়? কালিকাপুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥"
(ষষ্টিতম অধ্যায়, ২৬শ শ্লোক)

ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া রাবণ বধের নিমিত্ত অকালে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন। শরৎকাল দক্ষিণায়ন হেতু দেবগণের রাত্রিকাল, এই জন্য অকাল বলা হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী অংশের মর্ম্ম এই;—ভগবতী প্রবোধিতা হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তার পর সপ্তাহ কাল রাম-রাবণের যুদ্ধের পর রাবণ নিহত হয়। দেবতারা সেই সপ্তরাত্রি দেবীর পূজা করেন। তাঁহারা নবমীতে ভগবতীর বিশেষ পূজা এবং শ্রবণাযুক্ত দশমীতে বিসর্জ্জন করেন। দেবী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ত্রেতাযুগে দশভুজারূপে আবির্ভূতা হন। প্রতিকল্পেই রাম ও রাবণের উৎপত্তি হয় এবং প্রতি কল্পেই দেবী দৈত্যনাশ করিয়া থাকেন। এখানে রামচন্দ্রের পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। শুনিয়াছি মহাভাগবতে শ্রীরামচন্দ্রের পূজার একটী আখ্যান আছে। রামচন্দ্র এক শত আটটি পদ্ম লইয়া দেবীর পূজায় বসিয়াছিলেন। ভগবতী তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। লুপ্ত পদ্মের অভাবে ভক্ত স্বীয় নয়ন উৎপাটিত করিয়া দেবীচরণে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হন। তখন ভগবতী দর্শন দিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যাহা হউক যখন মহর্ষি বাল্মীকির বীণা এ সম্বন্ধে নীরব, তখন আমরা উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, কালিকাপুরাণের উপরিউদ্ধৃত শ্লোকই রূপান্তরিত হইয়া প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। *

রামায়ণে শ্রীদুর্গাপূজার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু মহাভারতে এ সম্বন্ধে দিক্-নিদর্শনের অভাব নাই। বাস্তবিক, 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। মহাভারতে শ্রীদুর্গার স্তব আছে। পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের জন্য বিরাট নগরে প্রবেশ করিলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত একটি দুর্গা-স্তব পাঠ করেন। পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের মুখনিঃসৃত সেই সমগ্র দুর্গাস্তব, পাঠকের অবগতির জন্য এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে (১)* কুমারি ব্রহ্মচারিণি
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে॥
(২)* চতুর্ভুজে (৩)* চতুর্বক্ত্রে, পীনশ্রোণিপয়োধরে।

* কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গোৎসবের বর্ণনা আছে। উপরি উদ্ধৃত কালিকাপুরাণের শ্লোকাবলম্বনে যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, পরন্তু তাঁহার দুর্গোৎসব আখ্যানের উপর কখন জন জন সাধারণের বিশ্বাস স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়।

*(১) কৃষ্ণ স্বরূপা।
(২,৩) ষড়াবিন্দুরূপা।

ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি।
ভাসি দেবী যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহা॥
স্বরূপং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বিশদং তব খেচরি।
কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা শঙ্কর্ষণসমাননা॥
বিভ্রতী বিপুলৌ বাহূ শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘণ্টী স্ত্রী বিশুদ্ধা চ যা ভুবি॥
পাশং ধনুর্ম্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ। ৪*
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূষিতা॥
চন্দ্রবিস্পর্দ্ধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা॥
ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা।
বিভ্রাজসে চাবদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ॥
ধ্বজেন শিখিপুচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া।
তেন ত্বং স্তূয়সে দেবি ত্রিদশৈঃ পূজ্য-
সেঽপি চ॥
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব॥
জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্॥
বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।
কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে॥
কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদে কামচারিণি।
ভারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ
প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে তু নরা ভুবি।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতো-
ঽপি বা॥
দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে॥
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ॥
যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।
ত্বং কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ধৃতিঃ সিদ্ধি হ্রীর্বিদ্যাসন্ততি-
র্মতিঃ॥
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ
ক্ষমা দয়া।
নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্।
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞ্চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি॥
সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্ন-
বান্।
প্রণতশ্চ যথা মূর্দ্ধা তব দেবি সুরেশ্বরি॥
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ।
শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে॥†

এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ ভারতবর্ষে ভগবতী দুর্গার পূজা হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে ইতিহাস আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে দেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি করিয়া পূজা করেন। যদিও কেহ পুরাণের কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা দিতে ইতস্ততঃ করেন, বেদ উপনিষদের উক্তি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমরা দেবীর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকি। শ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুরবধের এরূপ বিবরণ আছে ;—

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য আরূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥
ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ॥

(৪) অষ্টভুজে অষ্টপ্রহরণ।

† এই স্তব সকল মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। এক খানি [illegible] হইতে ইহা [illegible]

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ॥

দেবী সেই অসুরের উপর আরোহণ করিলেন, এবং চরণে তদীয় কণ্ঠ নিপীড়িত করিয়া শূল দ্বারা আহত করিলেন। তাহাতে অসুরের অর্দ্ধ শরীর মুখ হইতে নির্গত হইল এবং অসুর ভগবতীর তেজে স্তব্ধ হইল। অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী বৃহৎ খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। এখানে যে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল মাত্র ভগবতী ও অসুর বর্ত্তমান। পুরাণে দেবীর দশভুজা, ষোড়শভুজা ও সহস্রভুজা মূর্ত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। যে কারণে হউক, আমরা দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কার্ত্তিকেয়, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইঁহাদিগকে কোথায় পাইলাম? দেবীর যে ধ্যান প্রচলিত আছে, তাহাতে ইঁহাদিগের উল্লেখ নাই। ধ্যানে সিংহ ও নাগপাশ আছে।

"বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি ভীষণাননম্॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥

দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর সিংহবাহনের কথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিমাতে সিংহ নাগপাশে বেষ্টিত, ইহা কোথা হইতে আসিল, জানি না। যাহা হউক, ধ্যানে খড়্গ, চক্র প্রভৃতি প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাম মাত্রও নাই। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাই নাই। তাঁহারা ইহার সমর্থনের জন্য কালীবিলাস তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

বামে চ কার্ত্তিকং দেবং দক্ষিণে গণপতিং তথা॥

অর্থাৎ দেবীর বাম দিকে কার্ত্তিক এবং দক্ষিণ দিকে গণেশ, এবং—

যা নিত্যা প্রকৃতিলক্ষ্মী দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।
সারদা সরস্বতী নিত্যা বামভাগে সদা স্থিতা।

দেবীর দক্ষিণে লক্ষ্মী এবং বামে সরস্বতী। এ সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

দুর্গোৎসব হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ব্রত। ইহা ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনা ও বিধবার একাদশীর ন্যায় একান্ত কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। ইহার অন্যতর নাম শক্তি পূজা। পূর্ণব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনা করার নাম শক্তিপূজা। জননী কখনও দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, কখনও জগৎপ্রসূতি জগদ্ধাত্রী, কখনও কালভয়নিবারিণী কালী। পূর্ণব্রহ্মময়ীকে শক্তি বলিয়া পূজা করি কেন? দেবীপুরাণে ইহার উত্তর আছে।

"শক্তা যা জগতঃ কর্ত্তুং সর্গানুগ্রহসংগ্রহান্।
শক্তিঃ শক্তৌ স্মৃতো ধাতুঃ শিবা শক্তিস্ততঃ স্মৃতা॥

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়ে যাঁহার শক্তি, তিনিই শক্তি। এই শক্তির আর একটি নাম মহামায়া। যাঁহার প্রভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান, তিনিই দেবী মহামায়া। তাঁহারই ঐন্দ্রজালিক কুহকে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল 'আমি' 'আমি' শব্দ ধ্বনিত ও প্রতি-

ধ্বনিত হইতেছে। 'আমার পুত্র, আমার সংসার, আমার জন্ম, আমার মৃত্যু'—সেই মহামায়ারই প্রভাবের ফল। এই দেবী মহামায়াকে লইয়া বৈদান্তিকগণ অত্যন্ত গোলে পড়িয়াছেন। "সদসৎ অনির্ব্বচনীয়ম্" ইহাই তাঁহাদের শেষ কথা। অদ্বৈতবাদিগণ বহু বিচার বিতর্কের পর বলিয়াছেন, মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাও নহেন, অভিন্নাও নহেন।* যাহা হউক, মাতৃভক্ত সন্তান ঐ সকল দার্শনিক কূটতর্ককে দূরে রাখিয়াই পূর্ণ ব্রহ্মময়ীর পূজায় প্রবৃত্ত হন। কারণ দেবী তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন "অহং ব্রহ্ম স্বরূপিণী, মত্তঃ প্রকৃতি পুরুষাত্মকং জগৎ, শূন্যঞ্চা-শূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দা অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইত্যাহাথর্ব্বশ্রুতিঃ" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী আমা হইতেই প্রকৃতি পুরুষাত্মক এই জগৎ, আমি শূন্য ও অশূন্য, আমি আনন্দ ও নিরানন্দ, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম।

শক্তিপূজার আরও সমস্যা আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ত চিরপ্রসিদ্ধ। অধুনাতন নিরাকারবাদীরা প্রধানতঃ শক্তি পূজা উপলক্ষ করিয়া হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করেন। বিশ্বাসী ও প্রকৃত তত্ত্বদর্শী না হইলে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। শালগ্রামশিলা হউক, অথবা মৃণ্ময়ী প্রতিমা হউক, আমরা সর্ব্বত্র সেই একমাত্র চৈতন্যের উপাসনা করিয়া থাকি। প্রতিমা প্রভৃতি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আমরা শালগ্রাম শিলায় তুলসী দান করিবার সময় যেমন "নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" বলিয়া পরমাত্মার ধ্যান করি, শ্রীদুর্গা পূজা করিবার সময় তেমনি,—

চিতিরূপেন যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

বলিয়া চৈতন্যময় পূর্ণব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকি। যে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্ত পাঠ করা দেবীপূজার একটি প্রধান অঙ্গ, তাহাতে দেবীর এই উক্তি আছে ;—"ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ, প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং" অর্থাৎ জীব যে ভক্ষণ করে, দর্শন করে, শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে এবং শ্রবণ করে, সে আমিই করিয়া থাকি। সুতরাং হিন্দু যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা করেন না, তাহা সরল চিত্ত জ্ঞানিজন মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট ভাবে উল্লেখ যোগ্য। "নিত্যজ্ঞান কৃত্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা স চ লাঘবাদেক এব, ন চ জন্যজ্ঞানকৃত্যাশ্রয়ো জীবাত্মা যথানন্তঃ মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদিভেদাৎ, তথা শিব-বিষ্ণু-দুর্গাদীনাং শরীরভেদাৎ পরমাত্মা নানা এবাস্ত ইতি বাচ্যং, ভক্তানুগ্রহায় গৃহীতানাং শরীরানাং নানাত্বেন তত্র নানাত্ব-ভ্রমাৎ, নহি ভ্রমাদ্বস্ত সিদ্ধিরিতি।" পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয়। মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি ভেদে জীবাত্মা যেমন অনন্ত, শিব বিষ্ণু দুর্গা ভেদে পরমাত্মা তেমন বহু নহেন। নানা রূপ হেতু বহুত্বের ভ্রম হইতে পারে বটে ; কিন্তু

* শক্তিঃ শক্তেঃ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদ্ দৃষ্টেন চাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ॥ পঞ্চদশী।

ভ্রান্ত বুদ্ধি ত আর প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। '

উপরে বলিয়াছি, আজ কাল শক্তি পূজার অনেক বিড়ম্বনা। সে দিন জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, দুর্গোৎসবের conceptionটা (কল্পনা) কি, বলিতে পার। আমি বন্ধুকে সরলভাবে বলিলাম "ব্রহ্ম ও জীব," এবং "উপাস্য ও উপাসকের" কল্পনা ব্যতীত আর অন্য কি conception আছে? বন্ধু দেখিলেন, আমি তাঁহার কাল্পনিক ব্যাখ্যার দিক্ দিয়াও যাইতেছি না। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, পুনরপি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন, 'দুর্গার এই প্রকার মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? আমি বন্ধুকে পুরাণোক্ত মহামায়ার আবির্ভাব কাহিনী বুঝাইয়া দিলাম। বন্ধুর অভিলষিত conception হইতে দুর্গোৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব অনেক দূরে গিয়া পড়িল। পুরাণ ছাড়িয়া দুর্গোৎসবের conception করিতে হইলে প্রবঞ্চনা ভিন্ন গতি নাই। পুরাণেতর কল্পনাসমূহের মধ্যে পলিটিকেল ব্যাখ্যা অন্যতম। কমলা-কান্তের সময় হইতে বক্তা, লেখক সকলেই দুর্গোৎসবকে একটা রাজনৈতিক রূপক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কেননা 'শক্তি' শব্দটা রূপকের সমর্থন করে। বুঝান হইতেছে যে, জাতীয় শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই শক্তি পূজার প্রকৃত অর্থ। যেমন দেবতাদিগের তেজ হইতে শক্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি লোক-সমাজ যদি যত্নবান হয়, তাহা হইলে বিপুল জনসমষ্টির সম্মিলিত তেজে দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। জগজ্জননীর ভাবুক ভক্তগণ এই প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া মর্ম্ম বেদনা প্রাপ্ত হন। বিষয়-বাসনার সহস্র ইন্দ্রজাল লইয়া এই সংসার। জীবের চঞ্চল চিত্ত সহজেই তাহাতে প্রলুব্ধ হয়। এ দিকে, তরঙ্গ-ভঙ্গচপল আয়ু দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কবে যে জীবন-বুদ্বুদ নিঃশেষ হইবে, কে বলিতে পারে? মানব সংসারের যন্ত্রশালায় 'চোখ ঢাকা বলদের মত' দিবানিশি ঘুরিতেছে; যিনি এই মায়াময় সংসারের একমাত্র সার, তাঁহাকে ভাবিবার অবসর কোথায়? স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, অর্থ-পদ-যশ, বিলাস-বিভ্রম-আমোদ,—সংসারী মানব কোন্‌টা ত্যাগ করিবে? যাঁহার লাগিয়া রাজপুত্র বুদ্ধ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তরুতল আশ্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সংসারী জীব সহস্র যন্ত্রণার মধ্যে কেমন করিয়া তাঁহার করুণা লাভ করিবে? তাই সম্বৎসর পরে তিনটী দিনের জন্য হিন্দুর দুর্গোৎসব। এই তিন দিন সকল ভুলিয়া সেই চিন্ময়ী জগজ্জননীর শরণাপন্ন হইতে হয়। সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনা যে অনাবশ্যক, তাহা বলিনা। নিরুপদ্রবে ধর্ম্মের সেবা করিতে হইলেও তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাহা বাহিরের জিনিস, তাহা বাহিরে রাখাই শ্রেয়ঃ! পুত্র কন্যার দায়, সমাজের অবস্থা, রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম,—সংসারের এই সকল আবর্জ্জনা উপাসনাক্ষেত্র হইতে সুদূরে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। দেবতার মন্দিরে কর্ম্মক্ষেত্রের অভিনয় কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে।

আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন,

যাঁহারা দুর্গোৎসব করেন শত্রু নিপাতের জন্য। দস্যু, তস্করের কালী পূজার ন্যায় ইঁহারা পাপ চিন্তা লইয়াই দুর্গোৎসবে প্রমত্ত হন। এই প্রকার তামসিকতাপূর্ণ উপাসনা যে, হীন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইঁহারা সংসার-রঙ্গভূমির প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে শত্রুজ্ঞান করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের হলাহলে দেবীর মঙ্গলঘট পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর উপাসকগণ সহোদর ও প্রতিবেশীবর্গকে চণ্ডমুণ্ড কল্পনা করিয়া চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনীর নিকট বরাভয় প্রার্থনা করেন। মূঢ় মানব একবার ভাবিয়া দেখে না যে, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণ, চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজের দল লইয়া তাহারই হৃদয়মধ্যে রাজত্ব করিতেছে। পাপ তাহার মনুষ্যত্বকে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বর্গের নন্দনকানন দৈত্য, দানবের লীলা-স্থলীতে পরিণত করিয়াছে। মানব জীবনের যাহা সর্ব্বস্ব, পাপ রক্তবীজের দল তাহা হরণ করিয়াছে। কিন্তু এমনি মোহান্ধ জীব, সে নষ্ট মণির উদ্ধারে তাহার মতি নাই, সে অমৃতের সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি নাই! কেন না প্রকৃতি তাহাকে যে পথ প্রদর্শন করিতেছে, সে সেই পথেই চলিয়াছে। তাই মূঢ়, আত্মজ্ঞানের অভাবে, মহামায়ার পূজা করিতে বসিয়া ঘৃণিত জিঘাংসার পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

এস মা আনন্দময়ি, চৈতন্যস্বরূপিণি! এস মা পূর্ণব্রহ্মময়ি, ভগবতি, দুর্গে! মা শরৎ-সমাগমে প্রকৃতি তোমার পূজো-পহার লইয়া আবির্ভূতা। পৃথিবী কুসুমহার গাঁথিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। শরতের বিচিত্রবর্ণ রৌদ্রে তোমারই রূপপ্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্লোলিনীর কুলুকুলুরবে তোমারই মহিমাসঙ্গীত গীত হইতেছে। জল-স্থল ও গগন-পবন তোমার মহিমারাগে আজ নবশ্রীসম্পন্ন। মা, তোমার আগমনে জড়, জীব যে যেখানে আছে, সকলই আনন্দময়। হে দুরিত-নাশিনী, ত্রিতাপ-তারিণি! মা, তুমি এস। এই পাপ-তাপপূর্ণ সংসার তোমার আগমনে পবিত্র হউক। মা, বেদান্ত যাহাই বলুক, আমি তোমাকে ব্রহ্মের অভিন্না বলিয়াই পূজা করি। মা, তুমি যে নিজেই বলিয়াছ,

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

এ জগতে আমিই একমাত্র আছি, দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। হে দুষ্ট, (শুম্ভ) এই দেখ, আমার বিভূতিস্বরূপ দেবতারা আমাতে লীন হইলেন। মা, তুমি অরূপা হইয়াও সরূপা, তুমি নির্গুণা হইয়াও গুণময়ী, তুমিই এই জগৎ, তুমিই সেই ব্রহ্ম। করুণাময়ি! আসিতেছ, তোমাকে কি দিয়া পূজা করিব মা? তোমার পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা আছে। মা, এইখানে শাস্ত্রের কূটতর্কে আমি দিগ্‌ভ্রান্ত। সমাধি ও রাজা সুরথ নিজ নিজ গাত্র হইতে রক্ত বলি দিয়া ছিলেন। মা, আমি তোমার চরণে আমার অহং জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গণকে উৎসর্গ করিতে চাই, কিন্তু শক্তি নাই। শক্তিময়ি, আমাকে সেই শক্তি দিয়া কৃতার্থ কর, মা! ভগবতি! আমি তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? রাজা সুরথ তোমার নিকট নষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে

তাহাই দিয়াছিলে, ফলে তাঁহার জন্মান্তর ঘটে। মহাজ্ঞানী বৈশ্য সমাধি সর্ব্বস্ব ভুলিয়া জ্ঞান ভিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে সমাধির মোক্ষলাভ হয়। মা মোক্ষদে, রত্নাকর তুমি, তোমার নিকট কোন্ রত্ন ভিক্ষা করিব? মা, তোমার মায়ার আবরণটা উন্মোচন করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। জগৎ এই তিন দিন তোমার ধ্যানে নিমগ্ন হউক। এই কয় দিন আমরা তোমার নিকট আমাদিগের দুঃখ, দৈন্যের কাহিনী নিবেদন করিব না। আমাদের পরিবারের দারিদ্র্য, আমাদের সমাজের অভাব, আমাদের রোগ-শোক-তাপ, সংসারের সকল চিন্তা এই কয় দিনের জন্য অবসান হউক, আমারা সকল ভুলিয়া তোমার ধ্যানে ও পূজায় প্রবৃত্ত হই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কবি।

(সুরে গেয়)

আমরা কবিতা গাথি
আমরা স্বপনে মাতি
আমরা গাহি গান।
কখনো সাগর তীরে
কখনো গিরির শিরে,
কোথাও নাহি স্থান।

২

আমরা জানিনা ছল,
মানিনা পাশব বল,
চাহিনা ধন জন,
ল'য়ে সুখ-হীন সুখ
ল'য়ে দুখ-হীন দুখ
কত না অনশন!

৩

রবি হেসে চায় আগে
শশী চায় অনুরাগে
নিশ্বাসে শ্বসে বায়
আমরা চাহিনা কিছু
সময় ছুটিছে পিছু
লুটিছে ধরা পায়।

৪

বিহগের সুরে ছন্দে
ফুলের বরণে গন্ধে
বিহ্বল-চিত অতি।
প্রলয় ঝটিকা স্বনে
কঠোর কুলিশ রণে
আমরা মহারথী।

৫

আমাদের হৃদি রাগে
কতনা মানব জাগে
অমরা মহিমায়।
আমাদের ঘৃণা ভারে—
মরণ মুছিতে নারে—
সে অমা-কালিমায়

আমরা জীবন গড়ি
মরণে মধুর করি
হতাশে দেই আশা।
শিশুরে হৃদয়ে টানি
রমণীরে দেবী মানি
যুবকে ভালবাসা।

পীড়িতের তরে যুঝি
পতিতের ব্যথা বুঝি
সজীব করি দেশ।
আমরা দেশের প্রাণ
প্রীতি স্মৃতি ধ্যান জ্ঞান
আমরা আদি শেষ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

বিস্মৃত-জনপদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আবদর রজাকের কাহিনী।

আবদর রজাক দেখিলেন বিজয় নগর সৌভাগ্যে ও সম্পদে অতুল। বিজয়নগর নৃপতির শক্তি অপরিসীম, তাঁহার সাম্রাজ্য স্বর্ণদ্বীপ হইতে কুলবর্গ * এবং বঙ্গদেশ হইতে মালবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শৈলপ্রমাণ উচ্চ এবং রাক্ষসের ন্যায় বলবান সহস্র হস্তী, একাদশ লক্ষ যোদ্ধৃপুরুষ বিজয়নগরের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত। সমগ্র হিন্দুস্থানে বিজয় নগর নৃপতির ন্যায় একচ্ছত্র নরপতি আর কেহ নাই। †

বিজয় নগরের অনুরূপ কোন নগরের কথা কেহ কখনো শুনে নাই, এমন নগরও কেহ কোন দিন দেখে নাই, ইহা এইরূপে গঠিত যে সাতটী দুর্গ যেন সাতটী সুদৃঢ় প্রাসাদ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। ..... উত্তর সিংহদ্বার (বহির্দ্বার) হইতে দক্ষিণ সিংহদ্বার ৭ মাইল ব্যবধান। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুর্গের মধ্যস্থলে কর্ষণযোগ্য ভূমি উদ্যান ও গৃহাদির অভাব নাই। তৃতীয় হইতে সপ্তম দুর্গ মধ্যস্থিত স্থানে বহু বিপণি বিপুল জনমণ্ডল তথায় বিরাজমান। রাজ-প্রাসাদের নিকটে চারিটী 'বাজার'। ...... প্রত্যেক বাজারেই উচ্চ বেদী এবং সুদৃশ্য ক্রমোচ্চ সোপান শ্রেণী। প্রাসাদ সমূহের মধ্যে রাজপ্রাসাদই সর্ব্বোচ্চ। বিপণিগুলি যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত। পুষ্প বিক্রেতা গণ যদিও আপন আপন 'দোকানের' সম্মুখে উচ্চ বেদী বাঁধিয়াছে কিন্তু তাহারা পথের উভয় পার্শ্ব হইতেই পুষ্প বিক্রয় করে ইহাতে কাহারো কোনরূপ অসুবিধা হয় না। সদ্য

* কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ।

† শিলা লিপি হইতে ইহাই জানা যায় যে দ্বিতীয় দেবরায় এই সময়ে "মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চয়িত সুগন্ধি পুষ্প সকল সময়েই পাওয়া যায় …সকল স্থানেই গোলাপ ফুল বিক্রীত হয়। এ দেশের লোক মনে করে খাদ্যের ন্যায় গোলাপ ফুলও বিশেষ আবশ্যক। সমব্যবসায়ীদিগের দোকান-পসার এক স্থানে সজ্জিত। এই সকল 'বাজারে' মণি মুক্তা, প্রবাল ও হীরক বিক্রীত হইয়া থাকে। … রাজ-প্রাসাদের সন্নিকটে প্রস্তর বিনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী দিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। সেই সকল পয়ঃ-প্রণালী মসৃণ ও সুন্দর।

সুলতানের (নৃপতির) প্রাসাদের দক্ষিণ ভাগে দেওয়ানখানা। রাজমন্ত্রী এই স্থানে বসিয়া রাজকার্য্য করিয়া থকেন। দেওয়ান খানা অতি বৃহৎ এবং দেখিলে মনে হয় যেন একটী "চেহেল্ সুতুন" অর্থাৎ চল্লিশটী স্তম্ভ বিশিষ্ট বৃহদায়তন কক্ষ। ইহারই সম্মুখে একটী মনুষ্যের অপেক্ষা উচ্চ কক্ষকে 'দপ্তর খানা' কহে। এই দপ্তরখানা দীর্ঘে ত্রিশ গজ এবং প্রস্থে ৬ গজ। এখানে রাজ্যের দলিলপত্র রক্ষিত হয় এবং লিপিকারগণ কার্য্য করেন।

দেওয়ানখানার মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া একজন রাজ পুরুষ শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত। মঞ্চের পদ তলে সারি বাঁধিয়া চোবদারগণ দণ্ডায়মান থাকে। অভিযোগকারী চোবদারদিগের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করে এবং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিয়া আপনার বক্তব্য প্রকাশ করে। * অভিযোগ গ্রহণ করিয়া বিচারক আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। সে আদেশ অমান্য করিবার অধিকার কাহারো নাই। বিচার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি যখন আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজদর্শনে অগ্রসর হয়েন, তখন সুচিত্রিত সাতটী ছত্র লইয়া ছত্রধারীগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, উভয় পার্শ্বে বাদ্যধ্বনি হয় এবং স্তাবকগণ তাঁহার জয় গান করিয়া থাকে। রাজার নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ৭টী ভিন্ন ভিন্ন তোরণ অতিক্রম করিতে হয়। প্রত্যেক তোরণ সজ্জিত প্রহরী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। বিচারক প্রত্যেক তোরণ সন্নিকটে এক একটী ছত্রধারীকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন এবং শেষে একাকী নৃপতি সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রাজ্যের ও রাজ-কার্য্যের সংবাদ প্রদান করেন।

রাজপ্রাসাদের বামভাগে টঙ্কশালা। এখানে তিন প্রকারের সুবর্ণ, এক প্রকারের রৌপ্য এবং এক প্রকারের তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হয়। সকলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজ্যের দেয় রাজকর টঙ্কাশালায় প্রদান করে। কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকিলে তাহাও টঙ্কশালা হইতে লইতে হয়। প্রতি চারি মাস অন্তর সিপাহীদিগের বেতন দেওয়ার নিয়ম আছে।

এ রাজ্যের জন-সংখ্যা এত অধিক যে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে গেলে অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে। রাজার অর্থাগারে গর্ত্ত বিশিষ্ট কক্ষ আছে। সেই সকল গর্ত্ত মধ্যে গলিত স্বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডে রক্ষিত হয়। বড় ছোট এ দেশের যে কেহ সকলেই মূল্যবান প্রস্তর নির্ম্মিত ভূষণ ব্যবহার করে।

* দক্ষিণা দিবার কথা শুধু ইলিয়ট সাহেবর গ্রন্থেই আছে। অন্য স্থানে দেখিনাই।

মন্ত্রীর কর্ম্মশালার সম্মুখেই হস্তিশালা। রাজার বহু সংখ্যক হস্তী আছে, তন্মধ্যে বৃহৎ গুলিই এখানে রক্ষিত হয়। প্রত্যেক হস্তীর জন্য এক একটী স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সে সকল কক্ষপ্রাচীর সুদৃঢ়, কক্ষের ছাদ কাষ্ঠ নির্ম্মিত। একটী প্রকাণ্ড শ্বেতহস্তী বহুযত্নে রক্ষিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রভাতে ইহা রাজার নিকটে আনীত হয়। 'কিচু' (কচু ?) সিদ্ধ করিয়া লবণ চিনি সংযোগে দুই মণ ওজনের এক একটী গোলক নির্ম্মিত হয়। সেই সকল গোলক মাখনে সিক্ত করিয়া রাজপ্রাসাদের হস্তিদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

* * * *

টঙ্কশালার পুরোভাগে শান্তি রক্ষকের (আধুনিক পুলিশ কমিশনার) কর্ম্মশালা। তাঁহার অধীনে ১২০০০ জন শান্তিরক্ষক (পুলিশ) আছে। বেশ্যালয় হইতে সংগৃহীত রাজকর হইতে ইহাদের বেতন প্রদান করা হয়। সেই সকল বারবণিতাদিগের সুরম্য হর্ম্ম্যশ্রেণী ;—তাহাদের চটুলতা ও কটাক্ষ অবর্ণনীয়।

* * * *

টঙ্কশালার পশ্চাতেই বাজারের ন্যায় একটী স্থান আছে। ইহা দীর্ঘে ৩০০ গজেরও অধিক এবং প্রস্থে ২০ গজ। পথের দুই পার্শ্বে হর্ম্ম্যশ্রেণী এবং বারান্দা। হর্ম্ম্যগুলির সম্মুখে সুন্দর প্রস্তরময় আসন নির্ম্মিত রহিয়াছে। পথিপার্শ্বে উজ্জ্বল বর্ণে-রঞ্জিত প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর মূর্ত্তি। সে গুলি এত সুন্দর, যে দেখিলে আসল বলিয়া ভ্রম হয়। ......দ্বার-প্রান্তে বসিবার আসন প্রভৃতি রক্ষিত হয়। বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিতা বারবিলাসিনীগণ সখিগণ সমভিব্যাহারে সেই সকল আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিয়া তাহাদিগকে ফাঁদে ফেলে। ....

একদিন রাজা আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি সায়ংকালে রাজদর্শন করিতে গমন করিলাম। আমি তাঁহাকে পাঁচটী সুন্দর ঘোটক এবং দুই খানি থালিতে নয় খানি দামাস্ক এবং সাটিন উপহার দিলাম। নৃপতির উপযুক্ত একটী সুসজ্জিত ৪০ স্তম্ভ বিশিষ্ট কক্ষে তিনি তখন বসিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে বহুলোক বৃত্তাকারে উপস্থিত ছিল। বহুমূল্য সাটিনের পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া আসল মুক্তার হার কণ্ঠে দোলাইয়া নৃপতি সমাসীন ছিলেন। সে কণ্ঠমালার মূল্য নিরূপণ করা মণিকারদিগের পক্ষেই অত্যন্ত দুরূহ। ......রাজার বর্ণ পীতাভ, দেহ ক্ষীণ এবং দীর্ঘ। ...তাঁহার মূর্ত্তিটী নয়নাকর্ষক।

তিনি আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিকটে বসাইলেন এবং সম্রাটের পত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমায় কহিলেন—মহিমান্বিত সম্রাট যে আমার সভায় তাঁহার দূত প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি।' ....আমার সিধা স্বরূপ প্রতিদিন দুইটি ভেড়া, ৮টী মুরগী, পাঁচ মণ চাউল, এক মণ মাখন, এক মণ চিনি এবং দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণমুদ্রা প্রেরিত হইত। ...

এ দেশের ক্ষমতাশালী কাফেরগণ (!) আপন আপন শক্তি, সম্পদ, আড়ম্বর ও অহঙ্কার প্রদর্শনে পটু। তাই রাজা প্রতি

বৎসর মহানবমী নামক একটী আড়ম্বর পূর্ণ উৎসব করিয়া থাকেন; আমি রজব মাসের সেই উৎসব বর্ণনা করিতেছি। (?) *

রাজার আদেশে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সেনাপতি প্রভৃতি তিন চারি মাসের পথ দুর হইতেও আসিয়া রাজধানীতে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের সহিত সহস্র হস্তী আসিল। সে সকল হস্তির হাওদা বিচিত্র কারুকার্য্যময় ও অতীব সুন্দর। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটী উপযুক্ত বিস্তৃত স্থানে এই সকল হস্তী আসিয়া দাঁড়াইল। দেশের গণ্য মান্য ভদ্র সম্প্রদায় তথায় সমবেত হইলেন।

সেই সুসজ্জিত ক্ষেত্রে অগণিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহাদের কোনটী ত্রিতল, কোনটী চতুস্তল, কোনটী পঞ্চতল। প্রত্যেক গৃহ গাত্রে অসংখ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মূর্ত্তি অঙ্কিত। সে সকল চিত্র এত সুন্দর যে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয় এবং চিত্রকরের-লিপি কুশলতা ও বিষয়জ্ঞানের পরিচয় দেয়। কোন কোন গৃহ এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে তাহারা অনবরত বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন দৃশ্যাবলী আনিয়া নয়ন সমক্ষে ধরিতেছে। এই স্থানের সম্মুখে একটী অতি সুন্দর নবতল প্রাসাদ। তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাজার সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। সপ্তম তল আমার ও আমার বান্ধবদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রাসাদ ও পূর্ব্ব লিখিত গৃহ গুলির মধ্যে একটী সুসজ্জিত সুবিস্তৃত মুক্ত স্থানে গায়িকা, ভাট প্রভৃতি সমবেত হইয়া আপন আপন কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। এই গায়িকাসম্প্রদায়ের মধ্যে যুবতীই অধিক। তাহাদের বসন্তের-গোলাপ-নিন্দিত গণ্ড, শরতের চন্দ্র তুল্য সুন্দর বদন লোকের প্রাণ মন মোহিত করিতেছে। রাজার সম্মুখেই তাহারা একটী যবনিকান্তরালে অবস্থান করিতেছিল যবনিকা অন্তর্হিত হইলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা লীলা বিভঙ্গে চরণ বিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে চিত্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে।

উৎসব কালের নৃত্য গীত, ভোজবাজি অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আব্দর রজাক কহিতেছেন,—

উৎসবের তৃতীয় দিবসে আমি রাজসদনে নীত হইলাম। রাজা এক খানি বৃহৎ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। সে সিংহাসন স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট মণিমুক্তাদি খচিত। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এমন শিল্পনৈপুণ্য সম্ভব নহে। সিংহাসন সম্মুখে এক খানি সাটিনের আসন ছিল—তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর মুক্তার তিন সারি ঝালর ঝুলিতেছিল। উৎসবের কয়েক দিন এই আসনের উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া রাজা তদুপরি উপবিষ্ট থাকিতেন। ....

...রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখিলাম ছাদ এবং কক্ষ প্রাচীর তরবারি পৃষ্ঠের ন্যায় পুরু স্বর্ণ পত্রে মণ্ডিত। সেই সুবর্ণ পত্র নানাবিধ মুক্তাদি খচিত। সুবর্ণ শলাকা বিদ্ধ হইয়া সেই মুক্তা খচিত সুবর্ণ পত্র

* আব্দর রজাক যে উৎসব বর্ণন করিয়াছিলেন তাহা মহানবমী বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহা দিবসত্রয় ব্যাপী ছিল। মহানবমীর উৎসব নয় দিন ব্যাপী। বোধ হয় আব্দর রজাক নববর্ষোৎসব দেখিয়া থাকিবেন। শুক্ল আশ্বিনে মহানবমী উৎসব। উহা ১৩৪২ খৃঃ অব্দের রজব মাসের চন্দ্র কার্ত্তিকের চন্দ্র আশ্বিনের নহে

কক্ষ প্রাচীরে অবরুদ্ধ। সম্মুখের বেদীর উপর নৃপতির বৃহদায়তন স্বর্ণ সিংহাসন শোভা পাইতেছিল।

বিজয়নগরের হিন্দু নৃপতি যে শুধু শক্তি এবং সমৃদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে তাঁহার সদ্‌গুণ রাশিরও সীমা ছিল না। *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মহাভারত।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত।

কেতুগ্রহ—দুঃশাসন।

দুঃশাসন চরিত্রের লক্ষণ গুলি এই :—

১। আবৃতনয়না গান্ধারী যে মাংসপিণ্ড প্রসব করেন তাহার শত খণ্ডের এক খণ্ড দুঃশাসন রূপে পরিণত হয়।

২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবর্ত্তকত্রয়ের একজন দুঃশাসন। (মহা।)

৩। দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃ শত--শত তারক মধ্যে দুঃশাসন একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ।

৪। দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন কৃষ্ণার কেশপাশ ধারণে কুরুসভায় আনয়ন করেন।

৫। দুঃশাসনের বক্ষ খড়্গে বিদারণ করিয়া ভীমসেন তাহার রক্তপান করেন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। পিতৃযান ওরফে ছায়াপথ—ইতিহের ছায়াদেবী। রেবতী ছায়ার নামান্তর। এজন্য শনি ছায়াসুত ও রেবতীভব।

২। গ্রহগণের শীর্ষস্থানীয় সূরপুত্র সৌরী—শনিই স্বর্ভানু। এবং স্বর্ভানুর প্রতিকৃতি রাহুসর্প। রাহুর ধড় কেতু (লাঙ্গুলঃ Nodus) নামে খ্যাত

৩। কেতুগ্রহের অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত (যম)। যম—মঙ্গল প্রতি দ্বিতীয় বর্ষে—অদৃশ্য থাকে বলিয়া উহার ঐতিহিক নাম চিত্রগুপ্ত।

৪। সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত সুধা দেববেশে পান হেতু মোহিনীদেবী রাহুর মুণ্ড ছেদন করেন, তাহার ধড়ই কেতুগ্রহ তাহা কাহার অবিদিত নহে।

উপপত্তি।

কেতু দুঃশাসনের চরিত্র লক্ষণ যৎসামান্য যে কিছু পাওয়া যায় তাহার বিশেষত্ব তত চিত্তাকর্ষক নহে, সুতরাং সাধারণ্যের পক্ষে আমাদের নির্ণীত স্বরূপতা হৃদ্বোধক হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না। তবে অন্যান্য বীর চরিত্র যদি হৃদয়ঙ্গম হয় তবে দুঃশাসন কেতুগ্রহ বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

* In very truth, he possessed excellent qualities.

—Matla'u-s Sadin from Elliots' History of India, vol iv. page 12

১। কেতুগ্রহ চিত্রগুপ্ত দৈবত বলিয়া দুঃশাসন সতত নরক-কর্ণের পক্ষপাতী।

২। কৃষ্ণার অবমাননা করিয়া কেতু দুঃশাসন মোহিনীর কৃত নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইল।

৩। কেতু দুঃশাসনের কণ্ঠরুধির পান করিয়া ভীমসেন পরিতৃপ্ত হইলেন। (মহা ৮।৮৪)

ধনপতিকুবের—ভূরিশ্রবা।

(মহা—৭।১৩৯—১৪০)

ভূরিশ্রবার চরিত্র লক্ষণ গুলি এই :—

১। ভূরিশ্রবার আদি নাম জলসন্ধ (মহা ৭।১৪৮) এবং তাহার উপাধি ভূরিশ্রবা, যূপকেতু, ও শলাগ্রজ।

২। ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত খড়্গ সমবেত বা খড়্গ সমন্বিত ছিল।

৩। জলসন্ধ ভূরি দক্ষিণা প্রদ ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ভূরিশ্রবা ছিল।

৪। ভূরিশ্রবা "অগ্নিতে আহুতি প্রদানে নিয়ত দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিতেন এবং প্রার্থী মাত্রেরই কামনা পূর্ণ করিতেন" এজন্য তাঁহার যূপকেতু নাম এবং যূপ তাহার রথধ্বজ চিহ্ন ছিল।

৫। ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠিত বীরদ্বয় ছিলেন।

৬। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভূরিশ্রবা সাত্যকির কেশগ্রহণ পূর্ব্বক বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন।

৭। ভূরিশ্রবার গৃহীত কেশ বাহুর সহিত সাত্যকি স্বীয় মস্তক পরিভ্রামিত করিতে লাগিলেন।

৮। শ্রীকৃষ্ণ প্রণোদিত অর্জ্জুন বাণ দ্বারা খড়্গ চিহ্নিত দক্ষিণ বাহু ছেদন করিলেন।

৯। এবং সাত্যকি খড়্গ দ্বারা প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার শিরঃ ছেদন করিলেন।

১০। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভূরিশ্রবা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়া গরুড়াসনে শিবিরাজপ্রাপ্তধামে গমন করিলেন।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

১। ভগোলে মকর রাশির ঊর্দ্ধে দৃষ্টি চলে না। করিলে গরুড়মণ্ডল (Aquila) দেখা যায়। তারা গরুড়ের উঃ পূঃ ভাগে প্রবিষ্টমণ্ডল (Delphinos) অবস্থিত। (১) তদুত্তরে শৃগাল মণ্ডল (Vulpecula) এবং তারা শৃগালের উঃ পঃ কোণে ব্রহ্ম দৈবত অভিজিৎ নক্ষত্র বীণামণ্ডলে (Lyra) অবস্থিত আছে। (২)

২। প্রবিষ্ট মণ্ডলে বসুদৈবত পঞ্চ তারাত্মিকা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র স্থাপিত আছে।

জ্যোতিষিক ইতিহ।

(রামায়ণ ৭।৩)

১। বিশ্রবাপুত্র ধনপতি কুবের ধন ও যক্ষের অধীশ্বর ছিলেন।

(মহা ৫।১৬)

২। এবং সায়ক (খড়্গ) তাঁহার অস্ত্র ছিল

(মহা ৮।৯১)

ধনপতি যক্ষরাজ। যক্ষগণ ধনরক্ষক ও জলাধিপতি বরুণ দেবের বার্ত্তাবাহক।

(১) "ডলফিন্ মৎস্য ভূমধ্যসাগরে ও অতল-অন্তিক সাগরে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় ইহার আশ্চর্য্যজনক নানাবর্ণপরিবর্ত্তন ঘটে"। (Webster)

(২) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা অভিজিতের বাহা। তৈঃ ব্রা ১।৫।১.৪।

৪। রামায়ণ মতে (৭।১৮) ধনপতি কৃকলাসরূপী। (৩)

৫। কুবেরের সভা "অন্তরীক্ষ চারিণী"।

(মহা ২।১০)

উপপত্তি।

আমরা দেখিতেছি যে :—

বিশ্রবা পুত্র ধনেশ ধনদানে ও যজ্ঞ দক্ষিণা দানে সতত ব্রতী।

ভূরিশ্রবাও ধন দানে ও যজ্ঞ দক্ষিণা দানে সতত ব্রতী।

সায়ক (খড়্গ) বিশ্রবা পুত্রের অস্ত্র। ভূরিশ্রবার দক্ষিণ বাহু খড়্গসমন্বিত বা সমবেত।

বিশ্রবা পুত্র যজ্ঞের অধীশ্বর।

ভূরিশ্রবার পতাকা যূপ চিহ্নিত।

ধনঞ্জয় বিশ্রবা পুত্র ও ভূরিশ্রবা উভয়ের বিজেতা আবার শ্রবিষ্ঠ ওরফে ধনিষ্ঠ নক্ষত্র তারা গরুড়োপরি অবস্থিত।

ভূরিশ্রবাও গরুড়াসনে আসীন।

ধনিষ্ঠ ওরফে শ্রবিষ্ঠ ব্রহ্ম দৈবত অভিজিৎ নক্ষত্রের সন্নিহিত।

ভূরিশ্রবাও "ব্রহ্ম লোক প্রতিষ্ঠিত"।

পঞ্চ তারাত্মিকা ধনিষ্ঠার এক তারা হীন হইলে তারা চতুষ্টয় অবশিষ্ট থাকে।

এক হস্ত অর্জ্জুন শরে বিচ্ছিন্ন হইলে ভূরিশ্রবা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অন্তরীক্ষ চারী বিশ্রবাপুত্র ধনেশ, ব্রহ্ম লোকাধিষ্ঠিত গরুড়োপরিস্থ তাঁরা শ্রবিষ্ঠ ওরফে তারা ধনিষ্ঠা, এবং গরুড়াসীন ভূরিশ্রবা, এ তিনের নিত্য সম্বন্ধ সহজেই উপলব্ধি হয়।

তারা গরুড় ওরফে তারাশ্যেনের ও তারা হংসের সন্নিহিত তারা শৃগালের সহিত শিবিরাজের ঘনিষ্ঠতা থাকিলে সংশয়ের কোন হেতুই থাকে না (মহা ৩।১৯৬)।

ডলফিন মৎস্যের জলচরত্ব ও কৃকলাসের স্থলচরত্ব, সামুদ্রিক ও মধ্যভূমিজ কবিগণের কল্পনার পার্থক্যের ফল মাত্র। মূলে একই।

নৈঋর্ত মঙ্গল-রাবণের ভ্রাতা নৈঋর্ত বিশ্রবাপুত্র অসুর পক্ষে দাঁড়াইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ঐতিহিক চরিত্র "ভূষণ বাহন" দ্বারা নির্ণয় করাই নিরাপদ। কারণ ভূষণ বাহন অপরিবর্ত্তনীয়।

(কুমারসম্ভব ৩।৪১) নন্দী-বুধের (৪) হেমবেত্র মহাকবি হোমারের অডেসী (২৪।১-৪) তে হার্মিজ হস্তে এবং "বেবিলনের নেবোতারার হস্তে দৃষ্ট হয়" (Rawlinson)।

কামদেবের বর্ম্ম রোমে কুপিড দেবের দেহে এবং গ্রীসে ইরস্ দেবের শরীরে দৃষ্ট হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

(৩) "কৃকলাসঃ ধনাধ্যক্ষঃ"। রামায়ণ।

কৃকলাস অন্ধকারে থাকিলে ছেয়ে রং হয় আলোকে থাকিলে পার্শ্বস্থ পদার্থের বর্ণ ধারণ করে এবং ভয় পাইলে রক্তবর্ণ হয়—

"কৃকলাসের মস্তক স্বর্ণবর্ণ এজন্য ইহার কাঞ্চনক নাম" (রামানুজস্বামী)

কাঞ্চনকই ধনপতির উপযুক্তরূপ।

(৪) বুধগ্রহের একটী নাম প্রহর্ষণ। ঐ প্রহর্ষণ নাম ইতিহাসে নন্দীনামে পরিণত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্য—কৃপাচার্য্য

কৃপাচার্য্যের চরিত্র লক্ষণ গুলি এই :—

১। গৌতম পুত্র মহর্ষি, শরদ্বানের পরশুম্বে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। এই পুত্রের নাম কৃপ এবং কন্যার নাম কৃপী

(মহা ১।১৩০)

২। পিতার অধ্যাপনায় কৃপ আচার্য্য হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণ এবং বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

(মহা ১।১৩০)

৩। দ্রোণাচার্য্য—কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন।

৪। মহাভারত মতে (৮।৮৯) কৃপ অমর ও (৪।৫৫ নীল পতাকা পরিশোভিত ছিলেন তাঁহার (৬।১৭) রথধ্বজ বৃষভাঙ্কিত এবং তাঁহার (৬।২০) যানের অগ্রভাগ "উৎকৃষ্ণ" ছিল।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। উশনা দেব ও শ্রীদেবী শুক্র গ্রহের যমজ মূর্ত্তি। শুক্রগ্রহ দেখিতে নীলাভ।

২। শুক্রাচার্য্য পৌরাণিক যুগে অসুরগণের অস্ত্রগুরু হইয়াছিলেন। বেদে উশনা ইন্দ্রদেবের মিত্র ও সহায় বলিয়া বর্ণিত আছে। *

৩। রাশিচক্রের তারাবৃষ ও তারাতুল শুক্রগ্রহের গৃহদ্বয়। তারাবৃষের মুণ্ডে অতি উজ্জ্বল রোহিণী নক্ষত্র এবং তারাতুলের অগ্রভাগে উজ্জ্বল বিশাখা নক্ষত্র অবস্থিত আছে। কিন্তু তারাবৃষের প্রথম ভাগে স্থিত কৃত্তিকানক্ষত্র তাদৃশ তেজস্বী নহে এবং তারাতুলের প্রথম ভাগে যে তারাগুলি আছে তাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র।

উপপত্তি।

১। কৃপাচার্য্য অমর ছিলেন সুতরাং বুঝিতে হইবে যে কৃপ পার্থিব প্রাণী নহে। এবং স্বর্গে ও সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ও অসুরাচার্য্য শুক্র গ্রহ ভিন্ন আর অন্য আচার্য্য নাই। দ্রোণ গুরু মহাভারত মতে (১।৬৭) বৃহস্পতির অংশে জন্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ স্পষ্ট কথায় দেবগুরু বৃহস্পতি দ্রোণাচার্য্য নামে ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং শুক্রাচার্য্য ভিন্ন আর কেহ কৃপাচার্য্য হইতে পারে না।

২। শুক্রগ্রহ দেখিতে নীলাভ দেখায়। †
এজন্য কৃপ নীল পতাকা সুশোভিত।

৩। তারা বৃষ শুক্রের গৃহ, এজন্য কৃপের রথধ্বজ বৃষভাঙ্কিত।

৪। শুক্রগৃহ তুলরাশির অগ্রভাগ—উৎকৃষ্ণ। এইজন্য কৃপের যানের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ণ।

৫। বৈদিকযুগে শুক্র দেবপক্ষ ত্যাগ করিয়া অসুর পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তাই দ্রোণ ও কৃপ মধ্যে মহাভারতে সৌহৃদ্য উপলক্ষিত হয়। (‡)

তারাদর্শক।

* ঋঃ বেঃ ১।৫১।১০-১১।

† বিশ্ববর্ণ দর্শনী যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে যে শুক্রগ্রহ বর্ণে পীতাভ শুক্ল।

‡ Popular Hindu Astronomy p 190. দেখ।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

(পূর্ব্বপ্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

(G. De Lafont)র

ফরাসী হইতে।

ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা নৈতিক কর্ত্তব্যসাধনকে বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্চতর আসন প্রদান করেন। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বিতীয় আমূল সংস্কার,—যদিও এই মূলসূত্রটি বহুপূর্ব্বে মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু তদনুসারে কোন কাজ হয় নাই। কাজ হওয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কতকগুলা অতিরঞ্জিত ও শিশু-সুলভ বাহ্যানুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বুদ্ধ যে ইহারই প্রতিবিধানার্থ একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন,—ইহাই বুদ্ধের গৌরব। বুদ্ধ ও খৃষ্টের মধ্যে ইহা আর একটি সংস্পর্শস্থল। খৃষ্টও Pharisee দিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন যে, তাহারা সদনুষ্ঠান ও দান ধ্যান করে না, কেবল ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানেই সন্তুষ্ট থাকে।

শাক্যমুনি ও যিশুর মধ্যে যে একটা সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়,—সে তাঁহাদের দার্শনিক মত কিংবা ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া নহে। বস্তুতঃ, বাইবেল-গ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে কোন দার্শনিক শিক্ষা পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম্ম কপিলের সাংখ্যদর্শন হইতে জড়বাদ গ্রহণ করিয়াছে; অতএব এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই। কিন্তু যদি আমরা তাত্ত্বিক দিক্‌টা ছাড়িয়া ব্যবহারিক দিক্‌টা ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, উহাদের উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ধর্ম্মের নিকট ও মৃত্যুর নিকট সকল মনুষ্যই সমান—এই কথা প্রচার করিবার জন্য, বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উভয়ই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে নিরক্ষরদিগকে ও দীনদুঃখীদিগকে আহ্বান করিতেন এবং উভয়ই ধনাঢ্যদিগকে ও ধর্ম্মধ্বজীদিগকে অবজ্ঞা করিতেন। এক জন উদ্ধত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল:—"হে গৌতম! ব্রাহ্মণের সারাংশ কি? এবং কি কি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ-পদবী লাভ করা যায়?" শাক্যমুনি উত্তর করিলেন:—"তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ যিনি সমস্ত মন্দকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি দ্বেষহিংসা ও মলিনতা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন।"

আর এক সময়ে বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন:—"চণ্ডালের ন্যায় ব্রাহ্মণও নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব, একজন মহৎ, আর একজন নীচ—এরূপ উক্তির হেতু কি থাকিতে পারে? মৃত্যু হইলে, অস্পৃশ্য ও হেয় বলিয়া ব্রাহ্মণও পরিত্যক্ত

হয়—তবে অন্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রভেদ কোথায় ?" (৪৯)

উভয়েরই উপদেশ নীতি-মূলক। ইতর সাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময় বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ই সুস্পষ্ট সরল ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাহাতে তাহারা সহজে বুঝিতে পারে, এইরূপ দৃষ্টান্ত-কথার দ্বারা উপদেশ দিতেন। উভয়েই বলবানের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিয়াছেন, উভয়েই শস্ত্র-বলকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, উভয়েই চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভূতে দয়া, দান ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। কেবল তাঁহাদের প্রচারিত দুইটি ধর্ম্ম বিশ্ব-জনীন; ঐ দুই ধর্ম্মই, নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যকেই আপনার নিকট আহ্বান করিয়াছে, উভয়ধর্ম্মই প্রচারকের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছে; তাহার কারণ, উভয় ধর্ম্মই ভূতদয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই উভয় ধর্ম্মের ভক্তেরা স্ব স্ব ধর্ম্ম জগতের নিকট প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উভয় ধর্ম্মই, স্বকীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রবেশাধিকার দিয়া, নারীজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছে।

এক কথায়, বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ই (সাম্যবাদের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে) সাম্যবাদের প্রচারক ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম মুখ্যতঃ নীতিমূলক ধর্ম্ম, উহার কোন বিশেষ দর্শনতন্ত্র নাই; কিন্তু ধর্ম্মমাত্রই কোন একটা দর্শনের সহিত যোগ নিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। আদি-বৌদ্ধধর্ম্ম যে জড়বাদী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কপিলের সাংখ্যদর্শন শাক্যমুনির অতীব প্রিয় ছিল। সাংখ্যধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিকাশ লাভ করিয়াছে—অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে—বৌদ্ধধর্ম্ম, যুক্তি-মূলক সাংখ্য ধর্ম্মেরই ব্যবহারিক পরিণাম। Lassen, Burnouf প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তারা এই মতেরই পক্ষপাতী।

কপিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, বেদের প্রামাণিকতা অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু শাক্যমুনি, বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বর্ণভেদ, যজ্ঞাদি উপধর্ম্ম, অল্পজনাধিপত্য (oligarchy) ও পৌরোহিতিক প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কপিল, প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়বোধের বিষয় হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে একত্র অবস্থিত দুইটি নিত্য তত্ত্ব আছে:—একটি প্রকৃতি—মূলহীন মূল, যাহা সমস্ত পদার্থের নিত্য কারণ; আর একটি পুরুষ—বুদ্ধি ও জ্ঞানের মূলতত্ত্ব।

ঐ দুই মূলতত্ত্বের সংযোগে দুঃখের উৎপত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই মূলতত্ত্ব লইয়া মনুষ্যও গঠিত হইয়াছে; সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিনির্মুক্ত করিতে না পারিলে মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কেন না, দুঃখের উচ্ছেদ সাধনই আত্মার চরম উদ্দেশ্য।

বুদ্ধও ঐ একই স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্রটি এই;—সকল বস্তুই নশ্বর; বুদ্ধ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় বোধ হইতে

যাত্রা আরম্ভ করিয়াও, পরে উহাদিগকে বিভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, উহারা অহং-এর অংশ নহে। সাঙ্খ্য বলেন, অজ্ঞানই আমাদের শত্রু—অজ্ঞানের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতে হইবে। শাক্য মুনির মতে, মুক্তির চারিটি পথ জানাই আমাদের বিজ্ঞানের সীমা; তাহার ওদিকে আর কিছুই নাই;—সে সমস্তই শূন্য। যে যুগে শাক্যমুনি জন্মিয়া ছিলেন সেই যুগে সমস্ত ভারতভূমি, আত্মার যোনিভ্রমণে বিশ্বাস করিত। জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা আত্মা যত কাল না বিশোধিত হয় এবং বিশোধিত হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়, তত কাল আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে—এই বিশ্বাস তখনকার লোকের মনে দারুণ ভীতি উৎপাদন করিত। কিছুই স্থায়ী নহে এবং জীবন দুঃখময়। অতএব মানুষকে এমন একটি স্থান দেখাইতে হইবে যাহা অবিনশ্বর, যেখানে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হয়, যেখানে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; এবং সেই স্থানে পৌঁছিবারও একটি সুগম পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। শাক্য মুনি বলিলেন—সেই স্থানটি 'নির্ব্বাণ', এবং সেই স্থানে উপনীত হইবার চারিটি পথ—ইহাই মুক্তির চারিটি তত্ত্ব; এই মহাপথ আবার অষ্টাংশে বিভক্ত।

মুক্তির এই চারি তত্ত্বের উপর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথমে কাশীধামেই এই তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

"হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ সম্বন্ধে এই পবিত্র সত্যটি তোমরা শ্রবণ কর:—জন্ম দুঃখ, রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় বস্তুর সহিত সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বস্তুর সহিত বিয়োগ দুঃখ; সংক্ষেপে—পার্থিব পদার্থের প্রতি পঞ্চবিধ আসক্তিই দুঃখ। এই পঞ্চবিধ আসক্তি কি? না,—দেহের প্রতি আসক্তি, বেদনার প্রতি আসক্তি, স্মৃতির প্রতি আসক্তি, সংস্কারের প্রতি আসক্তি ও চৈতন্যের প্রতি আসক্তি।"

"হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ নিবৃত্তি সম্বন্ধে এই পবিত্র সত্যটি শ্রবণ কর:—বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া বিদূরিত করিয়া, বিসর্জ্জন করিয়া তবে এই তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ। দুঃখ ধ্বংসের মার্গ সম্বন্ধে এই সত্যটি শ্রবণ কর;—এই পবিত্র মার্গ অষ্ট স্কন্ধে বিভক্ত;—বিশুদ্ধ বিশ্বাস, বিশুদ্ধ ইচ্ছা, বিশুদ্ধ ভাষা, বিশুদ্ধ কার্য্য, বিশুদ্ধ জীবিকা, বিশুদ্ধ অভিনিবেশ, বিশুদ্ধ অধ্যবসায়, বিশুদ্ধ ধ্যান।" (৫০)

অতএব, এই চারিটি সত্য সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ বলিয়াই পুনর্জন্মের দুঃখময় পথ আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হয়। ফলতঃ আমরা যদি এই চারিটি সত্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়। যখন জীবন দুঃখময়, যখন জগৎ দুঃখের দৃশ্য ছাড়া আর কোন দৃশ্য আমাদিগকে দেখাইতে পারে না, তখন জীবনে এত আসক্তি কেন?

কিন্তু শাক্যসিংহকে সেই প্রবৃত্তিটির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল যাহা মানব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে—সেই জীবনের তৃষ্ণা—যাহার প্রভাবে মানুষ সকল

প্রকার সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি যাহা মানুষকে স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত উত্তেজিত করে। এই তৃষ্ণাকে—এই বাসনাকে, যে কোন প্রকারে হউক, উন্মূলিত করা আবশ্যক। এখন দেখা যাক, বুদ্ধ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

তিনি বলেনঃ—যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করে তাহাই নশ্বর; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সমস্ত জগৎই সাক্ষ্য দিতেছে;—এই নিয়মকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। কিন্তু এই পৃথিবীতেই জীবনের শেষ হয় না; মৃত্যুর পর, জীবের রূপান্তর আরম্ভ হয় এবং জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

জন্মান্তরেও কিছুই স্থায়ী হয় না। সেখানেও জীব আনন্দ লাভ করিতে পারে না; কেন না, যেখানে নিত্য পরিবর্ত্তন সেখানে আনন্দ নাই। মানুষ পুনঃ পুনঃ সেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না, সর্ব্বত্রই তাহার সম্মুখে—দুঃখ। সুতরাং মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—কেমন করিয়া সেই নিত্য বিরামের দিকে—সেই নির্ব্বাণের দিকে সে অগ্রসর হইতে পারে—যেখানে পৌঁছিলে হর্ষ শোক, সুখ দুঃখ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেই নির্ব্বাণে উপনীত হইলে কোন শক্তিই তাহাকে সেখান হইতে নিকর্ষণ করিতে পারিবে না। নির্ব্বাণের অর্থ চিরন্তন বিরাম—সেখানে উপনীত হইলে পুনর্জন্ম আর হয় না।

কিন্তু এইখানে একটী কঠিন প্রশ্ন আছে। যাহা কিছু আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিতেছে সকলই যদি পরিবর্ত্তনের বিষয় হয়, তাহা হইলে আমাদের অন্তরে এমন একটি মূলতত্ত্ব—এমন একটি মূল উপাদান থাকা আবশ্যক যাহা নিত্য, যাহা অপরিবর্ত্তনীয়; সে মূলতত্ত্বটি কি ?

সেটি মানুষের "আমি।" যদি এই আমি-টি অপরিবর্ত্তনীয় হয় তাহা হইলে অবশ্য সেই আমি—দেহ হইতে, বেদনা (sensation) হইতে, সংস্কার হইতে, চৈতন্য হইতে বিভিন্ন হইবে—সেই সকল উপাদান, যাহা লইয়াই মানুষের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত। কেন না, এই সকল উপাদান অনিত্যধর্ম্মী। যেখান হইতে অস্থায়িত্ব ও দুঃখ বিদূরিত হইয়াছে, যেখানে সকলই সুনিশ্চিন্ত, যেখানে আমি-র আর পুনর্জন্ম হয় না, সে স্থান ছাড়া মুক্তি লাভের আর কোথাও সম্ভাবনা নাই।

বুদ্ধের মতে, ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ ধ্রুব সত্য যে, অহং কিংবা আত্মা কোন বিশেষ গুণ নহে।—"আত্মা কিংবা অহং-এর স্বরূপত কোন গুণ নাই। ব্যক্তি কোন গুণবিশেষ নহে।" "আমি অতীত কালে একটি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম" এই বাক্য যে বলিতেছে সে-ই "আমি" কিংবা অহং। এই আমি কিংবা অহং-ই ব্যক্তি। এই অহং কোন উপাধিও নহে, কোন গুণও নহে—কোন মহাভূতও নহে।" (৫১)

অবদান-শতক নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই মতটি ব্যক্ত হইয়াছে। জগতে কোন্ বস্তু নশ্বর এবং কোন্ বস্তু নশ্বর নহে,

—অবদান-শতকে ইহার একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে। তাহার সারাংশ এই :—রূপ, বেদনা, জ্ঞান, সংস্কার এসমস্তই নশ্বর-ধর্ম্মী; কেন না, এ সমস্ত অস্থায়ী; এবং যাহা কিছু অস্থায়ী তাহাই দুঃখময়। অতএব, যাহা কিছু অস্থায়ী, যাহা কিছু দুঃখের আধার, তাহা কখন শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরে নিম্নলিখিত ভাবটি উদ্রেক করিতে পারে না;—ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা। এই নিমিত্তই, রূপ বেদনা সংস্কারাদি 'আমি' কিংবা 'অহং' নহে। যাঁহার এইরূপ মত, তিনি রূপ, বেদনা সংস্কারাদিতে বিরক্ত, সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত হইতে আপনাকে বিযুক্ত করেন। ঐ সমস্ত হইতে একবার বিযুক্ত হইতে পারিলেই তিনি মুক্তি লাভ করেন, আর তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। তবে কোন্‌টি নশ্বরধর্ম্মী নহে?—সে হ'চ্ছে নির্ব্বাণ।

(ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলার শিল্প।

The people of Bengal had been used to tyranny, but had never lived under an oppression so farr-eaching in its effects, extending to every village market and every manufacturer's loom. They had been used to arbitrary acts from men in power, but had never suffered from a system which touched their trades, their occupations, there lives so closely. The springs of their industry were stopped, the sources of their wealth were dried up.

—*Economic History of British India R. C. Dutt.*

বঙ্গের শিল্প সম্ভারের জন্য বঙ্গবাসী একদিন সর্ব্বজয়ী ছিল; তাহাকে ম্যানচেষ্টারের মুখের দিকে চাহিতে হয় নাই। সেফিল্ডের অনুগ্রহও ভিক্ষা করিতে হয় নাই। বাংলার শিল্পেই অনেকাংশে ইংলণ্ডের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সে আজ কত দিনের কথা, তখনও উত্তমাশয় অন্তরীপ আবিষ্কৃত হয় নাই; সেই সময় হইতেই ভারতের তরণী ভারতের পণ্য বহিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করিত। ভারতবর্ষের সে বাণিজ্যকাহিনী এখন ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতে হয়। এখন ইতিহাস পাঠ করিয়া শিখিতে হয় যে ফিরিঙ্গিরা যখন প্রথমে মালবের উপকূলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহার অল্পকাল পরেই বাঙালী নাবিক তাহাদের জাহাজে

কার্য্য করিত।২ সেকালে চট্টগ্রামকে "পোর্টোগ্রাণ্ডি" বলিত! চৈনীক পরিব্রাজক বঙ্গদেশের জাহাজে আরোহণ করিয়াই ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনী এখন শুনিলে মনে হয় ইহা যেন স্বপ্ন, নতুবা বাংলার সে নৌশিল্প কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেল? সরকারী দপ্তর পাঠে যখন আমরা জানিতে পাই যে বাঙালী লস্করগণ যে জাহাজ লইয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিল, সে জাহাজ বার্মিংহাম হইতে আমদানী করা হয় নাই তখনই আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। তখনই মনে হয় সে অর্ণবপোত কোথায় গেল, সে শিল্পই বা কোথায় গেল, আর সে নাবিকের জাতিই বা এখন কোথায়?

ইংরাজ বাহাদুর এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সে অতি পুরাতন কথা যখন এ দেশের লস্করগণ ইংলণ্ডে যাইয়া ইংরাজ বোম্বেটে কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত এবং শেষে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে বিলাতের রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজ বাহাদুর আদেশ করিয়াছিলেন যে ভারতের লস্কর আর অর্ণবপোত লইয়া ইংলণ্ডে আসিতে পারিবে না। পাছে ইংরাজের কুচরিত্র-কাহিনী ভারতে রটিয়া যায়—পাছে ভারতবাসী প্রবাসী ইংরাজদিগকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ইহাই সেই নিষেধ আজ্ঞার অন্যতম কারণ বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃকই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে ভারতের নৌশিল্প ধ্বংস কামনা উক্ত আদেশের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ ছিল।

সেকালে হিন্দুগণ যে তরণী আরোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থে সে পরিচয় বিদ্যমান—হিন্দুর কাব্য-নাটকাদিতেও তাহার বর্ণনা রহিয়াছে, বাংলার সিংহল বিজয় কাহিনীর সহিতও সে বিস্তার পরিচয় বিজড়িত। সেই স্মৃতি জাগরিত রাখিবার জন্য আজ এতকাল পরে বঙ্গ-কবি মাতৃভূমিকে প্রণাম করিয়া ভক্তের মত গাহিয়াছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল
ভারত-সাগর ময়;
সন্তান যার তিব্বত চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ—
তার কিনা এই ধূলায় শয়ন
তার কিনা এই ছিন্ন বেশ?৩

বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনী অতিপুরাতন—বাংলায় জাপানে উপনিবেশ স্থাপন কাহিনীও তদ্রূপ। সম্রাট আকবরের শাসনকাল ত অধিক দিনের কথা নহে। সে সময়েও বাংলায় নৌশিল্প ছিল। অধিক দিনের কথা নহে, বাংলার শেষবীর

২ Portuguese in India—Danver

cf "In that year (1517) John de Sieveira, who had been sent to the Maldives to obtain permission to build a fort, while returning to Goa with four sail, seized two vessels...... ...This high-handed act did not pass unnoticed by a member of his creed, described as "a young Bengalian."—Ralph Fitch, by J. Horton Ryley, 1899.

৩ আমার দেশ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্রতাপাদিত্যেরও রণতরী ছিল—সে সকল তরণী হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠিত; মোগল সেনাপতিকুল সেই গর্জ্জন শুনিয়াছিলেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময়েও বাঙালীর নৌবিদ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর এমন দিন আসিয়াছিল যখন ঢাকায়, পাটনায় এবং চট্টগ্রামে জাহাজ নির্ম্মিত হইত—সে সকল জাহাজ বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ছিল। তাহারা ওক কাষ্ঠের ছিল না—এ দেশীয় শেগুণ কাষ্ঠেই নির্ম্মিত হইত; ওক কাষ্ঠকে পরাজিত করিয়া শেগুণ কাষ্ঠ তরঙ্গে ও তুফানে, সাগরে ও সমরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই সকল অর্ণবপোত যখন বাংলার বন্দর হইতে বাংলার তাঁতের বসন লইয়া, বাঙালীর রেশম ও মস্‌লিন বহিয়া, বাংলার কার্পাস বোঝাই করিয়া ইউরোপের অর্থ এ দেশে আনিবার জন্য বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিত, সে দৃশ্য না জানি কত সুন্দর, কত চিত্তসুখকর, কত গৌরবেরই ছিল!

ব্যাপারী ইংরাজ বাঙালীকে তাহার সকল সৌভাগ্যের ন্যায় সে সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিল। কোম্পানী বাহাদুর হয়ত প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই তাই নিজেদের আবশ্যকীয় অর্ণবযান বাংলায় প্রস্তুত করাইতেন; কিন্তু বিলাতের বণিকবৃন্দ অনেক হৈ চৈ করিয়া, অনেক লেখা-পড়া করিয়া শেষে সমস্তই বন্ধ করিয়া দিল। লণ্ডন, লিভারপুল, বার্মিংহাম্ প্রভৃতি সমস্বরে রোদন করিয়া উঠিল দেখিয়া ইংরাজ কর্ত্তাগণ স্থির করিলেন—আর নহে, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন হইতে ভারতবর্ষের মাল মসলা দিয়া বিলাতে জাহাজ প্রস্তুত হউক। বাংলার নৌশিল্প সেই দিন হইতে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গেল।

কোম্পানী বাহাদুরের আমলেও বাংলার প্রতি জেলায় নানাবিধ শিল্প উন্নত অবস্থায় ছিল। বঙ্গ-বিধবাগণ এবং নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ তখন চরকার সাহায্যে সূতা কাটিয়া বাংলার বিপণি পূর্ণ করিয়া দিত, চরকার দ্বারাই তাহারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।[৪] চরকার সেই গ্রাম্য গান—

'চরকা আমার সোয়ামী পুত রে—
চরকা আমার নাতি,
চরকা'র দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি রে—

এখনও গ্রাম্য কর্ণনাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; এখনও স্মরণ করাইয়া দেয় যে এ দেশে যখন বিলাতী সূতা প্রচলন করিবার আবশ্যক হইল তখন কোম্পানী বাহাদুরের চরকা-ভীতি ঘটিল। চরকার গান এত কাল পরেও মনে করাইয়া দেয় যে কোম্পানী বাহাদুরের সেই চরকা-ভীতি এতই প্রবল হইয়াছিল যে প্রথমে উহার উপর একটা কর বসিয়াছিল।[৫] শুধু কর বসাইয়াই তাঁহারা নিরস্ত হন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহারা বাংলার চরকা-গুলি ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর লোক আসিতেছে শুনিলেই গ্রামবাসিনীরা তখন আপন আপন চরকা

৪ পূর্ণিয়ায় ৩লক্ষ টাকার কার্পাসে ১৩ লক্ষ টাকার সূতা প্রস্তুত হইত।

৫ India in Victorian age.

কূপ বা পুষ্করিণী মধ্যে নিক্ষেপ করিত—কেহ কেহ বা তাহাদের অগ্নি-সংকার করিয়া নিশ্চিন্ত হইত।

বাংলায় তখন এমন স্থানও ছিল যেখানে শুধু ঠক্‌ঠকি তাঁতেও বার্ষিক ৫ লক্ষ মুদ্রারও অধিক আয় হইত।৬ তখন কাগজ, গন্ধদ্রব্য, তৈল, ময়দা, লবণ, সূতা, রেশম, তামাক, তুলা, পাট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বাংলার বিপণিতে সজ্জিত থাকিত। সূক্ষ্ম মস্‌লিন হইতে আরম্ভ করিয়া তসর, গরদ, ধুতি, শাড়ী, গামছা পর্য্যন্ত বাংলার তাঁতে প্রস্তুত হইত—বাঙালির হাটে রাজত্ব করিত—বাঙ্গালির কাছে পূজা পাইত। কোম্পানী বাহাদুর তন্তুবায়দিগকে দাদন দিতে চাহিলেন; তাহারা প্রথমে উহা লইতে অস্বীকৃত হইয়া চাবুক খাইল, শেষে স্বহস্তে নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বলি দিয়া দাদনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। রেশম-শিল্পের সংকার হইল।৭ ইংরাজ-বণিক নিশ্চিত হইলেন!

এত অত্যাচারেও বঙ্গের শিল্প একেবারে মরিয়া গেল না। কোম্পানী বাহাদুর তখন এ দেশের পণ্য-সম্ভারের উপর অতি গুরু শুল্ক-ভার স্থাপন করিয়া বিলাতি পণ্যকে মাশুল মুক্ত করিয়া দিলেন!৮

বাঙ্গালার হরি তন্তুবায়ের বস্ত্রের উপর তখন শতকরা ৭০৲ হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত কর ধার্য্য হইল এবং বিলাতের বস্ত্র বিনা শুল্কে বাংলার বাজারে বসিয়া বাঙালীর মাতৃশ্রাদ্ধের উদ্যোগ করিল!৯ বাংলার রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র আর বিলাতে যাইতে পারিল না—রাজবিধি উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বাংলার শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া বিলাতের ডিরেক্টার সভা কোম্পানী বাহাদুরকে ডাকিয়া কহিলেন—বঙ্গের রেশমশিল্প লুপ্ত করিতেই হইবে, সুতরাং শিল্পিদিগকে আর স্বাধীনভাবে রেশমের ব্যবসায় করিতে দিও না। কোম্পানীর শিল্পশালায় আসিয়া উহারা কোম্পানীর জন্যই পট্টবস্ত্র বয়ন করুক। ইহাতে যদি কেহ

৬ পূর্ণিয়া।

৭ Consideration on Indian affairs—Bolts

৮ British goods were forced upon her (India) without paying any duty and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contested on equal terms.—Mill's History of British India.

৯ বাঙ্গালী আজ স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বিলাতে এতকাল পরে কোম্পানী বাহাদুরের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে! ভারতবাসী "নানা কারণে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিলাতী দ্রব্যের আমদানি দিন দিন হ্রাস হইতেছে, সুতরাং বিলাতী শ্রমজীবীদের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাসগো নগরে ৫৬ হাজার শ্রমজীবী বেকার অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে! তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে। বার্ম্মিংহামের ১০ হাজার শ্রমজীবীর কাজ গিয়াছে। লিভারপুলের ২০ হাজার শ্রমজীবী কর্ম্মচ্যুত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হওয়াতে প্রায় ১২ লক্ষ লোক নিঃসম্বল হইয়াছে।"

সঞ্জীবনী, ১৫ আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।

আপত্তি করে তবে তাহাকে দণ্ডিত করিতে কুণ্ঠিত হইও না।১০

ইহাতেও বাংলার শিল্প জীবিত থাকিল! কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে তখন অনেক টক্র, পিক্র, গোমীষ প্রভৃতি ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিলাতের বাজার তখন বাংলায় আসিয়া বসিল—আর বাঙালীর হাট কর্ম্মনাশায় ও ভাগীরথী মধ্যে ডুবিয়া গেল। শুধু বাংলায় নহে—ভারতীয় পণ্য সম্ভারের উপর তখন অন্তর্বাণিজ্য কর সংস্থাপিত হইয়া বাংলার বস্ত্র, বাঙালীর চিনি, বাংলার তুলা, বাঙালীর তামাক প্রভৃতি দ্বিশতাধিক পণ্য নিতান্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিল! বাঙালী ষষ্ঠি বৎসর ধরিয়া সেই অতি গুরুকরভার বহন করিয়াছিল। হরিনাথ তাঁতি ও রমানাথ কর্ম্মকার সেই করের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আপন আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল এবং ইংরাজের বেসাতি শিরে তুলিয়া বাংলার হাটে, ঘাটে, মাঠে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেফিল্ড এবং ম্যানচেষ্টার যে প্রবেশ পথ পাইয়াছিল সেই সুড়ঙ্গ মুখে তাহারা ক্রমে নানাবিধ বিস্ফোরক লাগাইয়া যাবতীয় বাধা বন্ধ ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুদ্র প্রবেশপথ তখন ধীরে ধীরে সুমার্জ্জিত সরল সহজ রাজপথে পরিণত হইয়া ইংরাজের বিজয় কীর্ত্তির অনন্তকালস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বাংলার এবং ভারতের বক্ষের উপর শোভা পাইতে লাগিল। ভারতবন্ধু ডিগ্‌বী মহাশয় তাই দৈববাণী করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ধনেই ইংলণ্ড সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে; সে ধন ভারতবাসীগণ স্বেচ্ছায় ইংলণ্ডকে প্রদান করে নাই—উহা বৈদেশিকদিগের শক্তি এবং কৌশলবলেই আহৃত হইয়াছে।১১

অত্যাচার বহুদিন পূর্ব্বেই বাঙালীকে চক্ষুদান করিয়াছিল কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর বোধ হয় বাঙালীচরিত্র বুঝিতে পারেন নাই। যদি পারিতেন তাহা হইলে ভান্‌সিটার্ট সাহেব হয়ত কলিকাতা কৌন্সীলকে বলিতেন না—

'আমি পূর্ব্বাপরই বিবেচনা করিয়া আসিতেছি, যাহাতে বাংলার প্রত্যেক লোকই আমাদের শত্রু হইয়া না উঠে সে জন্য আমাদের কার্য্যকলাপের উপর একটা আবরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কোম্পানীর শক্তিসাহায্যে আবরণকুশলতায় এবং আমাদের বণিকদের অত্যাচারে বাঙালী জাতি নিতান্তই উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের শাণিত তীব্র ছুরি যে তাহাদের মেদ-মাংস-মজ্জা কাটিয়া একেবারে অস্থি স্পর্শ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া পাছে, বাঙালী নিতান্ত মরিয়া হইয়া উঠে ইহাই আমার আশঙ্কা ছিল। যদি হঠাৎ বাতাস ভিন্ন দিকে বহিতে আরম্ভ করে, যদি বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা হইলে তখন কি হইবে? আপনারা কি ইহাই ইচ্ছা করেন যে বাংলার প্রত্যেক

10 London Despatch—17 March 1769.

11 Modern England has been made great by Indian wealth, wealth never preferred by its possessors, but always taken by the might or skill of the stranger—Prosperous British India—Digby.

লোকেই আপনাদের চিরশত্রু হইয়া উঠুক?' ১২.

ভান্‌সিটার্টের আত্মা শান্তি লাভ করুক—বাংলার অশ্রু শুকাইবার নহে। বঙ্গ-কবির বিষাদের গান চির দিন কাঁদিয়া কহিবে—

'তুরঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে;
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।'

যদি তাহাই না হইবে তবে কি কোম্পানী বাহাদুরের স্বদেশীয় ঐতিহাসিক পর্য্যন্ত বলিতেন যে, যখন তিন কোটী বঙ্গবাসী নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া গেল, তখন বাণিজ্য-লব্ধ ধনে কোম্পানী বাহাদুরের কলিকাতা পূর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী কোম্পানীর পূর্ব্বে অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন অত্যাচার কোনো দিনও আর সহে নাই!১৩

আমরা কোম্পানী বাহাদুরের ইতিহাস লিখিতে বসিলেই সর্ব্বদা শুধু তাঁহাদিগকেই দোষের ভাগী করিয়া থাকি। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে আমরাই আমাদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছি, আমরাই কোম্পানী বাহাদুরকে যেরূপে অত্যাচার করিতে শিখাইয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিলে প্রতি বাঙালীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। আমাদের ছিদাম বিশ্বাস, গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিংহ, রেজাখাঁ প্রভৃতি যে পাপ করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাঙালীর অনেক দিন লাগিবে।

কোম্পানীর দাদন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা অথবা কোম্পানীর নিকটে পণ্যাদি বিক্রয় না করিয়া অন্যের নিকট বিক্রয় করা ন্যায় ও ধর্ম্মের চক্ষে অপরাধ না হইলেও কোম্পানী বাহাদুরের নিকট অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত। কিন্তু সেই অপরাধের জন্য হরি তন্তুবায়ের স্ত্রী ও রামধনের পুত্রবধূ যে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার জন্য শুধু কি কোম্পানী বাহাদুরই দায়ী, না আমরাও দায়ী?

বাঙালী ছিদাম বিশ্বাস তখন আরও অনেকের ন্যায় কোম্পানীর পাদুকা লেহন করিত এবং তন্তুবায়দিগকে নিগৃহীত করিয়া বাধ্য করিবার জন্য প্রতিদিন নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিত! সে সকল ঘৃণিত কলুষিত বীভৎস কাহিনী লিখিয়া আমি নিজেকে আর পাপলিপ্ত করিতে চাহি না। ছিদাম কোম্পানীবাহাদুরের প্রাণপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু গুপ্ত ঘাতকের শাণিত ছুরি যে দিন ছিদামের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়াছিল কোম্পানীর ফৌজ সে দিন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই! কোম্পানী বাহাদুর যদিও ছিদামের মৃত্যুতে ক্ষুভিত হইয়া কহিয়াছিলেন—'বাংলা এত দিনে তাহার একমাত্র হিতৈষী বন্ধুকে

12 Seir Mutaqherin—vol iii.

13 Enormous fortune were thus rapidly accumulated at Calcutta, while thirty millions of human beings were reduced to the extremity of wretchedness. They had been accustomed to live under tyranny, but never under tyranny like this.—Lord Macaulay.

হারাইল'১৪ কিন্তু সেই কোম্পানী বাহাদুরের ইতিহাসই কহিয়া দিতেছে—'তন্তুবায়দিগের উপর নিত্য যে সকল নূতন নূতন দণ্ড বিধান করা হইতেছে, তাহাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের উপর যে নূতন নূতন অত্যাচার হইতেছে বাবু ছিদাম চন্দ্র বিশ্বাসই সে সমুদায় আবিষ্কার করিতেন।'১৫

শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা।

ভাষাতত্ত্ব।

(১) পাঞ্চস্বর।

রাজভাষায় দীক্ষালাভের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি Rowe's Hints এ পড়িয়াছি প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে প্রথমে (definition) সূত্র ধরিয়া আরম্ভ করিতে হয়, এবং সূত্রপ্রান্তস্থ বড়শীদ্বারা মানসসরোবর হইতে ভাবশফরী-গুলি ক্রমশঃ টানিয়া তুলিতে হয়। ভাল, সেই পথই ধরা যাউক। 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয় ভাষা-তত্ত্ব। প্রথম দেখিতে হইবে 'ভাষা' কাহাকে বলে? যাহা ভাসে তাহাই ভাষা;* মনটা একটা সমুদ্রবিশেষ, গভীর ভাব-সলিলে কানায় কানায় ভরা; সেই ভাবসমুদ্রে জোয়ার লাগিলে যাহা ভাসিয়া বেড়ায় তাহাই ভাষা। ফলতঃ ভাসা ভাসা জিনিস লইয়াই ভাষা, ভিতরকার গভীরতত্ত্ব কখনও মুখ ফুটিয়া ভাষায় প্রকাশ হয় না। ইহাই একটু ঘোরালো করিয়া সাহিত্যের ভাষায় বলিলে এইরূপ দাঁড়ায় 'ভাবসাগরের ফেনিল ঊর্ম্মিমালা কবিতা ও ভাবসরসীর ফুল্ল শতদল কাব্য।' এইত গেল ভাষার স্বরূপনির্ণয়। তাহার পর 'তত্ত্ব'; যাহা 'তাহা' তাহাই সাধুভাষায় 'তত্ত্ব'; অর্থাৎ সূত্র দাঁড়াইল এই:—that that that that is is তত্ত্ব। এখন দুইটি কথা এক করিয়া হইল 'ভাষা-তত্ত্ব'; একপদীকরণং সমাসঃ।

ভাষাতত্ত্ব অনধিকারীর পক্ষে গীতাতত্ত্ব ও একাদশীতত্ত্বের ন্যায় শুষ্ক নীরস কেন না ইহাতে কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, শরীর অবশ হয়, সীদন্তি সর্ব্বগাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। কিন্তু অধিকারীর নিকট ইহা উদ্বাহতত্ত্বের ন্যায় সরস-রসাল পেলব-কোমল, অথবা ভঙ্গান্তরে বলিতে গেলে, নবজামাতার বাটীতে প্রেরিত তত্ত্বের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী।

ভাষা বাক্য লইয়া, বাক্য পদ লইয়া, পদ অক্ষর লইয়া। সুতরাং ভাষাতত্ত্বে অক্ষরের স্থান বিজ্ঞানতত্ত্বে পরমাণুর ন্যায়। অতএব আলোচনা করিতে হইলে অক্ষর লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। বৈয়াকরণসম্প্রদায়ের

14 In him (Sidam Biswas) Bengal has lost its only patriot.—Resolution of the council 6th January, 1764.

15 Different methods of punishment which are now being inflicted upon the weavers themselves, as well as upon their wives and daughters, were planned, devised and invented by Babu Sidamchandra Biswas—Official despatch, Kasimbazar.27th December, 1763.

* কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাঠকগণ 'ষ' 'স' এর গোল হইয়াছে বলিয়া একটা কোলাহল তুলিবেন। বাস্তবিক বাংলা ভাষার একটা বই 'স' নাই-তাহা পরে বুঝাইব।

প্রথাও তাহাই। ‘অক্ষর’ কাহাকে বলে? যাহা নিত্য, যাহার ধ্বংস নাই, তাহাই ‘অক্ষর’—তা সে শ্রীরামপুরের কাঠে গড়াই হউক আর সীসায় ঢালায়ই হউক; কেন না শব্দ নিত্য, শব্দই ব্রহ্ম। এ কথা খোলসা করিয়া বুঝাইতে হইলে মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে লেক্‌চর দিতে হয়। সে ভার গুরুমীমাংসকগণের মস্তকে চাপাইয়া আমরা অন্যান্য তত্ত্ব উদ্ঘাটন করি।

বাঙ্গলাভাষার-অক্ষরসংখ্যা লইয়া অনেক দিন হইতে গোলযোগ চলিতেছে। মীমাংসা সুদূরবর্ত্তিনী। তবে আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতেছি। সিদ্ধান্তের ভার আপনাদের উপর। প্রথম, স্বর ধরুন। কেহবা বারো, কেহ বা তেরো, কেহ বা চৌদ্দর পক্ষপাতী; ভয় নাই, আপনারা সম্মতিসঙ্কটে পড়িবেন না। চান্দ্রমতে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ; সৌরমতে ৠ ৡ মলমাস হিসাবে পরিত্যক্ত। কেহ কেহ তন্ত্রশাস্ত্রের ও ভারতচন্দ্রের দোহাই দিয়া ঐ স্বর দুইটিকে বজায় রাখিতে চাহেন। কি লজ্জা! তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবীচক্রের কথা আছে, ভারতচন্দ্রে বিদ্যাসুন্দরের কথা আছে, সুতরাং উভয়ই ঘোর অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ; কাজেই এই কারণেইত ৠ ৡ ভদ্র সমাজ হইতে তাড়িত হওয়া উচিত। বাকী দ্বাদশটীর দাবী দাওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রণালীতে খারিজ দাখিল করিব।

দীর্ঘ ৠ দীর্ঘ ৡ গেল, হ্রস্ব ঋ হ্রস্ব ঌ ও যাওয়াই ভাল। দেখুন, ওদুটার কদাকার চেহারার উপর আমার ছেলেবেলা হইতে রাগ আছে। দেখিলেই গা রি রি করে (তানপূরা সাধিতেছি না); যখন উহাদের কায ‘রি’ ‘লি’ দ্বারা অনায়াসে চলে তখন ওদুটাকে সুধু সুধু ভাতকাপড় দিয়া পোষা কেন? স্বীবামুন দ্বারা যখন সংসার বেশ চলে তখন আর খামখা মাকে ঠাকুমাকে পোষা কেন? এ সব মান্ধাতার আমলের কিম্ভূতকিমাকার mammoth, mastodon, megatherium হালের পৃথিবী হইতে লোপ পাওয়াই ভাল। যাক্ ওদুটাত খসল। ‘কৈ হইল কুড়ি কৈ হইল কুড়ি’ ইত্যাদি ছড়া মনে পড়ে ত?

তার পর হ্রস্ব দীর্ঘর পালা। একদিন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঐ লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। তাঁহার ফরমাএশ হইল, সব সময়ে বারো হাত কাপড়ে চলেনা, গৃহস্থালীর কাযকর্ম্মের সময় একযোড়া খাটো কাপড়ের প্রয়োজন। শুনিয়া বড় রাগ হইল, খাটো কাপড় পরিবে মা ভগিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনীর অঙ্গে কি তাহা শোভা পায়? গৃহিণীকে অনেক বুঝাইলাম, ছোট কখনও বড় হয় না, কিন্তু বড় কাপড়ও সময় বিশেষে খাটো করিয়া পরা যায়, তবে এ আব্দার কেন?’ ইহাকেই বলে law of parsimony। ব্রাহ্মণী বুঝিলেন কিনা বুঝিলাম না, কেন না তাঁহার বুদ্ধিটা Newton * এর মতই সূক্ষ্ম। হ্রস্ব দীর্ঘর বেলায়ও সেই

* কথিত আছে Newton এর দুইটি পোষা বিড়াল ছিল। তিনি তাহাদের বসবাসের জন্য একটি কাঠের বাক্স করিয়া দিয়াছিলেন এবং বড় বিড়ালটির প্রবেশের জন্য একটি বড় ছিদ্র ও ছোটটির জন্য একটি ছোট ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন। ছোটটিও যে বড় ছিদ্র দিয়া যাতায়াত করিতে পারে এ বুদ্ধি তাঁহার ঘটে আসে নাই।

কথা; এক প্রস্থতেই বেশ চলিয়া যায়, মহ আস্‌বাব বাড়ানর দরকার কি? আর এক কথা, হ্রস্ব দীর্ঘ যেন দুই প্রস্থ থাকিল, প্লুতের বেলায় কি করিবেন? তখন কি আবার 'তেসরা নম্বর' হাজির করিবেন? আপনারা সকলেই নিরুত্তর। মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ধরিয়া লইতে পারি। ফলতঃ অধিকাংশ লোকেরই যখন হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান নাই, তখন অনর্থক বহ্বাড়ম্বর কেন? এ যে শিরোনাস্তি শিরোব্যথা!

ঐ=অই, ঔ=অউ; তখন আর ও দুইটা ভিড় বাড়ায় কেন?

ঐ যাঃ, করিয়াছি কি? Rowes Hints বহুকাল অভ্যাস নাই, বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। প্রবন্ধ (essay) লিখিতে গেলে যে বিষয়টির পৌর্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া চালতে হয়, আমি তাহা সাফ ভুলিয়া গিয়াছি! এখানে একটা ওখানে একটা অক্ষর ধরিতেছি আর টিপিয়া মারিতেছি। শৃঙ্খলার (method) ব্যতিক্রমের জন্য নম্বর কাটা যাইবে। যাক্, Better late than never, এখন সাম্‌লাইয়া লই।

স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ'; ইহার উচ্চারণ লইয়া বিষম গোল, ইহাকেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলদ বা সাধুভাষায় স্বস্তিবাচনে প্রমাদ। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ নাকি 'বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জল' সহেনা, তাই পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। এ দেশে সাধারণতঃ ইহার তিনটি উচ্চারণ শুনা যায়।

(১) প্রথমটি অনুচ্চারিত, তথাপি তাহাকেও উচ্চারণ বলিতে হইবে, কেন না বৈশেষিকমতে অভাবও একটা পদার্থ। উদাহরণ, সকল বর্ণের অভাব যে কৃষ্ণ প্রমাণ যথা—মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে) তাহাকেও কৃষ্ণবর্ণ বলি। সেই রকম, ছল, বল, কল, কৌশল, এই সকল স্থল

(২) দ্বিতীয় উচ্চারণ বিকৃত কিন্তু অত্যন্ত প্রচলিত (বাজারের সব মালই আজ কাল যে ভেজালমিশান), এই উচ্চারণ ওকারের সহিত অভিন্ন। যথা নরম, গরম, হজম। রকম সকম, শরৎ, ভুবন, কাগজ, কলম, 'অ' এর এই উচ্চারণ বর্ত্তমান থাকাতে ওকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন দেখি না। যখন উভয়ে ভাগবাটওয়ারা করিয়া কাজ করিবেনা তখন জ্যেষ্ঠাধিকারই বলবান্ থাকুক্। 'ও'র জবাব হইল।

(৩) তৃতীয় উচ্চারণ স্বাভাবিক কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনের ন্যায় ইঁহাকে স্বভাবে পাওয়া দায়। যথা, দশা, কলা, গলা, চলা।

এইখানে বলিয়া রাখি, অ ও য় অভিন্ন, আ ও য়া অভিন্ন। করিয়াছে, চলিয়াছে, প্রভৃতি পদ করিআছে চলিআছে হইবে। ইংরাজীর নজীর রহিয়াছে, are doing, are going; ইংরাজীর নজীর অকাট্য। যদি বলেন, ইংরাজী নজীর মিলিলনা, ইংরাজী ধাতুরূপটা progressive আর আমাদেরটা present perfect। সেত হইবেই, উহারা যে progressive race; আর আমাদের সব অতীত, তবে আজও ফলভোগ করিতেছি, ইহাই present perfect এর লক্ষণ। কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, করি আছে হইলে সন্ধি হইয়া কর্য্যাছে হইত, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন খাঁটি বাঙ্গালায় সন্ধি নাই (আমরা যে সকলেই

এক এক মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ); থাকিলে 'সই' সে হইত, 'রাই' রে হইত, 'ধাই' ধে হইত, হাইকোর্ট হে কোর্টে পরিণত হইত।

অ নিজে গোলমেলে লোক বলিয়া অপরের বেলায়ও বিঘ্ন ঘটায়, যেন ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী। তাঁহার কৃপায় কায অকায হইয়া উঠে, বেলা অবেলা হইয়া পড়ে, কাল অকাল হইয়া যায়, কুষ্মাণ্ডও ধরে।

এখন বাকী রহিল, অ, আ, ই, উ, এ 'অ'র স্বত্ব সাব্যস্থ হইয়াছে, অতএব তাহার license renew করা হউক। বাকী কয়েকজনের পাট্টা বা চিঠার অনুসন্ধান করা যাউক। এবার ব্যতিরেক মুখেপ্রমাণ দিব (ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্রথম পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞা)।

মুখবন্ধে বলিয়া রাখি, আকার সকল পদার্থেরই আছে, নিরাকারেরও আকার আছে—বানানে ধরা পড়ে। অতএব আকার ছাড়া যায় না।

সিম্সন্ ও প্লেফেয়ারের প্রমাণ—আকার না থাকিলে ঘটঘাট চেনা যাইবে না, নগরী নাগরী চেনা যাইবে না, ধোপার পাট ও চিত্রকরের পটে প্রভেদ থাকিবে না, গালগলা গলগল করিবে, পাপীকে puppy জ্ঞান হইবে (যথা বৈদান্তিকমতে রজ্জুকে সর্পজ্ঞান), বাবা Bob হইবেন (বড় বাকী নাই)।

'আ' না থাকিলে মধুমাখা 'মা' বুলি আর শুনিতে পাইব না, 'বাবা', 'দাদা', 'কাকা', 'মামা', 'শালা' প্রভৃতি প্রীতিকর সম্পর্ক উঠিয়া যাইবে।

অতএব 'আ'র স্বত্ব বাহাল রহিল।

এবার 'ই'। ইকার না থাকিলে শিশু হি হি করিয়া হাসিবেনা, প্রৌঢ়ের ন্যায় হা হা করিয়া বা যুবার ন্যায় হো হো করিয়া হাসিবে, কিশোরী খিল খিল করিয়া না হাসিয়া প্রেতিনীর ন্যায় খলখল করিয়া হাসিবে, প্রেমিকপ্রেমিকা ফিস্ ফিস্ করিয়া পীরিতির কাহিনী কহিবে না, বীণাবিনিন্দিত রমণী-বাণীর ধ্বনি শুনিতে পাইব না। আবার দেখুন, ইকার না থাকিলে ঘি চিনি মিছরি রুটি লুচি কচুরি নিমকি সিঙ্গারা মিহিদানা মতিচুর মিঠাই মিঠান্ন সব চুলায় যাইবে, থাকিবে কেবল ডালভাত; ব্রাণ্ডী হুইস্কি শেরি শ্যাম্পেন সিদ্ধি আফিম জাহান্নমে যাইবে, থাকিবে কেবল তামাক আর গাঁজা; বঙ্গবাসী সঞ্জীবনী হিতবাদী বসুমতী থাকিবে না, থাকিবে কেবল নায়ক; বেঙ্গলি মিরার পত্রিকা পেট্রিয়ট থাকিবে না, থাকিবে কেবল ষ্টেট্স্‌ম্যান ও নেশান। শিক্ষাবিভাগের লোপ হইবে, শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করিবে না, বিচারালয়ে উকীল হাকিম জুরী আপীল ডিক্রী ডিস্‌মিস্ ছানির বিচার সব উঠিয়া যাইবে, ডাকবিভাগে পিয়ন চিঠিবিলি করিবে না, ইন্‌সিওর রেজিষ্টারি হুণ্ডি টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কিছুই থাকিবে না, টিকিট বিক্রি হইবে না, বেয়ারিং চিঠিও চলিবে না। আরও অনেক বিভ্রাট্ ঘটিবে। হাকিম থাকিবে না হুকুম থাকিবে, তামিল থাকিবে না তেলুগু থাকিবে, তহবিল থাকিবে না তছরূপ থাকিবে।

অতএব ইকার বাহাল রহিল, তবে দীর্ঘটি ছাড়িতে হইবে, দেখিলেই ঈগল পাখী মনে পড়ে।

এবার উকারের পালা। উকার না

থাকিলে শিশু উঁ উঁ করিয়া কাঁদিবে না আর তাহার প্রসূতি ঘুম হইতে উঠিয়া মুখে চুমু দিবে না (কাহার ?)। কচু কচ কচ করিবে, ফুল ফল হইবে, মধু মদে, কলু কলে পরিণত হইবে (হচ্চেও তাই), পুরুষ পরশপাথর হইয়া যাইবে, ঘুঘু সব পায়রা হইয়া যাইবে, চুলোয় চলো হইয়া পড়িবে, ঘামাচি কুট কুট না করিয়া ফোড়ার মত কটকট করিবে, ভূমিতে দূর্ব্বা গজাইবে না, মরুতে উট চলিবে না।

অতএব উকারও বাহাল রহিল। তবে দীর্ঘটিকে সচিত্র বর্ণপরিচয়ে ফাঁসিকাঠে লট্‌কান হইয়াছে, আমরা ও সেই হুকুম মকুব করিতে পারিব না।

পরিশেষে একারের পালা। এ না থাকিলে যে সে লোকের সঙ্গে কথা বলা চলিবে না, যেখানে সেখানে যাওয়া চলিবে না, কে রে হে বলিয়া ডাকা চলিবে না।

এর আর এক উচ্চারণ অ্যা ; কেমন লাগ্‌ল, কেন ভাল লাগ্‌ল, জিজ্ঞাসা করিতে পাইব না। অতএব 'এ' কেও বাহাল রাখা গেল।

এখন বাদসাদ দিয়া এই পঞ্চস্বর দাঁড়াইল, —অ, আ, ই, উ, এ

বাঙ্গালাভাষায় পাচটির বেশী স্বর হওয়া উচিত নহে, কেন না ইংরাজী ভাষায় ইহার বেশী নাই। যাহা ইংরাজী তাহাই ভাল এবং তাহাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এ কথা যদি কেহ অস্বীকার করেন তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি রাজদ্রোহী। আর এক কথা। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন হিন্দুসমাজে তেত্রিশ কোটি দেবতার চাপে কেহ মাথা তুলিতে পারে না, ছত্রিশ জাতির গোলমালে জাতীয় একতার পথে বিঘ্ন ঘটে। য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সব 'একাকার হইয়াছে এবং তাহারা একেশ্বরবাদী। সুতরাং তাহারা সভ্য ও সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করিয়াছে। অতএব প্রমাণ হইল যে বর্ণ-মালায়ও অক্ষরসংখ্যা যত কমিবে ততই জাতীয় উন্নতির পথ প্রসারিত হইবে। য়ুরোপীয় বর্ণমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা আপনারা প্রণিধান করিতে পারিবেন।

তবে যদি এই স্বদেশীর দিনে বৈদেশিক অনুকরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দেন, তবে সেখানেও দেখুন :—

পাঁচের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। পঞ্চভূতে আমাদের দেহ নির্ম্মিত, পঞ্চগব্যে শুদ্ধিলাভ হয়, গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ করিতে হয়, পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়াছেন, তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামের পঞ্চক্রোশী পবিত্র, রাসপঞ্চাধ্যায় বৈষ্ণবের চক্ষে ও পঞ্চমকার শাক্তের চক্ষে পরমপবিত্র, পঞ্চবটীবনে রামসীতা বাস করিয়াছিলেন, পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধঘোষণা হইয়াছিল। আরও দেখুন কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষার গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র প্রধান, হাস্যরসে ইংরাজী Punch ও বাঙ্গলা পঞ্চানন্দ অদ্বিতীয়, সাহিত্যের আসরে পাঁচফুলের সাজি বরণীয়, তালের মধ্যে পঞ্চমসোয়ারী জাঁকালো, মশলার মধ্যে পাঁচ ফোরণ ঝাঁঝাল।

অতএব আশা করি, আমার এই পঞ্চস্বর

মদনের পঞ্চশরের ন্যায় (পঞ্চমস্বর না হইলেও কোকিলের সঙ্গে লেখকের অনুরূপ সাদৃশ্য আছে) শিশুদিগের মাতাপিতার হৃদয়ে আমূল প্রোথিত হইবে। *

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শূন্য পুরাণ।

(সমালোচনা)

শূন্যপুরাণ—৺রমাই পণ্ডিত প্রণীত, নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক টিপ্পনী ও গ্রন্থকারের জীবনী সহ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত।

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চ্চা হইতেই বাংলা ভাষার পুরাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত কাব্য হইলেও বাংলার একখানি মূল গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; আর বিদ্যাপতি মৈথিল হইলেও, তাঁহার পদাবলি বাঙালির ও বাংলা ভাষার আদরের ধন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। বিশেষ বাঙালির মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্য দেব যখন বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন, তখন বিদ্যাপতি যে সকলের আদরের বস্তু তাহাতে সন্দেহ কি? তাহার পর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্লাবনে বাংলা ভাষার শক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে, সে ভাষা যে নবজীবন লাভ করে, তাহাও বেশ বুঝা যায়। শ্রীচৈতন্য-প্রাণ পদাবলি ও গ্রন্থাদি সকলেই আলোচনা করিতে থাকেন। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমাদর বাংলায় ছিল; তবে কৃত্তিবাস যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক একথা অনেকেই জানিতেন না ও মানিতেন না। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা ঘটক দিগের কারিকা হইতে দেখাইয়া দেন। এখন বুঝা গিয়াছে যে কৃত্তিবাস প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বের লোক। এই সকলই বৈষ্ণব গ্রন্থ; চণ্ডী মঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল শাক্ত গ্রন্থ। বাংলা ভাষায়, পুরা হৌক, আংশিক হৌক, কোনরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থ যে আছে, একথা পূর্ব্বে কেহ জানিত না ভাবিত না। বিংশতি বৎসর মধ্যে এই কথাটা প্রচারিত হইয়াছে। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু যখন ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশ করেন, তখনও তিনি একথার ইঙ্গিতও করেন নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাতৃভাষার সেবায় ধন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, এই তিন মহাত্মা বাংলা ভাষায় প্রচ্ছন্ন সুপ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-বাদ থাকার কথা প্রচার করিয়াছেন।

আমাদের সম্মুখস্থ শূন্য পুরাণ, সেই প্রচারের আপাতত শেষ ফল। গ্রন্থের মুখবন্ধে ১৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের

* পূর্ণিমাম্মিলন উপলক্ষে পঠিত। বারান্তরে বাঞ্জনবর্ণ আলোচিত হইবে।

পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল কথার সম্যক্ সমালোচনা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবে না, আমি সাধারণ পাঠকের জন্য আয়াস পাইতেছি মাত্র। পণ্ডিত পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন। মোটামুটী দুই চারিটি কথায় বৌদ্ধ বাদ ধরা যায় :—(১) আদি দেবের কথা বা সৃষ্টি তত্ত্বে (২) পূজার পদ্ধতিতে (৩) পূজাকর পরিচয়ে। সৃষ্টি তত্ত্বে শূন্য হইতে আরম্ভ; আদি, অনাদি বা ধর্ম্ম বলিয়া এক দেবতা এ ধর্ম্ম আমাদের বমায় ধর্ম্মরাজায় সে ধর্ম্ম নহেন। পদ্ধতিতে 'দ্বার মোচন' 'চপা পাক'...'ঢেঁকী মঙ্গল' 'গাম্ভরী মঙ্গলা' 'ঘাট মোচন' 'নগুই প্রভৃতি কত জানা অজানা কাণ্ডাকাণ্ড আছে। পূজাকর পরিচয়ে, হাড়ী, ডোম বাইতি প্রভৃতি নীচ জাতির বিবরণ আছে। এই সকল দেখিলেই মনে হয়,—জিনিসটা কোন প্রধান ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, আর কিছু। বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণী মধ্যে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই কিছু না কিছু এখনও রহিয়াছে।

রামাই পণ্ডিতের সময় নির্ণয় কল্পে নগেন্দ্র বাবু, বিশ্বকোষে, তাহাকে বঙ্গের প্রথম ধর্ম্মপালের সমসাময়িক বলিয়াছিলেন; এখন সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাকে আর দুই শত বৎসর পরের লোক স্থির করিয়াছেন। নিজের ভ্রম নিজে দেখাইতে গিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের তত কথা জানিবার প্রয়োজন নাই। সিদ্ধান্ত এই হইয়াছে—উত্তর রাঢ়ে যে সময় (১০১২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ১ ম মহীপালের অভ্যুদয়, তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজা ২য় ধর্ম্ম পাল, রামাই পণ্ডিত, মাণিক চাঁদ, গোবী চান্দ বা গোবিন্দ চন্দ্র ও লাউসেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম পাল, রঙ্গপুর জেলার ডিম্‌লা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপুর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। এখনও লোকে সেই ধর্ম্মপালের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজধানী হইতে পূর্ব্ব দিকে ১২।১৩ মাইল দূরে ময়নাপুর গ্রাম। ময়নাপুরের ৩॥ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাতলার ঘাট বিদ্যমান। ময়নাপুর ও চাঁপাতলার মধ্যে প্রাচীন হাকন্দ গ্রাম। এই খানেই শূন্য পুরাণ রচিত হয় বলিয়া, ঘনরাম প্রভৃতি ইহাকেই হাকন্দ পুরাণ বলিয়াছেন শূন্য পুরাণের প্রথম কয় পংক্তি আর বারমাসি হইতে খানিকটা গল্প উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

সৃষ্টি-পতন।

১

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার নছিল ন ছিল কৈলাস ॥২
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥৩
দেবতা দেহারা নছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥৪
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥৫
পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥৬

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥৭
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী ॥৮
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥৯
দসদিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন ॥১০
চাদি বেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার ॥১১
জীব জন্ত নহি ছিল নছিল বিম্বুপাত।
দেব থল নহি ছিল নছিল জগন্নাথ ॥১২"

অথ বারমাসি।

"কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কম্নি। গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি। সন্নাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জয় জয়কার॥ দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ মাস মেস রাসি হে বসুদেব! বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর পুষ্পপানি। সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কম্নি। গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্নাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেক সুখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জয় জয়কার। দাতা দানপতি বিঘ্ন জাব নাস।"

যদিও রামাই পণ্ডিতের সময় এখন হইতে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বের স্থিরীকৃত হইয়াছে, তথাপি সম্পাদক বলেন, যে সেই ভাষার উপর এত শুদ্ধীকরণ চলিয়াছে, যে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষার ছায়া ইহাতে বিস্তর পড়িয়াছে; এমন কি অনেক স্থলে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের শুদ্ধীকরণও আছে। তাহার পর নানা কারণে সম্পাদককে "অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।" তবে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, "ভবিষ্যতে উক্ত স্থান সমূহ দর্শন ও রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের সহিত দেখা করিয়া শব্দার্থ ও অজ্ঞাত তত্ত্ব সমূহ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।" আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার আশা সফলা হইবে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্চ্চা।

ভূমিকা।*

এই বিশ্বজগৎ একটা 'মায়া-পুরী।'— মানবের কল্পনা ইহার সৃষ্টি কর্ত্তা; এবং ইহার ঘটনাসমূহের উদ্ভাবক। অথচ মানব আপনাকে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র এবং সেই পুরী-

* শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য পরিষদে পঠিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

মধ্যে নিবদ্ধ ভাবিয়া আপনাকে সর্ব্বোতভাবে তাহার অধীন ধরিয়া লইয়াছে। এবং আপনারই কল্পনা দ্বারা নিয়ত আপনাকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে। এই যে বন্ধন ইহারই বৃত্তান্ত লইয়াই বিজ্ঞান শাস্ত্র। কিন্তু এ বন্ধন কাল্পনিক; সুতরাং বিজ্ঞান শাস্ত্রের এই খানে গোড়ায় গলদ।

মানব তাহার জীবন আরম্ভ করিয়া বিশ্বজগতের একটা অংশকে পৃথক করিয়া লয় এবং তাহার নাম দেয় 'দেহ'। এই দেহ-অংশ বিশ্বজগতের অপরাংশের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও এই গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র অংশটাকেই সে নিতান্ত আপনার ভাবে; অপরাংশ তাহার নিকট অনাত্মীয় বা পর। কিন্তু এই দেহ যাহা মানবের আপন এবং বিশ্বজগতের অপরাংশ বা বাহ্যজগৎ যাহা তাহার 'পর',—এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। এই দেহের সহিত বাহ্যজগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে; যখন এই কারবার আরম্ভ হয় তখন জীবনধারী জীবের জন্ম, এবং যখন ইহা শেষ হয় তখন তাহার মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যু এই দুই ঘটনার যে কাল, সেই কাল ব্যাপিয়া দেহের সহিত বাহ্যজগতের সম্পর্ক থাকে ও কারবার চলে। কিন্তু সে সম্পর্ক দুই প্রকার। প্রথমতঃ তাহা বিরোধের সম্পর্ক—বাহ্যজগৎ সর্ব্বদা সহস্ররূপে জীবদেহকে আত্মসাৎ করিয়া পঞ্চভূতে বিলীন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে; যাহা তাহা হইতে উৎপন্ন তাহাকেই সে পুনর্গ্রহণ করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট। সুতরাং জীবের যাহা কিছু ভয় তাহা বহির্জগৎ হইতেই। কিন্তু অপরপক্ষে, বহির্জগৎ তাহার পরম মিত্র। কেন না, বহির্জগৎ হইতেই মালমশলা সংগ্রহ করিয়া আপনার দেহ পুষ্ট রাখিয়াই, দেহী জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়, এবং বহির্জগতের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরম শত্রু সেই আবার পরম মিত্র। তাই বলিতেছিলাম;—জীব ও বাহ্যজগতের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র! বাহ্যজগতের মূর্ত্তি যেন হরগৌরীর মূর্ত্তি,—হর অষ্টপ্রহর তাঁহার কাল-শিঙ্গা বিনাদিত করিয়া জগতকে প্রলয়ের মুখে টানিতেছেন আর গৌরী বরাভয় করে আশ্বাস দিতেছেন। এই যে সম্বন্ধ, এই যে কারবার, ইহাই জীবন-দ্বন্দ্ব। কিন্তু পরিণামে ইহাতে বাহ্যজগতেরই জয় হয়! জীব একদিন পরাস্ত হয়ই—সেই দিন তাহার মৃত্যু। কিন্তু "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" কথাটা সব সময় বিজ্ঞান-সম্মত নহে; নিম্নশ্রেণীর অনেক জীব তাহার প্রমাণ। উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবেরা মরণ ধর্ম্মী হইলেও তাহারা বড় কৌশলী। স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহারা দেহের কতকাংশ বাহ্যজগতে আধান করিয়া নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং বাহ্যজগত হইতেই মালমশলা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় জীবন দ্বন্দ্ব চালাইতে থাকে। সুতরাং বাহ্যজগতের উদ্দেশ্য জীবকে ধ্বংস করা এবং জীবের উদ্দেশ্য আপনাকে রক্ষা করা—এই পরস্পর বিবদমান লক্ষ্য-দ্বয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চিরদিন সমান ভাবে চলিতে থাকে।

এখন, জীবদেহটা কি তাহা বুঝা যাক্। আধুনিক জীব-বিদ্যা ইহাকেও যন্ত্র হিসাবে দেখিতে চান—সেরূপ দেখা স্বাভাবিকও

বটে, কারণ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ন্যায় জীব দেহ অতি বিচিত্রভাবে আপনাকে আপনি চালিত করিয়া যায়—কেবলমাত্র কার্য্যকরী শক্তির জন্য সে বহির্জগতের অপেক্ষা করে। তাহার পরিপুষ্টি সাধনে বা আত্মরক্ষার উপায় অন্যান্য যন্ত্রাদির ন্যায় আপনার নিকট যথেষ্ট পরিমাণে তাহাতে আছে। কিন্তু এ যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি? আহার নিদ্রা, এবং সময়মত কারণে অকারণে আপন শক্তি নিয়োগ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাই কি জীবদেহের জীবন যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য? বাহির হইতে ত কই অন্য কোন উদ্দেশ্য আমরা বুঝি না। ফলে, জীব-বিজ্ঞান দেহ যন্ত্রকে এইরূপ একটা কৌতুকের বস্তু বলিয়াই দেখেন। কিন্তু, তত্রাচ দেহ-যন্ত্রের সহিত মানবনির্ম্মিত অন্যান্য যন্ত্রের একটা মূল প্রভেদ আছে। অন্য যন্ত্র কারিকরের অপেক্ষা করে, কিন্তু জীবদেহ আপনাকে আপনি গঠিত করিয়া তোলে। অবশ্য একেবারে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু যে ক্ষুদ্র একটু বীজের মধ্যে কোন শরীরই লক্ষ্য হইতে পারে না, সে কেমন অদ্ভুতভাবে বাতাস এবং মৃত্তিকা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষে পরিণত হয়! জড়জগতেও অবশ্য, মৃৎ কণিকার পর মৃৎকণিকা জমিয়া কালক্রমে বিচিত্রাকৃতি পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়, চিনির সরবৎ হইতে চিনির দানা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ত্যাগ করিয়া মিছরীরখণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু জীবদেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এবং জড়দেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে একটা প্রভেদ আছে। তাহা আত্মরক্ষার চেষ্টা। পর্ব্বত খণ্ড বা মিছরীখণ্ড বারিধারা বা কোন কঠিনাঘাতে গলিত বা দীর্ণ হইবার সময় আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু জন্তু-জগতে বা উদ্ভিদ-জগতে সর্ব্ব সময়ে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের অবয়বের সংস্থানও এই চেষ্টার অত্যন্ত উপযোগী। তাই বলিতেছিলাম জীবের যাবতীয় চেষ্টাই তাহার আত্মরক্ষার অনুকূল; জড়যন্ত্রে আমরা এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। এবং এইখানেই এ দুয়ের পার্থক্য। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্রের প্রামাণ্য আমরা স্বীকার করি; জীবের ন্যায় জড়েরও যে একই প্রকার চেতনাশক্তি আছে তাহা ঠিক; কিন্তু জীবের সাড়া দেওয়ার চেষ্টা যেরূপ সম্পূর্ণ ভাবে তাহার আত্মরক্ষার অনুকূল, জড়েরও সে চেষ্টা যে তদ্রূপই, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বাহ্যজগতের সহিত নিয়ত এই সংঘর্ষণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া জীব আপনাকে স্থান কালোপযোগী রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বকীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—সন্তানোৎপাদনও জীবের আর একটা নিজস্ব ক্ষমতা। জড়ের তাহা নাই। পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

পারিপার্শ্বিক সংঘর্ষণের ফলে জীব-জগতে ক্রমশঃ এক মহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আধুনিক জীবজাতির অধিকাংশই পৃথিবীতে ছিল না ইহার বহু প্রমাণ আছে। তবে তাহারা আসিল কোথা হইতে? নানা মুনি এ বিষয়ে নানা মতের অবতারণা

করিয়াছেন, তন্মধ্যে ডারুইনের মতটাই প্রমাণযোগ্য। ডারুইন বলেন—জীবমাত্রেই কতকগুলি বিশিষ্ট-ধর্ম্মা হইলেও কোন এক জাতীয় জীবের মধ্যে প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে সমানধর্ম্মা হইতে পারে না। একই পিতামাতার চারি পাঁচ বা ততোধিক সন্তান হইলে সকল সন্তানই একরূপ হয় না। সকলকেই জন্মিয়াই বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়—সেই যুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তন হয়। যাহার শক্তি আছে সে জয়ী হয়, এবং বংশ রক্ষার সুবিধা পায়; যে দুর্ব্বল সে বংশ রক্ষায় সমর্থ হয় না। প্রত্যেকের জয়লাভের প্রণালী বিভিন্ন। কেহ বা তীক্ষ্ণ দন্তের বলে কেহ বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বলে আবার কেহ বা শৃঙ্গের বলেও জয়ী হয়। যাহারা সন্মুখ-যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহাদের বংশের শেষ পরিণতি সিংহে ও শার্দ্দূলে; আবার যাহারা রনে ভঙ্গ দিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে তাহাদের বংশধর—শশক ও হরিণ। ফলে জীবসমাজে একটা বাছাই কার্য্য বা "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" চলিলেছে। যে ক্ষমতাবান্ সে বাঁচে, যে অক্ষম সে মরে; (আবার সময়ে সময়ে দু'এক স্থলে ইহার বিপরীতও দেখা যায়; কিন্তু সেটা Honourable Exception!) যাহার যে অবয়ব বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধের অনুকূল তাহার সেই অবয়ব সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া বংশ পরম্পরায় গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি। জীবের দেহযন্ত্রের অন্তর্গত অবয়বগুলিতে জীবন-রক্ষার অনুকূল নানা কৌশলে পরিপূর্ণ। অবশ্য তাহাতে অসম্পূর্ণতা যে নাই তাহা নহে, নহিলে জীবের এত আধিব্যাধি দুঃখ তাপ কেন? তথাপি সে কৌশল সম্পূর্ণ-তারই একটা ছায়া। প্রেয়-গ্রহণ ও হেয়-বর্জ্জন আত্মরক্ষার এই দুইটি মূলসূত্র। যাহা হেয়, অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে প্রতিকূল তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, এবং যাহা প্রেয় বা উপাদেয়, অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের পক্ষে যাহা অনুকূল তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জীবমাত্রে এই চেষ্টা লইয়া জীবন যাত্রার পথে চলিয়াছে। যে ইহাতে অশক্ত তাহাকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে এই প্রেয়-গ্রহণই সুখ এবং হেয়-বর্জ্জনের অশক্তিই দুঃখ। কিন্তু জীবমধ্যে এই সুখ দুঃখের বোধাবোধ করে, কোথায়, এবং কি হইতে সৃষ্টি হইল, তাহা নির্ণয় করা এক বিষম সমস্যার কথা। জড়জগতের মধ্যে এই সুখ দুঃখানুভূতি নাই।—সকল জীবেরই যে এই অনুভূতি আছে তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত সকলই অনুমান। আমার অনুভবাদি আমার নিকট প্রত্যক্ষ। অপরের অনুভূতি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু এ জগতের সাড়ে পনর আনা অংশকেই আমি জানি না। সুতরাং এ স্থলে জীবমাত্রকেই সুখ দুঃখানুভব সমর্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং সুবিধাজনকও বটে।

এখন, এটা আমাদের বুঝিতে হইবে যে এ বিশ্বজগৎ এক মহা স্বার্থের মেলা; যাহার যাহাতে স্বার্থ সিদ্ধি সে তাহারই অন্বেষণ

করিতেছে। এই যে সুখ দুঃখানুভব ক্ষমতা ইহার পুষ্টি কিসে হইল, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। ডারুইনের শিষ্যেরা বলিবেন—ইহাতে জীবের লাভ, কারণ, যে জীব অনুভবশক্তিযুক্ত, তাহার পক্ষে অনুভব শক্তিহীন জীব অপেক্ষা জীবন—সংগ্রামে সুবিধা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই অনুভব—ক্ষমতার পুষ্টি। ফলে, উন্নত জীবের নিকট বাহ্যজগতের মূর্ত্তিই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বাহ্যজগতের সহিত যুগপৎ মিত্রতা ও শত্রুতার ফলে, সেই বাহ্যজগতের কতকাংশ সে সুখজনক ও কতকাংশ দুঃখজনক রূপে দেখিয়া থাকে। মানবের কথাই দেখ। বাহ্যজগৎ তাহার নিকট কেবলমাত্র জড় পদার্থ নহে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বার দিয়া সে যে যে অনুভূতি আনয়ন করে তাহারই সহিত তাহার ক্রমশঃ যথার্থ সম্বন্ধ দাঁড়ায়;—সে সম্পর্ক, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ প্রকার অনুভূতির। কারণ, মানব যে জগতকে জানে সে জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শময় এই রূপাদি যাহা সে অনুভব করে তাহাই তাহার একমাত্র জ্ঞান। সে রূপরসহীন অন্য জগতকে জানে না। সুতরাং দেখিতেছি মানবের সহিত জগতের একমাত্র মুখ্য সম্পর্ক—অনুভূতির সম্পর্ক। অন্যান্য অচেতন যন্ত্রাদির সহিত এইখানে পার্থক্য। রূপ রস গন্ধাদিই মানবের বাহ্যজগৎ। সুতরাং যে রূপ যে রস যে গন্ধ তাহার প্রীতিকর তাহাই সে গ্রহণ করে, এবং যাহা অপ্রীতিকর তাহা সে বর্জ্জন করে। যে অনুভব সুখকর তাহাই তাহার কাম্য, যাহা দুঃখজনক তাহা তাহার পরিত্যাজ্য। সৌভাগ্য ক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, যাহা জীবন রক্ষার অনুকূল তাহাই সুখকর এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই দুঃখকর হইয়া জীবের নিকট আজ প্রতীয়মান হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিদেবী এ বিষয়ে জীবকে সাহায্য করিতেছেন। তত্রাচ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল এখনও অসম্পূর্ণ; তাই বিরুদ্ধ ঘটনাও সময়ে সময়ে ঘটিয়া থাকে। এবং জীব অনেক সময়ে মঙ্গলামঙ্গলের প্রভেদ ধরিতে পারে না। তত্রাচ, সুখের অন্বেষণ এবং দুঃখের পরিহার—জীবন যাত্রার এইমাত্র প্রণালী। যাহারা এই প্রকৃতি বর্জ্জিত, তাহারা, Honourable Exceptionএর প্রভাবে আজ কোন ক্রমে দশ লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি যুক্ত হইয়া থাকিলেও, একদিন না একদিন তাহাদের "কেহ না রহিবে আর বংশে দিতে বাতি"

জীবন রক্ষার জন্য এই প্রকৃতিগুলি কালক্রমে জীবের সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীব সেই সকল প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ইহাদিগকে আমরা সহজাত সংস্কার বা instinct আখ্যা দিতে পারি। এই সংস্কার জীবগণকে আত্মরক্ষার পথেই পরিচালনা করিতেছে। সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মোটের উপর জীবনযাত্রা বেশ চলিয়া যায়। কারণ, বহির্জগত হইতে অনুক্ষণ যে সকল আঘাত আক্রমণ আসিতেছে তাহাদিগকে রোধ করিতে ভাবিবার বা চিন্তিবার সময় প্রায়ই থাকে না;—সে সব ক্ষেত্রে সহজাত সংস্কারই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু অনেক

স্থলে আবার এমন অনেক ঘটনা বা রূপ-রসাদির দুর্ব্বোধ মিশ্রণ আসিয়া পড়ে, যে স্থলে সহজাত সংস্কার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পথ দেখায় না। সে সকল ঘটনা কখনও সুখ কখনও বা দুঃখ দেয়, কখনও বা সুখ দুঃখ কিছুই দেয় না। সে সব স্থলে জীব সাধারণ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সুখগ্রহণের এবং দুঃখ বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়া অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হয়ত সে আপাত সুখে, দুঃখের বীজ নিহিত আছে, হয়ত সে দুঃখে, অশ্রুত কোন্ রম্যবীণার ঝঙ্কার স্পন্দিত হইতে থাকে!

কিন্তু সে সব স্থলে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য আবার কতকগুলি জীব এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। সহজ সংস্কার যেখানে অক্ষম, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি সেখানে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবেও এই শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—যথা মধুমক্ষিকার চক্র এবং মধুসঞ্চয়ের ব্যবস্থা, পিপীলিকার সমাজ এবং শাসন-পদ্ধতি, পরভৃতের ডিম্বসংস্থান প্রভৃতি; কিন্তু এ সকল অপূর্ব্ব হইলেও ইহা নিতান্তই সহজাত সংস্কার বলিয়া মনে হয়। কারণ সে সকল কার্য্য ব্যতিরেকে তাহারা একদণ্ডও বাঁচিতে পারে না। কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ জীবে যে এই বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিণতি লাভ করে তাহা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না,—করিতে সাহস পাইবেন না। মনুষ্যের মধ্যেই এ বৃত্তির পরাকাষ্ঠা, তাই মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ।

এই বুদ্ধিবৃত্তি জীবনযাত্রার পক্ষে যে অনুকূল তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কারণ সহজাত সংস্কার যেখানে অক্ষম এবং ভ্রান্ত, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে যথার্থ পথ দেখাইয়া দেয়। ডারুইনের শিষ্যেরা, এই বুদ্ধি-বৃত্তিকেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-লব্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। হয়ত তাহা সম্ভব, এবং পুরুষ পরম্পরায় প্রবর্ত্তিত হইয়া নির্ব্বাচন ফলে হয়ত ইহার তীক্ষ্ণতা ও প্রসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তত্রাচ এই বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনে প্রতি জীবেরই একটা নিজস্ব বা ব্যক্তিত্ব আছে। সহজাত সংস্কারের সহিত ইহার এইখানে প্রভেদ। ইহার প্রয়োগ নৈপুণ্য মানুষকে শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হয়। কারণ সকল মানবই স্ব স্ব জীবনে ঠিক এক অবস্থাতেই পতিত হয় না। পিতা যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন পুত্রও ঠিক সেই সেই অবস্থায় পড়ে না। জীবনে বিভিন্ন ঘটনাচক্র বিভিন্নাকারে পিতা এবং পুত্রকে আক্রমণ করে। সুতরাং জীবমাত্রকেই সময়ে সময়ে আপনার নিজত্বকে একটু প্রয়োগ করিতে হয়। পিতা এবং পুত্রের জীবনের ঘটনাচক্রও অনেকটা একরূপ হইলেও পুত্র জাতমাত্রেই পিত্রানুষ্ঠিত পথ জানিতে পারে না। চারিদিক দেখিয়া অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তবে সে কার্য্য করিবে। জীবনের প্রতি ক্ষতিই সুতরাং এক হিসাবে তাহার পক্ষে লাভ; কারণ একটা ক্ষতির অভিজ্ঞতা লইয়া সে ভবিষ্যতের অপর দশটা ক্ষতির সহিত যুঝিতে পারিবে। সেই অভিজ্ঞতার ফলেই মানব তাহার জীবনের পথ নিরূপণ করে। সহজাত পাশবিক সংস্কারের বলে যন্ত্রবৎ পরিচালিত

না হইয়া সে স্বাধীনভাবে আপন জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করে। যাহা একহিসাবে তাহার ক্ষতি করে, তাহাকেই অপর হিসাবে সে তাহার লাভের পথে খাটাইয়া লয়। যেরূপ রস গন্ধ আসিয়া তাহাকে আঘাত দিতেছে সেই রূপ রস গন্ধকেই সে তাহার স্বকার্য্য-সাধনে প্রেরণ করিতেছে। শত্রু-ভাবে যাহা আসে তাহাকে দিয়া সে মিত্রের কার্য্য করাইয়া লইতেছে। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকতা। মনুষ্য এই বৈজ্ঞানিক জীব। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া সে বিশ্ব-জগতের সমাচার লইতেছে এবং আপন অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছে। এবং সুবিধামত প্রয়োজনমত বহির্জগতকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। রূপ রসাদির যে প্রবাহ আসিয়া চিত্রপটে রেখা টানিয়া দিতেছে তাহার সাহায্যে সে তাহার ভবিষ্যৎ—তাহার জীবন রক্ষার উপায়—নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছে। অতএব মানব, বৈজ্ঞানিক।

ঘটনার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করা এবং সেই দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবনযুদ্ধের কার্য্যে লাগানই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র কর্ম্ম। যন্ত্রতন্ত্রের বহু ড়ম্বর নহিলে যে বৈজ্ঞানিক হয় না একথা মনে করা ভুল। মানব মাত্রেই—যাহাকে বিচারশক্তির সহিত বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে হয়—সকলেই এক একটি ছোট খাট বৈজ্ঞানিক। আজ কেলভিন বা এডিসন বা অন্যান্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক-গণের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা নিতান্তই একটা অদ্ভুত কথা নহে; কারণ মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলি কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ অজ্ঞাত-নামা বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে—আজ তাহার খবর কে রাখে? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নি প্রজ্জ্বালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এডিসনের কোন আবিষ্কার তাহার সহিত তুলনীয় নহে।

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বজগতকে পর্য্যবেক্ষণ করি। কিন্তু সকলের দৃষ্টি সমান নয়। কেহ উদারদৃষ্টি, কেহ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, কেহ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, কেহ বা স্থূলদৃষ্টি। কেহ চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ; কেহ চশমার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছু দেখেন না। কেহ দূরবীণ সংযোগে দূরের দ্রব্য নিকটে দেখে, কেহ অনুবীক্ষণ দিয়া ছোট দ্রব্য বড় করিয়া দেখে। কেহ নৈসর্গিক ঘটনা দেখিয়াই তুষ্ট, কেহ অঘটন ঘটাইয়া, পাঁচটা দ্রব্য একত্র মিশাইয়া (expriment) তৃপ্ত। কেহ হাইড্রোজেন অক্সিজেনে অগ্নিসংযোগ করিয়া কেহ চুম্বকের নিকট লৌহ ধরিয়া দেখেন—কি হয়। কেহ ইন্দুরের লেজ কাটিয়া বাচ্চার দশা কি হয় দেখেন; কেহ বা আবার রোগীকে ঔষধ গেলাইয়া দেখেন সে শীঘ্র ভবসংসার পার হয় কি না।—এ সকল কার্য্যই বৈজ্ঞানিকতার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের ঘটনাপরম্পরা বসিয়া বসিয়া দেখেন। কিন্তু কেন উহা ঘটে কি উদ্দেশ্যে ঘটে তাহার উত্তরে এক মহা "না" ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারেন না। বৃন্তচ্যুত নারিকেল ভূমিতে পড়ে;—

কেন পড়ে? পৃথিবী আকর্ষণ করে বলিয়া? কিন্তু যদি বলি--পৃথিবী আকর্ষণই বা করে কেন? বিকর্ষণ করে না কেন?—তাহার আর উত্তর নাই। 'অবশ্য বিকর্ষণের প্রভাবে বৃন্তচ্যুত হইবামাত্রই নারিকেল ফল যদি তাহার শস্য ও ক্ষীর সমেৎ উধাও হইয়া বেলুনের মত আকাশ পথে উঠিয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীর সহস্র সহস্র বৈজ্ঞানিক হতাশ ভাবে ঊর্দ্ধমুখে দূরবীণ লাগাইয়া হেরিয়া দেখিতেন এবং কত মিনিটে কত ঊর্দ্ধে উঠিল তাহার হিসাব রাখিতেন; কিন্তু নারিকেল ফল আর রসকরার পরিণত হইত না!' আধুনিক ব্যবস্থা মিষ্টান্নভোজী মানবের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক বটে, কিন্তু পৃথিবীর এই আকর্ষণ-প্রবৃত্তিই কেন, কে তাহার সদুত্তর দিবে? হয়ত পরবর্ত্তী কেহ প্রমাণ করিবেন যে নারিকেল ও পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থিতিস্থাপক বন্ধন আছে যাহার জন্য এই আকর্ষণ; অথবা হয় ত ঊর্দ্ধ হইতে কোন চাপ পাইয়া নারিকেল খণ্ডের এই অধঃ-পতন!

কিন্তু কার্য্যফলের কারণানুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিক তত ব্যস্ত নহেন। তিনি কেবল দৃষ্ট ঘটনাবলীর আলোচনা করেন এবং তদ্দ্বারা কি কি কার্য্য সাধন হইতে পারে তাহাই দেখেন। প্রকৃতির কার্য্য শৃঙ্খলাময়; শৃঙ্খলা না থাকিলে কোন কার্য্য ঠিকমত হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃতির কার্য্যের এই [illegible] বৈজ্ঞানিকের ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক সেই সকল শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করেন। তিনি জাগতিক নিয়মের আবিষ্কার করেন। সকলেই কিন্তু সে সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী নহেন। যিনি হন তিনিই যথার্থ বৈজ্ঞানিক;—তাই নিউটনের নিউটনত্ব, এডিসনের এডিসনত্ব।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে বৈজ্ঞানিক দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু বিশ্বজগতের অতি অল্প অংশই তাঁহার লক্ষীভূত হয়। তাই বিশ্ব তাঁহার নিকট 'অনন্ত'। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিশ্বজগতের সাড়ে পনর আনা অংশই আমার অনুমান-সাপেক্ষ। এই অনুমানলব্ধ এবং প্রত্যক্ষ বিশ্বজগতের ভিতরে ও বাহিরে আর একটা বৃহত্তর অংশ কল্পিত হয়। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বৈজ্ঞানিক এই অজ্ঞাত জগতে ক্রমশঃই আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু এই অজ্ঞাত জগতের ঘটনাবলীর সহিত আমাদের জ্ঞাত জগতের ঘটনাবলীর পরস্পর সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই না। এই জন্য সহজে আমরা সে জগতের কথা বিশ্বাস করিতে চাই না। বৈজ্ঞানিক অতি সন্তর্পণে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, তাহাদের সত্যতার অগ্নিপরীক্ষা করিয়া তবে তাহাদিগের সহিত পরিচয় করেন। যে কোন প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য। সুতরাং জ্ঞাত-জগতের ঘটনা পরম্পরার সহিত সে প্রত্যক্ষ ঘটনা আপাতঃ মিল না খাইলেও একদিন মিল খাইবেই এই ভরসায় তাঁহাকে চলিতে হইবে। জাগতিক কোন ঘটনাকেই অতিপ্রাকৃত বলা উচিত নহে। আধুনিক শ্রেষ্ঠ [illegible]কগণের [illegible] হইলেও পারে; কিন্তু [illegible] ঘটনা সমূহ সত্য অতিপ্রাকৃত হইবেনা, কারণ ব্যবহারিক

জগতে অতিপ্রাকৃত বলিয়া কোন কথা নাই।

প্রত্যক্ষজ্ঞাত, অনুমানলব্ধ ও কল্পিত এই তিন অংশ একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বজগতেয় যথার্থ মূর্ত্তি কি তাহা এখনো কোনও বৈজ্ঞানিক জানিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন লব্ধ কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের উপরই তাঁহার বিশ্বজগতের জ্ঞান নিবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহার বাহিরে যাইয়া নূতন ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে নূতনতর জ্ঞানলাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আপাততঃ তিনি ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ রসাদি পঞ্চ বস্তুকে দেশে কালে সন্নিবেশিত করিয়া জগতের একটা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইতেছেন এবং তাহার মধ্যে নানা অবয়বের সংস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক অবয়ব কেমন আপনার স্থানে থাকিয়া সুন্দর ভাবে আপনাপন কার্য্য করিয়া জগত যন্ত্রে একতা এবং সমতা রক্ষা করিতেছে তাহা দেখানই তাঁহার কাজ। সেই সকল যন্ত্রাবয়বের কার্য্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহাকে বুদ্ধির পরিচালনা এবং নানারূপ কল্পনাশক্তি বা অনুমানের উদ্ভাবনা করিতে হয়। এই অনুমানের বলেই অনেক তথ্য শেষে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সকল যন্ত্রাঙ্গের কার্য্যের মীমাংসা হয় নাই। জীবনহীন জড়ে কিরূপে কখন জীবন সঞ্চার হয়, জীবের মধ্যে কখন চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচার [illegible] কিরূপে উদ্ভব হইল—এ সকল বিষয়ের মীমাংসা এখনও বহুদূরে। ডারুইনবাদীরা বলেন, জীবের জীবন রক্ষার্থ এ সকলের আবশ্যকতা আছে—সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এ সকল ঘটিয়াছে। কিন্তু জগতকে যদি যন্ত্র হিসাবে দেখি, তবে এ প্রশ্নের মীমাংসা কিরূপে হয়?—ফলতঃ, জড় ও জীবের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান আছে, তাহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। জড় ও জীবের সম্পর্ক এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে সামান্য ভাবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে এবং হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে এখনও বিশ্বজগতের চির-রহস্যের দ্বার অর্গলাবদ্ধ। রুদ্ধ কবাটের অবকাশপথে রহস্যময় জ্ঞানালোকের আভাসটুকু গোচরীভূত হইতেছে মাত্র। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যে 'একম্', সংযোগ বিয়োগের মধ্যে যে 'একম্' জড় এবং জীবের মধ্যে যে 'একম,'—যে এক কার্য্যকরী শক্তির লীলা—যেদিন তাহা যথার্থ প্রতিভাত হইবে, সেই দিনই চরম সার্থকতার দিন।

সুতরাং দেখিতেছি—জীব এবং বাহ্যজগৎ এই দুয়ের মধ্যে পরস্পর একটা সংঘর্ষ চলিতেছে এবং জীবের যত কিছু চেষ্টা, আত্মরক্ষার জন্য; ও বাহ্যজগতকে জয় করিয়া তাহাকেই আপনার জীবন-রক্ষায় নিযুক্ত করিবার জন্য। এই আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির প্রযত্নে আজ আমরা বিস্ময়জনক সফলতা লাভ করিয়াছি।—যে বাহ্যজগত একদিন [illegible] করিবেই তাহাকেই আমরা আজ ভৃত্যের ন্যায় নিয়োগ করিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ?

আমাদের কাম্য কি ?—সুখ-লাভ। সে সুখ-লাভ কিসে হয় ?—আত্মরক্ষায় এবং আত্মপরিপুষ্টিতে—প্রেয়-গ্রহণে এবং হেয়-বর্জ্জনে। আমাদের জীবনের যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের প্রতি নিযুক্ত। আমাদের সুখান্বেষণের নিগূঢ় উদ্দেশ্য তাহাই। কিন্তু মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্যেও সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইতর জীব তাহা পারে না। সঙ্গীতের ঝঙ্কার, বিহগের কলতান, কবিতার মোহিনী, নদীনীরের কুলু কুলু ধ্বনি—এ সকলে যে সুখ সে সুখের সহিত আত্মরক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। এ সুখ উদ্দেশ্যহীন সুখ, ইহা শুধুই আনন্দ! এ সকলই এক মহা আনন্দের ছায়ামাত্র। ইহার উর্দ্ধতম সোপানে উঠিয়া প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর কল্যাণী-মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া যে আনন্দ, সে আনন্দ অপার্থিব—তাহা কেবল মানবের ন্যায় উচ্চতম জীবেরই উপভোগ্য।—জগতের এই নিয়মশৃঙ্খলার আবিষ্কার, এই জ্ঞানরাজ্যের বিস্তৃতি, জগতের এই অন্ধকারাবৃত অংশে জ্ঞানালোক-সম্পাত—ইহাতে যে আনন্দ, সে আনন্দ টেলিফোনে নাই, ডায়নামোয় নাই, ষ্টীমশিপে নাই, এরোপ্লেনে নাই! সে আনন্দ চির কল্যাণময়, চির শান্তিময়। সে আনন্দ, জীবজগতের জীববৃন্দের এই পরস্পর শোণিত-পান তৃষায় ব্যথিত হইয়া উঠে, সে আনন্দ মানবের এই ক্রূর স্বার্থ সংগ্রামে ক্লিষ্ট হইয়া উঠে! 'জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান কোটি মানবের পাদপীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই ধূলি বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দধারাকে কলুষিত করিও না। প্রাচীন ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—বিজ্ঞানই আনন্দ, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়াপুরীতে বদ্ধ জীব, ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও যদি পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্ব্বাস্বাদ গ্রহণে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান যে আনন্দ উৎস খুলিয়া দিয়াছে, তাহার সে নির্ম্মল জলপ্রবাহকে ব্যবহারিক জীবনের সুখ দুঃখের কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না—করিও না।'*

নীলকণ্ঠ।

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, নীলকণ্ঠ কাছারী ভাঙ্গিয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার স্নান আহার সম্পন্ন হইল, ষোড়শী "ছেঁচা" আনিয়া দিল; ——থের কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কেমন বাধ বাধ ঠেক .

"আচ্ছা, কাল না হয় মন্মথ দুর্য্যোগে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু আজ এতটা বেলা হলো, নিজে একবার আসা দূরে যাক্, একটা সংবাদ পর্য্যন্ত ও সে দিলে না, কেন?" ষোড়শীর প্রাণের ভিতর টা

* মূল প্রবন্ধ বর্ত্তমান মাসের 'সাহিত্যে' দ্রষ্টব্য।

যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু "চোরের মা জন্ম, ফুকারি কাঁদিতে নারে," সে নীলকণ্ঠকে মুখ ফুটিয়া মন্মথের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না! তামাকু সংযোগে তাম্বুল রস গ্রহণ করিতে করিতে, নীলকণ্ঠ ষোড়শীকে বলিলেন, "আজ তা হ'লে তোমার পাঠ বন্ধ!" ষোড়শী সহসা কথাটার অর্থ বোধ করিতে না পারিয়া একটু 'অবাক' ভাব ধারণ করিল;—তখন বৃদ্ধ আবার বলিলেন,— "তুমি বুঝি শুন নাই,—মন্মথ বাবুর যে অসুখ।"

অসুখ? কি অসুখ? দারুণ আগ্রহে, এ প্রশ্নের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কবে হ'তে অসুখ, কি অসুখ?"

নীল—সেটা ঠিক বল্‌তে পারলাম না, শুধু শুনলাম তাঁর শরীরটা ভাবান্তর হ'য়েছে,—বাড়ীর মধ্যেই আছেন!—আমার সঙ্গে অসুখ ব'লে দেখা করেন নি!

"কে দেখ্‌চে?" ষোড়শীর কথায় বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন নাতবৌ?" ষোড়শীরও হাসি আসিল। সে বলিল "ওগো তা কেন, ডাক্তার কবিরাজ কেউ দেখ্‌ছে কি?" "আমিও তাই বলছি, বলিয়া নীলকণ্ঠ আরম্ভ করিলেন,—

"বাপ যদি ঘরে থাকে
কবিরাজে কেবা ডাকে"

"মিন্সের বুড়ো বয়সে রস দেখ" মনে মনে এই কথা ভাবিয়া "যাও" বলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে ষোড়শী গৃহান্তরে গেল। এদিকে নীলকণ্ঠ দিবা-নিদ্রার আয়োজন করিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়াই নীলকণ্ঠের সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, আচ্ছা, ষোড়শী আমায় তাড়াতাড়ি আসিতে কেন লিখিয়াছিল, তাহাত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। না না ভুল কেন হবে, ষোড়শীকে কাল সে অবস্থায় দেখিয়া আর এসব কথা তোলাই হয় নাই!

কিন্তু আসল কথা কি তাই? না, সত্য ভুলই হইয়াছিল; কত দিনের পরে ষোড়শীকে দেখিয়া, বৃদ্ধের আর কোন কথা মনে ছিল না। শুধু 'নয়ন অঞ্জলি ভরি', ষোড়শীর সে রূপ-রস পানে বৃদ্ধ বিভোর ছিলেন! ষোড়শী সম্মুখে থাকিলে নীলকণ্ঠের যে কিছুই মনে থাকে না! হরি-নাম, পরিণাম সবই যে ভুল হইয়া যায়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মন্মথের অসুস্থতার কথা শুনিয়া—ষোড়শীর মন বড়ই চঞ্চল হইল। বন্ধুর পীড়ার সংবাদে মন অধীর হওয়া আর আশ্চর্য্যের কথা কি? ইহাতে সঙ্কোচের কোন কারণ ত ষোড়শী দেখিতে পাইল না! মন্মথের সহিত আর তেমন ঘনিষ্ঠতা সে কিছুতেই করিবে না, সেত ঠিকই; কিন্তু তার অসুখ হইলেও যে পত্র দিয়া সংবাদ লইলে দোষ স্পর্শিবে, এমন কথাও ত কোন শাস্ত্রে লেখে না। আর মন্মথ ষোড়শীর শিক্ষার জন্য কত যত্ন, কত কষ্ট করিয়াছে, সে সব কি সহজে ভুলিবার, না সে ঋণ সহজে শুধিবার? তা, তার অসুখটা বেশী নয় ত? উনি সে [illegible] খবরটাও ভাল করে নি[illegible] [illegible]লেন না!

মন আর প্রবোধ মানিলনা, ষোড়শী

তখন তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতে বসিল। তার পর তখনই ঝিকে দিয়া সে পত্রখানি মন্মথের নিকট পাঠাইয়া দিল।

এই ঝির একটু পরিচয় এইখানে দেওয়ার প্রয়োজন। সে "দৌত্য কর্ম্মে নিপুণা অভিসার মিলনে",—কিন্তু এতদিন তাহার এ বিদ্যা এখানে অপ্রকাশ ছিল। আবার ছড়া বল, হেঁয়ালি বল, দাশুরায়ের পাঁচালি, মধু কাণের চপ বা বিদ্যা সুন্দরের গান বল সবই ঝির কণ্ঠস্থ। তাহার ভাব ভঙ্গীতে, আকার ইঙ্গিতে, মনে হয়,

আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া, তবু কিছু গুড়া আছে শেষে!

ঝি যতক্ষণ না ফিরিল, ষোড়শী ততক্ষণ "হা প্রত্যাশে" পথ পানে চাহিয়া রহিল, ভাত শুখাইতে লাগিল। ঝি ফিরিল, মুখ খানা যেন তেলো হাঁড়ি, ঝির ভাব দেখিয়া ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লো?" ঝি তখন ঠোঁঠ ফুলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল "তখনই ত বলেছিলাম, বড় লোকের সঙ্গে মেশা মিশি ভাল নয় গো, ভাল নয়! হায়, আমার পোড়া কপাল, বৌ ঠাকরুণ! অসুখ টসুখ সব মিছে, বাবু ত দেখলাম গিন্নিটির সঙ্গে দিব্বি হাসি তামাসা করছেন। এরই নাম,

যার গোপাল তার গোপাল হবে,—

এ সব দেখে শুনে হাড় ভাজা ভাজা হ'য়ে গেছে গো বৌ ঠাকরুণ, ভাজা ভাজা হয়ে গেছে! ঐ যে কথায় বলে

বড়র মায়া বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ—"

ঝির এ বক্তৃতার বেগ আরও বহিত, কিন্তু সহসা ষোড়শীর তিরস্কারে সে বাক্য-স্রোত প্রতিহত হইল। ষোড়শী তখন জিজ্ঞাসা করিল "চিঠির জবাব কই? আর তিনি আছেনই বা কেমন?" উত্তরের প্রতীক্ষায় ষোড়শী উদ্গ্রীব [illegible] রহিল।

"দেখ দেখি একবার কথার ছিরি [illegible]। আমিই বা ছাই পাঁশ এতক্ষণ কি বকে মলেম, আর তুমিই বা আমার মাথা মুণ্ডু কি বুঝলে! আরে,—

আর কি তোমার রাখাল আছে,
সে এখন মথুরায় রাজা হয়েছে!"

"তা বেশ! তার পর কি বল না?" ষোড়শীর নিকট বাধা পাইয়া, ঝি আবার পথে আসিল, বলিতে আরম্ভ করিল,—"বাবুদের বাড়ীতে ত ঢুকলেম, বল্লে না পিত্যয় যাবে, বৌ-ঠাকরুন, ঝি গুলো আর বামনি মাগী, যেন চাক ভাঙ্গা বোলতার মত আমায় ছেঁকে ধল্লে গো! তারা হাসতে হাসতে বল্লে —কি লো বিন্দে, কি মনে করে, পাখী ধত্তে না কি? পাখী শিকলি কেটেছে বুঝি!' মা মা, মা, মাগীরে এত কলাও জানে! আমিত লজ্জায় মরে গিয়ে, মনে মনে বল্লেম—মা পিরথিমি, তুমি দো ফাঁক হও, আমি তোমার গর্ভে ঢুকুই! আহা বেঁচে থাকুন গিন্নি, অমন লোক্ কি আর হয় গা? গিন্নি, ভাগ্যি যেই তখন এলেন তাই রক্ষে! কি লোকগা, গিদের অহঙ্কার কিছু নেই, যেন মাটীর মানুষ! ঐ যে কথায় বলে—" "ওসব রাখ, মন্মথ কি বল্লেন তাই বল্" বলিতে বলিতে ষোড়শী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।—ঝির কিন্তু তাহাতে দৃকপাত নাই, সে নানা কথা নানা ছড়ার পর আবার আসল কথা আরম্ভ করিল; "বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে দুয়োর ঠেলে দেখি কিনা, সব্বনাশ! ভর দুপুর বেলায় কর্ত্তা গিন্নি দুটীতে মুখোমুখি হয়ে বসে আছে! (তৎপর নাসিকায় তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া) ছি, ছি, ছি কালে কালে হলো কি? তবু সে ভদ্রলোকের মেয়ে, আমায় দেখে একহাত ঘোমটা টেনে বাইরে যাচ্ছিল—বাবু কিনা বল্লেন—ঝিকে অত লজ্জা কেন? ঘরেই থাক! কেনগা, ঝি কি আর মানুষ নয়? ঝি কি—" ঝির বক্তৃতা স্রোত ষোড়শীর ধমকে আবার প্রতিরুদ্ধ হইল—তখন সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল—"ঠাকুরুণটী ত রইলেন কোণ 'গাদা' হয়ে! আমি তখন দেওয়ানজীর নাম করে বল্লেম—কর্ত্তা পাঠিয়ে দি[illegible] এখন কেমন আছেন—বাবু

একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন এখন একটু ভাল আছি', তার পর আস্তে আস্তে চিঠিখানি বাবুকে দিলাম—বাবু সেখানা নিয়ে বিছানার তলায় গুঁজে রাখলেন—আর আমায় ইসারা করে চলে আসতে বল্লেন; আমি থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ফিরে এলাম আর কি বল! সাধে, কি বলি বৌ ঠাক্‌রুণ—"থাক্ থাক্ আর বলে কাজ নাই" বলিয়া ষোড়শী রন্ধন গৃহে গমন করিল।

ষোড়শীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিতে-ছিল—হুকুমে সে চক্ষের জল ফিরাইল, তার পর ঝির অসাক্ষাতে অন্ন ব্যঞ্জন সব কুকুরকে দিয়া, হেঁসেল তুলিয়া হাত পা ধুইয়া আপনার পাঠ-গৃহে গেল। ঝির সমক্ষে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু গৃহে আসিয়া ষোড়শী তার সে ধারা রোধ করিতে পারিল না! প্রথমে বিন্দু বিন্দু শেষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল, বর্ষাস্নাত প্রস্ফুট গোলাপের মত তখন সে কম গণ্ডদ্বয় আরো সুন্দর দেখাইতেছিল! বাম হস্তে বাম কপোল রাখিয়া ষোড়শী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল! তখন তার মনের ভাব

"কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে
আপনা আপনি কেন সুখী নহে নর!"

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ষোড়শী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল! তখন সে যিনি সকল দুঃখের বিনাশক, সকল তাপের নিবারক, সেই দয়াময়ের আশ্রয় লইল। সে নাম স্মরণে ষোড়শীর মনে আবার বলের সঞ্চার হইল, সে আপনার দুর্ব্বলতায় আপনি লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—"মন্মথের অসুস্থতার সংবাদে আমার মন এত উতলা হইল কেন? তাহার এ অবহেলায় আমার বুকে এত ব্যথা লাগিল কেন? কেন বা তাহার এ ব্যবহারে আমার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিল? আমার ঋষিতুল্য স্বামী, আমার স্নেহময় স্বামী, আমার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ?, কোথায় তুমি দয়াময়, অবলার প্রতি করুণা কর; কোথায় তুমি পতিত পাবন, এ পতিতোন্মুখের উদ্ধার সাধন কর;—এ বহ্নিমুখ হইতে এ দুর্ব্বল পতঙ্গকে রক্ষা কর;—এ বংশী রবে মুগ্ধ কুরঙ্গিনীকে ব্যাধের জাল হইতে মুক্ত কর! স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান, স্বামী চিন্তা, ভিন্ন আমার হৃদয়ে—অন্যের ছায়া-মাত্র যেন না পড়ে!

—হৃদয় কঠিন হও,
চাহিব না কারো পানে!"

ষোড়শী যুক্ত-করে, মুক্ত হৃদয়ে, সিক্ত চক্ষে এই ভাবে বার বার ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

ক্রমশ

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রাখী।

প্রভু,
আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখোনা ঢাকি!
এসেছি তোমারে; হে নাথ,
পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি।

আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে।
তোমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমা[illegible]াক॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বিস্মৃত জনপদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

মহারাজাধিরাজ রাজ পরমেশ্বর দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজয়নগরের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। সে তিমিরাবৃত পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত আলোক যে কি প্রকারে পাওয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে। দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের জয়গৌরবগায়ক ফিরিস্তা এবং সমসাময়িক পরিব্রাজক নুনিজ উভয়েই আপন আপন কাহিনী লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে সমুপস্থিত। সে কাহিনীর একটীর সহিত আর একটীর মিল নাই!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে বিজয়-নগরের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে "সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং অবস্থা পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া অনুমানের বলে অগ্রসর না হইলে উপায় নাই।" সেই অনুমানের বলে অগ্রসর হইয়া একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন ফিরিস্তা অপেক্ষা নুনিজ সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। *

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে ফিরিস্তার স্থান অনেক উচ্চে ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই প্রামাণ্য ইহা বলা যায় না। সেনানায়ক মহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ ঐতিহাসিক ফিরিস্তা নামে জনসমাজে পরিচিত। তিনি জন্মাবধি অসিচালনাই করিতেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ একদিন বিজাপুরের স্বাধীন মুসলমান নৃপতির কৃপা-কটাক্ষলাভ করিয়া অসির সহিত লেখনীও ধারণ করিলেন। ইহা ১৫৯৩ খৃঃ অব্দের কথা। তখন পর্য্যন্তও তিনি 'তারিখ-ই ফিরিস্তা' লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তিনি বিজাপুরের রাজদূত স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট কাশ্মীরে প্রেরিত হইয়া লাহোরের সন্নিকটে সম্রাট সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'

* If we are to be guided purely by probabilities, it would seem that the history given by Nuniz is likely to be more accurate of the two.—Sewell.

রচনা করিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। * সম্ভবতঃ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিক সিউএল সাহেব বলিয়াছেন যে ফিরিস্তা ১৬০৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই। পরিব্রাজক নুনিজের কাহিনী বিজয়নগরপতি অচ্যুতের শাসন সময়ে বিজয়নগরেই লিখিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুর রাজ্যে বসিয়া হিন্দু কর্ম্মবীরদিগের মুখে অনেক কথাই হয়ত শুনিয়া ছিলেন। সুতরাং ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে লিখিত নুনিজের কাহিনীই ১৬০৭ খৃঃ অব্দে আহামদ নগরে রচিত ফিরিস্তার ইতিহাস অপেক্ষা সমধিক প্রামাণ্য।

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিরূপাক্ষ রায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কেবল রমণী ও সুরা লইয়াই কাল কাটাইলেন, পিতৃ পিতামহদের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া, বিজয়নগরের গৌরব ও সম্মান, স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। মদিরায় বিভ্রান্তচিত্ত রমণীর বিলোল কটাক্ষে উন্মত্ত বিরূপাক্ষ রায় কখনো গৃহের বাহির হইতেন না—কি সেনাপতি কি সৈন্য কি প্রজাসাধারণ কেহই তাঁহার দর্শন পাইত না! সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্বাধীনতালিপ্সু, সমরকুশল অকুতোভয় স্বদেশপ্রাণ পূর্ব্ব নরপতিগণ হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ঢালিয়া যে সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন সে সমুদায় একে একে কক্ষ ভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় খসিয়া পড়িতে লাগিল। বিজয়নগরের হিন্দুযোধগণ দুর্ব্বার মুসলমান সমরে আত্মবলি দিয়া দিনে দিনে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যে সকল বিজয় মালিকা আহরণ করিয়া হিন্দুর গৌরবভূমির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, বিরূপাক্ষের চরিত্রহীনতায় ও ব্যসনে সে সমুদায় স্খলিত হইতে লাগিল—রাজার পাপে সোণার রাজ্য ডুবিতে লাগিল! রাজ্যের সামন্তবর্গ তখন প্রত্যেকেই স্বাধীন হইয়া উঠিলেন এবং যাঁহার হস্তে যে জনপদের শাসন ভার ন্যস্ত ছিল, তিনি তাহাই আত্মসাৎ করিলেন! সুতরাং দেখিতে না দেখিতে গোয়া, ছাউল, দাবল প্রভৃতি রাজ্য বিরূপাক্ষের হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

বিরূপাক্ষ যেমন চরিত্র হীন, তেমনি নিষ্ঠুর ছিলেন। শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বরাজ্যের অনেক প্রধান ব্যক্তিদিগকে নিহত করিলেন। তিনি এক দিন নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলেন যে কোন একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার কক্ষে বিনানুমতিতে প্রবেশ করিয়াছেন। অমনি পর

* During his travels, which at our time reached even to Badakhshan, he must, of course, have extended his observation, and amused the materials which were made use of in his history.—Elliot's History of India, vol vi.

দিন প্রভাতে সেই নিরপরাধ সৈন্যাধ্যক্ষের শির ভূমিতে লুটাইল।

পাপীর দণ্ড ভগবান প্রদান করিয়া থাকেন। সে দণ্ডের হস্ত হইতে কাহারো অব্যাহতি নাই। বিরূপাক্ষেরও দণ্ড হইল। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল। উভয়ে একদিন পরামর্শ করিলেন যে পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্যের কণ্টক দূর করিবেন! সয়তান আসিয়া জ্যেষ্ঠের স্কন্ধে ভর করিল—তাহারই শাণিত ছুরিকাঘাতে হতভাগ্য বিরূপাক্ষ মানবলীলা সংবরণ করিলেন! যে মহান্ জাতির জ্ঞানবৃদ্ধ জগন্মান্য শিক্ষাগুরু বজ্র নির্ঘোষে বলিয়া গিয়াছেন—'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ' যে জাতির মহাকাব্য সরযূ তীরে পিতৃ সত্য প্রতিপালনের অত্যুজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়া পৃথিবী মধ্যে অমরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, সেই জাতির রাজকুমার নিদ্রিত পিতার শয়ন কক্ষে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার মুক্ত বক্ষে স্বহস্তে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিল! বিজয়নগরের পাপের ভরা আরও ভারি হইল।

পিতৃরুধির রক্ত হস্তে পিতৃসিংহাসন স্পর্শ করিতে পিতৃহন্তার সাহস হইল না। সে বলিল 'না না আমি পারিব না—পিতার রুধিরে আমার দেহ অনুরঞ্জিত হইয়াছে—আমি সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারিব না। আমার কনিষ্ঠের শিরে রাজমুকুট স্থাপিত হউক।' তাহাই হইল। কনিষ্ঠ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি দেখিলেন, অগ্রজ জীবিত থাকিতে নিঃশঙ্ক হইবার উপায় নাই। যে হস্ত পিতার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়াছে তাহা মুহূর্ত্তে যার তার হৃৎপিণ্ড কাটিতে পারে! দুষ্ট সহচরগণ নৃপতির মনোরঞ্জনার্থ বলিল তাহা নিশ্চয়—সিংহাসনের কণ্টক দূর করাই শ্রেয়ঃ।' অমনি ভ্রাতা ভ্রাতার কণ্ঠছেদন করিল। মুসলমান নৃপতির ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে কিন্তু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ যাহাদিগের ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষক তাহাদিগের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বুঝি আর নাই!

ভ্রাতা ভ্রাতার কণ্ঠছেদন করিল-বিধাতার অভিসম্পাত পূর্ণ হইল। পিতৃহন্তার প্রায়শ্চিত্ত হইল। অগ্রজকে বধ করিয়াই কনিষ্ঠ আপনাকে একেবারে নিরঙ্কুশ বলিয়া মনে করিলেন এবং পিতৃপদাঙ্কানুসরণ করিয়া ব্যসনে মনোনিবেশ করিলেন। সুরার উৎস ছুটিল—রাজপ্রাসাদ রমণীর লীলাচঞ্চল চরণ-নূপুর শিঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল—রাজকার্য্য ভাসিয়া গেল!

রাজ্য মধ্যে তখন যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলেন রাজ্য যায়—স্বাধীনতা যায়—সব যায়। শলুভ বংশের নরসিংহ রায় তখন বিজয়নগরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি অগ্রণী হইয়া সকলকে আহ্বান করিলেন। ক্ষমতা শক্তি প্রতিষ্ঠা তখন যাঁহাদের হস্তে ছিল, নরসিংহ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'ওঠো জাগো সকলে সমবেত হইয়া বিজয়নগর রক্ষা কর—হিন্দুর গৌরব বাঁচাও'। সকলে দেখিলেন তখনো সময় আছে, তখনো চেষ্টা করিলে হৃতগৌরব আবার ফিরিতে পারে। কল্যাণশ্রী আবার মুখ

তুলিয়া চাহিতে পারেন। তাঁহারা জাগ্রত হইলেন। জাগ্রত হইয়া খরকৃপাণ ধারণ করিলেন। দেশমধ্যে বিদ্রোহের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

নৃপতি তখন রমণী লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত। এ সকল দেখিবার বুঝিবার ও প্রতিকার করিবার অবসর তাঁহার তখন ছিল না। তাঁহার ঘৃণিত আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া যে হতভাগ্য প্রমোদ কক্ষে রাজ্যের সংবাদ বহিয়া লইয়া গেল তাহারই লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিল না! নরসিংহের একজন সেনাপতি আসিয়া যখন বিজয়নগরের সিংহদ্বার সুমুখে বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করিল তখন তাহাকে বাধা দিবার আর কেহ থাকিল না। সুরাপ্রমত্ত নৃপতি ইহা শুনিয়াও বলিলেন, 'ও কিছু নয়—কার এমন সাহস যে আমার প্রাসাদ অক্রমণ করিবে? নাচো গাও আনন্দ কর!' বিদ্রোহী সেনার অধ্যক্ষ যখন নগর প্রবেশ করিলেন তখনো রাজার নিকট সংবাদ গেল—তখনো তিনি কহিলেন, 'ও কিছু নয়—নাচো—গাও—আনন্দ কর।' সেনাপতি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন—প্রাসাদতোরণ হইতে রাজার প্রমোদ কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন—দুই চারিজন রাজ অঙ্কভাগিনী রমণীর ছিন্নদেহ কক্ষদ্বারে লুটাইয়া পড়িল—চারিদিকে রক্তস্রোত—চারিদিকে কোলাহল! তখন নৃপতির মোহ ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন সত্য সত্যই সব গিয়াছে। ভীরুর সকল শক্তি তখন চরণদ্বয়কে আশ্রয় করিল। প্রাসাদ, প্রমোদভবন, বরনারী সহচরী সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি তখন প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। নরসিংহ নির্ব্বিবাদে বিজয় নগরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।*

নরসিংহের শাসন কাহিনীর বিস্তৃত ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। ফিরিস্তা বলিয়াছেন, 'তিনি শক্তিশালী নরপতি ছিলেন।' নুনিজ লিখিয়াছেন 'নরসিংহকে প্রজাসাধারণ ভালবাসিত।' রাজা কৃষ্ণ দেবরায় ১৫০৯ খ্রীঃ অব্দে বিজয় নগরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে নরসিংহ ও বীর নরসিংহ রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ফিরিস্তা ও নুনিজ উভয়েই এই সময়ের ইতিহাস

* When the King was told of the up rising of this captain Narsinha, how he was approaching and seizing his lands and how many people were joining him, he seemed unmindful of the loss he had suffered, he gave no heed to it nor made ready, but, instead, he only ill-treated him who had brought the news so that a captain of the army of this Narsinha arrived at the gates of Bisnaga, and there was not a single man defending the place; and when the King was told of his arrival he only said that it could not be. Then the captain entered the city, and the King only said that it could not be. Then he even entered his palace and came as far as the doors of his chamber, slaying some of the women. At last the King believed, and seeing now how great was the danger, he resolved to flee by the gates on the other side; and so he left his city and palaces, and fled.

—Chronicle of Fernas Nuniz.

লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একের সহিত অঙ্কের মিল নাই।

রাজা নরসিংহ যে শক্তিশালী নরপতি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। বিজয়নগরের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া, দেশে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দীর্ঘকালের রাজত্বের পর নরসিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

এই যুগে বিজয়নগরে যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বিজয়নগরের চিরশত্রু বাম্‌নি সাম্রাজ্যেও সেইরূপ নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিয়াছিল। বিজয়নগরের কাহিনী বুঝিবার জন্য তাহারও আলোচনা করা প্রয়োজন।

হসন গাঙ্গু নামে একজন নিম্ন শ্রেণীর পাঠান কালক্রমে দক্ষিণের রাজা হইয়াছিলেন। গাঙ্গু নামক একজন ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞের অধীনে কয়েক বিঘা জমী লইয়া হসন প্রথমে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজদরবারে গাঙ্গুর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে হসন একদিন দেখিলেন মৃত্তিকা নিম্নে অনেক অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে। হসন সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সে অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া প্রভু গাঙ্গুকে প্রদান করিলেন। হসনের সাধু চরিত্র দর্শনে পুলকিত গাঙ্গু রাজ সদনে হসনকে পরিচিত করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে হসনের পদোন্নতি ঘটিতে লাগিল। শেষে যখন দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিল, বিদ্রোহীগণ তখন হসনকে তাহাদের নেতৃপদে বরণ করিয়া লইল। হসন ইতি পূর্ব্বেই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় নামের সহিত প্রভু গাঙ্গুর নাম সংযুক্ত করিয়া হসন গাঙ্গু নামে পরিচিত হইতেছিলেন। বিদ্রোহী দলপতি হইয়া এখন তিনি প্রভুর জাতি বাচক সজ্ঞা 'ব্রাহ্মণ' শব্দটীকে ও গ্রহণ করিয়া হসন গাঙ্গু বাম্‌নি নামে আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন।

ওরঙ্গলের বিদ্রোহ এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বিদ্রোহীদিগের অনেক সুবিধা করিয়া দিল। সম্রাট মহম্মদ তোগলক অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ওরঙ্গল-নৃপতি হসন গাঙ্গুর সাহায্যার্থ নিজের অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন। হসন গাঙ্গুবাম্‌নি এইরূপে বাম্‌নি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কালক্রমে বাম্‌নি সাম্রাজ্যের সহিত বিজয় নগরের ভীষণ সমর উপস্থিত হইল। হিন্দুবীরগণ বিজয় নগরের স্বাধীনতা রক্ষার্থ সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। যুদ্ধ অবিরাম চলিতে লাগিল। বিজয়লক্ষ্মী কখনো বিজয়নগরের প্রতি কখনো বা বাম্‌নি সাম্রাজ্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

বাম্‌নি সুলতানগণ যতদিন দিল্লীর সম্রাটের শক্তিচূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, বিজয়নগর এবং ওরঙ্গলের হিন্দু নৃপতিগণ ততদিন বাম্‌নি বাহিণীর পার্শ্বে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করাই তাহার মূলকারণ ছিল। যখন দিল্লীর সম্রাট হৃতগর্ব্ব হইলেন তখন বাম্‌নি সাম্রাজ্যের শক্তি বর্দ্ধিত হইল। দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনতা প্রিয় হিন্দুরাজগণ দেখিলেন বাম্‌নি সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন না করিতে পারিলে দাক্ষিণাত্যে

মুসলমানের গতি রোধিত হইবে না। তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া বাম্‌নি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের এই মহা-মিলনই বিজয়নগরের প্রকৃত ইতিহাস। সে গৌরবের ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন হিন্দু ঐতিহাসিক এতদিনও অগ্রসর হয়েন নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

বাম্‌নি রাজবংশের দশম নৃপতি আলা-উদ্দীন ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে পরলোকে গমন করিলে তাঁহার পুত্র হুমায়ূন সিংহাসনে আরোহন করিলেন। হুমায়ুন ভীষণ কোপন স্বভাব ও রক্ত পিপাসু ছিলেন। তিনি অবিলম্বে তেলেগু প্রদেশে যুদ্ধাভিযান করিলেন। অধর্ম্ম সমরে সুলতান হুমায়ুনের ভীষণ পরাজয় ঘটিল। হুমায়ুন ১৪৬১ খৃঃ অব্দে পরলোকে গমন করিলেন। তখন দ্বিতীয় দেবরায়ের পুত্র মালিকার্জ্জুন বিজয় নগরের সিংহাসনে বর্ত্তমান ছিলেন।

অষ্টম বর্ষীয় বালক নিজাম শাহ হুমায়ুনের রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ মহম্মদ ১৪৬৩ খৃঃ অব্দে বাম্‌নি সাম্রাজ্যের সুলতান রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন সম্ভবতঃ বিরূপাক্ষ বিজয়নগরের নৃপতি ছিলেন। চরিত্র হীন বিরূপাক্ষ মদিরা লইয়াই কাল কাটাইতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া সুলতান মহম্মদের বিজ্ঞ মন্ত্রী মহম্মদ গওয়ান গোয়া নগর অধিকার করিয়া লইলেন। তখন মুসলমানগণই সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাণিজ্যের একমাত্র কর্ত্তা ছিল। মুসলমান বণিকগণ তখন হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদিগের জন্য সহস্র সহস্র সুন্দর অশ্ব আনাইয়া বিক্রয় করিত। বিজয়নগর-সম্রাট এই সকল অশ্বের উপরই সমধিক নির্ভর করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে ভট্‌কলের মুসলমান বণিকগণ হিন্দু-নৃপতির নিকট অশ্ব বিক্রয় না করিয়া মুসলমানদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রোধান্ধ বিজয়নগরপতির আদেশে দশ সহস্র নিরপরাধ মুসলমান নিহত হইয়াছিল! যাহারা কোন-মতে প্রাণ রক্ষা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারাই গোয়ায় উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক গোয়া নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যাহা হউক, এই অকারণ হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুলতান মহম্মদের মন্ত্রী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিয়া গোয়া অধিকার করিয়া ছলেন।

সেকালে বিজয়নগর ও বাম্‌নি সাম্রাজ্যের মধ্যে যে ভীষণ রণ হইয়াছিল তাহার কারণ হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বা মুসলমানের প্রতি হিন্দুর জাতিগত বিদ্বেষ নহে, তাহার প্রকৃত কারণ আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা। দীর্ঘকাল ব্যাপী এই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের ফলে এবং উভয় রাজ্যের শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার মানসে পরস্পর বান্ধবের ন্যায় অসি ধারণ করায়, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের ক্রম বর্দ্ধমান জাতিগত ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।* তাই আমরা দেখিতে পাই হিন্দু বিনা আপত্তিতে

* These long wars are tolerably equal terms, together with occasional alliance against common enemies, same to have had some effect in mitigating the overbearing conduct of the Musalmans towards the Hindus.—Elphinston's History of India p. 475.

মুসলমানের এবং মুসলমান বিনা বাধায় হিন্দুর অধীনে কার্য্য করিত। মালব-সৈন্য যখন বাম্‌নি সামাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল তখন দ্বাদশ সহস্র পাঠান ও রাজপুত বীর মালবের গৌরব রক্ষার্থ অসি ধারণ করিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি বিজয়নগর-পতি দেবরায় মুসলমানদিগকে আপন সৈন্য মধ্যে গ্রহণ করিতেন, মুসলমান সেনাপতিদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন এবং হিন্দু হইয়াও মুসলমানদিগের উপাসনার নিমিত্ত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের এই সখ্য ভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা স্থানে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। সে ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহার শিক্ষাকে গ্রহণ না করিলে স্বেচ্ছায় আত্মাবমাননা করা হয়।

দিনে দিনে সব যায় দাক্ষিণাত্যে মুসলমান গৌরবের প্রবল প্রহরী বাম্‌নি সাম্রাজ্যেরও ধ্বংস হইবার কাল সমুপস্থিত হইল। সে ধ্বংসের বীজ অন্যত্র হইতে আসে নাই—রাজ্যের যাঁহারা স্তম্ভ তাঁহারাই তাহা বপন করিয়াছিলেন। সৈন্য মধ্যে সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের ভিতর যে দ্বেষ বর্ত্তমান ছিল তাহাই ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। সেই ঈর্ষ্যানল ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া সেনাবাস হইতে রাজ্যমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—ক্রমে ক্রমে রাজসভা, মন্ত্রগৃহ, বিচারমণ্ডপ সকল স্থানে প্রবেশ করিয়া রাজা ও রাজ্য উভয়ই ভস্ম করিয়া ফেলিল! সে কাহিনী বর্ণনা করিবার স্থান ইহা নহে। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ কিরূপে মুসলমানের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিলেন, প্রবল প্রতাপ বাম্‌নি বাহিনী কিরূপে সংমিলিত হিন্দুদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছিল—বিস্মৃত জনপদের ইতিহাস শুধু তাহারই ইতিহাস।

উড়িষ্যার রাজার আত্মীয় অম্বররায় লোভপরবশ হইয়া উড়িষ্যার রাজসিংহাসন লাভের আশায় বামনি সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ সুলতান মহম্মদের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। অম্বররায় প্রতিশ্রুত হইলেন যুদ্ধে জয় হইলে সুলতান মহম্মদের অধীনে করদমিত্র নৃপতি স্বরূপ বাস করিবেন এবং কৃষ্ণা ও গোদাবরী তীরে রাজমহান্দ্রি ও কন্দাপিল্লি জনপদ তাঁহাকে দান করিবেন। সুলতান সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার বিপুলবাহিনী অম্বররায়ের হস্তে উড়িষ্যা প্রদেশ অর্পণ করিল, তিনিও আত্মপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া সুলতানকে রাজমহান্দ্রি ও কন্দাপিল্লি প্রদান করিলেন। কিছুকাল পর তিনি দেখিলেন স্বকার্য্য উদ্ধার করা হইয়াছে, সুলতানকে তুষ্ট রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। অম্বর রায় পূর্ব্বপ্রদত্ত রাজমহান্দ্রি ও কন্দাপিল্লি কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুলতানের সহিত যুদ্ধে অম্বররায় পরাজিত হইলেন। সুলতানের সৈন্য বীর পদভরে জলস্থল কম্পিত করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জয়হৃষ্ট মুসলমান সৈন্য কন্দাপিল্লির দেবমন্দির চূর্ণ করিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের শোণিতে দেবতার পাদপীঠ অনুরঞ্জিত হইল—শেষে মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর থাকিল না; সুলতানের

আদেশে তথায় একটী মসজেদ শির উত্তোলন পূর্ব্বক উর্দ্ধনেত্র হইয়া ভগবানের স্বর্ণসিংহাসনের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজা নরসিংহ তখন বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন বটে কিন্তু সুলতানের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সুলতান অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাঞ্চির সুবর্ণমণ্ডিত মণিমুক্তাখচিত মন্দির লুণ্ঠিত হইল, রাজ মহাদ্রি রুধির স্রোতে ভাসিয়া গেল। কোন্দাবিদ্ দুর্গ সুলতানের করায়ত্ব হইল। চতুর্দ্দিকে মৃত্যু ও ধ্বংস বিস্তার করিয়া সুলতান মস্‌লিপত্তন অধিকার করিয়া লইলেন। বাম্‌নি সুলতানের ইহাই শেষ সমরবিজয়। কিছুকাল পরই তিনি বিশস্ত বিনত অমাত্য মহম্মদ গওয়ানকে বিনা কারণে হত্যা করিলেন! বৃদ্ধের তপ্তশোণিত প্রতিশোধের জন্য রোদন করিতে লাগিল! বাম্‌নি সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ এই লোমহর্ষক ব্যাপারে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন —দেশমধ্যে ভীষণ বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হইল। সেই অনলস্পর্শে বাম্‌নি সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া গেল

বাম্‌নি সাম্রাজ্যের চিতাভস্মের উপর তখন পঞ্চ মুসলমান রাজ্য * উত্থিত হইয়া বিজয়নগরের ললাটলিপি লিখিয়া রাখিল। রাজা নরসিংহ প্রথমে সেই পঞ্চমুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্বিরোধে লিপ্ত হইয়া একের বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মুদ্‌কল এবং রাইচূড় পুনরায় বিজয়নগরের অধীন হইল।

ভারতের ভাগ্যবিধাতা এই সময়ে পর্ত্তুগীজ ভাস্কদাগামাকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া মুসলমান বাণিজ্যের উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থা করিলেন। ১৫০৬ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক ভর্থেম বিজয়নগর পরিভ্রমণ করিয়া লিখিলেন—"নগর অতি বৃহৎ এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। ....রাজার অধীনে সর্ব্বদা ৪০০০০ অশ্বারোহী এবং ৪০০ হস্তী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠে ছয় জন করিয়া যুদ্ধার্থী গমন করে। যুদ্ধের সময়ে হস্তির শুণ্ডের সহিত দীর্ঘ তরবারি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ......নৃপতি স্বয়ং যে অশ্বে আরোহণ করেন তাহা এতই বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত হয় যে সে অশ্বের মূল্য আমাদের কতিপয় নগরের মূল্যের সমান।"

ভর্থেম যখন বিজয়নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার তিন বৎসর পরই কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাই বিজয়নগরের সুবর্ণযুগ—ইহাই হিন্দু-প্রতিষ্ঠা, হিন্দুশক্তি ও হিন্দুসমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠার সময়। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ সেই সুবর্ণযুগের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন অথচ আমরা আমাদের গৌরবেতিহাসের কোন ধারই ধারি না—আমাদের মুদ্রাযন্ত্রও তাই শুধু "উপন্যাস" ও "নবন্যাস"ই প্রসব করিতেছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

* (১) বিজাপুরে আদিল শাহী।
(২) আহম্মদাবাদে বারিদ শাহী।
(৩) বিরারে ইমাদ শাহী।
(৪) আহমদনগরে নিজাম শাহী।
(৫) গোলকণ্ডায় কুতব শাহী।

ভোজনতত্ত্ব।*

(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলি অবলম্বনে।)

সংযমশিক্ষক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাগই করুন আর যাই করুন, আমি খোলসা বলিতেছি, আমি একটু ভোজনবিলাসী। ব্রাহ্মণের উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সময়বিশেষে ব্রাহ্মণের পারণ একটু মাত্রা অতিক্রম করে ইহাও স্বাভাবিক। জড় জগতের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অমোঘ নিয়ম জীবজগতেও খাটে। হিন্দু বিধবাদিগের নির্জলা একাদশী জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহাদের দশমী দ্বাদশীর ব্যাপারটা একটু মাত্রা অতিক্রম করে না কি? বশিষ্ঠ ঋষি জঠরজ্বালায় নরমাংস খাইয়াছিলেন, অগস্ত্যমুনি আর কিছু না পাইয়া সমুদ্রের লোনা জলে উদর পূরাইয়াছিলেন, জহ্নুমুনি ভাগীরথীর সদ্যোনিঃসৃত সলিলরাশি এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়াছিলেন,—এ সব শাস্ত্রের কথা, অবিশ্বাস করিবার যো নাই। আর এখনও অনেক 'কলির ব্রাহ্মণ' মুখপ্রিয় নিষিদ্ধ মাংস, এবং লবণাম্বু অপেক্ষাও তৃষ্ণানিবারক ও গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্র পেয়, পাত্রকে পাত্র উদরস্থ করেন ইহাও দেখিতে পাই। অতএব নজীরের যখন অভাব নাই, আর অদ্যকার রাত্রিতে মিলনের ঘটক অভিন্ননাম। মিত্র মহাশয়ের গৃহে যখন কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া সরভাজার সসরঞ্জাম সমাবেশ, তখন দেশকালপাত্র বিবেচনায় ভোজনতত্ত্ব আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ইহাতে কিঞ্চিৎ কটুতিক্তকষায় রস থাকিলেও তাহা পাঁচ রকমের মিষ্টান্নের সঙ্গে উদরস্থ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না, পরন্তু এত মিষ্টান্নের সঙ্গে উদরস্থ করিলে হরীতকীর ন্যায় উপকারী ভিন্ন অপকারী হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরে কি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে? মনস্বী লেখক কি কেবলমাত্র পাঠকপাঠিকার ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য এতগুলি উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন? না তদপেক্ষা অন্য কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল? এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে কখনও যথাযথ আলোচনা হয় নাই। আমার পরম বন্ধু ত্রিবেদী মহাশয় একবার তাঁহার বিজ্ঞানের দূরবীণ কষিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে এই সমস্ত বিচিত্র প্রেমের কাহিনীতে Darwin, Huxley ও Herbert Spencer-এর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি সুপরিস্ফুট। 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আবার আজকাল এক শ্রেণীর সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক অনুবীক্ষণের সাহায্যে উপন্যাসগুলির ভিতর রাজদ্রোহের জীবাণু বা বীজাণু দেখিতে পাইতেছেন। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' আমি কিন্তু গ্রন্থগুলি যখনই পড়ি তখনই তাহার ভিতর এই পরমতত্ত্ব দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই যে, পরিবারমধ্যে পত্নীর প্রকৃত স্থান কোথায়, কি ভাবে স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত সহায় হইতে পারেন, এই গভীর প্রশ্নের বিচার করিবার উদ্দেশ্যেই আখ্যায়িকাগুলি লিখিত। (কোনও কোনও ইংরেজ সমালোচক টেনিসনের

---

* গত রাসপূর্ণিমায় পূর্ণিমামিলন উপলক্ষে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের ভবনে পঠিত।

Idylls of the King নামক কাব্যমালারও এইরূপ উদ্দেশ্য পরিকল্পনা করেন।) আমার প্রকৃতির দোষে কি কবির প্রতিভার গুণে এরূপ প্রতীয়মান হয় বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমি যেরূপ বুঝিয়াছি যথাজ্ঞান নিবেদন করিতেছি। আপনারা শ্রবণকালে 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই প্রবাদবাক্যটি স্মরণ রাখিবেন।

অজ রাজা যখন পত্নীবিরহে বিকলচিত্ত তখন 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' এই বলিয়া আদর্শপত্নীর গুণগান করিয়াছেন। দুই পুরুষ পরে যখন আবার শ্রীরামচন্দ্রের প্রায় সেই দশা উপস্থিত, তখন তিনিও ওই কথাটাই আরও একটু ঘোরালো করিয়া 'কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী, স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্যা, রঙ্গে সখী', বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। এই প্রাচীন নজীর দৃষ্টে নগেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ণবিপর্য্য শ্লোকে বলিয়াছেন :— 'সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।' কিন্তু এ সব ত ভাবপ্রবণতা (Sentiment) ইহাতে পাকা কাযের কথা পাওয়া যায় না। পত্নীর পত্নীত্ব কোথায়, ইহার practical solution যদি চাহেন তবে practical ইংরাজ জাতির ভাষা অনুসন্ধান করুন। ইংরাজীতে একটা আছে :— The best way to a man's heart is through the stomach ; কথাটা ডাক্তারী শাস্ত্রসম্মত কিনা জানিনা, কিন্তু কথাটা বড় পাকা। কার্য্যকুশল ইংরেজের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণে পত্নীর প্রকৃত পত্নীত্ব কোথায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই সুকবি টেনিসন গাহিয়াছেন "Man for the field and Woman for the hearth"। আর এই কথাই পরমজ্ঞানী রাস্কিন আরও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন :—

Lady means loaf-giver or bread-giver ; she should see that every body has something nice to eat ; she should be a cook combining English thoroughness, French art and Arabian hospitality.

এ ত দেখিতেছি আমাদেরই হিন্দু আদর্শ। জানিনা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রাস্কিন্ কখনও এই মূর্ত্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিনা, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব এই সোণার অন্নপূর্ণা ও মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি, রন্ধনে ও পরিবেষণে সিদ্ধবিদ্যা এই দশভুজা মূর্ত্তি, হিন্দুগৃহে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই আদর্শ, প্রকৃত গৃহিণীর আদর্শ। হিন্দু পত্নীর আসল পত্নীত্ব এইখানে। এই জন্যই পাকস্পর্শ না করিলে জ্ঞাতিকুটুম্ব বশ হয় না। এই মন্ত্রে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী বশ করিয়াছিলেন, এই মন্ত্রের প্রভাবে ফুল্লরা খুল্লনা স্বামিসোহাগিনী, এই মন্ত্রবলে ভারতচন্দ্রের হাস্যমুখী পদ্মমুখী সপত্নীসত্ত্বেও পতির আদরিণী গরবিণী সুয়ারাণী। নলরাজা যদি বাবুর্চ্চিখানার ব্রাহ্মণের ন্যায় নিজে রন্ধনপটু না হইয়া বিদ্যাটা দময়ন্তীকে শিখাইতেন, তাহা হইলে কি আর রাজ্যভ্রষ্ট হইতেন, না দময়ন্তীকে হারাইয়া কষ্ট পাইতেন? 'স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে'

যে একটা প্রবাদ আছে সে কাহার রান্নার গুণে তাহা বিষ্ণুশর্ম্মা হইতে 'বুনো রামনাথ' পর্য্যন্ত বিলক্ষণ জানিতেন। বাস্তবিক, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের সঙ্গে বামাঙ্গিনী বামার নিত্যসম্বন্ধ। তবে শাস্ত্রে একটা কথা আছে বটেঃ—'মাতরঞ্চ মহানসে'। কিন্তু আমার বোধ হয় ওটা প্রক্ষিপ্ত। কোনও'রসিকো নব্য যুবা' নবোঢ়া প্রণয়িণীর সঙ্গে দুদণ্ড বিশ্রম্ভালাপের সুবিধার জন্য Coast clear (কোষ্ঠখোলসা) পণ্ডিতীভাষায় স্থানটি নির্ম্মক্ষিক করিবার উদ্দেশ্যে মাতাঠাকুরাণীর উপর ঐরূপ বরাত চালাইয়াছেন। রন্ধনশালার ভার প্রকৃতপক্ষে পত্নীর।

এখন দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে কি কৌশলে এই শিক্ষা দিয়াছেন। সার্থকনামা অমৃতলালের অমৃতময়ী 'বৌমা' বলিয়াছেন, "উপন্যাসের নায়িকারা কখনও ভাত রাঁধেন নাই।" সে কথাটাও পরখ করা যাক্।

১। দুর্গেশনন্দিনী, এই গ্রন্থে বিদ্যাদিগ্‌গজের স্বপাক আহার ছাড়া আর রান্না বান্নার কথা বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রেমবিহ্বলা নায়িকা তিলোত্তমা আন্মনে হিজিবিজি লিখিতেছেন, কেননা শাস্ত্রে বলেঃ—কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহকারনং। তাহার পর, বিমলা? তিনি ঘটা করিয়া চুল বাঁধিতেছেন, সপত্নীকন্যার প্রণয়দূতী সাজিবেন আর প্রতিনিধি সাজিয়া ভাবী জামাতার নিকট অভিসারে যাইবেন, এই সব লইয়াই ব্যস্ত। আস্‌মানির ত dog (লিঙ্গ বদ্‌লাইয়া লইবার ভার শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর) in the manger policy, তিনি নিজে রাঁধিয়া দিতে পারেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণের তৈয়ারী ভাত নষ্ট করিয়া দিতে পারেন। আর নবাবনন্দিনী আয়েষা ত সেবাধর্ম্মনিরতা মানবীবেশে দেবী, ministering angel; Rebecca ও Florence Nightingaleএর কনিষ্ঠা এবং কুরুক্ষেত্রের সুভদ্রার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তিনি অবশ্য রান্নাবান্নার অতীত। উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে কতবার মনে হইয়াছে, আহা, আয়েষা যদি স্বহস্তে একটু সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া জগৎসিংহকে খাওয়াইতেন, তবে মোগলসেনাপতির পুত্রের পরকাল ও নবাবজাদীর ইহকাল সমকালেই ঝর্ঝরে হইত। প্রেমময়ী তিলোত্তমা দুর্গাভ্যন্তরে স্বীয় কক্ষমধ্যে জগৎসিংহকে পাইয়া প্রেমাবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইয়া যদি চট্ করিয়া কেরোসিন ষ্টোভে গোটা দুই বেগুন ও খানকয়েক ফুল্‌কা লুচি ভাজিয়া দিতেন, তবে কি আর দেবে পদাঘাত পুরন্দর দুর্ভিক্ষ? আর আস্‌মানির হাতে বিদ্যাদিগ্‌গজ বেচারার জাত গেল, পেট ভর্‌ল না। যদি একদিন স্বহস্তে 'কালিয়া কাবাব রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান' না হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত তবে সেই মহাব্রাহ্মণের হুস্ হাস্ কলমা পড়াও সার হইত না, অভিরামস্বামীর উপযুক্ত শিষ্যের শিষ্যাদিগা গরীয়সী হইত। আমাদিগকেও আর 'যবনীমুখপদ্মানাং' ব্যাখ্যার জন্য এমন সুপাত্রকে ছাড়িয়া মল্লিনাথের কাছে ছুটিতে হইত না।

২। 'মৃণালিনী।' মৃণালিনীর প্রথম সাক্ষাতে দেখি, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের মামুলি ব্যবস্থামত চিত্র আঁকিতেছেন, সখী মণিমালিনী সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে-

ছেন, (যাহাকে ইংরাজী দণ্ডবিধিতে বলে aiding and abetting), আর দুজনে মনের কথা বলিতেছেন। ক্রমে জানিলাম, তিনি উপন্যাসের নায়িকার মত মালা গাঁথিতে জানেন, বস্ত্রে কারুকার্য্য করিতে জানেন, প্রণয়লিপি লিখিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে মূর্চ্ছা যাইতেও পারেন; তিনি হৃষীকেশ ব্রাহ্মণেরবাড়ী পরের অন্নে উদর পোষণ করেন, রন্ধনের কোনও ধার ধারেন না। এরূপ নারীর দাম্পত্যজীবন কণ্টকাবৃত হইবে বই আর কি? সখী মণিমালিনীরও রন্ধনের যোগ্যতা ছিল না, কাযেই অদৃষ্টে দাম্পত্যসুখ ঘটে নাই। তার পর ভিখারীর মেয়ে গিরিজায়া গান গায়, কবরীতে যুথিকার মালা পরে, দূতীগিরিতে দড়, সম্মার্জ্জনীচালনে ক্ষিপ্রহস্ত, কিন্তু হাতাবেড়ী নাড়িতে নারাজ। সম্ভবতঃ চা'ল চিবাইয়া বা চিড়া ভিজাইয়া জঠরজ্বালা জুড়াইত। কুসুমনির্ম্মিতা মনোরমা শৈবলিনীর ন্যায় মালা গাঁথিয়া বিড়ালের গলায় পরান এবং সারাজীবন প্রেমবহ্নিতে ও অন্তিমে পতির চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন, আগুনের সঙ্গে তাঁহার এইমাত্র কারবার। পশুপতির প্রেমেই তাঁর পেট ভরিত। আর বোধ করি জনার্দ্দন শর্ম্মার নবদ্বীপধামে রোজ নিমন্ত্রণ যুটিত। রত্নময়ী জেলেনী, সে রাঁধিতে জানিত কি না জানিত জানিয়া আমাদের ফল নাই। কথায় বলে বেল পাকিলে কাকের কি?

৩। 'কপালকুণ্ডলা'। কপালকুণ্ডলা ত কাঁচাখেগো দেবতার কাছে তরিবৎ, রান্নাবান্নার ধার ধারিতেন না। ফলমূলাশী কাপালিকের পালিতা কন্যা—'নাহি জানে রাঁধাবাড়া নাহি পাড়ে ফুঁ। পরের রাঁধনা খেয়ে চাঁদপানা মু'। তাই গ্রন্থকার খুব ঘোরালো করিয়া তাহার রূপবর্ণনার অবকাশ পাইয়াছেন। তাহার পর উড়িষ্যাপ্রত্যাগতা মতিবিবি যদি শুধু রূপের ডালি না খুলিয়া সেই রাত্রে চটিতে ভুনীখিঁচুড়ি চড়াইয়া দিতেন আর 'মুই হ্যাহু' বলিয়া পরিচয় দিয়া সেই দেবদুর্লভ আহার্য্য বলরামের ভোগ বলিয়া চালাইতেন তবে কি আর নবকুমার শর্ম্মা চটিতে পারিতেন, না উপন্যাসখানি বিয়োগান্ত হইত? সপ্তগ্রামের অরণ্যে আসিয়াও মতিবিবির রোদন সার হইল, এ বুদ্ধিটা অগর ঘটে আসিল না। নতুবা নবকুমারের 'পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' হইতে বাকী থাকিত কি? শ্যামা স্বামিবশীকরণের ঔষধ খুঁজিতে গিয়া আপনিও মজিল, কপালকুণ্ডলাকেও মজাইল। হায়! সে পুরুষ বশ করার সহজ ঔষধটা জানিত না। মোগলযুবরাজপ্রণয়িনী ভুবনসুন্দরী মেহেরউন্নিসা তরঙ্গে নূরজাহান মগধরাজকুমারপ্রণয়িনী মৃণালিনীর ন্যায় খাসকামরায় বসিয়া তস্বীর লিখিতেছেন, আর মতিবিবি সখী মণিমালিনীর ন্যায় তাঁহার নিকট বসিয়া চিত্র লিখন দেখিতেছেন এবং তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। এই ত ব্যাপার। বাঁদী পেষ্‌মন্‌ ত আসমানির ছোট বোন, তাহার কথা তোলা একেবারেই অপ্রয়োজন।

৪। 'রজনী।' রজনী 'ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপীকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া,' ফুলের মালা গাঁথে। উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা বটে, ফুলের স্পর্শ ও ঘ্রাণ তাহার জীবনকে একখানি

কাব্যে পরিণত করিয়াছে, তাহাতেই তাহার পেট ভরে, প্রাণ পূরে। তবে সে কি জন্য রাঁধিবে? আহা, বেচারা জন্মান্ধ, ভিতরে বাহিরে 'ঘোরা তিমিরা রজনী'। সে রাঁধিবেই বা কিরূপে? যাক্, সে শচীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষ, তাহাতে আবার অগাধ বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী, সোণায় সোহাগা। তবে এক ভরসা শচীন্দ্রনাথের আদর্শ স্ত্রীর বর্ণনায় 'রন্ধনে দ্রৌপদী' কথাটা আছে। তিনি বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের মত ঠিকে ভুল করেন নাই। তার পর ললিতলবঙ্গলতাও দ্বিতীয় পক্ষ, কিন্তু অমরনাথের একটি কথায় জানিতে পারি যে তিনি 'স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইতেছেন।' এই গুণেই তবে সতীন, সতীনপো ও খোদ মিত্রজা বশীভূত। ভুবনেশ্বরী চির রুগ্ণা, অতএব রন্ধনে অশক্তা; কাযেই, স্বামী ত স্বামী, আপন পেটের ছেলেও পর হইয়া গিয়াছে। ফুলবাগানের চাঁপা উগ্রগন্ধা; গোপালের প্রথম পক্ষ চাঁপাও উগ্রচণ্ডা। কেমন রাঁধিত জানি না, তবে স্বভাব দেখিয়া অনুমান হয় ব্যঞ্জনে লবণের ভাগ কম ও ঝালের ভাগ বেশী পড়িত। নতুবা শিশুশিক্ষার সুপরিচিত সুবোধ ও সুশীল গোপাল কেন নিমকহারাম হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ করিতে চাহিবে? 'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা,' ওটা ত একটা ছল; অনেক বাবুই ওরূপ ক্ষেত্রে হঠাৎ মনুর পরম গোঁড়া হইয়া পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, এই উপন্যাসখানি দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীরা সাদরে পড়িবেন।

৫। 'চন্দ্রশেখর।' গ্রন্থারম্ভে ত দেখিতেছি, শৈবলিনী রজনীর মতই ফুলের মালা গাঁথে, নিজে পরে, দ্বিপদ চতুষ্পদ সব জীবকেই পরায়। তবে সে রজনীর মত কাণা নহে, কিন্তু আর এক ভাবে কাণা; যখন দিব্য চক্ষু পাইয়াছিল তখন সে সে কথা বুঝিয়াছিল।* চন্দ্রশেখর মাতৃবিয়োগের পর স্বপাক খাইতেন, শৈবলিনীকে ঘরে আনিয়া সে কষ্ট ঘুচিয়াছিল কি না ঠিক জানা যায় না। এক রাত্রিতে স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িয়া রাখিয়া আপনি আহারাদি করিলেন এ কথা স্মরণ হয় বটে, কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জন যে তিনি রাঁধিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাই নাই। আমার বিশ্বাস চন্দ্রশেখর তখনও হাত পোড়াইয়া রাঁধিতেন; কেন না, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী। তাই শৈবলিনী-শৈবাল চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে ভালরূপে জড়াইতে পারে নাই। জাতি রক্ষার জন্য লরেন্স ফষ্টারের নৌকায় স্বহস্তে রাঁধিতেন বটে কিন্তু জোবানবন্দীতে প্রকাশ, সে কেবল চাউল সিদ্ধ করা ও দুধ। বোধ হয় তখন সবে হাতেখড়ি হইতেছে, তাও দায়ে পড়িয়া; পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাওয়ার কথাও শুনা যায়। তখনও তিনি হাতাবেড়ী অপেক্ষা ছুরি তরবারি নাড়িতেই বেশী মজবুত। সুন্দরী রূপেও সুন্দরী, গুণেও সুন্দরী, কিন্তু তাঁহারও রন্ধনের কথা পুথিতে কোথাও লেখে না। তিনি রন্ধনপটু হইলে শ্রীনাথ নিশ্চয় প্রকৃত ঘরজামাই হইয়া থাকিত ও পোষ মানিত। রূপসীর রূপ ছিল, কিন্তু রন্ধনে অজ্ঞতাবশতঃ বোধ হয় প্রতাপকে দাম্পত্যবন্ধনে বাঁধিতে পারে নাই। আর দলনী বেগম, তিলোত্তমা ও মৃণালিনীর যাবনিক সংস্করণ, 'সুগন্ধ কুসুম-

দামের ঘ্রাণে পরিপূরিত গৃহে' গুলেস্তাঁ পড়েন, বীণায় ঝঙ্কার দেন, চিড়িয়া নাচান, প্রেমের বুলি বলান, ও বলেন, এবং যথা-সময়ে—বিষপান করেন। যে স্ত্রী স্বামীকে স্বহস্তপ্রস্তত অন্নব্যঞ্জন খাওয়াইতে না পরিল তাহার বিষপানই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত

৬। 'কমলাকান্ত'। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে সময় অসময়ে বিনামূল্যে দুধ দই যোগাইত, কখনও কখনও বোধ করি দুই একটা সিধাও দিত, বড়জোর ঘরের পিঁড়ায় বসাইয়া বিদ্যাসাগরজীবনীর সুপরিচিতা স্নেহময়ী রাইমণির মত আগুট কলার পাতায় চিড়ামুড়্কির ফলার করাইত; কিন্তু যদি এক দিন কপাল ঠুকিয়া গোয়াল ঘরের কোণে বসাইয়া স্বহস্তপ্রস্তুত ভিজা ভাত বেগুণ পোড়া খাঁটি সর্ষপ তৈল ও করকচ লবণ সংযোগে খাওয়াইত তাহা হইলে আফিংখোর তৈলতরুণীবর্জ্জিত কমলাকান্ত কি আর জোবানবন্দীতে নিমকহারামী করিত? কমলাকান্ত সেই মুহূর্ত্তেই অভিরামস্বামীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া বসিত, বইখানিও খাঁটি নভেল হইত, আর নীরবে একটা বড় রকমের সমাজ-সংস্কার সম্পন্ন হইত।

৭। 'কৃষ্ণকান্তের উইল।' 'রোহিণী রন্ধনে দ্রৌপদীবিশেষ'। হরলাল সেই রন্ধন দেখিয়াই পাগল, কেন না ঘ্রাণেই অর্দ্ধ-ভোজন। আবার গোবিন্দলাল রোহিণীকে রন্ধনের জল আনিতে দেখিয়াই গলিয়া গেলেন, যেমন বৈষ্ণব বাবাজী 'এই মাটীতে মৃদং হয়' বলিয়া ভাবে বিভোর। কিন্তু এত গুণ থাকিয়াও রোহিণীর ভাগ্যে সুখ ঘটিল না। যখন শুনিলাম, সে নারীর প্রকৃত কার্য্য ছাড়িয়া দানেশ খাঁর পাশে বসিয়া তবলায় চাটি দিতেছে তখনই বুঝি-লাম তাহার কপাল ভাঙ্গিতে আর দেরী নাই (তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!)। কথায় বলে 'যার কর্ম্ম তারে সাজে।' তার পর ভ্রমর। ভ্রমরের করুণকাহিনী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন ঃ—'গোবিন্দ-লালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত ফুৎকার অর্থাৎ উনানে ফুঁ। এক দিন যদি ফু করিয়া বৌমার হাতের রান্না পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খাওয়াইতেন তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইত।

৮। 'বিষবৃক্ষ।' বিষবৃক্ষে পাঁচটি ফুল। (১) সূর্য্যমুখী (২) কমল (৩) কুন্দ,—চতুর্থটি হীরা, পঞ্চমটি হৈম। প্রথম দুইটি অমৃত, শেষ দুইটি বিষ; মাঝেরটি অমৃত হইয়াও বিষ। "বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেৎ অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।" হৈমবতীর যে কোনও গুণ নাই তাহার পরিচয় গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। নহিলে আর দেবেন্দ্র দত্ত অধঃপাতে যায়! সূর্য্যমুখীর রজনী ও শৈবলিনীর মত ফুলখেলা দেখিয়াছি, সুভদ্রা সাজিয়া বগী হাঁকাইয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু রন্ধনপটুতার কথা নগেন্দ্রনাথ তাঁহার গুণের যে লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছেন তাহার ভিতরে ত পাই না। কুন্দসম্বন্ধে দেবেন্দ্র দত্ত নেশার ঝোঁকে একবার বলিয়াছিল বটে 'বিধবা হ'য়ে দত্তবাড়ী রেঁধে খায়' কিন্তু সে মাতালের কথা, বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তাহার এক রা 'না,' ইহা হইতে 'রান্না' হয় কিনা বৈয়াকরণ বিচার করুন। কুন্দ যদি পাকা রাঁধুনী হইত তাহা হইলে নগেন্দ্র নাথের প্রীতি অচলা থাকিত। 'সংসারে'র সুধার সঙ্গে তুলনা করুন; কচি আমের অম্বলের গুণে শরৎবাবু মুগ্ধ আর নগেন্দ্রনাথ! একই বিধবাবিবাহকাণ্ডে এক স্থলে বিষ ও অন্যস্থলে সুধা ফলিল কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের স্থিতিশীলতা ও রমেশচন্দ্রের সমাজসংস্কার-প্রিয়তার দোহাই দিয়া আসল কথাটা চাপা দিবেন না। খগেন্দ্রনাথের নহে, নগেন্দ্র-নাথের 'ভগিনী কমলের' প্রতি আমার বড় পক্ষপাত; নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতাইবার লালসায় নহে, কমলমণির গুণে। তিনি শ্রীশ বাবুকে জল খাওয়াইয়া তবে মানে বসেন। এমন নারীর বশীভূত না হইয়া কি থাকা যায় গা? পোড়ালোকে বলে কি না শ্রীশবাবু স্ত্রৈণ। এমন গুণের কমল পাইলে জন্ম জন্ম এ অপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। হীরা হিষ্টিরিয়ার বশ, কাজেই বুড়া আয়ীমার উপর রান্নার ভার। সে কেবল 'দন্তগৃহেন্দু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা'; নগেন্দ্রনাথের রূপজ মোহ, কুন্দের অতৃপ্ত বাসনা, সূর্য্যমুখীর অভিমান, দেবেন্দ্রনাথের পৈশাচিক প্রণয় ও নিজ হৃদয়ের হিংসাদ্বেষ ও লালসা—এই সমস্ত আবর্জ্জনা জড় করিয়া রাশীকৃত করিতেছে

৯। 'রাজসিংহ।' রূপের নাগরী রূপ-নগরী মৃণালিনী বা মেহেরউন্নিসার মত চিত্র আঁকিতেছেন না বটে, কিন্তু চিত্র দেখি-তেছেন, কিনিতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন। কাব্যের নায়িকাদিগের যাহা ঘটিয়া থাকে, 'দর্শনাৎ, শ্রবণাৎ' তাঁহারও তাহা যথানিয়মে ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী সখী মণিমালিনীর চেয়ে দড়, ঘটকালিতে বিমলার বা গিরিজায়ার কাছাকাছি না গেলেও অনসূয়া প্রিয়ংবদার দোয়াড়। উভয়ের রন্ধনের প্রসঙ্গ কোথাও দেখি না, চঞ্চলকুমারী লড়াই করিতে ও নির্ম্মলকুমারী ঘোড়ায় চড়িতে খুব মজবুত। জেবউন্নিসা ফুলের কুকুর গড়েন, আসব পান করেন ও সুখ লুঠেন। দরিয়া আতর সুর্ম্মা বেচে, খবর বেচে, নাচে গায়, প্রয়োজন হইলে সওয়ার পাজে ও বন্দুক ছুড়ে। ভাগ্যে মাণিকলাল কন্যার জন্য রাঁধিতে শিখিয়া ছিলেন, তাই নির্ম্মল তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষ সাজিয়া কোনও দিন ভাতে কাটি দিল না, মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইল। ফলতঃ চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীই বলুন, জেবউন্নিসা দরিয়াই বলুন, আর যোধপুরী উদিপুরীই বলুন, সকলেই দেখি বিষম অগ্নি-কাণ্ডের ভিতর আছেন, কেহ জ্বালিতেছেন, কেহ পুড়িতেছেন, কেহ পোড়াইতেছেন, কিন্তু কোথাও রন্ধনের কোনও উদ্যোগ দেখি না। ইতর পাত্রাগণের মধ্যে পান-ওয়ালীকেও রাঁধিতে দেখি না, সে 'চিত্র-শোভিত দীপালোকিত দোকান ঘরে কোমল গালিচায় বসিয়া মিঠে খিলির সঙ্গে মিঠে কথা বেচে।' বাস্তবিক পানওয়ালীরা কখন রাঁধে কখন খায় ইহা হালের কলিকাতায় ত একটা প্রহেলিকা (mystery)। দেখিতেছি সেকালেও তাই ছিল। তস্বীরওয়ালী কাবাব রাঁধে উত্তম, খিজির সেখের বাপের সংসারে সুখ ছিল; তবে বেশীদিন রহিল না। তাহার কিস্মৎ খারাপ।

১০। ‘যুগলাঙ্গুরীয়’ত মূর্ত্তিমান্ ফলিত জ্যোতিষ। ইহা হইতে কাব্যরস আশা করা যায় না।

১১। ‘রাধারাণী’। রাধারাণীর সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম পরিচয় তখন তাহার বয়স একাদশ পূর্ণ হয় নাই। সেও অবশ্য কাব্যের নায়িকাদের মত মালা গাঁথে কিন্তু তাহা রজনীর ন্যায় পেটের দায়ে, বিক্রয়ের জন্য। সেই বয়সেই সে মাকে পথ্য রাঁধিয়া দেয়। এমন গুণবতী কন্যার যে ভাল ঘর বর হইবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। তবে তখনই যদি নিমন্ত্রণ করিয়া রুক্মিণীকুমারকে স্বহস্তপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন খাওয়াইত তাহা হইলে মিলনে এত বিলম্ব হইত না। যখন রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনি আসিয়া ধরা দিলেন তখন রাধারাণী ‘স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।’ ধনবতী হইয়াও তিনি শৈশবে অভ্যস্ত রন্ধনবিদ্যাটা ভুলেন নাই ভরসা করা যায়; অতএব অন্নব্যঞ্জন যে তাঁহার স্বহস্তপ্রস্তুত এরূপ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত হইবে না।

১২। ‘ইন্দিরা।’ রমণবাবুর রমণী সুভাষিণীর কথায় জানিতে পাই:—‘আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি তবে কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে’। এখন সহজেই বুঝিলাম কেন রমণ বাবু সুভাষিণীর আজ্ঞাকারী, কেনই বা খোদ কর্ত্তা রামরাম দত্ত কালীর বোতলটার বশ। তবে সোণার মার রান্নায় কোনও ফল দর্শায় নাই; তাহার কবুল জবাব সে নিজেই করিয়াছে, ‘এখনকার দিনে রাঁধিতে গেলে রূপযৌবন চাই।’ আর ইন্দিরা? সে ত রন্ধনের গুণে হারাধন ফিরিয়া পাইল। তবে কাঁচা বয়েস বলিয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। উপন্যাসের নায়িকার মত, প্রয়োজন হইলে, সেও মল্লিকাফুলের চেয়ে সুন্দর অঙ্গে মল্লিকা ফুলের অলঙ্কার পরিয়া প্রিয়জনের কাছে যায়। কবির কথায় ‘রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ, বকুল ফুলের মালা; রাঙ্গা শাড়ী হাতে হাঁড়ী রাঁধে কায়েতের বালা।’

১৩। ‘আনন্দমঠ’। নিমাই রাঁধে বাড়ে, কাযেই দুটিতে সুখে থাকে, এমন লক্ষ্মীর সংসারে অকালের বৎসরেও মন্বন্তর থাকেনা শ্রী ও প্রফুল্লর প্রথম খস্‌ড়া শান্তি মুগ্ধবোধ পড়িয়া ব্যায়াম শিখিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ হইয়াছিল। নতুবা সে যদি স্বহস্তপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন বাড়িয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ধরিত, তাহা হইলে কি আর তাহার শিকলি কাটিয়া পাখী পালায়, না নিমাইএর ঘট্‌কালি নিস্ফল হয়? বিশেষ জীবানন্দ ঠাকুরের যেরূপ ভোজনে অনুরাগ। কল্যাণী পুনর্জীবনলাভের পর যদি গীতা পাঠ না করিয়া গৌরীদেবীর কাছ হইতে হাঁড়াবেড়ী কাড়িয়া লইয়া একবার রন্ধনে মন দিত, তাহা হইলে ভবানন্দ ঠাকুরের জীবন্তে সমাধি হইত। গৌরীদেবীর অবস্থা সোণার মার মত, ভাগ্যে রূপযৌবন নাই সেই রক্ষা। কল্যাণী আনন্দমঠে আশ্রয় পাইলে স্বামীকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারেন নাই, বনফলে সারিতে হইয়াছিল, তাহারই কি প্রায়শ্চিত্ত বিষভোজন?

১৪। ‘সীতারাম’। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাই বলুন আর হিমরাশিপ্রতিফলিত

কৌমুদীরূপিণী রমাই বলুন—দুজনেই পটের বিবি। কাযের মধ্যে পাশা খেলেন আর রাণীগিরির আখ্‌ড়াই দেন। রমার আবার একগুণ বেশী, ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করেন, আর দলনীর মত সহোদর ভাইয়ের অভাবে সতীনের ভাইয়ের সঙ্গে সলা পরামর্শ করিয়া দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান। নন্দাকে লক্ষ্মীর ন্যায় পদসেবা করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে সেটা রমার কর্ত্তব্য। জয়ন্তীর শিষ্যা শ্রী-গীতা খাওড়াইতে মজবুত; যখন স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল তখন 'পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিত, স্বামীকে খাইতে দিলাম'; কিন্তু স্বামীর কাছে আসিয়া সে বিদ্যার কোনও পরিচয় দিল না। সে যদি প্রফুল্লর মত রাঁধিতে পারিত, তবে কি আর অত বড় রাজ্যটা ছারেখারে যায়! যে রাজার রন্ধনপটু গৃহিণী নাই তাহার অধঃপতন সুনিশ্চিত। উপন্যাসের এই শিক্ষা। ঐতিহাসিক নিখিল বাবু এ তত্ত্বটা বুঝিয়াছেন কি? গ্রন্থকার 'দেবী চৌধুরাণী'তে অন্বয়মুখে এই তত্ত্বটা প্রমাণ করিয়া 'সীতারামে' ব্যতিরেকমুখে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

১৫। 'দেবী চৌধুরাণী'। হরবল্লভ রায়ের গৃহিণী ঠাকুরাণী রাঁধেন না বটে, তবে 'নারীধর্ম্মপালনার্থ ব্যজনহস্তে স্বামীর ভোজনপাত্রের নিকট শোভমানা', অর্থাৎ তিনি ছাইতে জানেন না, তবে গোড় চেনেন। শনৈঃ পন্থাঃ; এ পুরুষে এই পর্য্যন্ত দেখিলেন, আর এক পুরুষ পরে দেখিবেন কতদূর উন্নতি হইয়াছে; ইহাই হইল কাব্যে অভিব্যক্তিবাদের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মঠাকুরাণী রন্ধন করেন, জীবদ্দশায় ঠাকুরদাদা মহাশয় কত আদর করিতেন তাহাত জানিয়াছেন—'তোর ঠাকুরদাদা এমন বারো মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, আবার তখনই ডেকেছে।' তা ডাক্‌বে না? রান্নার কথা মনে পড়্‌লে যে কান্না পেত! তবে সময়বিশেষে ব্রজেশ্বরের মুখে ভাল লাগে নাই; তা অমন হয়। আমরা সকলেই এক এক ব্রজেশ্বর, গৃহিণী পিত্রালয়ে গেলে অমন দশা সকলেরই হয়, 'গরুগুলার দুধ পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়ে যায়'।

কুলমণি হীরার খুড়ি তবে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী accommodating। নয়ান বৌর যে রূপ, রাঁধিয়া কি করিবে? সোণার মার কথা মনে আছে ত? সাগরের দৌড় পান সাজা পর্য্যন্ত, আর রান্না 'ধূলা চড়্‌চড়ি, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট,' তার ভালবাসা তার ঘরকন্না রান্নাবান্না সবই যে ছেলেখেলা। জয়ন্তীর আদিম সংস্করণ নিশি ঠাকুরাণীর হস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, কাজেই তাহা হরবল্লভ রায়ের জন্য 'ক্ষীর ছানা মাখন' প্রভৃতি বালগোপালের ভোগ সাজাইতে পারে, রাঁধিতে পারে না, সুতরাং তাহার শাশুড়ীগিরির আখড়াই দেওয়াই সার হইল। আর দিবা—তিনি ত কেবল নিশির সানাইএর পোঁ ধরেন।

তাহার পর—প্রফুল্ল। এই প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরই আদর্শ দম্পতী। ব্রজেশ্বরের ন্যায় এ অধম লেখকও স্বভাবকুলীন, পক্ষপাতটা স্বাভাবিক। ব্রজেশ্বরের ন্যায়, লেখকের তিন পক্ষ না হইলেও পূর্ব্বপুরুষ-

দিগের মধ্যে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পক্ষপাতের আরও একটু কারণ আছে। দক্ষিণ বঙ্গের ত্রিস্রোতা পবিত্রসলিলা হইলেও উত্তর বঙ্গের ত্রিস্রোতা লেখকের প্রিয়তর; কারণ ব্রজেশ্বরের ন্যায় লেখকেরও রঙ্গপুরের প্রতি প্রাণের টান আছে। যাক্ বর্ত্তমান লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রফুল্লই যে গ্রন্থকারের আদর্শ পত্নী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রফুল্ল স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীর মত ভুল করিল না। তার রান্নার সুখ্যাতি এম্‌নি যে তাহাতে স্বামী ত স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী ও পরিজনবর্গ, এমন কি সপত্নীরা পর্য্যন্ত, সকলেই বশ। 'যে দিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত সে দিন কাহারও অন্নব্যঞ্জন ভাল লাগিত না।' প্রফুল্ল কি বলিতেছেন শুনুন--'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।' ব্রজেশ্বরের মাতা গোবিন্দলালের মাতার মত নহেন, তিনি গিন্নিপনা জানেন, তাঁহার সোণার সংসার হইল।

আর একটি রহস্য দেখিবেন। গ্রন্থখানি রন্ধনের উদ্যোগেই আরম্ভ; উপকরণ অভাবে রন্ধন তখন বন্ধ ছিল। আবার রন্ধনের সম্পাদনেই শেষ। প্রথম পরিচ্ছেদেই the key-note is struck। এখন বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না যে এই নারীধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষবয়সে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন পত্নীর রন্ধনপটুতার উপর কতটা নির্ভর করে; তখন যে খাওয়া দাওয়ায় একটু নিট্‌পিটে স্বভাব হয়

ফলশ্রুতি।

ব্রতকথার ন্যায় এই পত্নীতত্ত্ব যে গৃহে পঠিত হইবে তথায় দোবে চোবে মিশির পাঁড়ে প্রভৃতি বিশ্রীনামধারী ও ততোধিক বিশ্রী আকৃতিপ্রকৃতিধারী বামুন ঠাকুরের স্থান শ্রীমতী সুমতি মধুমতীরা দখল করিবেন, 'মহারাজ' গিয়া মহারাণী (Her Majesty) পাকশালার সিংহাসন অধিকার করিবেন, অধিকারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মেদিনীপুর-বাঁকুড়াবাসীর পরিবর্ত্তে আমাদের হৃদয়াধিকারিণীরা চক্রবর্ত্তিনী হইয়া বসিবেন; রন্ধনের গুণে দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় অথচ কোমল হইবে। শৌণ্ডিকালয় গণিকালয় জনশূন্য হইবে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের দোকান উঠিয়া যাইবে, ম্যুনিসিপালিটির তথা আমাদের hostএর জয়জয়কার। এই অপূর্ব্ব কথা পাঠ করিলে, কুমারীরা রাধারাণীর মত ভাল ঘর বর পাইবেন, সধবারা ইন্দিরার মত হারাধন পতিপ্রেম ফিরিয়া পাইবেন, সপত্নীবতীরা প্রফুল্লের মত সপত্নীযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে ঘরকন্না করিবেন; ঘরে ঘরে প্রফুল্ল ইন্দিরা কমলমণি সুভাষিণী রাধারাণীর মত গৃহিণীরা পতির অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন— আর তাহার ফলে ব্রজেশ্বর উপেন্দ্রবাবু শ্রীশ বাবু, রমণ বাবু ও কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণের মত পত্নীগতপ্রাণ পতি গৃহিণীর মনোরঞ্জন করিবেন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আবার জীবন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করিবেন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোম্পানীর রাজস্বনীতি।

(১)

It must appear to a sensible mind, that the whole system of the Government of Bengal at this period was in reality no other than one continued scene of imposition upon the public, under sounding phrases and pompous appearances; perhaps more ridiculous than anything that has been held up under the veil of politics, and even exceeding any thing exhibited on the theatre of false religion.

Bolt's considerations on Indian Affairs p. 189.

কোম্পানী বাহাদুর যখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেন, লর্ড ক্লাইব তখন কোম্পানীর কর্ত্তা। তাঁহার আদেশে ও সিলেক্ট কমিটির অনুমোদনে মিঃ সাইক্‌স অবিলম্বে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট স্বরূপ মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। বঙ্গ, বেহার, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল;—

বাঙ্গালার রাজস্ব —	১৫৬২৩৪৫৫৲
রাজস্ব আদায়ের ব্যয়—	১০২৯৯২৯৶০
	১৪৫৯৩৫২৫॥৵০
শুল্ক ও অর্থদণ্ড ১৯১৩৮৸৶০	
চুনাখালীর শুল্ক ১৭৩৬১০৵০	
বল্লাবন্দরের শুল্ক ১২৫০০০৲	
আজিমগঞ্জের শুল্ক ১০৭০৬৲	
মুর্শিদাবাদের টঙ্কশালা ৩০০০৫৲	
	৪৫৪৮১৪।০
	মোট ১৫০৪৮৩৩৯৸৵০
বেহারের রাজস্ব ——	৬১০৯০৫॥৶০
বর্দ্ধমান ৩৩৫০০০৲	
মেদিনীপুর ৪২২০৮৮৲	
চট্টগ্রাম ৮২১২৪১।৶০৲	
	৪৫৯৩৩২৯।৶০
কলিকাতা, ২৪ পরগণা এবং ৫৫টী গ্রাম হইতে আদায় ও সমুদ্র পথের বাণিজ্য শুল্ক	১০৭৫০৮৭৲

সুতরাং সাইক্‌স সাহেবের প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে মোট ২৬৮২৭৬-৬১৸৶০ রাজস্ব কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে আসিয়াছিল। * এই রাজস্ব আদায়ের নীতি ও তজ্জনিত দেশের অবস্থা পরবর্তী অধ্যায়ে বলিব। কোম্পানীবাহাদুর ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন এবং পরবৎসরই সাইক্‌স সাহেব উপরি উক্ত অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখাইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব প্রীত হইয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে বিলাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন ;—†

'দেওয়ানী লাভ করাতে আপনাদের রাজস্ব ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকার কম হইবে না। পরে আরও অন্ততঃ ২০।৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। দেশে শান্তি থাকিলে বিচার এবং সৈন্যরক্ষার ব্যয় কখনই ৬০ লক্ষের অধিক হইবে না। নবাবের মুশাহারাত এখনই কমাইয়া ৪২ লক্ষ করা হইয়াছে। বাদশাহের প্রাপ্য মোটেই ২৬ লক্ষ টাকা। সুতরাং কোম্পানী অনায়াসেই ১২২ লক্ষ মুদ্রা পাইবেন। সুতরাং ইন্‌ভেষ্টমেণ্টের ব্যয়, চীন সংক্রান্ত খরচ, ভারতবর্ষের অন্যান্য উপনিবেশের ব্যয় বাদেও আপনাদের অর্থাগারে আরও অনেক টাকা থাকিবে।...আমি রাজস্বের যে হিসাব দিলাম তাহা কাল্পনিক নহে; আপনারা নিশ্চয় জানিবেন রাজস্ব কিছুতেই আমার প্রদত্ত হিসাব অপেক্ষা কম হইবে না।' যে দেশের রাজস্বের অবস্থা এইরূপ স্বচ্ছল ছিল, অধিক নহে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে সে দেশের কি দুর্গতি হইয়াছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনী তাহা বলিয়া দেয়। কিন্তু আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। বণিক জাতি রাজ্য লাভ করিয়াও কিরূপে বাণিজ্য করিয়াছিল তাহার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে বাঙ্গালার রামধনগণ কেন মন্বন্তরের অনলে পুড়িয়া মরিয়াছিল।

লর্ড ক্লাইভ যখন তৃতীয়বার এ দেশে আগমন করেন তাহার পূর্ব্বেই বিলাতের কর্ত্তাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে কোম্পানীর ভৃত্যগণ যাহাতে নিজেদের জন্য বাঙ্গালার বাণিজ্য না করেন তাহা করিতেই হইবে। লবণ, শুপারি ও তামাকের ব্যবসায় লইয়াই এ দেশবাসীদিগের সহিত অধিক গোলযোগ হয় বলিয়াই লর্ড ক্লাইব ডিরেক্টরদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন 'ও সকল দ্রব্যের ব্যবসায় নবাবকেই করিতে দেওয়া সঙ্গত।' কোম্পানীর ভৃত্যগণ যেন আর লবণ, [illegible]পারি ও তামাকের ব্যবসায় না করে। তাহা হইলে আর কোন গোলযোগ ঘটিবে না।'...বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইলে কোম্পানীর ভৃত্যাদিগের যে অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিজে কোন প্রকার বাণিজ্যের সহিতই লিপ্ত থাকিব না। তাহা হইলেই গবর্ণরের অংশের বাণিজ্যলব্ধ লাভ তাহারা পাইয়া তুষ্ট হইবে।' ‡

শীত প্রধান ইংলণ্ডের শীতল সমীরণ

* Bolt's considerations on Indian Affairs. p. 154.

† Ibid.

‡ The trading therefore in salt, beetle and tobacco, having been one cause of the

সেবন করিতে করিতে লর্ড ক্লাইব যে সকল সদিচ্ছার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, উষ্ণদেশের তীব্রতপনতাপ লাগিবা মাত্র তাঁহার সে সদিচ্ছাগুলি আর থাকিল না! বিলাতের কর্ত্তাগণ ক্লাইবের পত্র পাইয়াই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন "তামাক, শুপারি, লবণ এবং যে সকল দ্রব্য বাঙ্গালায় জন্মে ও তথাতেই বিক্রীত হয় সে সমুদয়ের অন্তর্বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিও। দেখিও যেন নবাব তুষ্ট থাকেন এবং কোম্পানীর ও তাহাদের ভৃত্যদের ক্ষতি না হয়। নবাবের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন।...নবাবের রাজস্ব, সন্তোষ ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হইয়া এই কার্য্য করিবেন। এ কার্য্য তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি জানিয়াই করিতে হইবে, যেন আপত্তি করিবার আর কোন সঙ্গত কারণ না থাকে"। *

লবণ, তামাক ও শুপারির ব্যবসায় একনিষ্ঠ করিতে পারিলেই যে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা ছিল, লর্ড ক্লাইব এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাহা দেওয়ানী লাভের পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তাঁহারা এখন এই ব্যবসায় করিবার জন্য একটী সমিতি সংস্থাপন করিলেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কথা অকস্মাৎ বিস্মৃত হইয়া লবণ, তামাক ও শুপারির ব্যবসায় লব্ধ লাভ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। † এই ব্যবসায় যে কিরূপে এবং কোন পথে পরিচালিত হইবে সকলকে তাহা জানিতেও দেওয়া হইল না! অন্য সকলে এই নবগঠিত "কমিটি অব ট্রেডের" হস্তে সকল ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক অন্ধের মত প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য হইল! ‡

এই "কমিটি অব ট্রেড" ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে যে ত্রয়োদশটী অদ্ভুত মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকটীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। এই ব্যবসায় একটী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইবে। লাভের অংশ পাইতে যাঁহারা ন্যায়তঃ অধিকারী তাঁহারাই শুধু এই কমিটির সদস্য থাকিবেন। এই ব্যবসায় চালাইবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া টাকা তুলিতে হইবে।

present disputes, I hope these articles will be restored to the Nabob, and your servants absolutely forbid to trade in them. This will be striking at the root of the evil.........As a means to alleviate, in some measure, dissatisfaction that such restrictions upon the commercial advantages of your servants may occasion in them, *it is my full intention not to engage in any kind of trade myself*; so that they will divide amongst them what used to be the governor's portion of commercial advantages, which was always very considerable.—Clive's letter. 27th April, 1764. (Vide Bolt's considerations, appendix, p. 146.)

* Bolt's considerations on Indian Affairs, p. 165.

† In contradiction to his Lordship's most solemn declarations an universal public monopoly of those three articles was determined on; the profits of which were to be divided among themoselves, and such others of the company's servants as they thought proper.—Bolts' considerations on Indian Affais, p. 166.

‡ Ibid, p. 166.

২। বাঙ্গালায় যে পরিমাণ লবণ, তামাক ও শুপারি উৎপাদিত হয় এবং বিদেশ হইতেও যাহা আমদানী হয় সে সমস্তই এই নবগঠিত সমিতি ক্রয় করিয়া লইবেন। কোম্পানীর মুখাপেক্ষীগণ যাহাতে এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না করেন তদ্বিষয়ে সাধারণ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে।

৩। নবাবের রাজ্যমধ্যে যে যে জেলায় এই সকল দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেই সেই জেলার কর্ম্মচারী বা প্রজাগণ যাহাতে এই ব্যবসায় না করে তাহার ব্যবস্থার জন্য নবাবের নিকট আবেদন (?) করিতে হইবে।

৪। এই সমিতি যে লবণ তামাক ও শুপারি ক্রয় করিবেন তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমিতির 'এজেণ্ট' কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত হইবে। দেশীয় বণিকগণ তথা হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া যেখানে-সেখানে যদৃচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিবে। ইংরাজ বণিকগণ এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য স্থানে স্থানে যাইয়া যে অত্যাচার করিয়া থাকেন, এই বন্দোবস্তে তাহার আর সুবিধা থাকিবে না। সর্ব্বসাধারণে বলিয়া থাকে যে আমরা এদেশীয়দিগকে লবণ, তামাক ও শুপারির ব্যবসায় লব্ধ লাভ হইতে একেবারেই বঞ্চিত করিয়া থাকি। কিন্তু এই নূতন বন্দোবস্তে এ দেশীয়দিগকে লবণ ক্রয় ও বিক্রয়ের লভ্যাংশভাগী করিলে সে দুর্ণাম আর থাকিবে না। *

এইরূপে সকল বন্দোবস্ত করিয়া কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালার নাম-সর্ব্বস্ব নবাবের দোহাই দিয়া পরওয়ানা বাহির করাইলেন। দেশের জমীদারগণ পর্য্যন্ত মুচলেখা দিয়া বলিলেন 'আমরা কোম্পানী ভিন্ন অন্যের নিকট লবণ, শুপারি বা তামাক বিক্রয় করিব না।' নিম্নে একখানি মুচলেখার আংশিক বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

'আমি শ্রীযদুরাম চৌধুরী, পরগণা দেহুল্লা, জেলা ইন্‌জিলি নবাবের আদেশ অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে...... কোম্পানী ভিন্ন অন্যের সহিত লবণের ব্যবসায় করিব না। তাঁহাদের আদেশ ভিন্ন আমি এক কণিকা লবণও হস্তান্তরিত করিব না। আমার জমিদারী মধ্যে যে পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয় সে সমস্তই আমি অবিলম্বে বিশ্বস্তভাবে পূর্ব্বোক্ত সমিতির হস্তে অর্পণ করিব এবং আমার লিখিত বন্দোবস্ত মত তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিব।...আমি যদি ইহার অন্যথা করি তাহা হইলে প্রাগুক্ত সমিতিকে প্রতি মন লবণের নিমিত্ত পাঁচ টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড দিব।'†

এইরূপে নবাবের দোহাই দিয়া কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালার লবণ, তামাক ও শুপারির ব্যবসায় একনিষ্ঠ করিয়া লইলেন এবং ৭৫৲ টাকায় একশত মন লবণ ক্রয় করিয়া ৫০০৲ টাকায় তাহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন! সুতরাং দেশের রামধনও মবারক পূর্ব্বে ১৲ টাকায় যে পরিমাণ লবণ

* Bolt's considerations on Indian Affairs, pages 163-169.

† Ibid, p. 177.

পাইত তখন ৬৷৷০ টাকায় তাহা ক্রয় করিতে লাগিল! নবাব আলীবর্দ্দীর সময়ে খৃাজা ওয়াজিদ নামক এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসায় করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। খৃাজা ওয়াজিদ তখন ৪৷৷৫০৷৬০ টাকায় ১০০ মণ লবণ বিক্রয় করিতেন। কোম্পানীর লবণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও পাটনায় ১৫০ টাকায় ১০০ মণ লবণ পাওয়া যাইত। কিন্তু এ দেশের লোকের মুখ চাহিয়া লর্ড ক্লাইব যখন নূতন সমিতি গঠিত করিলেন তখন বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে শতকরা ৩০০টাকা এবং পাটনা প্রদেশে শতকরা৮৫০ টাকা দরে লবণ বিক্রীত হইতে লাগিল! *

লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে কোন প্রকার ব্যবসায়েই লিপ্ত হইবেন না। ইতিহাস এ বিষয়ে অন্যরূপ প্রমাণ দেয়। লবণের ব্যবসায়ের প্রথম বর্ষে লবণ-সমিতির কাহার কিরূপ লাভ হইয়াছিল তাহা দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে। †

সমিতির সভ্যের নাম।	জন সংখ্যা	প্রত্যেকের অংশ	মোট অংশ সংখ্যা	প্রথম বর্ষের লাভ (পৌণ্ড)
লর্ড ক্লাইভ	১	৫	৫	২১১৭৯ ১/৫
ব্রাইট সম্নার	১	৩	৩	১২৭০৭ ১/২
জেনেরল কার্ণাক	১	৩	৩	১২৭০৭ ১/২
১০জন কাউন্সেলর এবং ২কর্ণেল	১২	২	২৪	১০১৬৬০ ১/৫
চ্যাপলেন প্রভৃতি	১৮	২/৩	১২	৫০৮৩০ ৩/১০
ফ্যাক্টর, মেজর, ডাক্তার প্রভৃতি	২৮	১/৩	৯ ১/৩	৩৯২৭৪ ১/৩
মোট	৬১	--	৫৬ ১/৩	২৩৮৬১৯

লবণ, সুপারি ও তামাকের এই একনিষ্ঠ ব্যবসায়ের কথা যখন বিলাতের কর্ত্তাদের কানে পৌঁছিল তখন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ লিখিয়া পাঠাইলেন "তোমরা এ ব্যবসায় বন্ধ কর।" ক্লাইব এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ এই নিষেধ বাক্য শুনিয়াও শুনিলেন না; তাঁহারা লবণের শুল্ক আরও বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং ভাবিলেন কোম্পানীর লাভ অধিক হইলেই বিলাতের কর্ত্তাগণ তুষ্ট হইবেন। ক্লাইভ তাই বিলাতে লিখিলেন লবণের ব্যবসায় হইতে কোম্পানীর বার্ষিক ১২৷১৩ লক্ষ মুদ্রা লাভ হইবে! লর্ড ক্লাইভ এই একনিষ্ঠ ব্যবসায় রহিত করিলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন যেমন করিয়াই হউক এই ব্যবসায় চালাইতেই হইবে। ডিরেক্টর সভার নিষেধ বাক্য মান্য করিবার প্রয়োজন নাই! ‡

শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা।

* Bolt's considerations on Indian Affairs, page 174-78.

† Bolt's considerations on Indian affairs, p. 180.

সঙ্গীত।

সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুতিমধুর ও মনোমুগ্ধকর জগতে আর কিছুই নাই। কোন বিদ্যাই ইহার তুল্য আদরণীয় নহে, এজন্য "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরঃ" এবং"গানাৎ পরতরং নহি" প্রাচীন বুধবাক্য প্রবাদ রূপে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গীতের মধুর রবে শিশু, পশু, পক্ষী এমন কি ক্রূরমতি সর্পও মুগ্ধ হইয়া থাকে বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া মৃগ, ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হয়; মুরলীর স্বর মাতিয়াই উষ্ট্র মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর বিচরণ করে। সঙ্গীত, সুখী, দুঃখী, ধনী, দীন, গৃহী, সন্ন্যাসী বাল-বৃদ্ধ সকলেরই চিত্ত বিনোদনে সমর্থ। ইহা মানবজাতির স্বভাবসম্ভূত, বিদ্যা। প্রকৃতি কর্তৃক শরীরস্থ ধমনীতে লয় এবং কণ্ঠে স্বর সন্নিবদ্ধ থাকাতে সুকুমারমতি শিশুরাও আহ্লাদে নৃত্য ও অন্যমনস্কভাবে অব্যক্ত গীতানুকরণরূপ ধ্বনি দ্বারা হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে! কারণ বেদনায় ক্রন্দন ও আনন্দে কীর্তনই তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া। এজন্য হিন্দুস্থানীরা বলেন "গানা আর রোনা" মানবের স্বাভাবিক কার্য্য এই স্বাভাবিক গুণ শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষে সম্যক বিকাশ এবং সমাজ বিশেষের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতার সহিত উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

সঙ্গীতে বীর, করুণ, আস্য,হাস্যাদি অষ্ট-রস বিদ্যমান থাকায়ে ইহা দ্বারা যত সহজে প্রেমিকের প্রেম, বীরের বীর্য্য, ভক্তের ভক্তি ভাবের উদ্রেক হয়, বিয়োগ-বিধুরের বিরহ,শোকার্ত্তের সন্তাপ অপনোদিত হয়, ভীরুর সাহস, ভগ্নোদ্যমের উৎসাহ এবং বিমর্ষের হর্ষভাব সমুদিত হয়, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ হইতে পারে না।

আদিম অবস্থায় যখন লিখন পঠন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সভ্যতা জন সমাজে প্রচলিত ছিল না, তখনও সঙ্গীত মানব মণ্ডলীর দ্বারা সমাদৃত ও সমালোচিত হইত। প্রাচীন রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, যুদ্ধাদির বিবরণ, ভগবানের লীলাদি কোন বিশেষ ঘটনার বিষয় গীত দ্বারা বিবৃত

‡ That provided any order or direction should issue or be made by the said court of Directors......directing the said exlusive joint trade...to be dissolved or put to an end...... members of the committees and council, should and would, notwithstanding any such order or direction, keep up, continue and enforce or cause to be kept up, continued and enforced, the said exclusive joint trade and merchandize—Deed of Indemnity whereby the Right Honourable Robert Lord Clive and the Gentlemen of the committees and council at Calcutta, engage not to obey the orders of the court of E. I. Direector and respecting the salt Monopoly :—Bolt's considerations : Appendix, p. 161-65 vide also chapter xiii. on the Monopoly of salt &c.

হইয়া পুরাবৃত্তরূপে জনপরম্পরা রক্ষিত হইয়া সংপ্রতি আধুনিকদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজত্ব সময়ে পূর্ব্বতন নিখিলধীমান আর্য্য বুধগণের প্রযত্নে তদানীন্তন সামাজিক পরমোন্নতির আনুসঙ্গিক শিক্ষা, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ন্যায়, মীমাংসাদি বিবিধ বিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত চরমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত ও ক্রমশ অনাদৃত এমন কি অনভ্যাসে লয় প্রাপ্ত হইতে হইতে পরিণামে নিতান্ত সংকীর্ণ কলেবরে নীচ নট নর্ত্তকী নিকরের করে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। উহারা বিলাসাসক্ত ধনীদিগের চিত্তবিনোদন জন্য অশ্লীল ভাষা, ভাবভঙ্গিময় গীতাদির আলোচনা করাতে সঙ্গীতএকদা ভদ্রসমাজের ঘৃণার্হরূপে পরিণত হয়। সময় সততই পরিবর্ত্তনশীল। সময়ক্রমে যবনাধিকারের অবসানে উদামশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষানুরাগী ইংরেজজাতির ভারতাগমন অবধি তাঁহাদিগের যত্নানুরাগে, শিক্ষা-সাহায্যে বিদ্যা, জ্ঞান, জ্যোতিঃ এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন আর্য্যভূমে পুনর্ব্বার বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হওয়ায় অচেতন আর্য্যকুমারেরা শিক্ষিত ভদ্র ইংরেজ নরনারীর সঙ্গীত ধ্বনিতে যেন ক্রমশ সঞ্জীবতা প্রাপ্ত হইতেছেন। সার্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে সঙ্গীতে ভারতীয় ভদ্রসমাজের যেরূপ বিরাগ ও ঘৃণা বোধ ছিল অধুনা তাহা দৈনন্দিন অপনোদিত হইয়া সঙ্গীতানুরাগ অনেকেরই মনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতানভিজ্ঞতা একণে অনেকেই অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সভ্যসমাজে সঙ্গীতানভিজ্ঞতা প্রকৃত অযোগ্যতা বলিয়া পরিগণিত। উক্ত সমাজসমূহে সাহিত্যাদি শিক্ষার সহিত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয় সুতরাং পাশ্চাত্য নর-নারী আবালবৃদ্ধ, সকলেই সঙ্গীতে অল্লাধিক ব্যুৎপন্ন কিনা, ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের শতকরা পাঁচজনও সঙ্গীতে কিছুমাত্র অভিজ্ঞানসম্পন্ন কিনা সন্দেহ স্থল।

যদ্দ্বারা সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে সম্যক ব্যুৎপত্তি জন্মে তাহা ইহার ঔপপত্তিক অংশ, এবং যে প্রকারে ঐ ব্যুৎপত্তি ক্রিয়াতে পরিণত হইতে পারে তাহা ক্রিয়াসিদ্ধাংশ নামে অভিহিত। শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সর্ব্বাদৌ ভগবান পঞ্চাননের পঞ্চবদনে ভৈরব, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ ও শ্রী এই পঞ্চ রঞ্জনগুণবিশিষ্ট রাগের উৎপত্তি হয় এবং গৌরী তৎশ্রবণে নটনারায়ণ রাগের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হরগৌরীর নিকট ষড়রাগ শিক্ষা করিয়া চতুর্ব্বেদ ও চারি উপবেদের সৃষ্টি করেন ; তন্মধ্যে সামবেদসম্ভূত নাদবেদ গন্ধর্ব্বজাতি বহুল চর্চ্চা করিত বলিয়া উহা গান্ধর্ব্ব বেদ নামে অভিহিত হয়।

নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই ত্রিবিধ ক্রিয়াসমন্বিত সঙ্গীতের অন্যতর নাম তৌর্য্যত্রিক। নৃত্য পদ দ্বারা সাধিত হয়। নৃত্যের উদ্দেশ্য লয়-প্রদর্শন। সমব্যবহিত সময় মধ্যে নিয়মিত পাদবিক্ষেপ দ্বারা কাল বিভাগকে লয় বলে। লয় শ্লথ, মন্দ্র ও দ্রুত এই তিন প্রকার। গীত বাদ্যে অবলম্বিত কোন লয়ের অনুসরণ ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন দ্বারা হাব ভাব প্রকাশ সহ ধ্বনিব্যঞ্জক পাদবিক্ষেপকে নৃত্য বলে। নৃত্য ভাবাঙ্গ ও উপাঙ্গ দুই

প্রকার। অঙ্গের কোন প্রত্যঙ্গ বা অপাঙ্গাদি দ্বারা মানসিক হাব ভাব প্রকাশকে ভাবাঙ্গ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করাকে উপাঙ্গ বলে। পুরুষের নৃত্যের নাম তাণ্ডব এবং বিলাসময়ী স্ত্রীলোকের নৃত্যের নাম লাস্য। এই তাণ্ডবের 'তা' ও লাস্যের 'লা' সংযোগে তালা বা তালের উৎপত্তি হইয়াছে। মাত্রাভেদে তাল বা ছন্দে সম ও বিষম বৃত্ত পটতাল, ধর্ম্মতাল, যতিতাল, ত্রিতালী, চৌতাল, ইত্যাদি বহুসংখ্যক। তালের প্রধানতঃ বিসম, সম, অতীত ও অনাঘাত এই চারি অংশ দ্বারা কাল প্রদর্শিত ও লয়ের গতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কোন সুনাদক যন্ত্রে তালসকল কতিপয় বর্ণময় অবয়বে ধ্বনিত হইলে উহা বাদ্য নামে অভিহিত হয়। ফলত নৃত্য ও বাদ্য প্রায় একই ক্রিয়া, তবে নৃত্য পদে ও বাদ্য হস্তের অভিঘাতে বা মুখের ফুৎকারে সাধিত হয়। নৃত্য, গীত ও বাদ্য ক্রিয়াতে সাধন জন্য শব্দের অঙ্গ বর্ণমালা উদাত্ত, অনুদাত্ত, সরিৎ ত্রিবিধ, স্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ত্রিবিধ মাত্রানুক্রমে গীতে স্বরবর্ণ এবং নৃত্য ও বাদ্যে ব্যঞ্জনবর্ণসকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গর্দ্দভ, বৃষভ, অজা, ময়ূর, কোকিল, অশ্ব ও হস্তী এই সপ্তবিধ পশুপক্ষীর স্বাভাবিক স্বর অবলম্বনে তাহাদিগের নামানুসারে খর হইতে খরজ, ঋষভ বা বৃষ হইতে ঋষভ, * অজা বা গান্ধারী হইতে গান্ধার, ময়ূর হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, ধাবনশীল অশ্ব হইতে ধৈবত এবং হস্তী হইতে নিষাদ, বা নিখাদ এই সপ্ত স্বর পরিগৃহীত হইয়া খরের নামান্তর সারঙের সা পদ, ঋষভের ঋ, গান্ধারের গা এইরূপ সপ্ত স্বরের আদ্যবর্ণ সা, ঋ, গা, ম, প, ধ, নি সপ্ত সাঙ্কেতিক স্বর গীতের ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমস্ত স্বরকে এক সপ্তক বা গ্রাম বলে। মানব-শরীরস্থ উদর হইতে উদাত্ত বা উদারা, কণ্ঠ হইতে অনুদাত্ত বা মুদারা এবং মূর্দ্ধা হইতে সরিৎ বা তারা গ্রামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনুষ্যকণ্ঠে এই তিন গ্রামের অধিক স্বর কোন ক্রমেই ধ্বনিত হইতে পারে না, এজন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে মাত্র তিন গ্রামেরই উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিশেষে সা, ঋ, গা, মাদি প্রত্যেক ধাতুকে খরজ কল্পনা করিয়া ক্রমেই সপ্ত-গ্রাম পর্য্যন্ত ধ্বনি করা যাইতে পারে। স্বরের ক্রমিক ঊর্দ্ধগতির নাম অনুলোম ও অধো-গতির নাম বিলোম। সপ্তস্বরের অধিষ্ঠাতা সপ্ত দেবতার উল্লেখ আছে, যথা—খরজ অগ্নির, ঋষভ ব্রহ্মার, গান্ধার সরস্বতীর, মধ্যম মহাদেবের, পঞ্চম লক্ষ্মীর, ধৈবত গণেশের এবং নিষাদ সূর্য্যদেবের অধিকৃত।

সপ্তস্বরের মধ্যে নিষাদ নিঃসন্তান, তদ্ভিন্ন অপর ছয় স্বরের খরজ হইতে ভৈরব, ঋষভ হইতে মালব (মালকোষ নামান্তর নটনারায়ণ) গান্ধার হইতে বসন্ত নামান্তর হিন্দোল বা হিণ্ডোল, মধ্যম হইতে পঞ্চম বা দীপক, পঞ্চম হইতে মেঘ এবং ধৈবত হইতে শ্রীরাগ (রঞ্জয়তি রাগঃ) উৎপন্ন হইয়াছে এবং তজ্জন্যই প্রথম রাগ ভৈরব, দ্বিতীয় মালকোষ, তৃতীয় হিণ্ডোল, চতুর্থ দীপক, পঞ্চম মেঘ ও ষষ্ঠ শ্রীরাগ নির্ণীত হইয়াছে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মালব-নামক কোন রাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, বস্তুত

* হিন্দুস্থানীদিগের ষ কে খ উচ্চারণ হেতু খখভ।

মালকোষেরই অন্যতর নাম মালবা বা নট-নারায়ণ।

ব্রহ্মা এই ষড়রাগ ঋতু ভেদে গান করিবার জন্য শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালকোষ, শীতে শ্রী, বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে পঞ্চম এবং বর্ষায় মেঘ রাগের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক ঋতুতে একটী মাত্র রাগ গান করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না, এজন্য বিরিঞ্চি প্রত্যেক ঋতুতেই ষড়রাগ পর্য্যাপ্তরূপে গান করিবার জন্য প্রত্যেক রাগের ষড় রূপান্তর সৃষ্টি করত উহাদিগকে রাগের স্ত্রী রাগিণী নামে অভিহিত করেন। ব্রহ্মা এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীময় গীত, বাদ্য ও নৃত্যসমন্বিত তৌর্য্যত্রিক নারদ, ভরত, তুম্বুর, হূহূ ও রম্ভা এই পঞ্চ শিষ্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বর্ণর্ত্তকী রম্ভা স্বর্গে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। তুম্বুর কর্ত্তৃক তুম্বুরা, তম্বুরা, তাম্বুপুরা নামক স্বরসহায়ী যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক এক খানি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সঙ্গীত শাস্ত্রের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভরতের প্রণীত গ্রন্থই ভূতলে প্রচলিত হয় এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য ভদ্রনামক জনৈক নট দেশীনামক সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। স্বর্গে প্রচলিত প্রথার নাম মার্গ, মর্ত্ত্যে প্রচলিত প্রথার নাম দেশী। ভরত সঙ্গীতের আদি, বীর, করুণ, রৌদ্র, অদ্ভুত, ভয়ানক, হাস্য ও বিভৎস এই অষ্ট রস অবলম্বনে প্রত্যেক রাগের আট আটটী রসরূপী পুত্র বা উপরাগ এবং উহাদিগের প্রত্যেকের এক একটী স্ত্রী বা উপরাগিণী সৃষ্টি করেন। তদনন্তর শিষ্য, প্রশিষ্যক্রমে রাগ পুত্রগণের পুত্র, পুত্রবধূ, সখা ও সখী সহকারে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে সমগ্র রাগ পরিবার চুয়ান্ন কোটী, মতান্তরে উনপঞ্চাশ ক্রোটী, পর্য্যন্ত সংখ্যা প্রাপ্তে লক্ষ প্রকারে গীত হইয়াছিল। এক্ষণে চর্চ্চা অভাবে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে! বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক রাগরাগিণী মাত্র চতুর্দ্দশ প্রকারে প্রচলিত আছে।

সর্ব্বাদৌ আর্য্যজাতির অভ্যুদয় আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ পাঞ্চাল (পঞ্জাব) সন্নিহিত সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানেশ্বর, হস্তিনা বা দিল্লী নগরের অদূরে অবস্থিত। এই হেতু হিন্দুস্থানেই সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, ভরত, হনুমন্ত ও কল্লিনাথ এই চারি মতই প্রসিদ্ধ। সোমেশ্বর নামক বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তা—"সোমেশ্বর রাগ-বিরোধ" নামক এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করত রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। অন্য সকল মতেই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু হনুমন্ত মতে ছয় রাগ ও প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটী রাগিণীর বর্ণন দৃষ্ট হয়। ভরতের মতে রাগ পরিবার একশত আটত্রিশটী, অর্থাৎ ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, আটচল্লিশ পুত্র ও আটচল্লিশ পুত্রবধূ, কিন্তু কল্লিনাথের মতে পুত্রবধূগণের উল্লেখ না থাকাতে রাগ পরিবার নব্বইটী। ব্রহ্মার মতে রাগরাগিণী এইরূপ বর্ণিত আছে যথা :—

শ্রীরাগের রাগিণী মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারা, মধুমতী ও পাহাড়ী।

বসন্ত রাগের—দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, টোরিকা, ললিতা ও হিন্দোল।

পঞ্চম রাগের—বিভাষ, ভূপালী, কর্ণাটী, পাঠসংহিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।

ভৈরব রাগের—ভৈরবী, বাঙ্গালী, সৈন্দবী, রামকেলী, গুর্জ্জরী ও গুণকেলী।

মেঘ রাগের—মল্লারী, সৌরবী, সায়েরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গার।

নটনারায়ণের—কামোদা, কল্যাণী, আভরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও হাম্বীর।

ভরতের মতে কথঞ্চিৎ নামান্তর দৃষ্ট হয়।

ষষ্টিদণ্ডাত্মক দিবসকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বাহ্ণের দশদণ্ড বসন্ত ঋতু, মধ্যাহ্নের দশদণ্ড গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণের দশদণ্ড বর্ষা, রাত্রির প্রথম দশদণ্ড শরৎ, মধ্য দশদণ্ড হেমন্ত ও শেষ দশদণ্ড শীত ঋতু ভেদে পূর্ব্বাহ্ণে বসন্ত, মধ্যাহ্নে দীপক, এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে মেঘ, শ্রী, ভৈরব, ও মালকোষ গান ব্যবহার বিরুদ্ধ। প্রভাতে ভৈরব, সন্ধ্যায় শ্রীরাগ গানের নিয়ম।

বারান্তরে সঙ্গীত সম্বন্ধে অন্য অন্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজানকীনাথ বসাক।

মহাভারত।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত।

তারা কন্যা———কৃষ্ণা

কৃষ্ণাচরিত্রের লক্ষণগুলি এই :—

১। পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্র যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

(মহা ১।১৬৫)

২। যজ্ঞসেন মরুৎগণের পক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। (মহা ১৬৭)

৩। মরুৎ—যজ্ঞসেনের পুত্র শিখণ্ডী।

৪। অর্জ্জুনের বাহুবলে যজ্ঞসেন পরাজিত হইয়াছিলেন।

৫। মরুৎ—যজ্ঞসেন দ্রোণবিজয়ী পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাগ্নি হইতে পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন (১) এবং যজ্ঞবেদী হইতে কন্যা কৃষ্ণা আবির্ভূত হইলেন

(মহা ১।১৬৭)

৬। কৃষ্ণা—শূলপাণির কন্যা। (২)

৭। কৃষ্ণার দেহ নীলোৎপলের গন্ধময় ছিল। (মহা ১।১৬৭)

৮। মহাভারত মতে (১৬৭) কৃষ্ণা—শচীদেবী—(১।১৯৭) কৃষ্ণা লক্ষ্মীদেবী এবং (১৮।৪।১২) কৃষ্ণা—শ্রীদেবী।

১। ঋগ্বেদ মতে বিদ্যুতাগ্নি মরুৎদেবের সহচর ১।১৬৭।৩ মহাভারতে বিদ্যুতাগ্নি ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে মরুৎ-যজ্ঞসেনের পুত্র স্থান অধিকার করিয়াছেন, মহাভারত মতে ধৃষ্ট—চঞ্চল এবং দ্যুম্ন—অগ্নি।

২। শ্রীঃ এষ দ্রৌপদীরূপা ত্বদর্থে মানুষং গতা।
রত্যর্থং ভবতাং হ্যেষা নির্ম্মিতা শূলপাণিনা॥ মহা ১৮।৪।১০

৯। কৃষ্ণার স্থালী সতত অন্নপূর্ণ থাকিত। (মহা ৩।৩)

কৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী। (মহা ৫।৮২)

১১। লক্ষ্য ভেদ করিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণাকে স্বয়ম্বরে লাভ করেন। পর পর পঞ্চ দিনে পঞ্চ পাণ্ডব একে একে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করেন। প্রতি নিশান্তে কৃষ্ণা—কুমারীত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইতেন। (মহা ১।১৯৮)

১২। দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন কৃষ্ণার কেশকলাপ নিদারুণ আকর্ষণ করিলে কৃষ্ণার কেশকলাপ ছিন্নভিন্ন ও অর্দ্ধাম্বর ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। (মহা ২।৬৬)

১৩। জয়দ্রথ কৃষ্ণার উত্তরীয় ধারণ করিলে কৃষ্ণার আকর্ষণে জয়দ্রথ ভূতলশায়ী হইলেন। পরে জয়দ্রথ উত্তরীয় পুন আকর্ষণ করিলে কৃষ্ণা জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। (মহা ৩।২৬৬)

১৪। বিরাটভবনে কৃষ্ণা সৈরিন্ধ্রী ছিলেন। এবং বিরাট সেনাপতি কীচক কৃষ্ণার উত্তরীয় ধারণ করিল। কৃষ্ণার আকর্ষণে কীচক ভূতলশায়ী হইল। কীচক কেশকলাপ গ্রহণে কৃষ্ণাকে ধরাতলশায়িনী ও কৃষ্ণার দেহে পদাঘাত করিল।

(মহা ৪।১৬)

১৫। সহদেব ও কৃষ্ণা দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির বিরোধী, কিন্তু ভীমার্জ্জুন সন্ধির প্রয়াসী। (মহা ৫।৮২)

১৬। স্বর্গারোহণ কালে কৃষ্ণা অগ্রে পতিত হইলেন।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

১। রাশিচক্রের সপ্তম রাশির নাম তুল রাশি। এই রাশিতে নক্ষত্র চক্রের চিত্রা নক্ষত্রের অর্দ্ধাংশ, পূর্ণ স্বাতি নক্ষত্র এবং বিশাখা নক্ষত্রের তিনচতুর্থাংশ পড়িয়াছে। কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের চিহ্ন-স্বরূপ তারাগুলি বহু উর্দ্ধস্থ ভূতেশ (Bootes) মণ্ডলে অবস্থিত আছে। (৩)

২। বেদিক যুগের প্রথম ভাগে চিত্রা-নক্ষত্রের অধিপতি ইন্দ্র ছিলেন। "ইন্দ্রস্য চিত্রা"। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৪।৭।৪) নক্ষত্রটী এক তারাত্মিকা, তারাটী স্থূলত্বে তারাজগতের ষোড়শতম তারা এবং বর্ণে কোমল নীলবর্ণ। কাশীর পঞ্জিকায় চিত্রা দশভূজা নারী মূর্ত্তিতে অঙ্কিত থাকে।

৩। স্বাতি নক্ষত্রের অধিপতি বায়ুদেব বা মরুৎগণ ওরফে রুদ্রগণ। নক্ষত্রটী বহু তারাত্মিকা। যোগ তারাটী—স্থূলত্বে তারা-জগতের চতুর্থ তারা এবং বর্ণে কুঙ্কুম বর্ণ। এই তারাটী বেদে—"রোহিত" (লোহিত বর্ণ মৃগ) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। রোহিত তারা মরুৎগণের পৃষতী রথের যুগ টানে যথা (৪)

যদা এষাং পৃষতী রথে প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ (ঋঃ বেঃ ৮।৭।২৮)

রোহিত তারা প্রতি সেকেণ্ডে ৭০ মাইল চলে। মরুৎগণের এমন সুযোগ্য বাহন তারাজগতে আর নাই। (৫)

"স্বাতির" মুখ্য অর্থ দ্রুতগামী এবং

৩। নক্ষত্র শব্দের মুখ্য অর্থ—স্থান এবং গৌণ অর্থ—ঐ স্থানের চিহ্নস্বরূপ তারা বা তারানিচয়।

৪। এই বেদিক মৃগ হইতে পুরাণে পবনের বাহন মৃগ হইয়াছে।

৫। বেদিক ঋষিগণ ভূতেশমণ্ডল, স্বাতি নক্ষত্র, রোহিত তারা জানিতেন এবং হয়ত বা রোহিত তারার গতি-

গৌণ অর্থ ঋষ্টি (শূল বা খড়্গ) গতিকে খড়্গের দেবতা রুদ্রদেব শূলপাণি। "অশ্বত্থামা" দেখ।

৪। রোহিত তারার পাশ্চাত্য নাম "ভল্লুক রক্ষক" (Gr. Arktouros—the Bear Ward)

৫। রাধা নামান্তরে বিশাখা নক্ষত্র বৈদিক যুগে দ্বিতারকময় ছিল। ১ এবং ২ তুলস্য; তারাদ্বয়ময় বিশাখা যুপ বলিয়া বর্ণিত। (৬)

সৌন্দর্য্যে রাধা (তড়িৎ) নক্ষত্র সকল নক্ষত্রের আধ পত্নীপদ লাভ করিয়াছিল।(৭) কিন্তু রাধার আর এখন সে দিন নাই। রাধার তারাদ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটী (১ তুলস্য, সৌম্য কীলক) হরিৎ বর্ণ। তারাটী ঔজ্জ্বল্যে ১ বৃশ্চিকস্য (Antares) তারা অপেক্ষা সমুজ্জ্বলতর ছিল। কিন্তু এক্ষণে তারাটী তদপেক্ষা তেজস্বিতায় অনেক হীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

রাধার অধিদেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি। (৮) ইন্দ্রাগ্নয়োঃ বিশাখে। (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।১।৪)

৬। তুলা রাশিতে বিশাখা যুপের পূর্ব্বদিকে একটী তারা বেদি আছে। (৯)

বিথুর কোকিল চিরজীবিনী শবরীর মুখে জ্বলন্ত অক্ষরে এই তারা বেদির বর্ণন তুলিয়া দিয়া এই বেদিকে অমরত্ব দিয়াছেন।

তেষাং তপঃপ্রভাবেন পশ্য অদ্যাপি রঘূত্তম।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়া বেদি-অতুলপ্রভা।
(রাম ৩।৭৪।২৪)

অস্যার্থঃ—সেই মহর্ষিগণের তপপ্রভাবে অদ্যাপি সেই অতুল প্রভাসম্পন্ন বেদির রূপে সকল দিক্ সমুজ্জ্বল হইতেছে, হে রাঘব দেখ।

৭। কন্যা রাশিঃ—

"জলে নৌকাস্থা শস্য-অগ্নি-ধারিণী স্ত্রী"।

রাশিটী জলময়। (১০) এজন্য এই রাশিস্থ সংক্রান্তি বিন্দুর নাম জল বিষুব সংক্রান্তি। তারাকন্যা নৌকায় স্থিত। এক হস্তে শস্য অপর হস্তে অগ্নি ধারণ করিয়া আছেন। পদতলে তারা কাংস্য (the Cup)। আমরা এস্থলে তারা কন্যার সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি যাহা নেহাত দরকারি তাহাই মাত্র বলিব।

তারা কন্যা ভূতেশ মণ্ডলের তলে অবস্থিত। জ্যোতিষ মতে এ অবস্থিতি স্থান সম্বন্ধ সূচক।

শীলতা পর্য্যবেক্ষণে উহাতে মরুৎগণকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একথা বলিলে য়ুরোপীয়রা "মহাজনো যেন-মুখো ভবিষ্যতি"। কারণ প্রোফেসর ওয়েবার সাহেব ফতোয়া দিয়াছেন "গ্রীকগণের তারামণ্ডলগুলি হিন্দুগণ গ্রহণ ও পালন করিয়াছেন।" এ দিকে মাত্র ১৭১৮ খৃঃ অব্দে কতক স্থির তারার নিজ গতি থাকা ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ্ হলি (Halley) অবধারণ করিয়াছেন।

৬। বিশাখযূপে দেবানাম্ সর্ব্বেষাম্ অগ্নয়ঃ চিতাঃ। মহাভারত ১৩।১২।৩

৭। "নক্ষত্রাণাম্ অধিপত্নী বিশাখে।"

৮। পৌরাণিক যুগে এই বেদবাক্যের উপর স্তূপাকার ইতিহ রাশি স্থাপিত হইয়াছে। সে কথায় আমাদের এখন দরকার নাই।

৯। বেবিলন নগরের জ্যোতির্ব্বিদগণ এই তারা বেদি বিলক্ষণ জানিতেন।

"The Alter however dropped out of the representation" of the seventh Sign. (R. Brown.)

১০। তু। বেবিলনে এই রাশিটীর নাম আব—নাম (Abnam) অর্থাৎ বৃষ্টি-প্রচারক।

একথা বিশেষ স্মরণার্হ যে তারা কন্যা রাশিচক্রে কেবল একমাত্র নারী মূর্ত্তি যাহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত এবং তারাকন্যা পতনশীল অবস্থায় অধিষ্ঠিত। (ভূগোল চিত্র দেখ)। ● কন্যায়াঃ তারার পাশ্চাত্য নাম শস্য-আহর্ত্রী (Vindemiatrix)

দ্বাদশ রাশির মধ্যে সমসংখ্যক ষট্‌রাশি নিশাসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। কন্যা রাশি নিশাসংজ্ঞক বলিয়া ইতিহে সর্ব্বত্র "কৃষ্ণা" নাম পাইয়াছে। (১১)

৮। সপ্তর্ষি মণ্ডলের জ্যোতিষিক নাম চিত্রশিখণ্ডীমণ্ডল এবং বাজসনেয়ীন্ সংহিতা মতে এই তারামণ্ডলের নাম ঋক্ষ মণ্ডল বা ভল্লুক মণ্ডল। ভূতেশ মণ্ডলের উত্তরে এই তারামণ্ডল অবস্থিত। এবং এই তারামণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎ ভল্লুক (the Great Bear)। তারা ভূতেশ বৃহৎ ভল্লুকের রক্ষক বলিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষিক ইতিহাসে খ্যাত আছে। এবং ঐ ইতিহের চির স্মরণার্থে এই তারামণ্ডলের বৃহত্তম তারা (রোহিত) পাশ্চাত্যে "ভল্লুক রক্ষক" (Arktouros—the Bear Ward) নাম লাভ করিয়াছে।

বেদ মতে মরুৎগণ ভূতেশ মণ্ডলে অবস্থিত হইয়াছেন মরুৎ-দেবের যজ্ঞ প্রাচীন বাণীগত বা সর্ব্বজন বিশ্রুত। মহাভারতের মধ্যে মরুৎ-দেব যজ্ঞসেন নামে দণ্ডায়মান। পাশ্চাত্যের "ভল্লুক রক্ষক" বুটেশ দেবের ভারতীয় ভ্রাতা ভূতেশ দেব তারা ঋক্ষ ওরফে তারা শিখণ্ডীর পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন।

জ্যোতিষিক ইতিহ

১। একটী রমণী গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়া রোদন করিতেছিলেন। তাহার অশ্রুবিন্দু জলে পতিত হইবামাত্র স্বুবর্ণময় পদ্ম হইতেছিল। (১২) (মহা ১।১৯৭)

২। সেই রমণী মহেশ্বর-আদেশে ইন্দ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র ইন্দ্র বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। (মহা ১।১৯৭)

৩। মহেশ্বরের আদেশে সেই রমণী ভূতলে পঞ্চ ইন্দ্রের পত্নী হইলেন।

(মহা ১।১৯৭)

৪। পৌলোমী শচীপতি ইন্দ্র পুলোমাসুরকে বধ করেন।

৫। বৃষাকপি শচী বর্ষণ করেন। (ঋঃ বেঃ ১০।৮৬)

৬। স্বর্গরাজ নহুষ শচীকে কামনা করেন। (মহা ৫।১৫)

৭। কেশী অসুর দেবসেনাকে হরণ করিতেছিল ইন্দ্র দেবসেনাকে (১৩) অসুর হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। (মহা ৩।২২২)

৮। রামায়ণ মতে (৩।৭৪) মহর্ষিগণের (সপ্তর্ষিগণ) প্রিয় শিষ্যা "চিরজীবিনী" শবরী (সামান্য শবর কন্যা নহে,

---

১১। তু। We find the 'Black' goddess in many parts of Hellas......the original prototype is Istass......(R. Brown.)

১২। তু। সোমপবমান ক্রন্দন্ দেবান্ অজীজনৎ। ঋঃ বেঃ ৯.৪২।১৪।
পুষ্পিকাঃ—দেবান্—নক্ষত্রানি। অঃ বেঃ ১৩।১।৪০।

১৩। "সেনা ইন্দ্রস্য"। তৈঃ ব্রাঃ।

পরমদেব কিরাতের কন্যা।) সঞ্চিত ফল দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণের আতিথ্য সৎকার সমাধা করিয়া বেদিস্থ হুতাশনে দেহ আহুতি দিয়া স্বস্থানে স্বর্গে গমন করিয়া স্বর্গে নিজস্থান আলোকময় করিয়া রাখিয়াছেন।

বিরাজয়ন্তীং তং দেশং বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা
তৎপুণ্যং শবরী স্থানং জগাম আত্মসমাধিনা॥

মরুৎ-দেব দুহিতা কৃষ্ণা ও স্বর্গে:—

তথা দদর্শ পাঞ্চালীং কমলোৎপলমালিনীম্
বপুষা স্বর্গম্ আক্রম্য তিষ্ঠন্তীম্ অর্কবর্চ্চসম।
(মহা ১৮।৪।১০)

অস্যার্থঃ—তদ্রূপ পদ্মমালা বিভূষিতা কৃষ্ণাকেও দেখিলেন। সূর্য্যনিভ দেহ দ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন।

৯। আদি শচী ঊষা। তারা জগতে অদিতি—আকাশগঙ্গা ঊষা—শচীর মূল প্রতিকৃতি বা প্রতিমা। আবার তারা কন্যা আকাশগঙ্গার প্রতিমা বলিয়া জলাপ্লুত। "জলে নৌকাস্থা।" আবার স্ত্রীগ্রহদ্বয় সোম ও শুক্র উভয়েই আকাশগঙ্গার প্রতিমা। স্ত্রীগ্রহ সোম লক্ষ্মী রূপ (১৪) এবং স্ত্রীগ্রহ শুক্র শ্রী রূপ ধারণ করিয়াছেন। একথা আমরা বলিলে হয় ত কেহ বা স্কন্ধোত্তলন করিবেন। কিন্তু "পদ্ম পুরাণে" প্রকাশ

শ্রীদেবী শুক্র পিতা ভৃগুর কন্যা (পদ্ম পুরাণ ১।৩৪)

আবার ভৃগুপুত্র শুক্রের একটী নাম লক্ষ্মী-সহজ (১৫)। এবং স্ত্রীশুক্র শচীদেবী ওষধির অধিপতি স্ত্রীগ্রহ চন্দ্রের একটী নাম লক্ষ্মী-ভ্রাতা। (১৬)

ওষধির অধিপত্নী লক্ষ্মীদেবীর পূজা কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে হয়।

তবেই মানিতে হইল যে চন্দ্রের নারী-মূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবী (১৭) এবং শুক্রের নারীমূর্ত্তি শ্রীদেবী। সুতরাং মহাভারত মতে শচী—স্ত্রীমূর্ত্তি শুক্রগ্রহ—স্ত্রীমূর্ত্তি সোম গ্রহ—কৃষ্ণা বিশদ বোধার্থে—তুলনা জন্য পাশ্চাত্য ইতিহ দুই চারিটী স্মরণ রাখিতে হয়।

১০। গ্রীক ইতিহ মতে:—

আইকেরিয়স (Ikarios) দুহিতা ইরিগণি (Erigone) হত পিতার অনু-গমনার্থে—উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করেন এবং পিতা ও কন্যা উভয়ে জিউসদেবের আজ্ঞায় স্বর্গে ভূতেশ (Bootes) ও তারা কন্যা (Parthenos) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মন্তব্য:—ইতিহটী দক্ষ ও সতীর দেহ ত্যাগের সুসদৃশ।

১১। এরিগণি প্রভাতী বুধ তারা ও সমগ্র তারা জগতের প্রসূতি।

১২। "বেবিলন নগরের ইস্তার দেবী(১৮)

১৪। লক্ষ্ম (কলঙ্ক) ধারিণী—লক্ষ্মী।

১৫। লক্ষ্মী ও শ্রীদেবী যদি চ স্বতন্ত্র ছিলেন কিন্তু পুরাণে উভয়ে মিলিয়া গিয়াছিলেন এজন্য নামটী শ্রী-সহজ না হইয়া লক্ষ্মী-সহজ হইয়াছে। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ মতে শুক্রগ্রহের ধ্যানে—"শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী প্রত্যাধিদৈবতম্" পাই।

১৬। লক্ষ্মী-ভ্রাতা শীতরশ্মি জাতঃ চ সুধয়া সহ। পঃ পুঃ ৩।৪১।

১৭। "উমা-অধিদৈবতং সোমম।" গ্রহ যাগতত্ত্ব।

১৮। তারা কন্যা।

("স্বর্গ কন্যা") রণরঙ্গিণী ও উলঙ্গিনী। (১৯) ইস্তার দেবী—অগ্রে চন্দ্র ও পরে শুক্র গ্রহের প্রতিমা ছিলেন এবং কন্যা রাশিতে অধিষ্ঠিত আছেন।" (R. Brown)

১৩। এবং ইস্তার দেবীর ক্রোড়ে স্কন্দ (orion) দেব।

উপপত্তি।

৫। কৃষ্ণা চরিত্রে মানবত্বার নাম গন্ধ নাই। অতিরঞ্জনার্থে কৃষ্ণা যজ্ঞ বেদি হইতে আবির্ভূত বলিয়া পরিকল্পিত নহে। ঐতিহাসিক হিসাবে ঐতিহাসিকগণ দেবগণের জন্ম-মরণ-আদি কল্পনা করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আদ্যাশক্তি জগৎ-মাতার মাতৃজঠরে জন্ম কল্পনাতীত বলিয়া জগৎ-মাতা সীতার আবির্ভাব যজ্ঞ-ভূমি-কর্ষণে, জগৎ-মাতা রাধার আবির্ভাব পদ্ম মধ্যে, জগৎ-মাতা অদিতি—আকাশগঙ্গার আবির্ভাব ভাগীরথীর জলে এবং যজ্ঞবেদি হইতে জগৎ-মাতা কৃষ্ণার আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে। আমরা ভারত-জগতে অসহায়। আমাদের উক্তির আজ খোদ প্রমাণ স্বর্গ ভিন্ন এ জগতে আর কে দিবে। ঐ দেখ বিধাতা দক্ষের দেহ রূপ রাশিচক্রে (ক) তারা বেদি হইতে সমুত্থিত তারাকন্যা কৃষ্ণা অদ্যাপি তারা-বেদির অদূরে "বপুষা স্বর্গং আক্রম্য তিষ্ঠন্তি।" বহু দূরে যাইতে পারেন নাই।

৬। রামায়ণের ভূতেশ—কিরাত-দেবের কন্যা শবরী মহাভারতের মঞ্চে মরুৎ-যজ্ঞ-সেনের কন্যা কৃষ্ণা রূপে দণ্ডায়মান।

মহর্ষি বাল্মিকির "দ্যোতয়ন্তী বেদি" "হুতাশন" "শবরী" ও "মহর্ষিগণ" মহাভারতে পরিপুষ্ট ভাবে "বেদি," "অগ্নি" "কৃষ্ণা" এবং "যাজ" রূপে পুনঃ আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র।

৭। আকাশ-সমুদ্রস্থ তারাগণ পদ্মের উপমেয়। তাই কোমল নীলবর্ণ চিত্রা-নক্ষত্র-ময় কৃষ্ণা-দেহ নীলোৎপল-গন্ধময়। অতিরঞ্জন ইহাতেও নাই। ইহা ঐতিহাসিকের অর্থবাদের গুপ্ত দিক্-দর্শন মাত্র।

সোম পবমান ক্রন্দন্ দেবান্ অজীজনৎ। সোম পবমানের স্ত্রীমূর্তি শচীদেবীরও অশ্রু-বিন্দু সুবর্ণময় পদ্মে (তারাতে) পরিণত হইতেছে।

কৃষ্ণা মহাভারতে মানবী বলিয়া পরিচিত, এজন্য কৃষ্ণার গ্রীক-ভগিনী ইরিগণির ন্যায় তারাজগতের মাতা হইতে পারেন নাই, "গ্রহ-পঙ্ক্তের" প্রসূতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন মাত্র।

৮। শচীদেবী, লক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীদেবী সকলেই তারাকন্যায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কৃষ্ণা,—শচী, লক্ষ্মী ও শ্রীদেবী। এজন্য তারা-কন্যার হস্তে শঙ্খ ও অগ্নি। (২০)

৯। শবরীর কুটীর প্রচুর ফলপূর্ণ, বন-

১৯। "Thus we meet with Istar as a warrior goddess, despoiled of her garments in the under-world and holding orion on her knees." (R. Brown.)

(ক) পুনঃ দ্বাদশধা আত্মানং বিভজৎ রাশি সংজ্ঞকম। সূর্যসিদ্ধান্ত ১২ ২৫।

২০। "The Goddess Istar (Heaneh-daughter) originally represented the Moon in its female phase. But Istar was subsquently identified with the planet Venus, and her stellar reduplication was the nocternal Sign Virgo." (R. Brown.)

বাসিনী কৃষ্ণার কুটীরে অন্নপূর্ণ স্থালী। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা না হইলে এ সব কিরূপে সম্ভব হয়।

১০। মোহিনীরূপধর শ্রীকৃষ্ণ তারা-কন্যা কৃষ্ণার স্বাভাবিক সখা বটে।

১১। শিল্পবিদ্যা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে সমগ্র সভ্যজগতে যে ধর্ম্ম প্রাণে দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি কল্পিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্ম প্রাণে জগৎপ্রসবিনী তারাকন্যা কুমারী মাতা পরিকল্পিত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতি-মাতা স্থিরযৌবনা পৃথা, পৃথিবীর কুমারীত্ব লোপ হইবার নহে। সুতরাং জগৎ-প্রসবিনী চিরকুমারী তারাকন্যার কুমারীত্ব অবিলোপী। ইহাতে অতিরঞ্জন নাই, ইহাতে অতিশয়োক্তিও নাই। ইহা খাঁটী ইতিহ, ধর্ম্ম ইতিহ। প্রাচীন বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণের অতি সাধের কল্পনা—অতীব উচ্চতম হইতে উচ্চতর কল্পনা।

আদ্যাশক্তি জগৎপ্রসবিনী, "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায়"ই কুমারী মাতা। ঐ দেখ পাশ্চাত্য এসিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন

"The Great Goddess of Western Asia was both Virgin and Mother, hence the Parthenos Virgo element" (R. Brown.)

আবার তদনুকল্পে ঈশ্বর-সন্তানের প্রসূতি মাতা মেরী "কুমারী মাতা" (Virgin Mother)। এমন কি "মধ্য যুগে য়ুরোপে ভূগোল-চিত্রে তারাকন্যার কক্ষদেশ সুকুমার সুশোভিত করিত।" (Maunder)

আবার য়ুরোপীয় নাট্যশালায় মিরেকল (Miracle) নামক নাটকনিচয়ের অভিনয়ে রঙ্গস্থলে সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি সতত উদয় হইতেন। প্রতিমা-বিদ্বেষী মাননীয় পোপদেবের কড়া হুকুম জারি করিয়া ঐ মূল-সংস্কার-গত অভিনয় স্থগিত করিতে হইয়াছিল।

১২-১৪। তারা কন্যার কেশকলাপ চির-দিনই পরহস্তগত।

তাই সীতার কেশপাশ মঙ্গল-রাবণ(২১) হস্তে। ধূর্জটি-তনয়ার কেশপাশ দুঃশাসন ও কীচক হস্তে। আরও কত উদাহরণ আছে তাহা বলিবার নয়, পাঠক স্মরণ করিয়া লইবেন।

দিগম্বর-সীমন্তিনী, দিগম্বর-নন্দিনী (ক) সকলেই উলঙ্গিনী—কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে। তাই কৃষ্ণার উত্তরীয় লইয়া দুঃশা-সন, জয়দ্রথ ও কীচকের এত টানাটানি।

কৈকয়ী—সন্তান কাম-রাবণ জগৎ-মাতা আকাশগঙ্গার (২২) উত্তরীয় স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়া সীতাদেবী স্বয়ংই তাহা ত্যাগ করিলেন। (রাম ৩।৫৪)

প্রকৃতি-মাতার বস্ত্রকল্পনা বিড়ম্বনা মাত্র।

আবার আদ্যাশক্তির কাছে সকলেই হীনবল।—উপনিষদ মতে আদ্যাশক্তি

২১। বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্দ্ধজেষু করেণ সঃ। রাম ৩।৪৯।

(ক) জগৎ-ব্যাপক মরুৎ দেবই প্রকৃতপক্ষে দিক্‌-অম্বর মূর্ত্তি ধারণ করেন।

২২। "পূর্ব্বস্যাং দিশি সীতা স্তম।" বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ ১।৫।৮৮।

হৈমবতীর রক্ষিত তৃণ ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ-আদি লোকপালগণ কেহই নাড়িতে পারেন নাই।

তাই আদ্যাশক্তি কৃষ্ণার বাহুবলে মহারথী জয়দ্রথ এবং বিরাট-চমূপতি কীচক ভূতলশায়ী।

আবার শচী-কৃষ্ণাকে নহুষ-দুর্য্যোধন কামনা করেন; কেশী-জয়দ্রথ হরণ করেন, এবং বৃষাকপি-কীচক কর্ষণ করেন।

১৫। মহাকবি সমররঙ্গিণীর হস্তে অস্ত্র দেন নাই বটে। কিন্তু সহ-দেব (ভৃগুনন্দন) এবং শ্রী—কৃষ্ণা উভয়ে একমতে সমর-

ফরসীদেশ . নীত লিপ্ত যমজ-

দ্বয়ের মতভেদ ছিল না।

১৬। তারাজগতে কৃষ্ণা ও পঞ্চপাণ্ডবগণের মধ্যে তারাকন্যা কৃষ্ণা সর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত আছেন, তাই কৃষ্ণার পতন অগ্রে কল্পিত হইয়াছে।

তারা দর্শক।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

মোট কথা,—দুঃখসম্বন্ধীয় সত্যে উপনীত হইবার প্রণালীটি এইরূপ :—যাহা কিছু জন্মায় তাহাই নশ্বর, অর্থাৎ, পরিবর্ত্তনের অধীন। অতএব জন্মমাত্রই দুঃখ, কেননা, দেহের জীবন ও আত্মার জীবন চলিয়া যায়, পক্ষান্তরে প্রত্যেক ঘটনা অন্য ঘটনার সহিত এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ; জন্ম হইতেই দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জন্ম সর্ব্বপ্রথম নহে; ইহার পূর্ব্বে অনন্তসংখ্যক জন্ম হইয়া গিয়াছে, পরেও অনেক জন্ম হইবে; কেননা, এই জন্ম,—বিষয়-বাসনা হইতে, ধারাবাহিক কর্ম্মপরম্পরার সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, মানুষের প্রকৃত 'আমি' তাহার দেহ হইতে, তাহার ইন্দ্রিয়াদি হইতে, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি হইতে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। সুতরাং, বিষয়ের অনিত্যতার উপর মানুষ স্বকীয় ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইলেও, অন্ততঃ মানুষ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; এবং পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ হইতে মানুষ যখনই আপনাকে বিযুক্ত করে, তখনই সে মুক্ত হয়। বস্তুত, জীবন-তৃষ্ণা ও পার্থিব সুখের বাসনা হইতেই কি দুঃখ উৎপন্ন হয় না? এখানে মানুষ ধনোপার্জ্জনের জন্য কতই শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, কত বিপদকেই আলিঙ্গন করে—তথাপি হয়ত তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাহার মনস্কামনা কখন কি পূর্ণ হয়? যে ধন অতি কষ্টে অর্জ্জিত হয়, তাহার রক্ষণে আবার কত উদ্বেগ, কত চিন্তা। কত রাজা, কত মনুষ্য, স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে, আবার কত লোক, সুখের লালসায়, চুরী করে, মিথ্যা শপথ করে, হত্যা করে, ব্যভিচার করে। এ সমস্তই জীবন-তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন হয়। এপর্য্যন্ত বুদ্ধ শুধু এই কথা বলিয়াছেন যে, ইহ সংসারে সমস্তই

দুঃখময়, প্রায় সমস্তই অনিত্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সত্য কি?—না দুঃখের কারণ, ও দুঃখের ধ্বংস। ইহার মধ্যে কার্য্য-কারণের সূত্রটি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। জীবনের মূল যে তৃষ্ণা এবং দুঃখ—এই উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধের প্রকরণটি এইরূপ ঃ—

"অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ; নামরূপ হইতে ষড়ায়তন; ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ; স্পর্শ হইতে বেদনা; বেদনা হইতে তৃষ্ণা; তৃষ্ণা হইতে উপাদান(কর্ম্মফল); উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি (জন্ম) ও জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস, ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে, অবিদ্যার পূর্ণ উচ্ছেদ ও নিবৃত্তি হইতে সংস্কারের নিবৃত্তি, সংস্কারের নিবৃত্তি হইতে বিজ্ঞানের নিবৃত্তি, বিজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে নামরূপের নিবৃত্তি, নামরূপের নিবৃত্তি হইতে ষড়ায়তনের নিবৃত্তি, ষড়ায়তনের নিবৃত্তি হইতে স্পর্শের নিবৃত্তি, স্পর্শের নিবৃত্তি হইতে বেদনার নিবৃত্তি, বেদনার নিবৃত্তি হইতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে উপাদানের নিবৃত্তি, উপাদানের নিবৃত্তি হইতে ভবের নিবৃত্তি, ভবের নিবৃত্তি হইতে জাতির নিবৃত্তি, এবং জাতির নিবৃত্তি হইতে জরা-মরণাদি সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও নিরোধ হইয়া থাকে।" (৫২)

ইহাই দুঃখোৎপত্তির অবিচ্ছেদ্য কার্য্য-শৃঙ্খল—এক কথায়, এই শৃঙ্খলটা দুঃখের মূল পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার জন্য যে উপায়ে দুঃখের উচ্ছেদ হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণেও কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল অনুসৃত হইয়াছে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ইহার প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি—ইহাই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার প্রথম অবয়ব।

আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের মতে, অবিদ্যাটা কি? ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মায়াও নহে, সাঙ্খ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের অভেদও নহে; কিংবা ব্যক্তিগত 'আমি' ও অসীম 'আমির' একত্বও নহে। বুদ্ধ ও প্রাথমিক বৌদ্ধ-তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে চারিটি মহাসত্য (চতুরার্য্যসত্য) সম্বন্ধে অজ্ঞান—অবিদ্যা। হে সৌম্য! "দুঃখকে না জানা, দুঃখের কারণকে না জানা, দুঃখের ধ্বংসকে না জানা, দুঃখ-ধ্বংসের উপায়কে না জানা,—ইহাকেই অবিদ্যা বলে"। (৫৩)

বস্তুত বৌদ্ধদিগের মতে, হওয়াটাই দুঃখ; অবিদ্যা মানুষকে বিশ্বের এই সার-সত্যটিকে জানিতে দেয় না, সুতরাং সুখ যাহা বাস্তবিক দুঃখ, সেই সুখ সম্বন্ধে মানুষের বিভ্রম জন্মে। কিন্তু সকল কার্য্যেরই যেমন কারণ আছে, সেইরূপ অবিদ্যারও একটা কারণ আছে। সেই কারণটি কি? এইখানে আসিয়া বৌদ্ধদর্শন থামিয়া যায়; বৌদ্ধদর্শন বলে,—যেমন একটা অফুরন্ত পথের পূর্ব্ব প্রান্তটি আবিষ্কার করা যায় না, যেমন ডিম্ব ও পক্ষীর, কিংবা বীজ ও বৃক্ষের পরিবর্ত্তন-পরম্পরা ঠিক ধরা যায় না, সেইরূপ সংসার-চক্রও অপরিমেয়।

তার পর—অবিদ্যা হইতে সংস্কার।

যে সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মন সুখের বিষয়সকলকে বাস্তব মনে করিয়া সুখের প্রতি ধাবিত হয় (তা সে সুখ পার্থিবই হউক, কিংবা মোক্ষজনিতই হউক) সেই সকল ধারণাকে সংস্কার বলে।

মানুষের মৃত্যুকালে মানুষের যেরূপ বাসনা ও স্পৃহা থাকে তদনুসারেই তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়। ইহা হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রসঙ্গে অর্থাৎ কর্ম্মবাদে আমরা উপনীত হই।

কৰ্ম্ম কি?—না—এই দৃশ্যমান ভৌতিক জগতের নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা। নৈতিক জগতের ইহাই অবিচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-ভাব। ইহা সেই অকাট্য অখণ্ড ন্যায় যাহা হইতে ভাল কার্য্য ও মন্দ কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসূত হয়। ইহাই নৈতিক দণ্ডপুরস্কারের নিয়ম-পদ্ধতি।

প্রথম অবয়বটির বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করা যাউক। অজ্ঞানবশতই আমরা জীবনকে ইষ্ট বলিয়া মনে করি, এবং এই জন্যই আমরা সংসারে সুখের অন্বেষণে ধাবিত হই। কিন্তু আমরা যে কোন কর্ম্ম করি, তাহার মধ্যেই দণ্ড-পুরস্কার গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে। মৃত্যুকালে কেবল সসীম লক্ষ্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি বদ্ধ থাকিলে মানুষ সংসার-বন্ধনেই আবার আবদ্ধ হয়, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার নূতন শরীর ধারণ করে এবং তাহার সুকৃতি-দুষ্কৃতির কর্ম্মফলে আবার নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের দ্বিতীয় অবয়বটি এই—সংস্কার হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। Oldenburg বলেন, এই জ্ঞান অর্থে, একটা বিশেষ জ্ঞানক্রিয়াও বুঝায় না, কিংবা জ্ঞানের বিষয়ও বুঝায় না, এখানে জ্ঞান অর্থে, জ্ঞান-বৃত্তির উপাদান-বস্তু...অন্যান্য উপাদান হইতে এই জ্ঞানের উপাদান অতীব শ্রেষ্ঠ, জীব যত কাল যোনি ভ্রমণ করে, এই জ্ঞানই তাহার জন্মপরম্পরার বন্ধন-সূত্র।" (৫৪)

ইহা হইতে আমরা তৃতীয় অবয়বে উপনীত হই; জ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ শরীর মনের উৎপত্তি। মানুষের ভৌতিক ও নৈতিক উপাদানগুলি বিনষ্ট হইলে, এই জ্ঞানই থাকিয়া যায়। সুতরাং গর্ভসঞ্চারের সময় মাতৃগর্ভে এই জ্ঞান-বীজ ভৌতিক আকার ধারণ করে;—শরীর-গঠনের জন্য ইহা নিতান্তই আবশ্যক। বুদ্ধ ও আনন্দের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে:—"যদি জ্ঞান, নামরূপের আশ্রয় গ্রহণ না করে তাহা হইলে জন্ম, জরা, মৃত্যু এবং দুঃখের উৎপত্তি ও পরিবৃদ্ধি এ সমস্ত কিরূপে হইতে পারে?—না প্রভু, কিছুই হইতে পারে না।—সুতরাং হে আনন্দ, এই জ্ঞানই নামরূপের কারণ, মূল ও পত্তনভূমি।" (৫৫)

তাহার পর, এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের শেষ অবয়বগুলির মধ্যে যে যোগ—তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বস্তুত, বাহ্য বস্তুর সহিত যোগ স্থাপন করিবার জন্য, শরীর মাত্রই ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণে বাধ্য হয়। ইহাই ষড়িন্দ্রিয়; দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। বাহ্য বিষয়ের সহিত এই সকল ইন্দ্রিয়ের সংস্রব হওয়ায়, ইহা হইতে স্পর্শের উৎপত্তি এবং স্পর্শ হইতে বেদনার (সুখ-

দুঃখ-বোধ) উৎপত্তি হয়। বেদনা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে বিষয়াসক্তি। এই-রূপে মানুষের যে চিত্তবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল,' সেই তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। মৃত্যুকালে এই তৃষ্ণাই মানুষের পুনর্জ্জন্ম প্রদান করে। এই পুনর্জ্জন্মের সহিত আবার সকল প্রকার দুঃখ আসিয়া পড়ে ;—জন্ম, জরা, মৃত্যু। এই সংসার-চক্রের আর শেষ নাই।

(ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কামনা

ঐ আসনতলের মাটির পরে
লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায়
ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর
দূরে রাখ,
চির জনম এমন করে
ভুলিয়োনাক।
অসম্মানে আন টেনে
পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায়
ধূসর হব।

আমি তোমার যাত্রিদলের
রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি
সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কত লোকে
আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত
রইব চেয়ে।
সবার শেষে বাকি যা রয়
তাহাই লব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায়
ধূসর হব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য-সংবাদ।

সাহিত্য-সংবাদের আবশ্যকতা।

ভগবানের কৃপায় বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্র এখন বিস্তৃত। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যার অনুপাতে উপযুক্ত না হউক, এখন অনেকে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টির প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। এখন কাব্য-নাটক, ছন্দ-অলঙ্কার, ব্যাকরণ-অভিধান, ইতিহাস-ভূগোল, দর্শন-বিজ্ঞান, গণিত-জ্যোতিষ, শিল্প ও চিকিৎসা প্রভৃতি

সাহিত্যের সকল দিকেই অল্প-বিস্তর কাজ হইতেছে। এই সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত চেষ্টা ব্যতীত বিশেষভাবে গবেষণার জন্য দেশের নানাস্থানে অনেকগুলি সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল সভা-সমিতি হইতেও বিস্তর কাজ হইতেছে। দেশের টোল, চতুষ্পাঠী, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও দেশীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি চলিতেছে। বহুবিধ প্রাচীন ও নবীন উপায়ে অনেক কাজ হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহার কোনও সংবাদ সাধারণে রাখে না, পায়ও না। দেশের প্রতিভা সাহিত্যের পথ ধরিয়া কোথায়, কি ভাবে উহার উন্নতি ও বিধান করিতেছে, তাহা জানিবার কোন উপায় সাধারণের নাই। আমরা সাধ্যমত সে অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্যিক সভা-সমিতির কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করাই সঙ্গত। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী এক স্থানে সমবেত হইয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় দেশের সাহিত্যিক উন্নতির কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন এবং কি করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে, অনেক বিষয়ের কৌতুহল পরিতৃপ্ত হইবে। সভা-সমিতিগুলির সংবাদ দিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কথা বলিতে হয়। পরিষৎ আজ পনর বৎসরকাল দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া যে ভাবে দেশের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ইহার কার্য্যকলাপ জানিবার আগ্রহ যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরিষৎ কি নূতন পুথি বাহির করিলেন, কি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন, কি নূতন কার্য্যে হাত দিলেন,—এই সমস্ত জানিবার জন্য পরিষদের সদস্যগণেরও যেমন আগ্রহ থাকে, সাধারণের কৌতুহলও তদপেক্ষা কোন ক্রমেই কম নহে। পরিষৎপত্রিকার পরিশিষ্টে তিনমাস অন্তর সে সমস্ত বিবরণ অনিয়মিত ভাবে পাঠ করিয়া কাহারই তৃপ্তি হয় না। এ জন্য মাসে মাসে পরিষৎ ও অন্যান্য সভাসমিতির কার্য্যবিবরণ বঙ্গদর্শনে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

ষষ্ঠমাসিক অধিবেশন।

গত ২৪শে আশ্বিন রবিবারে পরিষদের ষোড়শবর্ষীয় ষষ্ঠমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এবৎসরে তিনিই এখানকার স্থায়ী সভাপতি। পরিষৎ-মন্দিরেই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শতাধিক সদস্য ও শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবারকার অধিবেশনে বাইশ জন নূতন সদস্যের নাম, দুইজন বিশেষ-সভ্যের নাম এবং ছয় জন ছাত্র-সভ্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। পরিষদের এখন সর্ব্বশুদ্ধ মোট সভ্যসংখ্যা ১২০০ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মফস্বলেই পরিষদের সদস্য সংখ্যা অধিক। ইহা হইতেই বুঝা যায় পরিষদের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আকর্ষণ কত বেশী। শুনা যায়, ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিক সভায় এত অধিক সংখ্যক সদস্য নাই। পরিষৎ ভারতের সাহিত্যিক সভা-সমিতিগুলির মধ্যে এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতে শিলিট আবিষ্কার।

এই অধিবেশনেই শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এস্ সি মহাশয় স্বীয় গবেষণাবলে ভারতবর্ষে যে নূতন ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদাবিৎ, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, কোন পণ্ডিতই এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও 'শিলিট' নামক খনিজ পদার্থ দেখিতে পান নাই। কিরণকুমার বাবু গবেষণাবলে নাগপুরে এই পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালীর দ্বারা এই আবিষ্কার প্রথম হইল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা এই সংবাদ বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রথম ঘোষিত হইল, এ সকল বাঙ্গালীর গৌরবের কথা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ভূতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, এম্, আর, এ, এস্ মহাশয় এই সংবাদ সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

মধ্যম রাজদেবের তাম্রশাসন।

বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বি এ মহাশয় পরিষদের আর এক জন সহকারী সম্পাদক। ইনি কলিকাতার ভারতীয় চিত্র শালার প্রাচীন-মুদ্রাতত্ব বিভাগের একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী। ইনিও সে দিন পরিষদের সভায় একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রদর্শন ও তাহার বিবরণ জ্ঞাপন করেন, এই তাম্রশাসনখানি উড়িষ্যার অন্তর্গত কঙ্গোরাবিভাগে পাওয়া গিয়াছে। শৈল বংশীয় মধ্যম রাজদেব নামে কোন রাজা নিজ রাজত্বকালে ষড় বিংশতি বৎসরে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, এই তাম্রশাসনখানি তাহারই দলীল এই শৈল রাজবংশ, এই মধ্যম রাজদেব বা তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ কথা এখনও জানা যায় নাই। যাহা হউক রাখাল বাবু দ্বারা পরিষৎ হইতে এই নূতন তাম্রশাসনখানির বিবরণ সাধারণে এই প্রথম প্রচারিত হইল।

পরিষদে বিজ্ঞানচর্চ্চা।

বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-চর্চ্চা এতদিন স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই বিজ্ঞানের জ্ঞান ধামা-চাপা পড়িয়া থাকিত। এখন অল্পে অল্পে তাহা 'হাতে-কলমে' কাজে লাগিবার মত হইতেছে। ডাক্তার জগদীশ ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র এ বিষয়ে 'হাতে-কলমে" যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছে।—এখন দুই চারি জন এম্ এ যুবক পরের গৃহকলহের মধ্যে পড়িয়া কিরূপে নিজের অন্নসংস্থান, গাড়ীঘোড়া এবং মানসম্ভ্রম করিয়া লইতে হয়, তাহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতেও অধীত বিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করাটাকে আর অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। এই জন্যই সেদিন সাহিত্য-পরিষদে একটি যুবক আমাদের আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে, খানায়-ডোবায়, যে 'শুশুনি-কলমী ল-ল করে' সেই শুশুনি শাকের একটা প্রকৃতিগত নূতন রহস্যের আবিষ্কার করিয়া শুনাইয়াছিলেন। এ বিষয়টা এতদিন উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে অজ্ঞাত ছিল। এই জন্যই সে দিন কিরণ বাবুর অনুসন্ধানে

ভারতে 'শিলিট' বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত বিবিধ প্রকার 'জীবাশ্ম' সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পরিষদে দেখাইতেছেন। পরিষৎ এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া সুযোগমত একটি সুব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্যগণকে ধরিয়া সহজ সরল ভাষায়, চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে এক এক বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়াইয়া, যাহাতে সকলেই প্রত্যেক বিজ্ঞানের স্থূল-স্থূল কথাগুলি বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রীপণ কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই বক্তৃতামালার উপক্রমণিকা স্বরূপ যে প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন, "মায়াপুরী" নামে তাহা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে এবং বঙ্গদর্শনের গত সংখ্যাতে তাহার সার সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে বগুড়ার কৃতবিদ্য জমীদার, ভারতীয় চিত্রশালার প্রাণীতত্ত্ববিভাগের কিউরেটার বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি,এস্ সি মহাশয় জীব-বিজ্ঞানের বক্তৃতামালা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যান হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাখ্যানগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ সরল বিজ্ঞানসূত্র প্রকাশ করিবেন। আগামী মাস হইতে আবার এই ব্যাখ্যানমালা আরম্ভ হইবে।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা।

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই বাহাদুর যখন তিব্বতে গিয়াছিলেন, তখন দলই লামার বাটী হইতে বৌদ্ধযুগের অনেক লুপ্ত ভারতীয়-রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। কাশ্মীর-নিবাসী কবিবর ক্ষেমেন্দ্র সুরি-বিরচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' নামক বুদ্ধদেবের লীলাপ্রকাশক কাব্যখানি বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অপ্রাপ্য হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দলই লামার পুস্তকাগারে রক্ষিত, সেকালে খোদিত কাঠের পাটার গ্রন্থ হইতে, উক্ত কাব্যের এক প্রস্থ ছাপ তুলিয়া আনিয়াছেন। কবি ক্ষেমেন্দ্র খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের মহাযান-সম্প্রদায়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, এই গ্রন্থ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই মহাযান-সম্প্রদায় হইতেই বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার এবং বৌদ্ধমূর্ত্তি-পূজার প্রচার হয়। গ্রন্থখানি ভারতবর্ষের নানা দেশে প্রচারিত থাকিলেও অতি শীঘ্রই ইহার অভাব ঘটিয়াছিল। ক্ষেমেন্দ্রের তিরোভাবের দুইশত বৎসরের মধ্যেই কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে নেপালাদি রাজ্যেই এই গ্রন্থের অভাব হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নেপালরাজ অনন্তমল্ল এই কাব্যখানি সম্পূর্ণ সংগ্রহে চেষ্টা করেন; কিন্তু তখনই তিনি ইহার প্রথম ৫০টি পল্লব ব্যতীত আর পান নাই। তিব্বতীয়েরা কিন্তু এই সময়ে কাশ্মীর হইতে বহু যত্নে সমগ্র গ্রন্থ সংগ্রহ করে এবং নিজের ভাষায় কবিতা অনুবাদ করিয়া রাখে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই তিব্বতীয় অনুবাদ সংশোধিত হয় এবং কাঠের পাটায় খোদিত করিয়া মুদ্রিত করা হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে দলই লামার আদেশে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত

ঐ অনুদিত পুঁথির পাঠ মিলাইয়া ইহার পুনরায় সংশোধন করা হয় এবং ৬০০ শত কাঠের পাটায় খোদিত করিয়া পুনরায় ছাপা হয়। এই সকল কাঠের পাটা হইতে রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র এক প্রস্থ পুস্তক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ছাপিয়া লইয়া আসেন। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐগুলি এসিয়াটিক সোসাইটির হস্তে দিলে, উক্ত সোসাইটি উহার সংস্কৃত পাঠ ও তিব্বতীয় পাঠ স্থির করিয়া একত্র ছাপিতে আরম্ভ করেন। ঐখান হইতে এ পর্য্যন্ত ৪০টি পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। এখনও ৬৮টি পল্লব ছাপিতে বাকী, অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থখানিতে অষ্টোত্তরশত পল্লব আছে। এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণের সাহায্যে রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র এই মহাগ্রন্থ বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিতেছেন। গত বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ মহাশয় রায় বাহাদুরের নিকট এই বিবরণ শুনিয়া উহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রার্থনা করেন। রায় বাহাদুর পুস্তকের ভূমিকা এবং প্রথম পল্লবের মূল এবং অনুবাদ পরিষদের গত অধিবেশনে পাঠার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে উহা সভাস্থলে পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উপস্থিত না থাকায়, বহুভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ উহার কতকাংশ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান। রায় বাহাদুরের চেষ্টায় এবং পরিষদের যত্নে এই মহাগ্রন্থখানি বাঙ্গালা-বাণীমন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিবে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি।

বাঙ্গালা নাটক ও মুসলমান বিদ্বজ্জন-সমিতি।

বাঙ্গালীর লিখিত নাটকাদিতে মুসলমান-সমাজের অপ্রীতিকর এবং অনিষ্টকর বর্ণনা স্থান পায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান বিদ্বজ্জনেরা একটি সমিতি গঠন করিয়া উহা নিবারণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার রসুল সাহেব ইহার সভাপতি। সম্প্রতি এই সমিতি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে পরিষদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। পরিষৎ এবিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের অসৌহার্দ্দ্যসূচক অথবা ইতিহাস-বহির্ভূত কোন কল্পিত কথা রচনা দ্বারা বাঙ্গালা নাটককে দূষিত করিতে বা তদনুরূপ রচনা অভিনয় দ্বারা বাঙ্গালা নাট্যশালার প্রতি কাহারও বিরাগ আনয়ন করিতে নিরস্ত হইবার জন্য বাঙ্গালা নাটক লেখকগণকে ও নাট্যশালাধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। পরিষদের এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে; তবে আমরাও মুসলমান লেখকগণের হস্তে হিন্দুর বিরক্তিকর কোন লেখা প্রকাশ হইতে না দেখিলে আরও প্রীত হইব।

৺রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।

তেওতার রাজবংশের মহানুভব প্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন দেশের সকল সৎকর্ম্মে তিনি অগ্রণী ছিলেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। একবৎসর এই প্রীতির বশে তিনি ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

সদস্যপদ আনন্দসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় আলয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পরিষদের তত্ত্বাবধান করিতেন। পরিষদের গত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় তাঁহার গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিবার ব্যবস্থা করেন।

মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ ষোলবৎসর কাল এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের বিপুল সঙ্কল্পরাশির কোন কোনটির কার্য্য আরম্ভমাত্র করিয়াছেন, অবশিষ্টগুলিকে নানা কারণে স্পর্শ করিতেই পারেন নাই। দেশের রাজা, মহারাজা বা বিদ্বজ্জনেরাও সকলে এখনও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার সুযোগ পান নাই; কিন্তু সুদূর বোম্বাই প্রদেশে গুর্জ্জর রাজ্যে মহারাট্টাগণ ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন। গুজরাট-আমেদাবাদে অর্দ্ধ শতাব্দী কালেরও অধিক কালের প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্য-সভা বর্ত্তমান থাকিতেও তথাকার মহারাষ্ট্রীয়েরা আমাদিগের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুকরণে বরদায় এক মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি ও জনৈক প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহাশয়ই সেখানকার উদ্যোক্তা। বঙ্গের গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণকে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গণ্যমান্য সদস্যবর্গকে তাঁহারা এই সাহিত্য-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয় এই মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যাইতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষাও বাঙ্গালার ন্যায় সংস্কৃত-শব্দ-বহুলা, সুতরাং উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও খুব দুরবর্ত্তী নহে। এক্ষণে উভয় পরিষদে এক উদ্দেশ্যে স্ব স্ব দেশের মাতৃভাষার উন্নতি ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উভয় ভাষাভাষীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সৌখ্যবর্দ্ধনে যত্ন করিলে সোনায় সোহাগা হইবে।

রাজা রামমোহনের ছবি।

রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক। তাঁহার যখন বিলাতে মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার ডাক্তার এস্‌লিন্ তাঁহার মৃত মুখের ছাঁচ লইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তাহা হইতে প্যারী-প্লাষ্টারের প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত ডাক্তার এস্‌লিনের কন্যার কাছে ছিল। রাজা যে শালের পাগড়ীটি মাথায় দিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন সেই পাগড়ীটিও তাঁহার কাছে ছিল, অবশেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ যখন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি রাজার ঐ মূর্ত্তি ও পাগড়ী আনিয়া নিজের কাছে রাখেন। তৎপরে গত ১৩১৫ সালের চৈত্র মাসে তিনি উহা পরিষদে দিয়াছেন। চৈত্র মাসেই উহা যথারীতি পরিষৎ-মন্দিরের দর-দালানে মূর্ত্তিপীঠের উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ইহা রাজার

স্মৃতি-নিদর্শনের পক্ষে বহুমূল্য হইলেও দ্বিতলের সভাগৃহে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম-চন্দ্রের পার্শ্বে তাঁহার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপযুক্ত পরিমাণের তৈলচিত্র না থাকায় পরিষদের সভাগৃহটির শোভা পূর্ণ হইতেছে না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, রাজার সুযোগ্য পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় পিতামহের উপযুক্ত তৈলচিত্র পরিষদে দান করিবেন। সম্প্রতি পরিষৎ নিজ ব্যয়ে রাজার একখানি সুন্দর ব্রোমাইড ছবি করাইয়া আপাততঃ প্রতিকৃতিমালার ক্ষুণ্ণতা বিদূরিত করিয়াছেন। এখানিও রাজার একখানি ঐতিহাসিক ছবির অনুকৃতি। বিলাতে বৃটিশ মিউজিয়মের হলে যে সুবৃহৎ সুন্দর তৈলচিত্র আছে, এখানি তাহারই ফটোগ্রাফ হইতে সুবিখ্যাত হুপ সিং কোম্পানী দ্বারা প্রস্তুত। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজার তিরোভাব দিন উপলক্ষে রাজার এই মূর্ত্তি ও ছবি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা দেবপ্রতিমার ন্যায় সাজাইয়া সাধারণের দর্শনার্থ পরিষদের নিম্নতলের সভাগৃহে রাখা হইয়াছিল। ব্রোমাইড ছবিখানির প্রতিষ্ঠাও উক্ত ২৪শে আশ্বিনের অধিবেশনে হইয়া গিয়াছে।

পরিষদের নামরহস্য ও নামকর্ত্তৃগণের ছবি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় কোন সভা প্রতিষ্ঠার কল্পনা সর্ব্বপ্রথমে ১২৭৯ সালে সার্ জন বীম্‌সের হইয়াছিল। তাহার পর ১৩০০ সালে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সাহায্যে যখন সার জন বীম্‌সের প্রস্তাব মত একটি সভার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে এম্ লিওটার্ড্ নামে একজন ইংরাজও ইহার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কাজেই সেই সময়ে উক্ত সভার নামও ইংরাজীতে The Bengal Academy of Literature রাখা হয়। মাস কয়েক যাইতে না যাইতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার জন্য স্থাপিত সভার নামকরণ যে ইংরাজীতে হইয়াছে, ইহা অনেকেরই বিরক্তিকর ও অসহ্য হইয়া উঠিল। ইংরাজী নামের প্রতিবাদ করিতে অগ্রণী হইলেন প্রবীণ সাহিত্যরথী ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। তিনিই উক্ত সভার ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ করিয়া, সেই নামে পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত সভার 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নাম রাখিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সুযুক্তিপূর্ণ এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান। অবশেষে ১৩০১ সালের বৈশাখ মাস হইতে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে সভার ঐ নাম প্রথম হয়। গত ২৪শে আশ্বিনের অধিবেশনে পরিষৎ স্বীয় নামকরণ কর্ত্তাদিগের অর্থাৎ ৺রাজনারায়ণ বসু ও ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ৺রাজনারায়ণ বাবুর ছবিখানি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ বদান্য জমীদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দান। হাওড়া-বাঁটরা-নিবাসী চিত্রকর শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দাস এই ছবিখানি আঁকিয়াছেন। ৺উমেশ বাবুর তৈল চিত্রখানি তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের উপহার। কলিকাতা-

দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন গুপ্ত উহার চিত্রকর। মূলপ্রতিষ্ঠাতা ৺ক্ষেত্রপাল বাবুর ছবি বহুপূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন এবং তাহা পরিষদের মন্দিরে বহুকালাবধি আছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রাও এখানে অল্পে অল্পে সংগৃহীত হইতেছে। খোদিত লিপিযুক্ত বা ঐতিহাসিক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত ভগ্নমূর্ত্তি বা ভাস্কর্য্য-খণ্ড সকলও অল্পে অল্পে সংগৃহীত হইয়া ভবিষ্যৎ চিত্রশালার আয়োজন করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরই যত্নে পরিষৎ এপর্য্যন্ত দশ-বারোটি দুর্ল্লভ প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি গুপ্ত সম্রাট্‌গণের বংশধর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ঐ মুদ্রাটি ১১৩৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতাবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৪০১ খৃষ্টাব্দে উত্তরভারতের সম্রাট্‌ হন। ইনি মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র এবং 'দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য' এই গৌরবময় উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই সময়ে গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

অবলোকিতশ্বর, বুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি-সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঢাকা বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহারই উপকরণ-সংগ্রহের সময় রামপাল প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন পাইয়াছেন। দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি তাহার মধ্যে অন্যতম। সাহিত্য-পরিষদের ভাদ্রের অধিবেশনে এই মূর্ত্তি প্রদর্শিত ও তদ্বিবরণ পঠিত হইয়াছিল। ইহার ছবি ও বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু কোন বিলাতী চিত্রশালায় বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ পাইবার সংবাদ পাইয়াও লোভসংবরণ পূর্ব্বক দেশের জিনিস দেশে রাখিবার আশায় উহা সাহিত্য-পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল, এম্ এস্ মহাশয় কিছুদিনের জন্য বিহারে গিয়াছিলেন। বিহার নগরে প্রাচীন ওদন্তপুরীর যথেষ্ট ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তিনি এখানে কয়েকটি উৎসাহী যুবকের সাহায্যে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি এবং খোদিত লিপিযুক্ত মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দিয়াছেন। এই সকল খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই।

ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের লিখিত উড়িষ্যার প্রাচীন তত্ত্বের বিবরণ যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা মোটামুটি পুরী, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, জাজপুর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন তত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু তাহা ভিন্ন উড়িষ্যার আরও শত সহস্র স্থানে স্তূপ-তড়াগ-বনমধ্যে

কত ঐতিহাসিক স্থানের ভগ্নাবশেষ গুপ্ত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান এ পর্যান্ত কেহই করেন নাই। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর একজন কৃতবিদ্য, রাজ্যের কুশল ও গৌরবপ্রয়াসী। তিনি স্বরাজ্যের প্রাচীন তত্ত্ব উদ্ধারের জন্য আজ তিন বৎসর কাল চেষ্টা করিতেছেন এবং এইজন্য প্রতি বৎসর পাঁচ সাত হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। বিশ্বকোষ-সম্পাদক, প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই অবৈতনিক ভাবে এই মহাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং আজ তিন বৎসরে ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত হরিপুরনামক স্থানে কত মৃৎস্তূপ উৎখাত, কত ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন মন্দিরের ও দেবদেবীর প্রতিমার এবং বৌদ্ধমূর্ত্তির আবিষ্কার, কত তাম্রশাসন, শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কীর্ত্তিকলাপের সবিস্তর বিবরণ ইংরাজীতে ছাপা হইতেছে। এই বিবরণীতে গৌর, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু এই পঞ্চোপাসকের প্রভাবের নিদর্শন স্বরূপ কত শত ভাস্কর্য্য, ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, দুর্গ, ও বিধ্বস্ত গ্রাম নগরাদির প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইতেছে, কত প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি ও তাম্রলিপির প্রতিকৃতি ছাপা হইতেছে। নগেন্দ্র বাবুর এই রিপোর্টখানি উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসেরও কত কথার নূতন পথ খুলিয়া দিবে। এই অনুসন্ধান ও গবেষণা সূত্রে নগেন্দ্র বাবু উড়িষ্যার মানবংশ, তুঙ্গবংশ, শুল্কীবংশ ও শৈলবংশ নামে কয়েকটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব রাজবংশের বিবরণ নূতন আবিষ্কার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভায় তাহা প্রথম বিজ্ঞাপিত করেন। সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু জাজপুরের প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ রত্নগিরি প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনের জন্য আহূত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের কার্য্য শেষ হইলে, উড়িষ্যার করদ মহালের অন্যান্য রাজা এবং মেদিনীপুরের গড়জাত মহালের রাজারা তাঁহাকে স্ব স্ব রাজ্যের প্রাচীন-তত্ত্ব উদ্ধারে নিয়োগ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

শ্রীঃ—

নীলকণ্ঠ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নীলকণ্ঠের কাজটা ঠিক হয় নাই! আরব্ধ জমাবন্দীর কাজ শেষ না করিয়াই সে ভাবে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাটা নীলকণ্ঠের অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু কেন যে নীলকণ্ঠকে এভাবে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল, তা অবশ্য আপনাদের অজ্ঞাত নাই। প্রবীণের পক্ষে নবীনা স্ত্রী যে "প্রাণেভ্যোপি গরিয়সী!" তরুণীর মনোরঞ্জনের জন্য বৃদ্ধস্বামী বেচারীদের অনেক সময় কত যে অকাজ, কোন কোন সময় কত কুকাজও

করিতে হইয়াছে, সে সব কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসও পুরাণের পৃষ্ঠায় কালিমারঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। সংসার-নাট্যশালাতেও এ দৃশ্যের অভাব নাই! এ অভিনয়ের বিরাম নাই। নীলকণ্ঠও সে সাধারণ নিয়মের হাত এড়াইতে পারেন নাই। ষোড়শীর সেই আকুল আহ্বানে, বংশীধারীর মুরলী-রব-মুগ্ধা রাধার ন্যায়, সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া, সু, কু না ভাবিয়া, নীলকণ্ঠ ছুটিয়া আসিয়াছেন। তা কাজটা অবশ্য নীলকণ্ঠের ভাল হয় নাই। নীলকণ্ঠ যে ইহা না বুঝিয়াছিলেন তাহা নহে, আসিবার সময়, হয় ত, এতটা মনে হয় নাই, কিন্তু গৃহে পৌছার পর হইতেই বার বার তাহার মনে হইতেছিল, কাজটা কি অন্যায়ই হইয়াছে! এ বুড়া বয়সে কি ছেলেমানুষিই করিয়াছি! অনুতাপের একটা গাঢ় ছায়া হৃদয়টা যেন অন্ধকার করিয়া দিল। কিন্তু তখনই আবার মনে হইত কাজ ত প্রায় শেষ করিয়াই রাখিয়া আসিয়াছি,—সামান্য যেটুকু বাকী আছে, তা স্থানীয় কর্ম্মচারীই সম্পন্ন করিতে পারিবেন; কিন্তু হায় মানুষ গড়ে, দেবতায় ভাঙ্গে! চানক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—"জমাবন্দী" কার্য্যের শেষ ফেলিয়া রাখিতে নাই! নীলকণ্ঠ সংবাদ পাইলেন, স্থানীয় কর্ম্মচারী সুযোগ বুঝিয়া, মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতেছেন,—"রক্ষক হইয়া ভক্ষকে" রূপান্তরিত হইতেছেন। নিজের স্বার্থের মন্দিরে মুনিবের হিতটুকু বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন! খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে, পড়ে পড়ে অবস্থা। নীলকণ্ঠের কল্পনার বালুঘর ফুৎকারে অদৃশ্য হইল। তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল ছি, ছি, ছি! তাকে নিতান্তই অপদার্থ বলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার কৃত কার্য্যে, তাঁহার ত্রুটিতে, তাঁহার অন্নদাতার বিষম ক্ষতি হইতে বসিয়াছে। শেষে কি তাঁহার এতটা অধঃপাত হইল—বৃদ্ধ বয়সে স্বখাদ-সলিলে শেষে কি তার ষোড়শী-কলসী গলায় বাধিয়া এইরূপ অপমৃত্যু ঘটিল! এই ভাবের কত কথা মনে আসিতে লাগিল।

সংসার-মন্থনে যৌবনে নীলকণ্ঠের ভাগ্যে যে অমৃত উঠিয়াছিল, তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া কেন আবার তাঁর এ বয়সে দ্বিতীয় মন্থনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। এই কথা ভাবিয়া নীলকণ্ঠের দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মন্মথের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হওয়ার পর ষোড়শীর হৃদয়ের নিভৃত তলে কোথায় একটা বেদনা যেন চোরাবালির মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছিল। তাহার সুখশান্তির তরণী চলিতে চলিতে সহসা সেই চোরাবালিতে ঠেকিয়া মাঝে মাঝে "বানচাল" হইয়া যাইত। জীবন তখন দুঃসহ হইয়া উঠিত। সংসারের কিছুই আর তার ভাল লাগিত না। আজ মন্মথের এই নিদারুণ অবজ্ঞা ও অবহেলার বিষাক্ত বিশিখ ষোড়শীর কাণের ভিতর দিয়া যখন তার মরমে প্রথম বিঁধিল, তখন সেই বেদনার যন্ত্রণা যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মত ষোড়শী ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়া কাতর প্রাণে আকুলকণ্ঠে সেই অন্তর্য্যামী করুণাময়ের চরণকমলে কাতর প্রার্থনা জানাইল;—সেই ব্যথিত হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন বৃথায় যায় নাই। যেন কোন

এক অদৃশ্য কোমল হস্তের করুণ স্পর্শে ষোড়শীর সে সুতীব্র বেদনার উপশম ঘটিল, জ্বালা জুড়াইল। তখন বিদ্যুৎপ্রবাহে ষোড়শীর মনে নববলের সঞ্চার হইল।

ষোড়শীর হৃদয় হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল। এতদিন স্বামীর সহিত তাহার কেমন একটা ব্যবধান ছিল, কেমন যেন 'বাধ-বাধ' ভাব ছিল, যন্ত্রচালিতের ন্যায়, কর্ত্তব্যের খাতিরে, সংস্কারের বশে, ষোড়শী স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিত। তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। ষোড়শী নিজে যে ইহা ঠিক বুঝিতে পারিত তা নয়, তবে স্বামীর সহিত ব্যবহারে তাহার কি যেন একটা অভাব থাকিয়া যাইত, মাঝে মাঝে ইহাই তাহার মনে হইত, কিন্তু সে অভাব কি এবং কোথায়, তাহা সে ধরিতে পারিত না, আজ সহসা সে অভাব ধরা পড়িল। সে বুঝিল, এতদিন সে স্বামীকে যত্ন করিত, সেবা করিত, ভক্তি করিত, কিন্তু ঠিক ভাল বাসিত না। আজ হইতে স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসিতে হইবে, উমা যেমন মহাদেবকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তেমনই ভাল বাসিতে হইবে। এ ভালবাসা তুই একদিনে হইবে না, ইহাতে ঘোর তপস্যা চাই! ষোড়শী সেই তপস্যাই করিবে! মন্মথের চিন্তা ভস্ম হইবে;—হোক!

* * * *

আজ কাছারী হইতে ফিরিতে নীলকণ্ঠের কিছু বিলম্ব হইয়াছে। এতদিন প্রথম সাক্ষাতে বরাবর নীলকণ্ঠই হাসি মুখে ষোড়শীকে উপলক্ষ করিয়া আগে কথা কহিতেন কিন্তু আজ ষোড়শীর এ কি পরিবর্ত্তন, আজ নীলকণ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে, ষোড়শী আগ্রহ ভরে নীলকণ্ঠকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আজ ষোড়শীর সুন্দর প্রফুল্ল মুখে এ কি লাবণ্য সঞ্চার, উজ্জ্বল চক্ষে এ কি অমৃতের লহরী! নীলকণ্ঠ "নয়ন অঞ্জলি ভরি" সে রূপ-সুধা-পান করিতে লাগলেন—তাঁহার সে অনুতাপ, সে প্রতিজ্ঞা নিমেষে কোথায় ভাসিয়া গেল! বৃদ্ধের ব্যবহারে আজ যৌবনের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল, সে চাঞ্চল্যে ষোড়শীও বিব্রত হইয়া পড়িল,—ষোড়শী কিছু বিব্রত হইল বটে কিন্তু বিরক্ত হইল না! কেবল আবেশ মগ্ন নয়নে নীলকণ্ঠের প্রতি কটাক্ষপাত করিল—সে কটাক্ষের মদিরতা নীলকণ্ঠ বহুদিন পান করেন নাই! কতদিনের কথা সে আজ, আজ কি তবে নীলকণ্ঠের যৌবন আবার ফিরিয়া আসিল!

বাহিরে কে ডাকিল,—বাবু টেলিগ্রাম!

* * *

সেই জলাবন্দীর ব্যাপার লইয়া মফঃস্বলে বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে—শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা উপস্থিত, নীলকণ্ঠকে আজ রাত্রেতেই রওনা হইতে হইবে।

* * *

"আমায় একা ফেলে যেওনা, যেওনা—ষোড়শী নীলকণ্ঠের দুটি পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে লইয়া চল—আমায় একা ফেলে যেওনা, যেওনা!

"পথে নারী বিবর্জ্জিতা"

নীলকণ্ঠ ষোড়শীর এ প্রস্তাব নিতান্ত পাগলামি ভাবিয়া উড়াইয়া দিলেন!—ষোড়শীকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া নীলকণ্ঠ মফঃস্বল রওনা হইলেন—কিন্তু ষোড়শী প্রবোধ মানিল না! ষোড়শী সমস্ত রাত্রি রোদনে কাটাইল!" হায় নীলকণ্ঠ, তোমার পূজার জন্য হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে অনেক যত্নে, অনেক আয়াসে ষোড়শী বাছিয়া বাছিয়া যে 'ফুলদল' সংগ্রহ করিয়াছিল, তুমি আজ সে সকলই পায়ে দলিয়া গেলে!

"পূজার তরে হিয়া, উঠেছিল ব্যাকুলিয়া,
—ভক্তের সে পূজা, তুমি গ্রহণ করিলে না!"

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
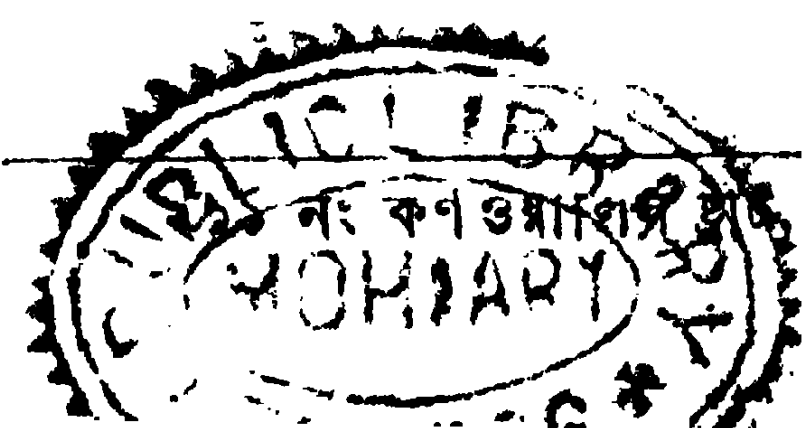
২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

ব্রাহ্মণ।

জগতের ইতিহাসে এবং হিন্দুর সমাজ-সংস্থানে ব্রাহ্মণের আসন কোথায়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যে আসনে যে অধিষ্ঠান করে, সেই আসন তাঁহাকে যত্ন করিয়া রক্ষা করিতে হয়। কেরাণীর সামান্য বেত্রাসন হইতে রাজাধিরাজের স্বর্ণ-নির্ম্মিত হীরক-খচিত শূর-বৃন্দ-সুরক্ষিত সিংহাসন পর্য্যন্ত সকল আসনকেই রক্ষা করিবার জন্য অধিষ্ঠাতাকে নিয়ত জাগরিত, অবহিত এবং সচকিত থাকিতে হয়। যিনি অনবহিত, তাঁহার আসন স্থির থাকিতে পারে না।

একবার বেণের সময়ে, দ্বিতীয়বার নহুষের সময়ে, আর তৃতীয়বার বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাব-সময়ে ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠিত আসন টলমলায়মান হইয়াছিল, কিন্তু তখন ব্রাহ্মণেরই প্রতিভা তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। প্রতিভায় যাহার উৎপত্তি প্রতিভা তাহারই রক্ষণে অগ্রসর হয়;—ভিক্ষায় যাহার উৎপত্তি, অনুগ্রহে যাহার স্থিতি, বিনাশের সময়ে তাহার রক্ষার জন্য প্রতিভা কোথা হইতে আসিবে?

ব্রাহ্মণ্যের মূল উপাদান জ্ঞান, বৈরাগ্য, সাধন এবং পরার্থপরতা; ইহাদের একটিও প্রতিভাবিহীন ক্ষেত্রে জন্মে না, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য যে পরানুগ্রহসম্ভূত নহে, ইহা নিশ্চিত, এবং সম্পদ-বিপদে প্রতিভা যে সমভাবে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছে, ইহা নিঃসংশয়। সেই চিরাগত প্রতিভা এখনও অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান আছে, এই বিশ্বাসেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণ, নতুবা খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর এই খর-বেগ-প্রারম্ভে, পৃথিবীব্যাপী এই বিপ্লবের যুগে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর অতি অল্প, শুনিবার অবসর আরও অল্প, চিন্তা করিবার অবসর ত নাই বলিলেই হয়।

জগতের অনেক প্রাধান্যের অভ্যুদয় এবং বিলয় হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ইতিহাসের স্মরণাতীত কাল হইতে অদ্যাবধি বর্ত্তমান দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি? ভারত-সমাজের ন্যায় এত বড় প্রাচীন, উন্নত, বুদ্ধিমান এবং সভ্য একটা সমাজ শ্রেণী-বিশেষের আদেশে নির্ব্বিবাদে নিরাপত্তিতে এভাবে চলিয়া আসিতেছে কেন? কারণ, কেবল সেই অমোঘ উপাদান, সেই সুদৃঢ় ভিত্তি—সেই জ্ঞান, বৈরাগ্য, সাধন এবং পরার্থপরতা। যতদিন ব্রাহ্মণের এই সম্পচ্চতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার উচ্চাসন কাড়িয়া লইবার শক্তি কাহারও নাই।

মানবের জন্ম-মৃত্যু ইচ্ছাধীন, ইহা একটি সুক্ষ্মতত্ব এবং অব্যভিরেকী সত্য। যে আত্মহত্যা করিবেই করিবে, তাহাকে কেহই বাঁচাইতে পারিবে না; আর যে বাঁচিবেই বাঁচিবে, তাহাকে কেহই মারিতে পারিবে না। তবে বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিতে মানুষ মরে কেন? অবশ্য সে ইচ্ছার কোন ফাঁকে কিছু ভয় বা সন্দেহ লুকাইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। এক ছিটা গোমূত্র পূর্ণ-কলস দুগ্ধ নষ্ট করে, এক তিল সন্দেহ বা ভয় ষোল আনা ইচ্ছাকে দুর্ব্বল—দূষিত করে। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-চিকিৎসাতে রোগীর বাঁচিবার ইচ্ছা যতটা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার মৃত্যু-ভয় এবং চিকিৎসা-সাফল্যে সন্দেহও ততটাই সূচিত হইতেছে। ইচ্ছাশক্তি কথাটা যেমন সহজ, কাজটা তেমন সহজ নহে। ইচ্ছা দৃঢ় না হইলে পূর্ণ হয় না, আর ভয় বা সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে তাহা দৃঢ় হয় না।

ব্রাহ্মণ্যের সংরক্ষণ এবং বিনাশও ব্রাহ্মণের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা ভয়-সন্দেহ-শূন্য হইলেই দৃঢ় হইবে, আর দৃঢ় হইলেই তাহার ফল ফলিবে।

কিন্তু ইচ্ছা দৃঢ় হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই; সে ধারণা তমসাচ্ছন্ন থাকিলে ইচ্ছাও দৃঢ় হইতে পারে না। ইচ্ছা প্রবল হইলে যত্নের দৃঢ়তা উপদেশের অপেক্ষা রাখেনা—ক্ষুধা প্রবল হইলে আহারের উপদেশ না পাইলেও ক্ষতি হয় না।

ব্রাহ্মণ্য-সংরক্ষণে ইচ্ছা দৃঢ় হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য জিনিষটা কি এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যের মূল উপাদান-গুলির উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি; এগুলি নিত্য—স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্ত্তনে এ গুলির পরিবর্ত্তন হয় না। আচারাদি আর কতক-গুলি আহৃত উপাদান আছে, তাহা অনিত্য। যাহা আসে, তাহা যায়—আগমের অপায় অনিবার্য্য। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যাহার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য—যে কারণে সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার অবসান হইলেই যাইবে।

সংস্কার—আধ্যাত্মিক, ক্রিয়া—নিত্য; কিন্তু উহার চিহ্নাদি অনিত্য। যজ্ঞের ফল ইহপরকালব্যাপী, কিন্তু তাহার চিহ্ন—যজ্ঞের ফোটা—কতক্ষণ কপালে থাকে? উপনয়ন-সংস্কার নিত্য, কিন্তু দ্বিজত্বের চিহ্ন শিখা-সূত্রাদি অনিত্য। যুগে যুগে যজ্ঞসূত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মাসে মাসে তাহাকে ছাড়িতে হইতেছে। সর্ব্বলোক-নমস্কৃত দণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণ্যের চরম স্থান লাভ করিয়া, শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করেন। যজ্ঞ-সূত্র-বর্জ্জিত হইয়া পদমাত্র চলিতে নাই; তবে কি সাঁতারে যজ্ঞ-সূত্র হারাইলে বা ছিঁড়িয়া গেলে সেই খানেই ডুবিয়া মরিতে হইবে? আমি ত' শিখা-সূত্র আদর করিয়া রাখি; কিন্তু যদি অবস্থায় পড়িয়া আমাকে উহা ছাড়িতেই হয়, যদি বল-পূর্ব্বক কেহ উহা কাড়িয়াই লয়, তবে কি সেই পরকৃত অপরাধের জন্য আমার দণ্ড হইবে—আমাকে ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে? অনিত্যের সঙ্গে আমি নিত্যকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না।

উদ্দেশ্যই লক্ষ্য, ব্যবহার তাহার পরিচারক মাত্র। উদ্দেশ্য স্থির, ব্যবহার পরিবর্ত্তনশীল স্থিতিই উদ্দেশ্য, গতি কেবল স্থিতির জন্য

মানুষ গতিশূন্য হইলেই জড় হইল—স্পন্দন ছাড়িলেই মরিল। আমাদের যত ক্রিয়া, যত ব্যবহার, সমস্তই স্থিতির জন্য—বাঁচিবার জন্য। একই মানুষ কখন দিনের মধ্যে তিন বেলা মৎস্য-মাংস দ্বারা উদর পূরিয়া আহার করে, কখন শাগু সুজী খায়, কখনও নিরম্বু উপবাসে থাকে—কেবল জীবনের জন্য, শরীরের অবস্থানুসারে এবং চিকিৎসকের উপদেশ মতে। বালক-যুবক-বৃদ্ধের কর্ত্তব্য এক নহে, সুস্থ-পীড়িতের পথ্য এক নহে, সম্পন্ন-বিপন্নের ব্যবহার এক নহে—এক হইতে পারে না।

ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সমাজেরও বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য আছে, সমাজও কখন সুস্থ থাকে, কখনও পীড়িত হয়, কখন সম্পদে থাকে, কখনও বিপদে পড়ে। স্বাস্থ্যের লক্ষণ এই, সামান্য আঘাতে তাহার কিছু হয় না, বরং সে আঘাতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া চলে। সুস্থ যুবক শীতে গ্রীষ্মে অব্যাহত, ঝড়ে জলে অক্লান্ত, আঁচড়ে আঘাতে তাহার দৃক্‌পাত নাই, কত জায়গায় কাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইতেছে, আবার আপনা হইতেই তাহা শুকাইতেছে। কিন্তু বৃদ্ধ বা রুগ্নের সেটি হয় না। দূষিত শোণিত আঘাতের বেগ সহিতে পারে না, সামান্য আঁচড়েই বিশাল ঘা' উপস্থিত হয়, কখনও সেই সামান্য সূত্রে অবলম্বন করিয়া ধনুষ্টঙ্কার বা বিসর্প দেখা দেয়। সমাজের অবস্থাও তাই। ভারত-সমাজ যখন সুস্থ সবল ছিল, তখন সে কত আঘাত পাইয়াছে, কিছুতেই দমে নাই; তখন সে কত পরের বোঝা বহিয়াছে, কিন্তু আজ সে নিজের নড়িটি বহিতেও অক্ষম। ভারত একদিন বিশ্ব-হিত-চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, বিশ্ব-তত্ত্বের আলোচনায় বিভোর ছিল, বিশ্ববাসীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া মুক্তির দ্বারোদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিল! আর আজ? আজ ভারত নিজের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় বিব্রত, নিজে কেমন করিয়া বাঁচিয়া রহিবে, এই চিন্তায় অবসন্ন।

ব্যষ্টির যৌবন স্থির রাখা যায় না, তাহা একবার গেলে আর ফিরিয়াও আসে না; কিন্তু প্রতিভার বলে সমষ্টির যৌবন স্থির থাকিতে পারে, তাহা একবার গেলেও আবার ফিরিয়া আসিতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সমাজের এই প্রভেদ। ভারত-সমাজের যৌবন যাইয়া এখন বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, স্বাস্থ্য যাইয়া এখন তাহাকে রোগে ধরিয়াছে। এক সময়ে সে প্রচণ্ড তরবারির আঘাতও অনায়াসে সহিতে পারিত, কিন্তু আজ সে সামান্য আঁচড়ে চাপড়ে ম্রিয়মান।

জগতে অনেক জাতির বিগত যৌবন ফিরিয়াছে, অনেক জাতি সুচিকিৎসার গুণে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিয়াছে। ভারতও আবার যৌবন পাইতে পারে, আবার সুস্থ হইতে পারে, কিন্তু সুচিকিৎসকের হাতে পড়া চাই।

এই সুচিকিৎসকের কথা মনে হইলেই ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ে। ব্রাহ্মণ! তোমার ব্রহ্মণ্য-শক্তি কি নিদ্রিত? আজ তোমার ব্যবস্থিত এবং পরিরক্ষিত হিন্দু-সমাজ বিপন্ন, বিদ্রুত, বিধ্বস্ত; তুমি কি জীবিত থাকিয়া চক্ষের সম্মুখে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ ভাবে তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিবে? যে প্রতিভার বলে একদিন তুমি ভারতকে মানব-সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাইয়াছিলে, আজ কি তাহা

স্তিমিত? যে তপস্যার বলে একদিন তুমি প্রচণ্ড ক্ষাত্রশক্তিকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছিলে, আজ কি তাহা নির্ব্বাপিত? তুমি স্থির, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু তোমার বিধান অস্থির, অনিত্য, পরিবর্ত্তনসহ। একদিন তোমার যে সুব্যবস্থা সমাজের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, আজ তাহাই ঘোর দুঃখকর বন্ধনে পরিণত হইয়াছে, একদিন যে ব্রততী বনস্পতির শোভা সম্পাদন করিতেছিল, আজ তাহাই তাহার মৃত্যুময় কাল-পাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তোমার প্রজ্ঞা-চক্ষু কি ইহা দেখিতেছে না?

বন্ধনের প্রয়োজন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অস্বীকার করা যায় না। যখন হস্তপদাদি কোন অঙ্গ ভগ্ন হয়, তখন বন্ধনই তাহার চিকিৎসা; কিন্তু আরোগ্যের পরেও কি সেই বন্ধন সেই ভাবেই থাকিবে? কলমের জন্য গাছের ডাল বাঁধিতে হয়; কিন্তু যখন কলম লাগিয়া যায়, তখনও কি তাহাকে সেই ভাবেই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে? বন্য গজ ধরা পড়িলে তাহাকে বাঁধিয়াই বশে আনিতে হয়; কিন্তু সে যখন পোষ মানে, মাহুতের কথা শুনে, প্রভুর কার্য্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হয়, তখনও কি তাহার পায়ের বেড়ী থাকিয়াই যাইবে? যখন বন্ধনের প্রয়োজন হয়, তখন সে বন্ধন দৃঢ় হওয়াই উচিত; খেদায় ধরা বন্যগজের বন্ধন শিথিল হইলে জনস্থানের কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, ভাঙ্গা হাতের খাটিয়া শিথিল করিয়া বাঁধিলে রোগীর জীবন কিরূপ বিপন্ন হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু প্রয়োজন যখন তিরোহিত হয়, তখন বন্ধন কেবল শিথিল করা নহে, একেবারে খুলিয়া দেওয়াই উচিত। বাসুকির রজ্জুতে মন্দরের বন্ধন প্রথমে অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, প্রভৃতি কত উপাদেয় উৎকৃষ্ট বস্তু প্রসব করিল; কিন্তু অতি লুব্ধ দেবদৈত্য যখন তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সেই বন্ধন আরও কসিতে লাগিলেন, তখন অতি লোভের দশা যাহা হয় তাহাই ঘটিল,—যাহার শক্তিতে ত্রিলোক-দুর্লভ অমৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, সে-ই আবার বিশ্ব-বিনাশী কালকূট উদ্গীরণ করিল! অধিক চিপিলে লেবু তিক্ত হয়, 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং' এ সব ডাকের কথা।

সমাজের বন্ধন অনিবার্য্য—বন্ধনই সমাজের স্থিতি এবং শক্তি। মনুষ্যের সমাজ কতকগুলি বন্ধনেরই সমষ্টি। পশুপক্ষীর মধ্যে প্রাকৃতিক বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন নাই। সুতরাং তাহাদের সমাজ এবং সামাজিক শক্তিও নাই। যে সমাজের বন্ধন যত দৃঢ়, সে সমাজও তত দৃঢ়; যে সমাজের বন্ধন যত শিথিল, সে সমাজ তত বিশৃঙ্খল, তত অব্যবস্থ, তত বিপন্ন।

কিন্তু বন্ধন রক্ষার জন্য, কি পীড়নের জন্য? শাস্ত্র শাসনের জন্য, কি সংহারের জন্য? ব্যবস্থা মঙ্গলের জন্য, কি অমঙ্গলের জন্য? যোগাবিষ্ট চিত্তার সহিত নিঃস্বার্থ ও সরল ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; আর আমরা অচিরেই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইব কি চির দিনের জন্য বাঁচিয়া রহিব, এই সমাধানের উপরেই তাহা নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্ন হিন্দু-সমাজের জীবন-মরণের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই প্রশ্ন হিন্দু-সমাজের আপাদমস্তক বিলোড়ন করিতেছে। যাহারা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে আছে, তাহাদের গায়ে স্বাধীনতার বাতাস লাগিতেছে, তাহারা মাথা তুলিতে চাহিতেছে। তাহারা বলিতেছে,"আমরা

আর "গ্যালি শ্লেভের" মত নৌকার বাতায় বাঁধা থাকিয়া সারা জীবন দাঁড় টানিতে পারি না। আমাদিগকে অধিকার দাও, হাত পা নাড়িবার স্বাধীনতা দাও, আমরা বার্কেনহেডের অমর-কীর্ত্তি বীর-বৃন্দের ন্যায় স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে হয় দিব। তখন আমরা সমাজকে আপনার জিনিষ বলিয়া জানিব, কাযেই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব না।"

এই আলোড়নের ফল দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া দেখা দিতেছে। যাহারা শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান, যাহারা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে, তাহারা আপনাদের অভিযোগ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি লইয়া একে একে সত্বর পদে হিন্দুসমাজের নিকটে—ব্রাহ্মণের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে। তাহারা জানিতেছে, যাহারা কোন ধর্ম্ম মানেনা, কোন সমাজের ধার ধারে না, তাহাদেরও এরাজ্যে স্থান আছে; তবে তাহারা তোমাদের নিকট উপস্থিত কেন? কেবল ধর্ম্মভীরুতা, আত্ম-মর্য্যাদা এবং সমাজের আকর্ষণই তাহার কারণ। আর যাহারা আশা, উদ্যম এবং শক্তিশূন্য, যাহারা আত্ম-মর্য্যাদা এবং জাতি-মর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছে, তাহারা হিন্দু সমাজের নিকট প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কিছুরই প্রত্যাশা নাই ভাবিয়া দলে দলে নীরবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ! তুমি হিন্দু-সমাজের শীর্ষ, চারিযুগ ভরিয়া তুমিই হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাদাতা। কোন সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইলে হিন্দু তোমারই দ্বারে ব্যবস্থার জন্য উপস্থিত হয়, এই দুর্দ্দিনেও সামাজিক প্রতিকারের জন্য রাজদ্বারে যায় না। এই যে তোমার সমাজের অধিকার্দ্ধ তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর অল্পার্দ্ধমাত্র উচ্চাধিকারের প্রার্থনায় তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাদের কি ব্যবস্থা করিবে, কর। ইহাদের কাহাকেও তুমি ছাড়িয়া দিতে পার না, কাহাকেও তুমি বিমুখ করিতে পার না। যদি ছাড়িয়া দেও, অচিরেই তুমি সমাজ-শূন্য সমাজ-পতি হইবে; যদি বিমুখ কর, আর কেহ তোমার দ্বারস্থ হইবে না, তুমি শীঘ্রই উচ্চাসন ভ্রষ্ট হইবে। এতদিন তুমি সকলকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু আজ তোমারই ঘোর অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, মঙ্গল; উত্তীর্ণ না হইতে পার, মরণের জন্য—বিলোপের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অনেক প্রণম্য পণ্ডিত এখনও অতীতের আদর্শে বিভোর, প্রাচীনের প্রেমে প্রমত্ত! তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা, প্রাচীন পথেই চলিব, প্রাচীন প্রথাই রক্ষা করিব, ইহাতে যত যায় যত থাকে। কিন্তু যাইতে বসিলে যে সবই যায়, লোম ঝরিলে যে কম্বল থাকে না, ইহা তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। তাঁহারা না বুঝুন, কিন্তু যেখানে ভিন্নধর্ম্ম বলম্বী গুণ্ডারা দিবালোকে পূজ্যমানা দুর্গা-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিল, আর পূজকগণ সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিল না, সংখ্যা-মাহাত্ম্য বুঝিবে সেই জামালপুরের লোকে, আর বুঝিবে সেই সুদূর উত্তর-পশ্চিম-

সীমান্ত জেলার লোকে, যেখানে মুসলমানেরা হিন্দুর বালককে জোর করিয়া মুসলমান করিতেছে, সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে জোর করিয়া বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিষ্ক্রয়ের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। সত্য বটে, দুর্ব্বলের বল রাজা থাকিতে এ সকল বিষয়ে প্রজার ভয়-ভাবনা নিরর্থক; কিন্তু জামালপুর এবং সীমান্ত প্রদেশ যে এই রাজ্যের বাহিরে নহে, এ কথাটাও মনে রাখা নিতান্ত অনুচিত না হইতে পারে। কাফিরিস্থানের কাফিরিজাতি হিন্দুই ছিল; তাহারা চিরদিন বিপুল বিক্রমে মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে আফ্গানিস্থানের আমীর আব্দুর রহমান্ তাহাদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং অসংখ্য বন্দুক-কামান-ধারী মুসলমান-সৈন্য পাঠাইয়া সেই মুষ্টিমেয় ধনুর্ব্বাণধারী কাফিরি-বীরের ধ্বংশ সাধন করিলেন। কাফিরি-বীরগণ জাতি, ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিল, এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ জয়লব্ধ ধন-রত্ন-ধনুর্ব্বাণ-পূর্ণ শকট-মালার সঙ্গে সঙ্গে আফ্গান-জাতির দাসত্বের জন্য প্রেরিত হইল! কাফিরি-জাতির জন-বল থাকিলে কি এমনটা হইতে পারিত? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যাঁহারা বলিবেন জাতীয় স্থিতিতে লোক-বলের প্রয়োজন নাই, স্বয়ং বৃহস্পতি আসিলেও তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিবেন না। ট্যাস্‌মানিয়ার অধিবাসীদিগকে "শিকার" করিয়া ইংরাজেরা নির্ম্মূল করিতে পারিতেন না, যদি তাহাদের জন-বল অধিক থাকিত। যে সকল জাতি আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষেও পদার্পণ করিয়াছেন; তবে যে ভারতবাসী আজিও নির্ম্মূল হয় নাই, সে কেবল তাহাদের ভাগ্য-বলের জন্য নহে, কতকটা লোক-বলের জন্যও বটে। এত বিক্রান্ত বোয়ারজাতি ইংরাজের হাতে পরাজিত কেন? স্বাধীনতার এমন উগ্রতপস্তার পবিত্র ক্ষেত্র পোলাণ্ড আজ জর্ম্মণী এবং রুষিয়ার কুক্ষিগত কেন? আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, ধনসম্পদ বরং তোমার প্রাণের কাল হইয়া দাঁড়াইবে, যদি তুমি লোক-বল হইতে বঞ্চিত হও।

আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা লোক-বলের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, নতুবা বহুবিবাহের অর্থ কি, অনুলোম বিবাহের অর্থ কি, পুন্নাম নরকের অর্থ কি, পিণ্ডরক্ষার জন্য দ্বাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থার অর্থ কি? কৌলিক শাস্ত্র এবং পৈতৃক ব্যবহার কেবল শব্দার্থে বুঝা যায় না, চিন্তা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার ভাবার্থ, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার চরম লক্ষ্য বুঝিতে পারিলে তবে ত বুঝা হয়।

অতি খরতর স্বদেশীর সময়ে ক্যাপিটাল নামক সংবাদপত্রে ম্যাক্‌স্ স্বাক্ষরিত একজন লেখক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, পত্রান্তরে ঐ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত দেখিয়া পড়িয়াছিলাম। লেখক স্থানে অস্থানে যে সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট ছায়া ব্যতীত একটি বর্ণও মনে নাই; কিন্তু তাঁহার একটি বাক্যের অর্থ হৃদয়ে এমন ভাবে বসিয়া গিয়াছে যে, এ জন্মে তাহার স্মৃতি অপসৃত হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন, "পঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখ্ এক জাতি বলিয়া স্বীকার করাতে আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছি।"

ম্যাক্স্ মহাশয়ের উন্মত্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ আজকাল নানা কারণে অনেকেই উন্মাদগ্রস্ত হইতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক জাতীয় দুইটি সম্প্রদায় আপনাদিগকে এক জাতি বলিতে চাহিয়াছিল মাত্র ; ইহাতে স্বদেশ, স্বাধীনতা, বন্দেমাতরম্ কিম্বা বোমা-বারুদের নাম গন্ধ নাই ; এমন সরল সাদা সত্য কথায় ম্যাক্স্ মহাশয় ক্ষিপ্ত হইলেন কেন ? যাঁহারা ভারতে ইংরেজ-প্রভুত্বের মর্ম্মস্থল লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কেন। সাত কোটি মুসলমান সম্মানিত, আর বিশ কোটি হিন্দু অবজ্ঞাত কেন ? যাহা হউক, ম্যাক্সের জন্য আর মধ্যমনারায়ণের প্রয়োজন হইবে না, শিখ্-সভা না কি লিখিয়া পড়িয়া জানাইয়াছেন তাঁহারা হিন্দু নহেন। ভরসা করি অতঃপর জৈন, রামানন্দী, বল্লভী, গৌরাঙ্গী, দয়ানন্দী, প্রভৃতি সকলকেই খত দিয়া হিন্দুত্বের দায় হইতে খালাস-পত্র লইতে হইবে। ওয়াহাবী হাঙ্গামার সময় না কি অনেক বিদ্রোহী মুখ কামাইত, কাছা দিত, আর পুলিস দেখিলে বলিতে "মুই হেঁদু"। এখন উপস্থিত হিন্দুর পালা। এখন "আমি হিন্দু নই" বলাই অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক। বলি, রক্তটা বদলাইবার কোন একটা বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির হয় না ? কিন্তু ব্রাহ্মণ ! তোমার উপায় কি—তুমি পালাইবে কোথায় ? সকলেই হিন্দুত্বকে নাওয়ারিস্ মনে করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু তুমি সেটি পার কই ? তুমি যে মার্কামারা হিন্দু ! তবে এক উপায় আছে, বর্ত্তমান আবিষ্কারের যুগে কেহই নিরুপায় নহে, তোমারও নিস্তারের এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তোমার বেদ ত "কৃষকের গান" হইয়াই রহিয়াছে, তোমার ইতিহাস নাই বলাতে প্রমাণের পথও বন্ধ হইয়াছে, তোমার রামায়ণ-মহাভারত, এমন কি, ভগবদ্-গীতা পর্য্যন্ত রূপকে পরিণত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। এখন যদি কলমের বাহাদুরী দেখাইতে পার, হিন্দুত্ব এবং ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া বাস্তবিক কোন দিন কিছু ছিল না, ও দুইটা সাহিত্যালঙ্কারের রূপক মাত্র, এইটি প্রমাণ করিয়া যদি একটা প্রবন্ধ লিখিতে পার, তবে বাঁচিয়া ত যাইবেই, কোন কোন বিদ্বন্মণ্ডলে বাহবাও পাইবে, সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে।

মূলকথা—ব্রাহ্মণ ! এখন তোমাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। তোমার এই বিশাল হিন্দু-সমাজ ছত্রভঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, হিন্দুত্ব লোপ পায়, এ সময়ে ধীরতা এবং বীরতার সহিত অগ্রসর হইয়া উহাকে রক্ষা করিতে হইবে। তোমার ভাষায় কেবল 'ধর্ম্মভীরু' শব্দটা নহে, 'ধর্ম্মবীর' শব্দটাও আছে, এখন তাহার সার্থকতা প্রদর্শনের সময়। সিংহ প্রায়ই সুপ্ত থাকে, সে সমস্ত দিন গর্জ্জিয়া বেড়ায় না। কিন্তু যখন সে জাগে, যখন সে গর্জ্জন করে, তখন সমস্ত কানন-ভূমি সে গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হয়, সমস্ত পশুপক্ষী নীরবে অবহিতচিত্তে সে গর্জ্জন শ্রবণ করে। ইংরাজের সংস্পর্শে আইসার পর ইংরাজ-পণ্ডিত এবং ইংরাজ-ভ্রমণকারী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ক্ষুদী মুদী পর্য্যন্ত কে তোমার ধর্ম্ম এবং সমাজকে নাড়া চাড়া না দিয়াছে, কে হক্-না-হক্ দুই কথা না বলিয়া ছাড়িয়াছে ? খৃষ্টধর্ম্ম এবং ইস্‌লামধর্ম্ম লইয়া কোন কথা নাই, কিন্তু তোমার হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজ লইয়া

পৃথিবী-ব্যাপিনী সমালোচনা এবং গবেষণা। বুঝিলে ইহাতেই বুঝিতে পার জগতে তোমার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব কত। সকলেই নাড়া দিয়াছে, কেহ কেহ আঘাতও করিয়াছে. কিন্তু তুমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ কর নাই, স্থির হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে সমস্ত সহিয়া ভগবন্নির্ভর এবং আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, রহিয়াছ। তপস্যার সময়ে এই নির্ভর এবং চিন্তাকে নিষ্ক্রিয়ই রাখিতে হয়, কিন্তু কর্ম্মের সময়েও ইহাদিগকে নিষ্ক্রিয় রাখিলে যে দুর্দ্দশা হয় আজ তোমার সমাজের সেই দুর্দ্দশাই উপস্থিত। যদি এই হট্টগোলের মধ্যে এতদিন তুমি কিছু বলিয়া বা করিয়া থাক, তাহা চেষ্টার মধ্যে গণ্য নহে, তাহা যেন মশা-মাছি তাড়াইবার জন্য নিদ্রিতের হস্ত-পদ-সঞ্চালন। এখন কর্ম্মের সময়, সুতরাং ঔদাস্যপূর্ণ ধ্যান-স্তিমিত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া জগতের দিকে চাহিতে হইবে, প্রবল ঝড়ে নিমজ্জমান তরণীর কর্ণ সবলে ধরিয়া তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। সমাজের এই অবস্থা যখনই উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তুমি এই বীরত্ব দেখাইয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছ, আজ আবার তোমার বীরত্বের সময় উপস্থিত।

ব্রাহ্মণ! তোমাকে সমাজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে, রোগ বুঝিয়া ঔষধ দিতে হইবে—তোমাকে কলির মহর্ষি হইতে হইবে, আর্ষশক্তি প্রয়োগে বিপন্ন সমাজ নিরাপদ করিতে হইবে। বাঁধা ব্যবস্থায় সকল কাজ চিরদিন চলে না, বাঁধা প্রেসক্রিপ্সনে সকল রোগের চিকিৎসা হয় না। তিনিই সুচিকিৎসক, যিনি কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থা এবং ঔষধের উপরে নির্ভর না করিয়া রোগী এবং রোগের অবস্থা লক্ষ্য করেন, এবং তদনুসারে নিজের স্বাধীন বিচার-শক্তির যথোচিত নিয়োগ করিতে পারেন। কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বেরি-বেরি প্রভৃতি নূতন নূতন সাংঘাতিক রোগে এখন মানব-জাতি নির্ম্মূল হইতেছে, কবিরাজী বা ডাক্তারিতে আর পার হইতেছে না, ইহাদের নিদান-আবিষ্কার এবং ব্যবস্থা-উদ্ভাবন চাই।

পৃথিবীতে অনেক জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, আবার বিলয় হইয়া গিয়াছে, কেবল প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহারা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই বলিয়া। মানবের এই শক্তি আছে, তাই আজও সে বাঁচিয়া রহিয়াছে। মানব-জাতির মধ্যেও যাহারা ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনে পটু, কেবল তাহারাই উন্নত হইতেছে, আর যাহারা সে কার্য্যে অশক্ত, তাহারা ক্রমশ ধ্বংসের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। জগতের সকল সভ্য জাতিই এই সত্য বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াই সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। সাবধান সময়ে না হইয়া অসময়ে হইলে কোন লাভ নাই, রোগের তাড়নায় জীবনী শক্তি হারাইয়া পরে ঔষধ ব্যবহার করিলে জীবন রক্ষা পায় না। যদি বাঁচিতে চাও, যে মুহূর্ত্তে রোগ বুঝিতে পারিলে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সাবধান হও। প্রতিকারের চেষ্টা কর। তীব্র তিক্ত বিস্বাদ ঔষধ সখ করিয়া, সাধ করিয়া কেহ খায় কি? কিন্তু অবস্থা যখন রোগ, তখন তাহার ব্যবস্থাও তীব্র তিক্ত ঔষধ। আগে রোগ-মুক্ত হও, তাহার পরে মাংস, পোলাও, সন্দেশ, মেঠাই, রুচিমত খাইও, রোগাবস্থায় তাহা খাইলে মরিবে।

অভিনব ব্যবস্থা দিতে হইলেই বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিতে হইবে। যে অবস্থায় হিন্দু-মহর্ষিগণ ব্যবস্থা-শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন হইল অতীত হইয়াছে—অবস্থা নাই, ব্যবস্থা আছে ; আবার যে সকল নূতন অবস্থা আসিয়া দেখা দিয়াছে, তাহারা ব্যবস্থার জন্য তোমার অপেক্ষা করিতেছে, অব্যবস্থিত থাকিয়া সমাজ এবং জীবনে নানা অশান্তি, নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছে। তোমার শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী যেমনই অপরাধ করুক না কেন তাহাদের বধ-দণ্ড হইবে না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন একটি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষকে খুন করিলেও মস্ত কুলীন, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, সমাজ-পতি ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইয়া যাইবে। কেন এমন হয়? এখন যে সেই অবস্থা নাই—যাহারা স্ত্রীকে সাক্ষাৎ জগদম্বার অংশ বলিয়া জানিত, যাহারা ব্রাহ্মণকে সাক্ষাৎ ভূদেব বলিয়া মানিত, এখন যে রাজদণ্ড তাহাদের হাতে নাই, এখন যে ব্রাহ্মণের হাতে ব্যবস্থা নাই, এখন যে শাস্ত্রের গায়ে আইনের জোর নাই। তোমার শাস্ত্র বলে, শূদ্র যদি বেদ উচ্চারণ করে, তবে তাহার মুখে প্রতপ্ত দ্রব লৌহ ঢালিয়া দিতে হইবে ; কিন্তু এখন গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে বা বেদের ব্যাখ্যা করিতে কে অধিকারী নহে ? তুমি তাহাদের কি করিতে পার ?

তবেই দেখা যাইতেছে, বাধ্য হইলে তুমি শাস্ত্রের ব্যবস্থাও ছাড়িতে পার। তোমার আচারে যে বস্তু নাই, কেবল "গজভুক্ত কপিত্থবৎ" আবরণটি মাত্র আছে, তাহাও তুমি জান, তবু আবরণটি ভাঙ্গিতে মমতা হয়। তুমি শূদ্রের জল খাও না, কিন্তু তোমার পৈতাধারী পরিচারক ব্রাহ্মণটি যে কোন কুলে জাত এবং কিরূপ সদাচার-সম্পন্ন, তুমি নানা ভয়ে তাহা জানিতে চাও না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, পাছে ব্রাহ্মণের অভাবে ঠাকুর-সেবা অচল হয়। তুমি ব্যভিচারিণীর হাতে জল খাও না, কিন্তু যে ভক্তিমতী শিষ্যানীটি কপালে উজ্জ্বল ফোটা কাটিয়া গলায় মোটা মালা পরিয়া তোমার পরিচর্য্যায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগবৎকৃপার কতদূর অধিকারিণী, ধ্যানস্থ হইয়া তাহা বুঝিতে তোমার সাহসে কুলায় না, পাছে "বিদায়" বন্ধ হয়। তোমার "পিণ্ডদাতা" পুত্র সহরের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যাইয়া কত রকমে তোমার পিণ্ড চটকাইতেছেন, তুমি তাহার খবর লও না, পাছে অমৃত-ভাণ্ডে বিষ বাহির হইয়া পড়ে! অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন ব্যবস্থায় লোকের ভক্তি, বিশ্বাস এবং সম্মান শিথিল হইয়াছে, অথচ একটা কিছু রীতি-পদ্ধতি-ব্যবস্থা ধরিয়া না চলিলে সভ্য সমাজ সহ্য করিতে পারে না, তাই এ কপটাচারের অশান্তি ভোগ। কালের অনুকূল, প্রকৃতির অনুকূল, পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুকূল ব্যবস্থা যদি বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে এই কপটতার নিরর্থক বোঝা দিনরাত্রি বুকের মাঝে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইত না,—পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যখানে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণার এই পরদাখানি থাকিত না। ইহাতে যে অপকার হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে পাগল হইতে হয়।

যখন ভারতে ব্যবস্থা-শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তখন রেল, ষ্টীমার, বিজাতীয় শিক্ষা এবং ভিন্নধর্ম্মীর সঙ্গে একত্র বাস, ইহার কোনটাই

ছিল না, সুতরাং এ সকলের উপযোগী ব্যবস্থা হইতে পারে নাই। এই সকল অভিনব অবস্থা যখন স্থায়ী, তখন আর অপেক্ষায় কাল-হরণ না করিয়া তাহাদের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত; কেন না, ইহাতে যত বিলম্ব হইবে, ততই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উভয় প্রকার ক্ষতি, হিন্দু-সমাজ ক্ষতি অনেক সহিয়াছে, আর সহ্য করিবার শক্তি তাহার নাই। এই যে একটা সময় আসিয়াছে, ইহা হিন্দুর জীবন-মরণের সন্ধিস্থল। এখন মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিবার অবকাশ হিন্দু-সমাজের নাই; এখন হয় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া মরিতে হইবে, না হয় পুরুষকার অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ! আর যে যাহাই বলুক, তোমার মহানিন্দুক এবং ঘোর শত্রুও তোমাকে কোন দিন নির্ব্বোধ বলিতে সাহস করে নাই, চিরদিন বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাশীলতার জন্য তুমি প্রসিদ্ধ। এখন সেই বুদ্ধি এবং চিন্তার প্রয়োগ করিয়া স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মকে বাঁচাও। জগতের অবস্থা কি, বিশ্বমানবের গতি কোন্ দিকে, কালের রথচক্র কেমন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, এবং নিজের গন্তব্য—কর্ত্তব্য স্থির কর। তুমি কোন কালে অন্যের কোন খবর রাখ নাই, ভারতকেই পৃথিবী মনে করিয়া—হিন্দুকেই বিশ্ব-মানব মনে করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছ, সমস্ত কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছ, তাহাতে বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। কিন্তু এখন তোমার দিগ্‌বলয়ের পরিধি অনেক বিস্তীর্ণ হইয়াছে, এখন সমস্ত পৃথিবী স্পষ্টালোকে তোমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সাবহিতচিত্তে চারিদিক চাহিয়া দেখ, জগতের অবস্থা চিন্তা করিয়া বুঝ, নিজের অবস্থার সঙ্গে সকলের তুলনা কর, এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহার উপরে ন্যায়, সত্য, উদারতা ও বিশ্ব-প্রেমের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা গঠন কর, যেন তাহা দেখিয়া বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অবাক্ হয়, যেন তাহা আর দেশ ও কালের গণ্ডীতে নিবদ্ধ না হয়, যেন আর অবস্থার পরিবর্ত্তন তাহাকে ব্যর্থ এবং নিষ্ক্রিয় না করিতে পারে, চূর্ণ-বিচূর্ণ না করিতে পারে

যে প্রশ্ন করে, যে সমস্যা উপস্থিত করে, সে ক্ষুদ্রতম হইতে পারে; কিন্তু যে প্রশ্নের সমাধান করে, যে সমস্যা-পূরণ করে, সে চিরদিনই খুব বড়। আমি তোমাকে খুব বড় বলিয়াই বিশ্বাস করি, সেই জন্যই এই জটিল সমস্যার মীমাংসার জন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হিন্দুর শাস্ত্র, আচার, সাধন-পদ্ধতি, বিশেষতঃ হিন্দুর জাতিভেদ চিরদিন হিন্দু-সমাজকে অভেদ্য দুর্গের ন্যায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অথচ সেই দুর্গই নাকি এখন তাহার চিররক্ষিত সমাজকে ছাড়িয়া দিতেছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে! তোমাকে বিচার-বুদ্ধি এবং সাধনশক্তি লইয়া এই সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, ইহার কোথায় কি ফাঁক আছে, কোথায় কোন্ ছিদ্র হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দুর্গটির সংস্কার করিতে হইবে—বিশ্বকর্ম্মার নৈপুণ্য সহ তাহাকে কাল-জয়ী করিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মুসলমান বা খৃষ্টানের প্রধান গৌরবের বিষয় বাহুবল; কিন্তু হিন্দুর গৌরব করিবার জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি

শত সহস্র বিষয় আছে। হে ব্রাহ্মণ! যাহাতে উচ্চনীচ প্রত্যেক হিন্দু তোমার ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া সেই গৌরব সমভাবে অনুভব করিতে পারে, যাহাতে সকলেই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া একটা সম্মানের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারে, যাহাতে ছোট বড় কোন হিন্দুকে নিজের হিন্দুত্বের জন্য লজ্জিত, অবজ্ঞাত, অপমানিত বা ঘৃণিত হইতে না হয়, তোমাকে সেইরূপ বিধান, সেইরূপ ব্যবস্থা, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি পার, তোমার ব্রাহ্মণত্ব সার্থক; যদি না পার, তোমার বুদ্ধিকে ধিক্, তোমার বিদ্যাকে ধিক্ তোমার নেতৃত্বকে ধিক্। এবার তোমার শেষ পরীক্ষা উপস্থিত। এবার তোমার উচ্চাসন হইতে পড়িয়া ধূলি-ধূসরিত হইবার লক্ষণ চারিদিকে ব্যক্ত হইতেছে। তোমার পুরুষকার প্রদর্শনের সময় আর কবে আসিবে? তোমার পূর্ব্বপুরুষ নিজের অস্থি দান করিয়া স্বজাতির মঙ্গল—জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন; তুমি কিরূপে সেই পিতৃঋণ পরিশোধ কর, কি দিয়া হিন্দুজাতি এবং বিশ্বমানবের মঙ্গল সাধন কর; তাহাই দেখিবার জন্য সভ্যজগতের অনন্ত চক্ষু তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জড়তা ঝাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ কর, উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ করিয়া অগ্রসর হও; ভয় নাই, জগদম্বা মহাশক্তিরূপে অভয় এবং সিদ্ধি লইয়া তোমার পশ্চাতে রহিয়াছেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি।

-:•:-

অবতরণিকা

Spiritual contemplation. Here is the key-note of Hindu art.—Havell.

এখনও ভারতবর্ষের বিবিধ পর্ব্বতকন্দরে, দেবমন্দিরে, বনান্তরালে, বৃক্ষমূলে বা ধরণীতলে যে সকল শিলানির্ম্মিত বা ধাতুনির্ম্মিত দেবদেবীর বিচিত্র শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে মূক জড়পিণ্ডমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অতিশায়িতরূপে মুখর। তাহাদের আয়তন, গঠনসামগ্রী, রচনা-কৌশল, অবয়ববিন্যাস ও অঙ্গলাবণ্য পুরাকালের কত কাহিনী ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে, কেবল যথাযোগ্য আলোচনার অভাবেই, তাহা আমাদিগের নিকট অপরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক আলোচনা যে শাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহা "শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি" * নামে ইউরোপীয় সুধীসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সমধিক শ্রম-

* Iconography নামে ইউরোপীয় সুধীসমাজে সুপরিচিত শাস্ত্র আমাদের ভাষায় "শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি" নামে কথিত হইলে, সম্যক্ অর্থ প্রকাশ করিতে পারিবে বলিয়া, সেই নাম গৃহীত হইয়াছে।

সাধ্য সাহিত্যচর্চ্চা বলিয়া, এখনও বঙ্গসাহিত্যে আশানুরূপ সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অল্পদিন হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত যথাযোগ্য উদ্যম এখনও ভাল করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

তাহার কারণ-পরম্পরার অভাব নাই। আমাদের দেশের অগণ্য উপাসক-সম্প্রদায়ের যে সকল পুরাতন উপাস্যমূর্ত্তি নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত পুরাতত্ত্বের কিরূপ সংস্রব ছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানের পথ এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। স্থানভেদে, কালভেদে, সম্প্রদায়গত-প্রয়োজনভেদে এবং শিল্পাচার্য্যগণের ব্যক্তিগত-প্রতিভাভেদে, এই সকল পুরাতন শ্রীমূর্ত্তিফলকে এত অধিক রচনাপার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, তত্তাবতের সামঞ্জস্য সাধিত করিয়া প্রবন্ধ রচনা করা নিরতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া, তাহার প্রয়াস পর্য্যন্তও সাহিত্যিকগণের নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছে না!

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এই সকল পুরাতন শ্রীমূর্ত্তির কতকগুলি আলোকচিত্র সংগৃহীত করিয়া, তদবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করায়, উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে এতদ্বিষয়ক বিবিধ তথ্যানুসন্ধানের কিছু কিছু আয়োজন করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল শ্রীমূর্ত্তি-চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তদবলম্বনে কোনরূপ তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূলতথ্যের আলোচনা আবশ্যক। *

অনধিকারচর্চ্চা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এই দুইটি পরিহার্য্য দোষের যথাসাধ্য নিবারণোপায় উদ্ভাবিত করিবার আশায়, সে কালের মনীষিগণ সকল বিষয়েরই বিবিধ বিধিনিষেধাত্মক সূত্ররচনার প্রয়াস স্বীকার করিতেন। তদনুসারে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, শ্রীমূর্ত্তি-রচনারও বিবিধ শিল্পসূত্র প্রচলিত হইয়াছিল। কালক্রমে শিল্পের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে সে সকল শিল্পসূত্রও, প্রয়োজনাভাবে হতাদৃত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে! প্রসঙ্গক্রমে পুরাণতন্ত্রাদিতে তাহার যাহা কিছু সারসংগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে—পারিভাষিক শব্দের অর্থবোধের অসামর্থ্যে—লোকসমাজের পূর্ব্বসংস্কারের নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটনে,—তাহাও লোকসমাজে—অপরিজ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছে!

---

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তথা বগুড়া সেরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু, মালদহনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ, এবং রাজসাহীনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয়, ও প্রবন্ধলেখক শ্রীমূর্ত্তি-তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া বরেন্দ্রভূমির নানা স্থান হইতে যে সকল মূর্ত্তিচিত্র ও মূর্ত্তিবিবরণ সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রধানতঃ তদবলম্বনেই প্রবন্ধ সংকলিত হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের শ্রীমূর্ত্তির বিবরণও ইহাতে স্থান লাভ করিবে। যদি অন্য কেহ অনুগ্রহ করিয়া প্রবন্ধলেখকের নিকট কোনও শ্রীমূর্ত্তি-চিত্র প্রেরণ করেন, তাহাও সাদরে স্বীকৃত ও আলোচিত হইবে।

শ্রীমূর্ত্তি-রচনা-প্রথা কত পুরাতন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ আলোচনার স্থান হইতে পারে না। তবে যাঁহারা বিশ্বাস করেন "ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কলানৈপুণ্য গ্রীকদিগের অনুকরণেই আয়ত্ত হইয়া থাকিবে," তাঁহারা তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই জানিতে পারিবেন,—গ্রীকগণ ভারতসীমায় পদার্পণ করিবার সৌভাগ্যলাভের পূর্ব্বকালেও শ্রীমূর্ত্তিরচনা-প্রথা ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত ছিল না। সম্প্রতি কলিকাতা কলাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত হাভেল সাহেব মহোদয় একখানি সুলিখিত গ্রন্থে * ভারতীয় ভাস্কর্য্য-বিদ্যার মৌলিকত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়া এতদ্বিষয়ক বহু ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন।

গ্রীকগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভের পূর্ব্বকাল হইতে, যাঁহারা সমুন্নত সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া প্রতিভাবলে সুকুমার সাহিত্যে ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়া জগদ্বিখ্যাত কৃতিত্ব-গৌরবের-অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কেবল চিত্রে ও ভাস্কর্য্যেই কিছুমাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শনের সামর্থ্য লাভ করেন নাই, এরূপ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন ও অশ্রদ্ধেয়। † পুরাকালের এসিয়ানিবাসিগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে ইউরোপের পণ্যবীথিকায় উপনীত হইতেন; ইউরোপীয়গণের পক্ষে তৎকালে এসিয়ার পণ্যবীথিকায় পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তজ্জন্য গ্রীকগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের সহিত সুপরিচিত থাকিয়াও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত ছিলেন না। পারসিক-সেনা গ্রীকদেশে আপতিত হইবার পর, অকস্মাৎ গ্রীকবীরগণের চেতনাসঞ্চারের সূত্রপাত ঘটে। তাহার পর মহাবীর সেকন্দর শাহের পতাকাবাহী গ্রীক-সেনাদল ভারতসীমায় উপনীত হইবার সময় হইতেই, প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীকদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত হইবার অবসর উপস্থিত হয়। তাহার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের দেবমন্দির শ্রীমূর্ত্তি-কিরণে উদ্ভাসিত ছিল। কিন্তু তাহার প্রমাণসংগ্রহে পরিশ্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় শ্রীমূর্ত্তি-তত্ত্বের অন্তরালে যে একটি বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপক ভারতীয় ভাবসামগ্রী ও অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতীয় শ্রীমূর্ত্তিবিজ্ঞানের মৌলিকত্ব সংস্থাপনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য;—তাহা কাহারও অনুকরণ-লব্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না;—তাহা ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বিজ্ঞাপক অন্তর্দৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় পুণ্যফল!

সেই অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে, ভারতীয় ভক্তসমাজ

---

* Indian Sculpture and Painting.

† It is *prima facie* incredible that a highly developed civilisation, spreading over thousands of years, and over a vast area like India, which has produced a splendid literature and expressed lofty ideals in building materials, should have lacked the capacity or found no occasion for giving them expression in materials for painting and sculpture.—Indian Sculpture and Painting, p. 5.

শ্রীমূর্ত্তি-রচনায় ব্যাপৃত হইবার প্রথম উপক্রম হইতে, প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর বিশুদ্ধ দ্রব্যেই শ্রীমূর্ত্তি-রচনার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কোন শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি কিরূপ দ্রব্যে নির্ম্মিত হইবে, তাহারও প্রয়োজনানুরূপ নির্ব্বাচন-নিয়ম প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ইহা ভারতবর্ষের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন সুসভ্য দেশের পক্ষে সর্ব্বথা স্বাভাবিক হইলেও অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন,—"ভারত-ভাস্কর্য্য প্রথমে কারুকর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়া, উত্তরকালে শিলাকর্ম্ম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের বিশ্বাস,—শ্রীমূর্ত্তিরচনা প্রথা পুরাকালে ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, শিলামূর্ত্তি গ্রীকদিগেরই অনুকরণ-লব্ধ!

এই সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত শিক্ষায়, পর্য্যবেক্ষণশক্তিতে, বিচার-বিজ্ঞতায় জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ইঁহারা কেহই শ্রীমূর্ত্তির উপাসক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। সুতরাং ইঁহাদিগের পক্ষে অনেক বিষয়ের রহস্যভেদ করা অসম্ভব। শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভাবনার মূল কোথায়, অনেকেই তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা

সাধকগণের হিতের জন্য ব্রহ্মের বিবিধরূপ, ইহাই একমাত্র প্রয়োজন। সাধকগণ সেই প্রয়োজন উপলব্ধি করিবামাত্র, প্রয়োজনানুরোধে দুই শ্রেণীর মূর্ত্তিরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা "চলাচল" নামে সাধকসমাজে সুপরিচিত। যাহা নিয়ত একস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যথোপচারে অর্চ্চিত হইবে, তাহা "অচল"; এবং যাহা নানা স্থানে নীত হইয়া অর্চ্চিত হইতে পারিবে, তাহা "চল"—এইরূপ সাধারণ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অচলমূর্ত্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইবে, তজ্জন্য দীর্ঘস্থায়ী গঠনসামগ্রী আবশ্যক, তাহা সহজেই প্রতিভাত হইবার কথা। চলমূর্ত্তির মধ্যে যাহা অর্চ্চনান্তেই বিসর্জ্জিত হইবে, তাহার জন্য দীর্ঘস্থায়ী গঠনসামগ্রী সংগ্রহে পরিশ্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই, তাহাও সহজেই প্রতিভাত হইবার কথা। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তিনির্ম্মাণের প্রথম উপক্রম হইতেই, উভয়বিধ প্রয়োজনানুরোধে, সাধক সমাজকে নানাশ্রেণীর স্থায়ী এবং অস্থায়ী গঠনসামগ্রী নির্ব্বাচনে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। গিরিবহুল এবং বনবহুল উত্তরভারতে শিলা, দারু প্রভৃতি কোন শ্রেণীর গঠনসামগ্রীরই অভাব ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমে দারুমূর্ত্তি ও পরে শিলামূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইবে কেন, তাহার কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। "দারুকর্ম্মের সুপরিচিত শস্ত্র সাহায্যেই ভাস্করগণ শিলাকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন,"—ইহার উপর নির্ভর করিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা সর্ব্বথা সত্য হইলেও, তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ফললাভ করিতে পারে না। শিলাফলকে ও দারুফলকে প্রথমে শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, তাহার পর শস্ত্রসাহায্যে উৎকীর্ণ করিতে হয়। অঙ্কিত করিবার ও উৎকীর্ণ করিবার প্রণালী উভয় স্থলেই একরূপ। কিন্তু শিলামূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইলেই অর্চ্চিত হইবার যোগ্য হইতে পারে। দারুমূর্ত্তি সেরূপ নহে। তাহাকে অর্চ্চনার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহার উপর বিবিধ লেপ ও বর্ণবিন্যাস করিতে হয়। তাহা ভাস্কর্য্য ও চিত্র উভয় প্রকার কলাবিদ্যার

উপর নির্ভর করে। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি-রচনার প্রথম প্রয়াসের সময়ে, সর্ব্বাগ্রে দারুমূর্ত্তিরচনায় ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। তাহা অপেক্ষাকৃত উত্তরকালে উদ্ভাবিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, প্রথম উপক্রমে, মানব-সমাজের পক্ষে অল্পায়াসে অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

যখন নানা গঠনদ্রব্য ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন সর্ব্বাগ্রে কিরূপ গঠনদ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব তাহা জানিতে হইলে, গঠন-সামগ্রীভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই আলোচনা আবশ্যক। এ বিষয়ে চিরদিন একরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, মানবসমাজের ক্রম-বিকাশশীল গঠন-প্রতিভা ক্রমে নূতন নূতন গঠনসামগ্রীর উদ্ভাবনা করাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতসাহিত্যেও তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তিরচনার প্রথম প্রয়াসের কথা কোন্ সুদূর অতীতকালের বিস্মৃতির-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; এখন কোন্ কোন্ শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার তথ্য-নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। উত্তর-কালে গঠনদ্রব্য-ভেদে চারিশ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি প্রচলিত হইবার কথা মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত আছে। যথা,—

"চিত্রজা চৈব লেপ্যা চ শস্ত্রোৎকীর্ণা চ পাকজা।"

এই শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে কাহার পর কোন্ শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রচনা-কৌশলে তাহার কোনরূপ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে সংশয়হীন হইবার উপায় নাই। কিন্তু মানব-জ্ঞানের ক্রম-বিকাশের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, যে পর্য্যায়ে শ্রেণীচতুষ্টয় উল্লিখিত, তাহাই হয় ত উদ্ভাবনার স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক পর্য্যায়। শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে মানসপটে কল্পিত হইয়া, পরে বহির্বস্তুর সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং গুহানিবাসী সাধকের পক্ষে সম্মুখস্থ শিলাপটে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াসকেই প্রথম প্রয়াস বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহা যেমন অনায়াসসাধ্য, সেইরূপ স্বাভাবিক। তাহার উপর লেপ প্রদান করিয়া মূর্ত্তিকলেবর বিকশিত করিবার চেষ্টা অত্যল্পকাল পরেই আরব্ধ হইবার সম্ভাবনা। তাহাকে স্থায়িত্বদানের কামনা হইতে প্রথমে "শস্ত্রোৎকীর্ণা মূর্ত্তি," ও পরে রাসায়ণিক জ্ঞান পরিস্ফুট হইবামাত্র, "পাকজা মূর্ত্তি" উদ্ভাবিত হইয়া থাকিতে পারে।

যাহা পটে, প্রাচীরে বা মৃণ্ময়াদি পাত্রে চিত্রিতা, তাহার নাম "চিত্রজা"; যাহা পুনঃ পুনঃ মৃণ্ময় লেপের পর লেপ প্রদানে নির্ম্মিতা, তাহার নাম "লেপ্যা;" যাহা শিলাময়ী বা দারুময়ী, তাহা শস্ত্রসাহায্যে উৎকীর্ণা বলিয়া তাহার নাম "শস্ত্রোৎকীর্ণা"; যাহা ধাতুময়ী, তাহা পাকপ্রণালীর সাহায্যে নির্ম্মিতা বলিয়া তাহার নাম পাকজা। মৎস্যপুরাণে এইরূপ বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা।
লেপ্যা তু পার্থিবা জ্ঞেয়া লোহজা পাকজা মতা॥
শৈলজা বৃক্ষজাচৈব শস্ত্রোৎকীর্ণা চ কীর্ত্তিতা।
চতুর্দ্ধা দ্রব্যভেদেন প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা॥"

গঠনপ্রণালী-ভেদেই হউক আর গঠন-সামগ্রী-ভেদেই হউক, মৎস্যপুরাণের মতে শ্রীমূর্ত্তি উল্লিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত

এই চারি শ্রেণীর মধ্যে সকল শ্রেণীর পুরাতন শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইবার উপায় নাই। পুরাকালের চিত্রজা শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সেকালে কোনও অচলা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও, তাহা এত কাল বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহা অদ্যাপি কাল পরাজয় করিয়া ক্ষত বা অক্ষত কলেবরে বর্ত্তমান আছে, তাহা সমস্তই "পাকজা" ও "শস্ত্রোৎকীর্ণা" শ্রেণীর অন্তর্গত। "শস্ত্রোৎকীর্ণার" মধ্যে আবার অতি পুরাতন দারুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব পুরাতন শ্রীমূর্ত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, শিলামূর্ত্তি ও ধাতুমূর্ত্তিমাত্রই অবলম্বন করিতে হইবে।

মৎস্যপুরাণে যে চতুর্ব্বিধ গঠন প্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তরকালে তদতিরিক্ত, অন্য কোনও গঠনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু উত্তরকালে "রত্নজা, গন্ধজা ও কৌসুমী" নামক আরও তিন শ্রেণীর গঠনসামগ্রী-নির্ম্মিতা শ্রীমূর্ত্তি প্রচলিত হইবার কথা "হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে" উল্লিখিত আছে। যথা,—

"মৃন্ময়ী দারুঘটিকা লোহজা রত্নজা তথা।
শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমী সপ্তমী স্মৃতা॥

প্রতিমানির্ম্মাণোপযোগী এই সকল গঠনপ্রণালীর ও গঠনসামগ্রীর কথা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—সে কালের ভক্তসমাজকে প্রতিমাপূজার্থ কত ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত করিতে হইয়াছিল। প্রতিমা যে কেবল উপাসনাব্যাপারের সৌকার্য্য সাধিত করিয়াই ভারতবর্ষকে স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা নহে ;—প্রতিমানির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়াই ভারতশিল্পাচার্য্যগণ বিবিধ বিচিত্র বিদ্যা অধিগত করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন সে শিল্পগৌরব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকৃতি, ক্রমোন্নতি ও পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার আশায় আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষ হইতে অনেক শ্রীমূর্ত্তি স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন। অতঃপর ভারতীয় শ্রীমূর্ত্তি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হইলে, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া নানা পাশ্চাত্য কলাভবনেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

গঠনপ্রণালী চতুর্ব্বিধ হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রধানতঃ চিত্র এবং ভাস্কর্য্য নামক দুইটিমাত্র কলাবিদ্যার অন্তর্গত। এই দুইটি কলাবিদ্যা সমান পুরাতন বলিয়া স্বীকার করিলেও, অতি পুরাতন চিত্রবিদ্যার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাহা নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। * তথাপি তাহার বিজয়-গৌরবকাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে চিরস্মরণীয়রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে নানা পুরাতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিতেছে। ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার এবং ভাষাকে কায়াদানের জন্য লিপিপ্রণালীর উদ্ভাবনার সময়ে, চিত্রবিদ্যা একটি সার্ব্বজনীন ভাষার ও লিপিপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছিল। সে ভাষা, সে লিপিপ্রণালী, সকল দেশের সকল

---

* It will be easily understood that owing partly to the destructive influences of a tropical climate, acting on materials ordinarily much less durable than stone or metal, and partly to the greater facilities which they apper to the destructive propensities of the Vaudal and Philistrise, the existiry records of pictorial art are much fewer than those of sculpture.—Indian Sculpture and Painting, p. 152.

যুগের সকল শ্রেণীর পণ্ডিত-মূর্খের পক্ষে সমান-ভাবে বোধগম্য। তাহার সাহায্যে ধর্ম্মভাব প্রচারিত করিবার জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যাশ্রমে ও দেবমন্দিরে চিত্রাঙ্কনের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইত। রাজভবনেও চিত্র-শালা নামে পৃথক গৃহে তাহার প্রভাব বর্ত্তমান ছিল।* তাহাতে যে সকল সুলিখিত চিত্র লোক-লোচনের আনন্দবৰ্দ্ধন করিত, তাহার নীরব ভাষা অজ্ঞাতসারে নানা কাব্যকথা অভিব্যক্ত করিত, দর্শনমাত্রে দর্শকচিত্তে সকল কথা দৃঢ়-মুদ্রিত করিয়া দিত।

মূর্ত্তিরচনার বিবিধ প্রণালী বর্ত্তমান থাকিলেও, চিত্রবিদ্যাই যে সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ সংস্কৃতসাহিত্যে উল্লিখিত আছে। ভাস্কর্য্যে অবয়ববিকাশের বিবিধ কৌশল অবলম্বিত হইবার অধিক সুবিধা থাকিতেও, ভাববিকাশের সেরূপ সুবিধা থাকিতে পারে না। চিত্রে কান্তিভূষণভাব সজীবতা লাভ করিয়া যেরূপ সহজে মূর্ত্তিচৈতন্য সাধিত করিতে পারে, ভাস্কর্য্যে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় সুধীগণ "চিত্রজা" প্রতিমারই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেন। তাহা "হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে" উল্লিখিত আছে। যথা—

"কান্তিভূষণভাবাঢ্যা শ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুট স্থিতা।
অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ।
তস্মাচ্চিত্রার্চ্চনে পুণ্যং স্মৃতং শতগুণং বুধৈঃ ॥"

অজন্তা-গুহার বিচিত্র চিত্রাবলীতে এখনও ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতীয় কলালালিত্যের এই সকল বিজয়-গৌরব কেবল শিল্পগৌরব বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না; তাহা বরং ধর্ম্মগৌরব বলিয়া অভিহিত হইলেই সুসঙ্গত হয়। অনাদিকাল হইতে যে ধর্ম্মভাব ধীরে ধীরে লোকসমাজে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল,—তাহা অনন্ত-বিস্তৃত নভোমণ্ডলের অগণ্য গ্রহনক্ষত্রজ্যোতিতে, চিরপ্রবহমান বায়ুমণ্ডলের সুখশীতল প্রেমা-লিঙ্গন সংস্পর্শে, বিচিত্র বনানীমণ্ডলীর বহু বিচিত্র পত্রপুষ্পসম্ভারে, ভূতধাত্রী বসুন্ধরার শস্যশ্যামল কোমল স্নেহাঞ্চলতলে নিয়ত অনুভূত হইয়া, মানবমন ভক্তিবিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল,—এবং তাহাই সকল প্রকার সাংসা-রিক আকাঙ্ক্ষার উপর আসন বিস্তার করিয়া, ভারতবর্ষকে শিখাইয়া দিয়াছিল,—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

সেই সাধুবৃত্তির ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া, স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, সকল পদার্থের অন্তরালে ভূমানন্দের অন্বেষণ করিতে গিয়া, চিত্রবিদ্যাকে, ভাস্কর্য্য-বিদ্যাকে, সকল বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া, নানা ভাবে আত্মবিকাশ করিয়াছিল। তজ্জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের কলাবিদ্যাকে কেবল লৌকিক-বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। তাহার লক্ষ্য যেমন অলৌকিক ছিল, কলানৈপুণ্যও সেইরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্যবিস্তারে ব্যাপৃত হইয়া, অলৌকিক সাফল্য লাভেই জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিকশিক্ষা-বিভ্রাটে সে সাফল্যের মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া, আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীমূর্ত্তিবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহার রচনা-লালিত্য উপভোগ করিতে পারি

* রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডীয় ষষ্ঠসর্গান্তর্গত "লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালা-গৃহাণি চ" উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নিদর্শন।

না; বরং তাহাকে ভারত-কল্যাণপুণ্যের অগৌরবের নিদর্শন ভাবিয়াই লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ি! *

এতকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের যে দিক্ যে ভাবে দেখাইয়া আসিয়াছেন, আমরাও কেবল সেই দিক্ সেই ভাবেই দেখিয়া আসিতে অভ্যস্ত হইয়া স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা বিসর্জ্জন দিয়া, স্বদেশের ইতিহাস-চর্চ্চাকালেও পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গের মধ্যেই আবার আর এক শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসু সত্যপ্রিয় লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব যথারীতি অধ্যয়ন করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের উপর বিদেশের প্রভাব কোন্ বিষয়ে কত দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল, এতদিন কেবল সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া, যাঁহারা ভারতবর্ষীয় সকল গৌরবের মূলেই পরানুকরণ-সাফল্যের স্বপ্নদর্শন করিতেন, এখন আর তাঁহাদের কোন কথাই বিনা বিচারে স্বীকৃত হইতেছে না। কারণ নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন—ভারতবর্ষের উপর বিদেশের প্রভাব অপেক্ষা বিদেশের উপর ভারতবর্ষীয় প্রভাব কত ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। গ্রীক-শিল্পাদর্শ ভারতবর্ষের শিল্পজ্ঞানকে বিকশিত করা দূরে থাকুক, এক সময়ে সমস্ত ইউরোপের শিল্প ও সভ্যতার উপরই ভারতবর্ষীয় আদর্শ প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। এখনও ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উপর প্রাচ্য আদর্শের কিরূপ প্রভাব লক্ষিত হইতে পারে, তাহার প্রকৃত অনুসন্ধান আরব্ধ হয় নাই। *

যে যুগে ভারতবর্ষীয়গণ জ্ঞানগৌরবে ভুবনবিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সে যুগে তাঁহারা বহু-বিদেশের সংস্রবে আসিয়া, নানা দেশের শিল্পকৌশলের সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কখন কখন বিদেশ হইতে কর্ম্মকুশল শিল্পকার আসিয়া ভারতবর্ষের দ্বারে কর্ম্মপ্রার্থী হইলে, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু সে সকল বিদেশাগত শিল্পকারগণকেও ভারতবর্ষের আদর্শেরই অনুকরণ করিতে হইয়াছে।

সে আদর্শ কিরূপ ছিল, পুরাতন শ্রীমূর্ত্তিতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এক অদ্বিতীয় শিল্পাদর্শ,—অলৌকিক—অনিন্দ্য-

* Modern "educated" Indians, to their shame be it said, are profoundly ignorant of and indifferent to this great science, the traditions of which are kept alive by the artistic castes of the present day; though they are fast being crushed under the vandal heel of what we mis-call civilisation, just as the traditions of the medœval artists and craftsmen have been extinguished in Europe by a barbarous and godless commercialism.—Indian Sculpture and Painting, p. 89.

* Europe is very apt to dwell upon the influence of Western art and culture upon Asiatic civilisation but the far greater influence of Asiatic thought, religion, and culture upon the art and civilisation of Europe is rarely appraised at its proper value.—Indian Sculpture and Painting, p. 19.

সুন্দর—অনাবিল ভাবলহরীর অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তি মাত্র। তাহা জড়বস্তু-সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াও, জড়বস্তুর অন্তরালে প্রবেশ করিয়া, তাহার আত্মার অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে লালায়িত ছিল;—লৌকিক দৃষ্টিতে যাহাকে যেমন দেখিতেছি, তাহাকে সেই ভাবে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়া, শিল্পের উচ্চ সংকল্পকে পদদলিত করিত না। যে সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যসমাজের মানবপ্রতিভা দেবমূর্ত্তিকে যথাসাধ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবমূর্ত্তিতে পরিণত করিবার অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে ভারতপ্রতিভা বাহ্যেন্দ্রিয় সুসংযত করিয়া, ধ্যানস্তিমিতলোচন ঋষিকুমারের ন্যায়, বাক্‌মনাতীত ভাবসামগ্রীর ধ্যানধারণায় অবসরশূন্য হইয়া, তাহাকে কায়াদান করিবার জন্য দীর্ঘ তপস্যায় আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই পরিণত ফল স্বরূপে এই সকল শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাবিত ও শিল্পকৌশলে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহা ধ্যানগম্য—কেবল ইন্দ্রিয়গম্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। সেই জন্যই তাহার প্রভাব দেবতাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবরূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, মানবমূর্ত্তির অস্থিমাংসময় অশোভন বহিরাবরণের উপরে এক অক্ষয়-সৌন্দর্য্য-কবচের উদ্ভাবনা করিয়া, যথাসাধ্য দেবভাব বিকশিত করিতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ভারতীয় আদর্শের সহিত গ্রীক আদর্শের প্রধান এবং প্রবল পার্থক্য। ইহাই ভারতীয় আদর্শের মৌলিকত্বের অভ্রান্ত নিদর্শন; ইহাই গ্রীকানুকরণবাদের প্রকৃষ্ট প্রতিবাদ।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রভাবে ইহাই আবার ভারতভাস্কর্য্যের অপরিস্ফুট শিল্পকৌশলের অভ্রান্ত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা ও মাংসপেশী-বিন্যাসের স্বাভাবিক রীতি যথাযথ প্রকাশিত হয় না বলিয়া, কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন সেকালের ভারতবর্ষীয়গণ অস্থিসংস্থান-বিদ্যায় অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের ভাস্কর্য্যেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই মতই প্রবল মত হইয়া উঠিয়াছে; অনেক সুশিক্ষিত ভারতবাসীও তাহার মন্ত্রশিষ্য হইয়া, স্বাভাবানুকরণকেই শিল্পের চরম আদর্শ মনে করিয়া, পুরাতন শ্রীমূর্ত্তিগুলিকে অপরিস্ফুট শিল্পকৌশলের অপরিণত প্রয়াস বলিয়া ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাভেল সাহেব মহোদয় তাহার ভ্রান্তিপ্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই।*

কোন দেশের লোকেই কেবলমাত্র স্বভাবানুকরণকে শিল্পের চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। যাহা স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে সূত্ররূপে প্রতিভাত, শিল্প তাহারই ভাষ্যরূপে অভিব্যক্ত। যাহা স্বভাবে আছে, অথচ ভাষ্যের অভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না, শিল্প তাহারই

* But the Indian artist in the best period of Indian sculpture and painting was no more ignorant of anatomy than Phidias or Praxiteles. He could create a higher and more subtle type than a Grecian athlete or a Roman senator, and suggest that spiritual beauty, which, according to his philosophy can only be reached by the surrender of worldly attachments and the suppression of worldly desires.—Indian Sculpture and Painting, p. 25.

অভিব্যক্তির চেষ্টা করিয়া থাকে। * যে দেশের লোকসমাজ স্বভাবসূত্র যে ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে, সে দেশের শিল্পও সেই ভাবেই তাহার ভাষ্যবিকাশে যত্নশীল হইয়াছে। মূলতত্ত্বে কোন দেশের সহিত কোন দেশের পার্থক্য না থাকিলেও, স্বভাবসূত্র বুঝিবার পার্থক্যে, এক দেশের সহিত অন্য দেশের শিল্পাদর্শের পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। যাহারা ইহসর্ব্বস্ব জাতি তাহাদের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি সকল প্রকার অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই এক কথাই পরিস্ফুট হইয়া থাকে ; তজ্জন্য তাহাদের শিল্পশাস্ত্রও স্বভাবসূত্রের ইহসর্ব্বস্ব ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-দর্শন নিরন্তর অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বিজয় কামনায়, বাহ্যবস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে উপনীত হইয়াই গুহানিহিত বিশ্বাত্মার বিমল সৌন্দর্য্যে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিল ; ভারতবর্ষের শিল্পশাস্ত্রও স্বভাবসূত্রের তদুপযোগী ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। †

জীব ও জড়ের প্রাকৃত রূপ রেখানিবদ্ধ সসীম আকৃতি ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহাকে যথাযথ প্রতিফলিত করিয়া নিরস্ত হইলেই, শিল্পের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না ! শিল্প বাহ্যরূপের যেরূপ ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেইরূপ ব্যাখ্যাই সূচিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাই তাহার লক্ষ্য ; বাহ্যরূপ উপলক্ষ্য মাত্র। যাহা প্রকৃত লক্ষ্য, তাহা সসীম নহে ; তাহা অনুভূতির রাজ্যে আসিয়া, প্রাকৃত কলেবরের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, অসীম সৌন্দর্য্যসাগরে পরিণত হইয়া থাকে। যে জাতি যে ভাবে সেই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে, তাহার শিল্পে সেই ভাব অভিব্যক্ত। দেবভাবোন্মত্ত ভারতশিল্পে সেই জন্য দেবভাবের প্রাধান্য ; অস্থিসংস্থান-বিদ্যায় সুপরিজ্ঞাত হইয়াও, ভারতশিল্পাচার্য্যগণ তাহার জন্যই রেখানিবদ্ধ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কারারুদ্ধ হইতে সম্মত হইতেন না।

এই ভাব কোন্ পুরাকালে ভারতশিল্পের পথ প্রদর্শক হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার কোনরূপ লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা কাহারও অনুকরণলব্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবারও সম্ভাবনা নাই। ইহা ভারতবর্ষের অন্যান্য সাধারণ ভাবসম্পৎ হইতে অমৃতধারার ন্যায় সকল প্রকার অভিব্যক্তির সঙ্গে একত্র পরিস্রুত হইয়াছিল। বৈদিক যুগের উদারচিত্তবৃত্তি যখন বিশ্বসৌন্দর্য্যের মধ্যে ভূমানন্দের পরিচয় লাভ করিয়া, "নেতি নেতি" বলিয়া প্রাণপণে সসীমের সকল গণ্ডী অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সত্যযুগেই শিল্পের সত্যলক্ষ্যও আর্য্যসমাজে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া

* The common philosophic basis of art in all countries assumes that art is not merely an imitation or record of facts and phenomena in Nature, but an interpretation,—the effort of the human mind to grasp the minor beauty and meaning of the external facts of Nature.—Indian Sculpture and Painting, p. 23.

† Eropean art has, as it were, its wings clipped : it knows only the beauty of earthly things. Indian art, soaring into the highest empyrean, is ever trying to bring down to earth something of the beauty of the things above.

থাকিবে। * তখন হইতেই বিধিনিষেধের অবতারণা করিয়া, এই ভাবসম্পৎ রক্ষা করিবার নানা প্রবন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"নেদং যদিদমুপাসতে।"

এই শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ, নেদং—নেদং—ইহা নয়—বলিয়া ভারতবর্ষের ঋষি-সমাজ যখন হিমালয়শিখরে আসন বিন্যাস করিয়া, অতীন্দ্রিয় আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই শিল্পের মূল লক্ষ্যও স্থির হইয়া গিয়াছিল। ইহা স্বীকার না করিলে, সাহিত্য দর্শন হইতে—ভারতবর্ষের সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা হইতে শিল্পের সামঞ্জস্য স্খলিত হইয়া পড়ে। ইহাই যে একমাত্র লক্ষ্য, তাহা উত্তরকালে পুনঃপুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের শিল্পকারগণ চক্ষু "উন্মীলিত" করিয়া বাহ্যবস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতি প্রকৃতি নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণের পর চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে তাহাই যথাযথ প্রতিফলিত করিবার উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সূত্রকারগণ শিল্পকারগণকে চক্ষু "নিমীলিত" করিয়া কেবল ভাববাচ্য হইতেই চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের উপকরণ সংগ্রহের উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। * সেই জন্য অন্যান্য দেশের চিত্র বা ভাস্কর্য্য "বাহির হইতে সমাহৃত"; ভারতবর্ষের চিত্র বা ভাস্কর্য্য "ভিতর হইতে অমোঘ রশ্মিতে বিচ্ছুরিত।" সেই জন্যই অন্যান্য দেশের চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে "বাহ্য সৌন্দর্য্যের' আতিশয্য, ভারতবর্ষের চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে "অতীন্দ্রিয় ভাবগাম্ভীর্য্য" দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া, শ্রীমূর্ত্তি-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত-ভাস্কর্য্য নানা রচনা-রীতির ভিতর দিয়া উত্তরোত্তর প্রতিভাবিকাশের চেষ্টা করিয়া, এক আকস্মিক বিপৎপাতে চিরকালের মত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইস্‌লামের অভ্যুদয় নামে অভিহিত, মূর্ত্তিবিদ্বেষী-মুসলমান-শাসনের অবিমৃষ্যকারিতায় কেবল যে বহু যুগের সযত্নসঞ্চিত অনুপম শিল্পাদর্শ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; মূর্ত্তিরচনার পুরাতন প্রবল আকাঙ্ক্ষা সহসা বাধা প্রাপ্ত হইয়া শিল্পকারগণকেও বৃত্তিচ্যুত করিয়া দিয়াছে! সুতরাং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর আর কোনরূপ নূতন রীতি প্রচারিত হইবার অবসর

* It is a wholly un-informed view of the divergence between the technical characteristics of European and Indian art to explain that Indian artists never learnt anatomy and drawing for a thorough knowledge of artistic anatomy and the capacity to draw imitatively from nature are accomplishments within the power of every mediocre painters and sculptors, while Indian artists have frequently exhibited intellectual gifts of the rarest and highest order.—Indian Sculpture and Painting, p. 32.

† The artist, says Sukracharya, should attain to the images of the Gods by means of spiritual contemplation only. The spiritual vision is the best and truest standard for him. He should depend upon it, and not at all upon the visible objects perceived by external senses.—Ibid, p. 54-55.

লাভ করে নাই। তৎপূর্ব্বে যে সকল রীতি প্রচলিত ছিল, তাহারই কোন না কোন রীতির শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমূর্ত্তি-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, (১) গঠন-সামগ্রী-বিচারে, (২) গঠনকৌশল-বিচারে, (৩) গঠনযন্ত্র-বিচারে, (৪) গঠনরীতি-বিচারে, (৫) গঠনসূত্র-বিচারে, (৬) এবং সাম্প্রদায়িক গঠনপার্থক্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিলে, এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করা অনায়াসসাধ্য হইত, তাহার অভাবে ইহা একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে। মূল-গ্রন্থগুলি অপরিবর্ত্তিত ও অখণ্ডিত কলেবরে প্রাপ্ত হইবার উপায় না থাকিলেও, পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে সকল সারসংগ্রহ সন্নিবিষ্ট হইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তদবলম্বনে অগ্রসর হইবার উপায় আছে, তদ্ভিন্ন নানা স্থান হইতে যে সকল শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে জানিলেও, নানা তথ্য সংকলিত হইবার আশা আছে।

সূত্রকারগণ শ্রীমূর্ত্তি-রচনার যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ প্রতিপালিত হইত বলিয়াও, শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি সংকলিত হইবার আশা আছে। আসন, ভূষণ, বাহন, মুদ্রা পরিচয়বিজ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া সুপরিচিত। যে সকল শ্রীমূর্ত্তি রাজবিপ্লবে, ধর্ম্মবিপ্লবে, বা অন্য কারণে খণ্ডিত-কলেবরে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই সকল চিহ্ন ধরিয়া তাহারও নানা তথ্য সংকলিত হইতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক-গঠন-পার্থক্য কোন কোন স্থলে এত যৎসামান্য, যে এক সম্প্রদায়ের শ্রীমূর্ত্তি এক্ষণে অন্য সম্প্রদায়ের শ্রীমূর্ত্তিরূপে অঙ্কিত হইতে দেখা যায়। তথাপি অভিনিবেশসহকারে তথ্য-নির্ণয়ের সমুচিত আয়োজন করিতে পারিলে, সর্ব্বথা বিফলমনোরথ হইবার আশঙ্কা নাই। কেবল আশঙ্কা এই যে, স্বদেশের বিলুপ্ত গৌরবের নিদর্শন সংকলনের অক্লান্ত অধ্যবসায় বুঝি এ হতভাগ্য দেশ হইতে চিরপ্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাঁহাদের চেষ্টায় আমাদের সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারিত, তাঁহাদের অনেকের আকাঙ্ক্ষা এখন বিষয়ান্তরে অভি-নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

বৌদ্ধধর্ম্ম।

(পূর্ব্বপ্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বে যে কার্য্য-কারণসূত্রটি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা যুক্তিতে এক জায়গায় বাধে; এমন কি, প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে সংস্কারসকল উৎপন্ন হয়; আবার সেই সংস্কার-সমূহ হইতে জ্ঞান এবং

জ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ শরীর মন উৎপন্ন হয়; আবার নামরূপ হইতে ষড়িন্দ্রিয়, ষড়িন্দ্রিয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা; বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে আমরা এক্ষণে এইরূপ বুঝি,—গর্ভাবস্থাতেই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের আরম্ভ হয়, পরে জীবিত ব্যক্তি বাস্তব জীবনে প্রবেশ করিয়া বাহ্য-জগতের সংস্পর্শে আসে। তবে এই কার্য্যকারণ-সূত্রটি উল্টা দিকে গিয়া কেমন করিয়া আবার এই কথা ব্যক্ত করে—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভব (অস্তিত্ব), ভব হইতে জন্ম, পরে মৃত্যু ?

এই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলটা হঠাৎ যেন এক জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি দেখাইব, যাহা ভাঙ্গা বলিয়া মনে হয় তাহা আসলে ভাঙ্গা নহে।

বস্তুত আমার মনে হয়, যে হেতু, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের তৃতীয় অবয়ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া (গর্ভসঞ্চারকালে, জ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ শরীর মনের উৎপত্তি । জীবের অস্তিত্ব; যেহেতু পরবর্ত্তী অবয়বগুলিতে আমরা দেখিতে পাই জীবের ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব নবম অবয়ব হইতেই (আসক্তি হইতে 'ভব' অর্থাৎ অস্তিত্ব) জীবের জন্ম সংঘটিত হয়।

এই প্রতীয়মান অযৌক্তিকতার হেতু অনুসন্ধান করিতে হইলে, হিন্দু দার্শনিকদিগের যে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি আছে, সেই মনোবৃত্তির মধ্যে ইহার হেতু উপলব্ধ হইবে।—সেই মনোবৃত্তিটি—সূক্ষ্মভাবের ধারণা। অতএব, বর্ত্তমানক্ষেত্রে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলের প্রথম নয়টি অবয়বে যে সত্তা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা স্থূল-সত্তা নহে, তাহা সূক্ষ্ম-সত্তা, তাহা সত্তার মূল-রূপ। অতএব এস্থলে এমন কতকগুলি গুণ কল্পনা করিতে হইবে যাহার মূলে বস্তু নাই, এমন কতকগুলি উপাধি কল্পনা করিতে হইবে যাহার মূলে বিষয় নাই—সেই সব গুণ কিংবা উপাধি মিলিয়া যে একটি সূক্ষ্ম-সত্তা গঠিত হয়, পরে তাহাই স্থূল-সত্তায় পরিণত হয়; এক কথায়, স্থূল-সত্তার সহিত যে সূক্ষ্ম-সত্তা সর্ব্বদাই সংযোজিত থাকে, ইহা সেই সূক্ষ্ম-সত্তার রূপ। সুতরাং কার্য্যকারণসূত্রের তৃতীয় অবয়ব হইতে (জ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি) আরম্ভ করিয়া তৃষ্ণা পর্য্যন্ত, আমরা এমন কতকগুলি উপাধি দেখিতে পাই যাহা ভৌতিক বিষয়ের বাহিরে অবস্থিত,—সেই সকল উপাধি কোন সূক্ষ্মপদার্থের একটা আচ্ছাদন মাত্র। স্থূল-সত্তার সহিত কেবল শেষ তিনটি অবয়বের সংস্রব দেখা যায়; একাদশ অবয়বে—অর্থাৎ জন্ম হইবামাত্র, যে পঞ্চস্কন্ধ সম্মিলিত হয়—সেই সব বোধমূলক ও জ্ঞানমূলক উপাধি যথা, রূপ, বেদনা, সংস্কার ও জ্ঞান; এবং সেই দশম অবয়ব, যে "ভব" অর্থাৎ সত্তা—সেই সত্তার মধ্যে, যেমন ভৌতিক সত্তা সন্নিবিষ্ট—সেইরূপ আধ্যাত্মিক সত্তা ও নৈতিক সত্তাও সন্নিবিষ্ট আছে।

কার্য্যকারণশৃঙ্খলটি এক স্থানে আসিয়া হঠাৎ ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া যে মনে হয় ইহাই তাহার ব্যাখ্যা। যদি প্রথম অবয়বগুলি হইতে বাস্তব সত্তা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক আর কিছুই হইতে পারে না। এই কথা Olden-

berg বুঝিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার বুদ্ধ-বিষয়ক গ্রন্থে, তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বচনসমূহের দোষ ধরিয়াছেন।

তা ছাড়া, এই মূল-রূপের কথা বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভাবন করে নাই —বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা সাংখ্য-দর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছে; কেন না, সাংখ্য-দর্শনে লিঙ্গশরীরের উল্লেখ আছে—বিশুদ্ধ উপাধিসমূহ লইয়া যে শরীর গঠিত, তাহাই লিঙ্গশরীর। "ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ভূমিকায়" Eng. Burnouf দ্বাদশ নিদানের কথা ভিন্নরূপে বিবৃত করিয়াছেন; আমি তাহার সার মর্ম্ম বলিতেছি, কেন না এই দার্শনিক মতটির উপর সমস্ত বৌদ্ধদর্শন প্রতিষ্ঠিত।

Burnouf ললিতবিস্তার হইতে একটি বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধ কিরূপে জীবোৎপত্তির কারণপরম্পরা ধ্যান-যোগে অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা অ-সত্তা হইতে কিরূপে সত্তার উৎপত্তি হইয়াছে দেখাইবার জন্য প্রথমে অবিদ্যা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু ললিত-বিস্তারে শাক্যমুনি উল্টা দিক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্তার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, তিনি সত্তার মূলদেশে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জন্ম-জরা-মৃত্যুসমন্বিত এই যে সংসার ইহা একটা অশুভ ব্যাপার, কেন না ইহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। জন্মই জরা-মৃত্যুর কারণ। ভব হইতে জন্মের উৎপত্তি; জন্মের কারণ গর্ভাধান। কাম হইতে গর্ভাধান, ও বেদনা হইতে কামের উৎপত্তি। আবার স্পর্শ হইতে বেদনা, ষড়িন্দ্রিয় হইতে বেদনার উৎপত্তি। আবার ষড়িন্দ্রিয়ের কারণ নামরূপ। আবার জ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি। জ্ঞানের কারণ সংস্কার এবং সংস্কারের কারণ অবিদ্যা।

Burnouf কার্য্য-কারণের এই শৃঙ্খলটি অনুসরণ করিয়া, এই শৃঙ্খলের প্রত্যেক অবয়ব এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন;—

১। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু। শাক্যমুনি এই মহাসত্যটি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সকল পদার্থেরই উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জন্মই জরা-মৃত্যুর কারণ। ব্যক্তির বাহ্যত-দৃষ্ট জীবনের দুই প্রান্ত—জন্ম ও মৃত্যু। জীবের জন্মগ্রহণমাত্রই, পঞ্চ স্কন্ধ অর্থাৎ পঞ্চ উপাধি আসিয়া তাহাতে সম্মিলিত হয়। (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।)

৩। ভবনামক তৃতীয় অবস্থার অর্থ—অস্তিত্ব। ইহাই পাপপুণ্যের অবস্থা ও ইহাই নৈতিক সত্তা; জন্মান্তরবাদের মতানুসারে, ইহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

৪। "ভব" অর্থাৎ হওয়ার কারণ গর্ভাধান। জীব গর্ভাবস্থা হইতে জন্মে উপনীত হয়। ইহাই জীবের ক্রমাভিব্যক্তি। কিন্তু জীবের এই অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চেষ্ট ভাবাপন্ন হইলেও, ইহাতে কতকটা সচেষ্টতাও লক্ষিত হয়। ইহার ক্রিয়াশক্তিই উহাতে পঞ্চ স্কন্ধ সংযোজিত করে; আবার এই পঞ্চ স্কন্ধ—পঞ্চেন্দ্রিয় ও দেহস্থ স্থূল উপাদানগুলির সহিত মিলিত হইয়া জীবের জন্মোৎপাদন করে।

৫। ভৌতিক গর্ভাধানই জীবের 'ভব'—অর্থাৎ হওয়া, ইহাই জন্মের পূর্ব্বায়োজন। গর্ভাধানের অর্থাৎ মূল-ছাঁচের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা—তৃষ্ণা ও বাসনা। অতএব মূলছাঁচের দেহেই বাসনার উৎপত্তি হয়। এইখানে এই

কথাটি বলা আবশ্যক যে বাসনা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া জীব এমন কতকগুলি অবস্থায় উপনীত হয়, যাহা সূক্ষ্ম জীবের একটা আচ্ছাদন মাত্র এবং পরে উহাই স্থূল জীবে পরিণত হয়। অতএব তৃষ্ণা বলিলে, স্থূল জীবের বাসনা বুঝিতে হইবে না, কিন্তু উহা সূক্ষ্ম বাসনা—যাহা জীবের আদিম ও সূক্ষ্ম শরীরের পরিণাম এবং তাহা হইতেই গর্ভ উৎপন্ন হয়; তাহার পর, এই গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল শরীরের পরিণাম-পরম্পরা আবির্ভূত হয়।

৬। বেদনা—যাহা আরও ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে, অনুভবশীলতা—এই বেদনা এক প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহা এইরূপ ভাবে বলে:—ইহা সাদা, ইহা কালো, ইহা ভাল, ইহা মন্দ। ইহা সুখদুঃখের অনুভূতি। এখানেও বেদনা ভৌতিকবিষয়-নিরপেক্ষ; কেননা এখানেও সূক্ষ্ম জীবের কথা, সেই স্থূল জীবের মূল-ছাঁচের কথা সূচিত হইতেছে—যে স্থূল জীবের আরম্ভ গর্ভাবস্থা। মোট কথা, জন্মগ্রহণ মাত্রে যে পঞ্চ স্কন্ধ কিংবা পঞ্চ উপাধি আসিয়া সম্মিলিত হয়, সেই সম্মিলনের পরেই বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, বেদন দুই প্রকার; এক, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহীর বেদনা; আর এক, জন্মগ্রহণের পর স্থূলদেহীর বেদনা।

৭। পদার্থসমূহের গুণ-ধর্ম্মের উপর সূক্ষ্মদেহধারী চিৎ-বস্তু যখন প্রভাব প্রকটিত করে তখনই পদার্থসমূহের সহিত তাহার স্পর্শ সংঘটিত হয়। সে কিরূপ?—না, জ্ঞা যখন তাপ ও শৈত্য অনুভব করে সেইরূপ।

৮। ষড়িন্দ্রিয়ের সম্মিলনই স্পর্শের কারণ; ষড়িন্দ্রিয় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও মন। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তুর সহিত মনের যোগ স্থাপন করে। কতকগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে, ইহা বিষয়ের কিংবা মানস-প্রতিবিম্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান; আবার অন্য সম্প্রদায়ের মতে, মন কেবল বিষয়ের প্রতিবিম্বকেই গ্রহণ করিতে পারে।

৯। নামরূপ কি? না, ব্যক্তিত্বে পরিণত চিৎ সত্তার কতকগুলি বিশেষ ধারণা। অর্থাৎ ইহা সূক্ষ্মদেহীর নাম ও রূপ। ইহা ব্যক্তিত্বে পরিণত নির্দ্দিষ্ট দেহ হইলেও এখনও মূল-ছাঁচের আকারে অবস্থিত—ইহা ব্যক্তিত্বে পরিণত চিৎ-সত্তার জ্ঞানের আয়তন। ফলত জন্মগ্রহণের পর পঞ্চ স্কন্ধ সম্মিলিত হইলেই ইহা স্থূল আকার ধারণ করে। ইহার ফলে রূপও দ্ব্যাত্মক; একটি সূক্ষ্মদেহের রূপ; আর একটি স্থূলদেহের রূপ।

১০। নামরূপ যাহা ব্যক্তিত্বে পরিণত চিৎ-সত্তার বাহ্য চিহ্ন—সেই নামরূপের কারণ - জ্ঞান। জ্ঞান ও ভাব এই দুই-ই সাধারণ জ্ঞান শব্দের অন্তর্ভূত। জ্ঞানও দুই প্রকার; প্রথমত ইহা সূক্ষ্মদেহীর উপাধি; দ্বিতীয়ত ইহা স্থূলদেহীর পঞ্চম উপাধি।

১১। সংস্কার কি? না, ভ্রমাত্মক ধারণা। যাহা মরীচিকা মাত্র তাহা বাস্তব বলিয়া অশরীরী চিৎ-সত্তার যে বিশ্বাস তাহাই সংস্কার;—এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই মরীচিকার জন্য একটা তৃষ্ণা থাকে, তাহাও সংস্কার; এবং জীব বাস্তব বলিয়া স্বকীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাও সংস্কার। সংস্কারগুলি জীব নিজে সৃষ্টি করে, রচনা করে, কল্পনা করে—এই সকল সংস্কার কল্পনা হইতে প্রসূত। এ

সমস্ত কল্পিত ধারণা। সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে, এই সকল সংস্কার,—অবাস্তব বিষয়ের অস্তিত্বে ভ্রান্ত বিশ্বাস বই আর কিছুই নহে। স্থূলভাবে বলিতে গেলে—ইহা বাস্তববৎ উপাদানে গঠিত বিচিত্র কল্পনাসম্ভূত বিচিত্র জীব—বিচিত্র সৃষ্টি।

১২। অবিদ্যা কি?—না, মিথ্যাজ্ঞান। যে জগৎ চিরচঞ্চল, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, সেই জগৎ-সত্তা কেবলমাত্র কল্পনা হইতে উৎপন্ন অথবা, জগৎ বাস্তব এই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন। এই মিথ্যা ধারণাটি সেই চিৎ-সত্তার প্রথম ধারণা, যে চিৎ-সত্তা এখনও ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় নাই, কিংবা এখনও দেহ ধারণ করে নাই। (৫৬)

অতএব দেখা যাইতেছে, অসত্তা ও অবিদ্যা হইতে আরব্ধ যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা তাহার মধ্যে, Burnouf মূল-ছাঁচ-গত সূক্ষ্ম জীব ও যে জীব জন্মগ্রহণের পর স্থূল দেহ ধারণ করে,—এই উভয় জীবকেই ধরিয়াছেন।

ইহাই তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত:—"জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, চিৎ-সত্তার এই পঞ্চ স্কন্ধ আসিয়া সম্মিলিত হয়; যথা:—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও জ্ঞান। এই পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে, চারিটি স্কন্ধ—আমি যে দ্বাদশ নিদানের কথা এইমাত্র বলিলাম—তাহার মধ্যে পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে; আমি যে ইহার পুনরুল্লেখ করিতেছি তাহা শুধু এইটুকু বলিবার জন্য যে এই পঞ্চ স্কন্ধ আর এখন সূক্ষ্ম উপাধি নহে (যাহা উপরে বলিয়াছি) প্রত্যুত জীবন্ত জীবের বাস্তব উপাধি—স্থূল উপাধি।" (৫৭)

দুঃখের কারণ প্রদর্শন করিয়া, তাহার পর এই দুঃখের কোথায় নিবৃত্তি হয় এবং যেখানে উপনীত হইলে মানুষের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, বুদ্ধদেব এখন সেই স্থানের নির্দ্দেশ করিতেছেন। মানুষের এই চরম গম্যস্থল এই চরম লক্ষ্য কি? না—নির্ব্বাণ—কি না মুক্তি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাভারত।

ইতিহাস (১) বা ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

পঞ্চ ইন্দ্র—পঞ্চ পাণ্ডব।

মহাভারতমতে (১।১৯৭) হিমাচলের শিখরদেশে সিংহাসনাসীন কামিনী-সমবেত দেব শূলপাণির আজ্ঞায় এক এক করিয়া পঞ্চ ইন্দ্র দরীমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ঐ সমবেত পঞ্চ ইন্দ্র পঞ্চ পাণ্ডব রূপে এবং স্বর্গলক্ষ্মী দেবী—তাঁহাদের ভার্য্যা হইবার নিমিত্ত—কৃষ্ণারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

(১) শব্দটি আমরা প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করি। সাধুভাষায় আধুনিক অর্থে ব্যবহার করি না।

এই পঞ্চ ইন্দ্রের নাম বিশ্বভুক্‌, ভূতধামা, শিবি, শান্তি ও তেজস্বী। পঞ্চ ইন্দ্রের একত্র সমাবেশ দৃষ্টে যে কেহ বুঝিতে পারেন যে দেবরাজ বা ইন্দ্র দেববিশেষের নাম নহে। ইন্দ্র (=রাজা) একটি উপাধি মাত্র। এবং বিশ্বভুক্‌-আদি পঞ্চ দেব ইন্দ্র-উপাধিধারী ছিলেন।

উত্তর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে শাকপূণি, ঔর্ণনাভ ও ঋষি যাস্ক (শক পূর্ব্ব ৫৭৮) আদি নিরুক্তকারগণ হইতে বিজয়-নগর বৃহস্পতি মাধবীয় ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য (শক-অব্দ ১২২৭) আদি ভাষ্যকারগণ সকলেই এক বাক্যে এক ইন্দ্রদেবের কথা বলিয়া আসিতেছেন। ততোধিক ইন্দ্রের কথা অর্থাৎ বহুদেবের "ইন্দ্র" উপাধি থাকার কথা কেহ ত কথন বলেন নাই। এবং য়ুরোপীয় বেদাধ্যায়িগণও কেহ কথন এক ইন্দ্র দেব বৈ বহুদেবের "ইন্দ্র" উপাধি থাকা বলেন নাই। তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে মহাভারতের "পঞ্চ ইন্দ্রের" উক্তি অতিরঞ্জনমূলক বা অতিশয়োক্তিমূলক।

আপাত দৃশ্যে এই প্রতিবাদ অতি গুরুতর ও সাংঘাতিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলে উহা ভিত্তিহীন।

ঋষি যাস্ক মতে ইন্দ্র বায়ুদেব এবং মধ্যস্থান-দেবতা এবং মোক্ষমূলার মতে ইন্দ্র মেঘ-দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং বলিতে হইবে যে ইন্দ্র-দেবের স্বরূপত্ব লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এবং মেধাবী মোক্ষমূলার বলেন "আর্য্যজাতির অন্য কোন শাখায় এমন কি অবেস্তাতেও "ইন্দ্র" নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইন্দ্রদেবের অবতারণা আর্য্যজাতির বিচ্ছেদের পরে ঘটিয়াছে।" "এবং (সূর্য্যাদি) অন্য সকল দেবই নৈসর্গিক দৃশ্য পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত, কেবল ইন্দ্রদেবের কোন মূল ভিত্তি নাই (২) এবং অনেক ঐন্দ্রী ইতিহ হয় ত পূর্ব্বে অন্য কোন দেবের ছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যদিও—"ইন্দ্র" দেববিশেষের নাম কি বহুদেবের উপাধি মাত্র—এই তর্ক প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য নৈরুক্তগণের বা ভাষ্যকারগণের মনে না উঠিলেও মোক্ষমূলার এই তর্কের দ্বার-দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার কোন সন্দেহ নাই। সে স্থলে পূর্ব্বাপর বেদভাষ্যকার-গণ 'ইন্দ্রকে' দেববিশেষ মনে করিয়া লইয়া বেদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের ধারণা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ নহে বলিয়া উহা নজীর-গণ্য হইতে পারে না এবং ঐ অবিচারিত ও অমীমাংসিত ধারণা দ্বারা মহাভারতের সাক্ষাৎ উক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না।

আসল কথা এই যে—আর্য্যজাতির কয়েকটি শাখা প্রথমে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তর য়ুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিলে অবশিষ্ট আর্য্যজাতির শূরসম্প্রদায় গ্রীসদেশে উপ-নিবেশ স্থাপনে জিউস্‌ (বৃহস্পতি) দেবকে দেবগণের সর্ব্ব প্রাধান্য দিয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং সুমেরুর বিকল্পে অলীকংপদ (স্বর্গ) অলিম্পস পর্ব্বতে কল্পনা করিয়া ভূস্বর্গে জিউস্‌দেবের "পবিত্র পর্ব্বত" নির্দ্ধারণ

(২) "Indra...was never identified with any physical object whether rain or cloud, or light or sky, but at once grew into a dramatic character, a hero, a conqueror, a supreme ruler." (Max Muller.)

করিয়া দিলেন। শেষাবশিষ্ট আর্য্যগণ বহুকাল যৌথ থাকিয়া সংস্কৃতভাষার উন্নত অবস্থায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইরান দেশে উপনিবেশ স্থাপনে জাতীয় দেব বৃহস্পতিকে অহুর মস্‌দ (অসুরমন্ত) (৩) নাম দিয়া একেশ্বর উপাসনার পথে উঠিলেন। যাজকসম্প্রদায় সিন্ধুতীরস্থ উপনিবেশে বৃহস্পতি দেবের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া বৃহস্পতি-আদি দেবগণকে "অগ্নি" ও "ইন্দ্র" উপাধি দিয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। (৪।৫)

এজন্য বেদের বহু সূক্তে অর্চ্চনীয় দেবের মূল নাম উল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদেবের রাজা (ইন্দ্র) জ্ঞানে "ইন্দ্র" উপাধি দিয়া ইন্দ্র নামে স্তব করা হইয়াছে। (৪) সূক্তবিশেষে ইন্দ্রের গুণ কর্ম্ম চরিত্র আদি ভেদে প্রত্যেক সূক্তের অর্চ্চনীয় দেবতা নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। (৫)।

কখন বা (২।২৪।১২) দেবদ্বয়কে (বৃহস্পতি ও ইন্দ্র) মঘবাদ্বয় (ইন্দ্রদ্বয়) বলিয়া সম্বোধন করা লক্ষিত হয়। বেদ (৩.৪৯।১) মতে ইন্দ্র (বজ্র) দেবগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন। এবং বহুতর দেবতা "ইন্দ্র" উপাধিতে অর্চ্চিত বলিয়া বেদে ইন্দ্রের বহু মাতা ও বহু পিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬) এবং বহুদেবের ইতিহ ইন্দ্রে আরোপিত হওয়া দৃষ্ট হয়। এইরূপে রজঃ সত্ব তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ কর্ম্মময়—ত্রিবিধ দেবগণই ইন্দ্র নামে অর্চ্চিত বলিয়া বিবিধ বিপরীত গুণ ও বিবিধ বিপরীত চরিত্র ইন্দ্রে উপলক্ষিত হয়। (৭)

ইন্দ্র যে প্রাচীন দেব নহেন এবং ইন্দ্রের যে কোন মূল ভিত্তি নাই এবং সকল দেবই যে ইন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন এ কথা যেমন

---

(৩) পণ্ডিতপ্রবর বহুদর্শী—হিন্দুদিকুলতিলক ডামেষ্টেটার অহুর মস্‌দ ("Supreme Intelligence") দেবের "মস্‌দ" শব্দের সংস্কৃত অনুরূপ "মেধা" শব্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মস্তক শব্দ ভিন্ন আভিধানিক "মন্ত" শব্দের ব্যবহার অতি বিরল, এজন্য "মন্ত" শব্দের প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই বোধ হয়; নতুবা তাঁহার কৃত অর্থের (Supreme Intelligence) সহিত মেধা শব্দ অপেক্ষা মন্ত শব্দের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া তিনি কোন্‌টি গ্রহণ করিতেন, তাহা বলা কঠিন নহে।

(৪) Henotheism—(Max Muller.)

(৫) অধিদেবতাগণের প্রতিমা (তারা) উজ্জ্বল বলিয়া অগ্নি নামে অর্চ্চিত হইয়াছে।

(৬) মাতা—শক্তি, শবসী, বিকুণ্ঠা একাষ্টকা, নিষ্টিগ্রী; পিতা—দ্যু।

(৭) সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ডাক্তার মুইর বেদে "এক ইন্দ্রের" রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক গুণগ্রাম ও চরিত্রগ্রাম বর্ণন দর্শনে অতীব ক্ষুব্ধ ও মহাবিরক্ত হইয়াছেন। এবং নিরীহ নিরপরাধ বেদবক্তা ঋষিগণের প্রতি মিষ্ট ভর্ৎসনা প্রয়োগে চিত্তের সংশয় মিটাইয়াছেন, যথা—"The reader......may think that he perceives incompatibility between the conceptions of the god, which he will find in the different parts of the preceding sketch. And according to our idea, no doubt, there is an incompatibility......And more particularly the sensual character which is generally attributed to the god, appears to be in opposition to the moral perfection, which is elsewhere described as an essential feature of his nature ......The ancient Idian poets regarded the diety as pertaking, in a higher degree, of the elements, sensuous as well as intellectual and moral, which on the evidence of their own consciousness they know to be equally constituent parts of their own nature.——O. S. Texts, V. 15.

বেদ ও অবেস্তা আদি অধ্যয়নে প্রতীতি হয়, তেমনি বেদেও গৌণভাবে উহার উল্লেখ আছে। (২।১২।৫)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।২।৩।৩) একটি ইতিহ আছে। তাহাতে প্রকাশ যে :—

"প্রজাপতি দেবও অসুর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তিনি ইন্দ্র সৃষ্টি করেন নাই। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন :—'আমাদের ইন্দ্র সৃষ্টি কর'। প্রজাপতি উত্তর করিলেন—আমি তপঃ দ্বারা দেব সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপ তপঃ দ্বারা ইন্দ্র সৃষ্টি কর। তপস্যায় বসিয়া দেবগণ (আপন আপন) আত্মা মধ্যে ইন্দ্র দেখিলেন, ইত্যাদি।"

ইন্দ্র (রাজা) উপাধি বলিয়া অদ্যাপি সপ্তগ্রহ মধ্যে বর্ষভেদে এক এক জন রাজা ও এক এক জন মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

কামিনীসমবেত শূলপাণি ও দরীমধ্যগত পঞ্চ ইন্দ্র যে এই সপ্তগ্রহের চিত্র মাত্র—একথা চিন্তাশীল পাঠককে জানাইয়া দিবার দরকার নাই।

এক্ষণে আমরা একে একে বিশ্বভুক্ আদি পঞ্চ ইন্দ্রের পরিচয় লইব।

ক্রমে উচ্চ বন্ধুর পথে আমরা অগ্রসর হইতেছি। সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি ব্যতীত এই দুস্তর মার্গ অতিক্রম করা অসাধ্য হইবে।

বেদের সাহায্যে পঞ্চ ইন্দ্রের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। বেদের শব্দার্থ আমরা দেশীয় ও বিদেশীয় নিরুক্তকার ও ভাষ্যকারগণের নিকট লইয়া চলি। বেদের ভাবার্থ—অর্থাৎ জ্যোতিষিক তাৎপর্য্যার্থ—আমাদের দীর্ঘকাল ভূগোল-পর্য্যবেক্ষণের ফল এবং বেদমন্ত্রের জ্যোতিষিক্ অর্থের জন্য আমরা সম্পূর্ণ দায়ী। এবং কেহ ঐ জ্যোতিষিক অর্থের কোন স্থলে ভ্রম থাকা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সহাবনত মস্তকে ঐ ভ্রম স্বীকারে সাধুবাদের সহিত প্রকাশ্যে উহা পরিহার করিব।

ইন্দ্র বিশ্বভুক্—যমরাজ (যুধিষ্ঠির)।

মহাভারতমতে (১।১৯৭) ইন্দ্র বিশ্বভুক্ যুধিষ্ঠির রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

এই বিশ্বভুক্ যম মৃত্যুদেব। যম—মঙ্গল নহে। ইনি বিচারপতি যমরাজ ওরফে ধর্ম্মরাজ। বেদে

"মৃত্যবে নমঃ যমায় নমঃ"

বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি দুর্ভাগ্য-ক্রমে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল ভাষ্যকারগণই দুই যম একত্রে মিশাইয়াছেন।

বেদমতে (১।৮৩।৫) তেজহীন অস্তগত সূর্য্যই যম—কি প্রত্যূষে কি প্রদোষে।

মহাত্মা মোক্ষমূলার ঠিক বলিয়াছেন যে :—

'Let us imagine then as well as we can that Yama, twin, was used as the name of the evening or the setting sun (no, also the morning sun) and we shall be able perhaps to understand how in the end Yama came to be the king of the departed and the god of the dead. As the east was to the early thinkers the source of life, the west was to them Nirreti, the exodus, the land of death. The sun conceived as setting or dying every day was the first who had trodden the path of life from the east to

the west…the first mortal, the first to show us the way when our course is run and our sun sets in the far west ''......That Yama's character is solar might be guessed from his being called the son of Vivasvat. Vivasvat like Yama is sometimes considered as sending death. R. V. viii 67, 20 "May the shaft of Vivasvat, O Adityas, the poisoned arrow, not strike us before we are old."

উপরোক্ত কথাগুলির মূল তাৎপর্য্য এই যে, প্রাতঃসূর্য্য-যম পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিম পথে সন্ধ্যাকালে অস্তাচলে উপনীত হইতেছেন। এবং তিনি আমাদিগকে তাঁহার নিজের উদয় গতি ও অস্ত দ্বারা দেখাইতেছেন; সকল জীবের এই দশা।

আমরা আরও দেখি (অঃ বেঃ ৩।২৯।৫) যে মৃত পুণ্যাত্মা সূর্য্যে ও চন্দ্রে চিরবাস করেন।

এই যম ও মৃত পুণ্যাত্মা বা পিতৃগণ তারাজগতে পুনঃ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সূর্য্য-যম প্রাচীন ধ্রুবতারায় (৭ তক্ষকস্থ Alpha Draconis) এবং পিতৃগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলে পুনঃ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন অর্থাৎ তারাজগতে যম-ধ্রুবতারা যম-সূর্য্যের প্রতিমা এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল পিতৃগণের প্রতিমা। (৮) এবং সূর্য্যের দৈনিক গতির পথ ছায়াপথে পুনঃ অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই জন্য বেদে বর্ণিত আছে (ধর্ম্মরাজ) "যম বিশ্ববৃক্ষের উপরে দেবগণের সহিত অমৃত পান করেন। তিনি অমর ও সর্ব্বোচ্চ বা তৃতীয় স্বর্গের অধীশ্বর। বিচারপতি ধর্ম্মরাজ পাপের দণ্ড বিধান ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করেন এবং বিচারকার্য্যে পিতৃগণ তাঁহার সভার সদস্য (জুরি) নিযুক্ত আছেন। যমরাজ সস্নেহে পিতৃগণকে (সপ্তর্ষি) পালন করেন। এবং তাহাদের জন্য 'পিতৃযান পথ' করিয়া দিয়াছেন।" (৯)

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া বেদমন্ত্রের ভাষ্য পাঠ করিলে উহার শব্দার্থ বোধগম্য হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে চাষার গানের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। উহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভগোলে নেত্রপাত করিতে হইবে, তবেই উহার জলন্ত চিত্র হৃদয়ঙ্গম হইবে নতুবা নহে।

যমরাজের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভগোল বা অভাবে তারা গোলক বা ভগোলচিত্র দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে:

৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সুমেরু পৃষ্ঠে রাত্রিকালে দণ্ডায়মান থাকিলে দর্শক দেখিতেন যে :—

অগণ্য হীরক খণ্ড সদৃশ পল্লবে পল্লবিত বিশ্ববৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অর্থাৎ দর্শকের মস্তকোপরে একটি ক্ষুদ্র তারা (৭ তক্ষকস্থ = Alpha Draconis) বিরাজমান রহিয়াছে। তারাটি অচল অটল। অটল অচল ধর্ম্মরাজের এমন অটল অচল প্রতিমা আর তারাজগতে নাই। তাহার নিম্নে সপ্তর্ষিগণ (Ursa Major) অবস্থিত আছেন। এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিম্নে পিতৃদৈবত মঘানক্ষত্র। মঘার যোগতারা (১ সিংহস্থ = Alpha Lionis) সুবিমল কিরণ বিস্তারে "মঘভূষণে" এই বৈয়াকরণিক বাক্যের

(৮) যে মরীচ্যাদয়ঃ সর্ব্বে স্বর্গে তে পিতরঃ স্মৃতাঃ। পুবরাহ রাণ।

(৯) যমরাজের নাম হইতে এই পথ যমপথ নামে খ্যাত এবং এই ছায়াপথ কৃষকগণের যমের জাঙ্গাল।

সার্থকতা সপ্রমাণ করিতেছে। নক্ষত্র চক্রে যম-রাজের প্রতিমা বলিয়া এই তারাটি "যমরাজপুত্র" বা "যুবরাজ" খ্যাতি লাভ করিয়াছে। (১০) তারাদর্শক আরও দেখিবেন যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরে মস্ত তারা সর্প (তক্ষক = Draco) দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই তারা সর্পের বৈদিক নাম নহুষ রাজ। (১১)

এই দৃশ্য মনে রাখিয়া ধর্ম্মরাজের বেদসূক্ত পাঠ করিলে বেদমন্ত্রের সদর্থ হইবে :—

যম বিশ্ববৃক্ষের উপর দেবগণের সহিত (অমৃত) পান করিতেছেন, যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাসে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ। (১০।১৩৫।১) (১২)

যমের অমর জন্ম গান করি :—

যমস্য জাতম্ অমৃতং যজামহে। (১।১৪৩।৫)

যম তৃতীয় স্বর্গের অধীশ্বর :—

নিম্ন স্বর্গদ্বয় সবিতৃদেবের :—

তীস্র দ্যাবঃ সবিতুঃ দ্বা উপস্থা একা যমস্য। (১৩) (১৩৫।৬)

যমের উপর কেহই নাই, বিবস্বান্ যমের নিচে :—

যমঃ পরঃ অবরঃ বিবস্বান্ ততঃ পরম্ ন অতি পশ্যামি কিঞ্চন। (১৪)

(অঃ বেঃ ১৮।২।৩২)

যম পাপীকে বোড়্শী দিয়া গাঁথেন :—

মুঞ্চন্তু মা......উত যমস্য পড়্বিশাৎ।

(১০।৯৭ ১৬)

যম নির্ব্বাণ মুক্তি দান করেন :—

যমঃ দদাতি অবসানম্ অস্মৈ। (১০।১৪।৯)

পিতৃগণও পাপের দণ্ড করেন :—

মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেনচিৎ ন যৎ বঃ আগঃ পুরুষতা করাম। (১০।১৫।৬)

এবং মৃতের জন্য অনুরোধ করেন

তে আ গমন্তু তে ইহ শ্রুবন্তু অধি ব্রুবন্তু তে অবন্তু অস্মান্। (১০।১৫।৫)

এই সদস্য পিতৃগণের অধিপতি যমরাজ। (১৫)

(১০) তু। বেবিলনে Lu-gal
এসিরিয়ায় Sannu
গ্রীসে Basiliskos
রোমে Regulus
অর্থাৎ Little king
(ছোট রাজা)।

(১১) তু। Phoenician Nakhasch, "who ruled at first over the world."
R. Brown.

(১২) তু। "যম দেবগণের সহিত গাছে বসিয়া অমৃত পান করিতেছেন" বলিলে চাষার গান হয় তাহা কে অস্বীকার করিবে।

পুষ্পিকাঃ—ভাগ্যবশে মূলে "পিবতে" আছে নতুবা অমৃতফল উল্লেখ করিলে রামায়ণের উপর টীকা পড়িত।

(১৩) ভূগোলে যেমন শীতপ্রধান সুমেরু দেশ ভূস্বর্গ বলিয়া পরিগণিত, ভগোলে তেমনি উত্তরস্থ মহামেরু স্থান তৃতীয় স্বর্গ ওরফে উত্তানপাদ এবং উহাই দেবগণের আবাস।

(১৪) "In the A. V. xviii. 2—32 he (Yama) is said to be superior to Vivasvat and to be surpassed by none."
Dr. Muir.

টিপ্পনী :—এই ভাষ্য দ্বারা ঘৃতে ভস্ম পড়িল।

কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে কি দেশীয় কি বিদেশীয় কোন ভাষ্যকারগণের প্রতি আমাদের ভক্তি কম আছে তবে গুরুর ভ্রম শিষ্যে না দেখাইলে জগতের উন্নতি হয় না এবং এই জন্য গুরুর ভ্রম দেখাইতে শিষ্যেরই অধিকার আছে। অন্য কাহারও সে অধিকার নাই। এই সকল ভাষ্যকারগণ পর পর বেদের অর্থ করিতে একে একে জীবন দিয়াছেন বলিয়া আজ আমরা ইহার সদর্থ করিতে যত্ন লইবার অধিকারী হইয়াছি।

(১৫) তু। Babylonean Tin-anna-Assyrian Dayna Sami-The Judge of

যমঃ পিতৃণাম্ অধিপতিঃ।

(অঃ বেঃ ৫।২৪।১৪)

এবং যম পিতৃগণকে সস্নেহে পালন করেন।

(১৬)

অত্র নঃ বিশ্পতিঃ পিতা পুরাণান্ অনু-বেনতি। (১০।১৩৫।১)

এক কথায় যমরাজ (স্বর্গের বিচারপতি) ৭ তক্ষকস্থ তারার অধিপতি এবং ভুরি পিতৃগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিত

যম-ধ্রুবতারা অটল ও অচল বলিয়া ইতিহাসমতে বিমাতা ছায়াদেবীর অভিসম্পাতে যমের এক পা কুষ্ঠরোগে খসিয়া পড়িয়াছে। যথা

পিতুঃপত্নীম্ অমর্য্যাদম্ যৎ মাম্ তর্জ্জয়সে পদা।
ভূমৌ তস্মাৎ অয়ম্ পাদঃ তব অদ্যৈব পতিষ্যতি॥

(মৎস্য পুরাণ ১১।২৯)

আবার ঐ দেখ সবোবরে ধর্ম্ম একপদে দণ্ডায়মান। (মহা ৩।৩৩১২)

আবার বেদমতে (৪।২৬।১) সূর্য্য ও ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্য "ইন্দ্র" উপাধি ধারণ করেন :—

অহং মনুঃ অভবম্ সূর্য্যঃ চ অহং...।

সুতরাং যম-সূর্য্যের প্রতিমাভূত যম-ধ্রুবতারায় যম-ইন্দ্র অধিষ্ঠিত আছেন।

এবার সপ্তর্ষিগণকে ইন্দ্রের বৃহৎ রথ সাজিতে হইল :—

যত্র রথস্য বৃহতো নিধানম্...। (৩।৫৩।৬)

এই বৃহৎ রথ (Long or Great Chariot) পাশ্চাত্যের একচেটিয়া নহে। (১৭) বেদে বহুস্থানে "বৃহৎ রথ" আছে।

তবে তর্ক উঠিতে পারে যে এই বৃহৎ রথ সপ্তর্ষিমণ্ডল না হইলেও পারে।

ভাল কথা। ঐ দেখ নহুষরাজ ইন্দ্রের (যম-ধ্রুব) সহিত ঐ রথে ভ্রমণ করিতেছেন।

অরাট্রে অক্ষো নহুষে সুকৃত্বনি সুকৃৎ স্ববায় সুক্রতুঃ। (৮।৮৬।২৭)

অতএব যমরাজকে ইন্দ্র নাম দেওয়া কষ্ট কল্পনা বা অতিরঞ্জন নহে। এবং ইন্দ্র বিশ্বভুক্ যুধিষ্ঠিররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না।

ইন্দ্র ভূতধামা—বায়ু বা রুদ্রদেব (ভীমসেন)।

মহাভারতমতে (১।১৯৭) ইন্দ্র-ভূতধামা ভীমসেন রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

বেদে (১০।১৬৮।২) বায়ুদেবকে "অস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এবং (৮।১১২০) ইন্দ্রকে রুদ্র বলা হইয়াছে। এবং (৮।১৩।২০) আদি বহুসূক্তে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ ওরফে রুদ্রগণকে ইন্দ্রের সহচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দেখিয়া শুনিয়া নিরুক্তকার ঋষি যাস্ক ইন্দ্রদেবকে মধ্যস্থান দেবতার শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইন্দ্রদেবকে বায়ুদেব অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইতি বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ নেতা মোক্ষমূলার ঐ সিদ্ধান্তের একান্ত বিরোধী। (১৮)

Heaven "which in the midst is bound." R. Brown.

(১৬) Babylonean Mar-gidda is described as "Rulei of the Ghosts."—R. Brown.

Zend : "Hoptoirenga, cntrusted with the gate and passage of Hell. "Avesta"

(১৭) ঐ। "Babylonean Mar-gidda-Long or great chariot."—R. Brown.

(১৮) "Now another god, Vayu, the wind, ... is often confounded with Indra —Max Muller,

এস্থলে বায়ুদেবকে ইন্দ্র না বলিয়া বায়ুদেবও অন্যান্য দেবগণের ন্যায় "ইন্দ্র" উপাধি ধারণ করেন—এই মীমাংসা মধ্যবর্ত্তী ভাবে করিলে বেদ ও নিরুক্তকার এবং ভাষ্যকারগণের সম্মান রক্ষা হয় এবং বিতর্ক শেষ হয়।

"ইন্দ্র-ভূতধামা ভূতেশ বায়ুদেব ভীমরূপে জন্ম গ্রহণ করেন," ইহাতে অতিরঞ্জন নাই।

তবে বায়ুদেব সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। বায়ুদেবের উগ্রমূর্ত্তি অসুর-ভাবাপন্ন।

ইন্দ্র-শিবি—বৃহস্পতি (অর্জ্জুন)।

মহাভারতমতে (১।১৯৭) ইন্দ্র-শিবি অর্জ্জুন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। একথা কাহার অবিদিত নাই যে বৃহস্পতি গ্রহের একটি নাম মনোজব অর্থাৎ অতি-দ্রুতগতিশীল। (১৯) বিষ্ণুপুরাণে প্রকাশ যে বায়ুমূর্ত্তি উগ্রদেব ও তৎপত্নী শিবাদেবীর সন্তান মনোজব বৃহস্পতি। (১।৮।১০) (২০) এবং হরিবংশ মতেও (৫।৩ ৪২) (২১) অনিলদেব ও তৎপত্নী শিবাদেবীর সন্তান মনোজব বৃহস্পতি।

শিবাপুত্র শিবি—বৃহস্পতিদেবই মৌলিক ইন্দ্র। অন্য দেবগণের ইন্দ্র উপাধি গ্রহণের কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ঋক্ বেদে (৫।৪৩।১২) এই গ্রহের বিম্বের যে বর্ণনা আছে তাহাও স্মরণ রাখা দরকার।

নীল পৃথ, বৃহৎ, উজ্জ্বল, (R) কণকবর্ণ, দীপ্যমান, এবং আরোচমান। যথা:—

আ বেধসম্ নীলপৃষ্টম্ বৃহন্তম্ বৃহস্পতিম্ সদনে সাধয়ধ্বম্। সাদৎ যোনিম্ দমে আ দীদিবংসম্ হিরণ্যবর্ণম্ আরুষম্ সপেম॥

জ্যোতিষমতে বৃহস্পতি গ্রহ পূর্ব্ব অর্জুনি ওরফে পূর্ব্ব ফল্গুনি নক্ষত্রের সন্তান। এজন্য ঐ গ্রহের নাম পূর্ব্ব ফল্গুনি ভব।

পূর্ব্বফল্গুনি ভব গ্রহকে ফাল্গুন বা অর্জুন বলা স্বাভাবিক বটে।

বলিতে কি বৃহস্পতিই মৌলিক ইন্দ্রদেব। এজন্য শতপথ ব্রাহ্মণে প্রকাশ যে ইন্দ্রের গুপ্ত নাম অর্জুন। (৪।৫।৭)

বৃহস্পতি পুরোহিত ও শুরশ্রেষ্ঠ। বৃহস্পতিই দ্বিবিধ চরিত্রবান্ বলিয়া এই গ্রহ ব্রহ্মদৈবত ও ইন্দ্রদৈবত।

ব্রহ্মাধিদৈবং সুর্য্যাস্যং ইন্দ্র প্রত্যভি-দৈবতং। মেধাবী মোক্ষমূলার ঠিক বলিয়াছেন যে ইন্দ্রনামক দেবতা আধুনিক ও ভারতীয় দেবতা সুতরাং খুব সম্ভবতঃ অনেক প্রাচীন ইতিহ এবং যাহা হয় ত অন্য দেববিষয়ক ছিল তাহাই ইন্দ্রে আরোপিত হইয়াছে।

But though Indra under this name was a more recent and peculiarly Indian god the possibility is by no means excluded that

---

(১৯) আকারে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতিগ্রহ ১৩০৯ গুণ বড়। কিন্তু ৯ ঘণ্টায় বৃহস্পতিগ্রহ একবার মেরুদণ্ড আবর্ত্তন করে এবং বৃহস্পতির বায়ু সতত প্রবল ঝটিকায় পরিণত থাকে।

(২০) শনৈশ্চরঃ তথা শুক্রঃ লোহিতাঙ্গঃ মনোজবঃ।

(২১) অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রঃ মনোজবঃ।

(R) তু। "Sometimes the belts, as the coloured bands are called, are of a pale bluish colour (W. Peck, 1890).

ধন্য ঋষিগণের চর্ম্ম চক্ষু !!!

some of the myths told of Indra were of earlier date, that they were told originally of some other god,

বেদপাঠেও আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্রদৈবত সূক্তগুলির অধিকাংশে বৃহস্পতির গুণ চরিত্র কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যথা—

(A) (ঋঃ বেঃ ১।২৩।১৪) পূষন্ দেব (পোষকদেব অর্থাৎ ধাতৃদেব) চিত্রবর্হিষ রাজাকে (বৃহস্পতিকে) গুহামধ্যে লুক্কায়িত পাইলেন

(a) ক্রোনসের পত্নী রীয়া পুত্রভক্ষক স্বামীর ভয়ে ক্রীট দ্বীপের লিক্‌টনস্থ গুহামধ্যে জিউস্ দেবকে গোপনে প্রসব করেন।

তু। (৪।২৭।১২) ইন্দ্রের পিতা ইন্দ্রকে গর্ভে বা জন্মমাত্র বিনাশের সংকল্প করেন (৪।১৮।৫) তিরস্কারের হেতু বোধে মাতা ইন্দ্রকে গুহা মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

(B) (৪।৫০।৪) পরম ব্যোমে মহঃ জ্যোতি হইতে সপ্তাস্য বলীয়ান্ সপ্ত রশ্মি বৃহস্পতি জন্ম গ্রহণ করেন।

(b) অর্কঃ (Arcas = the Little Bear) অর্থাৎ সপ্ত তারকময় ঋক্ষশাবক সপ্তশাবকময় বৃহৎ ঋক্ষ (the Great Bear) হইতে জন্মগ্রহণ করেন।

তু। (৩।৫।৫) ইন্দ্রও সপ্তশীর্ষ এবং সপ্তরশ্মি বটে।

(c) অর্কঃ (Arcas).

তাহার মাতার প্রাণনাশে সমুদ্যত হইয়াছিল।

তু। (৪।১৮।১) ইন্দ্রের জন্মকালে ইন্দ্র-জননীর প্রাণনাশের উপক্রম হইয়াছিল।

(D) শ্রুতবান্ (বৃহস্পতি) অক্ষি (ঋক্ষা পুত্র) নাম ধারণ করেন। (৮।৬৩।১৩)

(d) জিউস্ দেব লাইকেরিয়স্ নাম ধারণ করেন।

(E) পূষন্‌দেবের সুপনাম্নী ছাগী (অজ তারা = Capella) ছিল (১০।২৬।৬) পূষন্ দেব বৃহস্পতিকে রক্ষা করেন। (১।৪২।৫) এবং বৃহস্পতি অগ্নি (পূষন্) দেবের সকাশে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। (৮।৬৩।৪)

(e) এইজী (Aigi = Capella = অজতারা) জিউস্ দেবকে স্তন্যদানে পোষণ করেন। এই তারার ভগ্নী হেলিকী (Heliki) এই পোষণে এইজীর সহায়তা করেন। পুরস্কার স্বরূপে এইজী তারা রূপে ও হেলিকী বৃহৎঋক্ষ তারামণ্ডল রূপে স্বর্গে নীত হইলেন।

(f) জিউস্ দেব স্বীয় পিতাকে পরাভব ও বন্দী করেন।

তু। ইন্দ্র স্বীয় পিতাকে বধ করেন।

(৫।১৮।১২)

(G) বৃহস্পতি বজ্রী (১।৪০।৮)

(g) জিউস্ দেব বজ্রধর।

তু। ইন্দ্র বজ্রসহজন্মা। (১।৩১।৩)

(H) বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ রাজ। (২।২৩।১)

(h) জিউস্ দেবরাজ।

তু। ইন্দ্র রাজা (১।১০০।১) এবং ইন্দ্র সম্রাট্। (৪।১৯।২)

(I) বৃহস্পতি দেবগণের পিতা।

(২।২৬।৩)

(i) জিউস্ দেব দেবগণের পিতা।

(J) বৃহস্পতি জল দেব। (১০।৬৮।১২)

(j) জিউস্ দেব মেঘ সংহতি কারক।

তু। ইন্দ্র জল দেব।

(K) বৃহস্পতি সুধন্বা। (২।২৪।৮)

তু। ইন্দ্র সুধন্বা (১০। ১০৩। ৩) এবং ইষুহস্ত। (১০। ১০৩। ২)

(L) বৃহস্পতি সেনানায়ক। (২। ২৩। ১)

তু। ইন্দ্র সেনাপতি। (৩। ৩৪। ২)

(M) বৃহস্পতি প্রথমজ। (৬। ৭৩। ১)

তু। ইন্দ্র ঋষি পূর্ব্বজ। (৮। ৬। ৪১)

(N) বৃহস্পতি অঙ্গিরা বংশের শ্রেষ্ঠ।

তু। ইন্দ্র আঙ্গিরসগণের শ্রেষ্ঠ।

(১। ১০০। ৪)

উপরোক্ত তুলনায় সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে বৃহস্পতি দেব (গ্রীক জিউস্ দেব) ইন্দ্র উপাধি গ্রহণ করেন। এবং বেদপাঠে (৭। ৯৭। ৩) আমরা দেখি যে ব্রহ্মণস্পতি দেবকে ইন্দ্র সম্বোধন করা হইতেছে। এবং বেদে বহু স্থানে ইন্দ্রকে বৃহস্পতি বলা আছে (যথা ১০। ১০০। ৪; ১। ৬২। ৩) ইত্যাদি।

ইন্দ্র-শান্তি———বুধগ্রহ (নকুল)।

মহাভারতমতে (১। ১৯৭) ইন্দ্র-শান্তি নকুল রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

বেদমতে (৭। ৬৭। ১; ১০। ২৯। ১১) অশ্বিদ্বয় (বুধ ও শুক্র গ্রহ) রাজা এবং (৮। ৯। ১১) পশ্বাদি জীবপালক। এবং অশ্বিদ্বয় (১। ১১২। ১৩) নিয়ত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং (৪। ৪৫। ৬) তাহারা সূর্য্যের পথ-বিজ্ঞাপক। অশ্বিদ্বয় (১। ৪৬। ১৩ সূর্য্যের সহবাসী এবং তাহারা (১। ৩৫। ৩) সূর্য্যের সহচর। এজন্য অশ্বিদ্বয় রুদ্রের (= সূর্য্যের) (৫। ৭৩) সহচর বলিয়া "রুদ্র" খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অশ্বিদ্বয়—প্রাতে ও সায়ং কালে (১০। ৩৯। ১) উদয় হয় এজন্য উহারা প্রভাতী ও সন্ধ্যাতারা নাম পাইয়াছে।

অশ্বিদ্বয়ের "মধুকশা" সুবর্ণময়—(অঃ বেঃ ৯। ১)।

অশ্বিদ্বয় রাজা বলিয়া ইন্দ্রনাম ধারণ করেন।

এবং ইন্দ্র বুধ (৮। ৮৫। ১৩) অস্তগামী সূর্য্যের অনুগমন করেন। এবং বুধ—প্রহর্ষণ গ্রহের (২২) "হিরণ্য কশা" (৮। ৩৩। ১১) ইন্দ্রদেব হস্তে লইয়াছেন। আবার (৮। ২২। ১০) অশ্বিদ্বয় প্রভাত ও সায়ং কালে উদিত হইলে সর্ব্বজীবগণ আনন্দ হৃদয়ে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করে (অঃ বেঃ ৯। ১। ১) প্রাতঃ সমীরণ ও সন্ধ্যা সমীরণ শান্তিপ্রদ এজন্য "সৌম্য" গ্রহ শান্তমূর্ত্তির আধার। ঐ দেখ হেমবেত্র-ধারী নন্দী দেব শান্তি রক্ষা করিতেছেন।

(কুমারসম্ভব ৩। ৪১) (২৩)

অতএব ইন্দ্র-শান্তি দেব নকুল রূপে জন্ম গ্রহণ করা অতিরঞ্জন নহে। (২৪)

ইন্দ্র-তেজস্বী—শুক্রগ্রহ (সহদেব)।

মহাভারতমতে (১। ১৯৭) ইন্দ্র-তেজস্বী সহদেব রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

তারাজগতে "শুক তারা" জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

"Fairest of stars, last in the train of night"—(Milton)

সুতরাং "শুক তারার" তেজস্বী নাম

তারাদর্শক জানেন যে সূর্য্যের নিকটস্থ

(২২) পৌরাণিক নন্দী।

(২৩) লতা গৃহ দ্বার গতঃ অথ নন্দী বাম-প্রকোষ্ঠাপিত হেম বেত্রঃ।

(২৪) "উবাচ চ স্বপিতরম্ কুণ্ডঃ অয়ং স্বৈরিণী-সুতঃ"—পাদ্মে ৫।৬১

হইলেই জ্যোতিষ্কমাত্রেই তেজহীন হয় কেবল শুক তারা, গ্রহ যখন সূর্য্য হইতে সুদূরে উপনীত হইয়া আবার সূর্য্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে তখনই শুক্র বিম্ব ক্রমে ক্রমে পরম জ্যোতিষ্মান হয়। (২৫)

অতি গৌরবের কথা যে বৈদিক বামদেব ঋষি এই জ্যোতিবিক তত্ত্ব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন (৪।১৬।২৪) সূক্তটি ইন্দ্রদৈবত।

সূরঃ উপাকে তন্বং দধানঃ বি যৎ তে চেতি অমৃতস্য বর্পঃ।

অন্বার্থঃ

সূর্য্যের সমীপে—(তোমার) শরীর ধারক যখন হও, (তখন) তোমার অমৃতময় রূপ বিস্তৃত হইতে থাকে (সায়ন)।

Translation by Prof Griffith :—

"What time thou settlest near the sun thy body thy form immortal one, is seen expanding." (২৬)

বেদ মতে (৪।২৬।১) ইন্দ্রই বলিতেছেন "আমিই উশনা"। এজন্য মহর্ষি বামদেব শুক্রগ্রহের ঐ আশ্চর্য্য দৃশ্য ইন্দ্রে আরোপ করিয়াছেন। এবং বামদেব মতে শুক্রগ্রহ দেবরাজ ইন্দ্রের একটি রূপ অর্থাৎ শুক্রগ্রহ "ইন্দ্র" উপাধিধারী।

চতুর্থ মণ্ডলের ১৬ ও ২৬ উভয় সূক্তের ঋষিই বামদেব।

আবার শুকতারা স্বর্গের শ্রী এজন্য শুক্র গ্রহের পুরুষ প্রকৃতি উভয় মূর্ত্তির অধিদেবতা ও প্রত্যভিদেবতা ইন্দ্র ও শচী।

ইন্দ্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী প্রত্যভিদৈবতং।

অতএব ইন্দ্র-তেজস্বী শুক্রগ্রহ মানব ভৃগু সন্তান হইয়াও বেদে উশনা দেব নামে অঙ্কিত (১।৫১।১০) বলিয়া সহদেব নামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে অতিরঞ্জন নাই।

অতঃপর আমরা এক এক করিয়া পরে পাণ্ডবগণের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

তারাদর্শক।

---

(২৫) "Each evening it travelled further and further away from the solar orb till it reached a certain distance from him It then began gradually to approach the sun, becoming at the same time brighter and brighter till it finally travelled so close to him as to become lost in his brilliant rays."—W. Peck.

(২৬) গ্রিফিথ সাহেব ঠিক অনুবাদ করিয়াছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "পাক দেন এলো।" যথা .—"a poetic explanation of an eclipse of the sun.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভায়

রবীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ।

গত ভাদ্র মাসে ছাত্রসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় এই সভার সভাপতিস্বরূপে কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় সেগুলির সম্যক্ আলোচনা ও বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে ছাত্রজীবন যে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবহুল তাহা ত সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। যে যে উপাদানের সাহায্যে ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি গঠিত হয়, তাহা ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে সুখলভ্য নহে। এজন্য দেশীয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে পাশ্চাত্য-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হইতেছে। তাহার ফলে ফুটবল ও ক্রিকেট, সন্তরণ ও সমিতি, বক্তৃতা ও অভিনয় প্রভৃতি প্রসার লাভ করিতেছে। এগুলি যে একেবারেই পরিত্যাজ্য তাহা বলিতেছি না। যাহা কিছু শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে অনুকূল, ছাত্রজীবনে তাহারই প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এগুলি ছাত্রজীবনের পরিধিমাত্র স্পর্শ করে, ইহার আভ্যন্তরীণ সজীবতা ও পূর্ণতা প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং এইগুলির ব্যবস্থা করিলেই শিক্ষাসমস্যার শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবনকে সরল করিতে গিয়া যতদূর সম্ভব জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। হয় ত সে অতিরিক্ত হিতৈষণার ফলে ছাত্রজীবন ক্রমশঃ দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। ছাত্রজীবনে যে সকল বস্তুর একান্ত প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, অবসর, ও স্বাধীন চিন্তা—সেগুলিকে বর্ত্তমান শিক্ষানীতি অনুসারে যথাসম্ভব দূরে রাখিবার জন্যই বিধিমত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত জ্ঞানলালসা যাহাতে প্রাণে জাগিয়া উঠে, তাহার সুব্যবস্থা করাই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য। কল্পনা ও কৌতূহল না জাগাইতে পারিলে, শুধু স্মৃতিশক্তির উপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত, তাহা কখনও ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্যকর প্রভাব সঞ্চারিত করিতে পারে না। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন ও পরীক্ষার পৌনঃপুনিক ব্যবস্থা করিলেই সমস্ত দায়িত্বের অবসান হইল, ইহা মনে করা যায় না।

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষত্ব-লাভ ও অনুসন্ধিৎসা-পরিচালন। উচ্চশিক্ষা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে শিক্ষার্থীর মন কোনও বিষয়বিশেষের দিকে সহজে প্রেরিত হইয়া তাহারই ঐকান্তিক অনুশীলনে স্বাতন্ত্র্য ও সফলতা লাভ করিতে পারে। কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ প্রাণিতত্ত্ব, কেহ বা অর্থনীতিতে মনোনিবেশ করিবেন, এবং তাহাতেই জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন, ইহারই নাম বিশেষত্ব-লাভ। বিশেষত্বলাভ করিতে হইলে অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে অধ্যবসায় ও বিচারের সহিত পরিচালিত করিতে হয়। অন্যে যাহা বলিতেছে বা করিতেছে, তাহারই যথাযথ অনুসরণ করিলে চিত্তবৃত্তি-বিকাশের স্রোত অচিরে বাধাপ্রাপ্ত ও শুষ্ক হইয়া উঠে। অথচ এই অনুকরণই বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অবলম্বন। পরকীয় যুক্তি, পরকীয় নীতি কোনও প্রকারে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অধিগত করিতে পারিলেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এইরূপে আমাদের মানসিক উর্ব্বরতা ও সর-

সতা যে সত্বরই বিনষ্ট হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রতিকূল স্রোতকে প্রতিরুদ্ধ করিতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন :—

(১) মাতৃভাষার শক্তিসঞ্চয়।

(২) স্বাভাবিক বিষয় নির্ব্বাচন।

প্রথমটি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শিশুর পক্ষে যেমন মাতৃস্তন্যাপেক্ষা হিতকারী কোনও পথ্য নাই, মনোবিকাশের পক্ষে সেইরূপ মাতৃভাষার অপেক্ষা স্বাভাবিক এবং হিতকর কোন পন্থা নাই।

দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা লাভ করিতে হইলে বিষয় নির্ব্বাচন-ক্ষমতা আবশ্যক। মানুষের মন সকল বিষয়ে সমানভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণতঃ ছাত্রগণ অত্যন্ত স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে এই নির্ব্বাচনশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ সামান্ত নির্ব্বাচনও অনেক সময়ে অন্যের প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইতিহাস কিম্বা অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহা অনেক সময়ে বিষয়ের গুরুত্ব, সম্মানের তারতম্য, পরীক্ষার প্রশ্নের কাঠিন্য, পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য ইত্যাদি বিচার করিয়াই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সুফলের আশা স্বভাবতঃই সুদূর-পরাহত। সেই নির্ব্বাচনই স্বাভাবিক যাহা এই সকল অবান্তর চিন্তার উপর নির্ভর না করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক অনুশীলনের ফলে সংঘটিত হয়।

আমাদের দেশ এখনও যে শিক্ষায় জগতের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহার কারণ এই যে আমরা এখনও অতীতের মোহ এড়াইতে পারিতেছি না, এবং বর্ত্তমান শিক্ষা এবং সভ্যতাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইতে পারিতেছি না। সেই জন্য আমাদিগকে এখনও পল্লবের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। এই পল্লবরাশি অতিক্রম করিয়া যেদিন ফলের আস্বাদে অধিকারী হইব, সে দিন এ দেশের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। ইয়ুরোপীয় শিক্ষাপ্রণালী চিরকাল এমনটি ছিল না। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন চিরাচরিত প্রথার অনুবর্ত্তনেই নির্ব্বাহ হইত। বার্লিণের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্ট হইল, এবং তাহার ফলে ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষার আস্বাদন লাভ করিয়া যশস্বী হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণ হইতে লাগিল। ইয়ুরোপে শিক্ষার যুগ এমনই ভাবে ফিরিয়া গেল। জর্ম্মণী তখন নেপোলিয়নের বিপুল বিজয়নিশানের নিম্নে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিল, যখন ইহার সভ্যতার ইতিহাসে এই যুগপরিবর্ত্তন ঘটে। এখন জর্ম্মণী জগতের শিক্ষাগুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকা জর্ম্মণীকে, এবং জাপান জর্ম্মণী ও আমেরিকাকে অনুকরণ করিতে ব্যস্ত। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশও অনুসন্ধিৎসামূলক শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রভূত ফল লাভ করিতেছে। আমরাই কি শুধু পড়িয়া রহিব?

যে প্রসঙ্গে বর্ত্তমান শিক্ষানীতির আলোচনার অবতারণা করিয়াছি—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রশাখা—তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি। সাহিত্য-পরিষৎ

যে একটি ছাত্রশাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতিপয় ছাত্রকে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে সাহিত্য-ইতিহাসাদির আলোচনায় সহায়তা করিতেছেন, ইহা হয় ত অনেকের নিকট সুপরিচিত নহে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় ছাত্রগণকে সাহিত্য-পরিষদের সহিত কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহাতে ছাত্রগণ দেশের সাহিত্য-শিল্পেতিহাসে শ্রদ্ধাবান হইয়া তাহার হিতকল্পে কর্ম্ম করিতে এখন হইতে শিক্ষা লাভ করেন, এই উদ্দেশ্য লইয়া ছাত্রসভা জন্ম গ্রহণ করে। পরিষৎ ছাত্রসভ্যগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন না। বাল্যকাল হইতে সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃত কর্ম্মশীল, দেশপ্রাণ-সাহিত্য-সেবিগণের উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করিতে পারা ছাত্রজীবনের একটি বিশেষ গৌরবের সামগ্রী বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ ছাত্রশাখার সংগঠন করিয়া ছাত্রগণকে যে শুভসুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ দেশে এরূপ আরও অনেক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। যদি শিক্ষার সংস্কার কখনও করিতে হয়, তবে ছাত্রজীবনের মূলভিত্তিকে স্পর্শ করা চাই। দেশের বস্তু, দেশের ইতিহাস, দেশের কথা, দেশের ছড়া, প্রথম হইতে না জানিতে অভ্যাস করিলে, পরে সে অভ্যাস হওয়া বড়ই কঠিন। এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা চিরদিন রক্ষা করিবার যোগ্য। এইজন্যই আমি তাহার সেই অভিভাষণের সারমর্ম্ম সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত সুখবিন্দু সেনগুপ্ত (এক্ষণে পরলোকগত) কর্ত্তৃক "বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার মন্তব্য সহ ছাত্রদিগের পুরস্কার ঘোষণা করেন।

ছাত্রসভায় রবীন্দ্রবাবুর প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

ছাত্রসভার গঠনের পর কয়েক বৎসর যেরূপ কার্য্য দেখিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছিল যে ছাত্রসভা বেশী দিন টিকিবে না। কিন্তু সে দুর্ভাবনা এবৎসরের কার্য্য দেখিয়া মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। মুমূর্ষু ছাত্রসভা কয়েকজন সুবিজ্ঞ বৈদ্যছাত্রের * সুচিকিৎসায় পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি সকল ছাত্রসভ্যেরা এইরূপ উদ্যমের সহিত কার্য্য করিয়া এই ছাত্রসভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে বয়োপ্রাপ্ত সভ্যগণের নিকট হইতে বিশেষ দুরূহ কার্য্য উদ্যমের সহিত করিবার প্রত্যাশা করা যায় না; কারণ তাঁহারা প্রায় সকলেই বিষয়-কর্ম্মাদিতে ব্যস্ত। এ কৈফিয়তে আমি সম্পূর্ণ অভিমত দিতে পারি না, কেন পারি না তাহার কারণ এই, যে বিষয়ে আমাদের অনুরাগের স্রোত বাল্যকাল হইতে চলে নি, সে বিষয়ে বৃদ্ধবয়সে হঠাৎ অনুরাগ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। আমাদের শিশুকালে যে বিদ্যার্জ্জন হইয়াছে, তাহাতে স্বদেশের

* ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি, এ, সুখ বিন্দু সেন গুপ্ত বি, এ, শশিকান্ত সেন, রাখাল দাস কাব্যতীর্থ এবং কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি, এ, গত বৎসরের কার্য্যের জন্য সাহিত্য-পরিষদের পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বৈদ্যবংশসম্ভূত।

ভাষা ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা শিক্ষা হয় নাই, সেই জন্য বৃদ্ধবয়সে সে দিকে অনভ্যাস হেতু মন যায় না। ‘আমাদের আজকালকার শিক্ষা, অন্তরূপ, আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ বিশদভাবে জানি এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষয়ই জানি, কেবল বঙ্গদেশের, নিজের দেশের কিছুই জানি না। এর সম্পূর্ণ দোষ আমাদের নহে—আমাদের অভিভাবক ও বিদ্যালয় যে দিকে আমাদের লইয়া গিয়াছেন, আমরা সেই দিকেই গিয়াছি। সেই জন্য আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। এই অভাবটা নিজের ভিতর অত্যন্ত অনুভব করে’ আমি এই ছাত্র সভা-গঠনের কথা পাড়ি; কারণ ছাত্রগণের এই দিকে অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে পারিলে এবং এই ছাত্রসভাটি বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঠিক কাযটা, প্রকৃত উদ্দেশ্যটা ইঁহাদের দ্বারাই ভবিষ্যতে সুসম্পন্ন হইবে।

কাল বদলাইয়া গিয়াছে; এখন ছাত্রেরা গৌরবের সহিত দেশের ভাষা ইত্যাদি আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমন সময় ছিল যে দেশের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা, প্রাদেশিক বা গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ করা, ছড়া এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা, ইত্যাদি কায প্রায় সকলেই লজ্জাজনক মনে করিতেন। যাহা হউক, সেই পুরাণো ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের আজ দেশের সকল বিষয়েই অনুরাগ জন্মিয়াছে। আশা করা যায় যে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত এই সকল কায করিবেন। বড়ই সুখের বিষয় যে এই সুসময়ে ছাত্রসভা পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে, দক্ষিণ বাতাসে নব কিসলয়গুলি

বাস্তবিক ছাত্রসভা-গঠনের প্রস্তাবের সময়, আমার মনে এই ছিল যে সাহিত্য-পরিষদের ও ছাত্রসভার উৎপত্তির সহিত একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি গঠিত হইবে। অন্য অন্য বিদ্যালয়ের পাশ করা, চাকরি করা বা অন্য কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য; কিন্তু আমাদের এখানে দেশের বিষয় আলোচনা করিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত করিব, তাহার অন্য প্রলোভন নাই। এখানে দেশের সহিত এমন নিভৃত বিশ্রব্ধ পরিচয় লাভ করিতে পারিব যে তাহা হইতে আমাদের জীবন এক নূতন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এক অভিনব শক্তির আবির্ভাব হইবে। আমার মনে হয় এইখানে আমরা একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বপন করিতেছি। বস্তুতঃ আমার মনে এমন একটি আশা জাগিতেছে, বেশ বুঝিতেছি যে একটি সাধনা আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদের এই ক্ষীণ আরম্ভ হইতে একটি বিশাল ব্যাপার সংঘটিত হইবে, ইহা হইতে একটি বহু বিস্তৃত ব্যাপকতা পাওয়া যাইবে এবং সাহিত্য-পরিষদের সফলতা ভবিষ্যতে বিশেষরূপে সম্পূর্ণ হইবে।

সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভ্যদের সকলেরই যে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে এমন আমার বোধ হয় না। অনেকেই দায়ে পড়িয়া সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু আজ এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনে তাঁহাদের উৎসাহ ও চেষ্টা আছে—তাঁহারা অল্পসংখ্যক হইলেও তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক ভাল কায সাধিত হবে এরূপ আশা করা যায়।

অবশ্য এরূপ আশা করা যায় না যে উপস্থিত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে সকলেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া পুস্তক লিখিতে পারিবেন। এরূপ চেষ্টা অনেকেরই হয় ত আকাঙ্ক্ষা বা দুরাশাকে জাগাইয়া তুলিবে। কিন্তু এরূপ কায আছে যাহা অল্প অল্প করিয়া প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিতে পারেন, যেমন অভিধানের এক একটি অংশ যদি এক এক জন ভাগ করিয়া ল'ন, অথবা কেহ কবিকঙ্কন কেহ বা চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি পড়িয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা শব্দের Concordance শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া ফেলা যায়। এমন বৃহৎ কাযটাও অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে সহজে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

এইরূপ আর একটি কায—অনুবাদ। বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে উন্নত ও সুন্দর ভাবপূর্ণ স্থানগুলি অনুবাদ করিলে বঙ্গসাহিত্যের অনেক উপকার হইতে পারে। ছাত্রসভ্যেরা এই কাযটির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ সংস্কৃত, কেহ পালি, কেহ ইংরেজি, কেহ অন্য কোনও বৈদেশিক ভাষা হইতে অনুবাদ কার্য্যের ভার লইতে পারেন। এবং এরূপ কার্য্যও কোনো কোনো ছাত্রসভ্যের বিশেষ রুচিসঙ্গত হইতে পারে।

আর একটি কায যেটা অনায়াসসিদ্ধ সেটি পুঁথি-সংগ্রহ। কেবল পুঁথিসংগ্রহ কেন বঙ্গদেশের মিউজিয়ম-সংস্থাপন এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পারে। ছাত্রসভ্যেরা ইচ্ছা করিলেই বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে এমন কি নিজ নিজ গ্রাম হইতে, জেলা হইতে এই মিউজিয়ম-স্থাপনের উপযোগী নানারূপ বস্তু সংগ্রহ করিতে পারেন। মুদ্রা ঘট ইত্যাদি বহুবিধ শিল্পকার্য্যাদি, নানারূপ পণ্যজাতদ্রব্যাদি—যাহা বিশিষ্টরূপে বঙ্গদেশের—এ সকলই সংগৃহীত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক জন্তু বা উদ্ভিদের নিদর্শনস্বরূপ এক একটি উদাহরণ সংগ্রহও করা যাইতে পারে।

যাঁহাদের শব্দতত্ত্বসম্বন্ধে রুচি আছে তাঁহাদের উচিত পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে বৈদেশিক মহাপণ্ডিতদের দুই একখানি গ্রন্থ পড়িয়া লওয়া; ইহাতে কাযের অনেক সুবিধা হইবে। তাঁহারা ভাষা আলোচনা করিতে যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথে বঙ্গভাষাকে মনে রাখিয়া চলিলে অনেক সহজে অনেক নূতন কায করা যাইতে পারে। এইরূপে তুলনামূলক ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে এবং বঙ্গভাষার উচ্চারণ-তত্ত্বের মীমাংসা আরও অনেক দূর লওয়া যাইতে পারে। আমাদের মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে অনেক কথা বলিতে পারেন। আমি শব্দতত্ত্ব লইয়া শব্দের কেবল প্রথম অক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় পাইয়াছিলাম; অধ্যবসায়ের সহিত কিছুদিন কার্য্য করিলে শব্দের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি অক্ষরের সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হইবে। উচ্চারণ সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা আছে। অনেকে বলেন বাংলা ভাষায় হ্রস্বদীর্ঘ নাই—একথা বলার কেবলমাত্র তাৎপর্য্য এই যে হ্রস্বদীর্ঘ সম্বন্ধে আমরা সংস্কৃতের অনুকরণ করি না। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি—যেমন দুই অক্ষরের শব্দের শেষ অক্ষর হসন্ত হইলে তৎপূর্ব্বের অকার বা আকার দীর্ঘ উচ্চারিত হয়—যথা বন, মন, মান, বাণ ইত্যাদি। কিন্তু যদি শেষ অক্ষরটি

স্বরান্ত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বের স্বর হ্রস্ব হয় যথা—বাণী, মানা ইত্যাদি।

আর একটি বিষয় আছে যাহা এখনও কেহ ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই—যেটা ছন্দ। অনেকে মনে করেন না যে বাঙ্গলা ছন্দের কোনো বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সেটি ভুল ধারণা। এইরূপ বিষয়ে সকলে একত্র হইয়া সমালোচনা করিলে সময়ে অনেক কায হইতে পারে। এমন অনেক কায আছে, যাহা করে' গেলেই অনেকটা সিদ্ধ হয়, তাহাতে মনের বিশেষ শক্তির দরকার হয় না। এরূপ কায করিলে সকলে দৈনিক কাযের মত অল্প অল্প করিয়া করিলেই সময়ে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

সংগ্রহযোগ্য আর একটি বিষয়—যাহা অনায়াসে হইতে পারে তাহা এই, বঙ্গদেশের ছোট বড় নগর ও সহর এমন কি অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক, কতকগুলি পুরাতন। সেইগুলির সম্বন্ধে ছোট ছোট ইতিহাস এখন হইতে সংগ্রহ করিলে ভবিষ্যতে ইতিহাস-লেখকের অনেক সুবিধা হইবে। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও সহরের সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর বিবরণ এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী যদি এখন হইতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা হইতে পরে অনেক উপকার পাওয়া যাইবে।

আর একটি বিষয়—যেটা আমার বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নূতন ধর্ম্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ করা। মফস্বলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে হয় ত পল্লীর নিভৃত ছায়ায় কোনো ব্যক্তি এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠন করিতেছেন। তাঁহারা ভদ্রসমাজে বিশেষ পরিজ্ঞাত নহেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে তাঁহারা কি বলিতে এসেছেন, কি বল্‌ছেন এটা জানা উচিত, এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মমত প্রচলিত হইতেছে, অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে যে সকল শক্তি সমাজের মধ্যে কায করিতেছে, তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। আমি এইরূপ একজন ধর্ম্মপ্রচারকের বিষয় কিছু জানি—তাঁহার নাম লালন ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দুপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ শুনা যায় যে তাঁহার বাপ মা তীর্থযাত্রা-কালে পথিমধ্যে তাঁহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময়ে একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মতসকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে এ বিষয়ে সকলেরই মন দেওয়া উচিত।

আমাদের আলোচ্য আর একটি বিষয়—বৈজ্ঞানিক। গুরুতর বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কথা বলিতেছি না, ছোটখাটো বিষয় দৈনিক জীবনে যাহা প্রায়ই আমাদের চক্ষে পড়ে। পল্লীগ্রামে এমন অনেক গাছ আছে বা পাখী আছে যাহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা কিছুই জানে না। আমি বলি এইরূপ কত গাছ আছে, পাখী আছে তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক, এ বিষয়ে ছাত্রসভ্যেরা অনায়াসেই অনেকটা কায করিতে পারেন। এইরূপে একটা মিউজিয়ম স্থাপিত করিতে পারিলে দেশের বিশেষ লাভ হইবে। এমন অনেক গাছ বা পাখী আছে যাহা

ক্রমেই লোপ পাইতেছে কেহই তাহার খোঁজ রাখে না। একটি মিউজিয়ম স্থাপিত হইলে এই সকল উপকরণ তাহাতে সংগৃহীত হইতে পারিবে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা দেশে থাকিয়াও দেশের বিষয় কিছুই জানি না। আমাদের দেশে বাহ্যজগতের সহিত আমাদের কোনো যোগ নাই—আমরা যেন কেবলমাত্র চণ্ডীমণ্ডপের লোক। বস্তুতঃ আমাদের এইরূপ অজ্ঞতা স্বদেশের প্রতি আমাদের অনুরাগকে বড়ই সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে। দেশের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে যাঁহারা সাহায্য করিবেন প্রকৃতই তাঁহারা দেশের একটি ভাল কায করিবেন। প্রাচীনেরা যে বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত আছেন বা অবকাশ নাই বলিয়া এ বিষয় কিছু করিতে পারেন না তাহা আমি বলি না, আমি বলি আমাদের অভ্যাস নাই বলিয়া আমরা এ কার্য্য করিতে পারি না। দেশের কায করিতে বাস্তবিকই ইচ্ছা আছে, কায করিতে পারি না বলিয়া লজ্জাও অনুভব করি। বিশেষ যখন নব্য ইংরেজ বালক এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ভূরি ভূরি তত্ত্ব নির্গত করেন তখন আমাদের লজ্জার অবধি থাকে না। আমাদের অক্ষমতা অনভ্যাস হেতু। এই জন্যই বলি যদি ছাত্রসভ্যেরা এখন হইতে দেশের দিকে—চারি দিকে—দেশের মাটীর দিকে—এখন হইতেই দেখিতে শেখেন, তাহা হইলে বয়স হইলেও এইরূপ অনুরাগ থাকিয়া যাইবে।

আমার নিজের এ বিষয় কিছু করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া বিশেষ লজ্জা বোধ হয়। আমি আমার বয়সের অনেকটা অংশ ত্যাগ করিতে রাজি আছি যদি আপনাদের সহিত এইরূপ কাজে এইরূপ নবীন উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে পারিতাম। বাস্তবিক খগেন্দ্র বাবুর * প্রতি আমার অল্প অল্প হিংসা হয়, খগেন্দ্র বাবুর এই উৎসাহপূর্ণ কার্য্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাবলী ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতেই উৎপন্ন হয়। অনেক বড় বড় জিনিষ অপেক্ষা এইরূপে দেশের সাহায্য করা বেশী গৌরবের জিনিষ বলিয়া মনে করি। †

প্রার্থনা।

যদি　তোমার দেখা না পাই প্রভু
　　　এবার এ জীবনে,
তবে　তোমায় আমি পাইনি
　　　যেন সে কথা রয় মনে,
যেন　ভুলে না যাই বেদনা পাই
　　　শয়নে স্বপনে।
　এ সংসারের হাটে
　আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দুহাত ভরে উঠে ধনে,
তবু　কিছুই আমি পাইনি
　　　যেন সে কথা রয় মনে;
যেন　ভুলে না যাই বেদনা পাই
　　　শয়নে স্বপনে।

* ছাত্রসভার সম্পাদক।

† ভূতপূর্ব্ব ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম্, এ. রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।—বঃ দঃ।

যদি আলস ভরে
আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

বিদ্যাসাগরের পুস্তকাগার।

৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুস্তকাগার বাঙ্গালীর পক্ষে একটি গৌরবের বিষয়। তাঁহার আজন্মসঞ্চিত বহুব্যয়ে বাঁধা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক্, ল্যাটিন্, ফরাসী ও বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থরাশি আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু অর্থ রাখিয়া গেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রেরা এই পুস্তকাগার রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ইহা আপাততঃ কয়েক সহস্র টাকায় বন্ধক পড়িয়াছে। মহারাজা সার্ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর নাইট্ বাহাদুর এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় যাহাতে উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের যত্নসঞ্চিত পুস্তকগুলি দেনার দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন, দেনায় বিক্রীত না হইলেও ইহা বিক্রয় করা ব্যতীত ইহাকে রক্ষা করাও অসম্ভব, কারণ ইহা বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উইলের দানের কয়েক সহস্র টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মহারাজা ও সারদা বাবুর যত্নে সেদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি পরামর্শ-সভা বসিয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য একটি সমিতি হইয়াছে, তাহার সভাপতি হইয়াছেন মহারাজা নিজে, আর সম্পাদক হইয়াছেন —সারদা বাবু। পুস্তকরাশির বর্ত্তমান মূল্য কি হইতে পারে এবং কি উপায়ে বন্ধকের দেনা শোধ হইতে পারে তাহা নিরূপণ করাই এই সমিতির কার্য্য। মাতামহের এই প্রিয়বস্তুগুলি রক্ষার্থে শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিশেষ যত্ন লইতেছেন। পুস্তকাগারে আপাততঃ সর্ব্বপ্রকার ৩৫০০ পুস্তক ও ৩০০ পুঁথি আছে। পুস্তকগুলি আপাততঃ আধারসমেত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

বৈদিক দেবতা ত্রিত।

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির (প্রাচ্যতত্ত্ব-সভা) এপ্রেল ও মে মাসের পত্রিকা এই সেদিন বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে এপ্রেলের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনের 'ঋগ্বেদের নায়ক দেবতা' (The Hero Gods of the Rigveda) নামক প্রবন্ধে এবার 'ত্রিত'

নামক দেবতার পরিচয়কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই প্রবন্ধে নানারূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈদিক দেবতা ত্রিত একজন সেই যুগের রাজা ও বৈদিক ধর্ম্মোপাসক ছিলেন। ঋগ্বেদের নানাস্থানের ঋকে তাঁহার এই মনুষ্যত্বের যেমন প্রমাণ আছে, তেমনি নানা ঋকে আবার তাঁহার দেবত্বও অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত আছে। তিনি আকাশদেবতা, মেঘবজ্রবৃষ্টির অধিদেবতা এবং তিনি যে সকল প্রসিদ্ধ বীরকার্য্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া মহিমান্বিত হইয়াছেন, অবশেষে সেই সকল কার্য্য ইন্দ্র দেবতায় অর্পিত হইয়াছে। যেখানে যেখানে তাঁহার মনুষ্যত্ব-প্রতিপাদক ঋক্‌গুলি পাওয়া যায়, সেই সেই খানে যাস্ক এবং তাঁহার পথানুবর্ত্তী সায়ণ তাঁহাকে 'রাজর্ষি' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবত্ববাচক ঋক্‌গুলির ব্যাখ্যাস্থলে সায়ণ 'ত্রিত' শব্দকে "ত্রিলোকবাসী" এই অর্থে বিভিন্ন দেববাচী বিশেষণ শব্দরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ত্রিত দেবতার উদ্দেশ করিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা সকলেই নানারূপে চেষ্টা করিয়াছেন। অম্বিকা বাবুও তন্মধ্যে একজন। তিনি ত্রিত দেবতার মনুষ্যত্ববাচী ও দেবত্ববাচী ঋক্‌গুলি সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্য হইতে এক ঘটনা, বিষয় ও মহিমা বর্ণনাত্মক ঋক্‌গুলি একত্রিত করিয়া অপরাপর পণ্ডিতের মত সমালোচনা করিয়া স্বীয় মীমাংসা নিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুন্দর গবেষণাপূর্ণ এবং দীর্ঘ; প্রায় ১৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। তিনি এই প্রবন্ধে একে একে ত্রিতের মনুষ্যত্ব, তাঁহার অঙ্গিরা গোত্রে উৎপত্তি, তাঁহার বিপদে বৃহস্পতি দেবতার সাহায্য, তাঁহার 'আপ্ত্য' আখ্যার বিবরণ, তিনি সোম-প্রস্তুতকারক, তাঁহার প্রস্তুতীকৃত সোমের প্রশংসা, তৎকর্ত্তৃক ইন্দ্রাদি দেবতাকে, অসুর ও দানব যুদ্ধকালে সোমোৎসর্গ, সোমযাজীদিগের তিনি ও বিবস্বান্ অতি প্রাচীন, তাঁহার ইন্দ্রোপাসনা, তাঁহার অগ্ন্যুপাসনা, তাঁহার অশ্বমেধ, তাঁহার নরমেধের কথা, তাঁহার দেবত্ব, তৎকর্ত্তৃক বৃত্র-পরাজয়, তৎকর্ত্তৃক পণি-পতি-বল-পরাজয়, তাঁহার যজ্ঞসকলে ও যুদ্ধে মরুদ্‌গণের পৌরহিত্য ও সাহচর্য্য, ত্রিত কর্ত্তৃক অন্তরীক্ষ অধিকার, ইন্দ্রকর্ত্তৃক ত্রিতের পরাজয় ও অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহাকে দূরে নির্ব্বাসন, তৎকর্ত্তৃক বিবস্বান্ ও যমের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে অগ্নি আনয়ন ও সকলের গৃহে গৃহে স্থাপন—প্রভৃতি ঘটনা সম্বন্ধে বহুতর ঋক্ সংগ্রহ ও তাহার বিচার করিয়াছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ পারসীকদিগের অবেস্তা শাস্ত্র হইতেও এই সকল ঘটনার সদৃশ বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। অবেস্তা শাস্ত্রেও ত্রিতের উল্লেখ আছে এবং তাহাতে ত্রিতের কার্য্যাবলীর সহিত বৈদিক ত্রিতের সৌসাদৃশ্য আছে। সেন মহাশয় যে এই বিষয়ে এই প্রথম প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহা নহে। বৈদিক দেবতা ও বৈদিক যুগের ইতিহাস লইয়া তিনি এবং পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বহুকাল ধরিয়া গবেষণা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অম্বিকা বাবুর প্রবন্ধগুলি তাঁহার মাতৃভাষায় লিখিত নহে। উমেশ বাবু বাঙ্গলাতেই লেখেন। আশা করি, এই সকল প্রবন্ধের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের শিক্ষানবীশ ছাত্রেরা নিজেদের এবং মাতৃভাষায় পুষ্টিসাধন করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ এই কার্য্যের ভার লইতে পারেন।

ছাত্র-সভ্য পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এবিষয়ে মনোযোগী হইলে সুখের হয়।

বঙ্গদেশীয় মন্দিরের বিশেষত্ব

ঐ পত্রিকার মে মাসের সংখ্যায় বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "বাঙ্গালার মন্দির ও তাহার সাধারণ বিশেষত্ব" (Bengali Temples and their General Characteristics) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই প্রবন্ধটি বড় প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, কারণ বাঙ্গালা দেশের স্থাপত্য ও শিল্প সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে কেহ কোন কথা বলেন নাই। গৌড়ের মুসলমান কীর্ত্তিরাশি ও মগধের বৌদ্ধ কীর্ত্তিরাশির আলোচনাই সকলে করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ব্যতীত যে দেশে পাথর বেশী নাই, সে দেশে ইষ্টকশিল্পের যে সকল মনোমোহকর নিদর্শন বর্ত্তমান, সে গুলির আলোচনা উপেক্ষিত হইলে, প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধানের একদেশ অন্যায়রূপে অবহেলা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বাঙ্গালাদেশ একে নদীবহুল দেশ, তায় ঝড়ঝঞ্ঝাবাত এদেশে লাগিয়াই আছে। এই সকলের প্রভাবে বাঙ্গালা-দেশের কীর্ত্তি বড় বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। পদ্মার কীর্ত্তিনাশা নামই তাহার সাক্ষী। এরূপ স্থলে, যে সকল প্রাচীন মঠ, মন্দির, অট্টালিকা ও মৃণ্ময় দুর্গের অবশেষ এখনও কালজয়ী হইয়া দেশের নানা স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বিবরণ অতি শীঘ্র সংগৃহীত না হইলে আর কিছু পরে যে তাহাদের পাওয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা বড় অল্প। এ সময়ে মনোমোহন বাবু বাঙ্গালা দেশের বহুবিধ আকারের ত্রিরত্ন, পঞ্চরত্ন, সপ্তরত্ন, নবরত্ন এবং একচূড়াবিশিষ্ট বহু আকারের মন্দিরাদির ছবি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিশেষত্ব বর্ণন করিয়া তাহাদের গঠন বিবরণ প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটিরও বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন। মনোমোহন বাবু প্রত্নতত্ত্বালোচনায় বিশেষ অভিজ্ঞ পুরুষ। তিনি এত দিন যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যদি একনিষ্ঠ ভাবে মাতৃভূমি বাঙ্গালা দেশের প্রত্নতত্ব উদ্ধারে ব্রতী হন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় উপযোগী ব্যক্তি বিরল। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাও এ কার্য্যের সহায়তা করিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল, এরূপ স্থলে তাঁহার নিকট আমরা বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা আশা করিয়া কোনই অন্যায় করিতেছি না। আমাদের অনুরোধে তিনি এখন বাঙ্গালা লইয়াই থাকুন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট কার্য্য হইবে।

এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক-তালিকা।

এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে দুর্ল্লভ হস্তলিপি ত অনেক আছেই, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকও যাহা আছে, তাহা বড় সামান্য এবং অল্প দুর্ল্লভ নহে। অনেক গ্রন্থ এমন আছে, যাহা এখন আর পাওয়া যায় না, ছাপাও হয় না। এখানে ইউরোপীয় ভাষায় যে সকল গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত আছে, তাহার নূতন তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামানুসারে একখানি তালিকা খণ্ডশঃ মুদ্রিত

হইতেছে। ইহা দ্বারা সাহিত্য-সেবকগণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। শুনিলাম আমাদের সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে, তবে তাহা প্রকাশের এখনও বিলম্ব আছে।

নীল-কণ্ঠ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মন্মথের অসুখ খুব বেশী না হইলেও চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে কয়েক দিন বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইয়াছিল। কারণ একটু অনিয়ম হইলেই পীড়া কঠিন দাঁড়াইতে পারে, এ আশঙ্কা ছিল। মন্মথের মাতা তাঁর সবে ধন এই নীলমণির সামান্য একটু মাথা ধরিলেই পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন, তিলেক চোখের আড়াল করিতেও তাঁর ইচ্ছা হয় না। তিনি অসুখের সূত্রপাতেই মন্মথকে নজরবন্দী করিয়া ফেলিলেন। নিজে সকল সময় কাছে থাকিতে পারিতেন না বলিয়া 'বৌমা'কে মোতাইন করিলেন। নিপুণা গৃহিণীর এ বন্দোবস্তের ভিতর অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকান ছিল কি না জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থায় একটা বড় শুভ ফল জন্মিল। মন্মথ এত দিন তাঁর পত্নীর প্রকৃত পরিচয় পান নাই, পত্নীর সহিত বেশী কথা বার্তা বা আলাপের সুযোগই তাঁর ঘটে নাই! নিশীথে সেই অবগুণ্ঠনবতী সঙ্কুচিতা, নিদ্রাক্লান্তা বালিকা পত্নীর সহিত অল্পক্ষণের কথায় তাঁর তৃপ্তি জন্মিত না; তাঁর সেই ক্ষুধিত হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা ইহাতে মিটিত না! প্রেমের এ গোপন ক্ষণিক সাধনায় তাঁর সাধ পুরিত না! প্রেমের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায়, হৃদয় যখন খাঁ খাঁ করিতেছিল, প্রেমের এই প্রবল পিপাসায়, প্রাণ যখন আকুল হইতেছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, রহস্য-নিপুণা স্নেহ-প্রাণা ষোড়শীর সহিত তখন তাঁহার পরিচয় হইল! পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্টতায়, ঘনিষ্টতা ক্রমে আত্মীয়তায়, আত্মীয়তা শেষে প্রীতিবন্ধনে দাঁড়াইল। সেই প্রীতিসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মন্মথের সেই অতৃপ্ত তৃষিত প্রাণ যেন সুধা-সিক্ত হইয়া উঠিল, হৃদয়ের শূন্যতাও যেন ক্রমে ঘুচিতে লাগিল, কিন্তু সেই রাত্রিতে নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে ফিরিবার পথে সহসা সে সুধার সমুদ্র নিমিষে যেন মরীচিকার ন্যায় প্রতিভাত হইল—সে সুখ স্বপ্ন দেখিতে না দেখিতে ভাঙ্গিয়া গেল—সে আকাশকুসুম, ধরিতে না ধরিতে মিলাইয়া গেল। উদ্বেলিত হৃদয়-উচ্ছ্বাস কঠিনতট-প্রান্তে আহত হইয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন মন্মথের ব্যথিত, আহত, প্রাণ, সরলার সুকোমল, স্নিগ্ধ, উদার বক্ষে আশ্রয় পাইল, গতি ফিরিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্মথ জানিতেন, সরলা লেখা পড়া কিছুই জানে না, নিতান্তই সেকেলে! কিন্তু ২।১ দিনের পরিচয়ে, তিনি সরলার বর্ণপরিচয়ের পরিচয় পাইলেন, বুঝিলেন, সরলা একালের বিদুষী-বঙ্গ-মহিলা না হইলেও "গণ্ডমূর্খ" নহে! কাব্য-নাটক-উপন্যাসের সহিত তার পরিচয় না থাকিলেও পদ্য রামায়ণ মহাভারত তার বেশ পরিচিত! "প্রভাস," "শিবায়ন," প্রভৃতি বটতলার প্রাচীন পুস্তকের খোঁজ-খবরও সরলা কিছু কিছু রাখে! মন্মথের জননী প্রবীণা সঙ্গিনীদের সঙ্গে অপরাহ্নে অবকাশ সময়ে—সরলার মুখে, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভাস প্রভৃতি শুনিয়া থাকেন। এত দিন মন্মথের নিকট সরলার এ সব বিদ্যা অগোচর ছিল; সরলার "পড়া" শুনিতে এখন তাঁর বড় আগ্রহ হইল—কিন্তু সরলা যে তাঁর এ অনুরোধ সহজে রাখিবে মন্মথের এ বিশ্বাস হইল না; তাই তিনি সহজ পথে না গিয়া বাঁকা পথ ধরিলেন। এক দিন অপরাহ্নে সরলা যখন অন্দর-মহলে গৃহিণী-মণ্ডলমধ্যে, পাঠে নিমগ্না, মন্মথ তখন,—গোয়েন্দা-সূত্রে সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া গোপনে সরলার 'পাঠ' শুনিলেন। সরলার কণ্ঠস্বর কি মিঠে, আবৃত্তি কি মনোহর! এক দিনে মন্মথের তৃপ্তি হইল না, তিনি এই প্রকারে অজ্ঞাতবাসে লুকাইয়া লুকাইয়া ৪।৫ দিন সরলার মহাভারত, রামায়ণ ও প্রভাস পাঠ শুনিলেন। প্রত্যহ দুই ঘণ্টার অধিক 'পাঠ' হইত। গৃহিণীর অভিপ্রায় মত কিছুক্ষণ রামায়ণ, কিছুক্ষণ মহাভারত নিয়ম মত পড়া হইত, কোন কোন দিন শেষে 'প্রভাস'ও পড়িতে হইত।

আমরা সত্য কথা বলিব, মন্মথ ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য এবং সংস্কৃত-কাব্য-নাটকের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হইলেও মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির কোন ধারই ধারিতেন না। রামায়ণ মহাভারতে যে এমন রত্ন নিহিত আছে, তাহাও তিনি এতদিন জানিতেন না।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যেখানে পতিভক্তির উল্লেখ থাকিত, সেই সকল স্থান পড়িতে পড়িতে সরলার মুখে যেন কি এক কমনীয়-কান্তি ফুটিয়া উঠিত, মধুর কণ্ঠ মধুরতর হইত। কখন বা সে কমল-মুখ অশ্রু-আপ্লুত, কখন বা সে কোমল-স্বর সুধা-সিক্ত, হইয়া উঠিত। মন্মথ মুগ্ধ হইতেন—অনুতপ্ত হইতেন! তাঁর ঘরের রামায়ণ মহাভারত যে রত্নাকর, তাহার সন্ধান এতদিন না করিয়া, তিনি বিদেশী সাহিত্যে রত্নের অন্বেষণে সুদীর্ঘ কাল কাটাইলেন—আর তাঁর গৃহে, এমন গুণবতী ভার্য্যা থাকিতে, তিনি তাহার গুণের সন্ধান না লইয়া পরের গৃহিণীর গুণে মোহিত ছিলেন। কস্তুরিকা যেমন স্বীয় মদগন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সন্ধানে অশান্তভাবে, অধীর চিত্তে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, মন্মথও এতদিন কি সাহিত্যে, কি গৃহে, স্বীয় আদর্শের সন্ধান না লইয়া অন্যত্রে তাহারই অনুসন্ধানে কালক্ষেপ করিয়াছেন—আজ তাঁর সে ভ্রান্তি অপনোদিত হইল—তাই মধুসূদনের ভাষায় তাঁর মনে হইতে লাগিল—

রে মূঢ়! ভাণ্ডারে তোর বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ তুই,) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিলি ভ্রমণ,
পরগৃহে ভিক্ষাবৃত্তি, কুক্ষণে আচরি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
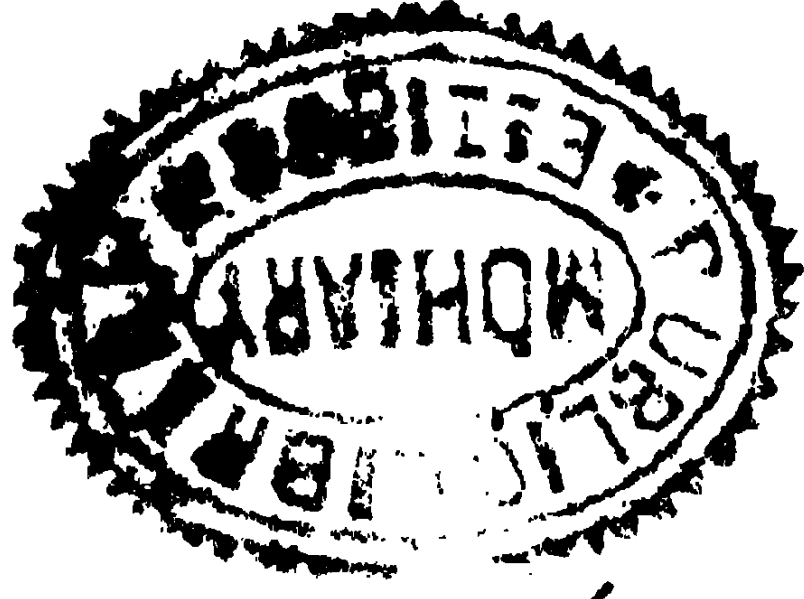
বঙ্গদর্শন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। এই যুগকে 'প্রাচ্যপ্রতীচ্য সন্ধিযুগ' বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলার ভবিষ্যতের ইতিহাসকার কখনই এ যুগের প্রভাব বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যে জাতি আপনার সভ্যতা ও জ্ঞান-গৌরব বিস্মৃত হইয়া ছয়শত বৎসর জড়ের ন্যায় পড়িয়াছিল, একটা নবীন সভ্যতার প্রখর কিরণ তাহার ঘুমন্ত চোখের উপর পড়িয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। তড়িৎপ্রবাহ-স্পর্শে তাহার অসার জড়দেহে একটা প্রাণের উত্তেজনা আনিয়া দিল। বাঙ্গালীর জাগরণ-প্রভাতের এই দিন সামান্য-গৌরব-মণ্ডিত নহে। নবীন-জাতীয়তা-গঠনের ভিত্তি এই দিনেই স্থাপিত হইয়াছিল। এই গঠনের যুগে বাঙ্গালীর অনেক প্রতিভাশালী কবি, মনস্বী লেখক, দূরদর্শী নাট্যকার, অক্লান্ত সমাজ-সংস্কারক, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, চিন্তাশীল রাজনৈতিক ও মহাপ্রাণ ধর্ম্মসংস্কারকের জন্ম হইয়াছে। জগতের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটা জাতীয় উত্থান ও পতনও বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই হইয়া থাকে। অতএব এই সকল মহাপুরুষ নবীন-জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল গঠন করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন ইহাই বলিতে হইবে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ইঁহাদের অন্যতম। এই গৌরবময় প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সন্ধিযুগে নবীনচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল।

বাঙ্গলার সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম-প্রদেশে নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান। কালের ন্যায় স্থানও মানব-জীবনের গতি অনেক পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং সমুদ্র-মেখলা-পরিবৃতা, গৈরিক-কিরীটিনী পার্ব্বতী চট্টলভূমি যে কবির জীবনের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা চিরকালই কবিজননী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার শ্যামল শস্যক্ষেত্র, জাহ্নবী-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-বিগলিত সমতলভূমি, পাদবিধৌত নীলজলরাশি ও রৌদ্ররঞ্জিত নির্ম্মল-আকাশ চিরকালই কবির প্রিয়স্থান। কিন্তু চট্টলের প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যের একটু বিশেষত্ব আছে। তাহার ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ দুর্নিবার সমুদ্র ও কঠোর-মূর্ত্তি দুর্জ্জয় পর্ব্বতমালার ভিতর যে কঠিন সৌন্দর্য্যের বিকাশ পাইয়াছে তাহা বাঙ্গলায় অন্যত্র দুর্লভ। নবীনচন্দ্র লীলাময় পার্ব্বতী-মাতার এই কঠিন স্নেহপূর্ণ-বক্ষে পালিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যে ভাবের যে একটা দুর্দ্দমনীয় বেগ—সৌন্দর্য্যের যে একটা রুদ্রমূর্ত্তির ছায়া দেখিতে পাই, বাঙ্গলার অন্য কোন কবির সঙ্গীতের ভিতর আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। প্রাচীন কাব্য সাহিত্য গঠনে চট্টগ্রাম নিতান্ত নগণ্য ছিল না। এখনও চট্টগ্রামের জীর্ণকুটীর অনুসন্ধান করিয়া অনেক পুরাতন রত্নের আবিষ্কার হইতেছে। আধুনিক কালেও নবীনচন্দ্রের ন্যায় কবির জন্ম দিয়া নব-যুগের কাব্য-ভাণ্ডারকে চটগ্রাম যথেষ্ট ঋণী করিয়াছে। ইহা চট্টগ্রামের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাঁহার ভিতর এমন একটা অসাধারণ শক্তি থাকে যাহাতে তাঁহাকে অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা একটু বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। এই শক্তি যাঁহার ভিতর থাকে বাল্যকাল হইতেই তিনি তাহার পরিচয় দিয়া থাকেন। বীজ দেখিলেই ভবিষ্যৎ মহাবৃক্ষকে জানিতে পারা যায়। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেমন চির-কালই আত্ম-গোপন করিতে পারে না—প্রতিভা তেমনই স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাধারণ স্থান ও কালের ভিতর এই শক্তি প্রায়ই বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। আপামর সাধারণের জীবন-প্রণালী যে এক-টানা ভাবে চলিয়াছে, প্রতিভাশালীর জীবন সেই পুরাতন খাতে চলিতে পারে না। নিজের অসাধারণত্ব সে কোন না কোনরূপে প্রকাশ করিবেই। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হন যে, অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই বাল্য-কালে বিশেষ সুবোধ বালক বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। চিরকালই ত সুবোধ বালকের দল জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। চির কালই ত তোমার আমার মত দশজন অবস্থার সঙ্গে মিল দিয়া বাল্যজীবন শেষ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভাকে সাধারণ স্থান ও কাল ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। চারিদিকের 'এক-ঘেয়ে' অবস্থার সহিত তাঁহাদের অসাধারণ প্রকৃতির 'খাপ' খায় নাই। তাই তাঁহাদের প্রকৃতি এইরূপ একটা বিশেষত্বের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। নবীনচন্দ্রও বাল্যকালে অতি দুরন্ত ছিলেন। বিদ্যা-লয়ে তাঁহার নাম ছিল 'দুষ্ট-শিরোমণি' (Wicked the Great)। প্রতিবাসিগণ ও সহাধ্যায়ীবর্গ তাঁহার অত্যাচারে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কেবল-মাত্র এই দুর্দ্দমনীয়তার ভিতরেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হয় নাই। উত্তর-কালে যে মহাকার্য্যের জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তরুণ বয়সেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় তখন হইতেই নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনেক সভাতেই

নবীনচন্দ্রের কবিতা শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইতেন। ভবিষ্যতে যে চন্দনবৃক্ষের সৌরভে সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইবে, এইরূপে চট্টগ্রামের এক নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহার বীজ উপ্ত হইতেছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসেন। প্রকৃতি দেবী এতকাল যাহাকে সমুদ্র ও পর্ব্বতের কঠিন সৌন্দর্য্যের ভিতর গড়িয়া তুলিতেছিলেন, এইবার বিধাতা তাহাকে যেন কর্ম্মশালের কঠোর পরীক্ষার ভিতরে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় কলিকাতার সমাজ ও সাহিত্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমস্ত দেশের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতীচ্য সভ্যতার প্রথম খরজ্যোতিঃ আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সমস্তকেই এক নবীন আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। বহুদিন যাহারা অন্ধকারের ভিতর জড়ের ন্যায় পড়িয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে এক আশ্চর্য্য আলোকরশ্মি প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম—সর্ব্বত্রই এই নবভাবের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ প্রতীচ্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সত্যের আস্বাদ পাইয়া তাহা প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য প্রতীচ্য সাহিত্যের ভাব ও সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন পথে চালিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষিগণ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিতেছিলেন। মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় কবিগণ প্রতীচ্যের কাব্যশ্রীর গৌরবে বাঙ্গলাকাব্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়েই একেশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বহুদিনকার সঞ্চিত-সংস্কার মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি উদারভাবের আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজ-সংস্কারক বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ-নিবারণের জন্য সমস্ত প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে অসীম দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন। নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে যে কবিত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এই নবভাবের উর্ব্বর ক্ষেত্রের মধ্যে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারই প্রথম ফল অবকাশ-রঞ্জিনী। অবকাশ-রঞ্জিনী আবার ইংরাজীশিক্ষিত কবির তরুণ বয়সের রচনা। তাই অবকাশ-রঞ্জিনীতে আমরা যুগধর্ম্ম, যৌবনধর্ম্ম এবং ইংরাজীকাব্যের নূতনত্বের ছায়া এই সমস্তই পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। সমসাময়িক সমাজের পুঞ্জীকৃত অচল সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সরল সহানুভূতি, অনাথা-বিধবার দুঃখে করুণ হৃদয়ের অশ্রুজল, অবকাশ-রঞ্জিনীতে এ সমস্তই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আবার নিরাশ ও ব্যর্থ প্রণয়ের তীব্র হা-হুতাশ, প্রতীচ্য কাব্যের Romantic Love এর অনুকরণে পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের কোমল

উচ্ছ্বাস, এ সমস্তও অবকাশ-রঞ্জিনীর পত্রে পত্রে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গলা-সাহিত্যে গীতিকাব্য তখনও খুব পূর্ণতা লাভ করে নাই। ইংরাজীতে Lyric বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাকেই যদি আমরা গীতিকাব্য নামে অভিহিত করি, তবে বলিতে হয় যে, বাঙ্গলাকাব্যে কোন দিনই প্রকৃত Lyric ছিল না। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অমূল্য পদাবলী এক হিসাবে Lyric বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত এই বিপুল মধ্যযুগের কোথাও আমরা গীতিকাব্যের লক্ষণ দেখিতে পাই না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও খাঁটী Lyric নহে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও পাঁচালীরই তাহা এক উচ্চসংস্করণ বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনই ইউরোপীয় আদর্শে বাঙ্গলায় প্রথম গীতিকাব্যের রচনা করেন। ব্রজাঙ্গনা ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই বাঙ্গলার প্রথম গীতিকাব্য, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'অবকাশ-রঞ্জিনী' মধুসূদনের গীতি-কাব্যের অনুকরণেই রচিত। বলিতে গেলে, গীতিকাব্য হিসাবে 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র স্থান খুব উচ্চ নহে। গীতিকাব্যের সেই সংক্ষিপ্ত গতি, ভাবের নিবিড়তা, সৌন্দর্য্যের গাঢ়তা ও ছন্দের সহজ লঘুতা 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তে নাই। তাহা Epic এর মন্থর গতি ও সৌন্দর্য্যের বিস্তৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অবকাশ-রঞ্জিনীর মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবিতার ছন্দে যে একটা তেজস্বিতা ও ভাষার সরল প্রবাহ দেখিতে পাই, এক হেমচন্দ্র ভিন্ন সমসাময়িক কোন কবিতেই আমরা তাহা পাই না। ভবিষ্যতের 'পলাশী' ও 'কুরুক্ষেত্রে'র কবির যে উদার গম্ভীর রাগিণীতে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, অবকাশ-রঞ্জিনীতেই যে তাহার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু তখনকার নব্যবঙ্গে একটি ভাব সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র সমাজ ও সাহিত্যের ভিতরে নানাভাবে নানা আকারে সেই একটি ভাবকেই আমরা প্রকাশ পাইতে দেখি। সেটি স্বদেশ-ভক্তি বা স্বদেশ-প্রেম। এই দেশভক্তি জিনিষটা যে অন্ততঃ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংঘর্ষণের ফল, এই নিষ্ঠুর সত্য আমাদিগের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজকবি ও ঐতিহাসিকের গভীর স্বদেশ-প্রেম যখনই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনই আমরা আমাদের জাতীয় অধঃপতন ও জন্ম-ভূমির পূর্ব্বগৌরব যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম। তখনই যেন দেশমাতৃকার প্রতি যে বহু শত বৎসরের অনাদর, তাহাই সহস্র-ধারায় ভক্তিরূপে উৎসারিত হইয়া উঠিল। নব্যবঙ্গের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভিতরেই আমরা দেশভক্তির বীজ দেখিতে পাই। রঙ্গলালে এইভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র যখন কাব্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন, তখনত দেশভক্তির পূর্ণ জোয়ার বহিয়াছিল। মধুসূদনের ভেরী-নিনাদ সবেমাত্র নীরব হইয়াছিল। দীন-বন্ধুর নাটকাবলী তখনও বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণকে দেশের দুঃখে ও দুর্দ্দশায় ব্যথিত

করিয়া তুলিতেছিল। তখনই সবেমাত্র 'বঙ্গদর্শনে'র গৌরবময় নবপ্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল। সেনাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের পতাকা-তলে স্বনামখ্যাত অনেক মহারথী সমবেত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের হৃদয় নবযুগের এই স্বদেশ-প্রেমের স্রোতে পূর্ণ হইয়া গেল। তরুণ কবির অন্তর স্বদেশের দুঃখে ও অধঃ-পতনে ব্যথিত হইয়া উঠিল। 'অবকাশ-

'তেই আমরা এই দেশভক্তির বহু পরিচয় পাই। কিন্তু 'পলাশীর যুদ্ধে'ই এই স্বদেশ-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আম্রবনে ভারতের যে ভাগ্য নির্ণয় হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহা শুধু ইংরাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর যুদ্ধ নহে—পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমের যুদ্ধও নহে; ইহা মানুষের সঙ্গে দৈবের যুদ্ধ—জাতির সঙ্গে বিধাতার যুদ্ধ। পলাশী শুধু কেবল একটা ছোটখাট অস্ত্রপরীক্ষার ক্ষেত্র নহে। ইহা জাতীয় ইতিহাসের একটি বিষাদপূর্ণ অধ্যায়—জাতীয় নাটকের একটি অতি শোকপূর্ণ দৃশ্য। নবীন-চন্দ্র এই জাতীয় শোককাব্য লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী ধন্য হইয়াছে। জন্মভূমির জন্য যে গোপন-ক্রন্দন তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, পলাশীর জাতীয় মহাশ্মশানে বসিয়া তিনি অন্তরের সেই রোদন-সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গাহিয়া লইয়াছেন। তাই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য, কেবলমাত্র সিরাজের অশ্রুতে নহে, সমস্ত বাঙ্গালীর অশ্রুজলে ইহার প্রত্যেক পংক্তি সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের একটী বিষাদময় দিবসের কাহিনী মাত্র নহে, একটী পরাধীন জাতির সাতশত বৎসরের সঞ্চিত মর্ম্মব্যথা ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আহত ভুজঙ্গের জলন্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় ইহার প্রত্যেক দীর্ঘশ্বাস যেন হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া দেয়, তপ্ত ধাতুস্রাবের ন্যায় ইহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু যেন মর্ম্মস্থানে আসিয়া স্পর্শ করে! স্বীকার করি যে, বিজেতা-কীর্ত্তিত ইতিহাস-অবলম্বনে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিত। ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে হতভাগ্য সিরাজের চরিত্র ইহাতে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তার জন্য কবিকে আমরা বেশী দোষ দিতে পারি না। তার জন্য যদি কোন পাপ তাঁহার স্পর্শিয়া থাকে, তবে সিরাজের জন্য যে পবিত্র শোকাশ্রু তিনি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা ধৌত হইয়া যাইবে। কঠোর ঐতিহাসিক কবিকে ক্ষমা না করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গলার প্রত্যেক হৃদয়বান্ নরনারীই 'পলাশী'র কবিকে আনন্দের সঙ্গে ক্ষমা করিবেন ইহা আমরা নিশ্চয় জানি।

'পলাশীর যুদ্ধ'ই নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য। নবযৌবনের আরম্ভে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাই নবযৌবনের যে একটা দুর্দ্দমনীয় ভাবের বেগ—তাহা ইহার ভিতর আমরা অনুভব করিতে পারি। অমর বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনাকালে ইহাকে বায়রণের কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই বায়রণের কবিতায় তাঁহার দুর্জ্জয় মনোবেগ যেরূপ জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে দেখি,

'পলাশীর যুদ্ধে'ও কবির দুর্জ্জয় স্বদেশ-প্রেম তেমনি জ্বালাময়ী ভাষাতেই প্রকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। কাব্যজগতে পলাশীর যুদ্ধের স্থান অনেক উচ্চে। পলাশীর নবীন চিত্রকর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতে যেরূপ অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা অনুকরণীয়, এক একটি Stanza যেন এক একটি সুন্দর চিত্র। সমগ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' যেন একটি মাত্র সূত্রে গ্রথিত ফুলসমষ্টির একখানি মালা। জলস্রোতের ন্যায় ইহার ঝঙ্কার যেন কবির হৃদয় হইতে স্বতঃই বাহির হইয়া পড়িতেছে। কোথাও অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতার লেশ-মাত্র নাই। ঐতিহাসিক কাব্য রচনা বড় কঠিন কাজ। সেই অতি কঠিন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া রঙ্গলাল তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু নবীনচন্দ্র সেই দুষ্করব্রত সুন্দররূপে উদ্‌যাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালীও কবির উপযুক্ত সম্মান করিতে ত্রুটি করে নাই। এক 'পলাশীর যুদ্ধে'ই নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়াছিলেন।

কবির দ্বিতীয় কাব্যসৃষ্টি 'রঙ্গমতী', 'পলাশীর যুদ্ধে'র ন্যায় 'রঙ্গমতী'ও জাতীয়তার কাব্য। কিন্তু 'পলাশী' অতীতের জন্য বিলাপ, 'রঙ্গমতী' ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। 'পলাশী' অতীতের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত, 'রঙ্গমতী' ভবিষ্যতের আশাপূর্ণ প্রতীক্ষা। 'পলাশী' গৌরব-রবির অস্তাচল দৃশ্য—'রঙ্গমতী' নবোদিত উষার আবাহন-কাহিনী! 'পলাশী'র মহাশ্মশানে যে শোক-কাব্যের অভিনয় হইয়াছিল, 'পলাশীর যুদ্ধে'র তরুণ কবি সেই বিলাপ গাথা উচ্চ-কণ্ঠে গাহিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক দেশবৈরীর যে মহাপাপের ফলে জন্মভূমি বিজেতার পদ-তলদলিত হইয়াছিল, যে পাপের ফল তাহা-দের বংশধরগণ এখনও পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছে, 'পলাশীর যুদ্ধ' সেই মহাপাপের জন্য অনুতাপের অশ্রুজল। কিন্তু নবযৌবনের হৃদয়াবেগ যখন কিঞ্চিত প্রশমিত হইয়াছিল, জাতীয় দুর্দ্দশার শোকের মোহ যখন কিয়ৎ-পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল, তখন কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অতীতের জন্য শুধু বিলাপে কোন ফল নাই। অতীতের বিলাপের প্রয়োজন আছে—আত্ম পাপ ও হীনতাকে বুঝিবার জন্য; আপনার মলিনতা ও কলঙ্ক-কালিমা অনুতাপের অশ্রুজলে ধুইয়া ফেলি-বার জন্য। কিন্তু জাতীয় দুর্দ্দশা মোচনের জন্য—জাতীয় উত্থানের সূচনার জন্য, শুধু অতীতের বিলাপে হইবে না—তার জন্য ভবিষ্যতের ভিত্তিমূল রচনা চাই; ভবিষ্যতে যে দেশমাতৃকার আবাহন করিতে হইবে, তাঁহার জন্য মন্দির-প্রতিষ্ঠা চাই। 'রঙ্গ-মতী'র সেই অতীত বাঙ্গালী রাজ্য; জল-স্থলে বাঙ্গালীবীরের সেই ভীষণ অনলক্রীড়া; বর্ম্মাবৃত, নিকোষিত-কৃপাণ, পর্ত্তুগীজদমী, সিংহশিশু বীরেন্দ্র বিনোদ; বীর-প্রণয়িনী, স্বপ্নসুন্দরী কুসুমিকা; প্রভুভক্ত, জ্ঞানী, বৃদ্ধ শঙ্কর, সমস্তই সেই ভবিষ্যতের আশার তুলিকাপাতে চিত্রিত। রঙ্গমতী কেবল একটি সপ্তদশ শতাব্দীর রাজ্যধ্বংসের চিত্র নহে —কেবল বিয়োগান্ত নাটকের একখানি করুণ দৃশ্যপট নহে! ইহা ভবিষ্যতের অরুণো-দয়-রেখাপাতে রঞ্জিত, আশার সুবর্ণ-জ্যোতিঃতে মনোহর, দূরদর্শী কবি প্রতিভার অশ্বাসবাণীতে পূতোজ্জ্বল! অধঃপতিত

জাতির সম্মুখে আদর্শের দর্পণ ধরিবার জন্তই ত কবির প্রয়োজন, নিমজ্জমান পথহারা জাতীয় তরণীকে ধ্রুবতারা দেখাইবার জন্তই ত কবির আগমন। ভবিষ্যতের সেই আদর্শ —অকূলসাগরে সেই ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতিষ্ঠার জন্তই কবিপ্রতিভা 'রঙ্গমতী' প্রসব করিয়াছে। 'রঙ্গমতী' বিজ্ঞব্যক্তির কথায় 'অনাগত বীর ও অনাগত মনুষ্যের কাহিনী'। নবীনচন্দ্রের কাব্যেতিহাসে 'রঙ্গমতী' একটি অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

'পলাশীর যুদ্ধ' অপেক্ষা 'রঙ্গমতী'র কাব্য গাঢ়তা লাভ করিয়াছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কতকগুলি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশ, সেগুলি একটী নিবিড় ঐক্যের ভিতর তেমন সুন্দররূপে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে'র ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক, ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক, তাহারা জলন্ত সত্য—তাহারা স্বাধীন দুর্দ্দান্ত। কবি তাহাদিগকে লইয়া কাব্য গড়িতে গিয়া আপনার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা যাইতে পারে না। তাই এই দুর্দ্দান্ত, জীবন্ত সত্যগুলিকে কবি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'রঙ্গমতী' কবির মানস-উদ্যান। ইহার প্রত্যেক ফুল প্রত্যেক পত্র কবির স্বহস্ত-রচিত। তাই সুনিপুণ মালীর ন্যায় তিনি এই মানস-উদ্যানকে সুন্দররূপে সাজাইতে পারিয়াছেন। আপন মানসী-কন্যাকে ইচ্ছামত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। তাই রঙ্গমতীর চিত্রিত কার্য্যপ্রবাহের ইতিহাস এক সুসম্বদ্ধ ঘটনার ভিতর ঐক্যলাভ করিয়াছে। ইহার ভিতর যে মানবজীবন চিত্রিত হইয়াছে—তাহা ছাড়িয়া দিলেও রঙ্গমতী এক বিরাট প্রাকৃতিক কাব্য। চিত্রের চারিদিকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত করা হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যভূমি, চট্টলের বিচিত্র কঠিন পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য, ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নদী প্রকৃতির ভীষণ মাধুর্য্য, রঙ্গমতীর ভগ্নাবশেষ, হিন্দুদুর্গের ধ্বংসচিত্রসমূহ, সমস্তই কি এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! ইহা পার্ব্বতী মাতার বক্ষে প্রতিপালিত নবীনচন্দ্রেরই তুলিকাপাতের যোগ্য। যে গভীর শোকদৃশ্যের ভিতর এই আশাকাব্যের দৃশ্য শেষ হইয়াছে তাহার চারিদিকে এই ভীষণ সৌন্দর্য্যরাশি অদৃষ্টরূপিণী 'কাননকালীর' করাল অট্টহাসের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবের নিবিড়তায় ও ছন্দের গাম্ভীর্য্যেও 'রঙ্গমতী'কে আমরা 'পলাশীর যুদ্ধ' হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি। নবীনের যে কোমল কঠোর সৌন্দর্য্য চিত্রে, জলদ-গম্ভীর রাগিণীতে বঙ্গবাসীমাত্রেই মোহিত, 'রঙ্গমতী'তেই আমরা তাহা পরিস্ফুটতর হইবার সূচনা দেখি।

যে সময়ে 'রঙ্গমতী' রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গদেশে এক নবীন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। 'অবকাশ-রঞ্জিনী' রচিত হইবার পূর্ব্বকালে বাঙ্গলা দেশের সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই সময়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংঘর্ষণের ফলে বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য সভ্যতার স্রোত প্রবলবেগে আসিয়া বঙ্গদেশের উপর আঘাত করিতেছিল। ধর্ম্মে, সমাজে ও সাহিত্যে

সর্ব্বত্রই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু সকল বিষয়েই প্রয়োগভেদে ভাল মন্দ দুই ফলই হইতে পারে। গ্রহণ ও অনুকরণ এই দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। একটার ফলে সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যটিতে সমাজ উত্তরোত্তর ধ্বংসের দিকে নীত হইতে থাকে। গ্রহণ জীবলোকের সাধারণ ধর্ম্ম। ভিতরে যে শক্তি আছে শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না, বাহির হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবেই। উদ্ভিদ্ যেমন বাহির হইতে সূর্য্যালোক ও বায়ু গ্রহণ করিয়া আপনার পরিপুষ্টি সাধন করে, মানুষও তেমনি বাহিরের শিক্ষা ও সাধনা হইতে গ্রহণ করিয়াই আপনাকে গঠন করিয়া তোলে। সমাজের পক্ষেও এই কথাই প্রযোজ্য। যে সমাজ চিরকাল আপনার মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার জীবনীশক্তিই থাকেনা। বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে সমাজ আপনার সমন্বয় করিয়া লইতে সমর্থ, সেই সমাজই প্রকৃতরূপে উন্নত হইতে পারে। কিন্তু অনুকরণ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। 'গ্রহণ' সমাজকে বাঁচাইয়া পরিবর্ত্তন করিতে চায়, 'অনুকরণ' তাহাকে ধ্বংস করিয়াই তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে যত্নবান হইয়া উঠে আপনার ব্যক্তিত্ব লোপ করিয়াই সে বাহিরের সঙ্গে মিশিতে প্রয়াস পাইতে থাকে। যে মূর্খ পিতৃপিতামহের পুরাতন পাকা বনিয়াদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াই নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণের কল্পনা করে, সে যে কেবল পুরাতনকেই ধ্বংস করে তাহা নহে, নূতনকেও হয়ত তাহার গঠন করিবার সামর্থ্য হইয়া উঠে না। পুরাতনকে নষ্ট করিলেইত চলিবে না; তাহার ভিতর যে সত্যশক্তি আছে তাহার উপরেই নূতনত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাচ্যপ্রতীচ্য সংঘর্ষণের যুগে বাঙ্গলাদেশে একসময়ে এই সত্যের অপমান করা হইয়াছিল। তাই 'গ্রহণ' ছাড়িয়া 'অনুকরণ'কেই আশ্রয় করিয়া আমরা ধ্বংসের দিকে নীত হইতেছিলাম। পশ্চিমসূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোঃতিতে আমাদের নয়ন ঝলসাইয়া গিয়াছিল; আমরা আপনাদের মহামূল্য মরকতকেও ফেলিয়া দিয়া, তাহাদের কাচখণ্ডগুলিও আদরে কুড়াইয়া লইতেছিলাম। যুনানী-সভ্যতার তীব্র-সুরা-পানে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাই নিজেদের সুধাভাণ্ডও দূরে ফেলিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত বিষ পানের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। ধর্ম্মে ঔদার্য্যের পরিবর্ত্তে নাস্তিকতা ও বিশ্বাসহীনতাই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সমাজে স্বাধীনতার স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতা ও দাম্ভিকতাকেই আমরা গৌরব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের নামে, স্বদেশ ও স্বজাতিকে আমরা ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেছিলাম। সমাজের কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়া নূতনরূপে কুসংস্কারের মোহে অন্ধ হইয়াছিলাম। সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা নাশ করিতে যাইয়া গভীরতর সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার কূপে নামিয়া যাইতেছিলাম। সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র প্রচার করিতে গিয়া শিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের মধ্যে এক নূতন জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিলাম। বাঙ্গলার আকাশে পশ্চিমের প্রলয়-ঝটিকার কালমেঘ ঘনাইয়া

তেছিল। "রুদ্রের ক্রোধাগ্নিচিহ্ন" যেন সেই সমাজ-বিপ্লবের কোলাহলের মধ্যে ক্রমেই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যে এক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন, যিনি এই প্রলয়ের বজ্র মাথায় পাতিয়া লইয়াছিলেন। এই সমুদ্র-মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহা পান করিয়া দেবাসুরের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি মহামনস্বী অমর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রতীচ্যসংঘর্ষণের ফলে সমাজে যে নবভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বহুপূর্ব্বেই রক্ষণশীল দল দাঁড়াইয়াছিলেন। এই নবভাবের মূলোচ্ছেদ করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সমাজকে এই নূতনত্বের মোহ হইতে টানিয়া তাঁহারা পুরাতনের দিকে লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়েও স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ এই নবভাবের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতেছিলেন। নবভাবের এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও দাম্ভিকতা তাঁহাদিগের শক্তিকে আরও উদ্বোধিত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলেন; সময়ের স্রোতকে বর্ত্তমান হইতে অতীতের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই, তাঁহারা এই বিপ্লবের সমাধানের পরিবর্ত্তে রহস্যকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিতে-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা দেখিতে পাইয়া-ছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যকে প্রতীচ্য হইতে বিযুক্ত করিয়া নহে,—প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া নহে,—প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্বয় করিয়াই কেবল এই বিপ্লবের সমাধান হইতে পারিবে। প্রাচ্যের চিরসুন্দর সনাতন যে সত্যগুলি আছে, তাহাদিগকে পরম যত্নে রক্ষা করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়াই প্রতীচ্যের নবসত্য গ্রহণ করিতে হইবে। স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইবে এবং ভালবাসিয়াই তাহাদিগকে প্রতীচ্য সভ্যতার সম্মুখীন করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই নূতনভাবে সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কারে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের দিকে প্রতীচ্য শিক্ষিতের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়া-ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সর্ব্বলোকপূজ্য নিষ্কামধর্ম্ম মহিমাময় বাসুদেব কৃষ্ণের চরিত্র-কথা। হিন্দুধর্ম্মের উদার মত ও সমাজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও প্রচারে তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্টাংশ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। প্রতী-চ্যকে ত্যাগ করিয়া নহে, পরন্তু তাহাকে সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।

এই যুগকে "হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ" বলা যাইতে পারে। নবীনচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই পুনরুত্থানের যুগের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এই 'পুনরুত্থানের আন্দোলনে'র বঙ্কিমচন্দ্র মস্তক, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ইহার বাহু এবং নবীনচন্দ্র ইহার হৃদয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ইহার অস্ত্র, নিষ্কামধর্ম্ম ইহার মন্ত্র এবং "নবজীবন" ও "প্রচার"

প্রভৃতি ইহার বাহন। নবীনচন্দ্র এই "পুনরুত্থানের" কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছিল, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়-চন্দ্র প্রভৃতির জ্ঞান যাহার ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল, নবীনচন্দ্রের কবিত্ব কাব্য-সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া তাহাকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। রঙ্গমতীর কবিকে আমরা 'প্রতিষ্ঠা'র অন্বেষণে ব্যস্ত দেখিয়াছি, অতীতের বিলাপকে ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের আশার জন্য ব্যাকুল দেখিয়াছি। 'পুনরুত্থানে'র কবির এই লক্ষ্য আরও স্থির হইয়াছে। 'পুনরুত্থানে'র কবি এই ভবিষ্যতের আদর্শকে এক নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়াছেন। সনাতন ধর্ম্ম, অক্ষয় কর্ম্ম ও অমর সাধনার উপর এই জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন-আর্য্যগৌরবের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতের চিত্রই তন্মধ্যে সমুজ্জ্বল। মহাভারতের যুগ আর্য্যসভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত যুগ। উদার নিষ্কামধর্ম্ম ও কৃষ্ণচরিত্রের অতুলমহিমায় এই মহাভারতের যুগ আলোকিত। 'পুনরুত্থানে'র কবি নবীন-চন্দ্র 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' এই মহাভারতের গৌরবময় যুগকেই চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবিপ্রতিভার দিব্য আলোকে মহান্ নিষ্কামধর্ম্ম ও মহিমাময় কৃষ্ণচরিত্রকে আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সুদূর অতীতের অস্পষ্ট কুয়া-সান্ধকারের মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্যের সেই ভীষণ দ্বন্দসংঘর্ষ; বৈদিকযজ্ঞীয় ধূম-কলুষিত সনাতন-আর্য্য-ধর্ম্মের সেই শোচনীয় অবনতি; স্বার্থপর ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণের সেই গভীর অধঃপতন, বাসুদেব কৃষ্ণের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী; সমুন্নত উদার গীতাধর্ম্মের সেই সাধনা ও প্রচার; জ্ঞান-রূপী ব্যাস, কর্ম্মরূপী অর্জ্জুন ও ভক্তিরূপিণী সুভদ্রার সেই অপূর্ব্ব সম্মিলন; ভারতময় হিংসা ও অশান্তির সেই লেলিহান শিখা-কুরুক্ষেত্রের বক্ষে প্রজ্বালিত সেই ভীষণ সমরবহ্নি, নির্ব্বেদের শোক, শ্মশানে চিতা-ভস্মের উপরে এক ধর্ম্মরাজ্যের সেই মহা-প্রতিষ্ঠা; ভারতময় কৃষ্ণনাম ও ধর্ম্মরাজ্যের সেই প্রচার; একই ভক্তির বেদিমূলে আর্য্য ও অনার্য্যের সেই মহাসম্মিলন—সকলই কি মহান্ কল্পনা ও দূরপ্রসারিণী দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। মহাভারতের মহান্ কাহিনীকে নূতন কাব্যচিত্রে প্রতিফলিত করা অতি কঠিন কার্য্য। সেই দুর্গম বিরাট অরণ্যের ভিতর পথ কাটিয়া লওয়া বড়ই দুরূহ ব্রত। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে নবীনচন্দ্রের এই দুষ্করব্রতের সফলতা-সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইয়া-ছিলেন। কিন্তু যে প্রতিভা 'পলাশীর যুদ্ধে' জয়লাভ করিয়াছিল 'কুরুক্ষেত্রে'র মহাতীর্থ হইতেও সেই প্রতিভা দেবপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য লাভ করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। অতীতের অন্ধকার হইতে মহাভারতের প্রাণময়, আলোকময় রাজ্যকে আমাদের সম্মুখে আনিতে তিনি সম্পূর্ণই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কোন কোন, অতিসতর্ক-বুদ্ধি, ধর্ম্মভীরু পণ্ডিতব্যক্তি নবীনচন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। মহাভারতের চিত্র বিকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু হায়, কবি-

প্রতিভা সকল সময়ে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া চলে না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের বুদ্ধির ন্যায় সেই বুদ্ধি কালের সঙ্কীর্ণতার ভিতর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। ক্ষুদ্র ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া কবি-প্রতিভা যে অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশের ভিতর ধ্যানমগ্ন হইয়া যায় ইতিহাসের সতর্কবুদ্ধি তাহাকে কল্পনায়ও আনিতে পারে না। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' মহাভারতের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র অতীতেরই গৌরবচিত্র নহে, তাহা দূরাগত ভবিষ্যতের দিব্যালোকপাতে রঞ্জিত ভূত ও ভবিষ্যৎ, গত ও অনাগত, জাহ্নবী ও যমুনার সম্মিলনে পবিত্র প্রয়াগ মহাতীর্থ। যাহা গিয়াছে তাহার গৌরব, যাহা আসিবে তাহার আশায় আলোকিত। কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ অতীতের ভিতর এই মহাচিত্র বদ্ধ নহে; ইহা অতীত ও বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের অনন্ত আদর্শকে স্পর্শ করিয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম ও অক্ষয়কর্ম্ম-সাধনার উপর এই 'জাতীয় মহাকাব্যে'র ভিত্তি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। যে 'মহাভারত'-চিত্র কবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কবে আসিবে জানি না, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে ইহা জাতীয় জীবনের অমর আদর্শ—লক্ষ্যহারা জাতীয় তরণীর সম্মুখে ধ্রুবতারার ন্যায় চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। কি উদার ধর্ম্ম, কি অমর বীর্য্যের উপর এই মহান্ অতীতের কল্পনা! 'কুরুক্ষেত্রে'র মহাতীর্থের উপর 'মহাভারতে'র উপর মহান্ চিত্র—ধর্ম্মরাজ্যের যে মহাপ্রতিষ্ঠা, তাহা কি গম্ভীর, কি মর্ম্মস্পর্শী কি আশার আলোকে উজ্জ্বল!

"উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি মাতা রাজরাজেশ্বরী।
নবধর্ম্ম-বেদিমূলে বসিয়া দেবতাগণ
আর্য্য অনার্য্যের ধ্যানে, বেদিবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি, তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী অতুলা প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম্মমন, রক্তবর্ণ কলেবর;
অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর
সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র হইয়াছে শোভমান
চারিভুজে চারিদিকে, ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান।
ধর্ম্মসাম্রাজ্ঞীর মুখ অনন্ত মহিমা-ছবি,
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বালরবি।
অনন্ত মানবব্যাপী ভবিষ্যত, বর্ত্তমান,
নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম।"

(ক্রমশ)

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার।

মহাভারত।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

বায়ুদেব—ভীমসেন।

ভীমসেনের চরিত্র লক্ষণ এই ঃ—

১। বায়ুদেবের ঔরসে পাণ্ডুরাজ-পত্নী পৃথাদেবীর গর্ভে ভীমসেন জন্মগ্রহণ করেন। (মহা ১।১২৩)

২। ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের প্রিয় ছিলেন। (মহা ১০।১২)

৩। জলক্রীড়া-কালে কালকূট-মিশ্রিত খাদ্য দুর্য্যোধন ভীমসেনের মুখে দিলে ভীমসেন জ্ঞানশূন্য হইলেন। দুর্য্যোধন অবসর পাইয়া ভীমসেনকে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। (মহা ১।১২৮)

৪। ভীমসেন নাগলোকে পতিত হইলে সর্পদংশনে ভীমসেনের ভুক্ত বিষ বিনষ্ট হইল। (মহা ১।১২৮)

দুর্য্যোধন পুনরায় বিষময় খাদ্য ভীমসেনকে দিলে ভীমসেনের উদরে তাহা জীর্ণ হইল। (মহা ১।১২৯)

৫। বারণাবত-নগরস্থ জতুগৃহে ভীমসেন অগ্নি দান করিয়া মাতা ও ভ্রাতাগণের সহিত বিবর দ্বারা বহির্গত হইলেন। (মহা ১।১৪৮)

৬। হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমসেনকে পতিত্বে বরণ করিল। এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটোৎকচনামক পুত্র লাভ করিলেন। (মহা ১।১৫৫)

৭। বেদব্যাসের আদেশে পৃথা ও পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। (মহা ১।১৫৬)

৮। ভীমসেন বক-অসুরের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া তাহার মৃত দেহ একচক্রা নগরীর দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিলেন। (মহা ১। ১৬৩-৪)

৯। ভীমসেন বক-অসুরের ভ্রাতা কির্ম্মীর রাক্ষস বধ করেন। (মহা ৩।১১)

১০। ভীমসেন কৃষ্ণার অপহরণে অকৃতকার্য্য জট-অসুরকে বধ করেন। (মহা ৩। ১৫৭)

১১। নহুষসর্প ভীমসেনকে আক্রমণ ও বেষ্টন দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিল। (মহা ৩।১৭৮)

১২। বিরাট নগরে ভীমসেন বল্লভ নামে সূপকার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (মহা ৪।৮)

১৩। ভীমসেন দ্রৌপদীর ধর্ষক সূতনন্দন বিরাট-সেনাপতি কীচকের বিনাশ সাধন করেন। (মহা ৪।২২)

১৪। কুরুক্ষেত্রসমরে ভীমসেন দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে বিনাশ করেন। এবং তিনি দুঃশাসনের রক্ত পান করেন। (মহা ৮।৮৩) এবং গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করেন। (মহা ৯।৬১)

১৫। ধনুর্ব্বিদ্যায় ভীমসেন সুনিপুণ ছিলেন। (মহা ৭।১২৭) কিন্তু গদাই তাঁহার প্রিয় অস্ত্র ছিল।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে তুলারাশিস্থিত স্বাতি নক্ষত্রের স্থান ভূতেশ মণ্ডলস্থ (Bootes) তারাগণে গঠিত স্বাতি নক্ষত্র হইতে নাম গ্রহণ করিয়াছে। বায়ু দৈবত স্বাতি নক্ষত্রের অপর নাম নিষ্ঠ্যা। যথা বায়োঃ নিষ্ঠ্যাব্রততি। ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে।

খচর দেবের এক মূর্ত্তি সৌম্য এবং অপর মূর্ত্তি ঘোর (রাক্ষসাত্মক) বায়ুদেবের সৌম্য মূর্ত্তির সহচরী স্বাতি এবং বায়ুদেবের ঘোর মূর্ত্তির সহচরী স্বাতির প্রতিমা নিষ্ঠ্যা (রাক্ষসী)।

ধীরচিত্ত ভিষক্‌গণ জানেন যে মানবাদি জীবের প্রধান খাদ্য বায়ু——ভাত নহে। এবং বায়ু দ্বারায় আমরা আমাদের আহার পরিপাক করি। এবং প্রাণ-অপান-আদি বায়ুপঞ্চকের আশ্রয়ে আমরা প্রাণ ধারণ করি। আবার সেই বায়ুর বক্রতা হেতু আমরা কালকবলে পতিত হই। এজন্য বেদে (ঋঃ ১।১১৪।৫—৭ ; ২।৩৩।৭) প্রকাশ যে মরুৎগণের পিতা রুদ্রদেব এক হস্তে ভেষজ (১) অপর হস্তে বিনাশ বিতরণ করেন। এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।২।২।১১) বায়ুদেবকে যমদেব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পুরাণ-মতে রুদ্রদেব একাই বৈদ্যনাথ এবং মহাকাল। বেদমতে (ঋঃ ৮।৪৬।১) রুদ্রদেব স্থিরধন্বা এবং ক্ষিপ্রশরবর্ষী। এবং বেদ মতে (ঋঃ ৮।৪৬।১০) রুদ্রদেব রাক্ষসাদির বিনাশক।

পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামা যে প্রহরী রুদ্রদেবকে দর্শন করেন (মহা ১০।৬) সেই রুদ্রদেব (মহা ১০।২) রাক্ষস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

২। গ্রহজগতে মনোজব বৃহস্পতি গ্রহ শুভ মনোজব বায়ুদেবের প্রতিমা এবং অঙ্গারক গ্রহ অশুভ বায়ুদেবের প্রতিমা।

বৃহস্পতি (ঋঃ ১।১৮।২) সর্ব্বরোগাপ-হারক (২) অঙ্গারক-যম মানব সন্তান খাদক এবং রাক্ষস গ্রহ। যথা

ভোক্তুম্ প্রজাঃ স মর্ত্ত্যানাম্ নিষ্প-পাত মহাগ্রহঃ। (মহা ৩।২২৯।৩৪) গৃহীত্বা তু পতাকা বৈ যাতি অগ্রে রাক্ষসঃ গ্রহঃ। (মহা ৩।২৩০)

৩। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে প্রায় ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বাসন্তিক ক্রান্তি-পাত (Vernal equinoctial point) কাল-পুরুষ মণ্ডলের (orion) উত্তরে এবং ব্রহ্মা-মণ্ডল ওরফে বৈদিক পূষন্ মণ্ডলের (Auriga) দক্ষিণে বৃষরাশিস্থ ২ বৃষস্থ (Beta Tauri) তারার নিকট দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই মহা বিষুবসংক্রান্তি দ্বার বেদে (ঋঃ বেঃ ৫।৫।৫) বহুস্থলে "দেবীদ্বার" নামে বর্ণিত আছে। (৩) দেবীদ্বারে সবিতৃদেবের সুবর্ণ চক্র উদিত হইলে রথীতম পূষন্ দেব ঐ চক্র উগ্র তারা বৃষ পৃষ্ঠে চালিত করেন। (৪)

(১) হস্তে বিভ্রৎ ভেষজা। (ঋঃ ১।১১৪।৫)

(২) যঃ রেবান্ যঃ অমীবহা।

(৩) দেবীঃ দ্বারঃ বিশ্রয়ধ্বম্। (ঋ ঃ ৫।৫।৫)

(৪) উত অদঃ পরুষে গবি সূরঃ চক্রম্ হিরণ্যয়ম্। (ঋঃ ৬।৫৬।৩)

এই দেবীদ্বার মহাভারত-উক্ত গঙ্গাদ্বারের (পৌরাণিক হরিদ্বার বা হরদ্বার) আধিদৈবিক প্রতিমা। এবং তারা বৃষের মুখ গোমুখী দ্বারের আধিদৈবিক প্রতিমা।

৪। দেবীদ্বারের অদূরে এবং কালপুরুষ মণ্ডলের শিরোভাগে সোম দৈবত পঞ্চতারাত্মিকা ইল্বলা (৫) ওরফে ইন্বকা নক্ষত্র ছায়াপথের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে। ৩ বৃষস্থ (Zeta Tauri) ও ৭,৫,২৪, এবং ৩ মিথুনস্থ (Eta, Mu, Nu, and Gamma Geminorum) এই পঞ্চ তারায় ইন্বকা নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে।

ইল্বলাঃ তৎশিরোদেশে ইল্বলাঃ পঞ্চতারকাঃ। (ইতি অমরঃ)

৫। সুদীর্ঘ তারা কাল পুরুষের শিরোগ্রস্থিত ১১ কালপুরুষস্থ (Lambda Orionis) তারা বাস্প স্তবক বেষ্টিত আছে ঐ বাস্পস্তবক দিব্য বরাহের (কাল পুরুষের) নামান্তর। (৬)

কপর্দ্দ (জটা) বলিয়া বেদে (ঋঃ ১।১১৪। ৫) বহুস্থলে বর্ণিত আছে। (৭)

" Orion (is) the brightest and most famous constellation in the sky and the most frequently alluded to in literature, ancient or modern, sacred or classical "—(Maunder)

পাঠক হিন্দু সাহিত্য পাঠ কালে এই উক্তিটি সতত মনে রাখিবেন।

৬। দেব সেনাপতি স্কন্দদেব (Orion) বিরাট রাজ্যে বরুণ, বিরাট-রাজের সেনাপতি পদে বিরাজমান। (৮)

১। দ্যৌ (পাণ্ডু) এবং পৃথিবী (পৃথা) হইতে রুদ্র—ভীমসেন দেবের জন্ম হইল।

২। মহাকাল রুদ্রদেব অপেক্ষা ধর্ম্মরাজ যমদেবের প্রিয়তর কে হইতে পারে ? রুদ্র—ভীমসেন যম—যুধিষ্ঠিরের প্রিয়তম ছিলেন।

৩-৪। রুদ্রদেব বলেন,

" বিষ খেয়ে জীর্ণ করি
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি "

ভীমসেন অক্লেশে বিষ পান বার বার করিতে সক্ষম।

৫। ঘোর কর্ম্ম রুদ্রদেবেই শোভা পায় ভীমসেন জতুগৃহে অগ্নি দান করিলেন।

৬। নিষ্ঠ্যা রাক্ষসী হিড়িম্বা নামে ভীমসেনকে পতিত্বে বরণ করিল।

৭। সবিতৃদেবের এক চক্র (সূর্য্য বিম্ব) হইতে দেবীদ্বারের সন্নিহিত আকাশ খণ্ড একচক্রা নগরী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৮। একচক্রা নগরীর অদূর পূর্ব্বভাগে এবং কাল পুরুষ মণ্ডলের উত্তর পূর্ব্বদিগে ইন্বকা নক্ষত্র অবস্থিত আছে। ইন্বকার ঐতিহাসিক নাম বক-অসুর। বকাসুর স্মৃতিশীল পাঠকের প্রাচীন বন্ধু। আকাশে বা তারা চিত্রে এই ইন্বকা নক্ষত্রের তারাপঞ্চকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দর্শক

(৫) ইল্বল] অসুর মহর্ষি অগস্ত্যের নয়নাগ্নিতে দগ্ধ হয়। (রাম ৩।১১)

(৬) Popular Hindu Astronomy দেখ।

(৭) "দিবঃ বরাহম্ অরুষম কপর্দ্দিনম্ "

(৮) " বরুণস্ত বিরাট "। ইতি তৈঃ আরণ্যক।

দেবীদ্বারে ভগ্নকটি বকাসুর দেখিতে পাইবেন।

৯। কির্ম্মীর অসুরের স্বরূপতা, অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারি নাই। ইতিবৃত্তবাদী জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারেন।

১০। জটাসুর ঐতিহাসিক বীরগণের আত্মারাম সরকার। জটাসুর বধ না করিলে বীরের বীরত্ব প্রকাশ হয় না।

১১।--পরম পদ (Polan Circle) স্থিত তক্ষক-নহুষ সর্প এক্ষণে ভূতেশ মণ্ডলের (Bootes) উপরিভাগে আচ্ছাদকভাবে অবস্থিত আছে। যম ধ্রুবতারার (৭ তক্ষকস্থ) ধ্রুব সিংহাসন অধিকার কালে আরও একটু বেষ্টক ভাবে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রুদ্র ভীমসেন নহুষ সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বেষ্টিত হইলেন।

১২। পরিপাক-ক্রিয়া বায়ুদেবের স্ব-ধর্ম্ম। সুতরাং মরুৎদেব ভীমসেন পাচক নিযুক্ত হইলেন। সুপাচক চিরদিনই "নৃপবল্লভ" বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

১৩। কীচক বধের ব্যাখ্যা বিরাট পর্ব্বে হইবে।

১৪। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত। (মহা ১৮৮৫) রাক্ষসদেব কর্ত্তৃক তাহাদের নিধন সুসঙ্গত।

তারাদর্শক।

শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের লক্ষ্য।

The beauty of a cloud or a flower lies in its unconscious unfolding of itself, and the silent eloquence of the master-pieces of each epoch must tell their story better than any epitome of necessary half truths.——Ideals of the East.

(ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য কি, তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা না করিয়াই, অনেকে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পদিন মাত্র তাহার গতিরোধের আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। যাঁহাদের চেষ্টায় ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের প্রকৃত মর্য্যাদা সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের অবসর প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহারা অকৃত্রিম সাধুবাদের পাত্র।)

অতি পুরাকালের ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। সেকালে তাহার প্রকৃতি বা লক্ষ্য কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই। সেকালের শিল্পকারগণ

* আসাম গৌরীপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

আত্মঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না;—শিল্পের লক্ষ্য বা সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিবার প্রয়াসে, তাহার ব্যাখ্যা-পুস্তক-প্রচারেও ব্যাপৃত হইতেন না। জনসমাজ শিল্প-সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত;—প্রত্যেক রেখাসম্পাতে কি লক্ষ্য, কি ভাবমাধুর্য্য, কি কাহিনী অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার রহস্যভেদ করিতে পারিত; কাহাকেও কোনরূপ ব্যাখ্যা-পুস্তকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত না। শিল্পই শিল্পের একমাত্র ব্যাখ্যা-পুস্তক ছিল।

আধুনিক সভ্যসমাজে ব্যাখ্যাপুস্তক প্রচলিত হইয়াছে। তাহা শিল্পের গৌরব-ঘোষণার জন্য নিয়ত কলরব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ভারত-শিল্পের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা এখনও যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সুতরাং ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য কি,—জনসমাজ তাহার রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। বরং ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্প যে উচ্চশ্রেণীর শিল্প বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সমধিক স্পর্দ্ধা করিতে পারে না, এইরূপ একটি ধারণাই নানা কারণে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

একটি প্রধান কারণ এই যে,—অনেকেই ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের মধ্যে কেবল পরানুকরণের নিদর্শন দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ততদূর অগ্রসর হইতে অসম্মত, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ বলেন,—" ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পে মানব এবং পশু এতদুভয়ের অতি প্রাকৃত সংমিশ্রণ-সঞ্জাত অস্বাভাবিক আড়ম্বরের আতিশয্য।" * কেহ বলেন,—" তাহা না হইবে কেন? ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতবর্ষের পক্ষে তাহাইত নিতান্ত স্বাভাবিক"! † কেহ আবার দার্শনিক বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া বলিয়া থাকেন,—"যাহারা পৃথিবীকে ব্রহ্মার স্বপ্ন অথবা মায়ার ইন্দ্রজাল বলিয়া চিরকাল লোক সমাজকে শিখাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার প্রভাবেই, তাহাদের দেশের শিল্প-বিজ্ঞান কখনও দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিবার উপযুক্ত ভাব-মাধুর্য্যে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই!" ‡

এরূপ সমালোচনা নিতান্ত মুখরোচক বলিয়াই প্রতিষ্ঠালাভে কৃতকার্য্য হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এরূপ সমালোচনায় ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের মূল লক্ষ্য অনুভূত না হইবারই কথা। " মানব এবং পশু এতদুভয়ের

* They usually consist of monstrous combinations of human and brute forms.—Westmacott's Handbook of Sculpture, p. 50.

† In such a tendency of mind, the works of sculpture have suffered most. No religion even brought to light such bombast of confused and mystical ideas as that of the Brahmin.—Dr. Lubke.

‡ How should art be inspired to delineate the circumstances of daily existence, when, according to the teaching of the Brahmins, the world was only to be regarded as a dream of Brahma, or the production of Maya (delusion.)—History of Sculpture, p. 12.

সংমিশ্রণ-সঞ্জাত” অতিপ্রাকৃত মূর্ত্তি যদি কেবল ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও সভ্য-সমাজে কল্পিত না হইয়া থাকিত, তথাপি এরূপ সমালোচনা সর্ব্বথা সমীচিন হইত না। কিন্তু গ্রীকশিল্পের গৌরবের সামগ্রী বলিয়া যাহা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যেও এরূপ অতিপ্রাকৃতের একেবারে অসদ্ভাব নাই। অথচ যাঁহারা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহার প্রশংসাবাদেই ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে ভারতশিল্পের এরূপ নিন্দাবাদ শোভা পায় না।

ভারত-মূর্ত্তিশিল্পের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। মূর্ত্তিনিচয় অবলম্বন করিয়া একখানি আদ্যন্তের ইতিহাস সংকলিত করিবারও সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে,—ভারতবর্ষ যত পুরাতন সভ্যজনপদ বলিয়া আধুনিক সভ্যসমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাও পুরাতন। সুতরাং মূর্ত্তিশিল্প প্রথমে কোন্ পথে ধাবিত হইয়াছিল, এখন আর তাহার কোন নিদর্শনই বর্ত্তমান নাই। যাহা পুরাতন মূর্ত্তি-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া প্রদর্শিত ও সমালোচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অতি পুরাতন নহে;—যাহা আছে, তাহার মধ্যে পুরাতন,—এই পর্য্যন্ত। তাহার উপর নির্ভর করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

মূর্ত্তি-শিল্পের প্রথম প্রয়াস কি ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল? তাহা কি প্রথমে চিত্রে অথবা ভাস্কর্য্যে আত্মবিকাশের চেষ্টা করিয়াছিল? চিত্রে করিলে, চিত্রের কতকাল পরে ভাস্কর্য্যে,—ভাস্কর্য্যে করিলে, তাহার কতকাল পরে চিত্রে? ইহার সকল প্রশ্নই তর্কসংকুল হইয়া রহিয়াছে। মানব-সমাজের সভ্যতা-বিকাশের প্রথম প্রয়াস যে পথে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা, ভারতবর্ষেও তাহা সেই পথেই ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কোন্ স্মরণাতীত পুরাকালের কথা? তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটনে অকৃতকার্য্য হইয়া, এখন কেহ কেহ বলিতেছেন,—“ভারত-সভ্যতার ইতিহাস ইউরোপখণ্ডে ভাল করিয়া সুবিদিত হইবার পর হইতে হিন্দু-শিল্পের প্রাচীনত্ব বিজ্ঞাপক পূর্ব্বপ্রচলিত সকল ধারণাই নিতান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র প্রাচ্যচেষ্টার মধ্যে ভারতশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।” *

যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন,—“খৃষ্টাবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের অভ্যুদয়কাল। কারণ, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন যুগের কোনরূপ মূর্ত্তিশিল্পের নিদর্শন বর্ত্তমান নাই; এবং খৃষ্টোত্তর ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগে ভারতশিল্প ক্রমেই অবসন্ন হইয়া

* Since the history of Indian civilisation became better known in Europe, our previous ideas respecting the antiquity of Hindu art have been found to be very exaggerated. In fact Indian art is the most modern of all oriental artistic efforts.—Professor Grunwedil's *Budhist Art in India*, p. 2.

আসিতেছিল"। * এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই।

উৎকলের অন্তর্গত "উদয় গিরির" বিচিত্র গুহাবলীর ভিত্তিগাত্রে যে সকল ভাস্কর্য্য-নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর এবং ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন বলিয়া পাশ্চাত্য সুধী-সমাজে সুপরিচিত। † তাহাতে এখনও পরানুকরণের পরিচয় বা আভাস আবিষ্কৃত হয় নাই; বরং ভারতশিল্পের আদিকীর্ত্তি বলিয়া তাহা এখনও প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহার রচনা-কৌশলের মধ্যে যে সুষমান্বিত শিল্পকলা অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—তাহা বহু শতাব্দীর সুদীর্ঘ শিল্পানুশীলনের পরিণত ফল; খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীকে তাহার আকস্মিক উদ্ভবকাল বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। ‡

সংস্কৃত সাহিত্যও ইহার পক্ষ সমর্থন করে। মূর্ত্তি-শিল্প কেবল শিলামূর্ত্তি এবং ধাতুমূর্ত্তি-নির্ম্মাণে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিলে, নানা তর্ক উত্থাপিত হইতে পারিত, কিন্তু দারুমূর্ত্তি এবং চিত্রমূর্ত্তিও মূর্ত্তি-শিল্পের অন্তর্গত;—তাহা দীর্ঘকাল সুরক্ষিত হইতে পারে না। ভারত-ভাস্কর্য্য প্রথমে দারুকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিবার কথা পাশ্চাত্যসমাজে অপরিজ্ঞাত নাই। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তীকালের মূর্ত্তিশিল্পের নিদর্শন না থাকিলেও, 'ছিল না' বলিবার উপায় নাই। সত্য সত্যই যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বকালেও মূর্ত্তি-শিল্প ভারতবর্ষে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না, বৈদিক সাহিত্যে, এবং রামায়ণ-মহাভারতে তাহার নানারূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রথমে কোন্ শ্রেণীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত, তাহার তথ্যনির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহা কি অট্টালিকাদির গঠন-সৌন্দর্য্য বিকশিত করিবার উদ্দেশ্যে স্থাপত্যের অনুযাত্রী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল? অথবা স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল? যদি স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হইয়া থাকে, তবে কি তাহা প্রথম হইতেই উপাসনা-ব্যাপারের সৌকর্য্যসাধনের বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল? অথবা উত্তরকালে সে উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল?

প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ধরিয়া তাহার তথ্য-নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহা অনাদিকাল হইতে শ্রীমূর্ত্তিপূজা প্রচলিত থাকাই স্বীকার করে। অনাদিকাল হইতে তাহা প্রচলিত

* No important monument goes further back than the third century B. C. The period of its development comprises about a thousand years,—from the third century B. C. to the sixth or seventh century A. D. *Budhist Art in India*, p. 2.

† Among the oldest sculptures of India are perhaps those cases of Udayagiri in the Puri district of Orissa. The most interesting are in the too storeyed Raj-Rani or Ranika-Nur caves. These remarkable reliefs show an uncommonly animated style, little influenced by foreign elements. They form, so to speak, the primitive basis from which issued the purified and refined forms of latter times.—*Budhist Art in India*, p. 23.

‡ এই জন্যই ইহাকে ওকাকুরা বলিয়াছেন,—"The silent protests of rock-cut Orissa."

ছিল না; থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না;—তাহা উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল;—ইহাই বরং ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পকে নিতান্ত আধুনিক এবং পরানুকরণলব্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—'ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্প প্রথম হইতেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রসূত শ্রীমূর্ত্তি-গঠনে ব্যাপৃত হইয়াছিল; অন্যথা তাহা স্থাপত্যের গঠনসৌষ্ঠব বৃদ্ধির সৌকর্য্যসাধনের জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।' * এই সিদ্ধান্তও সমীচিন বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

মানবসমাজের পক্ষে প্রথমে পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তুর সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা অনিবার্য্য; অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবনযাত্রানির্ব্বাহের নিত্য প্রয়োজনীয় বাহ্যবস্তুসংগ্রহে নিয়ত অবসরশূন্য থাকিবার সম্ভাবনাও অধিক। তৎকালে মানবচিন্তা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলনে ব্যাপৃত হইতে পারে না;—স্থূল ছাড়িয়া, সূক্ষ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার অবসর লাভ করিতে পারে না। কালক্রমে তাহার সম্মুখে এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের মঙ্গলদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। তাহার পূর্ব্বে, মানবের অন্তর্নিহিত স্বভাবানুকরণ-স্পৃহা একেবারে আলস্যে কালযাপন করিতে পারে না। তাহা ভাষার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে শব্দানুকরণে ব্যাপৃত হয়;—পূজার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে পুষ্পচয়ন আরম্ভ করে;—দেবমূর্ত্তির প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে, নানা সৃষ্টপদার্থের গঠন-চেষ্টা প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। গঠন-চেষ্টার এইরূপ স্বাভাবিক স্পৃহাকেই মূর্ত্তি-শিল্পের জন্মদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মানবসমাজের এইরূপ স্বাভাবিক স্পৃহা ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। এখানেও, এই স্বাভাবিক স্পৃহা, চিত্তবিনোদনার্থ অথবা অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনায়, আকারানুকরণে ব্যাপৃত হইয়াই, চিত্রাদি বিদ্যা অধিগত করিবার স্বাভাবিক পথ পরিষ্কৃত করিয়া থাকিবে;—পরানুকরণের অবসর লাভের আশায় সুদীর্ঘকাল আলস্যে কালযাপন করিবে কেন? অথবা মূর্ত্তিগঠনে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমেই শ্রীমূর্ত্তিগঠনে ব্যাপৃত হইবে কেন?

সকল দেশেই শিল্পের উচ্চ আদর্শ ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে;—কেবল ভারতবর্ষেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে শিল্পজ্ঞান এইরূপে পরিস্ফুট হইবারই সম্ভাবনা। তাহা প্রথমে যেরূপ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া থাকুক না কেন, সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি যতই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ততই যোগ্য বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

* The Sculpture of ancient India, originating as it did in religious tendencies and destined to serve religious purposes, could only follow its own immediate purpose in second representations: Otherwise, it was and remained, simply decorative and always connected with architecture.—*Buddhist Art in India*, p. 1-2.

এই অবস্থায় উপনীত হইয়া, যে দেশের মানবসমাজ যাহাকে চিরসুন্দর বলিয়া, অনুভব করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; এবং সেই সময় হইতে পূর্ব্বতন অপরিপুষ্ট আদর্শনিচয় প্রয়োজনাভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়া, ভারতবর্ষ দৃশ্যমান সংসার-চিত্র ছাড়িয়া, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে কায়াদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা মূর্ত্তি-রচনার প্রথম প্রয়াস নহে;—শ্রীমূর্ত্তি-রচনার প্রথম প্রয়াস;—অথবা মূর্ত্তিশিল্পের পরম পরিণতি। তাহা কোন্ স্মরণাতীত পুরাকালের কথা, কে তাহার তথ্য নির্ণয় করিবে? তাহার আদি-নিদর্শন বৈদিকযুগের যজ্ঞযূপের সহিত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

সে কারণে, যেরূপ ভাবেই ভারতবর্ষে শ্রীমূর্ত্তি-রচনার উদ্ভাবনা প্রচলিত হইয়া থাকুক না কেন, তাহা যে ব্রাহ্মণ-সমাজের শিক্ষাদীক্ষার অনিবার্য্য পরিণামরূপে বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-সমাজের পক্ষে লজ্জা অনুভব করিবারও কারণ নাই। পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তুর এবং তাহার অন্তর্নিহিত অপরিদৃশ্যমান মূলশক্তির পার্থক্য প্রদর্শিত করিয়া, পুরাকালের ব্রাহ্মণ-সমাজ পরিদৃশ্যমান অপেক্ষা অপরিদৃশ্যমানের সৌন্দর্য্য-মোহে লোকচিত্ত অধিক আকৃষ্ট করিতে সফলকাম হইয়া থাকিলে, তাহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। তাহার তুলনায়, একালের শিক্ষাদীক্ষা কত মলিন,—কত প্রাণহীন,—কত সৌন্দর্য্য-বঞ্চিত,—পণ্যশালার নগণ্য পণ্যপিণ্ড মাত্র!

অমরত্ব-লাভের অসীম আকাঙ্খাই ভারতবর্ষের সকল সভ্যতার প্রধান নিয়ামক বলিয়া প্রাচীনতম বৈদিক-যুগ হইতে দেদীপ্যমান। 'যাহাতে অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া কি করিব,'—ইহাই ভারতবর্ষের সকল কথার সার কথা। তাহার জন্যই শরীর, তাহার জন্যই শরীর-রক্ষার চেষ্টা;—তাহার জন্যই সংসার, তাহার জন্যই সংসারস্থিতি রক্ষা করিবার বিবিধ বিজয়-কামনা;—তাহার অধিক কাহারও অন্য কোনও কামনা থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। এই আকাঙ্খা শিল্পের মধ্যেও অমরত্ব-লাভের প্রবল প্রলোভনের ব্যাপ্তিদান করিয়াছিল। তাহার জন্যই শ্রীমূর্ত্তিনিচয় কখন কখন প্রাকৃতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, অতিপ্রাকৃত আকার ধারণ করিতেও বাধ্য হইয়াছে। কারণ, তাহা অন্যান্য দেশের মূর্ত্তিশিল্পের ন্যায় আদৌ মূর্ত্তিরূপে উদ্ভাবিত হয় নাই;—ভাবরূপেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

সূর্য্যোদয়ে বা সূর্য্যাস্তসময়ে অনন্ত-আকাশপটে চিরসুন্দর যখন বিচিত্র মেঘমালার ভিতর দিয়া নরনেত্রে দেদীপ্যমান হয়, তখন তাহার বাহ্যরূপ কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ চিরপরিচিত বাহ্যরূপের আকারকে অনুসরণ করিল, কোন্ মুহূর্ত্তে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল,—কে তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর লাভ করে?

অতীন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্য-মোহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বাহ্যরূপের সৌন্দর্য্য-মোহ অপেক্ষা কোনও অংশে দুর্ব্বল বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না; বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে অধিক প্রবল বলিয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহা ক্ষুদ্র সীমা লক্ষ্য করিতে পারে না। কারণ, তাহার দৃষ্টি নিকটে নহে, দূরে;—সসীমে নহে, অসীমে। ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক শ্রী-মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যরূপের এবং তাহার অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যরাশির চির-পার্থক্য সংসূচিত করিয়া বলিতে চাহিয়াছিল, —তাহা মানব-মূর্ত্তি নহে,—তাহা ইহ-লোকের নহে,—তাহা দেশকালপাত্রের অতীত,—সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্ব-লোকের পক্ষে সমানভাবে উপভোগক্ষম;—কেননা, তাহা অতীন্দ্রিয় ভাবসম্পদের অনির্ব্বচনীয় আধার! শান্তমূর্ত্তির ভিতর দিয়া এইরূপে অনন্ত শক্তির স্পর্শ লাভ করিবামাত্র, ভারতবর্ষ কণ্টকিতকলেবরে বলিয়া উঠিয়াছিল,—

> রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো
> ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো
> দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো
> যত্তীর্থ-যাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা-
> দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

এইরূপে যে সকল শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাতে অতিমাত্রায় আকারানু-করণের অথবা কিছুমাত্র পরানুকরণের পরি-চয় প্রকটিত হইতে পারে না। তাহা কেবল ধ্যানগম্য,—সকল সৌন্দর্য্যের সারসৌন্দর্য্য ধ্যানগম্য হইবারই কথা। মানব-প্রতিভা বিবিধ বাহ্যবস্তুর সাহায্যে তাহার ঈষৎ আভাস প্রদান করিতে পারিলেই কৃত-কৃতার্থ। সেইজন্য ভারতবর্ষের শ্রীমূর্ত্তি-রচনায় আভাসাত্মক শিল্পকৌশলের আতি-শয্য। সেইজন্য এই শ্রেণীর মূর্ত্তি-শিল্পে সাধারণ গঠন-কৌশলের সঙ্গে একটি অসা-ধারণ ভাববিকাশ-কৌশল জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ গঠন-কৌশলের কোন না কোন অংশে আকারানুকরণের বা পরানুকরণের অল্পাধিক পরিচয় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, অসাধারণ ভাববিকাশ-কৌশলের কোনও অংশেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। গঠন-কৌশলের যে অংশে আকারানুকরণের বা পরানুকরণের অল্পাধিক পরিচয় প্রতি-ভাত হইতে পারে, তাহাতে "সাদৃশ্য" আছে বলিয়াই, "অনুকরণ" আছে বলিবার অসংদিগ্ধ অধিকার নাই।

ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোনও পাশ্চাত্য দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা আপাততঃ সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত, সকল পাশ্চত্যদেশেই তাহা চিরসুন্দর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষই তাহাকে অতিক্রম করিয়া, প্রাচ্যভূমণ্ডলে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যবোধশক্তি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ ভারতবর্ষই বুঝিয়াছিল,—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।"

এই ভাব বিকশিত হইবামাত্র, আবার কেবল সৌন্দর্য্য-বিকাশের উপলক্ষ্য মাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল;—ভাববিকাশই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার তুলনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার মলিন হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্যই, আকার স্বাভাবিক কিম্বা অস্বাভাবিক হইলেও, সৌন্দর্য্য-বিকাশের তারতম্য ঘটাইতে পারে নাই। কারণ, আকার তখন ভাব-বিকাশের অনুগামী হইয়া, অনুকূলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা দ্বিভুজ,—তাহা চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ, বহুভুজ হইয়া গিয়াছে। যাহা একমুখ,—তাহা দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, বহুমুখ হইয়া গিয়াছে। প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র, মৃত্যুর মধ্যে যে প্রশান্ত সৌন্দর্য্য পরিদৃশ্যমান বিভীষিকার অন্তরালে লুকাইয়া থাকে, তাহাকেও ব্যক্ত করিবার জন্য, কপালমালিনী চামুণ্ডা-মাতৃকার কঙ্কালাবশিষ্ট বিশীর্ণ কলেবর উদ্ভাবিত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের শ্রীমূর্ত্তি-রচনাকৌশলের মধ্যেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা সংসারের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক, তাহা এইরূপে সংসারাতীত সৌন্দর্য্য বিকাশের পক্ষে সর্ব্বথা স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইবামাত্র, জনসমাজ আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে সম্মত হইতে পারে নাই; তাহারা তখন চিরপরিচিত সংসার-সীমার কঠিন আবেষ্টনকে দেখিয়াও দেখিতে পায় নাই;—ভাবসৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া, বাহ্যজ্ঞান বিসর্জ্জন করিয়া, একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! তখন ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সসীম হইতে অসীমে উপনীত হইয়া, মানব-কল্পনা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নূতন নূতন পন্থা-নির্দ্দেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন আর পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-মানবের অথবা জীবজড়ের পরিদৃশ্যমান অপরিহার্য্য পার্থক্য কিছুমাত্র প্রতিভাত হয় নাই। কারণ, তখন যাহা কিছু পৃথক্, তাহা এক; "রূপং রূপং প্রতিরূপং বিভাতি।" এইভাব ভারতবর্ষে একটি অনন্যসাধারণ অধ্যাত্ম-তত্ত্বরূপে অতি পুরাকাল হইতেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাব কালক্রমে ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র এসিয়া-খণ্ডেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ইহা কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আগন্তুকের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং
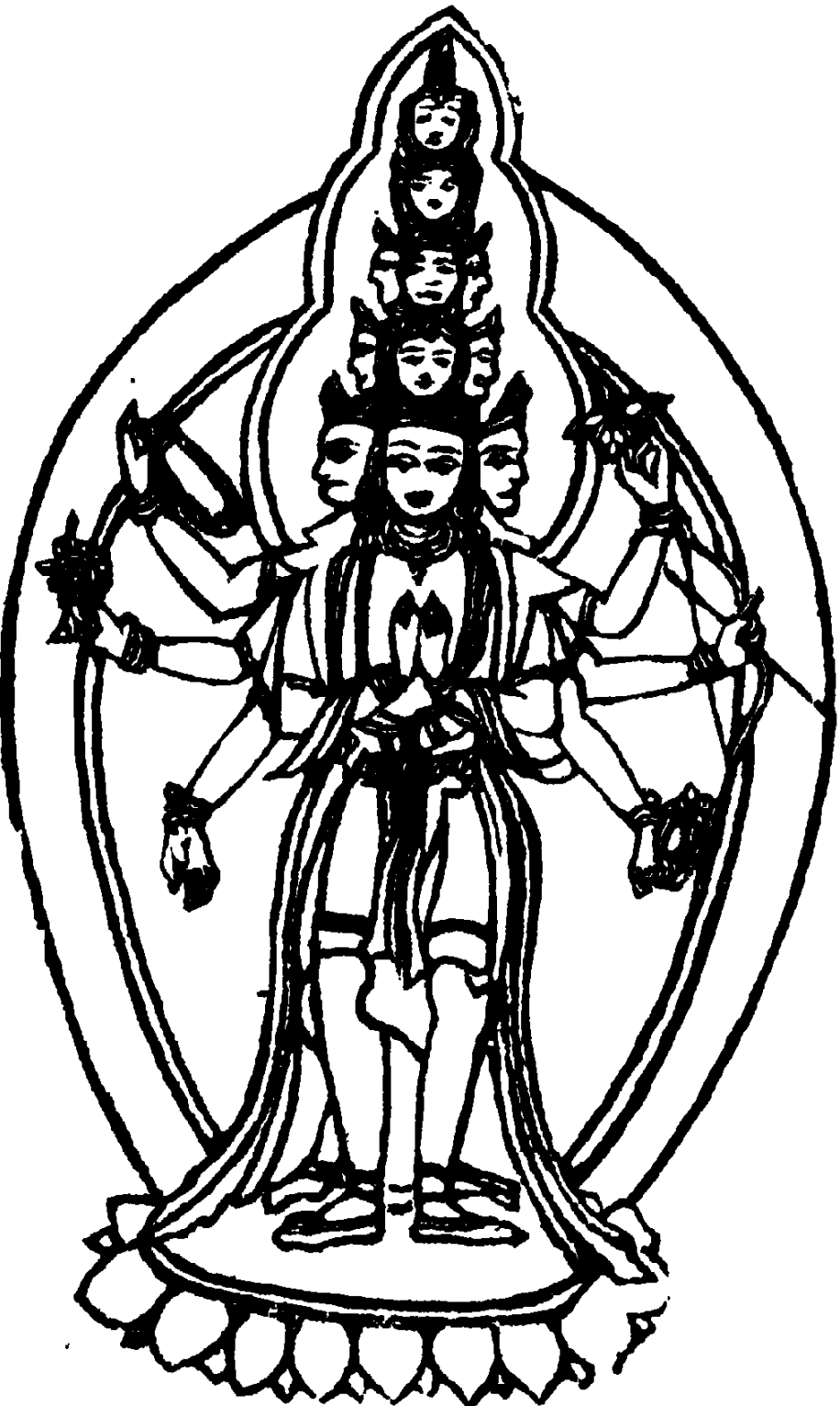
মনে হয়, ইহা সমগ্র প্রাচ্যভূমণ্ডলের পরম্পরাগত অন্তর্দৃষ্টির অসামান্য পুণ্যফল! হিমালয়ের পাষাণ-প্রাচীরও ইহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। কারণ, এসিয়ার সকল প্রদেশের মানব-প্রাণ একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। *

যে জাতি যে ভাবে চিরসুন্দরকে অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে ভাবের সন্ধানলাভের চেষ্টা না করিয়া, সে জাতির চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের মূললক্ষ্যের সন্ধানলাভের উপায় নাই। মূললক্ষ্যের সন্ধানলাভ করিতে না পারিলেও, শিল্প-মর্য্যাদা উপভোগ করিবার উপায় হয় না। তজ্জন্যই অনেক আধুনিক সমালোচকের নিকট ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতে পারিতেছে না। তাঁহাদের বিশেষ অপরাধ নাই। তাঁহারা যেখানে যতখানি আকারানুকরণের নিদর্শন দর্শন করেন, সেখানে সেই পর্য্যন্তই ভারত-শিল্পের সাফল্য স্বীকার করিয়া,—তাহার অভ্যন্তরে কতখানি পরানুকরণের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহারই তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন! আকারানুকরণের একচুল অভাব বা অবহেলা দেখিবামাত্র, এই শ্রেণীর সমালোচকগণ তাহাকে ভারত-শিল্পের অমার্জ্জনীয় অজ্ঞতার অথবা অসংদিগ্ধ অসামর্থ্যের নিদর্শন বলিয়া বিজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক অবজ্ঞাভরেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতে আরম্ভ করেন! নিরাকারকে আকার দান করিতে গিয়াই যে ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্প সর্ব্বতোভাবে 'আকার-সর্ব্বস্ব' হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই, সে কথা তাঁহাদের নিকট সহসা প্রতিভাত হয় নাই। *

ভারত-প্রতিভা যে আকারানুকরণ করিতে জানিত না, তাহা নহে। কিন্তু উত্তরকালে তাহাই মূর্ত্তি-শিল্পের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিচিত ছিল না। কারণ, তাহা প্রতিভা-সম্পন্ন মানবসমাজের পক্ষে কিছু-

* Asia is one. The Himalayas divide only to accentuate, two mighty civilisations, the Chinese with its communism of Confucius, and the Indian with its individualism of the Vedas. But not even the snowy barriers can interrupt for one moment that broad expanse of love for the Ultimate and Universal which is the common thought inheritance of every Asiatic race, enabling them to produce all the great religions of the world, and distinguishing them from those maritime peoples of the Mediterranean and the Baltic, who love to dwell on the particular, and to search out the means, not the end, of life.—*The Ideals of the East.*

* বৈতরণী-তীরের চামুণ্ডা-মাতৃকার দর্শন করিয়া একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়া গিয়াছেন,—'Chamunda is a ghastly figure of an extremely emaciated woman. She sits on a prostrate man, and wears a necklace of human skulls. Her face is repulsive, and her ribs and veins are delineated with gruesome fidelity. The sculptor has certainly succeeded in producing a more disagreeable image of death than any other artist has imagined; there is nothing in Holbein's Dance of Death quite so horrible." মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কি কৌশলে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা অন্য কোন দেশের শিল্পকার অভিব্যক্ত করেন নাই। যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে মৃত্যু-মূর্ত্তি তাহাও বিশ্বমাতার শ্রীমূর্ত্তি মাত্র;—ইহা কেবল ভারত-শিল্পেই অভিব্যক্ত!

মাত্র কঠিন ব্যাপার নহে; বরং সর্ব্বাংশেই স্বাভাবিক এবং সহজ। জীব-মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথা-দৃষ্ট প্রতিফলিত করা শিল্পকৌশলের মধ্যে কঠিন কৌশল বলিয়া পরিচিত নহে। তাহা শিল্পকৌশল-বিকাশের প্রথম চেষ্টা;—সৃষ্টি নহে,—সৃষ্টবস্তুর আকারাঙ্কন মাত্র। যে কেহ অল্পায়াসেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে।*

আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগ।

গত শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে বৈজ্ঞানিক-যুগের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। কিন্তু সকলদিক দিয়া বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকযুগের সূচনা করিয়া দিয়াছে। কোন নূতন ব্যাপার নজরে পড়িলে একটা বিস্ময়ের ভাব প্রথমে আমাদের মনে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তার পরই সেই জিনিষটাকে আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্যে লাগাইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। গত শতাব্দীতে যে সকল বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া গেছে তাহাদের প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ ও বিস্ময়-কর। সেগুলিকে পাইয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া যে জয়োল্লাস ও আনন্দ-কোলাহল উঠিয়াছিল তাহার এখন প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। নবাবিষ্কৃত ব্যাপারগুলিকে প্রাত্যহিক কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য যে প্রবল তৃষ্ণা ছোট বড় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও নানা আবশ্যক অনাবশ্যক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিতে বসিয়াছে। এখন লাভক্ষতির হিসাব পরীক্ষা করিবার সময় উপস্থিত। যে সকল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে সত্যই বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এখন যেন কলকারখানার ভিতর তাপবিদ্যুৎ ও চুম্বক-শক্তির খেলা দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, বিজ্ঞানের গূঢ়তম অংশে যে এক বৃহৎ তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহারি সন্ধানে সকলে ফিরিতেছেন। ইঁহারা বুঝিয়াছেন তাপালোক বিদ্যুৎ-চুম্বক এবং রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি যে একটি মূলভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বিচিত্র লীলা দেখাইতেছে, তাহার সন্ধান করিতে না পারিলে সকলি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুগঠিত যন্ত্র বা অপর কোন নূতন কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদিগকে আনন্দ দিতে পারিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যেন এগুলি দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না।

---

* It is a wholly uninformed view of the divergence between the techincal characteristics of European and Indian art to explain that Indian artists never learnt anatomy and drawing, for a thorough knowledge of artistic anatomy and capacity to draw imitatively from nature are accomplishments within the power of every mediocre painters and sculptors, while Indian artists have frequently exhibited intellectual gifts of the rarest and highest order.—Havell's *Indian Sculpture and Painting*, p. 32.

এই অতৃপ্তি এবং সত্যলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এখন অপর কোন বিশেষ দেশের বিশেষ বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায়ে আবদ্ধ নাই। সমগ্র জগতেরই বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ থাকিলে অতি দুর্লভ জিনিষও করায়ত্ত হইয়া পড়ে। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক সারসত্যের জন্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমেই সেই বাঞ্ছিতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকযুগের সূচনা করিয়া দিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল নবসত্যের কয়েকটির উল্লেখ করিব।

অধিক দিন নয়, দশ বারো বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ জড়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম্মগুলিকে নাড়া-চাড়া করিয়া সময় কাটাইতেন। সেগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করাই যে বিজ্ঞানালোচনার চরম সার্থকতা, তাহা তাঁহাদের মনেই হইত না। যে উৎস হইতে সমগ্র শক্তির ধারা বাহির হইয়া অনন্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই যে, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে এবং সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে, একথাও তাঁহারা মনে করিতে পারিতেন না। ইলেক্ট্রন্ (Electron) সংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত অল্প দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদিগকে সেই উৎসেরই পথে চালাইতেছে। এটা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার।

প্রায় শত বৎসর ধরিয়া বিদ্যুৎ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ নাড়া-চাড়া করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘকালে উহার যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করা হয় নাই। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইহার অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন জড় ও জীবের ধর্ম্মে এবং রাসায়নিক পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপারেও বিদ্যুতের কার্য্য দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখাকে এক একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া যে একটা বিশ্বাস পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার ভ্রম পদে পদে ধরা পড়িতেছে। দার্শনিকগণই এখন বলিতেছেন, সর্ব্বশক্তিমানের একটু শক্তিকণিকাই বিশ্বে সঞ্চারণ করিয়া তাহাকে এত বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। আমরা বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াও আজ সেই সত্যের সুস্পষ্ট আভাষ পাইতেছি। এটাও বড় কম লাভের কথা নয়।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, জগতে কোন জিনিষকে একেবারে তাপশূন্য হইতে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ তথাপি জড়ের এক তাপহীন অবস্থা (absolute zero) কল্পনা করিয়া অনেক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই প্রকার কোন বাস্তব পদার্থের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকায় সকল তত্ত্বের সুমীমাংসা হইত না। যে স্থানটুকু জুড়িয়া আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী বা অপর গ্রহনক্ষত্রগণ অবস্থান করিতেছে, কেবল তাহাতেই তাপের লীলা দেখা যায়। অনন্ত বিশ্বের অধিকাংশ স্থানই নিস্তাপ, নিস্পন্দ এবং স্তব্ধ। বর্ত্তমান যুগেই অধ্যাপক ডিওয়ার (Prof. Dewar) দীর্ঘ সাধনার ফলে পদার্থকে নিস্তাপ করিবার উপায় উদ্ভাবন

করিয়া সেই শুদ্ধ প্রকৃতির সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন"। ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়কে এক নূতন দিক দিয়া দেখিয়া জড়ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অণুবীক্ষণযন্ত্র বহুকাল হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক গভীর তত্ত্বেরও আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কখন এই যন্ত্রে অণুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেই উহার নামটি সার্থক হইতে চলিয়াছে। ধাতব পদার্থের অণুর সংগঠন আজকাল অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা ধরা পড়িতেছে। বিশেষত চাপ প্রয়োগ করিলে বা টানিলে ঐ সকল পদার্থে আণবিক বিন্যাসের যে একটু আধটু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই আবিষ্কারটিকেও আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলা যাইতে পারে।

নিউটন্ সাহেব তাপ ও আলোকের রশ্মিকে জড়কণার প্রবাহ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, উজ্জ্বল বা উত্তপ্ত পদার্থমাত্রেই নিজদেহের অতি সূক্ষ্ম কণা ত্যাগ করিয়া তাপালোক-রশ্মির উৎপত্তি করে। কিন্তু সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ঘটনার সহিত নিউটনের এই সিদ্ধান্তের মিল দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে গত শতাব্দীর মধ্যকালে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের জন্ম হইয়াছিল। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ পদার্থকেই অল্পাধিক পরিমাণে রশ্মিবিকিরণক্ষম দেখিতে পাইতেছেন। এই রশ্মিগুলি সাধারণ তাপ বা আলোকের রশ্মি নয়। পদার্থের দেহেরই অতি ক্ষুদ্র কণা রশ্মির আকার গ্রহণ করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলে। এগুলি বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

জড়পদার্থের এই বিয়োগধর্ম্মটি আধুনিক বিজ্ঞানে এক নূতন আলোক পাত করিয়াছে। জগতের সমগ্র জিনিষই ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাহাদেরই দেহের ভস্মকণিকা হইতে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। এই সুন্দর জড়জগতের তলায় তলায় যে, এত ভাঙাগড়া, জন্ম-মৃত্যু, ঘাত-প্রতিঘাত, হাস্য-ক্রন্দন নীরবে চলিতেছে, তাহা বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-গণই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। তিথি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, চেতন-অচেতন এবং প্রাণি-উদ্ভিদ্ সকলই সেই ভাঙাগড়ার ভিতরে পড়িয়াই এত সুন্দর এবং এত আনন্দময় হইয়াছে। তাই আমাদের কবি সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

"পারবি নাকি যোগ দিতে এ ছন্দে রে,
এই খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙ্‌বারই
আনন্দে রে,
পাতিয়া কান শুনিস্ না যে,
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণবীণায় কি সুর বাজে
তপন তারা চন্দ্রে রে,
* * * * *
ছেড়ে দেবার ফেলে দেবার মারবারই
আনন্দে রে॥"

যখন ওয়াট্ সাহেব বাষ্পীয়যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, তখন জগৎ ব্যাপিয়া এক ভীষণ আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। কলের সাহায্যে অল্পব্যয়ে বহুকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ভাবিয়া সকলেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তখন হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। কতটা শক্তি খাটাইয়া কল হইতে কতটা কাজ আদায় করা গেল, তখন তাহা হিসাব করা যাইত না। শক্তি ও কার্য্যের মাপ-কাটিও জানা ছিল না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মাপ-কাটি গড়িয়া এখন শক্তি এবং কার্য্যকে মাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজকাল বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র বলিয়া যে সকল কল প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রযুক্ত শক্তির শতকরা কেবল ১৮ ভাগ মাত্র কাজে লাগে। অবশিষ্ট ৮২ ভাগ কলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে বৃথা গরম করাইয়া ব্যয়িত হয়। ইহা দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন এই বাজে খরচের পরিমাণ কি প্রকারে কমানো যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাণিদেহের মাংসপেশী খাদ্য হইতে যে শক্তি আহরণ করে, তাহার সমস্তটাই বাহিরের কাজে ব্যয় করে না। ইহার অনেকটা দেহের উত্তাপ রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। তথাপি খাদ্য হইতে সংগৃহীত শক্তির অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ আমরা বাহিরের কাজে লাগাইতে পারি। একজাতীয় সমুদ্রচর মৎস্য (Electric Eel) ইচ্ছামত শরীর হইতে বিদ্যুৎ নির্গত করিতে পারে। এই বিদ্যুতের দ্বারা তাহারা ক্ষুদ্র জলচরদিগকে বধ করিয়া আহার করে। সহজ অবস্থায় সূক্ষ্ম তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্রে এই তড়িতের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু শিকারের সময় উপস্থিত হইলেই মেরুদণ্ডের স্নায়বিক কোষ সকল উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ এত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ তড়িৎ উৎপন্ন করিবার জন্য মৎস্য-দেহে কোন প্রকার জটিল যন্ত্র নাই, এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলে তাহার এক কণাও বৃথা তাপ উৎপাদন করিয়া ব্যয়িত হয় না। জোনাকি-পোকা যে আলোক প্রদান করে তাহা একবারে তাপশূন্য শক্তির ষোল আনাই তাহাদের দেহের বাহুল্য-বর্জ্জিত যন্ত্র দ্বারা আলোকে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি দেবী তাঁহার অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া যে কৌশলে বাজে খরচ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ এখন তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। জৈব পদার্থের অনুরূপ কোন জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের এবং নানা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহে সেই বস্তুকেই অনায়াসে অতি দ্রুত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই কার্য্যের জন্য বৈদ্যুতিক উনান্ বা সুসজ্জিত পরীক্ষাশালা কিছুরই আবশ্যক হয় না। প্রকৃতি যে কৌশলে প্রত্যেক শক্তিকণিকার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহারই অনুকরণে যন্ত্রগুলিকে বাহুল্যবর্জ্জিত ও সরল করাই যে প্রধান কর্ত্তব্য আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণই তাহা বুঝিয়াছেন।

গত শতাব্দীর শেষকালে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর সাহেব চিনি হইতে সুরার উৎপত্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া যখন জীবাণুর কার্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তখন সেই জীবাণুর তত্ত্ব লইয়া যে বিজ্ঞানের এক মহাশাখা গঠিত হইতে পারিবে, একথা কাহারও মনে হয় নাই। জীবাণুর (Bacteria) নাম শুনিলেই আমরা তাহাদিগকে নানা প্রকার ব্যাধির উৎপাদক এবং প্রাণীর পরম শত্রু ভাবিয়া আতঙ্কিত হই। জীবাণু এক জাতীয় জীব নয়। প্রাণীর যে বৃহৎ বিভাগটিকে আমরা পতঙ্গ বলি, তাহা যেমন ছোটবড় নানা-আকারের সহস্র সহস্র প্রাণী লইয়া গঠিত, জীবাণুও সেই প্রকারে এক বৃহৎ জীব-পরিবারের নাম মাত্র। ইহাও নানাশ্রেণীর এবং নানা প্রকৃতির আণুবীক্ষণিক জীবের সমষ্টি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দেড়হাজার বিচিত্র জীবাণুর সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু এই বিশাল জীব-পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র পঞ্চাশটিকে মানবের শত্রু বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে সুশীল এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের পরম সুহৃদ্। ইহাদের জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে মনে হয়, উচ্চতর জীবের কল্যাণ সাধনের জন্যই যেন ইহাদের জন্ম। কেহ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্‌কে পুষ্ট করিতে ব্যস্ত, কেহ গলিত জীবাবশেষের বিশ্লেষণ করিয়া মৃত্তিকাকে উর্ব্বর করিবার জন্য নিযুক্ত। নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়ের জলরাশিকে যে আমরা এত নির্ম্মল দেখি, তাহাতেও জীবাণুর হস্তচিহ্ন বর্ত্তমান। আধুনিক চিকিৎসকগণ এই সকল ক্ষুদ্র জীবের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াই আজকাল নানা ঔষধের আবিষ্কার করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিগ্রস্ত সহস্র সহস্র নরনারীর রোগযাতনা দূর হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ইহাদের অশেষ মঙ্গল কার্য্য ধরা পড়ে। মদ্য প্রস্তুত, দধি ক্ষীর মাখন উৎপাদন; এমনি কি, উৎকৃষ্ট রুটি প্রস্তুত প্রকরণেও বিশেষ বিশেষ জীবাণুর বিচিত্র কার্য্য দেখা যাইতেছে। জীবাণুবিদ্‌গণ এখন জীবাণুগুলির মধ্যে যেগুলি সুশীল তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে শিখিয়াছেন, এবং লালনপালন করিয়া তাহাদিগকে নানা কাজেও লাগাইতেছেন।

কোন বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের কতটা সুবিধা হইল ইহাই বিবেচনা করিয়া আবিষ্কারের মূল্য নির্দ্ধারণ করা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাহাকে বিজ্ঞানের মাপদণ্ড বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বীকার করিলেই বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো করিয়া দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে জ্ঞান প্রকৃতির সহিত পরিচয় স্থাপন করাইয়া মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত সৃষ্টির মহিমা দেখায়, তাহাই বিজ্ঞান। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তিনি কেবল জ্ঞানী নহেন, জ্ঞানের বৃদ্ধি করাও তাঁহার একটা কাজ। আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সাহায্যে উৎকৃষ্ট দধি বা ক্ষীর প্রস্তুত হইল কি না,

কেবল তাহা দেখিয়াই আধুনিক বিজ্ঞানে জীবাণুতত্ত্বের স্থান নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না। জীবাণুর আবিষ্কারে প্রাকৃতিক কার্য্যের যে সকল কৌশল জানা গিয়াছে, [illegible] তাহাদেরি গুরুত্ব দেখিতে হই[illegible]। জীবাণুতত্ত্ব এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা কেবল [illegible] জন্যই জীবাণুতত্ত্বকে আধুনিক [illegible]জ্ঞানিকযুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

মোহিনী

(১)

সে দিন বসন্তের বায়ু বহিতেছিল। কোকিল ডাকিতেছিল। চন্দ্র হাসিতেছিল।

পুষ্করিণীর ধারে মোহিনী একাকিনী বসিয়া পুষ্করিণীর জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকিরণ দেখিতেছিলেন।

(২)

মোহিনীর স্বামী থাকিতেও তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী বহুদিন হইতে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অদ্য অতি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ইংরাজীতে তাঁহার শ্বশুরকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। কি উপায়ে বিলাতে তাঁহার সংসার চলিবে, বিলাতে তিনি কি করিবেন, কেন তিনি গৃহে ফিরিবেন না, এ সকল বৃত্তান্ত তিনি কিছুই লিখেন নাই। তাঁহার নিজের পিতার বিশেষ সঙ্গতি কিছুই ছিল না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন অর্থের জন্য, স্ত্রীর জন্য নহে। তিনি শ্বশুরের অর্থে বিলাত গিয়াছিলেন। এরূপ জামাতা সুশীলচন্দ্র সহসা শ্বশুরমহাশয়কে কি প্রকারে ধীর, শান্ত এবং সংযত ভাবে এরূপ পত্র লিখিলেন; মোহিনীর পিতা রমেশচন্দ্র নানা দিক হইতে প্রশ্নটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, তখন তিনি একটি মাঝারি রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের গৃহে প্রয়াণ করিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ প্রবীণ ব্যক্তি। বহুতর কষ্টের তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া তিনি হাঁটিয়া গিয়াছেন। পায়ে ফোস্কা হইয়াছে, কিন্তু বসিয়া পড়েন নাই। দৈন্যের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি 'অনরের' সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে পুড়িয়া তাঁহার চরিত্র-স্বর্ণ কেবল বিশুদ্ধতর হইয়াছিল।

প্রাণকৃষ্ণ যখন তথাকথিত ব্যাপার শুনিলেন, তখন তিনি শিষ দিলেন; পরে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িলেন; পরে ভাবিলেন; পরিশেষে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন "হা।"

প্রাণকৃষ্ণ যখন অত্যন্ত করুণভাবে "হা" উচ্চারণ করিলেন, তখন রমেশ সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রাণকৃষ্ণ তাহার পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন।

কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ তাহা করিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন; রমেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে (অনধিক পাঁচ মিনিট কাল হইবে) প্রাণকৃষ্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "রমেশ বাড়ি যাও।"

রমেশ কহিলেন "বাড়ি যাইব কি! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিলেন "চাও না কি! —পাবে না!"

রমেশ। কেন!

প্রাণকৃষ্ণ। পরামর্শ দিবার কিছু নাই।

রমেশ। এখন মেয়ের কি হবে?

প্রাণকৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্য শিখুক। মনে কর সে বিধবা।

রমেশ প্রাণকৃষ্ণের উত্তরটিকে অত্যন্ত সন্তোষকর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "মোটে ষোল বৎসরের মেয়ে।"

প্রাণকৃষ্ণ। ১০ বছর বয়সেও কি মেয়ে বিধবা হয় না? এই ছয় বৎসর কাল সে যে সধবা ছিল, তার জন্ম সমাজকে ধন্যবাদ দাও।

রমেশ। তোমার কি আর কিছু বলবার নাই?

প্রাণকৃষ্ণ। আছে। তোমার আর তিনটি মেয়ে আছে ত?

রমেশ। আছেই ত!

প্রাণকৃষ্ণ। তোমার কন্যার চেয়ে রৌপ্যের দিকে যার বেশী লক্ষ্য, তার সঙ্গে কদাপি কোন কন্যার বিবাহ দিও না। আর দেরী করো না। আমার আহার প্রস্তুত।

রমেশ। আমিও না হয় আজি এখানে খেলাম।

প্রাণকৃষ্ণ। ও! খাবে! বেশ!" এই কথা বলিয়াই প্রাণকৃষ্ণ ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনিট পনর পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন— "ওঠো আহার প্রস্তুত।"

রমেশ সে রাত্রিকালে সেখানে ভোজন করিলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্নবাদ করিয়াও প্রাণকৃষ্ণের কাছে স্বীয় কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিমত আদায় করিতে পারিলেন না।

(৩)

ইংলণ্ডের একটি পরিবারের "ড্রয়িংরুম" আলোকিত! সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারী একত্র সমবেত। তাহাদের ভূষার পরিপাট্যে, উজ্জ্বল আলোকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে সেই কক্ষটি ইন্দ্রালয় বলিয়া দর্শকের ভ্রম হইতে পরিত—যদি ইন্দ্রালয় তিনি চক্ষে পূর্ব্বে দেখিতেন।

তাহার পরে নৃত্য, তাহার পরে বিশ্রাম ও সুরা, তাহার পরে আবার নৃত্য। রাত্রি শেষে নৃত্য ভঙ্গ হইলে সুশীলচন্দ্র কম্পিত কলেবরে গৃহে চলিয়া আসিলেন।

(৪)

সুশীলচন্দ্রের সহিত মার্গারেটের বিবাহের সব ঠিক, নিয়তির খড়্গ সুশীলচন্দ্রের স্কন্ধের উপর উঠিয়াছে, পড়িতে উদ্যত, এমন সময়ে প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নীলাম্বর তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুশীলচন্দ্র দিবাদ্বিপ্রহরে সোফায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কল্যকার রাত্রিজাগরণের পর দুপেয়ালা কাফি এবং পাউণ্ডখানেক চেক নিঃশেষ করিয়া তিনি রেণল্ডের মিষ্টরিস্ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রেণল্ড-খানি ভূতলে পড়িয়া গেল।

যখন সুশীলচন্দ্র যীশুখ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত স্বর্গ ও মার্গারেটের অঙ্গীকৃত আলিঙ্গন একসঙ্গে অনুভব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীলাম্বর দরোজায় টোকা দিয়া উত্তর না পাইয়াও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন "হ্যালো সুশীল! নিদ্রিত!"

সুশীল। (উঠিয়া) শয়তানের দোহাই! কে তুমি? (সুশীল যেরূপ ইংরাজি বলিলেন আমি তাহা যথাসম্ভব বাঙ্গালায় ভাবান্তরিত করিলাম।) নীলাম্বর একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন "আমি নীলাম্বর।"

সুশীল। নীলাম্বর! হ্যালো! তুমি এখানে!

নীলাম্বর। আশ্চর্য্য হচ্ছ! এবার ছুটিটা ব্রাইটনে কাটাবো ঠিক করেছি।

সুশীল। তা যেন করেছো! কিন্তু—এই মাত্র বলিয়া সুশীল মাথা চুলকাইলেন; তাহার পরে ভ্রষ্ট কলার তুলিয়া লইয়া গলায় পরিলেন; পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া fireplaceএর উপরিস্থ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেকটাই ঠিক করিয়া লইলেন; পরে আসিয়া নীলাম্বরকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"চাটার্জ্জি, আমার সুখে সুখী হও।"

(সুশীল ইংরাজীতে যাহা কহিলেন, congratulate me, তাহা বাঙ্গালায় ভাবান্তর হয় না! যত দূর সম্ভব তাহা ভাবান্তরিত করিয়া দিলাম।)

নীলাম্বর তাহার হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন "ব্যাপারখানা কি, বানার্জ্জি?"

সুশীল। তবে শোন। এই বলিয়া সুশীল পুনর্ব্বার fireplaceএর কাছে গিয়া তদুপরিস্থ তাক হইতে একটি সিগারেটকেস লইয়া নীলাম্বরকে দিলেন। নীলাম্বর তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইলেন। সুশীল সিগারেটকেসটি নীলাম্বরের হস্ত হইতে গম্ভীরভাবে লইয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। উভয়ে এইরূপে ভাবী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইলে সুশীল অতিকাতর ভাবে কহিলেন, "জানো, চাটার্জ্জি, তুমি এসে আমার কি ভেঙ্গেছো," বলিয়া দ্বারের দিকে অতীব মর্ম্ম-ভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইলেন। দ্বার যদি ভাঙ্গিয়া থাকিত তবে ত একটা শব্দ নিশ্চয়ই হইত। তিনি দ্বারের নিকটে গিয়া দ্বার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "কৈ দরজা ত ভাঙ্গেনি।"

সুশীল। শয়তান তোমায় গ্রহণ করুক। কে বলেছে যে, তুমি আমার ঘরের দ্বার ভেঙ্গেছো! তুমি যা ভেঙ্গেছো—সর্ব্বনাশ করেছো! ওহো জানোনা—তুমি জানোনা,—সুখী তুমি যে, জানোনা যে তুমি আমার কি ভেঙ্গেছো! কারণ তুমি আমার বন্ধু। আমার কি ভেঙ্গেছো তা যদি জান্তে, যদি বুঝিতে পার্ত্তে, যদি ধারণা কর্ত্তে পার্ত্তে—তাহ'লে—তাহ'লে তাহ'লে—তাহ'লে—এক কথায় দুঃখিত হতে। যাক, জানোনা;

সে ভালই হয়েছে! আমি কিছু মনে কর্ব্বো না। ভুলে যাবো, যদি তোমা সম্ভব হয়।

নীলাম্বর। বল না আমি তোমার কি ভেঙ্গেছি। আমি তার দাম দিতে প্রস্তুত আছি।

সুশীল। দাম!—চাটার্জ্জি! দাম দেবে, তার দাম তুমি দেবে! তোমার বাপের বিষয় বিক্রয় করেও তার দাম দিতে পারো না।

নীলাম্বর উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন। আবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন। কিছুই ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন না। শেষে অতি করুণ সুরে কতক স্বগত কহিলেন "ভাঙ্গলাম কি!" তাঁহার সেই কাতরোক্তিটি মৃতবৎসা ছাগীর অস্ফুট ক্রন্দনের মত শুনাইল। তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে সুশীল বিচলিত হইলেন। তিনি কহিলেন "চাটার্জ্জি, তবে শোন, তুমি কি ভেঙ্গেছো। আমি ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম জানো?"

নীলাম্বর। না।

সুশীল। আমি মার্গারেটকে স্বপ্নে দেখছিলাম। তুমি সেই স্বপ্ন ভঙ্গ করেছো।

নীলাম্বর আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বাপের বিষয় বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিনি মার্গারেটের প্রতি সুশীলের অনুরাগের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না।

সুশীল আবার কহিলেন "আমি মার্গারেটকে—এঁ্যা—বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি। বিবাহ এই ভেসরা মার্চ্চ। সব স্থির। তাই বলছিলাম বন্ধু আমার সুখে সুখী হও।

যদি ঠিক সেই সময়ে গৃহকর্ত্রী স্বয়ং চায়ের সরঞ্জম লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেন নীলাম্বর তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্যামপুকুরের গলির ১২।১ নং ভবনস্থ রমেশচন্দ্রের কন্যা মোহিনীকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন; কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল শ্বশুরের অর্থেই বিলাতে আইন পড়িতে আসিয়া প্রতি ছুটিতে ব্রাইটনে সামুদ্রিক বাতাস সেবন করিয়া থাকেন; কারণ তিনি জানিতেন যে আইনে দ্বিবিবাহের (bigamy) শাস্তি বেশ একটু গুরুতর। তিনি জানিতেন না কেবল মানবচরিত্র। মানুষ যে এতদূর হেয় কৃতঘ্ন হইতে পারে, তাহা কদাপি তিনি সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

নীলাম্বর কহিলেন "সে কি! এ যে দ্বিতীয়বার বিবাহ।"

সুশীল ব্যঙ্গহাসি হাসিলেন, কহিলেন—"হাঁ। তা জানি।"

নীলাম্বর। জেলে যাবে?

সুশীল। মার্গারেটকে নিয়ে জেলে কেন, হেলে অর্থাৎ নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি। তুমি জানো না! তাকে দেখনি।

নীলাম্বর। নাই বা দেখলাম!

সুশীল। তার গায়ের রং তুহিনের চেয়ে শুভ্র।

নীলাম্বর। অনেক সাদা চামড়ার নীচে—

সুশীল। তার কেশদাম—ওঃ ঠিক যেন গোধূলি।

নীলাম্বর। হলেই বা—

সুশীল। তুমি দেখোনি, সে চুল নয়, উল।

নীলাম্বর। তার না হোক তোমার ত বটে। তার চুল উল হোক আর যাই হোক, তুমি 'ফুল' হোয়োনা। শোন।

সুশীল। তার বক্ষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত।

নীলাম্বর। বক্ষ সমুদ্রতরঙ্গের মত হলেই যে তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র সম্বন্ধ হতেই হবে, এ কথা কেউ বলেছে কি।

সুশীল। কেন শেলি!

নীলাম্বর। ঐ কথা বলেছে? নিয়ে এসো শেলি।

সুশীল। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা!

নীলাম্বর। তাঁরা এই কথা বলেছেন যে সুন্দর পুরুষ সুন্দরী নারীর মধ্যে সম্বন্ধ ঐ একটি মাত্র। তা হলেও, এক মাত্র বিবাহই এই পশুর প্রবৃত্তিকে মানুষের ধাপে তুলতে পারে। বিবাহে এক কর্ত্তব্যজ্ঞানই এই সম্বন্ধকে পবিত্র করে দেয়।

সুশীল। আমি ত তাকে বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি।

নীলাম্বর। এ বিবাহ নয়, এ স্বেচ্ছাচার। এ বিবাহ হয় না—ঈশ্বরের আইনেও হয় না, মানুষের আইনেও হয় না। একজনকে বিবাহ করে' এসে—

সুশীল। হিন্দুসমাজে কি দুই স্ত্রী হয় না? কুন্দনন্দিনী—

নীলাম্বর। উচ্ছন্ন যাক্ কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনীও যা রোহিণীও তাই।

সুদূর বিলাতে ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে 'সোফা' শোভিত গৃহকক্ষে এরূপ কথোপকথন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বাঙ্গালা উপন্যাস যে অনেক নব্যযুবকের মস্তক বিগড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যকার দিনে এ অসংযত প্রবৃত্তির মাত্রা চড়িয়াছে। এ প্রবৃত্তি নব্যযুবকের কাছে বড় মনোরম, বড় প্রীতিপ্রদ। রেনল্ডের উপন্যাস এই প্রবৃত্তিতে আহুতি দিতেছে। এ কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিতেই হইবে। কারণ এ ব্যাধি বড় সংক্রামক।

বলা বাহুল্য যে নীলাম্বরের যুক্তি সুশীলের প্রবৃত্তির গতিরোধ করিতে পারিল না। সুশীলের বিবাহ হইয়া গেল।

(৫)

"আমার পুত্রের বিপক্ষে মোকদ্দমা আস্তে আমি নীলাম্বরকে লিখেছি।"—কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ সিদ্ধেশ্বর এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন।

রমেশ কহিলেন "সে কি ভশ্চার্যি মহাশয়! সে আপনার পুত্র।"

সিদ্ধেশ্বর। আমার ত্যাজ্যপুত্র।

"আমার" বলিতে সিদ্ধেশ্বরের স্বর এরূপ উচ্চে উঠিয়াছিল যে রমেশ ভাবিয়াছিলেন যে সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় তৎপরেই একটা অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ অভিশাপ উচ্চারণ করিবেন। কিন্তু যখন সে চীৎকার "ত্যাজ্যপুত্রে" মাত্র পর্য্যবসিত হইল তখন রমেশ কতক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণ স্বরে কহিলেন—"আর সে আমার জামাই—

সিদ্ধেশ্বর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন "জামাই বটে।" কিন্তু এ ঝাল নিজের উপর ঝাড়িলেন, কি বৈবাহিকের উপর ঝাড়িলেন কি স্বীয় পুত্রের উপর ঝাড়িলেন, তাহা বক্তা কি

শ্রোতা কাহারও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না। বৃদ্ধের স্বর কাঁপিতেছিল। রমেশ ইহার উত্তরে কি কহিবেন তাহা তাঁহার কোনরূপে মনে আসিল না। তিনি উত্তর খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে, ষ্টেশনে যাত্রীর কাছে প্রত্যাশিত ট্রেণের মত প্রিয় প্রাণকৃষ্ণ সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

রমেশ আশা করিয়াছিলেন যে প্রাণকৃষ্ণ বুদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বরকে তাঁহার ভীষণ সংকল্প হইতে বিরত করিবেন। প্রাণকৃষ্ণের ধীশক্তির প্রতি রমেশের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পুত্রকে নির্য্যাতন করার অস্বাভাবিকতা রমেশ বুঝিতেছিলেন, কিন্তু ঝুঝাইতে পারিতেছিলেন না। নৌকা ডুবু-ডুবু, এমন সময়ে উপযুক্ত নাবিক উপযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিল। তিনি উৎসুক ভাবে প্রাণকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্রমে প্রাণকৃষ্ণ সিদ্ধেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শুনিলেন। শুনিয়াই চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন "সাবাস্।"

ইহা শুনিয়া রমেশ ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রাণকৃষ্ণের গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন —"কিন্তু শোন প্রাণকৃষ্ণ"—

প্রাণকৃষ্ণ সেদিকে দৃকপাত বা কর্ণপাত না করিয়া সাগ্রহে সিদ্ধেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আবার কহিলেন "সাবাস্ সিদ্ধেশ্বর! আজ মানুষের মত একটা মানুষ দেখ্‌লাম।''

রমেশ। কেন?

প্রাণকৃষ্ণ। রোমে ব্রুটস্ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন তাই তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের দ্বিগুণ স্নেহ বক্ষে ধরে' এই বঙ্গদেশে কত ব্রাহ্মণ ব্রুটস্ আছে কে জানে! তাদের মধ্যে তুমি একজন। এসো আবার আলিঙ্গন করি।

রমেশ উঠিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিলেন যে তর্কের এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহাতে তিনি না দাঁড়াইলে আর উপায় নাই। নহিলে তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার অন্য কোন কারণ লক্ষিত হইল না।

সিদ্ধেশ্বর। আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। তোমার ছেলে আমায় চিরকাল গুরুর মত ভক্তি করে। আমার কথা অমান্য কর্ব্বে না।

প্রাণকৃষ্ণ। সাধ্য কি? আমি তার উপর একটা তারে খবর পাঠাচ্ছি। বাপের কথা ত সে কখনই অবহেলা কর্ত্তে পার্ব্বে না। এমন ছেলেই তৈয়ের করি নি, রমেশ।

এই প্রথম সে দিন প্রাণকৃষ্ণ রমেশের সহিত কথা কহিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ। আমি 'তার' পাঠাচ্ছি এখনই।

এই বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া দ্বারের কাছে যাইলে রমেশ অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে সিদ্ধেশ্বরের দিকে চাহিলেন! সিদ্ধেশ্বর কন্যার পিতার ব্যথা বুঝিলেন। নানারূপ বিপরীত অনুভূতি আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি কহিলেন "প্রাণকৃষ্ণ, দাঁড়াও।"

প্রাণকৃষ্ণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমেশ। ক্ষমা কর।

সিদ্ধেশ্বর রমেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন —"কিন্তু সে ক্ষমার যোগ্য নয়—পাষণ্ড।"

প্রাণকৃষ্ণ। ব্যভিচারী—

সিদ্ধেশ্বর। নরাধম।

প্রাণকৃষ্ণ। মহাপাপী—

এই সময়ে মোহিনী কক্ষে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন "যাই হৌন্ তিনি আমার স্বামী।"

(৬)

এরূপ ঘটিবে রমেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ষোড়শী কন্যা এরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিবে, তাঁহার বৈবাহিকের সমক্ষে আসিয়া বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের সমক্ষে আসিয়া পড়িবে, এরূপ তিনি কখন প্রত্যাশা করেন নাই। নাটকে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবজীবনে—সত্য কথাটা কি—তিনি এরূপ দেখেননি! আমরাও স্বীকার করিতেছি যে আমরাও দেখি নাই। কিন্তু নারী-হৃদয়ের ব্যথা, চাঞ্চল্য, নারী হৃদয়ের বল; আমরা অধম পুরুষ কতটুকু জানি। —নারী! নারী! ঈশ্বর কি দিয়া তোমার ঐ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গড়িয়াছেন তিনিই জানেন। স্বর্গে দেবীরা কি এর চেয়েও সুন্দরী!

ফলকথা দাঁড়াইল এই যে সে টেলিগ্রাম গেল না। অন্য টেলিগ্রাম গেল। তাহার মর্ম্ম "নালিশ করাইওনা। পুত্রকে বলিও যে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।"

(৭)

সুশীলের বিবাহের পর এক বৎসর গিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মের সখ তাঁহার ইতি-পূর্ব্বেই মিটিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইংরাজস্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি পাইলেন। একদিন্ পরিত্যক্ত সুশীল আবার সেই ব্রাইটনে সমুদ্রধারে একা বসিয়া ভাবিতেছিলেন! স্ত্রীর অর্থ নিঃশেষ করিয়া নিজের রিক্ত পকেটে হস্ত দিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে আবার তাঁহার বন্ধু নীলাম্বর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্বকথিত পত্র ও টেলিগ্রাম দেখাইলেন। সুশীলের চক্ষে জল আসিল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অন্যমনে পত্র ও টেলিগ্রাম বক্ষের পকেটে রাখিলেন।

(৮)

মোহিনী চন্দ্রালোকে ভাবিতেছিলেন! দূরে সানাই বাজিতেছিল! সানাইয়ের তান কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময়ে মোহিনীর মা আসিয়া ডাকিলেন "মোহিনী।"

মোহিনী! মা! এই যে যাচ্ছি! রাত্রি হয়ে গিয়েছে, জান্তে পারিনি।

যেন কত সঙ্কোচ। যেন অপরাধ তাঁহারই।

মোহিনীর মা কহিলেন "এসো মা, জামাই এসেছে।" মোহিনী উঠিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়।*

উপরোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূল চারিখানি শিলালিপি, লিপি চারিখানিই গয়া জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ম। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের নিকটে একটি ক্ষুদ্র সূর্য্য-মন্দির আছে। এই মন্দির গাত্রে সংলগ্ন একখানি শিলালিপি নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে উৎকীর্ণ। এই লিপি হইতে জানা যায় যে কমাদেশের রাজা পুরুষোত্তম সিংহ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া তাহার পুনরুদ্ধার-সাধনে যত্নপর হন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সপাদলক্ষ পর্ব্বতের রাজা অশোক-চল্লদেব এবং ছিন্দরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। শিলালিপিখানির মূল বিবরণ এই,—রাজা পুরুষোত্তম সিংহ স্বীয় কন্যা রত্নশ্রীর গর্ভজাত মাণিক্য সিংহের মঙ্গলকামনায় একটি 'গন্ধকুটী' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি শ্রমণ ধর্ম্মরক্ষিতের অধ্যক্ষতায় নির্ম্মিত হয়। ইনি রাজা পুরুষোত্তমের গুরু। (১)

২য়। কিছুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় উক্ত অশোকচল্লদেবের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা ৫১ লক্ষণসংবতে উৎকীর্ণ। ইহাতে অশোকচল্লদেব কর্ত্তৃক এক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য দানের বিবরণ ছিল। মিঃ জে, ডি, বেগ্‌লার সর্ব্ব

---

* শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'লক্ষ্মণ-সেনের পলায়ন" নামক ছবিখানি উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এত বড় জাতীয় কলঙ্ক ও এত বড় ঐতিহাসিক ভ্রান্ত-বিবরণের একখানি ছবির প্রচার ও প্রকাশকালকে শুভ মুহূর্ত্ত বলিবার কারণ এই,—এই ক্ষুদ্র উপেক্ষণীয় বিষয় হইতে আজ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের গভীর গবেষণায় বাঙ্গালীর একটি প্রধান জাতীয় কলঙ্ক দূর হইবার উপায় হইয়াছে। সুরেন্দ্র-বাবুর ছবিখানি দেখিয়াই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহা বঙ্গদর্শনেই তীব্র সমালোচনা দ্বারা উহার কাল্পনিকত্ব প্রতিপন্ন করেন। সেই প্রবন্ধে এ বিষয়ে রাখাল বাবুর আবিষ্কৃত যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করেন, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। রাখাল বাবুর মূল প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখিত ইহা তাহার যথাযথ অনুবাদ। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ষোড়শবর্ষীয় প্রথম-মাসিক অধিবেশনে (২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) রাখালবাবু এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মিনহাজ্‌উদ্দীন তাঁহার তবকত্‌-ই-নাসিরি গ্রন্থে যে ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার বাঙ্গলা জয় করেন, লিখিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-সম্রাট্‌ ৺বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদর্শনে তাহা প্রকাশ করেন। তদবধি এই ভ্রমের নিরাকরণ করিবার জন্য অনেক মনীষীই যত্ন ও চেষ্টা করিতে-ছিলেন। সম্প্রতি বিধাতার কৃপায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ায় রাখাল বাবু দ্বারা এ বিষয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে নিরসন হইল। এই প্রবন্ধের সারমর্ম্ম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক, কি অন্যবিধ সাময়িক পত্রের সাহায্যে এই ঘটনা যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সে ভার গ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব।

ব: স:।

১। A. S. R. Vol. III., p. 126, pt. XXXV.; Ind Ant. Vol. X, p. 341.

প্রথমে এই লিপির আবিষ্কার করেন, এবং কানিংহামের "মহাবোধি" গ্রন্থে ইহার এক অস্পষ্ট ছায়াচিত্রও মুদ্রিত হইয়াছিল। এইখানি কোনও মন্দিরে সংলগ্ন না থাকায় কিছুদিন পরে এখানি হারাইয়া যায়। অবশেষে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের কর্ম্মচারী মিঃ এ, এচ্, লঙ্গ্‌হার্ষ্ট মিঃ বেগ্‌লারের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে কতকগুলি ভাস্কর্য্যের সঙ্গে এই খানি ক্রয় করেন। এই সঙ্গে আরও কয়েকখানি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সমস্তই এখন কলিকাতার ভারতীয় চিত্রশালায় আছে। (২) উক্ত অশোকচল্লদেবের লিপিখানির শেষ দুই পংক্তিতে এইরূপ আছে,—

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্রদিনে ২৯"

৩য়। বহুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সেখানি ৭৪ লক্ষ্মণসংবতে উৎকীর্ণ। সপাদলক্ষ পর্ব্বতের অন্তর্গত খসদেশের রাজা অশোকচল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের ধনরক্ষক সহনপাল যে সকল দান করেন, এই লিপিখানিতে তাহাই উল্লিখিত আছে। মিঃ ভি, হথর্ণ্‌ এই লিপিখানি বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কার করেন। মিঃ প্রিন্সেপ বহু পূর্ব্বে ইহার পাঠ ও চিত্র প্রকাশিত করেন। (৩) ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৪) ও পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী (৫) বুদ্ধগয়ায় এই লিপিখানিকে খুঁজিয়া পান নাই। সে কথা তাঁহারা তাঁহাদের প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমি এখানিকে সম্প্রতি বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্য্যরক্ষার কুটীরের উত্তরদিকে একটি আধুনিক অট্টালিকার গাত্রে সংলগ্ন দেখিয়াছি। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানবিভাগের সদ্যপরলোকগত ডাঃ ব্লক ইহার অবস্থিতিস্থান জানিতেন। সম্প্রতি ডাঃ ফ্লীট এই লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে এতদুক্ত অশোকচল্ল অথবা দশরথ জৈন ছিলেন; কারণ প্রথম পংক্তিতে "জিনেন্দ্র" শব্দ আছে। (৬) পণ্ডিত ভগবানলাল প্রথম পংক্তির যে পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। 'জিনেন্দ্র' বুদ্ধদেবেরই একটি প্রসিদ্ধ নাম। এই লিপির প্রথম পংক্তি এইরূপ,—

'নমো বুদ্ধায়। দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসকস্য। হে বজ্রচরণারবিন্দ-মকরন্দ-মধুকর-ফলকার।

এতদুল্লিখিত 'হে বজ্র' শব্দ মিঃ হথর্ণের চিত্রেও সুস্পষ্ট আছে। উহাও বুদ্ধদেবের একটি সুপ্রসিদ্ধ নাম। (৭) এই শিলালিপির সময়নিরূপক পংক্তি এইরূপ,—

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখবদি ১২ গুরৌ।

৪র্থ। বুদ্ধগয়ার গৃহতলের প্রস্তরে খোদিত অশোকচল্লদেবের আর একখানি উৎকীর্ণ লিপিও বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হই-

২। J. B. B. R. A. S. Vol. XVI., p. 359; Cunnigham's Mahabodhi, p. 78, pt. XXVII A.

৩। J. A. S. B. Vol. 5, p. 658, pt. XXX.

৪। *Buddh-Gaya*, p. 199.

৫। Ind. Ant. Vol. X, p. 346.

৬। J. R. A. S. 1909 p.

৭। Bendall's সুভাষিতসমুচ্চয়, Cambridge 1891 p.

য়াছে। ইহাতে তারিখ নাই। কানিংহাম তাঁহার "মহাবোধি" গ্রন্থে ইহারও একটি অপরিস্কৃত ছায়াচিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। (৮) এই লিপিখানি পূর্ণপাঠ কোথাও আজিও প্রকাশিত হয় নাই। বুদ্ধকে নমস্কার জানাইয়া লিপিখানি আরম্ভ করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহাতে কোন দানের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। তাম্রশাসনাদিতে যেমন দানের নিয়মাদির উল্লেখ দেখা যায় এই লিপির চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে সেইরূপ উল্লেখ আছে এবং অষ্টম পংক্তিতে অশোকচল্লদেব ও তাঁহার ধর্ম্মরক্ষিতেরও উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধোক্ত প্রথম শিলালিপির নবম ও দশম পংক্তি হইতে তাঁহার নাম আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পংক্তিতে সিংহলদেশীয় স্থবিরগণের (সিংহলস্থবিরাণাম্) উল্লেখ আছে। এই স্থানেই সাধনিক ব্রহ্মচাট ও মাণ্ডলিক সহজপাল নামক দুইজন রাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধোক্ত তৃতীয় শিলালিপিতেও এই দুই কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। সহজপাল যিনি পরে কুমার দশরথের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নামই ব্রহ্মচাট। তৃতীয় শিলালিপিতে 'চাটব্রহ্ম' লিখিত হইয়াছে। এরূপ শব্দ পরিবর্ত্তন প্রাচীন লিপিতে বিরল নহে। তৃতীয় শিলালিপিতে সহজপালের নাম সহনপাল লিখিত হইয়াছে উহা সম্ভবত ভুল; সহজপালই হইবে।

এই চারিখানি শিলালিপিতে উল্লিখিত অশোকচল্ল চারিজন ভিন্ন ব্যক্তি অথবা একই ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে ডাঃ ফ্লীট সম্প্রতি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার এক নব্য সংখ্যায় মীমাংসা করিয়াছেন। চারিখানি শিলালিপিতেই যে একই ব্যক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রমাণিত হইতে পারে,—(১) অশোকচল্লদেবের নাম ভিক্ষু ধর্ম্মরক্ষিতের নামের সহিত ১ম ও ৪র্থ লিপিতে উল্লিখিত আছে। এই উভয় লিপিতেই ধর্ম্মরক্ষিতকে 'কমাবাজগুরু' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সুতরাং এই দুই শিলালিপির অশোকচল্লদেব একই ব্যক্তি স্বতন্ত্র নহেন। (২) তৃতীয় শিলালিপিতে যে রাজকর্ম্মচারীদিগের উল্লেখ আছে, চতুর্থ শিলালিপিতেও তাঁহাদেরই উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শিলালিপির অশোকচল্লও অভিন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয় শিলালিপিতে অশোকচল্লের পরিচায়ক অন্য কোন কথা না থাকিলেও অন্য শিলালিপিগুলির অশোকচল্লের সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিবারও যখন কিছু নাই, তখন অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিলেও কোন ক্ষতি হইতেছে না।

অশোকচল্লদেবের নাম লইয়াও একটু গোল আছে। প্রথম ও তৃতীয় শিলালিপিতে 'অশোকচল্ল' এইরূপ বানান সুস্পষ্ট আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ শিলালিপিতে 'অশোক বল্ল' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই নামটিকে প্রথমেই 'অশোকচল্ল' বলিয়া স্থির করেন। (৯) কানিংহাম ইহার দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ

৮। Mahabodhi, pt. XXVIII C.

৯। Ind. Ant. Vol. X. p. 342.

করেন। (১০) আমরা 'অশোকচল্ল' পাঠই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কারণ প্রথম ও তৃতীয় লিপি দুইখানি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে যত্নসহকারে খোদিত এবং ইহাতে ভুল নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ লিপি দুখানি অতি অযত্নে খোদিত এবং ভুলে পরিপূর্ণ, তদুপরি এই উভয় লিপিতে 'ব' ও 'চ' এই দুই বর্ণের পার্থক্য বিশেষ স্পষ্ট করিয়া রক্ষিত হয় নাই। এরূপ স্থলে পরিষ্কার ও সযত্নখোদিত লিপির পাঠ অনুসরণ করাই সমীচিন বলিয়া মনে করি।

এই লিপিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। উহাতে যে 'অতীত' পদের উল্লেখ আছে, তাহা কোনও বিশেষার্থবোধক এবং বহু পণ্ডিত বহুভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উনিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ কীলহর্ণ্‌ যখন লক্ষ্মণ সংবৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন (১১) সেই সময়েই ঐ প্রবন্ধেই তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে লক্ষ্মণসংবতের সৃষ্টিকাল ১০৪১ শকাব্দের সহিত সমান, ১০২৮ শকাব্দের সহিত নহে। ত্রিহুতের আধুনিক পঞ্জিকাগুলির উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোক্ত ধারণা (১০২৮ শকাব্দ) অবধারিত হইয়াছিল এই পঞ্জিকাগুলি ভুল। ডাঃ গ্রিয়ারসন শিবসিংহের যে তাম্রশাসন প্রকাশ করেন সেখানি যে জাল তাহাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। (১২) 'অতীত,' 'গত' বা তদ্বৎ অন্যান্য শব্দ সকলের রাজ্যকালাঙ্কের সহিত ব্যবহার অতি বিরল। ডাঃ কীলহর্ণের উত্তরভারতীয় খোদিত-লিপির তালিকায় কেবল একটি মাত্র উদাহরণ আছে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অন্যভাবে করা হইয়াছে। (১৩) এই বিষয়ে ডাঃ কীলহর্ণের মন্তব্যের অনুবাদ এই স্থলে প্রদত্ত হইল,—

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে তাঁহার রাজ্যকালের বৎসর উল্লেখ করিতে হইলে 'শ্রীমল্লক্ষ্মণদেবপাদানাং রাজ্যে' বা 'প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে' সংবৎ—এইরূপে বর্ণিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐরূপ বর্ণনাই থাকে কিন্তু 'রাজ্যে' পদের পূর্ব্বে "অতীত" প্রভৃতি পদ থাকিলে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে,—লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ কাল হইতেই এপর্য্যন্ত বৎসর গণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রাজ্য কাল প্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয়া গিয়াছে। (১৪)

তৃতীয় শিলালিপির শেষ পংক্তি ডাঃ কীলহর্ণ্‌ যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা

১০। Mahabodhi, p. 78.

১১। Ind, Ant. Vol. XIX, p. 1.

১২। Proc: A. S. B. 1895. p. 144, pt. III.

১৩। Ep. Ind. Vol. V. App. No 166.

১৪। During the reign of Lakshmanasena the years of his reign would be described as "*Srimallakshmana-devapadanain rajye* (or *Prabardhamana-vijayarajye*) *samvat*;" after his death the phrase would be retained but *atita* prefixed to the word *rajye* to show that, although the years were still counted from the commencement of the reign of Lakshmanasena that reign itself was a thing of the past."—Ind. Ant. Vol. XIX, p. 2, note 3.

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অনুবাদ অপেক্ষা সরল ও বিশদ হইয়াছে। 'অতীতে', পদ দ্বারা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে কোন ক্লেশ পাইতেই হয় না। তিনি আরও বলেন,—মিঃ ব্লকম্যান ১১৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বাঙ্গলা জয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে যখন বলেন "শেষ হিন্দুরাজা লখ্‌মণিয়া (Lakhmaniya) ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করিতেছিলেন"—ইহা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বুঝা যায় না যে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষ্মণসংবতের ৮০ অব্দ চলিতেছিল,—শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানাম্ অতীতরাজ্যে সংবৎ ৮০ হ" (১৫) অবশেষে ডাঃ কীলহর্ণ্ এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "সেনরাজগণের সময়-নিরূপণ" নামক প্রবন্ধে বল্লালসেনের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ দানসাগরের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে বল্লালসেন ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (১৬) অল্পদিন পরেই পণ্ডিত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সংস্কৃত পুথি অনুসন্ধানের ষষ্ঠ খণ্ড বিবরণ প্রকাশ করেন। এই বিবরণে বল্লালসেনের রচিত 'অদ্ভুত সাগর' নামে আর একখানি গ্রন্থের একটি দীর্ঘ বিবরণ ছিল। (১৭) ইহাতে ডাঃ ভাণ্ডারকর যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তদনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে বল্লালসেন এই গ্রন্থ ১০৯০শকে বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রবাবুর কথিত দানসাগরের বৃত্তান্ত ইহাদ্বারা সমর্থিত হইলে ডাঃ কীলহর্ণ্ এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণগুলি এই,—

১। বঙ্গরাজ বল্লালসেন রচিত 'দানসাগর' গ্রন্থের দুইখানি পুথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে,—

"নিখিলচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেন পূর্ণে।
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো-
রচিত ॥"

এই পুথি দুইখানির একখানি ইণ্ডিয়া আফিসে সংগৃহীত হইয়াছে। এখানিতে এই সময়নিরূপক শ্লোকে উল্লিখিত বর্ষ সংখ্যা সংখ্যাদ্বারাও লিখিত আছে। (১৮) অপর পুথিখানি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ পুস্তকালয়ে আছে। এইখানিতে আরও দুইটি শ্লোক আছে, তদ্দ্বারা সময়-প্রকাশ আরও বিশদরূপে হইয়াছে।

"রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে
ভূতা দানসাগরস্যাস্য।
ক্রমশোঽত্র সম্পরিদানুপাস্থা
বৎসরা পঞ্চ ॥
তদেবমেকনবত্যধিক বর্ষ
সহস্রারেঽষ্টিতে শাকে।
সম্বৎসরাঃ পতন্তি
বিশ্বপদারভ্য চ ॥" (১৯)

১৫। Ind. Ant. Vol. XIX., p. 7.

১৬। J. A. S. B. 1896, pt. I, p, 23.

১৭। Report on the Search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, during the years 1889—91, p. LXXXII.

১৮। Eggeling's India Office Catalogue, pt. III. p, 545.

১৯। Sashtri's notices of Sanskrit Manuscript, 2nd Series, Vol. I, p. 170.

২। বল্লালসেনের রচিত অপর একখানি গ্রন্থ "অদ্ভুতসাগর" সম্প্রতি বোম্বাই গভর্মেণ্টে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে,—

'খনবখেন্দ্বব্দে আরেভে অদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতেঃ॥'

এইরূপ বিভিন্ন পুথিতে সময়ের একতা দর্শন করিয়া এক প্রকার নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে হয় যে বল্লালসেন ১০৯০-৯১ শকাব্দায় (১১৬৮-৯ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং লক্ষ্মণসেন ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের পরে রাজ্যারোহণ করেন; কিন্তু ডাঃ কীলহর্ণ্‌ ইতিপূর্ব্বে যে লক্ষ্মণসংবতের আরম্ভকাল ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় না দেখিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু নিম্নলিখিত ঘটনার অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "লঘুভারত অনুসারে বল্লালসেন যখন মিথিলা-যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়। এই সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়"—এই ঘটনায় বল্লালসেন এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার নববিজিত মিথিলারাজ্যে একটি নূতন অব্দ প্রতিষ্ঠাপিত করেন ও উহা 'লক্ষ্মণসংবৎ' নামে অভিহিত করেন।" (২০) এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত এই মাত্র জানা গিয়াছে ডাঃ কীলহর্ণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণগুলির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে এপর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হন নাই।

নগেন্দ্রবাবুর নিজসংগৃহীত দানসাগর পুথিখানি বিশেষ প্রাচীন গ্রন্থ নহে। উহা আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুথিখানি দেখিয়া শুনিয়া আমাকে বলিয়াছেন, উহা দুই তিন শত বর্ষের প্রাচীন হইবে। ইণ্ডিয়া অফিসের পুথিখানিও ঐ রূপ অক্ষরে লিখিত। (২১) সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর পুথি অপেক্ষা বড় বেশী প্রাচীন হইবে না। এসিয়াটিক সোসাইটিতে দানসাগরের যে পুথি আছে, তাহাও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং প্রায় বিশুদ্ধ। এই পুথিতে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকের একটিও নাই, অথচ সেনরাজবংশাবলী আছে। (২২) কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহারাজের পুস্তকালয়ে আর একখানি দানসাগরের পুথি আছে। এখানি ১৭২৮ শকাব্দার (১৮০৬ খৃষ্টাব্দে) প্রতিলিপি। ইহাতেও উক্ত শ্লোকগুলি নাই। (২৩) এইরূপে একই পুস্তকের প্রায় সমসাময়িক চারিখানি পুথি পাইতেছি, তাহার মধ্যে একখানিতে সময়নিরূপক তিনটি শ্লোক, আর একখানিতে একটি শ্লোক আছে এবং অন্য দুখানিতে কিছুই নাই। এই ব্যাপার লইয়া বিবেচনা করিলে ঐ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারা যায় এবং তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। সময়নিরূপক প্রথম শ্লোকটিই সর্ব্বপ্রথমে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য উহা দুইখানি পুথিতে দেখা যাইতেছে।

২০। J. A. S. B. 1896, pt. 1, p. 23.

২১। Eggeling's India Office Catalogue, pt. III.

২২। Mss. No II.

২৩। Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit, Mss., 1st Series, Vol. I, p. 151.

কিন্তু শেষ শ্লোক দুইটি উহারও পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া একখানি ব্যতীত অপর কোন পুথিতে নাই। পণ্ডিত ভাণ্ডারকর যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও ঐ একখানি মাত্র পুথিতে দেখা গিয়াছে। "অদ্ভুতসাগরের" আরও অনেকগুলি পুথি অনেকস্থলে সংগৃহীত আছে, কিন্তু তাহাদের কোনখানিতে ঐ শ্লোক নাই ;—

(১) কাশ্মীরে রঘুনাথমন্দিরে একখানি পুথি আছে। (২৪)

(২) বোম্বাই গভর্মেণ্টের পূর্ব্বে সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত পুথি। (২৫)

(৩) বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি। (২৬)

(৪) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুথি। (২৭)

(৫) ইণ্ডিয়া অফিসের পুথি। (২৮)

ইহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের পুথিখানিতে ঐ শ্লোকটি নিশ্চয়ই নাই কারণ তাহা হইলে ডাঃ এগেলিস্ তাহা নিশ্চয় উদ্ধৃত করিতেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি আমি নিজে দেখিয়াছি, তাহাতে ঐ শ্লোক পাই নাই। অপর পুথিগুলি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অধিকাংশই সামান্য বেতনভুক্ পণ্ডিতগণের অযত্ন-সংগৃহীত বিবরণ মাত্র, সুতরাং উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না।

এই সময়নিরূপক শ্লোকগুলি যদিও আধুনিক পুথির প্রক্ষিপ্ত সম্পত্তি, তথাপি যদি স্বীকার করা যায় যে ঐ গুলি আসল পুথিতে আছে এবং বল্লালসেনেরই রচিত, তথাপি একটা বৃহৎ প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে কোন্ কথাই স্থির করা যাইতে পারে না। প্রশ্নটি এই,—কোন পুথির অতি নব্য প্রতিলিপির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন খোদিত লিপির প্রমাণের যাথার্থ্যে সন্দেহ করা উচিত হইবে কি? সাহিত্যিক প্রমাণ যদি প্রকৃষ্টরূপে বিশ্বাস্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? তাহাও খোদিত লিপির প্রামাণিকতার সহিত তুল্যমূল্য বিবেচিত হইতে কোন ক্ষতি নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে যে রামচরিত গ্রন্থের টীকা লেখা হইয়াছে, সে পুস্তকের প্রামাণিকতায় কেহ কখন সন্দেহ করে নাই। অথবা নেপাল হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভনিতাতেও কেহ অবিশ্বাস করে না; কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর হস্তলিপিকে তদপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের পুরাতন খোদিত লিপির বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে খাড়া করা সমীচিন হইবে কি? 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই গৌড়াধিপ বল্লালসেনের রচিত হইত, তাহা হইলে এতাবৎকালের মধ্যে কত প্রতিলিপি থাকিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? ডাঃ

২৪। Catalogue of Sanskrit Mss. in Kashmir by M. A. Stain.

২৫। Report on the Search of Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency, 1884-86 by R. G. Bhandarkar, p. 84, No. 861.

২৬। Govt. No. 1193.

২৭। Sastri's Notices of Sanskrit Mss. Vol. II.

২৮। India Office Catalogue, pt. III No. 712.

ভাণ্ডারকর বলেন যে মূলের অশুদ্ধতার জন্য অনেকগুলি শ্লোক বুঝা গেল না। আধুনিক হস্তলিপিগুলিতে অশুদ্ধতার পরিমাণ এত-বেশী যে তজ্জন্য কোন্ অংশ আসল এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তাহা ধরা বড় কঠিন। এই কারণেও আধুনিক পুথিগুলি প্রমাণ-স্বরূপ ধরা যায় না। খোদিত লিপিগুলি ঘটনার সমকালীন দলীল, কাহারও প্রতি-লিপি নহে। তাহাদের প্রাচীন অক্ষর-মালাই নিঃসন্দেহে তাহাদের প্রাচীনতার প্রমাণ করিয়া থাকে। এরূপ প্রমাণের বলে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তকে আধুনিক পুথির প্রমাণ-বলে অবিশ্বাস করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই কারণে আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ডাঃ কীলহর্ণ্ এত দৃঢ় ভিত্তি থাকিতেও কেন নিজমত পরিবর্ত্তন করিলেন।

ডাঃ কীলহর্ণের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত প্রবন্ধ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ৫১ লক্ষ্মণ সংবতে (১১৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল 'অতীত' হইয়া গিয়াছে। ইহাও সম্ভব যে সে সময়ে তাঁহার মৃত্যুও হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু এসম্বন্ধে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষতঃ খোদিত লিপির প্রমাণের বিরুদ্ধে যাইতেছে। ১১৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি যে ১১৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পারে না; কারণ তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন-গুলির মধ্যে অন্ততঃ দুইখানিও তাঁহার রাজ্যকালের তৃতীয় বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে লক্ষ্মণসংবৎ তাঁহার রাজ্যারোহণের দিন হইতে গণিত হইতেছে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কথাটা আবার নূতন করিয়া সম্প্রতি তুলিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন এই অব্দটি পূর্ব্বে সামন্তসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল পরে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারোহণের সময় হইতে উহা রাজগ্রাহ্য অথবা সর্ব্বত্র প্রচারিত করা হয়, এবং "লক্ষ্মণসেনের অব্দ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। তিনি তাঁহার কথার প্রমাণস্বরূপ অনেকগুলি খোদিত লিপির তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি দুইটি বিষম সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই;—

(১) তিনি যে সকল খোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই "অতীত" বা তদ্বৎ কোন পদ যুক্ত নাই এবং (২) ভারতবর্ষের অব্দ যতগুলি জানা গিয়াছে, তাহার কোনটিই এক রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার পর তাঁহার পরবর্ত্তী অপর এক রাজা দ্বারা পরিগৃহীত বা স্বনামে অভিহিত হইয়াছে, এরূপ ব্যাপার জানা যায় নাই; অন্তত ইহার স্বপক্ষে কোথাও কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর স্থাপিত। পিতার দ্বারা নবজাত পুত্রের নামে অব্দ প্রচলন করার কথাও কোথাও শুনা যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে লঘুভারতের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাও অবিশ্বাস্য।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বঙ্গ-জয় বিবরণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তখনকার বঙ্গ ও বিহারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। (ক্রমশ)

শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বে আকর্ষণী শক্তি। *

প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে প্রভূত প্রতিভাশালী গণিতশাস্ত্র-বিশারদ স্যার আইজাক নিউটন সাহেব একটি বৃন্তচ্যুত আপেল ফল ভূপতিত হইতে দেখিয়া তাহার কারণানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া জড়জগতের একটি গূঢ় মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এই বিশাল বিশ্ব মধ্যে যেখানে যে জড়পদার্থ আছে তাহা অন্য সমুদয় জড়পদার্থকে আকর্ষণ করে ও ঐ সমুদয় জড়পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকর্ষণ যে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া থাকে ও ঐ নিয়মটি কি তাহাও তিনি স্বীয় অসাধারণ-প্রতিভাবলে নির্ণীত করেন। তদবধি পাশ্চাত্যদেশে গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি সাধন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্যাবধি কেহ কোন বিসম্বাদ বা সন্দেহ উত্থাপিত করেন নাই, বরং নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা উহার তথ্য নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে উহা বিশ্বের একটি আদিম তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয় ও উহা দ্বারা অন্যান্য বহু তত্ত্বের কারণ নির্দ্দেশ ও সামঞ্জস্য সম্পাদন হইয়া থাকে।

স্যার আইজাক নিউটন সাহেব জড়-জগতের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই নিয়মটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, দুইটি জড়বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে ও উহাদের আকর্ষণী শক্তি উভয়ের দ্রব্যসমষ্টির (mass) গুণ-ফলের সম অনুপাতে ও পরস্পরের দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি গণিতশাস্ত্রের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন করেন যে, যদি দুইটি বস্তু পরস্পর এই নিয়মে আকর্ষণ করে ও উভয় বস্তু সংযোগে যে সরল রেখা হয় একটি বস্তুকে তাহার লম্বরেখার দিকে মুহূর্ত্তমাত্র চালাইয়া দেওয়া যায় ও অন্য কোন শক্তি বা গতি প্রয়োগ না হয়, তবে ঐ চালিত বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুর দিকে না যাইয়া অনন্তকাল তাহার চতুর্দ্দিকে ইলিপস্ (ellipse) অভিধেয় পথে ঘুরিতে থাকিবে। যে ঘূর্ণিত রেখার কোন এক বিন্দু হইতে আভ্যন্তরিক দুইটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দু পর্য্যন্ত দুই সরল রেখা সংযোগ করিয়া দিলে ঐ দুইটি রেখার সমষ্টি অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহাকে ইলিপস্ (ellipse) বলে। এই আকর্ষণী-শক্তিবলে, ও কোন অভাব-নীয় শক্তিতে উক্তরূপে ক্ষণিক আদিম গতি-প্রয়োগে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ইলিপস্ অভিধেয় পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে ও যদি অন্য কোন শক্তি বা গতি প্রয়োগ না করা হয় তবে অনন্তকাল এইরূপ ভ্রমণ করিতে থাকিবে। শুধু পৃথিবী কেন, গ্রহাদিও এই নিয়মের বলে আপন আপন পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের আবি-ষ্কারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে এ সকল কথা একেবারে জানা ছিল না তাহা নহে। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে (৫।৮৪।২ ঋক্), ও পৃথিবীকে সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া রাখিয়া পতন হইতে রক্ষা করে (৪।৫৩।৩

* ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের জন্য লিখিত।

খক্)। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট ভূভ্রমণবাদ প্রচার করেন। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে ও সেই শক্তিবলেই শূন্যমার্গে নিক্ষিপ্ত গুরুবস্তু পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। কুমারসম্ভবে কালিদাস উল্লেখ করিয়াছেন যে গ্রহনক্ষত্রাদি পরস্পরের আকর্ষণে ধৃত হইয়া আছে। অতএব জানা যায় যে এই আকর্ষণশক্তির জ্ঞান স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে ছিল, এবং এই শক্তিতেই যে গ্রহনক্ষত্রাদি স্ব স্ব স্থানে আছে তাহাও বিদিত ছিল। তবে যে নিয়মে দুইটি জড়বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে, তাহাও যে জানা ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আধুনিক-বিজ্ঞানজগতে নিউটন সাহেবের আবিষ্কৃত জড়বস্তুর আকর্ষণের নিয়ম একটি মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তন্মূলে আরও কোন গূঢ়তর বিশ্বতত্ত্ব নিহিত আছে কি না ও অন্য কোন মৌলিক তত্ত্ব হইতে উক্ত আবিষ্কৃত নিয়ম প্রতিপাদ্য কি না, তাহা কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানি নাই। এই প্রবন্ধে ঐ কথার আলোচনা করাই অভিপ্রায় এবং ঐ আবিষ্কৃত তত্ত্বের মূলে আরও যে গূঢ়তর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, নিউটন সাহেবের আবিষ্কৃত আকর্ষণের নিয়মটি নিম্নোক্ত অপেক্ষাকৃত সরল নিয়ম হইতে প্রতিপাদ্য :—

"ব্যবধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে এক পরমাণু অপর পরমাণুকে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে, ও ব্যবধান পরিবর্ত্তন হইলে আকৃষ্ট পরমাণুর দূরত্ব যতগুণ বৃদ্ধি হয়, আকর্ষণশক্তি ঠিক ততগুণ হ্রাস হইয়া যায় ও ঐ দূরত্ব যতগুণ হ্রাস হয় আকর্ষণশক্তি ঠিক ততগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

পরমাণুশব্দ কি অর্থে ব্যবহার হইল তাহা প্রথমে বলা আবশ্যক ; ইংরাজিতে যাহাকে এটম (atom) বলে পরমাণু অর্থে তাহা বুঝিতে হইবে না। গত ১৯শে জানুয়ারি তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকার মহাশয় মহর্ষি-কণাদকৃত বিজ্ঞানসূত্র বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কণাদ বলিয়া গিয়াছেন যে, পরমাণু নিত্য ও কদাপি ধ্বংস হয় না ও তাহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যখন কতকগুলি পরমাণু একত্র সংযুক্ত হয়, তখনই তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের আকার ধারণ করে, কিন্তু ঐ পদার্থ-আকার পরমাণুর ন্যায় নিত্য নহে, পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে পরমাণুতে পরিণত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে অণু বলা যায় ; ইংরাজিতে উহাকে মলিকিউল (molecule) বলে। ঐ ক্ষুদ্রতম অংশকে আরও ক্ষুদ্র করিতে গেলেই পদার্থের স্বরূপ নষ্ট হইয়া পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। এক পদার্থের অণুর দ্রব্যসমষ্টির (mass) অন্য পদার্থের অণুর দ্রব্যসমষ্টির সমান নহে ; কোনটিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ও কোনটিতে অধিকসংখ্যক পরমাণু থাকে। কিন্তু

পরমাণুর দ্রব্যসমষ্টি এক। এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণু বিভিন্ন আয়তন বা বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টি-যুক্ত নহে। ইংরাজিতে যাহাকে এটম (atom) বলা যায়, তাহা তাদৃশ নহে। এক পদার্থের এটম (atom) ও অন্য পদার্থের এটমের দ্রব্যসমষ্টি এক নহে। তজ্জন্য পরমাণুশব্দের এটম (atom) বুঝিতে গেলে ভ্রমোৎপাদ হইবে। এই নিয়মে দ্রব্য-সমষ্টির গুণফলের সমানুপাতে, বা দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে জড়বস্তুর আকর্ষণের হ্রাসবৃদ্ধির কথা কিছুই বলা হইল না। তাহা গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে এই সরল নিয়ম হইতে প্রতিপাদ্য।

এক্ষণে মনে কর যে, বামদিকে একটি পরমাণু আছে ও দক্ষিণদিকে তথা হইতে একহস্ত পরিমিত দূরে আর একটি পরমাণু আছে। আমরা যে আকর্ষণের নিয়মটি বলিয়াছি তদনুসারে বামদিকের পরমাণুটি দক্ষিণদিকের পরমাণুকে ও দক্ষিণদিকের পরমাণুটি বামদিকের পরমাণুকে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে এবং ঐ উভয় শক্তির সম্মিলনে ঐ দুইটি পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণ-শক্তি উদ্ভুত হয়। পরে কল্পনা কর যে, দক্ষিণদিকে যে পরমাণুটি আছে তাহার স্থলে দুইটি পরমাণু সংযুক্তভাবে রাখা গিয়াছে। এক্ষণে বামদিকের পরমাণুটির সহিত দক্ষিণদিকের এই সংযুক্ত পরমাণুটির আকর্ষণ যে শক্তিতে হইবে তাহা পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণশক্তির দ্বিগুণ। কারণ বামদিকের পরমাণুর সহিত দক্ষিণদিকের প্রথম পরমাণুর যত আকর্ষণ দ্বিতীয় পরমাণুরও ঠিক ততই আকর্ষণ। তবেই দুইটি পরমাণু থাকায় আকর্ষণ দ্বিগুণ হইল। পুনরায় কল্পনা কর যে দক্ষিণদিকে দুইটি সংযুক্ত পরমাণু আছে ও বামদিকে ঐরূপ তিনটি সংযুক্ত পরমাণু রাখা গিয়াছে, এক্ষণে উহাদের পরস্পর আকর্ষণশক্তি সর্ব্ব-প্রথমোক্ত শক্তির ছয় গুণ হইবে। কারণ পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বামদিকের একটি পরমাণুর সহিত দক্ষিণদিকের সংযুক্ত পরমাণুর আকর্ষণ প্রথমোক্ত শক্তির দ্বিগুণ, অতএব তিনটি পরমাণুর সহিত দক্ষিণদিকের সংযুক্ত পরমাণুর আকর্ষণশক্তি তিন বার ঐ দ্বিগুণ শক্তিটি যোগ করিলেই পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত শক্তির ছয়গুণ হইবে। তবেই দেখা গেল যে বামে তিনটি ও দক্ষিণে দুইটি পরমাণু একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলে তাহাদের পরস্পর আকর্ষণশক্তি তিন ও দুইয়ের গুণফল ছয়-গুণ বৃদ্ধি হইয়া গেল। এই রূপে যদি বাম-দিকে সাতটি সংযুক্ত পরমাণু ও দক্ষিণদিকে নয়টি সংযুক্ত পরমাণু রাখা যায় তবে বাম-দিকের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত দক্ষিণ-দিকের সংযুক্ত পরমাণুটির আকর্ষণ সর্ব্ব-প্রথমোক্ত শক্তির নয়গুণ। বামদিকের সাতটি পরমাণু থাকায় সাতবার নয়গুণ শক্তিতে অর্থাৎ তেষট্টিগুণ শক্তিতে ঐ দুইটি বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করিবে। কিন্তু প্রত্যেক দিকে সংযুক্ত পরমাণুসংখ্যা যত বেশী হইবে ঐ দিকে স্থাপিত বস্তুটির দ্রব্যসমষ্টি (mass) ও ততই বেশী হইবে। অতএব যদি প্রতি পরমাণু অপর পরমাণুকে অপরিবর্ত্তিত ব্যবধানে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে তবে ব্যবধান পরিবর্ত্তন না হইলে উভয় বস্তুর দ্রব্যসমষ্টির গুণফলের সম অনুপাতে তাহাদের আকর্ষণশক্তি পরিবর্ত্তিত হইবে। অর্থাৎ স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের নিয়মের প্রথমাংশটি আমাদিগের নিয়ম হইতেই প্রতিপন্ন করা গেল।

দ্বিতীয় অংশটিও ঐরূপে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। মনে কর দুইটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য-সমষ্টিযুক্ত বস্তু দুই হস্ত ব্যবধানে রাখা গেল, যদি একটিকে অপরের অভিমুখে সরাইয়া লইয়া একহস্ত ব্যবধানে রাখা যায় তবে বামদিকের বস্তুটি পূর্ব্বে যত শক্তিতে দক্ষিণ দিকের বস্তুটিকে আকর্ষণ করিতেছিল এক্ষণে ব্যবধান অর্দ্ধেক হইয়া যাওয়ায় তাহার দ্বিগুণ শক্তিতে দ্বিতীয় বস্তুটিকে আকর্ষণ করিবে। তাহাতে আকর্ষণ-শক্তি

দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। আবার দক্ষিণদিকের বস্তুটি পূর্ব্বে বামদিকের বস্তুটিকে যে শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছিল এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ শক্তিতে আকর্ষণ করিবে। অতএব তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ দ্বিগুণের দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ শক্তিতে হইতে থাকিবে। ঐরূপে দেখা যায় যে উভয়ের ব্যবধান প্রথমোক্ত ব্যবধানের তৃতীয়াংশ করিয়া দিলে পরস্পর আকর্ষণী শক্তি নয়গুণ হইয়া যাইবে ও চতুর্থ অংশ করিয়া দিলে ষোলগুণ হইবে। এই নিয়মে উভয়ের ব্যবধান দুইগুণ করিয়া দিলে তাহাদের আকর্ষণশক্তি চতুর্থাংশ, ও তিনগুণ করিয়া দিলে নবমাংশ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যে অনুপাতে ব্যবধান হ্রাসবৃদ্ধি হয় তাহার বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে আকর্ষণশক্তিরও বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের নিয়মের দ্বিতীয় অংশটিও প্রতিপন্ন করা হইল।

তবেই নিউটন সাহেবের আবিষ্কৃত জড়বস্তুর আকর্ষণের নিয়মটি মৌলিক-তত্ত্বস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। গণিতশাস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত অপেক্ষাকৃত সরল তত্ত্বটি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক ঐ সরলতর তত্ত্বটি হইতে বিশ্বের অন্যান্য গূঢ় তত্ত্ব কিছু বুঝা যায় কিনা।

জড়বস্তু মাত্রেই পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। তাহার প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণুগুলিকে ও অপরাপর সমুদয় জড়বস্তুর সকল পরমাণুগুলিকে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে ও নিকটের পরমাণুকে অধিক ও দূরের পরমাণুকে কম আকর্ষণ করে, ও উভয়ের ব্যবধান যতগুণ কম হয়, ততগুণ বেশী, ও যতগুণ বেশী হয় ততগুণ কম, শক্তিতে দ্বিতীয় পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যদি এই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ-শক্তির কার্য্য অপ্রতিহত হইত অর্থাৎ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন শক্তি বিশ্বে না থাকিত তবে এই ফল হইত যে, একটি পরমাণু অপরটির দিকে ধাবিত হইয়া তাহার সহিত মিলিয়া যাইত। একটি পার্শ্বে গিয়া অপরটি আটকাইয়া থাকিত তাহা নহে। কারণ যখন অন্য কোন শক্তি নাই কল্পনা করিয়াছি তখন বুঝিতে হইবে যে কোন পরমাণুটির বহির্দ্দেশে (surface) প্রতিরোধকশক্তি (resistance) নাই। অতএব উভয়ে সমকেন্দ্র হইয়া দুইটি পরমাণু এক হইয়া যাইত। মিলিত পরমাণুটির আয়তনের পরিবর্ত্তন হইত না, কিন্তু দ্রব্যসমষ্টি (mass) দ্বিগুণ হইয়া যাইত। এই রূপে অন্য একটি পরমাণুও ঠিক ঐ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমোক্ত পরমাণুর সহিত মিলিয়া লুপ্ত হইত, কেবল মিলিত পরমাণুর দ্রব্যসমষ্টি তিনগুণ হইত মাত্র। যে সকল পরমাণু দূরে আছে তাহারাও ধাবিত হইয়া ঐরূপ মিলিত ও লুপ্ত হইয়া যাইত, ও যত নিকটে আসিত তত বেশী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে মিলিত হইতে ছুটিত। এই রূপে এই বিশাল জগৎ একমাত্র পরমাণু-আকারে পরিণত হইয়া লীন হইয়া যাইত। এই অবস্থাকে প্রলয় বলা যাইতে পারে। বিশ্বজগতে আকর্ষণী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি আছে বলিয়াই তাহা হইতে পায় না। এই অন্য শক্তির উদ্ভবকে বিশ্বসৃজনী শক্তি ও উহার অবস্থানকে বিশ্বপালনী শক্তি বলিলে অসঙ্গত হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে এই বিশাল বিশ্ব এক বীজপরমাণু হইতে বিশ্লেষণ শক্তি দ্বারা সৃজন হইয়াছে ও যেখানে যে বস্তু আছে তাহা এক বীজ পরমাণু হইতে উদ্ভূত ও পরস্পর মিলিত হইয়া ঐ বীজপরমাণুর গর্ভে পুনঃ প্রবেশ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই জন্যই তাহারা পরস্পর আকর্ষণ করে। এই কারণেই স্যার আইজাক নিউটনের আপেলটি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল ও এই জন্যই চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ও সূর্য্য কে জানে কাহার চতুর্দ্দিকে অবিরত ভ্রমণ করে। জগতের সমস্ত দ্রব্যই এক মাতৃগর্ভ

হইতে উৎপন্ন ও ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট। স্নেহময়ী জননী যখন শিশুকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করেন, তখন ভাবিও না যে, তাঁহার অন্তঃকরণে স্নেহ আছে বলিয়াই শিশু তাঁহার বক্ষে আকৃষ্ট হইল। বিশ্বজগতের আকর্ষণী শক্তিও শিশুর অঙ্গকে মাতৃবক্ষের দিকে আকৃষ্ট করিয়া স্নেহশক্তির সহকার করিয়াছে। এই যে দরিদ্রটি ধনবানের দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, বুঝিও যে উহার শরীরটি গৃহস্বামীর শরীরকে ও গৃহস্বামীর শরীরটি উহার শরীরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং ভিক্ষা-প্রার্থনায় দরিদ্রটি যতই গৃহস্বামীর নিকটস্থ হইতেছে ততই তাহাদের শরীরের পরস্পর আকর্ষণ-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবার উদ্যম করিতেছে। যদি অন্য শক্তি না থাকিত তবে দাতা ও গৃহীতা মিলিয়া গিয়া এক হইয়া যাইত। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজ-ফরাসী সকলের দেহই অনুক্ষণ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। মনুষ্য, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি সর্ব্বজীব ও প্রস্তর, লৌহ, স্বর্ণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থ সকলেই সর্ব্ব সময়ে পরস্পরের দিকে ধাবমান হইতে সচেষ্ট। বাধকশক্তি না থাকিলে সকলেই মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইত। এই জগতে কেহ তোমার পরমবন্ধু ও কেহ বা ঘোর শত্রু। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণশক্তির সম্মুখে তাহাদের কোন পার্থক্য নাই, সকলেই ছুটিয়া আসিয়া তোমার বুকে মিলিয়া যাইবার জন্য উদ্যম করিতেছে, অন্য শক্তিতে বাধা পাইয়া উদ্যম সফল করিতে পারে নাই। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই বাক্যের সার্থকতা এই বিশ্বব্যাপী শক্তিই সাধন করে। বন্দীর চরণ যে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে ঐ চরণ ও শৃঙ্খল উভয়ে পরমবন্ধু; উভয়ে ছুটিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মলোপের জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। শৃঙ্খল চরণের ক্লেশদায়ক হইয়া থাকিতে বা চরণ শৃঙ্খলকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিতে ব্যগ্র নহে। ইহা কবির কল্পনা নহে, গণিতশাস্ত্রের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। নিউটন সাহেবের আবিষ্কারের উত্তরকাণ্ড মাত্র।

যেরূপ বাহ্যজগতে এই পরস্পর আকর্ষণী শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান সেরূপ কি অন্তর্জ্জগতেও নাই? ইহা অতি গুরুতর সমস্যা। ভবিষ্যতে কোন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ইহাও সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা অসম্ভব নহে। অন্তর্জগতেও যে ইহার অনুরূপ কোন শক্তি আছে, ও তাহাও যে এই নিয়মের ন্যায় কোন নিয়মে পরিচালিত, আমরা তাহার কতক কতক আভাস পাইয়া থাকি। নিকটে থাকিলেই ভালবাসা হয়, দূরে চলিয়া গেলে ভালবাসা কমিয়া যায়। মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়-তত্ত্বদর্শী অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, যাহাকে ভালবাস তাহাকে নিকটে রাখিও দূরে যাইতে দিও না, দূরে যাইলে আর সে পূর্ব্বভাব থাকিবে না। কিন্তু মানস-জগতে দূর অর্থে সর্ব্বদা বাহ্যজগতের ব্যবধান-আধিক্য বুঝায় না। ক্রমিক অন্তঃকরণে স্থান দিলেই নৈকট্য সম্বন্ধ হয়, বিস্মৃতিতে দূরত্ব বুঝায়। মানস-জগতেও যে এই জড়-জগতের ন্যায় আকর্ষণ আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু তাহার নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করা আমাদের অসাধ্য। ভবিষ্যতে যে কেহ পারিবেন না, কে বলিতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার।

কলিকাতা ২৭ নং হরিতুকিবাগান লেনে কমারশিয়াল যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দা

বঙ্গদর্শন।
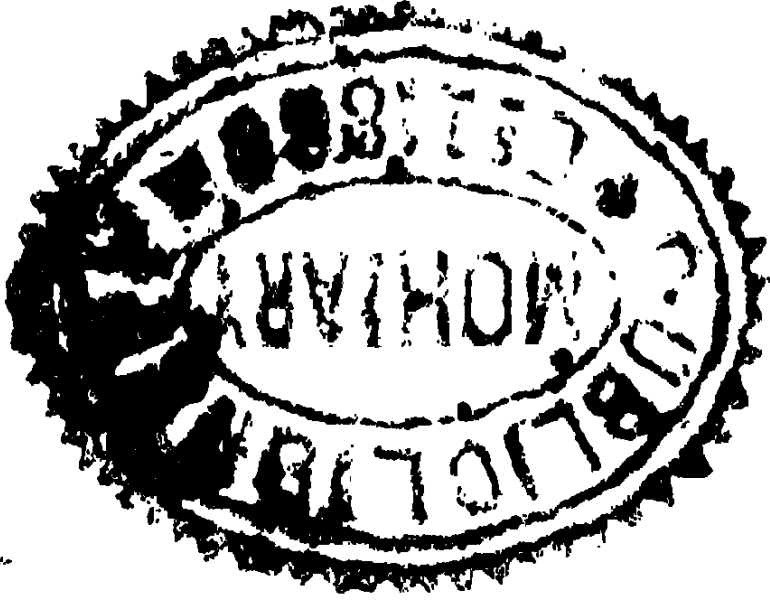
কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

(২)

'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' কবির পরিণত বয়সের সৃষ্টি। যে কবিত্ব অবকাশ-রঞ্জিনীতে উন্মেষিত, 'পলাশীর যুদ্ধে' ও 'রঙ্গমতী'তে পরিস্ফুট হইয়াছিল, 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' তাহাই পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্রোতস্বতী পর্ব্বতসানুমূলে তীব্র বেগে বহিয়াছিল, তাহাই এখানে বিশাল বেগে গ্রাম-জনপদ প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ছন্দের গাম্ভীর্য্য ও ঝঙ্কার, মধুসূদনের কাব্য ছাড়া আর কোথায়ও আমরা দেখিতে পাই না। গভীর-সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় ইহা আমাদের কর্ণে আসিয়া আঘাত করে। যে তুলিকা-স্পর্শে এই বিশাল দূরব্যাপী সৌন্দর্য্যচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন মাইকেল, এঞ্জেলো বা ফিডারের অনুপযুক্ত নহে। মহাভারতের, বিরাটঘটনাস্তূপ কবির অসামান্য-গঠনশক্তিবলে এক অপূর্ব্ব কাব্য-সৃষ্টির ভিতর সঙ্গতি লাভ করিয়াছে। 'রৈবতকে' এই মহানাটকের আরম্ভ। এখানে নায়কগণ একে একে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন। এইখানেই ধীরে ধীরে মহাভারতের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। 'কুরুক্ষেত্রে' কর্ম্মের পূর্ণতা। ভারতব্যাপী যুদ্ধানল ও অধর্ম্মের মধ্যে মহাভারতের মহাপ্রতিষ্ঠা হইতেছে। 'প্রভাসে' এই মহানাটকের অবসান। একে একে সমস্তই 'লীলাশেষে' রঙ্গভূমি হইতে অদৃশ্য হইতেছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, কেবল মাত্র ভবিষ্যৎ আশার সুবর্ণ কিরণ অস্তাচল রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। কাব্য-চিত্রিত চরিত্রগুলি যেন এক একটি জীবন্ত সত্যের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ ও দ্বৈপায়ন, সুভদ্রা ও অর্জ্জুন, রুক্মিণী ও সত্যভামা, উত্তরা ও অভিমন্যু, শৈলজা ও সুলোচনাকে যেন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াই আমরা আনন্দে বিহ্বল ও ভক্তিতে প্রণত হইয়া পড়ি। এই অধঃপতিত জাতির সম্মুখে যে প্রতিভা সুভদ্রার মত জননী ও পত্নী, অভিমন্যুর মত স্বধর্ম্মপালক পুত্র ও অর্জ্জুনের মত কর্ম্মবীরের আদর্শ ধরিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট আমরা চিরকালই ঋণী হইয়া থাকিব সন্দেহ নাই। এই জাতীয় মহাকাব্যের রত্নহারে 'কুরুক্ষেত্র' আবার মধ্যমণি। 'কুরুক্ষেত্র'

কেবলমাত্র নবীনচন্দ্রেরই শ্রেষ্ঠকাব্য নহে, বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। কুরুক্ষেত্র যে কোন মহাকবির গৌরবস্বরূপ হইতে পারিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই নবীনচন্দ্রকে 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি বলিয়াই জানেন। কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র'ই আমাদের মতে নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গৌরব। 'পলাশীর যুদ্ধে'র তরুণ-কবির কণ্ঠে যে উদ্দীপনার সঙ্গীত উঠিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের গম্ভীর ঝঙ্কারের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। 'পলাশী'র কবির দুর্জ্জয় হৃদয়বেগ আগ্নেয়-গিরির অগ্নিশিখার মত বাহির হইয়া পড়ে—জ্বালাময়ী বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ইহার জ্যোতি নয়নকে ঝলসাইয়া দেয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের সঙ্গীতঝঙ্কার গম্ভীর-মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য। ইহার কবিত্ব অবাতবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় বহুদূর-বিস্তৃত—শান্তিময়—স্থির—অচঞ্চল, হৃদয়ে কি মহান্ গাম্ভীর্য্যের ছায়া সঞ্চার করিয়া দেয়। 'পলাশী' তরুণ-হৃদয়ের রক্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, কুরুক্ষেত্রের পরিণত কবিত্ব হৃদয়কে গভীর সৌন্দর্য্যের রসে ডুবাইয়া দেয়। 'পলাশী'র তরুণকবির অঙ্কিত চিত্র বর্ণের উজ্জ্বলতায় নয়নকে মুগ্ধ করিয়া দেয়—কুরুক্ষেত্রের দক্ষশিল্পির অঙ্কিত চিত্র কলা-কৌশলের পূর্ণ-উৎকর্ষ; সমস্ত হৃদয় তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। কবির 'রৈবতক', 'প্রভাস' ও 'কুরুক্ষেত্র' পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে সমাদৃত হয় নাই, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জগতের অনেক মহাকবিকেই তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজ বুঝিতে পারে না—তাঁহারা তাঁহাদের সময়ের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাকবি মিল্‌টনকেও সামান্য মূল্যে 'প্যারাডাইস্‌লষ্টে'র সত্ত্ব বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কবির সৃষ্টি কখনও নিষ্ফল হয় না। যে সত্য ও সৌন্দর্য্যের দান কবি রাখিয়া যান—তাহা অবিনশ্বর। তাই আমাদের আশা আছে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয় আধুনিক বাঙ্গালীর নিকট সমাদর লাভ না করিলেও, ভবিষ্যতের বাঙ্গালী ইহার গৌরব নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন।

'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কবি নিজের মধ্যেই আবদ্ধ। নিজের সুখ-দুঃখের বোঝা লইয়াই তিনি বিব্রত। সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাহা আত্মপ্রেমেরই নামান্তর—আত্মপ্রেমেরই পারিপার্শ্বিক মাত্র। আত্মপ্রেমেরই আলোকে তরুণ কবি দেশকে যতটুকু দেখিতে পাইয়াছেন ততটুকুই তাহার কথা বলিয়াছেন। তাই যৌবনের সুখ-দুঃখ, পূর্ব্বরাগ ও বিরহের কোমল উচ্ছ্বাস, তরুণহৃদয়ের বেদনা ও নৈরাশ্যের কাহিনী—এক কথায় নিজের ছোট জগতের মধ্যেই 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কবি অধিকতর আবদ্ধ। কিন্তু 'পলাশী' ও 'রঙ্গমতী'র কবি স্বার্থকে অনেকটা অতিক্রম করিয়াছেন। নিজেকে ছাড়িয়া দেশের প্রতি তাঁহার প্রেমের স্রোত সম্পূর্ণ ফিরিয়া গিয়াছে। নিজের দুঃখ ভুলিয়া দেশের দুঃখেই পলাশীর কবি কাঁদিয়াছেন। নিজের সুখ ভুলিয়া মাতৃভূমির গৌরব ও আদর্শ কল্পনাতেই 'রঙ্গমতী'র কবি আনন্দ পাইয়াছেন। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে'র কবির হৃদয় আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তখন কবি সম্পূর্ণরূপেই দেশের

মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন। জাতীয়-জীবনের অক্ষয়-ভিত্তিরচনাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে। জাতীয়-জীবনের অমর-আদর্শস্থাপনেই তাঁহার দূরপ্রসারিণী দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 'পলাশী' ও 'রঙ্গমতী'র কবি বঙ্গের কবি, কিন্তু 'কুরুক্ষেত্রে'র ও 'রৈবতকে'র কবি সমগ্র ভারতের। মহাভারতের অমর আদর্শেই প্রৌঢ় কবির হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই যে মহান্ জাতীয়-প্রেম—এই যে মহাভারত-ব্যাপিনী দৃষ্টি—এর চেয়েও মহান্ ভাব—এর চেয়েও উদার আদর্শ আছে। আমিত্বের প্রসারেই মানব-জীবনের সার্থকতা। আমিত্বের প্রসারই মানবজীবনের মহালক্ষ্যের গন্তব্য পথ নিরূপিত। স্বার্থকে ক্ষুদ্র আত্মস্থান হইতে ক্রমে বৃহৎ পরিবারে—সমাজে—স্বদেশে—তারপর সর্ব্বজগতে ও সর্ব্বভূতে বিস্তার করিতে হইবে। কেবল নিজের দেশ ও সমাজ নহে; সমগ্র জগত, সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র প্রাণী—লোককে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে হইবে। কেবল স্বদেশ ও সমাজের গৌরব ও আদর্শের কথা নহে,—সমগ্র পৃথিবীর—সমগ্র মানবজাতির গৌরব ও আদর্শকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যে কবির কণ্ঠে সমগ্র জগতের এই গৌরবের মহাসঙ্গীত উঠিয়াছে, তিনিই ধন্য। যিনি সমস্ত মানবের মুক্তির গাথা গাহিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই আমরা দেখিতে পাই। 'মহাভারতে'র মহান্ আদর্শ ছাড়িয়া তিনি আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম ছাড়িয়া তিনি বিশ্বপ্রেমে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্বজগতের প্রেমে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়াছে। 'অমিতাভ' ও 'ভানুমতী'তে কবির এই বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই 'জন্ম-জরা-মরণ-ব্যাধি-পীড়িত জগতে এক দিন যে মুক্তির সঙ্গীত উঠিয়াছিল; এই বহু-তৃষ্ণা-দুঃখ-সমন্বিত মানবের জন্য একদিন যে শান্তির বার্ত্তা আসিয়াছিল—'অমিতাভে' সেই উদার সঙ্গীত—সেই মহতী বার্ত্তার কথা আছে। বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে সমস্ত জগতের দুঃখে, 'হিমাচলপাদমূলে শৈলজারোহিণী কূলে' এক দিন যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—একদিন যিনি সমস্ত জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পিতামাতা, পত্নী পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন—দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ করিয়া একদিন যিনি এই মৃত্যু-পীড়িত সংসারের জন্য অমৃত আনিয়াছিলেন—যাহা এখনও পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে—'অমিতাভ' সেই অমিতাভ বুদ্ধের মহান্ চরিত্রগাথা। 'অমিতাভ' সর্ব্ব জগতের দুঃখমোচনের সেই অমরসঙ্গীত, সর্ব্বভূতহিতের সেই অক্ষয়কাহিনী গীত হইয়াছে। 'ভানুমতী' চট্টগ্রামের একটি ঝটিকাবিপ্লবের কাহিনী। কিন্তু ইহাতে মহাঝড়-প্রমথিত চট্টগ্রামের জনপদসমূহের সেই করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কথাই যে কেবল আমরা বলিতেছি তাহা নহে; কিন্তু ইহার মধ্যে যে গভীর

মানবপ্রেম, যে নিষ্কাম পরহিতব্রত, যে উদার স্বার্থত্যাগ, জমিদার অনাথনাথ ও 'বেদিয়া বালিকা' ভানুমতীর যে অপূর্ব্ব চিত্র তাহার কথাই আমরা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কুরুক্ষেত্রে যে নিষ্কামধর্ম্মের, ও অমিতাভে যে সর্ব্বভূতহিতের মহতী বাণী আমরা পাইয়াছি—'ভানুমতী'তে সেই নিষ্কাম-ধর্ম্ম ও সর্ব্বভূতহিতেরই কথা আমরা শুনিতে পাই। যে কবি অমিতাভের বিশ্বপ্রেমের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছেন, এই সৃষ্টি তাঁহারই উপযুক্ত বটে।

'অমিতাভ' নবীনচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা। ইহা 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে'র পরে লিখিত। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা স্বভাবতঃ যেরূপ আশা করিতে পারি তাহা দেখিতে পাই না। 'অমিতাভে'র কবি 'কুরুক্ষেত্রে'র উপরে উঠিতে পারেন নাই। 'কাব্যশিল্পে' 'অমিতাভ'কে 'কুরুক্ষেত্রে'র নিম্নে স্থান দিতে আমরা বাধ্য। প্রতিভারও বিকাশের একটা আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। জড়জগতের ন্যায় মনোজগতেও পরিণতির পরিমাণ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার বেশী উঠিতে পারে না। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌-দেহ কিছুদিন পর্য্যন্ত বাড়িয়া আবার হ্রাস পাইতে থাকে। পর্ব্বত যেমন ক্রমোচ্চ হইতে হইতে উর্দ্ধতম শিখর পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার নিম্নগামী হইয়া পড়ে, কবি-প্রতিভার বিকাশেও আমরা অনেক সময় সেইরূপ দেখিতে পাই। নবীনচন্দ্রের কবিত্বের উর্দ্ধতম শিখর "কুরুক্ষেত্র"। তাহার উপরে আর তাহা উঠিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও নবীনের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি 'অমিতাভ'কে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার যে কোমল-কঠোর সৌন্দর্য্যচিত্র ও জলদগম্ভীর ধ্বনিতে আমরা মুগ্ধ, 'অমিতাভে' তাহার প্রভাব সর্ব্বত্রই অনুভব করিতে পারি। যে মহৎ জীবনের মহতী কাহিনী ইহাতে কীর্ত্তিত, নবীনের উদাত্তরাগিণী তাহার অনুপযুক্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে কবি অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছেন। 'মহানিশি,' 'মহানিষ্ক্রমণ,' 'সংসার-শ্মশান', 'মহানির্ব্বাণ' প্রভৃতি সর্গ পড়িলে বোধ হয় নবীনের কবিত্ব যেন মন্ত্রবলে আবার তাহার যৌবনের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'ভানুমতী' গদ্যকাব্য। এস্থলে আমাদের বলা উচিত যে নবীনচন্দ্র গদ্যরচনাতেও সামান্য-ক্ষমতা-পন্ন ছিলেন না। তাঁহার গদ্যরচনাতে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে একটি পৃথক্ স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে। ইহাতে অক্ষয়কুমারের তেজস্বিতা, ভূদেবের প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিবত্তা, বঙ্কিম-চন্দ্রের তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত কলাকৌশল, কালী-প্রসন্নের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা, বা রবীন্দ্র-নাথের আবেগময় সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রবাহ দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটা লীলাময়ী—এমন একটা সরল সৌন্দর্য্য আছে যে, তাহা আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া দেয়। ইহা গদ্য ও পদ্যের সম্মিলন, গদ্যে কবিতাময়ী ভাষা।

কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক। যে অনন্ত সুন্দর সমস্ত বিশ্বের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কবি তাঁহারই পূজা করেন। এই যে জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য, ইহা সেই একেরই বিকাশ; নহিলে ইহা কি বিশৃঙ্খল

হইত! এই যে প্রকৃতির দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও সংগ্রাম ইহারা কি অনন্ত মিলনের রজ্জুতে বাঁধা পড়িয়া আছে; নহিলে এই সৃষ্টি চূর্ণিত হইয়া যাইত! তিনি এক—তিনি বহু হইয়াছেন। বিশ্বের এই অনন্তসত্তার ভিতরে তিনি জ্ঞানরূপে, চিন্তারূপে জাগ্রত আছেন, তাই তিনি সত্য। এই বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁহারই অনন্ত শক্তির লীলা বিকাশ হইতেছে, তাই তিনি শিব। আবার তিনিই এই সমস্ত আনন্দের মধ্যে—শোভার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন, তাই তিনি সুন্দর। কবি এই সুন্দরকে লাভ করিবার জন্য—তাহাকে এই প্রকাশের মধ্যে অনুভব করিবার জন্যই সাধনা করেন। প্রত্যেক সূর্য্যরশ্মিতে, প্রত্যেক চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পগুচ্ছে, প্রত্যেক নীহার-মণ্ডিত-তৃণশীর্ষে, প্রত্যেক মেঘচ্ছায়ানীল কাননপত্রে—তিনি তাঁহারই সৌন্দর্য্যের লীলা-বিকাশ দেখিতে পান। তোমার আমার চক্ষে এই জগতের কোন অর্থ না থাকিতে পারে, এই বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রাণ না থাকিতে পারে; কিন্তু কবি এই জগতের প্রত্যেক ধূলিকণার ভিতরই অর্থ খুজিয়া পান---সমস্ত বিশ্বের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। তাই তিনি কবি।

কিন্তু বলিয়াছি ত তিনি এক বহুধা হইয়াছেন। তিনি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি কখনও কোমল কখনও কঠোর, কখনও করুণ কখনও রুদ্র, কখনও শান্ত কখনও বীভৎস। প্রকৃতি লীলাময়ী—বিচিত্ররূপিণী, কখনও নবারুণোদয়ে হাস্যময়ী—কখনও রৌদ্রবসনা ভয়ঙ্করী—কখনও চন্দ্রকরস্নাতা বিলাস-বিবশা—কখনও পুষ্পাভরণভূষিতা, বিহগ-কাকলী-কণ্ঠা উৎসবমগনা—আবার কখনও ঝটিকা-বিক্ষুব্ধা করালবদনা প্রলয়ঙ্করী! কিন্তু সকলেই কিছু এই সকল রূপ সমান ভাল বাসে না। কেহ কোমল, কেহ কঠোর, কেহ করুণ, কেহ রৌদ্রকেই ভাল বাসেন। কেহ তাঁহার প্রিয়াকে লীলাময়ী হাস্যময়ী দেখিতে চান, কেহ বিবশা আত্মহারার রূপে মুগ্ধ, কেহ আনন্দময়ী সঙ্গীতময়ীর রসে রসিক, আবার কেহ বা নিষ্কাম-শান্তিরূপিণীর ধ্যানে মগ্ন। তাই সকল চিত্রকর সকল সৌন্দর্য্য সমান ভাল বাসেন না। সকল সৌন্দর্য্যকে সমানরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। কেহ সূক্ষ্ম কোমল সৌন্দর্য্যের বিকাশে নিপুণ—আবার কেহ বা মহান্, বিশাল বা ভয়ঙ্করের মূর্ত্তি-চিত্রনে প্রতিভাশালী। ইউরোপের ফ্লেমিস চিত্রকরেরা প্রথমশ্রেণীর—আর ইটালীর চিত্রকরেরা দ্বিতীয়শ্রেণীর কালিদাস সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় মন্ত্রসিদ্ধ—আবার ভবভূতি গম্ভীর ও মহানের গঠনে সমধিক পারদর্শী। কণ্বের তপোবনমধ্যস্থা শকুন্তলাকে আঁকিতে কালিদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। কিন্তু হিমালয়ের বর্ণনায় তিনি তেমন সফল হইতে পারেন নাই। আর ভবভূতি মেঘনীলপর্ব্বত-শিখর-পরিবৃত 'গদ্‌গদনদৎ-গোদাবরী'-বারি-মুখরিত জনস্থানের অরণ্যবর্ণনায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস সূক্ষ্ম, ললিত ও কোমলের কবি; ভবভূতি করুণ, শান্ত ও গম্ভীরের কবি। নবীনচন্দ্র ভবভূতির

শ্রেণীর কবি। ভবভূতির সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা তাঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। তিনি ভবভূতির মত করুণ, শান্ত ও গম্ভীররই অধিক প্রিয়; করুণ, শান্ত ও গম্ভীরের বিকাশেই তিনি সুনিপুণ। করুণ চিত্রে ভবভূতি অদ্বিতীয়। 'জনস্থানে সীতা ও রামের সঙ্গে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া কে থাকিতে পারেন? নবীনচন্দ্রও করুণ চিত্রে ভবভূতিরই মতন সুনিপুণ। 'পলাশী'র জাতীয়-শোককাব্যেই তরুণ কবি ইহার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কুরুক্ষেত্রে'ই তাঁহার এই ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ। 'কুরুক্ষেত্র' এক অতি অপূর্ব্ব শোককাব্য। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গ পড়িতে পড়িতে বোধ হয় অতি পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। নিজে না কাঁদিলে অন্যকে কেহ কাঁদাইতে পারে না, ইহা অতি পুরাতন ও সত্য কথা। কুরুক্ষেত্রের পবিত্র ক্ষেত্রে কবি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; ইহার প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর কবির সেই অশ্রুতে সিক্ত রহিয়াছে। তাই কুরুক্ষেত্রে আমাদিগকে কাঁদিতে হয়—কবির সঙ্গে সমবেদনার অশ্রু ফেলিতে হয়। করুণের ন্যায় শান্ত চিত্রেও নবীনের অসীম ক্ষমতা। উত্তেজনা অপেক্ষা শান্তির সঙ্গীতেই তিনি সমধিক নিপুণ। পলাশীর তরুণ কবির ওজস্বিনী সঙ্গীতে 'ধমনী-ভিতরে' রক্ত নাচিয়া উঠে বটে। কিন্তু তদপেক্ষা যখন রৈবতকের সমুদ্রতীরে ও ব্যাসাশ্রমে আমরা নবীনচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখনই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারি। প্রভাসের সমুদ্রসৈকতে যে শেষ লীলার অভিনয় দেখি তাহাতে ধ্বংসের অবসাদের মধ্যেই আমাদের হৃদয় একটা নির্ম্মল শান্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের বিশাল সমরক্ষেত্রে, চিতাভস্মের উপরে মহাভারতের প্রতিষ্ঠায়, রঙ্গমতীর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অরণ্য-ভীষণ গিরিপ্রকৃতির বর্ণনায় নবীনের চিত্রের গাম্ভীর্য্য আমরা অনুভব করিতে পারি। অমিতাভে এই শক্তি অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। যে মহাপুরুষের মহতী কাহিনী ইহাতে কীর্ত্তিত, কবির গম্ভীর সঙ্গীত তদনুরূপই হইয়াছে!

ভাষার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের বিকাশ বড় কঠিন কাজ। সৌন্দর্য্য মনোজগতের জিনিষ, ভাষা জড়জগতের। সৌন্দর্য্য চৈতন্য—ভাষা জড়। জড়কে ভেদ করিয়া চৈতন্যকে পরিস্ফুট করা অতি দুরূহ কার্য্য। যে কবি এই ভাষাকে এই জড়কে যত আয়ত্ব করিতে পারিবেন তিনি তত কৃতী। যে চিত্রকর বর্ণকে যত অতিক্রম করিতে পরিবেন, ভাবকে ততই তিনি জাগ্রত করিতে পারিবেন। অক্ষম কবি ভাষাকে অতিক্রম করিতে পারেন না; ভাষাই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। নিপুণ কবির ভাষা, তাঁহার ভাবের সহচর বাহন মাত্র। ভাষার তাঁহার নিকট

'ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী'।

এই যে ভাষাকে নাচাইবার ক্ষমতা, এই যে ভাষার ভিতর সৌন্দর্য্যের প্রতিধ্বনি, এই ক্ষমতা নবীনচন্দ্রের ভিতর সমধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাই। পলাশীর যুদ্ধবর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনবিদিত। নবীনচন্দ্র যখন গাহিতেছেন

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক রক্ত ধমনীভিতরে;
মাতৃকোলে শিশুগণ করিলেক আস্ফালন
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

তখন বাস্তবিকই যেন আমরা 'ব্রিটিশের রণবাদ্য' শুনিতে পাই; 'আম্রবন' ও 'গঙ্গাজল' কাঁপাইয়া 'রক্ত ধমনী ভিতরে' নাচিয়া উঠে ও উৎসাহে বুক পূর্ণ হইয়া যায়। 'রঙ্গমতী'তে বীরেন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনায়ও আমরা এই উৎসাহ অনুভব করি।

আবার যখন নবাবশিবিরে উপস্থিত হইয়া শুনি

"বিবসনা লো সুন্দরি, সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ? নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনী সম বেণী দুলিতেছে পাছে।

তখন যেন নৃত্যশীলা বিবসনার বীভৎস দৃশ্য সম্মুখেই দেখিতে পাই।

কখনও বা নবীনের কবিতা হরিপ্রেমে উন্মত্ত—বৈরাগ্যে আত্মহারা!

কালা হইয়াছে গোরা জীর্ণ বাস পীতধরা,
হয়েছে মোহনবাঁশী দণ্ড বৈরাগীর,
চন্দন হয়েছে ধুলা প্রেমে গোরা আত্মহারা
নয়নযুগলে ধারা প্রেম জাহ্নবীর!
'হরিবোল হরিবোল'! নাচে গোরা বাহুতুলি
ধূলায় সোনার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি।

পড়িতে পড়িতে 'পুণ্যবতী' শৈলজার মত আমরাও হরিপ্রেমে উন্মত্ত গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাই, প্রেমে আমাদের অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে

সুভদ্রা যখন 'নারীধর্ম্ম' কহিতেছেন, তখন সুলোচনা শুনুন আর না শুনুন, নবীনের ভাষা ভক্তিপ্রণতা শিষ্যার ন্যায় সুভদ্রা-দেবীর পদতলে বসিয়া যেন 'নারীধর্ম্ম' শিক্ষা করিতেছে—

না দিদি, আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই;
বরিষার ধারা সম অজস্র জননী-প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চলে যাই।
মিত্রকে যে ভাল বাসে সকাম সে ভালবাসা
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার,
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার!

কি শান্ত—কিগম্ভীর—কি মহতী বাণী! ইহার ভিতর দিয়া যেন বিশ্বজননী রূপিণী সুভদ্রার মূর্ত্তি আমাদের অন্তরপটে ভাসিয়া উঠে!

যেখানে পতি-বিয়োগ বিধুরা বালিকা বধূ উত্তরা মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতেছেন, নবীনের ভাষাও সেখানে তাঁর সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল! তাহার প্রতি অক্ষর যেন অশ্রুতে সিক্ত হইয়া গিয়াছে!

"———দেব! কহ এক বার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল-খেলা নাহি ফুরাইতে নাথ
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?

* * * *

সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার
রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার,
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর?
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো রয়েছে পড়ি
উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর?

ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?

* * * *

দয়াময় ! দয়া কর দুঃখিনী কন্যার !
নহে যুগ নহে বর্ষ কেবল ছয়টি মাস
লিখিলে কি এই স্বর্গ কপালে তাহার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?"

এ বিলাপ শুনিতে শুনিতে আমরা পার্থের ন্যায় শোক-বাষ্প রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না।

কিন্তু হায়, উপাসক চিরকালই দরিদ্র! পূজা যাহাকে পাইতে চায়, সে যে চিরকালই দূর বলিয়া বোধ হয়! প্রাণের দেবতাকে চিরদিনই পাইতে আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু হায় তাহাকে ধরিয়াও যে ধরিতে পারি না! কবি চিরকাল সৌন্দর্য্যকে পাইতে চায়, সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে তাহাকে ধরা দেয় কই ? চিত্রকর চিরদিনই ভাবকে জাগ্রত করিতে চাহেন, কিন্তু সে চিরদিনই লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। এই যে প্রকৃতি, এই যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ, এও ত চিরদিন সেই সাক্ষ্যই দিতেছে। চিরদিনই এ যেন কাহাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সে যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে না। এই স্বর্ণরবিকর—এই সান্ধ্যগগণের সিন্দুর মেঘমালা—এই পূর্ণিমার ফুল্ল-পুষ্প-আভরণ—এই নীল আকাশ—এই উন্মত্ত জলধি এই চিত্রে কাহাকে যেন আঁকিতে চাহিতেছে!—সম্পূর্ণ আঁকিয়া উঠিতে পারিতেছে কই ? এই যে প্রকৃতির অন্তরে অহর্নিশি একটা ব্যাকুলসঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে!—কাহার গান যেন সে গাহিতে চাহিতেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ গাওয়া হইতেছে না—বীণার তার অর্দ্ধ পথে থামিয়া যাইতেছে! জগতের সমস্তই যেন অর্দ্ধেক! অর্দ্ধেক দেখা যায়, অর্দ্ধেক চিরকালই দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়। অর্দ্ধেক গান গাওয়া হয়—অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কবি যে অনন্ত সুন্দরের কথা বলিতে চান, তাহার কেবল অর্দ্ধেক যেন বলিতে পারেন, অর্দ্ধেক অকথিত থাকিয়া যায়। চিত্রকর যে মহানের চিত্র প্রতিফলিত করিতে চান্—তাহার অর্দ্ধেক যেন কেবল তুলিতে উঠে, অর্দ্ধেকই চিত্রকরের হৃদয়ে থাকিয়া যায়। কবি কেবল বর্ত্তমানের কথা—কোন বিশেষ একটি ঘটনা বা বিশেষ একটি সৌন্দর্য্যের কথা বলেন না; কিন্তু এই বর্ত্তমান ও বিশেষের মধ্য দিয়া তখন কিছু বলিতে চান, যাহা সর্ব্বকালব্যাপী—সর্ব্বস্থানব্যাপী; যাহা বর্ত্তমানের যাহা অতীতের—যাহা ভবিষ্যতের; যাহা চিরসুন্দর—যাহা চির-আনন্দময়! অর্দ্ধেক তিনি বলেন—অর্দ্ধেক আমি বলি। কবি যে বীণার সাধনা করিতেছেন, আমার মধ্যেও ত সেই সৌন্দর্য্যের বীণা আছে! তিনি তাঁহার বীণার তার এমন করিয়া আঘাত করেন—যাহাতে আমার হৃদয়ের বীণার তার বাজিয়া উঠে!—সে যে এক সুরে বাঁধা হইয়া আছে। সমস্তখানি কবি বাজাইলে ত আমার হইত না। আমার সৌন্দর্য্যকে আমি পাইতাম না, আমার আনন্দকে আমি অনুভব করিতে পারিতাম না! তাই কবি কেবল অর্দ্ধেক বাজাইয়া দেন। তিনি কেবল আভাস দিয়া দেন—পূর্ণতা আমি করিয়া লই। এই যে আভাস

দেওয়ার ক্ষমতা, এইটিই কবির বড় ক্ষমতা, ক্ষুদ্র কবির সম্বল অল্প। তাহার যাহা কিছু সে বলিয়া ফেলে; তাহাতে আমার আনন্দ হয় না। প্রতিভাবান্ কবি সমস্তটুকু বলেন না—আমার জন্য রাখিয়া দেন। সবটুকু আঁকিয়া ফেলেন না, আমার তুলিকার জন্য অবসর রাখেন। তিনি আমাকে কেবল কবিতা শুনান না; কিন্তু আমার নিদ্রিত কবিত্বকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। অন্য এক জনকে যে কবি করিতে পারে, সেই ত বড় কবি। এই যে আভাস দেওয়ার ক্ষমতা—এই যে অন্যের কবিত্বকে জাগ্রত করিবার ক্ষমতা, এই ক্ষমতা নবীনচন্দ্রের আছে। তাই তাঁহাকে বড় কবি বলি। নবীনচন্দ্রের কবিতার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্যে ব্যাকুলতা, একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ছায়া সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন কবি কি বলিতে চাহিতেছেন, সবখানি বলিতে পারিতেছেন না। এই ক্ষুদ্র—এই বর্ত্তমান—এই বিশেষকে ছাড়িয়া কি যেন অনন্তের দিকে যাইতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যেমন এক অনন্ত সমুদ্রেরই দিকে ধাবমান হয়,—তেমনি কবির সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য যেন এক অনন্ত সুন্দরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। ঐই স্থান, কাল, সমাজ, দেশ, সমগ্র জগত—সমস্ত ভুলিয়া এক স্থানহীন কালহীন মহান্ সত্যের দিকেই যেন তাহার গতি দেখিতে পাই। এই যে প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, ইহাতে যেন আর তৃপ্তি হয় না; কি এক অক্ষয় সৌন্দর্য্যের সিন্ধু আছে, তাহাকেই পাইতে ইচ্ছা হয়! এই যে জগতের ক্ষুদ্র প্রেম, ইহাতে হৃদয় ভরিয়া উঠে না,—

"অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি, কি যেন অনন্ত আছে,
প্রেম সিন্ধু সেই দিকে ধায়!"

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত যখন প্রবল বেগে আমাদের দেশের উপরে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, তখন তাহার প্রভাব সমাজ ও সাহিত্যের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ইহা আমরা বলিয়াছি। সেই সময়ে যদি আমরা আমাদের সাহিত্যকে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করিয়া রাখিতে চাহিতাম, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইত না। ভাবকে রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে আমরা তাহার ধ্বংসই সাধন করিতাম। আমাদের গৌরবান্বিত মাতৃভাষার অস্তিত্ব থাকাই হয় ত কঠিন হইত। কিন্তু ধন্য আমাদের তখনকার সাহিত্যের কর্ণধারগণ! তাঁহারা এই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গভাষার সমন্বয় করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের যে অতুল সম্পদ, তাহা হইতে মাতৃভাষাকে বঞ্চিত করিয়া অনুদারতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল মৃত সংস্কৃতভাষার মুখাপেক্ষী হইয়া দুহিতা বঙ্গভাষার চলিবে না; বর্ত্তমান সভ্যজগতের একটা প্রাণময়, জীবন্তভাষার সঙ্গে তাহার সখিত্ব করিতে হইবে। কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন প্রথমে এই পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের

যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা জননী বঙ্গভাষাকে তিনি বিবিধরূপে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে পাশ্চাত্য আদর্শে কাব্য, গীতিকাব্য ও নাটক প্রণয়ন করেন। বঙ্গীয় কাব্যের, ছন্দ ও ভাষার গতি নূতন পথে ফিরাইয়া দেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহারই পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা তাই বঙ্গভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাষার এই সমন্বয় চেষ্টা দেখি। নবীনচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাই এই উভয় ভাষার প্রভাবই তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর ছায়া বহুল পরিমাণে তাঁহার কাব্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র একটা দুর্জ্জয় বেগ, ভাবের স্বাধীন লীলাময়ী ভঙ্গী যেমন আমরা অনুভব করি, তেমনি অন্য দিকে তাঁহার ছন্দের জলদগম্ভীর ঝঙ্কার ও ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য, শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য, অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালিনী সংস্কৃতভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু যদিও ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য বহুল পরিমাণে নবীনচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাই বলিয়া তাঁহার প্রতিভা অনুকরণ-দোষ-দুষ্ট, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। অনুকরণ ও গ্রহণ যে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাহিত্যজগতে চিরকালই চিন্তা ও ভাবের বাণিজ্য চলিয়া থাকে। সেগুলি যে সর্ব্বত্রই জঘন্য চৌর্য্যবৃত্তি এ কথা বলা যায় না। জগতে কয়জন কয়টি নূতন কথা বলিয়াছেন; কয়জন নূতন ভাব ও নূতন সত্য প্রচার করিতে পারিয়াছেন? সত্য চিরকালই সুন্দর। জগতের সেই সনাতন সত্যগুলিকে যিনি নূতন আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ও নূতন বর্ণে সুন্দর করিয়া ধরিতে পারেন—তিনিই প্রতিভাবান্—তিনিই ধন্য সত্য ত চিরকালের; সত্য ত কাহারো নিজস্ব নয়। কিন্তু এই যে আলোক, এই যে বর্ণ, ইহাই কবির নিজস্ব—ইহাই কবির প্রতিভা। মহাকবি সেক্সপিয়র ও মিলটনও ত অনেক পুরাতন সত্য প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিকে তাঁহারা তাঁহাদের কবিপ্রতিভার দিব্য জ্যোতিতে অপূর্ব্বরূপে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতিও ত ব্যাস ও বাল্মিকীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের গৌরব হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের অসামান্য সৃষ্টিচাতুর্য্যে জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রেরও এই দিব্য আলোক—এই মোহিনী শক্তি ছিল, তাই তিনি অনেক পুরাতন কাহিনী ও পুরাতন সত্য কীর্ত্তন করিলেও—সেগুলিকে আরও মহীয়ান্ করিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিক কবিগণের চিন্তা ও ভাবের অনুবর্ত্তন করিলেও সেগুলিকে নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ভাব ও সৌন্দর্য্যের রাজ্যে যে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকালই বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাঙ্গালীর

স্বদেশ-প্রেমের তিন মহাকবি। নব্য-বঙ্গের প্রথমপ্রভাতে এই চারণ-কবিরাই স্বদেশ-প্রেমের উদাত্তসঙ্গীতে চারিদিক পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' রচনায় বাঙ্গালী চিরকালই যশস্বী ছিল। প্রেমরাজ্যের কুহক-কল্পনায়, বিরহ-মিলনের বিচিত্র-স্বপ্ন-সৃষ্টিতে চিরকালই বাঙ্গালী পটু ছিল। বহির্জ্জগতের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া নারীজনোচিত অবসাদের সঙ্গীতে তাহারা একান্ত আসক্ত বলিয়া তাহাদের একটা অপবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। নব্যবঙ্গের এই কবিগণ বাঙ্গালীর সেই অপবাদ দূর করিয়াছিলেন। অতীতের কোমল বীণার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সুগম্ভীর ভেরীনিনাদে বাঙ্গালার জলস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের মত এমন মর্ম্ম-স্পর্শী, প্রাণময় পুরুষোচিত ভাষায় কে আর বলিতে পারে ?—

> "হায় মা ভারতভূমি বিদরে হৃদয়,
> কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
> কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
> পরাণে বধিতে হায় মধুমক্ষিকারে ?
> পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়
> যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাধার,
> স্বর্ণপ্রসবিণী যদি না হইতে হায়,
> হইতে মা রঙ্গভূমে অদৃষ্ট ক্রীড়ার !

এই ক্রন্দন নবীনচন্দ্রের সমস্ত কাব্য-জীবনেই আমরা দেখিতে পাই। তিনি পূর্ণভাবেই জাতীয় কবি ছিলেন। স্বদেশের দুঃখ ও গৌরবের সঙ্গীতেই তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠ নিয়োজিত হইয়াছিল। অবকাশ-রঞ্জিনী হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশী, রঙ্গমতী, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাস সর্ব্বত্রই সেই একই স্বদেশ-প্রেমের স্রোত বহিতেছে। অনেকে মনে করেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের কবি পলাশী ও রঙ্গমতীর কবি হইতে ভিন্ন। আমরা কিন্তু পলাশী ও কুরুক্ষেত্র একই কবিপ্রতিভার কার্য্য দেখিতে পাই। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কবির স্বদেশ-প্রেমের পরিণত চিত্র। এখানে কবি কেবল অতীতেই তৃপ্ত হন নাই, ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। কবির দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি। তাহা কালের আবরণ ভেদ করিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে কবি ভবিষ্যতের যে মহান্ চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সত্য হইবে না কে বলিতে পারে ?

> "এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
> এক রাজ্য, এক নীতি
> সকলের এক ভিত্তি— সর্ব্বভূত-হিত ;
> সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
> লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
> একমেবাদ্বিতীয়ং ! কবির নিশ্চিত
> ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"
>
> (রৈবতক)

কবির মহাস্বপ্ন সফল হউক ! এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তাহা নির্ণয় করিবার এখনও সময় আসে নাই। নব্যবঙ্গের জীবনপ্রভাতে যে তিন সূর্য্য উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই একে একে

অস্ত গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গৌরব-কিরণ বর্ত্তমানকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতকেও আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। 'তাঁহাদের কবিত্বের তুলনায় সমালোচনা এখন আমাদের পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে।' মনস্বী হীরেন্দ্রনাথের সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিতে গেলে বলিতে হয় এখনও আমরা পর্ব্বতশিখরে রহিয়াছি; সুতরাং তাহার উচ্চত্ব আমরা বুঝিতে পারিব না। ভবিষ্যতের দূরত্বই তাহার প্রকৃতি নিরূপণে সমর্থ হইবে। বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহাও নির্ণয় করিতে এখন আমরা চেষ্টা করিব না। সে দুরূহ কার্য্য সাধনের উপযোগী ক্ষমতাও এ অধম লেখকের নাই। নবীনচন্দ্র যে অমূল্যদান আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, এখন কেবল তাহার কথাই আলোচনা করিবার সময় আমাদের উপস্থিত হইয়াছে। পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য—তাহাকে গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই মহাপুরুষ ও কবির আগমন। সত্য ও সৌন্দর্য্যই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য। অধঃপতিত জাতি এই সত্য ও সৌন্দর্য্যের পথ হইতে নিয়তই স্খলিত হইয়া পড়ে। মহাপুরুষ ও কবি তাই সত্য ও সৌন্দর্য্যের দান লইয়া জাতীয় জীবনের সম্মুখে উপস্থিত হন। দুর্দ্দিনের অন্ধকার-রজনীতে আপনার প্রতিভার আলোকে তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দেন; লক্ষ্যহীন জাতীয় তরণীর সম্মুখে আদর্শের ধ্রুবতারা স্থাপিত করেন। নবীনচন্দ্র আমাদিগকে এই ধ্রুবতারা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। যে অনন্ত স্বদেশ-প্রেম, গভীর আত্মত্যাগ এবং নিষ্কামধর্ম্ম ও কর্ম্মের মহান্ আদর্শের সঙ্গীত তিনি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের কলঙ্কমণ্ডিত জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। এই মরণশীল জগতে কবি অমর। তিনি যে ভাব ও সৌন্দর্য্যের দান রাখিয়া যান, তাহার মধ্যেই তিনি অমর হইয়া থাকেন। আপনার প্রদর্শিত সত্যের মধ্যেই তিনি প্রকৃতরূপে সত্য হইয়া উঠেন। এই সত্য ও সৌন্দর্য্যরূপী নবীনচন্দ্রকে লইয়া জাতীয়-জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে; তিনি যে আদর্শের ধ্রুবতারা আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই দুর্য্যোগের নিশিতে তাহাকেই স্থির লক্ষ্য করিয়া, আমাদের জাতীয়-জীবনতরণী ভাসাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন।

(গৌরীপুরে আহুত তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।)

যিনি এই রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে আমাদের সাক্ষাতেই বিরাজমানা, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া আমাদের কল্যাণ করুন্। যাঁহার কৃপাকণায় মূক বাচাল হইয়া থাকে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরম দেবতা আমাদিগকে আরব্ধকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদনের শক্তি প্রদান করুন

যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর আমন্ত্রণ-পত্র-প্রেরণে আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তখন মনে ভাবিয়াছিলাম যে সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-বিষয়ে নানা উপদেশ লাভ করিব। বিশেষতঃ নানা কারণে গতবার সম্মিলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই বড়ই উৎসাহ সহকারে "আসিব" বলিয়া স্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার পর তিনি যখন দ্বিতীয় পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ভার দিলেন, তখন উৎসাহটা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল, তথাপি রাজাদেশ বলিয়া সেই বিষয়েও স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত করিলাম। কিন্তু যখন ৬ই মাঘ বুধবার অর্থাৎ যে দিন গৌহাটী হইতে গৌরীপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা, তৎ পূর্ব্বদিন একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম যে আমাকে এই সম্মিলনের অধিনায়কত্ব করিতে হইবে, তখন প্রকৃতই স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার অযোগ্যতা নানা প্রকারের—এই যে আপনাদের সমক্ষে যে ভাবে প্রবন্ধটি পাঠ করিতেছি, ইহাতেই এক প্রকার অযোগ্যতার চিহ্ন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছেন। সে বরং সামান্য কথা। কিন্তু একটা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে যেরূপ ভাব ও ভাষার সমাবেশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহার অধিকারী আমি নই। আবার ঈদৃশ স্থলে পাঠ করিবার নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ রচনার্থ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে যতটুকু সময়ের আবশ্যক, তাহা পাওয়া ত দূরের কথা, কয়েকটি মাত্র কথাও যে গোছাইয়া বলিতে পারি সে সময়ও পাওয়া গেল না; প্রকৃতই একটি মাত্র দিনের মধ্যে ইহা কোনরূপে লিখিয়া সমাপন করিতে হইয়াছে। আমারই দুর্ভাগ্যের বিষয়! শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর যে সাধ করিয়া এই অযোগ্যের উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। হস্তিনাপুরাধিপতি যেমন ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণাদির অভাবে মদ্রবীর শল্যবর্ম্মাকে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, গৌরীপুরাধিপতিও মাদৃশ ব্যক্তিকে তাদৃশ হেতুতেই বোধ হয় এই কার্য্যে বৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সহৃদয় সভ্যমহোদয়গণ, আপনাদের প্রায় সকলেই হিন্দুসন্তান; একটি শিলাখণ্ড কিম্বা মৃৎপ্রতিমা সম্মুখে বসাইয়া যেমন আপ-

নারা ইষ্টদেবের ধ্যানে চিত্ত সমাহিত করিয়া থাকেন, আশা করি, তেমনই মৃৎ-শিলোপম এই অযোগ্যকে, সাক্ষাতে রাখিয়া আপনা-দের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন। ফলতঃ যাহাতে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় প্রথমাধিবেশনে বৃত হইয়াছিলেন, যে পদে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় দ্বিতীয়-অধিবেশনকালে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎস্থলে আমার ন্যায় শক্তি-সামর্থ্যহীনের নিয়োগ আমার পক্ষে অতীব সম্মানের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলনায় উপহাস-ভাজনের আশঙ্কাটাই যে অধিকতর, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্যমাত্র।

এইবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন গোয়ালপাড়া, গৌরীপুরে হওয়াতে ইহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। গোয়ালপাড়া বঙ্গ-দেশ ও আসামের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। তীর্থরাজ প্রয়াগে যেমন গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া প্রবহমান হইয়াছে গোয়ালপাড়াতেও বঙ্গ-ভাষা ও আসামীয়ভাষা সংমিশ্রিতভাবে অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। প্রয়াগের পুণ্যসঙ্গমে যেমন কচিৎ শ্বেতগঙ্গা-প্রবাহ কচিৎ কৃষ্ণাযমুনা-লহরীর মিলনের অপূর্ব্বদৃশ্য-নিরীক্ষণে দর্শকের মনে কালি-দাসের সেই—

"কচিৎ প্রভালোপিভিরিন্দ্রনীলৈ
মুক্তাময়ী যষ্টি চিরানুবিদ্ধা।"

ইত্যাদি ললিত মধুর বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হয়, তেমনি গোয়ালপাড়ার কোনও স্থলে আসামীয়ভাষা কোনও স্থলে বঙ্গভাষা এইরূপ এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হইয়া ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর মনে কৌতু-হলোদ্দীপন করিয়া থাকে। সম্মিলনের আমন্ত্রণকারী রাজাবাহাদুরও সেই নিমিত্তে "আসাম ও বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের সম্মিলন ও পরস্পর ভাষার উন্নতিসাধন কল্পে" গৌরীপুরে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া সবিশেষ সমীচিনতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিশেষতঃ যেমন রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে একবার ভগদত্তের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বিজয়ার্থ মহারথী অর্জ্জুন সসৈন্যে অভিযান করিয়াছিলেন তেমনই এই সম্মিলন-যজ্ঞের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাহিত্যিকবর্গ-সমন্বিত মহারথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহো-দয় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বর্ত্তমান প্রতিনিধি গৌহাটীতে গমন পূর্ব্বক ইহার জয় সাধন করিয়া সম্মিলনের কার্য্যক্ষেত্র সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তখন প্রাগ্-জ্যোতিষপুর হইতে কোনও বন্দী রাজসূয় স্থলে আনীত হইয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু এ স্থলে আমন্ত্রিত মহাত্মাগণের নিকট বর্ত্তমান প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের—আসামের—কাহিনী বলিবার জন্যই বোধ হয় তথা হইতে এক জনকে ধরিয়া এখানে আনিয়া দণ্ডায়মান করা হইয়াছে, ফলতঃ এই নববিজীত এবং সম্মিলনে সংযোজিত দেশের বিষয়ে সভাস্থ অনেকেই প্রকৃত তথ্য অবগত না থাকিতে পারেন। তাই তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

এখন যাহাকে আসাম বলে তাহা এবং

পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের এক বিশিষ্ট অংশ লইয়া প্রাচীন 'কামরূপ' দেশ অবস্থিত ছিল। কালিকাপুরাণ কিম্বা যোগিনীতন্ত্রে ইহার সীমানা উল্লেখ আছে, উক্ত তন্ত্রের একাদশ পটলে আছে,—

"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকরবাসিনীম্॥
উত্তরস্যাং কুঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥"

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেণ্ট-এর যতদুর অধিকার তাহার অধিকাংশ এবং কোচবিহার প্রাচীন কামরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর— অতএব মহাভারতের যুগে রাজধানীর নামেই রাজ্যের পরিচয় ছিল। পুরাণ তন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে সর্ব্ব প্রথম কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুর যে একই রাজ্যের নাম তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর বাণভট্টকৃত হর্ষ-চরিতের সপ্তম উচ্ছ্বাসে দেখিতে পাই, কুমার ভাস্করবর্ম্মা হর্ষদেবের নিকট দূত পাঠাইয়া সেই নরকাসুরের সময়ের শ্বেতচ্ছত্র তাহাকে উপহার দিতেছেন। চীনদেশীয় পরি-ব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ্ ইহারই নাম উল্লেখ করিয়া এই কামরূপের সভ্যতার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তারপর বলবর্ম্মা, ইন্দ্রপাল ও রত্নপাল প্রভৃতির তাম্রশাসনগুলি কৃষকের লাঙ্গলাহত হইয়া বহু শতাব্দীর পর ভূগর্ভ হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক শাসন-প্রদাতা রাজগণের বদান্যতার ও নরক ভগদত্তের বংশে তাঁহাদের উৎপত্তির কথা এবং তৎ-কালীন সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে, যাঁহারা তাম্রফলকগুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা লিপিভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা ঐগুলিকে আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই ত্রিযুগব্যাপী যাহার ইতিবৃত্ত, সেই নরকাসুরের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপে ধারাবাহিক একটা সভ্যতা চলিয়া আসিতে-ছিল। আবার কালিকা-পুরাণে (৪০ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই ভগবান বরাহের পুত্র নরক বাণের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া সঙ্গ-দোষে "অসুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে "শোণিতপুর" নরকের রাজ্যের কাছাকাছিই ছিল। বর্ত্তমান তেজপুরই সেই শোণিতপুর। আসামী ভাষায় শোণিত অর্থে "তেজ" শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; আসাম-প্রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে এই সেই দিন মাত্র—বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আসাম-অধিকারের (১৮২৬ খৃঃ) পর কোনও ডিপুটী কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক নামটি আসামীর গোচর হইবার জন্যই না কি শোণিতের পরিবর্ত্তে 'তেজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ কাছাড় জিলা বৃটিশ অধিকারে আইসার (১৮৩২ খৃঃ) পরও কিয়দ্দিন "হিড়িম্ব" নামে অভিহিত হইত। তাদৃশ কোন কারণেই বোধ হয় ইহারও নামটি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। আবার কালিকা-

পুরাণে (৩৯ অধ্যায়ে) দেখা যায় নরক বিদর্ভ-রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে কুণ্ডিন নামে একটি নদী আছে ইহার তীরে যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, স্থানীয় পুরুষপরম্পরা প্রবাদ এই যে ঐগুলি রাজা ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডিননগরেরই ধ্বংসাবশেষ; নদীরও নাম নগরের নামেই না কি কুণ্ডিন হইয়াছে। মহাভারত ও হরিবংশে বিদর্ভ ও তদ্রাজধানী কুণ্ডিনের সংস্থান স্পষ্টই বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণে নির্দ্দেশিত আছে। তবে নরকের শ্বশুরালয় এতদ্দূর না হইয়া সন্নিকৃষ্ট কুণ্ডিন—বিদর্ভে ছিল কি না তাহা সুধীগণের কিঞ্চিৎ বিভাব্য। ইতিপূর্ব্বে "হিড়িম্বের" উল্লেখ হইয়াছে, ইহার প্রাচীন সংস্থানও এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছিল, যদিও সম্প্রতি ইহার খানিকটা কাছাড় জিলা নামে আখ্যাত হইয়া সুরম্যোপত্যকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই সকল হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, আসামকে উত্তর-বঙ্গসম্মিলন সমীচিন ভাবেই স্বীয় কার্য্য-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছেন, ইহা এক বহু পুরাতন স্থান। যে সকল প্রাচীন ভূপতি এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, উঁহারা কেবল পরাক্রান্ত নহেন, বিলক্ষণ কীর্ত্তিমানও ছিলেন। ইহাদের সেই কীর্ত্তির চিহ্ন কোথায় গেল? তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে! তবে সেই বিলোপের দুইটি কারণ—প্রথম ও প্রধান স্বাভাবিক, দ্বিতীয় কৃত্রিম। সময়গতিতে ক্ষয় ও ভূকম্পনাদিতে লয়ই স্বাভাবিক কারণ। কৃত্রিম কারণ বড়ই শোচনীয়; আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে যখন প্রস্তুত হইতেছিল তখন ভূমি-খনন দ্বারা গৌহাটী সহরের কাছে এবং আরও নানা স্থানে না কি অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল, সেইগুলি যে কোথায় গেল, কি হইল তাহা বিধাতাই জানেন। তারপর তেজপুরে যে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ, বাণ-রাজার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত উহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে কয়েক খণ্ড মাত্র প্রস্তর ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলি না কি সহরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইবার নিমিত্ত জনৈক সেনানী ডেপুটীকমিশনার ভূগর্ভে সমাহিত করিয়া উহার উপর আফিস-আদালতের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন!

সেই প্রাসাদের একটিমাত্র অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভের প্রতিকৃতি এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণেল (জানুয়ারী ১৯০৯) মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—অপরগুলি যে তাদৃশ বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল না কে বলিতে পারে?

যাহা হউক সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলির পর্য্যবেক্ষণার্থ সম্প্রতি অনেক যত্ন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হিড়িম্বরাজ-কীর্ত্তি ডিমাপুরের স্তম্ভাবলী গড়গাঁও রঙ্গপুর (শিবসাগরস্থ) প্রভৃতি স্থানের অসহাম-রাজকীর্ত্তিসমূহের সংস্কারকল্পে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। এবং যেখানে যে প্রাচীন বা আধুনিক-কীর্ত্তি-নিদর্শন আছে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত রাজপুরুষেরা তাহার তালিকাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের

ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের Report on the progress of Historical Researches in Assam নামক ১৮৯৭ সালে মুদ্রিত প্রবন্ধে তিনি প্রায় চারি বৎসর কাল পরিভ্রমণ ও গবেষণা দ্বারা যে সকল বিষয়ের সন্ধান জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাদের তালিকা এবং কোনও কোনও স্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তাম্রশাসনাদির বিবরণ তাঁহারই সাহায্যে এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত হইয়াছে, আসামপ্রদেশে আহোম রাজগণের সময় হইতে যে ধারাবাহিক বুরঞ্জি বা ইতিহাস আহোমদের ভাষায় কি অসমীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল ঐগুলি হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই গেইট সাহেব "আসামের ইতিহাস" লিখিয়া আসামবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই গেল গবর্ণমেণ্টের বা সাহেবদের কর্ত্তব্যপালনের প্রশংসনীয় কাহিনী। কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? বলিতে গেলে এ যাবত কিছুই করা হয় নাই। অথচ এই স্থানে আমাদের এক বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশবাসিগণ আসাম সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করেন; অথচ আসাম তাঁহাদের অতীব সন্নিকৃষ্ট; পূর্ব্বে বহুদিন এবং সম্প্রতি কিয়দ্দিন যাবং পুনশ্চ তাঁহারা আসামের সঙ্গে একই প্রদেশভুক্ত। সুদূর হিমালয়ের পথে মাসাধিককাল পর্য্যটন পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমের কাহিনী প্রচারিত করা হইয়াছে; কিন্তু ডিব্রুগড় হইতে পাঁচ ছয় দিনে যেস্থানে পৌছা যায় সেই পরশুরামক্ষেত্রের কাহিনী এযাবৎ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল না। কণিষ্ক ও কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বহু অনুশীলন করা হইয়াছে, কিন্তু আহোম আকবর রাজা রুদ্রসিংহের নাম কেহ জানেন কি না সন্দেহ। অমৃতসরের নামকরণ-বিবরণ অনায়াসে বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু শিবসাগরের কথা কিছুই বলিতে পারি না। "উদাসীন সত্যশ্রবা" এ সকল বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও আজ উহার একখণ্ড কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বঙ্গবাসিগণের আসামের বিবরণ সংগ্রহে এত অনাদর।

সাহেবেরা এই সকল বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন এবং পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। এই হেতুবাদে আমাদের ঔদাসিন্য অবলম্বন সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের গবেষণায় অনেক ভুলভ্রান্তি আছে; তাহাদের লেখা ইংরাজিতে, ইহাতে আমাদের লাভ কি? বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলে এই সকল বিবরণী স্থায়ী হইতে পারে না; অতএব আমাদের এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্ত্তব্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। গতবর্ষে গৌহাটীতে বঙ্গসাহিত্য-অনুশীলনী-সভা স্থাপিত হইয়া এই সকল বিষয় কিছু কিছু আলোচিত হইতেছে বটে; কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র সভার দ্বারা আশানুরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

এই বৎসর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এই আসামের এক দেশে হইতেছে, এবং এতদুপলক্ষে সম্মিলনের প্রথম সভাপতি শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহোদয় এবং সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়

চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ পুরাণোক্ত সমগ্র কামরূপের কেন্দ্রস্থান ৺কামাখ্যাধিষ্ঠিত নীলাচলে এবং আসামের বর্ত্তমান রাজধানি গৌহাটী সহরে আগমনপূর্ব্বক ইহার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে আশা করা যায় যে, আসামের প্রাচীন তত্ত্ব বিষয়ে যথোচিত আলোচনা হইবে। মনে রাখিবেন যে উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রাচীন কাল হইতে পরস্পর সম্বন্ধ। এই আসাম যখন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন থাকে, তখন উত্তরবঙ্গ ও আসাম একই স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের অধীন ছিল। অতএব উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক আসামকে আপন কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করা সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে। কেবল পুরাতত্ত্ব নহে অন্যান্য নানা বিষয়েও আসাম প্রদেশ বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। আসামে যত প্রকারের জাতি ও রীতি-নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, যত প্রকারের বিভিন্ন ভাষা ও ভূষা প্রচলিত, যত প্রকারের উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য আছে, ভারতবর্ষের অপর কোনও প্রদেশে এত আছে কি না সন্দেহ। এই সকল বিষয় কোনওরূপ গবেষণা করিতে হইলে আসামে যত মালমসলা পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা সুদুর্লভ। বিখ্যাত পণ্ডিত মিঃ সি, বি, ক্লার্ক কেবল উদ্ভিজ্জ বিদ্যার অনুশীলনের সৌকর্য্যার্থ বৃদ্ধ বয়সে আসামে আসিয়া স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। আর আমরা আসামে কোনও কিছু শিখিবার বা জানিবার আছে কি না তাহার তত্ত্ব রাখি না।

এই আসামী ও বাঙ্গালীর সংমিশ্রণস্থানে আহূত সাহিত্য-সম্মিলনে অসমীয় ও বঙ্গভাষা উভয়েরই সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার উপভাষা (dialect) কি না এ বিষয়ে এক বিরাট আন্দোলন এই দেশে হইয়া গিয়াছে। আহোম রাজগণের সময় রাজভাষা (court language) অসমীয় ভাষাই ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই অসমীয় ভাষা আহোমদের জাতীয় ভাষা নহে। ইহারা ব্রহ্মদেশীয় নিজ ভাষা এস্থানে আগমনের অল্প পরেই পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের নর্ম্মাণগণের ন্যায় বিজীত জাতির ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে কেবল তাহাদের আপন ভাষাতেই ইতিহাসগ্রন্থ (বুরঞ্জি) লিখিত হইত। কিন্তু পশ্চাৎ তাহাও অসমীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

আসাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবার প্রায় দশ বৎসর পর অসমীয় ভাষাকে বাঙ্গালারই উপভাষা মনে করিয়া বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ও আদালতে বঙ্গভাষারই ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ বৎসর পর আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন নামক আসামের জনৈক প্রতিভাশালী কৃতি সন্তান এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকটন করেন। ইতিপূর্ব্বেই মিসনরী মহাত্মাগণ অসমীয় ভাষায় তাঁহাদের পুস্তিকাদি লিখিয়া সাধারণের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন এবং তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম "অরুণোদয়" পত্রিকা শিবসাগর হইতে প্রকাশিত করিয়া অসমীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদির প্রবন্ধ

লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আনন্দরাম ফুকনের পিতা হালিরাম ফুকন আসামের একখানি ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গদেশে ছাপাইয়া ছিলেন এবং আনন্দরাম ফুকন স্বয়ং আইন-সম্বন্ধীয় পুস্তক ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রায় অর্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রচার বঙ্গভাষায় বোধ করি উহাই সর্ব্বপ্রথম :—বঙ্গীয়-সাহিত্যজগতেও আনন্দরাম অতএব একজন স্মরণীয় পুরুষ।

যাহা হউক মিশনরীগণের প্ররোচনায় এবং অসমীয় ভদ্রলোকদের প্রার্থনায় সার জর্জ কেম্বেল ১৮৭৩ অব্দে অর্থাৎ আসাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিবার ৪৫ বৎসর পর পাঠশালে অসমীয় ভাষার প্রবর্ত্তন করেন এবং তখনই ইহা আদালতের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়। উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং এণ্ট্রেন্স স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত থাকিল। কিন্তু ১৮৯৮ সাল হইতে ক্রমশঃ ঐগুলিতেও অসমীয় ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও এফ, এর ভর্ণিকুলার বলিয়াও অসমীয় ভাষারই সমাদর হইয়াছে এবং কিয়দ্দিন হইল, হাইকোর্টের ফারমগুলিও অসমীয় ভাষায় অনূদিত হইবার অনুজ্ঞা হওয়াতে বঙ্গভাষার সঙ্গে অসমীয়-ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার সঙ্গে কি কি বিষয়ে মিলে ও কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রবন্ধান্তর লিখিত হইয়াছে, তাহা এই সভায় পঠিত হইবে, এক্ষণে অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার উপভাষা কি না, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ তদীয় Linguisted Survey of India গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

Whether Assamese is a dialect or a language is really a mere question of words which is capable of being argued *ad infinitum*, for the two terms are incapable of mutually exclusive definition like 'hill' and 'mountain'; they are convenient methods of expression but no one can say at what exact point a hill ceases to be a hill and becomes a mountain. It must be confessed that if we take Grammar alone as the basis of comparison it would be extremely difficult to oppose any statement to the effect that Assamese was nothing but a dialect of Bengali; the dialect spoken in Chittagong which is universally classed as a form of the latter language differs far more widely from the Grammar of the standard dialect of Calcutta than does the Assamese. If Grammar is to be taken as test and if on applying that test we find that Assamese is a language distinct from Bengali

then we should be compelled with much greater reason to say the same of the Chittagong *patois*. Vol. v., Part 1, 393 pages.

এইরূপ বলার পরও গ্রীয়ারসন্ সাহেব 'অসমীয় ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য বলিয়া যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আসামের ইতিহাসে গেইট সাহেব তাহাই কিঞ্চিৎ জোরের সহিত বলিয়াছেন, অতএব উহাই এ স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে :—

It may be pointed out that the possession or otherwise of a separate literature is generally regarded as one of the best tests to apply, and that if this be taken as a criterion, Assamese is certainly entitled to rank as a separate language Assamese is believed to have attained its present state of development independently of, and earlier than, Bengali ; and it is the speech of a distinct nationality which has always strenuously resisted the efforts which have been made to foist Bengali on it.

P. 328—329.

গেইট সাহেবের ইতিহাসের এই অংশের সমালোচনা উপলক্ষে মৎকর্ত্তৃক যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা একটু দীর্ঘ হইলেও এস্থানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি।

"Since the Assamese gentlemen of education and position, almost without exception, are very keen on having their mother-tongue recognized as an independent language, none should have any objection to Assamese having a distinct place of its own. But the argument of Mr. Gait is open to criticism. The first Assamese books were written by Sankara Deva, Madhava Deba, Ananta Kandali and others, who flourished during Naranarayan's time, *i. e.,*" by the middle of the 16th century. But the poems of Chandidas were composed about a century and a half earlier (circ. 1400 A. D) and Krittibas also wrote his Ramayan about a century earlier (circ. 1450) * So the Assamese literature cannot claim precedence in time. Whether its development was "independently of Bengali" or not, is a point which it is very difficult to discuss. But when we consider even on Mr. Gait's authority, that the wave of the religious movements of Srichaitanya reached Assam and led to the foundation of the Mahapurushiya Sect, the

* প্রায় হাজার বৎসরের প্রাচীন শূন্য পুরাণের কথাটা ভ্রমবশতঃ এস্থলে উল্লেখ হয় নাই।

wave of the renaissance of the vernacular literature to propogate that religion of love and devotion in Bengal must have also done much to stir up the literary activity among the inhabitants of Kamarupa. The unification of these two dialects, Assamese and Bengali would not, in my humble opinion, lead to any other results than beneficial to the people of Assam who seem to have done very little since Naranarayan's time for the development of their language. The oppoitunity was a fair one, which has now gone away: there was a special facility, too, for this as the script was the same for both the languages; and as to the existing books in the dialect, they would form part of the great body of the Bengali literature, as will be evident from the fact that Babu Dineshchandra Sen, author of a history of the Bengali literature, has actually included the Ramayana written by Ananta Kandali in his subject-matter as he was kept in the dark as to the locality to which the author belonged. It is fortunate for our Assamese brethren that their desire to have the recognition of their mother-tongue as a court language, has been, so easily fulfilled, the Irishmen and the Welsh people whose mother languages are of Celtic origin—and so, quite distinct from the Teutonic English—have not got the same privilege as yet.

আমাদের আসামবাসী বন্ধুগণ অবশ্য দেশবাৎসল্য দ্বারা পরিচালিত এবং মাতৃভাষার প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়াই আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অতি দূরদর্শী হইয়া আপাত স্বার্থ কেহ বিসর্জ্জন দিতে পারে না এবং সকলেই নিজের বিষয়ে পক্ষপাতী হয়—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁহারা এখন অসমীয় ভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাষা গ্রহণ করুন, সে কথাও বলিতেছি না। কিন্তু এই ভাষা-স্বাতন্ত্র্য বঙ্গ ও আসামবাসীর পরস্পর বিবাহাদি সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এক হইয়া যাওয়ার পক্ষেও যে বিঘ্ন হইল ইহাই প্রধানতঃ আক্ষেপের কথা।

এই প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করিবার একটুকু কারণও আছে। আসামবাসী অনেকের ইচ্ছা গোয়ালপাড়া জিলায় অসমীয় ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদের প্রধানতঃ এই মত যে (১) গোয়ালপাড়ার অধিকাংশ লোক অসমীয় ভাষাই ব্যবহার করে; (২) এই জিলার লোক প্রায়শঃ মহা-

পুরুষিয়া, অতএব অসমীয় ভাষা না লিখিলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শঙ্কর দেব প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠের অসুবিধা হইবে।' তাঁহাদের এই হেতুদ্বয়ের প্রথমটি সেন্‌সাস্ টেবল্ দ্বারা সমর্থিত হয় না। ১৯০১ সালের সেন্‌সাসে গোয়ালপাড়ার ১০০০০ জন মধ্যে ৬,৯২৬ জন বঙ্গভাষা, ২০৪৬ জন মাত্র অসমীয় ভাষা, ২৭৯ জন হিন্দী ভাষা এবং অবশিষ্ট কাছাড়ী গারো রাভা ইত্যাদির ভাষা-ভাষী। দ্বিতীয় হেতুবাদ সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে শঙ্কর দেবাদি রচিত ঘোষা প্রভৃতি পড়িয়া বুঝিবার নিমিত্ত অসমীয় ভাষার প্রবর্ত্তন অনাবশ্যক। শঙ্কর দেবের কবিতার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার নমুনা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইবে। বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিলেই উহা, অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। অপিচ যখন আসামী ভাষা কামরূপ জিলায় প্রবর্ত্তিত হয় তখন এই জিলারও বহুসংখ্যক লোকে উহাতে আপত্তি করিয়াছিল—কামাখ্যা পাহাড়ের উপর যে উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়টি আছে, তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালাই প্রচলিত। কামরূপের সাধারণ লোকে অনেকে আজিও কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া থাকে।

বঙ্গভাষা পূর্ব্বে আসামের পার্ব্বত্যজাতি-সমূহের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; কাছাড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে গারো পাহাড়ে মণিপুরে ও লুসাই পাহাড়ে বঙ্গভাষাই চলিত। এখন তত্তজ্জাতির নিজ নিজ ভাষা তাহাও প্রায়শঃ ইংরেজী অক্ষরে অধ্যাপিত হয়। এইরূপ ঘটাতে পাহাড়ী জাতীয় লোকগুলি যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকিত তাহার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী সমাজের অপেক্ষা এই সকল জাতিরই অধিকতর ক্ষতি হইল।

আসামে বঙ্গভাষা প্রচলিত না হওয়াতে আসামের আরও একটি গুরুতর ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। বঙ্গভাষার সহিত অসমীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়া গেলে আসামের প্রাচীন সাহিত্যগুলি বঙ্গভাষার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত এবং আসামের যে সকল হস্তলিখিত বুরঞ্জী, অন্যান্য পুঁথি আছে তাহাও নিজের সম্পত্তি ভাবিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিত, আবিষ্কৃত, আলোচিত ও প্রকাশিত হইত—যেমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নানা স্থানের পুঁথিগুলি হইতেছে। এখন অসমীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাঁহারা ইহার দিকে আর দৃক্‌পাতও করিবেন না। আসামপ্রদেশে অসমীয়-গণের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্তও এই সকল বিষয়ে স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধানাদি করিবার কোনও আয়োজন হইতেছে না—সত্বর হইবারও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। পুঁথিগুলি প্রকাশিত হইলেও বিক্রয়াদি দ্বারা কোনও লাভ হইবার সম্ভাবনা কম—অসমীয়গণের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের সমাদরকারী লোক সংখ্যাও বড় অল্প। সেন্‌সাসে দেখা যায় মাত্র সাড়ে তেরলক্ষ লোক অসমীয় ভাষা বলে; ইহার মধ্যে সাহিত্যের বিস্তৃতি আর কত হইবে? প্রায় পাঁচ কোটী লোক বঙ্গভাষা বলে; আসামী ও বাঙ্গালীর মিলন

হইলে শঙ্কর দেব প্রভৃতির প্রতিভার পরিচয় এই পাঁচ কোটী লোকেও পাইত। তাহা না হওয়ায় আসামের লাভ কি ক্ষতি হইল বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার একটা ফল এই হইয়াছে যে অসমীয় গ্রন্থকার মহাশয়েরা তাহাদের ভাষাকে বঙ্গ-ভাষা হইতে স্বতন্ত্র দেখাইবার নিমিত্তই বোধ হয় যতদূর পারেন সাহিত্যে দেশজ কথার অবতারণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অসমীয় প্রাচীন ভাষা এইরূপ ছিল না। সাহিত্যের ভাষা লৌকিক ভাষানুযায়ী হইলে অনবরত এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র উহা পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়ে এ নিমিত্ত স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ঘটে। গভীর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি এইরূপ ভাষায় লিখিত হওয়া অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অসমীয় ভাষার গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সভায় পঠিতব্য অপর প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিত আলোচিত হইয়াছে তাই এ স্থানে তাহার পুনরালোচনা করা বাহুল্য মনে করি।

অনেকের মত এই যে ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা আসিয়া আসামে বঙ্গভাষার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আহোম রাজগণের সময়ে বাঙ্গালা এখানে ছিল না। ইহা অবশ্যই ঠিক যে যদি আহোম রাজগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব না করিতেন তবে প্রাচীন কামরূপীয় ভাষা বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া যাইত, হয় ত আজি অসমীয় ভাষার চিহ্নও দেখিতে পাইতাম না। আহোম রাজগণই এই ভাষাকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের সময়ে আসামে ছিল না, ইহা বলা যাইতে পারে না। ১৫৫৩ শকে অসমীয় রাজার পক্ষ হইতে গৌহাটির তদানীন্তন মুসলমান ফৌজদার নবাব আলোয়ার খাঁর নিকট যে চিঠি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা বঙ্গভাষায় লিখিত। ১৯ ১ সালে ১লা আগষ্ট তারিখের অসমচণ্ডি নামক তেজপুর হইতে প্রকাশিত এক পত্রিকায় "ঐতিহাসিক চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ চিঠি খানি মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। সভ্য মহোদয়গণ দেখিবেন প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষা কিরূপ লিখিত হইত।

"স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলোয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে এথা কুশল তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকীল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থান পহুছিল। আমিও প্রীতি প্রণয় পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্থিতা না রহে, এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদ রূপে জানিতে আছ তোমার আমার অদুর ভাব প্রীতি ঘটিলে মন মাফক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক। আর তোমার আমার অত্যন্ত রূপ আনন্দযুক্ত হইলে উভয় পক্ষ লোকর নাবিদ্বেশ রূপ অবিযুতা অন্তশেত কিসক না রহবেক। এ কারণ তুমি লেখিবাপ পোবা আর তুমি যে লিখিয়াছ পূর্ব্বে

সত্রাজিতের সময় সিঙ্গরী বালীপাড়া বঁড়্‌গাও এই সকলত—আমার লোক জনে হাট খরিদ করিয়া আপন মাফিক নির্ণিত, করিয়াছিল এমত থান বলিতে তোমার উচিত নহে সেই ওক্তেতে পৎসাই লোকক্‌ ভোট, পাহাড়ী, ডফ্‌লা অনেক ঘাইল করিলেক আমার ও ফুকন ডাঙ্গোরীয়া সকলে অনেক প্রকার করি বারম্বার পাহাড়ী লোকক্‌ কাটিলেক তত্রাপি তাহার বদনাম আমার হইল। এখনও সে তারক চারিবাক চাহ এমন গোট তোমার উচিত না হয়। আর অপর তুমি যে বলিয়াছ ২৩ জন মনুষ্য তোমার যে ঘাইল করিতে আছ আমি ত তারেক নির্ণিত করিতে নাহি পারে সম্প্রতি প্রীতি পথ তোমার এমন প্রকার অপরিতোষ করিবার চিত্তেও উৎকর্ষ না। বিশেষ একটা হেঙ্গলের কারণ তুমি যে তিন জন মনুষ্য লোহারে বান্ধিয়া তোমার দিনেক নিয়া আছ এমন ধর্ম্ম করিবার তোমার উচিত ব্যবহার নহে, কিন্তু বড় লোকের জবানি হস্তি দন্তের সদৃশ যে লিখিয়াছ ই গোট তোমার প্রতি ব্যবহার হয় কিন্তু বড় লোকর বচন সামথ্যতা কার্য্য কামর দ্বারায় জানি আর অধিক কি কহিম আমার উকিল সনাতন ও শ্রীকান্তশর্ম্মা প্রমুখে সমস্ত জানিবেক। ইতি শক ১৫৩॥"

এই চিঠি হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে তদানীং কামরূপ পর্য্যন্ত মোসলমানের অধীনে ছিল এবং তখন রাজভাষা এখানে বাঙ্গালা ছিল। ইহার প্রায় ১ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন কামরূপ রাজা নরনারায়ণের অধীন ছিল, তখনও এই স্থানে রাজভাষা বাঙ্গালা ছিল। তন্নিদর্শন স্বরূপ ১৯০১ সালের ২৭ জুন তারিখের আসাম বন্তিতে প্রকাশিত অপর একখানি চিঠি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৭৭ শকাব্দে আহোম নৃপতি চুকাম্ফা স্বর্গ দেবের (ওরফে খোরা রাজার) নিকট লিখিত:—

"স্বস্তি সকল দিগ্‌দন্তী কর্ণ তালাস্ফাল সমীরণ প্রচলিত হিমকরহার হাস কাশ কৈলাস পাণ্ডর যশোরাশি বিরাজিত ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশ তরঙ্গিণী সলিল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর ধীমন্ ধীর ধৈর্য্য মর্য্যাদা পারাবার সকল দিক্‌ কামিনী গীয়মান গুণ সন্তান শ্রীশ্রী স্বর্গ নারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ড প্রতাপেষু লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদন পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বৃদ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারে এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয়; না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ-কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা, কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার, উদ্ভণ্ড চাউনিয়া, শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তানরার মুখে সকল সমাচার বুজিয়া চিতাপ বিদায় দিবা। অপর উকিল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোড় বালীচেক জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈচে। আর সমাচার বুজ কহি পঠাইবেক তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেঙ্গ

১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্টচামর ২০ শুক্ল চামর ১০ ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।''

ইহা হইতে শ্রোতৃবর্গ কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহার রাজধানীতে কিরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখা হইত তাহারও পরিচয় পাইলেন। এবং এই দুই খানি চিঠি দ্বারা এই সূচিত হইল যে আহোম রাজসভায়ও বাঙ্গালা লেখাপড়ার চর্চ্চা হইত, নচেৎ এই চিঠি পত্র লেখালেখি চলিত কিরূপে?

এ স্থলে অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিতে হইল, আসাম বুরুঞ্জি আলোচনা করা বঙ্গবাসিগণেরও একটা কর্ত্তব্য, কেন না এইরূপ চিঠি পত্র তাহাতে অনেক পাওয়া যাইবে। ইহাদ্বারা বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পর্কীয় নানা কথাও জানা যাইতে পারিবে এবং বঙ্গভাষার অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহারও বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে।

অসমীয় ভাষাদি সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল এখন বঙ্গভাষার সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে এই সম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশনদ্বয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং এই অধিবেশনে অন্যান্য সাহিত্যিকগণ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সম্মিলনের উদ্দিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। গোয়ালপাড়া স্থানের ইতিবৃত্ত বিষয়ে রাজা বাহাদুর অনেকটা আপনাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ের আলোচনা এক প্রকার পিষ্টপেষণবৎ বহিল্য মাত্র, তৎসম্বন্ধে নতুন কিছু বলিবার জন্য চিন্তা করিবার সময় আমি পাই নাই, তবে একটি কথা অসমীয় ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধে সেই ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এস্থলে বলিতে চাই, কেন না তাহা বঙ্গভাষা সম্বন্ধে প্রযোজ্য মনে করি।

সমগ্র ভারতবর্ষে কালে এক ভাষা হয়, ইহা স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই বোধ হয় চরম স্বপ্ন। সেইটি ঘটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতে পারে, তবে তজ্জন্য প্রত্যেক ভাষার লোকসাধারণেরই এখন হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। সম্প্রতি ইহা দেখা উচিত, যেন ভাষা এইরূপে গঠিত হয়—যাঁহাতে অপর ভাষার লোকেরা ইহা শুনিলে বা পড়িলে বুঝিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রতি ভাষারই উচিত সংস্কৃতের দিকে টানিয়া বলা; সংস্কৃতমূলক শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইলে কেবল বিভক্তি প্রত্যয়ের পার্থক্য অবগত হইলেই এক ভাষার লোক অন্য ভাষা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বুঝিতে পারিবে। এক লিপি বিস্তার—পরিষদের বোধ হয় তাহাই চরম উদ্দেশ্য। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা উপভাষা বিশেষের শব্দাদি চালাইতে চান, তাঁহারা যেন এইটুকু স্মরণ রাখেন, এই নিবেদন। এখন বিশেষতঃ, যখন সমগ্র বঙ্গভাষী একই প্রদেশবাসী নহেন, তখন এক পক্ষের বেশী বাড়াবাড়ি হইলে ঐক্যের বন্ধন স্বরূপ ভাষাও যে কালে পৃথক্ না হইয়া যাইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে।

উপসংহারের পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে সাধারণ দুই একটি কথা বলিতে

চাই। এতদ্বিষয়ে বোধ করি অনেকেই আমার মতাবলম্বী হইবেন না, তথাপি যখন আপনারা আমাকে বলিবার অধিকার দিয়াছেন তখন ব্যক্তিগত মতটাও বলিয়া ফেলা ভাল। সাহিত্য-সম্মিলন আমার মতে সাহিত্যিকবর্গের একটা মজলিসের ন্যায়ই হওয়া উচিত। ইহাতে আড়ম্বর করিয়া সভাপতি-নিয়োগ, অভ্যর্থনা-সমিতি-গঠন, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্ভাষণ, সভাপতির অভিভাষণ, প্রস্তাব-উত্থাপন, তৎসমর্থন এবং প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি এত ঘনঘটা করিবার প্রয়োজন কি? অবশ্য, সাহিত্যিকগণের সম্মিলন হওয়া একান্ত আবশ্যক, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতের আদানপ্রদান একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আড়ম্বর করিয়া কিছু করিলেই স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কুণ্ঠার ভাব আসিয়া পড়ে। পরস্পর কথাবার্ত্তার সুযোগ এবং অবসরও থাকে না, কেননা কার্য্য-তালিকায় বহুকর্ম্মের সমাবেশ থাকে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারিতে হয়। তারপর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজি কালি "সাহিত্য" শব্দটির অর্থ বড় বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে, শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। তবে "সাহিত্য-সম্মিলন" শব্দের পরিবর্ত্তে "সারস্বত-সম্মিলন" নাম দিলেই বোধ হয় কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সভ্য মহোদয়গণ, আমার বক্তব্যের কোনও প্রকারে উপসংহার করা হইল, আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত; আপনারা যে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার এই নিরস বাগ্‌ব্যাপার শ্রবণ করিলেন, তজ্জন্যও আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার মনে ইহার নিমিত্তই ক্লেশ হইতেছে যে এই বিষয়ক ভার যোগ্যতর পাত্রে অর্পিত হইতে পারে নাই, যেখানে দেবদূতেরা পাদক্ষেপ করিতে ইতস্তত করেন সেইখানে ব্যক্তিবিশেষ সবেগে ধাবিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না—যে কর্ম্মভার প্রবীণতর সাহিত্য-সেবিগণ গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গ্রহণ করাও সেইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। পরিশেষে প্রার্থনা এই যে উদারাশয় আপনারা আমার দোষরাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি কিছু সার থাকে তাহাই গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

আশা করি আপনাদের অনুকম্পায় সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইবে। ভগবতী মহামায়া আমাদের সহায় হউন।

শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম এ।

গুজরাথে মহারাষ্ট্র অধিকার।

ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী সময়ে মোগলদিগের পরাভব-সাধন করিয়া মহারাষ্ট্র-জাতি স্বাধীনতা-লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফল একাকী সম্ভোগ করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশও যাহাতে মোগলদিগের শাসন-পাশ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম গুজরাথের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। গুজরাথ মহারাষ্ট্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। এই প্রদেশের উত্তর দিকে কচ্ছ উপসাগর, রণ-প্রদেশ ও মারওয়াড়, পশ্চিম দিকে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে খম্বায়েৎ (কাম্বে) উপসাগর ও মহারাষ্ট্রদেশ, পূর্ব্বদিকে পঞ্চমহাল, মেওয়াড় (মিবার), মালব ও খানদেশ (মহারাষ্ট্র)। গুজরাথের মোট পরিমাণ প্রায় ৭২ হাজার বর্গ মাইল। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দেশ গুর্জ্জর-রাষ্ট্র নামে পরিচিত। গুর্জ্জর দেশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্প-কৌশল ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এদেশের লোকেরা শিল্প-বাণিজ্যের সবিশেষ পক্ষপাতী। এখানকার ব্রাহ্মণদিগকে "নাগর-ব্রাহ্মণ" বলে। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রসিদ্ধ "দেবনাগর" অক্ষর সর্ব্বপ্রথম এই গুর্জ্জর দেশে নাগর-ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই বর্ত্তমান আকার ও নাম লাভ করিয়াছে। গুজরাথের জন-সংখ্যা ন্যূনাধিক দশ লক্ষ। এই দেশের এক পঞ্চমাংশমাত্র ইংরাজদিগের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। অবশিষ্ট চারি পঞ্চমাংশ প্রদেশে "ঠাকুর"-উপাধিধারী দেশীয় নরপতিগণের শাসন অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের চেষ্টায় গুজরাথ হইতে মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদ না ঘটিলে আজ গুজরাথে আমরা এতগুলি দেশীয় রাজ্য দেখিতে পাইতাম কি না, সন্দেহ।

অতি প্রাচীনকাল বা খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত গুজরাথে নানাবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণের রাজত্ব বিদ্যমান ছিল। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজী স্বীয় ভ্রাতা অলফ খান ও উজীর নসরৎ খানকে এক লক্ষ অশ্বারোহী, ত্রিশ সহস্র পদাতিক, ১৫ শত হস্তী ও ৪৫ জন সর্দ্দার সহ গুর্জ্জর-বাসীর স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তদবধি গুজরাথে যে মুসলমান-শাসন বদ্ধমূল হয়, তাহা অওরঙ্গজেবের শাসন-কাল পর্য্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। এই প্রায় চারি শত বৎসরব্যাপী শাসন-কালে অনেক ধর্ম্মান্ধ মুসলমান নরপতি ও শাসনকর্ত্তার দৌরাত্ম্যে গুজরাথে বহুসংখ্যক দেবমন্দির ভগ্ন ও মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাথের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ভগ্ন মন্দিরের ও দেবমূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ ইতিহাস-লেখকই গুজরাথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে দস্যুতা, লুণ্ঠনাভিপ্রায় ও

দেশের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া মহারাষ্ট্র-বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল লেখকের মধ্যে কেহ কেহ রাজপুতজাতির প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত-নিবন্ধন ও কেহ কেহ ইংরাজ-শাসনের মহিমা-কীর্ত্তনে আগ্রহ-বশতঃ মহারাষ্ট্রজাতির পুণ্য চেষ্টার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে মালবের ন্যায় গুজরাথেরও মোগল-অত্যাচার-প্রপীড়িত অধিবাসী ও জমিদার-গণের দ্বারা আহূত হইয়াই মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাথে প্রবেশ করেন এবং তত্রত্য মোগল-শাসনের অস্তিত্ব-লোপ করিয়া সুশাসনে দেশবাসীকে সুখী করেন।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গুজরাথের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। ঐ অব্দে ছত্রপতি-মহাত্মা শিবাজী গুজরাথের অন্তর্গত অতি সমৃদ্ধিশালী সুরত নগরের অসৎ-প্রকৃতি ধনবান্ ব্যক্তিদিগকে লুণ্ঠন করিয়া মোগলদিগের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার ও আপনার অর্থাভাব দূরীভূত করেন। ঐ সময়ে তিনি মোগল-শাসনের উচ্ছেদ-সাধন-পূর্ব্বক স্বদেশের স্বাধীনতা-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ বিশাল সেনা-দল পোষণ ও অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সুরতের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নগরের লুণ্ঠনপূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ ভিন্ন সে ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবার তাঁহার আর কোনও উপায়ই ছিল না। তথাপি তিনি স্বভাব-সিদ্ধ সহৃদয়তা-বশে প্রকৃষ্ট হিন্দু-নীতির অনুসরণ করিয়া, সুরতের নিরীহ জনসাধারণ ও সজ্জন ধনবান্‌গণ যাহাতে লুণ্ঠিত না হন, তাহার সবিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথম বার সুরত লুণ্ঠন করিয়া শিবাজী প্রায় এক কোটি টাকা পাইয়াছিলেন। ঐ অর্থ তাঁহার নৌ-সেনা-বিভাগের পুষ্টি-সাধনে ও নূতন দুর্গ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল।

সম্রাট্ আকবরের সহিত যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য উদয়পুরের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণা প্রতাপকেও মুসলমানদিগের পণ্য-দ্রব্যাদি কয়েকবার পথিমধ্য হইতে লুণ্ঠন করিতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ হামিরের যুদ্ধ-নীতিও শিবাজীরই অনুরূপ ছিল। রাণা প্রতাপের পৌত্র রাণা কর্ণ সিংহ (১৬২১—১৬২৮ খ্রীঃ) মোগলদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় মেওয়াড়ের (মিবারের) রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল; এই কারণে তিনি সুরত লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় অর্থাভাব পূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর ন্যায় লুণ্ঠন-নীতি আর কেহ কখনও অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। রমণীকুলের প্রতি শিবাজী ও তাঁহার অধীন সৈন্যগণ সাতিশয় সম্মান-প্রদর্শন করিতেন বলিয়া অনেক সুরতবাসী রমণীর বেশ-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র-আক্রমণের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিক-দিগকে নিরীহ ব্যবসায়ী জানিয়া শিবাজী কখনও লুণ্ঠন করিতেন না। পাদরীগণ ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া তাঁহাদিগের লুণ্ঠন করিতেও শিবাজীর নিষেধ ছিল। সুরতে সেকালে দুই জন অতি প্রসিদ্ধ ইহুদী ব্যবসায়ী ছিলেন। বার্ণিয়ার বলেন, শিবাজী তাঁহা-দিগের মধ্যে এক জনকে লুণ্ঠন করিয়া অপর

ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কারণ, ঐ ইহুদী তাঁহার সজাতীয়দিগের ন্যায় কৃপণ ছিলেন না,—তিনি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে অর্থাদি-দানে সহায়তা করিতেন। লুণ্ঠন-কালেও সাধু-সজ্জনের ও অবলাকুলের সম্মান-রক্ষা-বিষয়ে মহাত্মা শিবাজী সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। তথাপি অধিকাংশ ইংরাজ-লেখক তাঁহার চরিত্রে নির্ম্মম দস্যু-প্রকৃতির আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে কার্য্যের জন্য হামির, প্রতাপ ও কর্ণ-প্রভৃতি রাজপুত নরপতিগণ নিন্দিত হন নাই, সেই কার্য্য এরূপ সতর্কতা ও সুনীতির মর্য্যাদা-রক্ষা-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াও শিবাজী দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা শ্বেতাঙ্গ-লেখকগণের সামান্য উদারতার পরিচায়ক নহে! নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নেত্রে অবলোকন করিলে সুরতের ধনবান্ ইহুদীদিগের লুণ্ঠন-কালে মহাত্মা শিবাজী যত্ন-পূর্ব্বক মনুসংহিতোক্ত নিম্নলিখিত বচনের অনুসরণ করিয়াছিলেন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।—

আদাননিত্যাৎ চাদাতুঃ আহরেৎ অপ্রযচ্ছতঃ।
তথা যশোঽস্য প্রথতে ধর্ম্মশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে ॥
যেঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি।
স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সন্তারয়তি তাবুভৌ ॥
যদ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অযজ্বনান্তু যদ্বিত্তং আসুরস্বং তদুচ্যতে ॥

একাদশাধ্যায়ে।

অর্থাৎ সর্ব্বদা কৃষি, প্রতিগ্রহ-কুসীদাদি দ্বারা যাহারা ধন উপার্জ্জন করে, অথচ তাহার সদ্ব্যয় করে না, (রাজা) তাহাদের ধন বল পূর্ব্বক (কুল্লুকের মতে—চুরি করিয়াও) গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ-(ধর্ম্ম) কার্য্যে ব্যয়িত করিলে তাঁহার যশ ও ধর্ম্মই বৃদ্ধি পায়। যে রাজা অসৎব্যক্তির নিকট হইতে ধন-গ্রহণ করিয়া সংপাত্রে দান করেন, তিনি স্বয়ং নৌকাস্বরূপ হইয়া আপনাকে ও ধনস্বামীকে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তারণ করেন। যাগশীল (ধর্ম্মশীল) ব্যক্তির ধনকে 'দেবস্ব' ও যাগহীন (অধার্ম্মিক) ব্যক্তির ধনকে 'অসুরস্ব' বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের ধনহরণে (রাজার) কোনও দোষ নাই।" ভাষ্যকার মেধাতিথি "যজ্ঞশীল" ও "অযজ্বা" পদের অর্থ 'গুণবান ও গুণহীন' গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন— "অয়মস্যার্থবাদ এবং গুণবদ্ভ্যোনাপহর্ত্তব্যং নির্গুণেভ্যস্তু ন দোষঃ।" শিবাজী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন এবং শাস্ত্রকারদিগের মতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যজ্ঞ আর নাই—এই কারণে শিবাজী যেরূপ সুবিবেচনার সহিত ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের নির্ব্বাচণ করিয়া সুরত লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহা সেকালের শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিলে কোনও দোষ হয় না।

১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী দ্বিতীয় বার সুরত লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তাঁহার সর্দ্দারেরা সুরতের নিকটবর্ত্তী দুইটি ক্ষুদ্র দুর্গ ও সাল্হের নামক একটি প্রসিদ্ধ সুদৃঢ় দুর্গ বাহুবলে অধিকার করেন। শেষোক্ত দুর্গটি মহারাষ্ট্র হইতে গুজরাথে গমনের পথে অবস্থিত ছিল। ঐ দুর্গ হস্তগত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুজরাথ-প্রবেশের

পথ সুগম হইল। মোগল-অত্যাচার-প্রপীড়িত গুজরাথ-বাসীরা এই সকল ঘটনায় অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিধর্ম্মীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি-লাভের আশা সমুদিত হইয়াছিল। (১) ইহার পর ১৬৭৫ ও ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভড়োচ (Broach) আক্রমণ করিয়া আপনাদিগের সংহার-শক্তির পরিচয়ে মোগলদিগকে আতঙ্ক-গ্রস্ত করিয়াছিলেন।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মহারাষ্ট্র-সেনানী খণ্ডে রাও দাভাড়ে গুজরাথের মুসলমান সুভেদারদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্থানে স্থানে মোগল সেনার পরাভব সাধন করিতে আরম্ভ করেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্র-সেনাপতি ধনাজী যাদব বিশাল সেনা-দল সহ গুজরাথে প্রবেশ-পূর্ব্বক বাবুয়া, গোধ্রা ও মহুদ প্রভৃতি নানা স্থানের মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগের পরাভব-সাধন করিয়া চৌথ আদায় পুরঃসর আহম্মদাবাদ আক্রমণ করেন। এই অভিযানে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মোগল সুবেদার ইব্রাহিম খান প্রায় বিংশতি সহস্রাধিক সৈন্যসহ মারাঠাদিগের আক্রমণে বাধা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠাদিগের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার পরাভব ঘটায় তিনি দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা কর দিয়া ধনাজী যাদবকে বিদায় করেন। (২) ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা আবার গুজরাথ আক্রমণ করেন; কিন্তু সেবার মুসলমান সুভেদারের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাঁহাদিগকে গুজরাথ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার ৪।৫ বৎসর পরে খণ্ডে রাও দাভাড়ে সৈয়দ হুসেন আলীর সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আহম্মদনগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বিজয় লাভ করেন (১৭১৬ খ্রীঃ)। তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু ঐ অব্দে তাঁহাকে মারাঠা সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন।

অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবারের যে অবস্থান্তর ঘটে, তাহাতে দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা ও বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ-বর্ষ-কালের মধ্যে গুজরাথে একাদিক্রমে আট জন সুভেদার নিযুক্ত হন। দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষগণের অব্য-

---

(১) Throughout the empire wide spread discontent prevailed among subordinate holders of this description as well as among all the Zamindars of the crown districts, so that the success of Shivaji in the Deccan found ardent sympathisers even in Gujrat. When the Zamindars saw that this Hindu rebel was strong enough to pillage Surat, they began to hope that a day of deliverance was near. The death of Aurungzeb (177) was the signal for these restless spirits to bestir themselves. When the Marathas began regular inroads they were hailed as deliverers from the yoke of the Mughal. The Rajpipla chief afforded the shelter and a passage through his country.—*Gazetteer of the Bombay Precy. (Gujrat) Vol. I, p. 226.*

(২) মিরাট-ই-আহম্মদী হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইল।

অস্থিত-চিত্ততায় গুজরাথে সুভেদারের পদ ক্ষণ-ভঙ্গুর হইয়া উঠিয়াছিল। গুজরাথের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ৩।৪ জন সহকারী শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। সুভেদারের পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমশঃ তাঁহাদিগেরও পরিবর্ত্তন ঘটিত। এই সকল সুভেদার ও শাসনকর্ত্তারা আবার সকল সময় বিনাযুদ্ধে পদত্যাগ করিতে চাহিতেন না। প্রায় প্রতি বর্ষেই নূতন সুভেদার নিযুক্ত হওয়ায় রাজস্ব আদায় কার্য্যে গোলযোগ ও অত্যাচার ঘটিত। সেই ক্ষণভঙ্গুর পদে যিনি নিযুক্ত হইতেন, প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াও হিন্দু জমিদারদিগের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই স্বল্পকালের মধ্যে স্বীয় অর্থাভাব দূর করিবার দিকে প্রায়শঃ তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এদিকে দেশের জমিদার-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সকল সময়ে বিনা অভিযানে কর আদায় হইত না। দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশের "কোলি" নামক ধীবর-জাতীয় লোকেরা ও থাম্বায়েৎ অঞ্চলের রাজপুতেরা জলে স্থলে দস্যুতা করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিত। ক্ষণস্থায়ী সুভেদারেরা তাহাদিগের দমনের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। এই অবস্থা যে প্রজার সুখ-শান্তির প্রতিকূল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার উপর আবার "মুগুকণ্ঠের" উপদ্রব ছিল। বিলাস-পরায়ণ মুসলমান রাজপুরুষদিগের পাপ দৃষ্টির জন্য সুন্দরী হিন্দু যুবতীর কুল-মান রক্ষা করা সময়ে সময়ে দুষ্কর হইয়া উঠিত, এরূপ আখ্যায়িকাও শুনা যায়। (৩) ফল কথা, এই সকল কারণে গুজরাথবাসী কি সাধারণ প্রজা, কি জমিদার —হিন্দু-মাত্রেই সে সময়ে মোগল-শাসনের বিলোপকামনা করিতেছিলেন।

এই সময়ে পেশওয়ে বালাজী-বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্ব্বিগ্রহ নিবারিত ও মহারাজ শাহুর শাসন সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সৈয়দগণের সহিত সন্ধি স্থাপন-পূর্ব্বক দিল্লীর রাজ-পরিবর্ত্তন-ব্যাপারে সহায়তা করিয়াও তাঁহারা সবিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে, গুজরাথের প্রধান প্রধান জমিদারেরা ও সামন্ত রাজারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তায় মোগল-শাসনের উচ্ছেদ-সাধন করিবার সংকল্প করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও গুজরাথ-বাসীকে মোগলের শাসন-পাশ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে ১৭১৯ সালে রাজ-পিপ্‌লার হিন্দু রাজা ও অন্যান্য জমিদারগণ মহারাষ্ট্র-সেনানী পিলাজী গায়কোয়াড়কে (৪)

(৩) Bombay Gazetteer. Vol. VII—Baroda, p. 170

(৪) ইনি বরোদার বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। ইঁহারই পিতৃব্য দামাজী গায়কোয়াড় (১৭২০ খৃঃ) বালাপুরের যুদ্ধে অলৌকিক শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রধান সেনাপতির সহকারীর পদ ও সমশের (শুরবারি) বাহাদুর উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পিলাজী প্রথমতঃ সামান্য গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনি স্বাধীন মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অচিরাৎ তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। প্রধান সেনাপতির অনুগ্রহে গুপ্তচর বিভাগ হইতে অপসারিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ ৫০ জন অশ্বসাদীর নায়কত্ব লাভ করেন। তাহার পর ক্রমশঃ স্বীয় রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া তিনি সেনাপতির একজন সহকারী হইয়া উঠেন। পরিশেষে দামাজী তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সদৈন্যে গুজরাথ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই সময়েই মারওয়াড়ের মহারাজ অজিত সিংহ গুজরাথের স্থভেদার-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে দুই একবার দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া স্বাতন্ত্র্য-লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সফল-কাম হইতে পারেন নাই। দিল্লীর দরবার তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য গুজরাথের স্থভেদারী প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিও অভ্যুদয়কামী গুজরাথী জমিদারদিগের প্রতি সহানুভূতি-বশতঃ মারাঠাগণের বিরুদ্ধাচরণ করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, গুজরাথের প্রাদেশিক মুসলমান শাসন-কর্ত্তারা মারাঠাগণের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলে তিনি, গুজরাথের উত্তরাংশ মারওয়াড়ের অধিকারভুক্ত করিয়া স্বীয় রাজ্য-বৃদ্ধি করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। মোগল-সাম্রাজ্যের বিনাশ-কাল সমীপবর্ত্তী দেখিয়া মহারাজ অজিত সিংহেরও হৃদয় মারওয়াড়কে, একটি বিশাল স্বাধীন রাঠোর রাজ্যে পরিণত করিবার আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। (৫)

গুজরাথের হিন্দু সামন্তদিগের দ্বারা আহূত হইয়া, ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে পিলাজী গায়কোয়াড় সুরত আক্রমণ করেন এবং তত্রত্য মোগলসেনাকে যুদ্ধে পরাভূত ও তাহাদিগের আহত সেনাপতিকে বন্দী করিয়া স্থানীয় ভীলদিগের অধীন "সোনগড়" নামক সুদৃঢ় দুর্গ বাহুবলে অধিকার করিতে সমর্থ হন। তাহার পর ঐ দুর্গে অবস্থিতি করিয়া তিনি রাজপিপ্‌লার হিন্দু রাজার সহিত সখ্য-স্থাপন করেন। ঐ রাজার অধিকাংশ ভূসম্পত্তি, এমন কি রাজধানী "নান্দোড়" পর্য্যন্ত, মোগল স্থভেদারেরা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পিলাজী তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের পুনরুদ্ধার-সাধনে সহায়তা করেন। অতঃপর পিলাজী নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর গুজরাথে প্রবেশের চেষ্টা করিলে নানা স্থানের পাটিলগণ তাঁহার পথি-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া মোগল-শাসনের মূলোচ্ছেদ-বিধানে তাঁহাকে সহায়তা করেন। এই সময়ে কণ্ঠাজী কদম বাণ্ডে নামক আর একজন মারাঠা সর্দ্দার মহারাজ শাহুর আদেশে পিলাজীর সহিত গিয়া মিলিত হন। তাঁহাদিগের সমবেত শক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া আহম্মদাবাদের মুসলমান স্থভেদার তাঁহাদিগকে চৌথ দান করিতে বাধ্য হইলেন। (১৭২০ খ্রীঃ)

মালবের ন্যায় গুজরাথেও প্রবেশ-লাভের

---

(৫) The custom of governing by deputy was now getting very common, and was productive of much evil. Every kind of disorder prevailed both in Guzrat and the Peninsula and the chiefs of Guzrat (notoriously Rajpipla) had already commenced to intrigue with the Gaikwar and invited him to overturn the remains of Mogul authority. On the other hand the Maharaja Ajit Singh was by no means averse to the encroachments of the Marathas, regarding them as a means of hastening the destruction of the Empire, on the fall of which he hoped to annex at least the Northern Purganas of Guzrat and erect a strong and independent Rathor Kingdom—Bombay Gazetteer, Vol Viii, pp 300.

পরই মহারাষ্ট্রীয়েরা উপনিবেশ-স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ প্রদেশকে আপনাদিগের স্বরাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। পিলাজী গায়কোয়াড়, "সোনগড়" অধিকার করিবার পরেই উহার সংস্কার-সাধন ও রাজপিপ্‌লা প্রদেশে চারিটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া গুজরাথের নানা স্থান হইতে মোগল রাজপুরুষদিগকে বিতাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হন। কণ্ঠাজী কদম বাণ্ডেও গুজরাথের আর এক অংশে (মাহী নদীর উত্তরাঞ্চলে) অধিকার স্থাপন করিতে যত্নশীল হন। এতদুপলক্ষে ঐ প্রদেশের মুসলমান সুভেদার ও শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বহুবার সংঘর্ষ ঘটে। এই সময়ে আবার গুজরাথের প্রাদেশিক মুসলমান শাসন-কর্ত্তারা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই সুযোগে কখনও এক পক্ষের সহায়তা করিয়া ও কখনও বা উভয় পক্ষেরই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল করিতে লাগিলেন। (৬)

এই সকল সংঘর্ষের ফলে একদিকে যেমন গুজরাথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার স্থাপিত হইল, অন্য দিকে সেইরূপ তাঁহাদিগেরই সাহায্যে অনেক প্রাচীন হিন্দু রাজা ও জমিদার আপনাদিগের বিনষ্ট অধিকারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইলেন। রাজপিপ্‌লার রাজার ন্যায় ইদরের ও নওয়ানগরের হিন্দু রাজাদিগেরও ভূ-সম্পত্তি মোগল সম্রাটের আদেশে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয়দিগের চেষ্টায় মোগলদিগের শক্তি খর্ব্ব হওয়ায় ঐ দুই প্রদেশের রাজারা স্ব স্ব অধিকার হইতে মুসলমান রাজপুরুষদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা করিতে সমর্থ হইলেন। পালানপুর ও দীসা প্রদেশের ঠাকুর-উপাধিধারী জমিদারেরা মহারাষ্ট্রীয়গণের উদারতাগুণেই স্ব স্ব অধিকারে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; মহারাষ্ট্রীয়দিগের চেষ্টায় গুজরাথে মোগলশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তত্রত্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদার স্ব স্ব অধিকার-বৃদ্ধি করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক কথায়, মোগল অধিকৃত গুজরাথের অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীয়দিগের শুভাগমনের ফলে, গুজরাথী জমিদার ও

(৬) মুসলমান-লেখকেরা পিলাজীর বিরুদ্ধে গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতার আরোপ করিয়াছেন। (G. Duff's History, p, 216 and Bombay Gazetteer, vol. I, p. 305) কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনায় তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ গুরুতর পরস্পর-বিরোধ দৃষ্ট হয় যে, তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস স্থাপনে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। মহারাষ্ট্রীয় রচনায় এ বিষয়ের যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে পিলাজীর ব্যবহার সম্বন্ধে মুসলমান-লেখকেরা যে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই যুগের মুসলমান-ইতিহাস-লেখকদিগের পক্ষপাত-সম্বন্ধে জন মালকম সাহেব স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারের যোগ্য,—From the commencement of the reign of Aurangzeb, the Mahomedan writers cease to be so minute in their details, as they were at former and most prosperous periods of the Moghul empire. The theme was not inviting, and their hostile feelings towards the Marathas have made them general and *unfaithful narrators* of the success of that people. দুঃখের বিষয়, গ্রাণ্টডফ সাহেব অনেক স্থলেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশ্বাসযোগ্য রচনায় অনাস্থা প্রকাশ করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পক্ষপাত-কলুষিত মুসলমান-লেখকদিগের উক্তির উপর সমধিক নির্ভর করিয়াছেন। ফলে তাঁহাকে পদে পদেই ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে এবং তাঁহার গ্রন্থে মহারাষ্ট্র-চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক প্রকার সম্পূর্ণরূপেই আত্মসাৎ করিয়া ভোগদখল করিবার সুবিধা পাইলেন। এমন কি, শের খান বাবীর বংশধরদিগের ন্যায় যে সকল মুসলমান-বংশ গুজরাথে দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতে-ছিলেন, তাঁহারাও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সদাশয়তাগুণে, পূর্ব্বোক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজস্ব আদায়-প্রথাও অধিকাংশ স্থলেই দোষ-পরিশূন্য ছিল। তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত রাজস্বের হার প্রায় কোনও স্থলেই ন্যায়-সঙ্গত সীমা অতিক্রম করিত না; বরং অনেক স্থলেই উহার পরিমাণ অতি সামান্য ছিল। এইরূপে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত প্রায় শতবর্ষকাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের সুশাসনে গুজরাথবাসিগণ নানারূপে উপকৃত ও সুখী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এখনকার মত সেকালে, দেশের লোকেরা এত নির্জ্জীব হইয়া পড়েন নাই বলিয়া মধ্যে মধ্যে দেশের ক্ষমতাশালী লোকদিগের মধ্যে বল-পরীক্ষা বা বিগ্রহাদি ঘটিত। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিনাশকালে স্বভাবতই এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ ইতিহাস-লেখক সেই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া গুজরাথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রায় শতবর্ষ-ব্যাপী অধিকার-কালকেই অশান্তি, অরাজকতা ও অত্যাচারপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন (১)। তাই আমাদিগকে মহারাষ্ট্রীয় দলের গুজরাথ আক্রমণের ইতিহাস ও সুফল এস্থলে কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বিবৃত করিতে হইল।

আহম্মদাবাদের মোগল সুভেদারের দেওয়ান আলি মহম্মদ-প্রণীত মিরাট-ই-আহম্মদী নামক গুজরাথের ইতিহাস-গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ শেষ করিয়া অনুবাদক কর্ণেল জে, ডবলু, ওয়াট্সন্ (রেওয়া কাঁঠা এজেন্সীর অস্থায়ী পোলিটিক্যাল এজেণ্ট) মহোদয় উপসংহারে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।—

The above sketch, if accuracy be allowed, will have shown that

(১) Introduction to *Rasmala* (A. K. Forbes) by Colonel J. W. Watson. এই ওয়াট্সন সাহেব মিরাট-ই-আহম্মদী-নামক পারস্য ভাষায় লিখিত গুজরাথের ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। গুজরাথের "রাসমালা" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস আহম্মদাবাদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী জজ এ, কে, ফরব্স সাহেবের দ্বারা ১৮৫৬ অব্দে রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ইতিহাসে ফরব্স সাহেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। রাসমালার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক কর্ণেল জে, ডবলু ওয়াট্সন্ মহোদয় ঐ নিন্দাবাদের অযথার্থতা প্রদর্শন করিয়া ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে আবকল উদ্ধৃত হইল।

Imbubed as he was with a thorough admiration for the Rajput races, we can hardly expect Mr. Forbes to be quite fair to the Mahrattas; but it is only just to say that his predecessors, Colonel Walker and others, are equally, if not more prejudiced against them; and even so late as 1842, I find so high an authority as Sir G. L. Grand Jacob speaking in an official report of "the customary Mahratta process of deglutition.' It is however but fair to the Mahrattas to point out that when they entered Gujerat' they were hailed as deliverers from the Mogul yoke and to show that the decay of the imperial power was caused more by the general disaffection of the Hindu Chieftains, the

the system of collecting tributes by yearly military expeditions, was by no means, as usually supposed, an invention of the Marathas, but on the contrary had been the customs of the previous rulers and may possibly have dated from the time of the Anhilwarah Kings.

অর্থাৎ গুজরাথী জমিদারদিগের নিকট মারাঠাদিগকে প্রায় প্রতি বৎসরেই বাহুবলে কর আদায় করিতে হইত। অনেকে মনে করেন, এই প্রথা মহারাষ্ট্র-শাসন কালেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্য নহে। মিরাট-ই-আহম্মদী-লেখকের বর্ণনানুসারে ঐরূপে বলপূর্ব্বক করাদানের প্রথা তৎপূর্ব্ব হইতেও, এমন কি, মুসলমানদিগের পূর্ব্বগামী হিন্দু-রাজন্যদিগের শাসন কাল হইতেও গুজরাথে প্রচলিত ছিল।

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, মারাঠা শাসন গুজরাথে কখনই কঠোর বা সুদৃঢ় ছিল না। আর পঞ্চাশ বৎসর-কাল যদি ইংরাজেরা ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে গুজরাথীরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই লাভ করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয়। উপসংহারে কর্ণেল ওয়াট্‌সন্ বলিয়াছেন,—

Defects have, I think, been attributed to the Maratha rule, which are common to all conquering powers and by no means peculiar to the Marathas. Thus greed, rapacity and encroachments are the terms ordinarily applied to the Maratha rule by historians; yet in point of fact, they do not appear to have been more rapacious or encroaching than the Mahomedans, while by the side of Nadir Shah and other invaders of India they contrast very favourably.

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

impatience of the predatory tribes, whose licen[illegible] plunder had been sternly checked, and the efforts towards independence of the imperial servants, than it ever was by the Mahratta incursions, which, without connivance, would have been impossible.

The Mahrattas, indeed, in Gujerat almost immediately aimed at territorial acquisition, and the establishment of Peelajee Guikowar at Songurh was speedily followed by a secret treaty with Rajpeepla for an unobstructed passage through his territory, and an unhindered crossing of the Nerbudda at Baba Piarah's ford. Owing to this connivance with the Guikowar, the chieftain of Rajpeepla was afterwards enabled to reconquer his ancient capital of Nondod and absorb the whole of Nandod Sarkar. It was owing to the Mahrattas that Eedur was able to expel its Mahummedan garrison, and that the tributary Sarkar of Nowanugger, in the peninsula, which had been made Khalsa by Auranzeb, was able again to resume its tributary relations. By Mahratta sufferance the Thakoris were undisturbed in the Jagirs of Pahlunpoor and Devee (Deesa), and but for Mahratta moderation, neither would Sher Khan Babi and his descendants have been allowed to absorb the imperial district of Soreth, nor would many other of the local chieftains of the peninsula have been able to enlarge their petty holdings into extensive principalities by wholesale absorption of the imperial domain.

* * In almost every case the Mahrattas were very moderate in their demands, and indeed, until the time of Shivram Gardee and and Babajee Appajee, the latter of whom was strengthened by the countenance of the English, not only were the amounts of tribute levied in the peninsula enforced with the greatest irregularity, but the actual sums taken were insignificant in amount.

মহারাষ্ট্র-জাতির ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্টডফ সাহেবও মহারাষ্ট্র-জাতির গুজরাথ অধিকার চেষ্টাকে দুর্নীতিমূলক লুণ্ঠনাভিযান নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্ব।*

(২) চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন।†

এইবার ব্যঞ্জনের অগ্নিপরীক্ষা। এখানেও হাত খাটো করার প্রয়োজন। কি উপায়ে করা যায় তাহার আভাস দিতেছি।

প্রথম প্রস্তাব। কোনও কোনও প্রদেশে আবহমান কাল হইতে বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং চন্দ্রবিন্দু বর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে, একটা 'র'তে দুইটার (র, ড়) কায চলিতেছে, অথচ সে অঞ্চলের লোকের জীবন-যাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, এমন কি দুই এক জন হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হইয়াছেন, আরও দুই একজন হইবার ভরসা রাখেন। আমরা go-ahead বলিয়া গুমার করি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক বলিয়াই কি এ অংশে অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা-দিগের অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিব?

দ্বিতীয় প্রস্তাব। চন্দ্রবিন্দু গেল, ং ঃ কেও বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। ং ঃ থাকিলে খাঁটি বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃতের প্রভেদ থাকিল কোথায়? আপামরসাধারণ সকলেই জানেন যে যেমন বাঙ্গলা কথার বিকৃত উচ্চারণ করিলেই ইংরাজী হয়, যথা দোর=door ভারী=very ইত্যাদি, সেইরূপ বাঙ্গলা কথায় ং ঃ দিলেই সংস্কৃত হইয়া যায়, যথা মন=মনঃ, বল=বলং ইত্যাদি; এ অবস্থায় এ দুটি খাঁটি বাঙ্গলার অনুরাগি-মাত্রেরই বিষনয়নে পড়া উচিত। আশ্চ-র্য্যের বিষয়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় খাঁটি বাংলার পক্ষপাতী হইয়াও অনুস্বারটিকে যেখানে সেখানে চালাইয়া খাঁটি বাংলাকে সংস্কৃতের ভেজালে মাটি করিতে বসিয়াছেন। ইহাতে যে বাংলা ভাষাটা অযথা সংস্কৃতানুগ হইয়া পড়িবে ইহা কি তাঁহার ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিকেও বুঝাইতে হইবে? সম্প্রতি একজন কট্‌কী পংডিতলোককে শংকুনিশ্বাসে অনুস্বার চালাইতে প্রয়াসী দেখিয়াও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। 'অনুস্বারটি গেলে বাঙ্গলায় অনুনাসিকের অভাব হইবে', কেহ কেহ এই আপত্তি তুলিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, যতদিন বাঙ্গালীর গৃহকোণে পত্নার প্রভাব ও গৃহের কানাচে পেত্নীর প্রাদুর্ভাব থাকিবে ততদিন অনুনাসিকের অভাব অনুভব করিতে হইবে না, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

তৃতীয় প্রস্তাব। বর্গের পঞ্চমবর্ণগুলা সবই অনুনাসিক, একটা রাখিলেই পাঁচটার কাজ বেশ চলিয়া যায়। অতএব আমার প্রস্তাব 'ম'কে বাহাল রাখিয়া বাকীগুলা খারিজ হউক। অন্যান্য পঞ্চমবর্ণ থাকিতে 'ম'কারের উপর এত টান কেন, এ কথা যদি কাহারও জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাঁহাকে

---

* পঞ্চস্বরের কথা কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।

† পূর্ণিমাসম্মিলন উপলক্ষে পঠিত।

ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রবন্ধকারের শাক্তবংশে জন্ম।

চতুর্থ প্রস্তাব। এইবার সেই মামুলি ঝগড়াটা তুলিব। তিনটা স, দুইটা ন, দুইটা ব, দুইটা য, দুইটা র, এ সব বাহুল্য এই টানাটানির দিনে কেন? শকার বকার ত অশ্লীল, অতএব পরিত্যাজ্য; তবে নিতান্ত ঠেকিলে একটি রাখুন। স-এর মধ্যে দন্ত্য 'স' সর্ব্বথা রক্ষণীয়, কেননা ইহার অভাবে 'স্ত্রী' ও তদপেক্ষা প্রিয় 'সন্তান' হারাইতে হয়। আর দন্ত্য 'স'-এর উপর আমার ন্যায় সদ্ব্রাহ্মণের অনুরাগ স্বাভাবিক, কেননা অমরকোষে লিখিতেছে:—'দন্ত-বিপ্রাণ্ডজা দ্বিজাঃ' অস্যার্থঃ—দন্তঘটিত-ব্যাপারে অর্থাৎ আহারাদিতে ব্রাহ্মণের অধিকার। 'শ' 'ষ' খারিজ করিলে কি লাভ-লোকসান হইবে তাহার একটা খতিয়ান দিতেছি, আপনারা নথিভুক্ত করিয়া রাখিবেন।

'শ' না থাকিলে:—মাছের আঁশ থাকিবে না (ঝীর পরিত্রাণ), আমের আঁশ থাকিবে না (মথি-লিখিত না হইলেও সুসমাচার), বাঁশের অভাবে লাঠী থাকিবে না, শেয়ালে কামড়াইবে না, শিকড় বাঁটিয়া কেহ ঔষধ করিয়া বশ করিতে পারিবে না, মরণে শঙ্কা থাকিবে না; তালশাঁসের উভয় দিকই দন্ত্য হইয়া যাইবে, কর্কশ মসৃণ হইবে, কপিশ পাংশুল মেটেরং ছেয়েরং হইবে, শ্বেতশুভ্র ধবল হইবে; আর অনেক দিন হইতেই ত শর্করা চিনিতে, শঙ্খ bugleএ, শাঁখা কাচের চুড়িতে ও শিক্‌লি চেনে পরিণত হইয়াছে।

'ষ' না থাকিলে:—শোষণ থাকিবে না শাসন থাকিবে, বিশেষ থাকিবে না সামান্য থাকিবে, শেষ থাকিবে না আরম্ভ থাকিবে (আমরা যে বাঙ্গালী), বিষয় থাকিবে না বক্তৃতা থাকিবে (যেমন প্রক্ষেত্রে) বৃষোৎসর্গ থাকিবে না তিলকাঞ্চন থাকিবে (অর্থাভাবে), আষাঢ় থাকিবে না মেঘদূত থাকিবে, আষাঢ়ে গল্প অসার গল্প হইবে, উষ্ণীষ থাকিবে না পাগ্‌ড়ি থাকিবে, মেষও থাকিবে না মহিষও থাকিবে না সব গরুগাধা গাড়োল হইবে ('বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জলে'র গুণে), কৃষ্ণ বিষ্ণু থাকিবেন না গৌরাঙ্গ থাকিবেন, (কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা), ষণ্ডা সাধু হইবে, বিষ অমৃত হইবে, তুষ চাউল হইবে, ঈর্ষ্যাদ্বেষ দয়ামায়া হইবে; অনেক দিন হইতেই যষ্টি cane হইয়াছে, মাষষ্ঠী লেডি ডাক্তার হইয়াছেন, ষাট্ পঞ্চান্ন হইয়াছে, অষ্টপ্রহর চব্বিশ ঘণ্টা হইয়াছে।

'ণ'কার গঙ্গার ওপার হইতে উচ্চারণ করিলে ঙকারের মত শুনায়, বড়নোংরা জিনিস; ইংরাজী knocker কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। অতএব ইহার উৎপাটনই শ্রেয়ঃ। তবে দন্ত্য 'ন' উঠাইয়া দিলে নিষেধের পাট উঠিয়া যাইবে, এই চা'ল আক্রার দিনে ভিক্ষুককে ফিরাইতে পারিব না, ইহা একটা বিবেচ্য বিষয়। বোধ হয় দন্ত্য 'ন' না ফেলিয়া রাখাই উচিত। 'জ' 'য' এর যেটি হয় রাখুন। 'র' এর কঠোর উচ্চারণ 'ড়', এই কঠোরতার ফলে মরা মড়া হয়, পার পাড় হয়। দেশের এ

অবস্থায় কঠোরতা ত্যাগ করিয়া মৃদুতা অবলম্বন করাই সুবুদ্ধির কায। পূর্ব্ববঙ্গের নজিরও রহিয়াছে। 'য়' ও 'অ'.তে প্রভেদ নাই, স্বরপ্রকরণে বুঝাইয়াছি, অতএব 'য়'র বহিষ্কারই শ্রেয়ঃ।

পঞ্চম প্রস্তাব। এইবার একটা সূক্ষ্মতত্ব, রুচির কথা, æsthetic sense এর কথা পাড়িব। টবর্গটা অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য দ্রাবিড়ী জিনিস, আর্য্যবংশসম্ভূত বাঙ্গালীর ভাষায় থাকা অন্যায়। দেখুন, ইহা হাটে-ঘাটে মাঠেবাটে পাওয়া যায়, নগরে সহরে ভদ্রসমাজে উহার স্থান নাই; ডোম চাঁড়াল হাড়ী প্রভৃতি অন্ত্যজবর্ণের মধ্যে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি সৎজাতির মধ্যে দেখা যায় না; ইহারও লাভলোক-সানের খতিয়ান পেশ করিলাম:—বাস্তবিক পক্ষে টবর্গ তবর্গেরই অপভ্রংশ, কঠোর উচ্চারণ, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার লোপ অবশ্যম্ভাবী। দণ্ড হইতে ডাণ্ডা, দাঁড়াও প্রাদেশিক উচ্চারণে ডাঁড়াও, দল্ ধাতু হইতে বা দ্বিদল শব্দ হইতে ডলা ও ডাল, তঙ্কা বা তন্খা হইতে টাকা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়=D. L. Roy, আর রবি বাবুর সাধের টা টো টে ইংরাজী 'the' এর অপ-ভ্রংশ ও পরনিপাত আর এক কথা, যে জাতির মাথা নাই তাহার মূর্দ্ধণ্য বর্ণেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব বর্গকে বর্গ বর্জ্জন করাই সুযুক্তি। লাভ-লোকসানের খতিয়ান পেশ করিলাম।

টবর্গ না থাকিলে:—

ঘাট থাকিবে না পুকুর থাকিবে, মাঠ থাকিবে না ময়দান থাকিবে, খাট থাকিবে না পালং থাকিবে, পাট থাকিবে না ধান থাকিবে, চট্ থাকিবে না কম্বল থাকিবে, কার্পেট থাকিবে না গালিচা থাকিবে, অট্টালিকা থাকিবে না প্রাসাদ থাকিবে, মঠ থাকিবে না মন্দির থাকিবে, পট থাকিবে না ছবি থাকিবে, ঘট থাকিবে না গুড়ের নাগ্‌রী জলের কল্‌সী থাকিবে, হাঁড়ীকুঁড়ি ঘটিবাটি থাকিবে না তৈজসপত্র থাকিবে, কাপড়চোপড় থাকিবে না বসনভূষণ থাকিবে, রাব্‌ড়ী থাকিবে না মালাই থাকিবে, কপাট চৌকাঠ থাকিবে না দোরদরজা থাকিবে, ডালা থাকিবে না কুলা থাকিবে, ডোল থাকিবে না গোলা থাকিবে, ডোর থাকিবে না কৌপীন থাকিবে, টব থাকিবে না বাল্‌তি গাম্‌লা থাকিবে, কণ্টক থাকিবে না কুসুম থাকিবে, টিক্‌টিকি থাকিবে না হাঁচি থাকিবে, এঁড়েদাম্‌ড়া ষাঁড় যাইবে পোকা থাকিবে, ঢাকঢোল গণ্ডগোল থাকিবে না গোলমাল থাকিবে (তবে চণ্ডীপাঠ চলিবে না), ঝাঁটা থাকিবে না জুতা ও গুতা দুইই থাকিবে, পৃষ্ঠ থাকিবে না কিন্তু জুতার দাগ থাকিবে, বিচারবিভ্রাট বিবাহ-বিভ্রাট থাকিবে না সমাজ-সংস্কার ও শাসন-সংস্কার হইবে, লুঠপাঠ থাকিবে না ঘুঁষ ও ঘুঁষা থাকিবে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ছোট বড় থাকিবে না সব ভাই ভাই হইবে, ব্যাটবল কপাটি হাডুডুডু থাকিবে না তাস পাশা দাবা থাকিবে (বাঙ্গালীর জয়জয়কার), হ্যাট-কোট প্যাণ্ট শার্ট থাকিবে না ধুতী চাদর থাকিবে (স্বদেশীর জয়), সম্রাট্ বড়লাট ছোটলাট জঙ্গীলাট থাকিবে না স্বরাজ

হইবে, Gad mad বুলি থাকিবে না শতংজীব থাকিবে, ষ্টীমার ষ্টীম বোট থাকিবে না জাহাজ থাকিবে, painter sculptor থাকিবে না চিত্রকর ভাস্কর থাকিবে, decanter দেশান্তর হইবে (Annie Besant আগে খেয়ায় আনী বাসন্তী হইয়াছেন, নতুবা বৈতরণীর খেয়াঘাটে গড়াগড়ি যাইতেন), টালি ইঁট কাঠ কড়ি থাকিবে না মার্ব্বেল পাথর ও লোহার বীম থাকিবে, টাকাকড়ি থাকিবে না গিনি মোহর কোম্পানির কাগজ থাকিবে, টাকা ঠন্ ঠন্ করিবে না গিনি ঝন্ ঝন্ করিবে, কেউটেও থাকিবে না ঢোঁড়াও থাকিবে না সব হেলে হইয়া যাইবে, (বাঙ্গলার দশাই তাই), জটিলা কুটিলা থাকিবে না ললিতা বিশখা বৃন্দাদূতী থাকিবে, হিংটিং ছট্ থাকিবে না সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম থাকিবে, ট্রেন ট্রাম মোটর গাড়ী থাকিবে না aeroplane থাকিবে, telegraph telephone থাকিবে না marconigraphy থাকিবে, চটাপট্ বৃষ্টি পড়িবে না ঝুপ্ঝুপ করিয়া জল হইবে, ফোটাফোটা বৃষ্টি পড়িবে না ঝুর্ঝুর্ করিয়া জল হইবে ;

ওষ্ঠ অধর হইবে, ইষ্ট হিত হইবে, মিষ্ট মধুর হইবে, শিষ্ট শান্ত হইবে, টক অম্বল হইবে, মিট্ মাট্ ডিস্মিস্ রফা হইবে, Exhibition প্রদর্শনী হইবে, ঠাট্টা বিদ্রূপ হইবে, পাড়া পল্লী হইবে, সাড়া সংজ্ঞা হইবে, হাড়্চাম্ড়া অস্থিত্বক্ হইবে, পিঁপ্ড়া পিপীলিকা হইবে, ঝড়ঝাপ্টা ঝঞ্ঝাবাত হইবে, ঠাণ্ডা শীতল হইবে, ডিঙ্গি নৌকা হইবে, বাটওয়ারা বিভাগ হইবে, ঠিকঠাক স্থিরনিশ্চয় হইবে, উঠাপড়া উত্থানপতন হইবে, ঠাকুর দেবতা বা ব্রাহ্মণ হইবে, বেড়ান ভ্রমণ হইবে, বেড়া বৃতি হইবে, ডাল শাখা হইবে, ডাল ঝোল বা যূষ হইবে (অম্লরোগের দৌরাত্ম্যে), খাটুনি পরিশ্রম হইবে (সাধুভাষার জয়জয়কার) টঙ্কার ঝঙ্কার হইবে (বাঙ্গলার মাটীর গুণে) খ্রীষ্ট কৃষ্ণবিষ্ণুনারায়ণ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র হইবেন, পূজার দালানের চণ্ডিকা অম্বিকা হইবেন, ঘরের উগ্রচণ্ডা রামরম্ভা হইবেন ; বটতলা নিমতলা হইবে (কাছাকাছি ত বটে), ডিম ফুটিয়া ছানা হইবে, পাঠ সাঙ্গ হইবে, পীড়া আরোগ্য হইবে, কোষ্ঠ খোলসা হইবে, ইঁচড় কাঁঠাল সব পাকিয়া যাইবে, বেড়ি ভাঙ্গিবে (মাইকেলের হুকুমে), কপট লম্পট্ শঠ সব সাধু স্বামী সন্ন্যাসী হইবে, হাড়ী চণ্ডাল ডোম ডোক্লা সব বামুন হইবে (এ যে ঘোর কলি), ছুঁড়ী বুড়া সব যুবতী হইবে, টুক্টুকে ফুট্ফুটে মেয়ে পাঁচপ্যাঁচা হইবে, ছড়ী ঘড়ী যুড়ী গাড়ী অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবে, blister, poultice, fomentation, ointment, liniment, হোমিওপ্যাথির কল্যাণে উঠিয়া যাইবে, vote, ballot উঠিয়া nomination হইবে, ভেট ডালি উপঢৌকন সার্কুলারে নিষিদ্ধ হইবে, ঘুড়ি-উড়ান আইন করিয়া বন্ধ হইবে, লাঠিসোটা হুড়্কোঠেঙ্গা ইট্পাট্কেল সব পুলিশ-আইনে উঠিয়া যাইবে, জোট্পাট্ করিয়া চোট্পাট্ করা বা ছুট্ছাট বলা ইংরেজের আমলে চলিবে না, পিঁড়েয় বসিয়া পেঁড়োর খবর দেওয়া চলিবে না, ছেলেরা আড়ি দিবে না,

মেয়েরা আড়ি পাতিবে না, আড়ি আড়ি ধান হইবে না (দেশে যে ঘোর অজন্মা), আড়মাছ ভদ্রলোকে খাইবে না, ইতি 'ভবিষ্যপুরাণে' ফলশ্রুতিঃ।

দেখুন স্রোতের টানও ঐদিকে। আট ভাজার স্থলে বত্রিশ ভাজা চলিয়াছে, খোলা-প্রাণের অট্টহাস্য মুচ্‌কি হাসিতে দাঁড়াইয়াছে, চণ্ডীর গান জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, ঠিকুজীকোষ্ঠী horoscope হইয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপ হল্‌ঘর হইয়াছে, থিয়েটার নাচঘর হইয়া পড়িয়াছে, acting বক্তৃতায় দাঁড়াইয়াছে, খেম্‌টা gramophone হইয়াছে, concert party ঐকতান বাদন হইয়াছে (গন্ধমাদনের কাছাকাছি, শব্দমাদন ত বটে), Emerald Classic এ লোপ পাইয়াছে, কোন্ দিন বা Star Minervaয় লোপ পাইবে, গণ্ডার rhino হইয়াছে, মাটি কলিকাতায় ভুঁই হইয়াছে, খুড়া খুড়ি কাকা কাকী হইয়াছে, আড্ডা আখ্‌ড়া Club, Association হইয়াছে, হোটেল আশ্রম হইয়াছে, কাঠের পিঁড়ির স্থান গালিচার আসনে অধিকার করিয়াছে, কড়াগণ্ডাবুড়ি পাই পয়সা পেনী হইয়াছে, টাকা শিলিংএ দাঁড়াইয়াছে, স্বদেশী চড়চাপড় চাঁটী বিদেশী kick cuffএ পরিণত হইয়াছে, পাঁঠাকাটা ছাগল জবাইএ দাঁড়াইয়াছে, কড়াই কেৎলি হইয়াছে, মশলা বাটা মশলা পেশায় পরিণত হইয়াছে, ধানভানা কলের কল্যাণে ঢেঁকির স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, হাঁটার পাট carএর কল্যাণে উঠিয়া গিয়াছে কাযেই কেহ হোঁচটও খায় না পায়ে ঘাঁটাও পড়ে না, টীকাটিপ্পনী ফুটনোট annotation commentary উঠিয়া নূতন রেগুলেশনে original research হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যুক্তি বাদ দিয়া ব্যঞ্জনগুলি এইরূপ দাঁড়াইল। ক গ চ জ ত দ ন প ব ম র ল স হ। এই চৌদ্দটি। এস্থলে ইংরাজী অপেক্ষাও বর্ণসংখ্যা সংক্ষেপ হইল। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।' সমাজতত্ত্বে দেখি ছত্রিশ বর্ণে বিভক্ত থাকাতে, আমাদের জাতীয় উন্নতি ও একতার পথে বিঘ্ন হয়, ভাষাতত্ত্বেও দেখি বর্ণবাহুল্যে ভাষার উন্নতি ঘটে না, শিক্ষার প্রসার হয় না। আমার এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে আর কোনও আশঙ্কা থাকিবে না। কর্ত্তাদের আমলের ছত্রিশ ব্যঞ্জনের স্থানে আমি যে চৌদ্দটি খাড়া করিয়াছি তাহা এই টানাটানির দিনে মঙ্গলময় নহে কি ?

আরও দেখুন চতুর্দ্দশ সংখ্যার মাহাত্ম্য বড় কম নহে। চৌদ্দভুবন দেখা অনেক সুকৃতির ফলে ঘটে, পক্ষান্তরে অনেক পাপের ফলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়, চৌদ্দপোয়া হইয়া শয়ন বড় আরামের, চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক অত্যন্ত মুখরোচক, বাঙ্গলা মুলুকে চৌদ্দয় নারীর যৌবনসঞ্চার, চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া পদ্য লেখা হয়, ফরাসী ইতিহাসে চতুর্দ্দশ লুই প্রথিতযশাঃ, হিন্দুর শাস্ত্রে চতুর্দ্দশ ভুবন, চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও চতুর্দ্দশ বিদ্যার খ্যাতি আছে, ব্রতশ্রেষ্ঠ শিবরাত্রিব্রত, সাবিত্রী-ব্রত ও অনন্তব্রত চতুর্দ্দশীতে অনুষ্ঠিত ও চতুর্দ্দশ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর কখনও কখনও সভ্যগণের সুবিধার জন্য পূর্ণিমা-মিলন চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে অধিষ্ঠিত হয় !!

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি।

...ত-শিল্প আকারাঙ্কণে অনভ্যস্ত ছিল বলিয়া যাঁহারা অনুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন না,—আকারাঙ্কণেই ভারত-শিল্পের উৎপত্তি। বৈদিক-যুগের যাগযজ্ঞাদি ব্যাপারে যে সকল "চিতি" বা যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্যই ভারতবর্ষকে আকারাঙ্কণে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। "চিতি"-সমূহ শ্যেনাদির বিবিধ আকারানুসারে রচিত হইবার বিধান "শুল্ব-সূত্রে" লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে "চতুরস্র-শ্যেনচিতি" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন;—আকারাঙ্কণের প্রথম প্রয়াসের নিদর্শন। * "শ্যেন-বক্রপক্ষ-ব্যস্তপুচ্ছ" আর এক শ্রেণীর "চিতির" নাম;—তাহাতে আকারাঙ্কণের অধিক প্রয়াস অভিব্যক্ত। † "কঙ্ক-চিতি,"—"অলজ-চিতি" প্রৌগ-চিতি—"রথচক্র-চিতি" ইত্যাদি ইত্যাদি "চিতি"-ভেদের মধ্যে নানা শ্রেণীর আকারাঙ্কণের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদিক কর্ম্মাঙ্গের বিশেষ অনুসঙ্গী হইয়া, যে জ্ঞান এইরূপে প্রাচীনতম বৈদিক-সমাজে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, বৈদিক-সভ্যতাই তাহার প্রকৃত উদ্ভবক্ষেত্র;—তাহাকে পরানুকরণলব্ধ বলিবার উপায় নাই। বরং আকারাঙ্কণ হইতে আকারানুকরণ,—আকারানুকরণ হইতে স্বভাবানুকরণ,—স্বভাবানুকরণ হইতে অতীন্দ্রিয় ভাববিকাশ-চেষ্টা ক্রমোন্নতির সুপরিচিত পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ‡

এই সকল "চিতি"-রচনার চেষ্টা কত পুরাতন, তাহার তথ্য-নির্ণয়ে সফলকাম হইবার আশা নাই। তাহার পরিচয় "কল্পসূত্রে"র পরিশিষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্যেনাদি পক্ষীর নামানুসারে যে সকল "চিতি" রচিত হইবার কথা লিখিত আছে, তাহাকে আকারাঙ্কণের নিদর্শন না বলিয়া, কেবল পারিভাষিক সংজ্ঞামাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কারণ, "তৈত্তিরীয় সংহিতায়" দেখিতে পাওয়া যায়,

* The most ancient and primitive form is the Chaturasra-syenachit, so called, because it rudely imitates the form of a falcon.—Thibaut's Sulva-Sutras.

† A nearer approach to the real shape of a falcon,—or as the Sutras have it,—of the shadow of a falcon about to take wing is made in the Syena vakrapaksha vyastapuchha, the falcon with curved wings and outspread tail.—Ibid.

‡ These facts have a double interest. They are in the first place valuable for the history of the human mind in general; they are in the second place important for the mental history of India, and for answering the question relative to the originality of Indian Science. For whatever is closely connected with the ancient Indian religion must be considered as having sprung up among the Indians themselves, unless positive evidence of the strongest kind point to a contrary conclusion.—Thibaut's Sulva Sutras, J. A. S. B. Vol. XLIV, p. 228.

—"স্বর্গকাম যজমান শ্যেনপক্ষীর আকার-বিশিষ্ট যজ্ঞ-বেদী নির্ম্মিত করিবেন ; কেননা পক্ষিদিগের মধ্যে শ্যেনপক্ষীই সর্ব্বাপেক্ষা সমুচ্চ আকাশে উড্ডীন হইতে সমর্থ ;—সুতরাং যজমান শ্যেনপক্ষীর আকার-বিশিষ্ট যজ্ঞ-বেদীতে আহুতি দান করিয়া, শ্যেনপক্ষীর মতই স্বর্গলোকে উড্ডীন হইতে পারিবেন।" যথা,—

"শ্যেনচিতং চিন্বিত সুবর্গকামঃ।
শ্যেনো বৈ বয়সাং পতিঃ।
শ্যেন এব ভূত্বা সুবর্গং লোকং পততি॥"

ভারতবর্ষ যে যুগে কেবল আকারানুকরণে ব্যাপৃত ছিল, সে যুগ শিল্পচর্চ্চার প্রথম যুগ। তাহা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, এখন আর সে যুগের প্রথম চেষ্টার কোনরূপ নিদর্শনই দেখিতে পাইবার আশা নাই। এখন যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের শিল্পাদর্শ বলিয়া, তাহাতে বাহ্যরূপ অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য-বিকাশের চেষ্টাই অধিক অভিব্যক্ত। তাহাকে "আকারানুকরণ" না বলিয়া, "স্বভাবানুকরণ" বলিতেই ইচ্ছা হয়। এখনও তাহার নানা নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। বৃক্ষলতাই হউক, পত্রপুষ্পই হউক, ফল-শস্যই হউক, মনুষ্য বা ইতরপ্রাণীই হউক,—চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে তাহাদের চির-পরিচিত "আকার" অপেক্ষা "স্বভাবই" অধিক আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শিত হইত। তাহাই ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

অজন্তা-গুহার বিচিত্র চিত্রাবলীর মধ্যে ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের যে সকল নিদর্শন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া-ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতেছিল, তাহার অবিকল প্রতিকৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।* তাহাতে যে বিশ্ববিমোহন চিত্রাদর্শ সভ্যসমাজের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাকে পরানুকরণ-লব্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকেই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন! কিন্তু সে সকল চিত্রে যেরূপ "স্বভাবানুকরণ" অভিব্যক্ত, তাহা ভারতবর্ষেই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। বুদ্ধসমীপগামিনী মাতার এবং সন্তানের চিত্রে যে "স্বভাবানুকরণ" পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, তাহা অনন্যসাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। মাতা সন্তানকে লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে বুদ্ধসমীপে দণ্ডায়মানা ;—সন্তানের মুখমণ্ডলে বালকোচিত বিস্ময়-বিজড়িত সরল ভাব ; মাতৃমুখমণ্ডলে ভক্তিরসাপ্লুত অপত্যবাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। "এইটি আমার কোলের বাছা, ইহাকে আশীর্ব্বাদ কর,—ইহা ছাড়া আর কোনও কামনা নাই," এইরূপ একটি অকৃত্রিম সন্তান-কল্যাণকামনাই সকল কামনার উপরে একমাত্র কামনা বলিয়া প্রতিভাত! অপত্য-স্নেহের অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রী যেন কায়ালাভ করিয়া, শিল্পগৌরবকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের চিরপরিচিত মাতৃমূর্ত্তিই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ;—সে মূর্ত্তি যেন বিশ্বজননীর

* The Paintings in the Budhist Cave-temples of Ajanta,—by John Griffiths.

ভুবনমোহিনী মাতৃমূর্ত্তিকেই রক্তমাংসের শরীরে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে! *

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ ইতিহাস-লেখক কোণার্ক-মন্দিরের হস্তিযূথের রচনা-কৌশল দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"হস্তিগুলি যেন ঠিক গজেন্দ্রগমনেই হাঁটিয়া চলিয়াছে; যাহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহারাও যেন জীবনে যেমন করিয়া বসিত, প্রস্তর-মূর্ত্তিতেও ঠিক্ সেই ভঙ্গীতেই দেদীপ্যমান!"† ইহাই "স্বভাবানুকরণের" পরাকাষ্ঠা। তাহা কেবল "আকার" মাত্রের যথাযথ অনুকরণ করিয়াই নিরস্ত হইতে পারে নাই;—যাহার যাহা "স্বভাব", তাহাও যথাসাধ্য অভিব্যক্ত করিতে যত্ন করিয়াছে। "আকার" কেবল তাহারই অনুগামী হইয়া অবলীলাক্রমে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল মূর্ত্তিশিল্পের নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, প্রথমেই তাহার স্বভাব —আচরণ, গতিবিভ্রম,—ব্যক্ত হইয়া পড়ে। আকারে কিছু তারতম্য ঘটিলেও, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইবার অবকাশ লাভ করে না। ইহা অবশ্যই উচ্চশ্রেণীর শিল্প-কৌশল। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি-রচনার সময়ে ইহা অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর রচনা-কৌশল অধিগত করিতে হইয়াছিল। তাহা বাহ্যমূর্ত্তি নহে; সুতরাং বাহ্য স্বভাব হইতে তাহার জন্য সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া আনিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাতে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মভাব অভিব্যক্ত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি-রচনায় ব্যাপৃত হইয়া, ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা নূতন নূতন শিল্প-কৌশলের আবিষ্কার সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সে কৌশল কিরূপ কৌশল? তাহা বাহ্যবস্তুর পরিদর্শনলব্ধ, অনায়াসলভ্য "আকারানুকরণ" বা "স্বভাবানুকরণ" নহে;—তাহা বাহ্যবস্তুর অতীত এবং অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রীর ধ্যানলব্ধ—তপস্যালভ্য——অনির্ব্বচনীয় চিত্তবল। তাহার জন্যই, যে যুগে গ্রীক-শিল্প দেবমূর্ত্তির কল্পনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবমূর্ত্তিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেই যুগে ভারত-শিল্প মানবমূর্ত্তি-রচনার সময়েও দেবভাবকে যথাসাধ্য উপন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছে! ‡ কারণ, ভারতবর্ষের নিকটে বিশ্বসংসার ব্যক্তাব্যক্ত;—আকার তাহার ব্যক্তরূপ; তাহা পৃথক্ পৃথক্ এবং সীমানিবদ্ধ;—তাহার অন্তর্নিহিত মূলশক্তি অব্যক্তরূপ; তাহা এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বতো-

* কলিকাতা কলাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিল্পাচার্য্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই চিত্র পুনর্মুদ্রিত করিয়া লিখিয়াছেন—In its exquisite sentiment (it is) comparable with the wonderful Madonnas of Geovanni Bellini.—Havell's Indian Sculpture and Painting, p. 165.

† The elephants move along at the true elephant trot and kneel down in stone as they did in life.—Hunter's Orissa, vol. I., p. 291.

‡ Greek and Italian art would bring the gods to earth, and make them the most beautiful of men; Indian art raises men up to heaven and makes them even as the gods.—Havell's Indian Sculpture and Painting, p. 83.

ব্যাপী, অনন্ত এবং অসীম। সেই অসীম অব্যক্তরূপকে যথাসাধ্য ব্যক্ত করিবার জন্যই শ্রীমূর্ত্তিনিচয় উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে তাহাই উদ্ভাবিত হইবার কথা। তাহার নভোমণ্ডল শূন্যময় আকাশমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই;—তাহা সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বকিন্নরকণ্ঠের অবিরাম স্তুতিগীতিতে চিরঝঙ্কৃত হইয়া, মানব-কল্পনাকে নিয়ত উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার সাগরজল কেবল লবণাম্বুরাশি বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই;—তাহা নারায়ণের অনন্তশয্যারূপে বিশ্বরচনার সকল উপাদান গর্ভে ধারণ করিয়াই নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। জলস্থল-মরুদ্ব্যোম এইরূপে ভাবময় হইয়া, ভাবাবেশে ভারতবর্ষকে অতীন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্য-মোহে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। মূর্ত্তি-শিল্পের ভিতর দিয়া তাহারই আভাস অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার জন্যই, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কেহ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিত না;—দেখিত কেবল অব্যক্তরূপের অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্য। তাহার জন্যই, সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তিকে একমাত্র অব্যক্তরূপের অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিবামাত্র ভারতবর্ষের সাধক বিচিত্র ভাবসমন্বয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন,—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্য-নাথো হরিঃ॥"

এই খানে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যে প্রবল পার্থক্য, তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিলে, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের মূললক্ষ্যের সন্ধানলাভের উপায় নাই।*

যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি-রচনার জন্য বিবিধ শিল্পসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তিকে আকারানুগত করিবার জন্য উপদেশ দান না করিয়া, ধ্যানানুগত করিবার জন্যই অধিক আগ্রহ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ধ্যানে যে অব্যক্ত মাধুর্য্য ভাষার সাহায্যে সুরচিত পদলালিত্য-বিস্তারে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে ব্যক্ত করিতে গিয়া, শিল্পীকেও ধ্যাননিষ্ঠ হইতে হইত।

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

এই বলিয়া অতি পুরাকালের শান্তরসাস্পদ আশ্রমমণ্ডলীতে যে আত্ম-জিজ্ঞাসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, অনির্ব্বচনীয় হইলেও, তাহাই বৈদিক সাহিত্যের বিবিধ স্তবস্তুতিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে

* Any Indian, man or woman, will worship at the feet of some inspired wayfarer who tells them that there can be no image of God, that the word itself is a limitation, and go straightway, as the natural sequence, to pour water on the head of the Siva-lingam.—The Ideals of the East, pp. 65-66.

কায়াদান করিবার জন্যই শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভাবনা। কিন্তু তাহাকে নিতান্ত আধুনিক উদ্ভাবনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে পাশ্চাত্য মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের উদ্ভাবনাকে "বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের সমকালবর্ত্তী একটি পরানুকরণলব্ধ আকস্মিক ব্যাপার" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সক্রেতিশ এবং প্লেতোর দার্শনিক মত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে,—পিথাগোরাসের আবির্ভাবের সমসময়ে, *—খৃষ্টাবির্ভাবের ৫৫৭ বৎসর অগ্রে,—কপিলবস্তুর শাক্য-রাজকুমার সিদ্ধার্থদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য সুধীসমাজে সুপরিচিত। তৎপূর্ব্বে যেন ভারতবর্ষে কিছুই ছিল না; এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালেই যেন সহসা সকল তত্ত্ব ভারতবর্ষে আগন্তুকরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছিল,—এইরূপ একটি ধারণা এক্ষণে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পথ-প্রদর্শক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু ইহাই কি ঐতিহাসিক সত্য?

বৌদ্ধধর্ম্মকে একটি নবধর্ম্মের আকস্মিক আবিষ্কার মনে করিয়া, অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সেই ধারণার উপরে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতেছেন, কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহাতে আস্থা স্থাপিত করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—বৌদ্ধধর্ম্ম যদি নবধর্ম্ম বলিয়াই বিবেচিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই তাহার আবির্ভাবের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। †

বৌদ্ধসাহিত্যেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার সকল কাহিনীতেই দেবদেবীর কথা। লুম্বিনী-বনের শাল-বৃক্ষের মঞ্জরী ধারণ করিয়া, শাক্যজননী মায়াদেবী যখন প্রসব-বেদনা বহন করিতেছিলেন, সেই সময়ে—সেই অবস্থায়—তাঁহার দক্ষিণ-কুক্ষি ভেদ করিয়া, শাক্যসিংহ বহির্গত হইবামাত্র, ব্রহ্মা আসিয়া সেই সদ্যঃপ্রসূয়মান শিশুদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই শিশু দেবশিশু;—ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সপ্তপদ গমন করিয়া, সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। এইরূপ আখ্যায়িকা এবং ইহার প্রস্তরচিত্রের অভাব নাই। শাক্যসিংহকে তাঁহার জীবিতকালেই দেবাবতাররূপে প্রচারিত করিবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারতবর্ষের পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহা যে বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমূর্ত্তি-রচনায় ব্যাপৃত ছিল, তাহাতে সংশয় প্রকাশের কারণ নাই। সেরূপ শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান নাই,—ইহাই একমাত্র অকাট্য তর্ক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে, তাহার জলস্থল-ব্যাপী বিপুল প্রচারক্ষেত্রের অসংখ্য গিরি-

* Pythagoras is said to have visited India; and there are some curious verbal coincidences which really seem to countenance the story.—Cunningham's Bhilsa Topes, p. 33.

† If in Budhism the proud attempt be made to conceive a deliverance in which man himself delivers himself, to create a faith without a god, it is Brahmanical speculation which has prepared the way for this thought.—Oldenberg's Budha, p. 53.

গুহায়,—চৈত্যে, স্তূপে, বিহারকাননে,—মূর্ত্তিশিল্পে যে অসাধারণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিল, তাহাতেই পুরাতন শিল্পকৌশল নবজীবন লাভ করিয়া, নূতন নূতন মূর্ত্তিরচনায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা মূর্ত্তি-শিল্পের প্রথম প্রয়াস বলিয়া কথিত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ গ্রীকশিল্পের অনুকরণলব্ধ বলিয়া ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের মৌলিকত্ব অস্বীকার করিবার জন্য লালায়িত হইলে কি হইবে? প্রাচ্যশিল্পের মূলপ্রকৃতির ও তাহার ক্রমবিকাশের বিবিধ রচনা-যুগের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্প আধুনিক হওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রথম রচনা-চেষ্টার নিদর্শন, অতি পুরাতন বলিয়াই, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার পুণ্যস্মৃতি দূরাগত বংশীধ্বনির মত এক মর্ম্মন্তুদ বিষাদগাথা জাগাইয়া তুলিয়া, এখনও পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্যে ধ্বনিত হইয়া রহিয়াছে।*

ভারতবর্ষে যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাহারও অনুকরণলব্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার কারণ নাই। তাহা অতি পুরাকালে সূত্ররূপে বৈদিকসাহিত্যে নিহিত থাকিয়া, ঋষিসমাজের ধ্যানগম্য ছিল। ক্রমে দর্শনশাস্ত্রের ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহা জনসাধারণের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।† তাহাই ভারতবর্ষের লোকসমাজের

* In India the art of this early Budhism was a natural growth out of that of the Epic age that went before. For it is idle to deny the existence of pre-Budhistic Indian art, ascribing its sudden birth to the influence of the Greeks, as European archeologists are wont to do. The Mahabharata and Ramayana contain frequent and essential allusions to stroeyed towers, gallaries of pictures, and castes of painters, not to speak of the golden statue of a heroine, and the magnificence of personal adornment. Indeed it is difficult to imagine that those centuries in which the wandering ministrels sang the ballads that were later to become the Epics, were devoid of image-worship; for descriptive literature, concerning the forms of gods, means correlative attempts at plastic actualisations. This idea finds corroboration in the sculptures of Asoka's rails, where we find images of Indras and Devas worshipping the Bo-tree.—The Ideals of the East, pp. 74-75.

† এই সকল দার্শনিক-তত্ত্ব ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দূরদেশে ব্যাপ্ত হইবার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন গ্রীসরাজ্যেও যে ভারতবর্ষের দার্শনিক-তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একজন স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The Indians have the advantage in point of time; and I feel satisfied that the Greeks borrowed much of their philosophy from the East. The most perfect system of the Ionics, as developed by Anaxagoras, is the same as the 'Sankhya' School of India; and the famous doctrines of Pythagoras are intensely Budhistical. The transmigration of souls is Egyptian as well as Indian; but the prohibition against eating animal food is altogether Budhist. Women were admitted as members both by Sakya and by Pythagoras; and there were grades in the brotherhood of Pythagoreans, as in the 'Sangha' or community of Budhists. These coincidences between the two sysmtems seem too strong to be accidental.—Cunningham's Bhilsa Topes, p. 33.

সকল ধারণার, সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল আচরণের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিত। চিত্রে বা ভাস্কর্য্যেও তাহা নানা ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। বিশ্বসংসার "ব্রহ্মার স্বপ্ন" হউক বা "মায়ার ইন্দ্রজাল" হউক, তাহাই বিশ্বসংসারের শেষ সিদ্ধান্ত নহে। তাহার অন্তরালে একটি সনাতন সত্তা আছে;—তাহা স্বপ্নাতীত, মায়াতীত—সার সত্য। চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে তাহাকেই প্রতিফলিত করিবার জন্য চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই জন্য শ্রীমূর্ত্তিনিচয় ভারতবর্ষের পুরাতন শিক্ষাদীক্ষার মূলসূত্রের মহাভাষ্য;—মূলসূত্র বিস্মৃত হইলে, তাহার উপাদেয় বিশদ ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই! এই সকল কারণে, ভারতবর্ষকে জানিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার শিল্পকৌশলের মূল লক্ষ্যকে একটি স্বতন্ত্র রহস্যরূপে জানিয়া শেষ করিবার সম্ভাবনা নাই। *

ভারতবর্ষকে জানিবার জন্য আগ্রহের অভাব না থাকিলেও জানিবার কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিবার উপায় নাই। "সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" এখন ভারতবর্ষ যে ভাবস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে তাহা প্রবল হইলেও, অনাবিল বলিয়া সমাদর লাভ করিতে পারে না। তাহার সহিত ভারতবর্ষের চিরপরিচিত ধ্যানধারণার সামঞ্জস্য নাই;—পুরাতত্ত্বের সামঞ্জস্য নাই,—এত যুগের এত কঠোর তপস্যারও সামঞ্জস্য নাই। তাহা ভারতবর্ষকে দিন দিন "ইহসর্ব্বস্ব" করিয়া তুলিতেছে, সেকালের সহিত এ কালের ব্যবধানকে এখন আর কেবল কালের ব্যবধান বলিবার উপায় নাই,—ভাবেরও বিশেষ ব্যবধান পরিলক্ষিত হইতেছে। সেকালের ভারতবর্ষ বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া সংযত হইয়া উঠিয়াছিল;—একালের ভারতবর্ষ অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া, দিন দিন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে যে অবশ্যম্ভাবী চিত্তদৈন্য উপস্থিত হইতেছে, সেই দৈন্যই প্রধান দৈন্য;—তাহা সাহিত্যে, শিল্পে, কল্পনায় ও কর্ম্মে পরানুকরণের ক্ষীণ ক্ষমতামাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, স্বাবলম্বন-শক্তিকে অবসন্ন করিয়া তুলিতেছে! যে চিত্তবল বাহ্যবস্তুর আবেষ্টনের মধ্যে নিয়ত কারারুদ্ধ থাকিয়াও, তাহার অন্তর্নিহিত মূলশক্তিকে ধ্যানায়ত্ত করিয়া, মূর্ত্তিশিল্পে প্রকাশিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিল, সে চিত্তবল এখন দুর্ব্বল হইয়া

* যাপান-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য অভিব্যক্ত করিতে গিয়া, কাকুযু ওকাকুরা লিখিয়া গিয়াছেন,—"Art with us, as elsewhere, is the expression of the highest and noblest of our national culture, so that, in order to understand it, we must pass in review the various phases of Confucian philosophy; the different ideals which the Budhist mind has from time to time revealed; those mighty political cycles, which have one after another unfurled the banner of nationality, the reflexion in patriotic thought of the lights of poetry and the shadows of heroic characters; and the echoes alike of the wailing of a multitude, and of the mad-seeming merriment of the laughter of a race."—The Ideals of the East, p. 9-10.

পড়িয়াছে। এখন আর সেকালের মূর্ত্তি-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য সহসা অনুভূত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষের কোন শ্রীমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—আকারানুকরণ কোন কালেই মূর্ত্তি-রচনার মূললক্ষ্য বলিয়া পরিচিত ছিল না। যে সকল শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নরমূর্ত্তির অনুরূপ নহে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নরমূর্ত্তির অনুরূপ তাহার রচনাকৌশলেও আকারানুকরণ মূললক্ষ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই। যে কোনও দ্বিভুজ একমুখ বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতি ত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়

কেবল একবার—একটি বিশেষ অবস্থা সংসূচিত করিবার জন্য—আকারানুকরণের আতিশয্য প্রকটিত হইয়াছিল। তাহা ঠিক বুদ্ধমূর্ত্তি নহে, তাহাকে ঠিক আকারানু-করণ বলিলেও সঙ্গত হয় না। তাহাও এক শ্রেণীর স্বভাবানুকরণমাত্র। শাক্য-সিংহ কঠোর তপস্যায় বিশীর্ণকলেবরে কি ভাবে কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন, সে চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত। এই একটি মাত্র উপলক্ষ্য ব্যতীত আর কোনও স্থলেই মানবদেহের যথাদৃষ্ট আকারানুকরণের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায়,—নরনারায়ণের অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্য। তাহাকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টাই প্রধান চেষ্টা। তাহার জন্য শিল্পী যেন ইচ্ছা করিয়াই, অতিমাত্রায় আকারানু-করণে ব্যাপৃত হইতে পারেন নাই। অতি মাত্রায় আকারানুকরণে ব্যাপৃত হইলে, রক্তমাংসের মানবদেহের যথাদৃষ্ট বিন্যাস-ব্যাপারে দেবভাব আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। বোধ হয়, সেই আশঙ্কায় সতর্ক হইয়াই, আকারানুকরণের সামর্থ্য থাকিতেও, শিল্পকার তাহার আতিশয্য প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার কোন মূর্ত্তিতেই নরাকারকে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। বরং শাক্যসিংহ যে সাধারণ জনসমাজের একজন হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, সে কথা বিস্মৃত হইবার জন্যই জনসাধারণের আগ্রহ ছিল। তাহাদের নিকট তিনি অবতাররূপে প্রতিভাত।

(ক্রমশ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

শিক্ষা ও তাহার সংস্কার। *

গত বৎসর রাজসাহীর অধিবেশনে আমি দুইটি বিষয়ের প্রতি সম্মিলনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম—শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদিগের দায়িত্ব এবং জাতীয় শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া ইহার ভবিষ্যৎ গতি নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইব। বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় আমার সময় ও সামর্থ্য নিতান্ত অল্প। যাহাতে যোগ্য হস্তে এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হয়, সেই আশা লইয়া আমি ইহার অবতারণা করিতেছি মাত্র।

যে সভ্যতার গৌরবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ মানবজাতির ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সভ্যতার মূল প্রস্রবণ এক কথায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় "শিক্ষা"। অন্যান্য শক্তি তাহার সহযোগী ও আশ্রয়স্বরূপ মাত্র। জর্ম্মণী যে তাহার ব্যবসায়ের দ্বারা জগৎকে ছাইয়া ফেলিতেছে, আমেরিকা যে তাহার বাণিজ্যের কর প্রসারণ করিয়া বসুন্ধরার ধনরাশি শোষণ করিতে বসিয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জাপান যুদ্ধনৈপুণ্যে জগতের সমক্ষে এসিয়ার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে এই সকল ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং যুদ্ধকৌশল সেই সমস্ত দেশের ক্রীড়াঙ্গনে, বিদ্যালয়ে, এবং শিক্ষাশিল্পভবনে (Laboratoryতে) সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়েরই ন্যায় অধীত এবং অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ফলত' বর্ত্তমান যুগে সমস্ত সভ্যজাতিই শিক্ষার মধ্য দিয়া আপন আপন স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে, এবং আপন আপন আদর্শকে গঠিত করিয়া লইতেছে। যে যে শক্তির বিকাশ হইলে মানব জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, নিজের উন্নতির পথ অনায়াসসাধ্য করিয়া লইতে পারে, সেই সেই শক্তি যাহাতে বাল্যাবস্থা হইতেই পরিপুষ্ট ও কার্য্যোপযোগী হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতিসমূহ পরস্পরের সংঘর্ষে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী কেমন বৈচিত্র্যবহুল ও পরিবর্ত্তনশীল তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, কাজেই এই বর্দ্ধমান, উন্নতিশীল জগৎপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া

* ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

চলিবার ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম হইয়াছে। একদিন য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রস্রবণমূলে দাঁড়াইয়া গ্রীক্‌দার্শনিক ভগবৎপ্রাণীর ন্যায় বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মই জ্ঞান অথবা জ্ঞানই ধর্ম্ম, আমাদের নিকট এরূপ উক্তি নূতন নহে। কেননা ভারতীয় দর্শনও একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিয়াছিল জ্ঞানই মুক্তি। প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হইলে সংসারবন্ধন টুটিয়া যায়, ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ হয়, দুঃখের নিঃশেষে অবসান হয়, এবং সূর্য্যোদয়ে নিশার ন্যায় মোহ-অভিমান মিলাইয়া যায়। য়ুরোপীয় দর্শন এ পর্য্যন্ত না গিয়া থাকিলেও, ধর্ম্ম, পুণ্য ও চারিত্র-গৌরবের মহিমা যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পরমার্থচিন্তা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সুফল প্রসব না করিয়া অনুকরণ বা অনুবৃত্তির আশ্রয় লইল। প্রাচীন মনীষিগণের উক্তি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া লোকে মানিয়া লইতে লাগিল। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহারই সমর্থন করিতে লাগিলেন, প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও তাহার কূটনীতি লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে, আক্রমণ হইতে প্রচলিত ধর্ম্মকে (church) রক্ষা করাই দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। স্বাধীনচিন্তা তিরোহিত হইল, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ক্রমশই লোপ প্রাপ্ত হইল, প্রতিভা সঙ্কুচিত অথবা অপব্যয়িত হইতে লাগিল, এবং বিজ্ঞানও দর্শন রুদ্ধস্রোতপল্বলের ন্যায় বিকাশ ও প্রসার বিবর্জ্জিত হইয়া নিতান্তই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

আমাদের দেশেও এমন একটা যুগ আসিয়াছিল—যখন প্রাচীন মনীষিগণের অতি সামান্য সামান্য উক্তিগুলি পর্য্যন্ত সমর্থন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করাই পণ্ডিতদিগের একমাত্র কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন কোনও প্রাচীন উক্তির দোহাই দিয়া সামান্য মতটুকু পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে পাণ্ডিত্যের অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইত। এইরূপে স্বাধীন চিন্তা এদেশ হইতেও এক সময়ে লোপ পাইয়াছিল। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার নামক প্রবন্ধে এইরূপ সময়ের একখানি ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সহিত সমস্ত বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও, ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত নহে যে, শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমস্ত ভারতীয় প্রতিভা প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন হইতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে বিলীন হইয়াছিল। ভারতের পক্ষে সে যুগ —সে তমিস্র যুগ—সে অন্ধ অলস নির্ভরের যুগ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া একটা অমঙ্গল-গ্রহের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। য়ুরোপীয় অসাড়তা একটা প্রবল ধাক্কায় চৈতন্য লাভ করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন কনষ্টাণ্টিনোপল তুরকীদিগের হস্তে পতিত হয়, মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসে সে একটি স্মরণীয় দিন। সেই সামান্য ঘটনা হইতে একটি অতি বিপুলশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল —যাহা ক্রমে সমস্ত য়ুরোপের বহু শতাব্দীর অবসাদকে দূর করিয়া দিয়া নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই নূতন অভ্যুত্থানকে Renaissance বা জ্ঞানের পুনরভ্যুত্থান বলে। কিছু দিন পরে মার্টিন লুথার

ধর্ম্মসংস্কার (Reformation) প্রবর্ত্তিত করিয়া উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেন। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রচলিত ধর্ম্মের আওতায় থাকিয়া জ্ঞানের তরু আর মুঞ্জরিত হইতে পারিতেছিল না। সেই ধর্ম্মের বিস্তৃত শাখাপল্লব যখন সংস্কারের কুঠারে একে একে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল তখন জ্ঞানের বৃক্ষ দিব্যালোক পাইয়া বিস্ময়কর ক্ষিপ্রত্বের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারই ফল প্রসূন জগতের নয়নমন সার্থক করিতেছে, তাহারই অমিয়বারি মানবের জ্ঞানপিপাসা মিটাইতেছে। পুনরভ্যুত্থান ও সংস্কারের ফলে অন্ধনির্ভর চলিয়া গেল। মানব তাহার নিজের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পাইল, স্বাধীনচিন্তা জ্ঞান ও ধর্ম্মে, দর্শন ও সাহিত্যে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। সেই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের বাক্য হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূচনা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানই শক্তি"। প্রকৃতির উপর প্রভুত্বস্থাপনই জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। এই উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তনের ফলে অল্পকালের মধ্যে যে অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। "জ্ঞানই ধর্ম্ম" এই দৈব ভাব হইতে "জ্ঞানই শক্তি" এই সম্পূর্ণ মানবীয় ভাবে আসিতে অনেক যুগ কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানবমহিমার এই গুপ্তমন্ত্র জগতে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছে—মানব নিত্য জগতের নূতন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লইতেছে, আকাশের বিদ্যুৎ হইতে ভূগর্ভের কঙ্কর পর্য্যন্ত ক্রীতদাসের ন্যায় বিজয়ীর প্রয়োজন সাধন করিয়া দিতেছে।

ভারতীয় সভ্যতা পূর্ব্ব গৌরবের ভারে অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন আদর্শ হইতে ক্রমে দূর হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়া ইহার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক ও পরিম্লান হইয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্রলক্ষ্যীভূত মুক্তি আর মানবের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতে সমর্থ হইল না। নিশ্রেয়স অধিগমের জন্য —নির্ব্বাণের জন্য—আর কেহ ব্যাকুল হইল না। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ। সংসারের দুঃখদৈন্য, ব্যাধিমৃত্যু নাগপাশের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবজীবনকে চতুর্দ্দিক হইতে আবদ্ধ করিয়াছে, এই দুঃখময় জীবনে যে সামান্য সুখের আবির্ভাব হয়, তাহা মরীচিকার মত সহসা বিলীন হইয়া যায়—রাখিয়া যায় চিরন্তন দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন কঠোরতা। মানবজীবনের প্রতি এই বৈরাগ্য আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত শক্তিগুলিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। সেকালের শিক্ষা এই সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা বন্ধনের ছেদন সহজসাধ্য নহে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা বহু পরিশ্রম ও সাধনা-সাপেক্ষ। সুতরাং প্রাকৃত জনের পক্ষে সহজ পন্থা সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। স্বর্গ তাহার বিবিধ বিভাগ লইয়া পারলৌকিক সুখের আগার বলিয়া প্রতিভাত হইল। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বাহুল্য হইল। যাগাদি কর্ম্ম জ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়া লইল। বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি-

বাদ করিয়া অপর দিকে স্রোত ফিরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কর্ম্মের বিস্তৃত আবরণকে ভেদ করিয়া আত্মোন্নতির পন্থা আবিষ্কার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাব য়ুরোপীয় পুনরভ্যুত্থানের ন্যায় ভারতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে এক সুমহান্ বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিল। ভারতের সে যুগকে হিরণ্ময় যুগ (Golden age) বলা যাইতে পারে—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাজত্বে রাষ্ট্রনীতির চরমোৎকর্ষ, প্রজাতন্ত্রের সর্ব্ববিধ উন্নতি,—চারিত্রনীতির সার্ব্বজনীন প্রসার—ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ চিত্র অতুলনীয়। শঙ্করাচার্য্যের প্রাচুর্ভাবে বৌদ্ধাধিকার সঙ্কুচিত হইল কিন্তু এই নূতন যুগের অল্পকাল পরেই ভারতের স্বাধীনতা অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইল। এই পরাধীনতার নিষ্পেষণে ভারতের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপ্রবণত্বকে অবসন্ন ও মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল। যে জাতি জীবনের দুঃখের অংশটাকেই ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল, বহির্ভাগ হইতে আর একটি নূতন দুঃখ আসিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রস্রবণকে একেবারে জমাইয়া দিল—জড়ত্বের মাত্রাকে শেষ সীমায় পৌছাইয়া দিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের ন্যায় ভারতে এই যুগ অজ্ঞানান্ধ এবং সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি পরিস্ফুট ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে মানুষের ব্যক্তিগত ভাব অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি রাজ্যতন্ত্রের জন্য, সমষ্টিবদ্ধ সমাজের জন্যই কর্ম্ম করিত। সাধারণতন্ত্র হইতে তাহার কোনও স্বকীয় অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারিত না। গ্রীকসভ্যতার মূলে আত্মোৎসর্গের এইরূপ একটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে প্রচলিত ধর্ম্ম বা church-এর দাসত্বই আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বাড়িতে দেয় নাই। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এই যুগে মানব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধীন, তাহার আপনার ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই। বর্ত্তমান যুগ আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এই নবযুগে সমাজতন্ত্র ও রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানব তাহার নিজ মহিমায় নিজে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাধীনচিন্তা এই যুগের যুগধর্ম্ম। চিন্তার স্রোত বাধাশূন্য হইলে কত বিভিন্ন দিকে উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতে পারে, য়ুরোপীয় বর্ত্তমান যুগ তাহার উদাহরণস্থল।

আমাদের দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার ঠিক এমন একটি ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না, তাহা আমি জানি না। আমার মনে হয় জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ স্বাধীনচিন্তার ক্ষেত্র ছিল। মানব তখন স্বাধীন ও নির্ম্মল অন্তঃকরণে স্ব স্ব ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত হইত। স্বার্থ অপেক্ষা মহত্ত্বের আদর্শকে বরণ করিয়া তাহার সেবায় আত্মাকে উৎসর্গ করিত। কিন্তু জাতিভেদের প্রভাবে জ্ঞান এবং কর্ম্ম ক্রমে কতকগুলি অনুষ্ঠানে পরিণত হইল। কোনও ধর্ম্মবিশেষের বা সাম্প্রদায়িক-মতবিশেষের সমর্থনে জ্ঞান ও কর্ম্ম নিয়োজিত হইল। স্বাধীনচিন্তা অনাবশ্যক হইয়া পড়িল এবং অন্ধবিশ্বাস তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল। ব্যক্তিগত ভাবের আর

বিশেষ অবকাশ রহিল না।

কালের অনন্ত রঙ্গমঞ্চে এইরূপ কতবার কত বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। মানবের জাতীয়জীবনে কত নূতন ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, এবং কত নূতন শক্তির সংঘাতে তাহার ভাগ্য গঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। একই লক্ষ্য অতীতকাল হইতে তাহাকে প্রযোজিত করে নাই। তাহার লক্ষ্য, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার কামনা, তাহাকে কখন কোথায় লইয়া গিয়াছে! কখনও উন্নতির উচ্চ শিখরে, কখন অবনতির অধস্তন সোপানে, কখনও নির্ম্মল বালসুলভ, ক্রীড়াকুতূহলী কল্পনালোকে, কখনও নির্ম্মম কঠোর বাস্তবরাজ্যে, কখনও বৈরাগ্যের উদারতায়, কখনও বিষয়বাসনার সংকীর্ণতায় মানবের নৈতিকজীবন পর্য্যায়ক্রমে বিরাজ করিয়াছে। যে সময়ে মানব যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছে, "শিক্ষা" অগ্রে তাহার সূচনা করিয়াছে। সুতরাং মানবজাতির উন্নতি বা অবনতির ইতিহাস তাহার শিক্ষানীতির মধ্য দিয়াই আপনাকে গঠন করিয়া লইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষানীতি আমাদের দেশে অনুসৃত হইতেছে, তাহা ঠিক আমাদের স্বদেশজাত বলা যায় না। আমাদের আচার, ব্যবহার, ভাষা ও পরিচ্ছদের ন্যায় এই শিক্ষানীতিও সঙ্কর। আমরা পূর্ব্বের আদর্শকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি নাই, অথচ নূতন আদর্শকেও সম্পূর্ণরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি না। শিক্ষা বলিতে আমরা এখনও খুব বড় রকমের একটা জিনিষ বুঝিয়া থাকি। গুরু বা উপদেষ্টা বলিতে এখনও এদেশের লোক সম্ভ্রমে আনত হয়। কিন্তু আমরা যেমন একদিকে অতীত মহত্বের মহিমায় গলিয়া যাই, তেমনি অপরদিকে নূতন আদর্শের প্রখরমধ্যাহ্নকিরণে আমাদের নয়ন ঝলসিয়া যায়। আর আমরা করুণ নয়নে দুই দিকেই চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয়, এ দুইটি প্রতিযোগী স্রোতকে মিশাইয়া আমাদিগের অনুকূল করিয়া লইবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ইংরেজ রাজ যখন এ দেশে সর্ব্বব্যাপী বর্ণাশ্রমবর্জ্জিত শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন মনে হইয়াছিল, দেশের ভাগ্য ফিরিল। কিন্তু এই যে দেশময় বর্ত্তমান শিক্ষার প্রতি একটি অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা কি সেই শিক্ষানীতির সুতীব্র সমালোচনা নহে? ইংরেজী শিক্ষা যে আশানুরূপ মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, সে সেই শিক্ষার সম্পূর্ণ দোষ নহে, দোষ আমাদের। আমরা সে শিক্ষাকে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করি নাই। আমরা অর্থের জন্য দলে দলে এই শিক্ষার আশ্রয় লইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিক্ষা এবং তাহার উদ্দেশ্য হইতে জাতীয় চরিত্র এবং উন্নতির মাত্রা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কেননা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাশক্তি জ্ঞান, এবং শিক্ষা সেই জ্ঞানের সাধিকা। অবস্থাবিপর্য্যয়ে আমাদের আদর্শ অতি সংকীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল—স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই আমরা চাহি নাই, কাজেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি নাই! যাহা নিজে অতি নীচ,

তাহা মহৎ কিছু প্রসব করিতে পারে না। স্বার্থ ঐহিক এবং পারত্রিক কোনও অভীষ্টই মিলাইয়া দিতে পারে না। স্বার্থ যদি ব্যক্তি-বিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র সমাজ বা জাতিতে প্রসারিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহা হইতে অনেক প্রত্যাশা করা যায়, কারণ সে স্বার্থের মধ্যেও পরার্থতা আছে। কিন্তু যে স্বার্থ জাতীয় বা সামাজিক স্বার্থ না হইয়া ব্যক্তিগত আকার ধারণ করে, তাহার পরিণাম শুভাবহ হয় না। আমরা অর্থের জন্য—প্রতিবেশীদিগের উপর প্রভাব স্থাপন করিবার জন্য—বিদ্যা অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে উদ্দেশ্য কেরাণীগিরি বা অন্যান্য চাকরীর দ্বারা যতক্ষণ সংসাধিত হয়, ততক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা চলিয়া যায়, কিন্তু লোকসংখ্যার তুলনায় চাকরী মুষ্টিমেয়, জীবন সংগ্রামের তীব্রতাও দিন দিন বাড়িতেছে, কাযেই অনেক সময় চাকরী যদি বা মিলে, তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। যে উদরান্নের জন্য শিক্ষাকে অবলম্বন, সেই উদরান্নই জুটিল না। কাযেই সর্ব্বত্র অসন্তোষ ও অশান্তির ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে।

আমাদের সর্ব্ববিধ অবস্থা হইতেই বুঝা যায় যে শিক্ষার আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক। যেশিক্ষানীতির অনুসরণ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ভাবে অকর্ম্মণ্য ও নিষ্ফল, ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ মিলিয়া আমাদের এই সঙ্কর রূপ একটা সভ্যতা উৎপন্ন করিয়াছে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পুরোহিত স্বরূপে লর্ড কার্জনও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এ ব্যাধির ঔষধ কি?

অবশ্য যে প্রাচীন সভ্যতা বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সে সভ্যতার দিকে স্বভাবতই লুব্ধ নেত্রে ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হয়। যে আদর্শের মহান্ ভাবে আর্য্যঋষিগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, যে অত্যুচ্চ আদর্শের সাধনায় তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বিধাতার ইচ্ছায় সে উদার উন্নত মহান্ আদর্শ এখনও সময়ে সময়ে ভারতবাসীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহার প্রতিভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া থাকে। কিন্তু গতিশীল জগৎপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমন্বয় করিতে হইলে, আমাদের সে প্রাচীন আদর্শকে তাহার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতা, বর্ত্তমান শিক্ষা যে লক্ষ্য লইয়া চলিতেছে, তাহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। শুধু আত্মার পারলৌকিক আনন্দ, বা মোক্ষ খুঁজিলে চলিবে না, যাহাতে ইহলোকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারা যায়, যাহাতে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, যাহাতে প্রকৃতির উপর আমাদের শক্তি ও প্রভুত্বের বিস্তার হয়, সে শিক্ষাকে অবলম্বন করিতে হইবে।

ইংরেজি সভ্যতার মধ্য দিয়া আমরা এই যে এক নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি, ইহার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্য দিয়া আমরা যে একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের আভাস পাইতেছি, কেমন করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইব, কেমন করিয়া সেই পাশ্চাত্যের

আদর্শকে প্রাচ্য আদর্শের সহিত মিলাইয়া দিয়া স্থির যমুনার সহিত খরস্রোতা জাহ্নবীর অপূর্ব্ব সঙ্গম স্থাপন করিব, ইহাই ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালীর একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে সকল ফল লাভ করিয়াছি, তাহার মধ্যে দুইটি সুফল এই যে, স্বাধীনচিন্তার পুনরভ্যুদয় হইয়াছে এবং মাতৃভাষার আদর হইতেছে। বর্ণ ও ধর্ম্মের কঠিন নিগড়ে যে ভারতীয় চিন্তা এতদিন মূর্চ্ছিত ছিল, তাহা বিভিন্নদিকে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার সুফলও ফলিতে দেখা যাইতেছে।

মাতৃভাষার আদর যে ক্রমশই বাড়িতেছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিরূপে সংক্রামিত হইতেছে, তাহা অদ্যকার এই শুভ সম্মিলন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই যে স্রোত বন্যার মত সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, ইহাকে প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষাকে একটি উচ্চ আসন দিয়া এমন এক শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, অচিরে ইহা আশাতীত সুফল প্রসব করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অসংখ্য যুবককে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া এদেশীয় শিক্ষানীতির একটি মহান্ সংস্কারের সূচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। মাতৃভাষাকে অবলম্বন না করিয়া শিক্ষা ও 'সভ্যতা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, যুরোপেও সে দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগ পর্য্যন্ত লাটিন ভাষার সমাদর ছিল, মাতৃভাষার অর্চ্চনায় যুরোপীয় এই নবযুগের উদ্বোধন হইয়াছিল। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মাণ ভাষায় যে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কেহ আগে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু সেই সকল দেশের মাতৃভাষায় যখন সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইল তখন হইতেই সেই সকল দেশের ভাগ্য ফিরিয়াছিল। এদেশেও মাতৃভাষাই আমাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিবে। মানবমনের পক্ষে মাতৃভাষার ন্যায় এমন স্বাভাবিক, সহজ এবং স্বাস্থ্যকর প্রভাব আর কোন ভাষারই থাকিতে পারে না। মাতৃকণ্ঠের ন্যায় মিষ্ট আর কিছু নাই, এই যে অপূর্ব্ব বন্ধন এতগুলি মানবের মনকে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি অতি অদ্ভুত শক্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার চরম পরিণতি বিধাতার আশীর্ব্বাদে এমন ফল প্রসব করিবে, যাহা মহত্ত্বে ও সম্পদে সমস্ত জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিবে। বর্ত্তমান শিক্ষানীতিতে ইংরেজিকে মুখ্য এবং বাঙ্গালাকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং মাতৃভাষাকে মুখ্য-স্থান প্রদান করিতে হইবে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ ও পরিণতির জন্য এ সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা।

কবিকঙ্কণ বর্ণন করিতেছেন—

প্রথমে ভ্রমরা জলে, শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায় ;
এড়ায়ে ভ্রমরা পাণি, সম্মুখেতে উজাবনি,
কোলগ্রাম এড়াইয়া যায়।
চাকদ কুমার খালা, এড়ায় সাধুর বালা,
ছাড়িয়া কৈল তেয়াগন ;
কাণ্ডার মালুম কাঠে, এড়াইল খানা ঘাটে,
মোহনায় দিল দরশন।
সম্মুখে হোসনপুর, গড়পাড়া কতদূর,
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কাণ্ডার মেলান বায় বাকসা এড়ায়ে যায়,
কাকনায় দিল দরশন।
এড়াইল গঙ্গাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া,
ডাহিনে এড়ায় কোঙরপুর।
কাণ্ডার মেলান বায়, বাঁকুলে এড়ায়ে যায়,
বেলেড়া বাহিল কতদূর।
ছাটার মেলান বায়, চরকি এড়ায়ে যায়,
আঙ্গারপুর বেণিয়ার বালা।
সেনালিয়া নয় গাঁ তাহাত করিল বাঁ,
উত্তরিয়া সাধু গেল কোলা।
সম্মুখে উধনপুর, নওহাটি কতদূর,
শাঁখারি ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পাণি, মহাপুণ্য মনে গণি,
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ।

* * * * * *

ভাণ্ডসিংহের ঘাট খান ডাহিনে এড়ায়ে।
মেটারি সহর খান বামদিকে থুয়ে॥
সঘনে কেরোয়াল পড়ে গেল পড়ে সাট।
নিমিষেক গেল সাধু যোজনেক বাট॥
বেলনপুরের ঘাটখান কৈল তেয়াগন।
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন॥
রজনী বিশ্রামে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায়॥
শীঘ্রগতি মির্জ্জাপুর বাহে ত্বরা ত্বরা।
নাহি মানে সওদাগর বসন্তের খরা॥
নায়ে পাইক গান গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল সহর আম্বুয়া মুলুক॥
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর রহে ডাহিনে গুপ্তিপাড়া।
উলা বাহিয়া যায় কাছিমার পাশে।
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু আসে॥
বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবেণী।
দুকুলের জপতপ কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান॥

* * * * * *

কাণ্ডার বয়ান সাধু করি অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিলা শ্রীপতি॥
নায়ে তুলি সওদাগর নিল মিঠা পাণি।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে ফরমানি॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোঁদল পাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন ন পাড়া॥
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা।
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা॥
উপনীত হৈল গিয়া নিমাই তীর্থের ঘাটে।
নিম্বের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥
ত্বরায় তরণী চলে তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।

সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায় ॥
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা এড়াইয়া যায় ॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে ॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ।
রাজহংস কিনি লৈল আর পারাবত ॥
বারুইঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা ॥
কালীর চরণ পূজা কৈল সওদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর ॥
নাচনগাছার ঘাটখান বাম দিকে থুয়া।
ডাহিনেতে বারাশত খলিনা এড়াইয়া ॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ এড়াইলা অবসান বেলা ॥
ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অমলিঙ্গ গিয়া উত্তরিলা সওদাগর ॥
সঙ্কেত মাধবে সাধু পুজিলা সত্বর।
তাহার মেলানে সাধু পায় হেতেঘর ॥
সেই দিন সওদাগর হাত্যাঘায় রয়।
রজনী প্রভাত হলে মেলি সাত নায় ॥
দুই এক নৌকা জলের মাঝে ভাসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
দূরে শুনে মগরার জলের নিস্বন।
আষাঢ়ের মেঘ যেন করিছে গর্জ্জন ॥
মোহানা বাহিল ডিঙ্গা করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জ্জয় মগরা ॥

* * * * *

প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়ে সওদাগর চলে রাত্রিদিন ॥

দক্ষিণে মেদনীমল্ল বামে হীরথানা।
কেরোয়ালের ঝম ঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥
কলাহাট ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
আঙারপুরের ঘাটখান বামেতে রাখিয়া ॥
গমন করিয়া গেলা বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ॥
কনকরচিত চক্রে রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর ॥
বহিত্র বান্ধিয়া বলে বেণের নন্দন।
এইখানে রহ করি প্রসাদ ভক্ষণ ॥

* * * * *

শ্রীমন্তের নৌকা বিংশতি দিবস অবিরাম গতিতে চলিয়া আজ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিল। এটি উৎকল দেশ, প্রকৃত দ্রাবিড় দেশ নহে। দ্রাবিড়রাজার শাসনাধীন। দ্রাবিড়-নামধেয় স্থানীয় রাজার রাজ্য বলিয়া কবি "প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে" এইরূপ বলিলেন। পরবর্ত্তী "ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, বিশ্ব যার যশ গায়, দ্রাবিড় ভূপাল যশোধন। দক্ষিণ জলধি কূলে, অক্ষয় বটের মূলে, আরাধিল দেব নারায়ণ।"

এই সকল কবিতায় ঐ কথাই প্রকাশ পায়। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীমন্ত এই স্থান হইতে কোন্ দিকে ও কোন্ পথে গমন করেন।

বাহ বাহ বলি যত ডাকেন সওদাগর।
রাত্রি দিন বেয়ে যায় নাহি করে ডর ॥
চিনি কুচিনের ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
রাড়িঘাট বাণপুর বামদিকে থুয়া ॥
ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে ॥

ছাদি কাটাইয়া পার হৈল বুহিতাল।
বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
বহিত্র বাঁধিয়া কিছু বলে সওদাগর।
গান করে পাচালিতে মুকুন্দ কবিবর॥

* *

সেতুবন্ধ সওদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
ত্বরা করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়া॥
চিত্রকূট পর্ব্বত যথা যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানাতে সীতাকুলি প্রবেশে হাড়খান।
তেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার মোহান॥
অলঙ্ঘ্য সাগরে রহিতে নাহি স্থল।
নাবিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল॥
রাত্রি দিন যায় ডিঙ্গা তিলেক না রয়।
উপনীত সদাগর হৈল কালীদয়॥

বোধ হয় সওদাগর শ্রীমন্ত অথবা কবিবর মুকুন্দ সিংহল চিনিতেন না। তাঁহাদের সময়ে স্কুলশিক্ষা ছিল না, তাই তাঁহারা "তেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার মোহান"। লঙ্কা গমনের পথ ছাড়িয়া অনেক দূর গিয়া "পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল।" জলপথের পথিকদিগকে সিংহলের দূরত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্কুলশিক্ষা থাকিলে লঙ্কার মোহানা ছাড়িয়া যাইতেন না। কেননা স্কুলশিক্ষার মতে লঙ্কা ও সিংহল একই স্থান। সুতরাং লঙ্কার মোহানা দিয়াই লঙ্কায় যাইতেন, ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেন না। তাঁহারা জানিতেন, লঙ্কা ও সিংহল দুইটা পৃথক্ দ্বীপ, তদনুসারেই তাঁহারা লঙ্কাগমনের পথ ত্যাগ করিয়া অনেক দূরে গিয়া সিংহলের অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই পার্থক্যজ্ঞান প্রাচীনদিগের জ্ঞানমূলক, শাস্ত্রমূলক। শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, লঙ্কা ও সিংহল পৃথক্ দ্বীপ।

"যে চ সিংহলবাসাশ্চ
যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।
সর্ব্বে তে সমুপাজগ্মুঃ
যুধিষ্ঠির নিবেশনে॥"

মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

"জম্বুদ্বীপস্য চ রাজন্! উপদ্বীপাবষ্টৌ।
তদ্ যথা স্বর্গপ্রস্থশ্চন্দ্র শুক্র আবর্ত্তনো
রমণকো মন্দহরিণঃ সিংহলো লঙ্কেতি।"

ভাগবত।

"স্বর্গপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্রঃ সিংহলাবর্ত্তনৌ তথা।
পঞ্চজন্য স্তথা মন্দহরিণো রমণকাহ্বয়।
লঙ্কেতি কথিতা বিপ্র! জম্বুদ্বীপস্য তেঽন্তরা॥

পদ্মপুরাণ।

"মরুদেশাৎ পূর্ব্ব ভাগে
কামাদ্রের্দক্ষিণে শিবে!
সিংহলাখ্যো মহাদেশঃ
মাঘদেশো ক্রমো ক্রমঃ॥
"লঙ্কা প্রদেশমারভ্য
মাঘান্তং পরমেশ্বরি।
সৌন্দরাখ্যো মহাদেশঃ
পর্ব্বতে তিষ্ঠতি প্রিয়ে॥"

শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র।

দেশভেদে কৃষিফলাফল-বিজ্ঞাপক জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত কূর্ম্মচক্রনামে একপ্রকার গণনাক্রম বিধান আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কূর্ম্মচক্র গজ দক্ষিণস্থ দেশ এই—

দক্ষিণেঽবন্তি মাহেন্দ্র মলয়া ঋষ্যমূককাঃ
চিত্রকূট মহারণ্য কাঞ্চী সিংহল কোঙ্কণাঃ।
কাবেরী তাম্রপর্ণীচ লঙ্কা ত্রিকূটকাদয়ঃ॥

লঙ্কা ও সিংহল এতদুভয়ের পার্থক্যবোধক

এইরূপ আরও অনেক প্রাচীন উক্তি আছে। সে সকল প্রাচীন উক্তি সত্বেও আমরা সিংহলের প্রাচীন নাম লঙ্কা এইরূপ মনে করি। এখন আমরা রামসেতুর সমস্ত্রে কিয়দ্দূর দক্ষিণে সিলোন-নামক একটা বৃহৎ দ্বীপ দেখিতে পাই। সুতরাং মনে করি, এই সিলোনই প্রাচীন লঙ্কা। এই লঙ্কাকে আমরা সিংহল মনে করি কেন? তাহা বলিতেছি।

বৌদ্ধদিগের একটা পুস্তক আছে, তাহার নাম মহাবংশ। যাঁহারা ভাবেন, লঙ্কা ও সিংহল এক, তাঁহারাই ঐ মহাবংশ হইতে এইরূপ একটি পালিভাষার বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

"সীহবাহু নরিন্দসো যেন সীহং লমায়সো।
তেন তৎসম্ভ জানত্তা সীহলাতি পযুচ্চরে॥
সীহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা।
তেনেব সীহলং নাম সন্নিতং সীহলস্ত তা॥"

বাক্যটির এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াও থাকেন।

"সিংহবাহু রাজা সিংহ বধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু তাহার পুত্রগণ সিংহল বলিয়া উল্লিখিত হয়। সিংহলেরা এই লঙ্কা গ্রহণ করিয়া বসবাস করিয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম সিংহল হইয়াছে।"

উল্লিখিত পালি-বাক্যটি যথাযথ সন্দর্ভে উদ্ধৃত কিনা, অনুবাদটিও ঠিক কি না, তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই। করিবার প্রয়োজনও দৃষ্ট হয় না। যদি কখন সিংহবাহু রাজার ও তদীয় পুত্রগণের লঙ্কা গ্রহণের কাল নির্ণয় হয় তাহা হইলে ঐ পালি-বাক্যের বিচার প্রয়োজনে আসিবে, নচেৎ উহা চিরকালই উপকথার ন্যায় উপেক্ষিত থাকিবে। সিংহবাহু রাজার পুত্রগণ এতদ্দেশীয় ব্যাসাদি ঋষিবৃন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে এবং ব্যাসাদি ঋষিবৃন্দের পূর্ব্বে লঙ্কা সিংহল আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলে ব্যাসাদি ঋষিদিগের গ্রন্থে লঙ্কা সিংহলের প্রাগুক্ত প্রকারের পার্থক্য প্রয়োগ হইত না, এবং হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। যদি এমন হয় যে, মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রাদুর্ভাবের পরে লঙ্কা সিংহল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের অবশ্যই মহাভারতাদি গ্রন্থোক্ত সিংহলের অস্তিত্ব এক্ষণ কোথায়, অর্থাৎ সে সিংহল এখন কোথায়, তাহা অনুসন্ধেয় হইবে। সে সিংহল কি এখন নামান্তরে বিরাজ করিতেছে, কি অজ্ঞাত রহিয়াছে, জানিবার জন্য মাঝে মাঝে কৌতুক উদ্দীপ্ত হয়; পরন্ত কৌতুক চরিতার্থের কোন উপায় পাওয়া যায় না।

রামায়ণের বর্ণনা—রামসেতুর দক্ষিণপ্রান্ত লঙ্কাসংলগ্ন। প্রত্যাগমনকালে লক্ষণ লঙ্কার নিকটস্থ কতক অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য রামসেতুর দক্ষিণ প্রান্তের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফাঁক; তৎপরে লঙ্কা। আধুনিক ভৌগোলিক চিত্রেও দেখা যায়—রামসেতুর দক্ষিণপ্রান্তের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফাঁক, তৎপরে সিলোন। সুতরাং সিলোনই পূর্ব্বকালের লঙ্কা। এবং ক্রমে সিলোনকে লঙ্কা বলা যাইতে পারে বটে, পরন্ত উহাকে সিংহল বলিতে গেলে সমুদায় প্রাচীন লিপি—সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্র অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত লঙ্কা-সিংহলের পার্থক্য মিথ্যাবাদে পর্য্যবসন্ন হয়। অন্য শাস্ত্র মিথ্যা হয় হউক, জ্যোতিঃশাস্ত্রকে

মিথ্যাবাদী বলিতে আমরা ইত হই। জ্যাতিঃশাস্ত্র বলিয়াছেন—

"দক্ষিণেহ বস্তি মাহেন্দ্রী মলয়া ঋষ্যমূককাঃ।
চিত্রকূট মহারণ্য কাঞ্চী সিংহল কোঙ্কণাঃ।
কাবেরী তাম্রপর্ণী চ লঙ্কা ত্রিকূটকাদয়ঃ॥"

এই বচনে লঙ্কা-সিংহলের পার্থক্য বিস্পষ্ট। মুকুন্দ কবিও ধনপতি সওদাগরকে লঙ্কা গমনের পথ অতিক্রম করিয়া সিংহলে লইয়া গিয়াছেন।

"সেতুবন্ধ সওদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সওদাগর বহিত্র বাহিয়া॥
ত্রিকূট পর্ব্বত যথা যক্ষরাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানাতে সীতাকুলি প্রবেশে হাড়খান।
ত্যাগ করি গেলা সাধু লঙ্কার মোহান॥"

এ সকল কথা পাঠ করিলে মনে হয়, সেই প্রাচীন সিংহল ইদানীং অন্য কোন নামে প্রখ্যাত বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ইদানীন্তন ভৌগোলিক চিত্রে দেখা যায়, সিলোনের উত্তরে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র, তদুত্তরে রামসেতু। পরন্তু রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে এইরূপ বুঝা যায় যে, লঙ্কার উত্তরে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র, তদুত্তরে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত ভগ্ন সেতুখণ্ড, তদুত্তরে পুনঃ সমুদ্র, তদুত্তরে বর্ত্তমান রামসেতু। প্রত্যাগমন কালে লক্ষ্মণ কর্তৃক রামসেতু তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার একখণ্ড তিন যোজন, আর একখণ্ড চারি যোজন, অপর একখণ্ড দ্বাদশ যোজন। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, লঙ্কার উত্তরে কিয়দ্দূর সমুদ্র, তদুত্তরে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ভগ্ন সেতুখণ্ড, এই সেতুখণ্ডই কালের পরিবর্ত্তনে ক্রমে দ্বীপসদৃশ জলাবাস হইয়া সিলোন নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

ভ্রমণকারীরা সিলোনের যেরূপ ভৌম প্রকৃতি বর্ণনা করেন, রামায়ণোক্ত লঙ্কার ভৌম প্রকৃতি সেরূপ নহে। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, লঙ্কা একটি পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। কোন এক সময়ে ত্রিকূট নামধেয় পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গ সমুদ্রগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কালান্তরে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সেই ত্রিকূটশিখরোপরি লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করেন। ইহার সর্ব্বদিকে সুবেল নামধেয় উর্দ্ধ পর্ব্বতের দ্বারা মধ্যস্থলে বেষ্টিত লঙ্কা নগরী। কোনও পর্য্যটক এমন কথা বলেন না যে, সিলোনের ভৌম প্রকৃতি বা সর্ব্বাঙ্গ প্রস্তরময়। কোনও ভ্রমণকারী এমন কথা বলেন না যে, সিলোনের সর্ব্বদিক্ পর্ব্বতাবৃত। কিন্তু রামায়ণ বলেন, লঙ্কা পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত ও পর্ব্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত; সেইজন্য ইহার সর্ব্বদিক্ পর্ব্বত-পরিবৃত, সেইজন্য ইহার নাম লঙ্কা-দুর্গ।

"দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবেল ইতিচাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরঃ।
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যামম্বুদ সন্নিভে।
আকুলৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কাদ্দীন্ন চতুর্দ্দিশি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা।
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্ম্মিতা॥"

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড।

যুদ্ধকাণ্ডেও এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা—

"শিখরস্ত ত্রিকূটস্য প্রাংশুমেবং দিবিচ্ছদাম্
সমন্তাৎ পুষ্পসংচ্ছন্নং মহারজতসন্নিভং।
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্

নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা।
দশযোজনবিস্তীর্ণা বিংশযোজনসমায়তা।
ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান সিলোনের ক্ষেত্রফল ও রামায়ণোক্ত লঙ্কার ক্ষেত্রফল এক বা অভিন্ন হইতেছে না।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বিস্মৃত জনপদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যগ্রহণ।

ইহা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয় যে, যেমন ইংলণ্ডে তেমনি ভারতবর্ষে ঠিক একই সময়ে দুই জন শক্তিশালী নরপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ধন, জন ও বিপুল সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৫০৯ খৃঃ অব্দ তাই এই কারণে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অতি স্মরণীয় বর্ষ। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রি ১৫০৯ খৃঃ অব্দের ২২ এপ্রিল তারিখে রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও সেই বর্ষেই বিজয়নগরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাম্পি নগরের পম্পাপতি দেবমন্দিরে প্রাপ্ত ফলকলিপি হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে তথায় একটি রাজসভা ও সমুন্নত বিজয়-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই শিলাফলকে লিখিত কাল ভ্রমাত্মক বলিয়া কোনো কোনো ঐতিহাসিক অনুমান করিয়া থাকেন। সে ভ্রম মারাত্মক নহে, কারণ এক হিসাবে গণনা করিলে কৃষ্ণদেবের সিংহাসনারোহণ কাল ১৫১০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে হয়, এবং অন্য হিসাবে ১৫০৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পড়ে। অষ্টম হেন্‌রি ১৫০৯ খৃঃ অব্দে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কৃষ্ণদেব রায়ের সমসাময়িক বলিতে কোনো বাধা দেখি না।

পর্ত্তুগীজ নুনিজ কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসন প্রাপ্তির যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আর কোথাও দেখা যায় না। নুনিজ লিখিয়াছেন, বিজয়নগরপতি বিরূপাক্ষপুত্র যখন নরসিংহের ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন, তখন তিনিই বিজয়নগরের নৃপতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি ৪৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে দুইটি অল্পবয়স্ক রাজকুমার বর্ত্তমান ছিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী নৃপতি তাই মন্ত্রী নরসনায়কের হস্তে রাজ্য ও রাজকুমারদ্বয়কে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে গমন করিলেন। মন্ত্রী রাজ্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই সিংহাসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন এবং প্রভুর পুত্রদ্বয়কে প্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। তাঁহার পুত্র বাসব রায় (নুনিজ লিখিয়াছেন Busbalrao) পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ছয় বর্ষ মাত্র

জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই ছয় বর্ষ তাঁহাকে শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব দমন করিতেই ক্ষেপণ করিতে হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-বিখ্যাত শলুভটিম্ম তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিজয়নগরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে না করিতেই বাসব রায়ের সমস্ত ফুরাইয়া আসিল। মৃত্যু আসিয়া কেশাগ্র ধারণ করিয়াছে দেখিয়া তিনি মন্ত্রী শলুভটিম্মকে শয়নকক্ষে আহ্বান করিয়া কহিলেন 'আমার এই অষ্টমবর্ষীয় ক্ষুদ্র শিশু রহিল, ইহাকে দেখিও—আমার মৃত্যুর পর ইহারই শিরে রাজমুকুট স্থাপিত করিও।' ভ্রাতা কৃষ্ণদেব বর্ত্তমান আছে, এখনই তাহার নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া আন, আমি তাহাকে অন্ধ ও অক্ষম দেখিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গমন করি।'

শলুভটিম্ম রাজপুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন; আসিয়াই কৃষ্ণদেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইয়া অশ্বশালার একটি নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া কহিলেন 'রাজার আদেশ, আপনার নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া রাজকুমারের পথ কণ্টকমুক্ত করিতে হইবে।'

কৃষ্ণদেব চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—আমিত কখনো রাজ্য চাহি নাই—রাজ্যের ধূলিকণা পর্য্যন্তও আমি চাহি না। ন্যায় ধর্ম্ম অনুসারে এ রাজ্যে যদিও আমারই অধিকার, কিন্তু আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। রাজ্য বা রাজপদ আমার আর কার্য্য নহে, আমি কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় কাল কাটাইব মনে করিয়াছি—আমি যোগী হইব। মন্ত্রী, আমি ত রাজকুমারের পথের কণ্টক নহি, তুমি ক্ষমা কর, আমাকে অন্ধ করিও না।

শলুভটিম্ম বিচক্ষণ ছিলেন; তিনি দেখিলেন রাজকুমার সামান্য বালকমাত্র, রাজদণ্ড ধারণে একান্ত অক্ষম, আর রাজভ্রাতা পূর্ণবয়স্ক, তাঁহার বদনে প্রতিভার রেখা বিদ্যমান, নয়নে বিশ্ববিজয়ীর তীব্র অনলশিখা, তাঁহার বচনে রাজোচিত গাম্ভীর্য্য। শলুভটিম্মের দয়া হইল। তিনি একটি মেষের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া মরণোন্মুখ নৃপতিকে দেখাইতে লইয়া চলিলেন, কৃষ্ণদেব লুক্কায়িত রহিলেন। রাজকক্ষে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরেই বাসব রায়ের মৃত্যু ঘটিল। শলুভটিম্ম সেই শূন্য সিংহাসনে কৃষ্ণদেবকে স্থাপিত করিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন শুনিয়া সাম্রাজ্যে আনন্দস্রোত বহিল। তিনি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সম্ভবতঃ চক্রী শলুভটিম্মের পরামর্শে রাজকুমার ও তাঁহার তিনটি ভ্রাতাকে দৃঢ় দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন। এইরূপে আপনাকে কণ্টকমুক্ত করিয়া কৃষ্ণদেব রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া লইতে লাগিলেন এবং রাজকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণদেব শুধু নামে নহে, কার্য্যেও প্রকৃত নৃপতিই ছিলেন, তাই বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ সহস্রমুখে তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছেন। * যদি তাঁহাদের রচিত

* Krishna Dev was not only monarch *de jure*, but was in very practical fact an absolute sovereign of extensive power and strong personal influence.—Sewell.

ইতিহাস না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সেকালের এই ভারতবিখ্যাত অসাধারণ-ধীসম্পন্ন, দৃঢ়মতি হিন্দু নৃপতির নামও শুনিতে পাইতাম না, কারণ ঐতিহাসিক ফেরিস্তা তাঁহার বিপুল গ্রন্থে কৃষ্ণদেবের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই! ইহাকে কি আমরা সেই বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের অনিচ্ছাকৃত ভ্রম বলিয়া মনে করিব?

পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক কহিয়াছেন,—কৃষ্ণদেব গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, সুশ্রী ও অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে বসন্তের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি সদানন্দ, সদা হাস্যময় ও সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বৈদেশিক অতিথি-দিগকে তিনি সর্ব্বদা সম্মান করিতেন। নিজের নিকটে ডাকিয়া লইয়া সর্ব্বদা তাঁহা-দের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তবে অকস্মাৎ মধ্যে মধ্যে তাহাকে ক্রোধ করিতে দেখা যাইত। অগণিত ধনরাশি, বিপুল বাহিনী, সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, এসকলই তাঁহার ছিল বলিয়া তিনি রাজাধিরাজ বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাহার ন্যায় একজন নৃপতির যেন ধন জন সাম্রাজ্য আরো অধিক থাকিলে ভালো হইত। ....তিনি প্রত্যহ উষায় জিঞ্জেলি তৈল (?) পান ও অঙ্গে অনুলেপন করিতেন * এবং ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্রে কটিদেশ মাত্র আবৃত করিয়া † মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গুরুভার মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম করি-তেন। ব্যায়ামান্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া ক্রীড়া করিতেন এবং শেষে সুবিখ্যাত কুস্তিগীরদিগের সহিত মল্লক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। এইরূপে পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি অবিলম্বে অশ্বারোহণ করিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নান করিতেন। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে স্নান করাইত। রাজা এই ব্রাহ্মণকে বড় ভক্তি করিতেন। স্নানান্তে শুচি হইয়া তিনি দেবমন্দিরে গমন পূর্ব্বক নিত্য পূজাদি সম্পন্ন করিতেন।

স্নান ও পূজান্তে নৃপতি একটি উন্মুক্ত সুচিত্রিত গম্বুজাকৃতি কক্ষমধ্যে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য করিতেন। কক্ষের বিশাল স্তম্ভাবলী ছাদ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত দীর্ঘ বস্ত্র-খণ্ডে সমাবৃত থাকিয়া শোভা পাইত। কক্ষের পুরোভাগে দুইটি সুগঠিত নারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপ একটি কক্ষে প্রতিদিবসের রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। রাজ-অমাত্যগণ এইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া রাজ-কার্য্যের সহায়তা করিতেন। রাজ্যের প্রধান নায়কগণ অদূরে মৌনে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষা করিতেন।

রাজা কৃষ্ণদেব তৎকালীন ভারতের হিন্দুর গৌরবভূমির একচ্ছত্র নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি সেই সময়েই পূর্ব্বকথিত রাজ-সভা এবং বিজয়গম্বুজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কেহ বা বলেন রাজমুকুট গ্রহণের কিছুকাল পর উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

---

* Narrative of Paes.

† এখন আমরা যাহাকে "লেঙ্গট" বলি তাহাই কি?

দেখিতে দেখিতে সমস্ত দাক্ষিণাত্য রাজা কৃষ্ণদেবের নিকট অবনতশির হইয়াছিল. সেরিঙ্গাপট্টম্ (শ্রীরঙ্গপত্তন) জনৈক মহারাষ্ট্র স্বাধীন নৃপতির বঙ্কাপুর, গার্সোপা কালিকট, ভাটকল, বরকুর প্রভৃতি সমস্তই বিজয়নগরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

তাঁহার রাজ্যশাসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ আল্‌মিদা ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহের বড়কর্ত্তা স্বরূপ অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ১৫০৯ খৃঃ অব্দে আল্‌বুকার্ক আল্‌মিদার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময় আল্‌বুকার্কের সহিত কালিকটের সাবুরীরাজের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সাবুরীরাজ বিজয় লাভ করিলেন। আল্‌বুকার্ক অনন্যোপায় হইয়া রাজা কৃষ্ণদেবের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, আমার নৃপতির আদেশে আমি শুধু মুর (মুসলমান) বণিকদিগকেই উৎখাত করিতে আসিয়াছি, হিন্দুর সহিত আমার শত্রুতা নাই। আপনি ইচ্ছা করিলেই আমি নৌসৈন্য লইয়া কালিকট আক্রমণ করিব আপনি উহা জয় করুন। কালিকট জয় করিতে পারিলেই আমি মুসলমান বণিকদিগকে বিদূরিত করিব এবং আপনার চিরশত্রু দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে আপনার সহায়তা করিব। আমি আরো কহিতেছি যে, আর কখনো বিজাপুরে আরব বা পারশীক অশ্ব প্রেরণ করিব না। সে সকল অশ্ব শুধু আপনার জন্যই থাকিবে।

রাজা কৃষ্ণদেব রায় বোধ হয় তখনো আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিয়াছিলেন না, তাই আল্‌বুকার্কের প্রস্তাবে কোনো উত্তর দিলেন না। আদিলশাহ তখন গোয়ার অধিকারী। আল্‌বুকার্ক গোয়া আক্রমণ করিলেন এবং গ্যাস্পার চানোকা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজকে বিজয়নগরের রাজসভায় প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, ভাটকালে পর্ত্তুগীজদিগকে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদত্ত হউক। কিছুকাল পূর্ব্বে আল্‌মিদাও এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় তৎ পূর্ব্বেই আদিল শাহের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

এই সন্ধি যে বিনা কারণে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অনুমান হয় না। আল্‌বুকার্ক ইতি পূর্ব্বেই (১৫১০ খৃঃ অব্দে) আদিলশাহের গোয়া জয় করিয়াছিলেন। আদিলশাহ গোয়ার পুনরুদ্ধারেও যত্নবান ছিলেন। আদিলশাহ বিজয়নগরের চিরশত্রু—কিন্তু কৃষ্ণদেব পর্ত্তুগীজদিগকেও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তাই মনে করিলেন আদিলশাহে ও আল্‌বুকার্কে যদি পুনরায় যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার সাহায্য না পাইলে পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত হইবে। কিন্তু যখন দূতমুখে শুনিলেন যে আল্‌বুকার্ক গোয়ার অধিকারী হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া আদিলশাহের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। শত্রুনিপাতই কৃষ্ণদেবের একমাত্র কামনা ছিল। যাহা হউক এই প্রস্তাবিত সাহায্য প্রদান করিবার আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ নাই। মুসলমান সৈন্যগণ নিজ বাহুবলে গোয়া

আক্রমণ করিয়া ভীষণ যুদ্ধের পর উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। পরাজিত আল্‌বুকার্ক ক্রোধে ও অপমানে দয়ামায়া বিস্মৃত হইয়া গোয়ার দেড়শত সম্ভ্রান্ত মুসলমান নাগরিককে বিনাপরাধে নিহত করিয়া পলায়ন করিলেন! তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ পৈশাচিকতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না!

ইস্মাইল আদিল গোয়া জয় করিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন রক্ষা করিতে পারিলেন না। ছয় মাস যাইতে না যাইতেই বিজাপুরে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেনাপতি রসুলখাঁর হস্তে গোয়ানগরী সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিজাপুরে যাইতে হইল। আল্‌বুকার্ক অবসর বুঝিয়া অষ্ট-সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে রসুলখাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং বালক যুবক বৃদ্ধ কিছু না মানিয়া ছয় সহস্র শির ভূমিতলে করিলেন—মুসলমানের রুধিরে গোয়ানগর আরক্ত হইয়া উঠিল! আল্‌বুকার্কের জয় হইল।

কৃষ্ণদেব যখন এই বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন নিজেই গোয়ায় দূত প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধাশ্ব সংগ্রহ করিতে তখন তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। সমুদ্রতীরে দুই চারিটি জনপদ অধিকার করিয়া রাজ্য-বিস্তৃতির জন্য তিনি তখন ব্যগ্র ছিলেন না। আদিলশাহের সহিত যে প্রাণান্ত কলহ চলিতেছিল, সেই ভীষণ কলহে জয় লাভ করিবার জন্য যুদ্ধাশ্ব তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আল্‌বুকার্ককে তুষ্ট করিবারও প্রয়োজন হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব তাই আল্‌বুকার্কের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং ভট্টকলে পর্ত্তুগীজ দুর্গ গঠন করিবারও অনুমতি দিলেন।

দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ তখন সকলেই গোয়ার দিকে চাহিয়াছিলেন। মুসলমান আদিলশাহ কি পর্ত্তুগীজ আল্‌বুকার্ক কে গোয়ানগর অধিকার করিয়া লয়—বাণিজ্য-লক্ষ্মী, বিজয়শ্রী কাহার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন সমগ্র দাক্ষিণাত্য তখন ব্যাকুল চিত্তে তাহাই দেখিতেছিল; সকলেই দেখিল মুসলমানের শক্তি চূর্ণিত হইয়াছে—বৈদেশিক বণিক তখন বিজয় গর্ব্বে উল্লসিত—আল্‌বুকার্ক তখন সেই গর্ব্বিত উল্লসিত নৃশংস সৈনিকদিগের জয়োন্মত্ত নায়ক। বঙ্কাপুরের নরপতি আর কাল বিলম্ব না করিয়া আল্‌বুকার্কের সহিত সখ্য করিলেন, অশ্ব চাহিলেন, সাহায্য চাহিলেন। আল্‌বুকার্ক চতুর ছিলেন। তিনি দেখিলেন বিজয়নগর গমনের পথেই বঙ্কাপুর, সুতরাং তাহার অধিপতির সহিত মিত্রতা থাকিলে ভবিষ্যতে উপকার হইতে পারে; তিনি আরো দেখিলেন বঙ্কাপুরে ঘোড়ার জিন প্রস্তুত করিতে অভিজ্ঞ লোকের অভাব নাই। বঙ্কাপুরপতির প্রার্থনা তাই অবিলম্বে পূর্ণ হইল। এদিকে বিজাপুরের সুলতানও আল্‌বুকার্কের নিকট অশ্ব চাহিতে লাগিলেন। বিজয়নগরের প্রার্থনা ত ছিলই। আল্‌বুকার্ক মুসলমান নৃপতিকে দিন কতক স্তোভবাক্যে ভুলাইয়া শেষে বিজয়নগরেই অশ্ব প্রেরণ করিতে চাহিলেন।

কিছুদিন পর কৃষ্ণদেব কহিলেন আমি দেড়লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি, আরব ও

পারশিক অশ্ব শুধু আমাকেই প্রদত্ত হউক। আলবুকার্ক তখন ক্রমেই নিজের অবস্থা বুঝিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অশ্ব ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের রাজশক্তির চলিবে না—বাণিজ্যপথ তখন তাঁহার হস্তে। তিনি সাহসে ভর করিয়া বিজয়নগরের প্রার্থনায় অসম্মতি প্রকাশ করিলেন!

কিছুকাল পর রাজা কৃষ্ণদেব পুনরায় আলবুকার্ককে জানাইলেন—'আমি অর্থ দিতেছি, সমুদায় অশ্ব আমিই চাহি। সত্বরেই আদিলশাহের সহিত আমার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।' আদিলশাহও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও আপনার প্রস্তাব দূতমুখে আলবুকার্কের নিকট প্রেরণ করিলেন। আলবুকার্ক দেখিলেন তাঁহার শক্তি তখন দাক্ষিণাত্যে অক্ষুণ্ণ হইয়াছে—কি বিজয়নগর—কি বিজাপুর সমস্তই তখন তাহারই মুষ্টি মধ্যে নিবদ্ধ! তিনি বিজয়নগরে লিখিলেন 'আরো অধিক অর্থ চাই। বর্ষে বর্ষে ত্রিশ সহস্র 'ক্রুজাডস্' না দিলে অশ্ব দিব না। অশ্ব গোয়া হইতে লইয়া যাইতে হইবে—বিজয়নগরে প্রেরণ করিতে ত পারিবও না।' আলবুকার্ক বণিক ছিলেন —তাই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিলেন—অর্থ পাইলে যুদ্ধেও সাহায্য করিতে পারি। এদিকে আবার বিজাপুরকে জানাইলেন 'সমুদায় অশ্বই আপনার—বিজয়নগরে একটিও যাইবে না। আমি যে ক্ষুদ্র জনপদটি চাহিয়াছি তাহা আমাকে দান করুন।' ধন্য আলবুকার্ক! ধন্য বণিক্‌নীতি!

আলবুকার্কের কোন বাসনাই পূর্ণ হইল না, কারণ অবিলম্বে শমন তাঁহাকে স্মরণ করিল—চাতুরি পরাজিত হইল।

যখন এই সকল ঘটে, সেই সময়ে দুয়ার্ত্তে বার্বোস নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ বিজয়নগর সন্দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন।

বিজয়নগর অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। ইহার একদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর অন্যদিকে খরস্রোতা তরঙ্গিণী এবং আর একদিকে উচ্চ শৈলমালা। নগরটি সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। ....নগরে সুন্দর সুন্দর বৃহৎ প্রাসাদের অভাব নাই। ধনাঢ্য রাজকর্ম্মচারী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদিগের সুবৃহৎ অট্টালিকা নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অন্যান্য গৃহগুলির ছাদ খড়ের। রাজপথসমূহ অতিশয় বিস্তীর্ণ—সাধারণ উদ্যানগুলিও সুবৃহৎ। নানা দেশের নানা জাতির লোকে সে সকল রাজবর্ত্ম ও উদ্যান সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। ....এই নগরে সংখ্যাতীত পণ্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। পেগু এবং লঙ্কা হইতে আনীত বহুমূল্য প্রস্তরাদি ও এই দেশের হীরকাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে। ....অর্মাজের ও কায়েলের (Cael) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মুক্তাদিও এস্থানে বহুপরিমাণে পাওয়া যায়......... প্রবাল, রেশম, রক্তবর্ণবস্ত্র—বুটাদার রেশমীবস্ত্র প্রভৃতিও যথেষ্ট মিলে। .... সর্ব্বদাই নয় শত হস্তী ও বিংশ সহস্র অশ্ব নৃপতির অধীনে সজ্জিত থাকে। এই সকল অশ্ব ও হস্তী তিনি নিজের অর্থে ক্রয় করিয়াছেন। ....তাঁহার অধীনে অশ্বসাদী ও পদাতীকে একলক্ষ যোদ্ধৃপুরুষ আছে। তাহারা সকলেই বেতনভোগী। (ক্রমশ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মহাভারত।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত

যুধিষ্ঠির।

১। ধর্ম্মরাজ যমদেবের ঔরসে পাণ্ডু-রাজপত্নী পৃথাদেবীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। (মহা ১।১২৩)

২। ভ্রাতৃগণ মধ্যে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের প্রিয়তম ছিলেন। (মহা ১০.১২)

৩। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (মহা ১।১৪১)

৪। কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ অন্তে কৃষ্ণা সহ পাণ্ডুপুত্রেরা হস্তিনানগরে উপনীত হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে যাত্রা করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। পাণ্ডবগণ তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। (মহা ১।২০৭)

৫। যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, শকুনির কপট দুরোদরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাদি দুর্য্যোধন অপহরণ করিল। পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর্ষ অজ্ঞাত বাস নির্দ্দিষ্ট হইল। (মহা ২।৭৫)

৬। যুধিষ্ঠির ঘোর নয়নে নিরীক্ষণ করিলে লোক দগ্ধ করিতে পারিতেন। (১) (মহা ২।৭৮ ; ৫।১৯৬)

৭। যুধিষ্ঠির সতত বিপ্রর্ষি ও মহর্ষিগণকে সানন্দে প্রতিপালন করিতেন। (মহা ৩।১—৩)

৮। স্বর্গরাজ নহুষের শিবিকা ব্রহ্মর্ষিগণ বহন করিতেন। একদা নহুষ রাজপদ দ্বারা শিবিকাবাহক মহর্ষি অগস্ত্যকে স্পর্শ করেন। অগস্ত্য রোষ পরবশে নহুষ স্বর্গচ্যুত ও সর্পযোনি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন। পরে নহুষের অনুনয়ে বরদান করেন যে কিছুকাল পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে তোমার শাপ বিমোচন হইবে। যমুনা নদীর সমীপবর্ত্তী অদ্রিরাজ পর্ব্বতে নহুষ সর্প ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে ধর্ম্মরাজ তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার সমাগমে নহুষ রাজা শাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। (মহা ৩।১৭৬—১৮১)

৯। ইন্দ্রসেন যুধিষ্ঠিরের সারথি ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ নামক পরম সুন্দর মৃদঙ্গদ্বয় শব্দ করিত। (মহা ৩।২৬৮)

১০। যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু ও সত্যবাদী ছিলেন।

১১। "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" এই কপট মিথ্যা বাক্য যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণকে বলিয়াছিলেন। (মহা ৭।১৮৯)

১২। যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কেহ শল্যরাজকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন না। (মহা ৯।৭)

১৩। যুধিষ্ঠির অশ্ব-সারথি-শূন্য রথে অবস্থিত হইয়া হেমদণ্ডমণ্ডিত শক্তি শল্যরাজের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ডমণ্ডিত শক্তি শল্যরাজের বক্ষ ভেদ করিল।

(১) নাহম্ লোকম্ নির্দ্দহেয়ম্ দৃষ্ট্বা ঘোরেণ চক্ষুষা।

শল্যরাজ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। (মহা ৯।১৭)

১৪। যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার স্বভাবসিদ্ধ শিরোমণি স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন। (মহা ১০।১৬)

১৫। গান্ধারী নেত্রনিবদ্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ দিয়া যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। (মহা ১১ ১৫)

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির মধ্যে পশুরাজ সিংহ পাণ্ডুবর্ণ। যথা অরুণ—সিত—হরিত —পাটল—পাণ্ডু—বিচিত্রাঃ।

(জ্যোতিষসার)

সিংহরাশি সূর্য্যগ্রহের গৃহ। এবং সিংহরাশিস্থ সূর্য্যও পাণ্ডুবর্ণ। যথা—পাণ্ডুরঃ পরদি প্রভুঃ।

(কৌর্ম্মপুরাণ ১৮)

(ক) পৃথিবীদেবীর ঐতিহিক নাম পৃথা। (মহা ৭।৫১)

(খ) উদয়োন্মুখ ও অস্তোন্মুখ সূর্য্যের নাম যম, সিংহরাশিস্থ সূর্য্যের নামও যম, যথা—গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসে যমঃ ভাদ্র পদে তথা।

(জ্যোতিষসার)

কারণ চারি হাজার বর্ষাধিক পূর্ব্বে যৎকালে ঋষিরেখা (Solstitial colure) তৎকালীয় ধ্রুবতারা (৭ তক্ষকস্থ = Alpha Draconis) হইতে সিংহরাশিস্থ মঘানক্ষত্রের যোগতারা (১ সিংহস্থ = Alpha Lionis) ভেদ করিয়া অবস্থিত ছিল তৎকালে এই যোগতারায় ঋষিরেখায় সূর্য্য উপনীত হইলেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ শেষ হইত এবং দক্ষিণায়নে সূর্য্যের পতন সুরু হইত এবং তেজের হ্রসতা আরম্ভ হইত। এজন্য সিংহরাশিস্থ সূর্য্যের যম নাম হইয়াছে।

(গ) ঋষিরেখাগত সূর্য্য উত্তরায়ণের চরম সীমায় উপনীত হয়। ঋষিরেখাগত সূর্য্য উচ্চতম পদবী প্রাপ্ত হয় এবং "উচ্চস্থ" বলিয়া পরিগণিত হয়।

আবার সুমেরুবাসী তারাদর্শকের মস্তকোপরিস্থ তারাকে ধ্রুবতারা বলে। সুতরাং তারাজগতে ধ্রুবতারাই সর্ব্বোচ্চস্থ বা উচ্চতম তারা।

তারাজগতের উচ্চতম তারা উচ্চতম সূর্য্য-যম গ্রহের নাক্ষত্রিক প্রতিমা বলিয়া ঐ তারাকে ধর্ম্মরাজ যম নাম দেওয়া হইয়াছিল। কারণ ঋগ্বেদমতে পাপের শাস্তি দাতা যম নহে। যম কেবল পুণ্যের পুরস্কার দাতা মাত্র। (ঋঃ ১০।১৪।৮—১০) এজন্য তাঁহার ধর্ম্মরাজ নাম অর্থাৎ স্বর্গের বিচারপতি নাম হইয়াছে। (২)

আবার প্রাচীন জ্যোতিষ মতে শনি উচ্চতম গ্রহ ছিল। সুতরাং উচ্চতম যম-ধ্রুবতারার সহিত উচ্চতম গ্রহেরও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, কারণ শনিগ্রহ যমদৈবত। যথা যমাধিদৈবতম্—প্রাজা—পতিপ্রত্যধি-দৈবতম্।

(গ্রহযাগ তত্ত্ব)

(২) তু। যম—ধ্রুবতারার পাশ্চাত্য নাম Akkadian (Babylon) Tir-anne = the Heaven Judge.

Semitic. Dayan Sami = the Heaven Judge.

(ঘ) সিংহরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে তারা সিংহের পাঁচটি তারা প্রধান। এবং তন্মধ্যে মঘানক্ষত্রের, যোগতারা (১ সিংহস্থ) সর্ব্ব প্রধান বা বৃহত্তম। তারাটি রবিমার্গের উপরে অবস্থিত বলিয়া তারাদর্শক ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পরম আদরের পাত্র। এবং যখন ঋষিরেখা ইহার উপরে ছিল তখন,ত ইহার আদরের সীমা ছিল না। তৎকালে ঋগ্বেদোক্ত অঘা (পাপ) নাম ত্যাগ করিয়া নক্ষত্রটি নক্ষত্র জগতের প্রধান রত্ন বলিয়া মঘা নাম গ্রহণ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বলেন মঘ ভূষণে, মঘ অক্ষক্রীড়ায়াম্ বা। (৩)

ঙ। ১ সিংহস্থ তারাটি সিংহাধিপতি যমের পুত্র বলিয়া যমরাজপুত্র নাম পাইয়াছিল। (৪)

আবার যম ধ্রুবতারা ও ১ সিংহস্থ তারা উভয়ে ঋষিরেখার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। যম ধ্রুবতারা উত্তরে এবং ১ সিংহস্থ তারা দক্ষিণে। সেই হিসাবেও ১ সিংহস্থ তারা যমরাজপুত্র খ্যাতি লাভ করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই।

চ। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাক্ষস বলিয়া মহাভারতে কথিত আছে (মহা ১৮৪) এবং পাণ্ডবগণ দেবতা বলিয়া কথিত আছে। (মহা ১৮৩)

রাক্ষসগণ নিশাচর এবং নিশার অনুচর। দেবগণ দিবার অনুচর।

পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ সতত নিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে এবং অপর অর্দ্ধাংশ সতত দিবালোকে ব্যাপ্ত থাকে। ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রপুরীর প্রতিমা এবং হস্তিনা দিকহস্তী পরিরক্ষিত পাতালপুরীর প্রতিমা মাত্র।

২। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে ৭ তক্ষকস্থ তারার ধ্রুবত্ব কালে তাহার একপার্শ্বে ধ্রুবচক্র (Polar Circle) বা পরমপদ অর্থাৎ ত্রিদিব এবং অপর পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল (the Great Bear) ছিল। এই দৃশ্যটি অতি সুন্দর ভাবে ঋগ্বেদে (১০।১৩৫।১) বর্ণিত আছে।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে
দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
তত্র নঃ বিশ্‌পতিঃ পিতা
পুরাণান্ অনুবেণতি॥

অস্যার্থঃ

সুন্দর পল্লবে পল্লবিত যে বিশ্ববৃক্ষে যমদেব দেবগণের সহিত অমৃত পান করেন, তথায় সেই লোকপাল যমদেব আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে সাদরে পালন করেন। (৫) বাস্তবিক পক্ষে যম-ধ্রুব বিশ্ববৃক্ষের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল, তাহার উপর আর কেহই ছিল না, যথা—

(৩) অঘাসু হন্যন্তে গাবঃ (ঋঃ ১০।৮৫।১৩)

(৪) তু। তারাটির পাশ্চাত্য নাম Gr. Basiliskos—the little king. Lat. Regulus—the little king. তারাটির নাম Little king কেন হইল য়ুরোপ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

(৫) সকল ভাষ্যকারগণ বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ করেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থের বিরোধী নহি। তবে আধিদৈবিক অর্থ ত্যাগ করিয়া এবং উল্লঙ্ঘন করিয়া আধ্যাত্মিক অর্থে প্রবেশ করা অনুচিত মনে করি।

যং: পর: অবর: বিবস্বান্
তত: পরং ন অতি পশ্যামি কশ্চন:
(অথর্ব্ব XVIII., 2-32)
অস্যার্থ:

যম সর্ব্বোপরে সূর্য্য নিম্নে যমের উর্দ্ধে কাহাকে দেখা যায় না।

৩। তক্ষকমণ্ডল (Draco) এই ধ্রুব-চক্রের মধ্যে অবস্থিত আছে। এই তারা-সর্পের আর একটি নাম নহুষ। (৬) তক্ষক-নহুষ সপ্তর্ষিমণ্ডলের উত্তরে অবস্থিত আছে॥

সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রের "বৃহৎ রথ" নামে ঋগ্বেদে (৩৫৩।৬) পরিচিত আছে (৭) এবং ইন্দ্রের এই রথে ইন্দ্র ও নহুষ একত্রে বিহার করেন। (ঋ ৮।৪৬।২৭)

তারাদর্শকমাত্রেই জানেন যে, যে তারা যখন ধ্রুব বিন্দুতে অবস্থিত থাকে সেই তারা এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সেই তারাঘটিত তারা-মণ্ডল তখন ভ-গোলের উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তারাটির ধ্রুবত্ব কালের অবসানে তারাটি ক্রমে দক্ষিণে নামিতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ তারাঘটিত তারামণ্ডলেরও অধঃপতন হয়।

৫। অগস্ত্য তারা (Canopus) দক্ষিণে আছে ইহা সকলেই জানেন।

(৬) তু। এই তারামণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম Phoenician Nakhasch.

(৭) তু। এই তারামণ্ডলের বেবিলনে নাম ছিল Man-gidda—The Long Chariot. Eng. Wain, Wagon, etc. See Popular Hindu Astronomy.

"যত্র রথস্য বৃহত: নিধানম্" R.V. III. 53. 6.

আবার ১১ তক্ষকস্থ (Lambda Draconis) তারাটি সৌম্য অগস্ত্য নামে পরিচিত আছে। (৮)

৬। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে সাতহাজার বর্ষ পূর্ব্বে ৬ তক্ষকস্থ তারা (Jota Draconis) ধ্রুব বিন্দুতে ছিল এবং ৭ তক্ষকস্থ (Alpha Draconis) তারা সাড়ে চারি হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ধ্রুবত্ব লাভ করে, সুতরাং ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্ব সময়ে তারা-নহুষ উচ্চতম স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

৭। মধুবিদ্যাবিশারদ প্রভাতী তারা-দ্বয় (বুধ ও শুক্রগ্রহ) যেমন উদয়শীল সূর্য্যের উদয় ঘোষণা করে। সন্ধ্যাতারাদ্বয় (বুধ ও শুক্রগ্রহ) অস্তোন্মুখ যম-সূর্য্যের অস্ত ঘোষণা করে। (৯)

৮। "ঋগ্বেদে স্বর্গের বিচারপতি ধর্ম্ম-রাজ যম পাপের শাস্তিদাতা নহে" (Dr. Muir) তিনি কেবল পুণ্যের পুরস্কারদাতা মাত্র (ঋ: ১০। ১৪) সুতরাং তাঁহার কেহ শত্রু হইতে পারে না। এবং বেদমতে (অথর্ব্ব ৭। ২৪। ১; ১০। ৮ ৪২) "সবিতা

(৮) ইতি এবম্ উক্তা ভগবান্ জগাম
দিশম্ সঃ যামীম্ সহসা অন্তরীক্ষম্।
তত্র অথ নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রীম্।
স্বম্ আশ্রমম্ সৌম্যম্ উপাজগাম॥
(বামন পুরাণ ১৮)

নহুষ সর্পরাজের পদতলে (লাঙ্গুলতলে) ১১ তক্ষকস্থ তারা বলিয়া ঐ তারাকে নহুষপদাহত অগস্ত্য বলিয়া ধারণা হয়।

(৯) তু। " and Spitywra, he who saved Yama into twain."—Avesta, Zamyadyast, VIII. 4-6.

সত্যধর্ম্ম” সেইজন্য ভীষ্মদেবের নাম দেবব্রত, ত্রিশঙ্কুরাজের নাম সত্যব্রত এবং দ্যুমৎসেনের (স্ত্রী) পুত্রের নাম সত্যবান্।

৯। যমের বজ্রের নাম দণ্ড। অস্তোন্মুখ যম-সূর্য্য গতিহীন বলিয়া বোধ হয়। এজন্য যম অশ্ব-সারথিশূন্য।

১০। ৭ তক্ষকস্থ (Alpha Draconis) যখন ধ্রুব সিংহাসন অধিকার করিত তখন ধর্ম্মরাজ যম এই তারার অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন। এই তারার আরবিক নাম থুবান্ (Thuban)অর্থাৎ সর্পমস্তক, কিন্তু তারাটি তক্ষক-নহুষের মস্তকে অবস্থিত নহে। তারাটি তক্ষক-নহুষসর্পের পুচ্ছমূলে অধিষ্ঠিত আছে। থুবান্ শব্দ বোধ হয় অর্থবাদমূলক এবং শিরোমণি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১১। সূর্য্যপত্নী ছায়াদেবীর (ছায়াপথ) অভিসম্পাতে বিবস্বান্ পুত্র যমদেবের এক পদ খসিয়া পড়িয়াছিল। যথা :—

পিতুঃপত্নীম্ অমর্য্যাদম্
যৎ মাম্ তর্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাৎ অয়ম্ পাদঃ
তব অদ্যৈব পতিষ্যতি॥

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৭।২৯)

অস্যার্থঃ

যে হেতু তুমি পিতার ভার্য্যাকে (আমাকে) অমর্য্যাদা করিয়া পদপ্রদর্শনে তাড়না করিলে সেই হেতু তোমার এই পদ অদ্যই পৃথিবীতে পতিত হইবে।

ক্রিময়ঃ মাংসম্ আদায়
পাদতঃ তে মহীতলম্।
পতিষ্যতি ইতি শাপান্তম্
তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্॥

(মাঃ পুঃ ৭৮।২৭)

অস্যার্থঃ

ক্রিমিগণ তোমার পদের মাংস লইয়া মহীতলে পড়িবে যমের পিতা স্বয়ম্ এই শাপান্তের ব্যবস্থা করিলেন।

শনি গ্রহের নাম খঞ্জ ইহা সকলেরই বিদিত আছে।

উপপত্তি।

১। বেদমতে (১১১৫৯১২ খৃঃ) দ্বারা পৃথিবী সকলদেবের জনক জননী। পৃথা পৃথিবীর গর্ভে যম-সূর্য্যের ঔরসে যুধি-স্থির রাজের জন্ম হয়। গ্রহ যুদ্ধে তারা ও গ্রহ-গণ সকলেই সচল কেবল যম-ধ্রুবতারা অচল ও অটল এজন্য যুধিষ্ঠির নাম।

২। ভীমসেন চরিতে দ্রষ্টব্য।

৩। যম-ধ্রুবতারার রাশিচক্রের নাক্ষত্রিক প্রতিমা মঘানক্ষত্রের যোগতারা (১ সিংহস্থ) এই তারার নাম যমরাজপুত্র। এজন্য যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

৪। পঞ্চ ইন্দ্রের প্রতিমা পঞ্চ পাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করিতে অধিকারী বটে। ধরাজগতের অর্দ্ধেক দেবগণ ও অর্দ্ধেক নিশাচর রাক্ষসগণের সতত অধীন থাকে।

৫। মঘানক্ষত্রস্থ যুবরাজের স্বধর্ম্ম পাশক্রীড়া তাহার সন্দেহ নাই। শনি-দুর্য্যোধনের কোপে শ্রীবৎসরাজ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং নারায়ণ এক বর্ষ গণ্ডকশৈলের গুহা মধ্যে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন।

৬। স্বর্গের বিচারপতি ধর্ম্মরাজের কোপদৃষ্টিতে লোক দগ্ধ হইবার কথা বটে।

৭। যম-ধ্রুব সতত সপ্তর্ষি আদি ঋষিগণকে সাদরে প্রতিপালন করেন, সুতরাং যুধিষ্ঠির চরিত্রের এই লক্ষণ তিনি বজায় রাখিয়াছেন।

৮। তারা নহুষ কিছুকাল স্বর্গের শীর্ষ হইতে নিম্নে আসিয়াছিলেন আবার সেই শীর্ষস্থান লাভ করেন।

৯। ইন্দ্রসেন বোধ করি মাতলি হইবেন এবং মৃদঙ্গদ্বয় যম-সূর্য্যের অনুচর অশ্বিদ্বয় (বুধ ও শুক্র গ্রহ)।

১০। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ যম বলিয়া যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু এবং যম-সূর্য্যের স্বধর্ম্মই সত্য ধর্ম্মতা।

১১। অঘানক্ষত্রস্থ তারা এক আধটা পাপ না করিলে নামের সার্থকতা বজায় থাকে না। এই জন্যই "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" পরিকল্পিত হইয়াছে। নতুবা স্বপক্ষের অসংখ্য লোক নিকটে থাকিতে তাহাদের নিকট সংবাদ লইলেই দ্রোণের সংশয় দূর হইত।

১২। শল্যরাজ-বধ শল্যচরিত্রে বিবৃত হইয়াছে।

১৩। যমের দণ্ড বেশ সুকৌশলে চাপা দেওয়া হইয়াছে। "হেমদণ্ডমণ্ডিত শক্তি।"

১৪। মঘানক্ষত্রের যোগতারা ভূষণ গ্রহণ না করিলে নামের সার্থকতা রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ যম-ধ্রুব যুধিষ্ঠির যে ৭ তক্ষকস্থ তারার অধিষ্ঠাতা দেবতা তাহার প্রমাণ রাখা দরকার। সুতরাং রাহু-অশ্বত্থামা সর্পের স্বভাবসিদ্ধ শিরোমণি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে দিয়া ঐতিহাসিক পাঠকের সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ দীক্ষিত পাঠকের সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন। থুবান্ (Thuban) তারার প্রাচীন হিন্দু নাম অদ্যাপি দৃষ্টি পথে পড়ে নাই। বৃহৎ আরণ্যকোক্ত "নক্ষত্র বিদ্যার" গ্রন্থ অপ্রাপ্য হওয়ায় ইতিহাসপাঠ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

১৫। ধর্ম্মরাজ যম খঞ্জ না হইলে যমদৈবত শনি খঞ্জ হয় না; শনি খঞ্জ না হইলে শনির গৃহ কুম্ভরাশি "চরণ রহিত" হয় না। খঞ্জত্ব এই তত্ত্বের লক্ষণ বলিতে হইবে।

যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণ পৃথক্ প্রবন্ধে বিবৃত করিবার মানস রহিল।

তারাদর্শক।

হিসাব।

হিসাবের পাতা খুলি দেখিলাম হায়!
জমা বলে কিছু মোর নাহিক খাতায়।
নিকটে যে শেষ দিন তাই ভাবি মনে।
কি ল'য়ে দাঁড়াব প্রভু তোমার সদনে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রাজা রামমোহন রায়। *

যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে ভারতভূমিতে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং যাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য—সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি——বহু বিষয়ে ভারতবাসীর চিন্তাস্রোতকে নূতন পথে প্রেরণ করিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। ইহলোকের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাঁহারা পরলোকে গমন করেন, পৃথিবী হইতে তাঁহাদিগের তিরোভাব অমিশ্র ক্ষোভের বিষয় নয়। আমাদিগের সহিত তাঁহাদিগের পার্থিব সম্বন্ধ শেষ হইল বলিয়া যদিও, দুর্ব্বলতা বশতঃ, আমরা অশ্রুপাত করি, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের মহিমা চিন্তা করিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করি এবং তাঁহারা যে আমাদিগেরই এক একজন, ইহা অনুধ্যান করিয়া আমরা আশান্বিত হই। এইরূপ মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত আমাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করে, ইঁহাদিগের আহ্বান-বাণী আমাদিগকে আলস্য ও জড়তা হইতে উদ্বোধিত করে এবং ইঁহাদিগের করস্থিত আলোক সংসারের ঘনান্ধকারের মধ্যে আমাদিগের গম্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমরা ইঁহাদিগের কথা চিন্তা করিয়া বিপদে ধৈর্য্য, সংশয়ে বিশ্বাস এবং শোকে শান্তি লাভ করি। পার্থিব জীবন শেষের সঙ্গে ইহাদের কার্য্য শেষ হয় না। অশরীরী আত্মময় হইয়া ইঁহারা আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে চিরদিন বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের, প্রকৃত প্রস্তাবে, মৃত্যু হয় নাই। অজর, অমর রূপে তিনি এখনও আমাদিগের মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদিগের চর্ম্মচক্ষু তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও মনশ্চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছে এবং অন্তরাত্মা তাঁহার আধ্যাত্মিক সংস্পর্শজনিত বৈদ্যুতিক তেজে তেজস্বী হইয়াছে। শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত পুরুষকে জ্যোতির্ম্ময় রূপে ধ্যান করিয়া ভক্তিপ্রদর্শন হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম। আমরাও সকলে এই সভাস্থলে অলক্ষিত জ্যোতির্ম্ময়-পুরুষ রাজা রামমোহন রায়কে উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।

যাঁহাদিগের সহিত রক্তমাংসের সম্বন্ধ থাকে, তাঁহারা কি গুণে বা কি জন্য আমাদিগের ভক্তির পাত্র, কেহ কখনও তাহা প্রশ্ন করে না। পিতা পণ্ডিত বা মুর্খ, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক, সন্তানপালনে সক্ষম বা অক্ষম হউন, তিনি পিতা। মাতা শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা হউন, স্নেহগুণে পুত্রকন্যার উন্নতিপথে সহায়তাকারিণী বা বাধাদায়িনী হউন, তিনি মাতা। পুত্রকন্যার হৃদয়ে পিতামাতার সিংহাসন চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাবাত তাহাকে বিগলিত করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদিগের সহিত রক্তমাংসের সম্বন্ধ থাকে না, কি গুণে বা কি কারণে—আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি,

* উন-অশীতিতম সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে পঠিত।

ইহা জানিতে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থই আজ আমরা সম্মিলিত। রক্তমাংসের সম্বন্ধ না থাকিলেও কি জন্য তিনি আমাদের ভক্তির পাত্র তাহা আলোচনা করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনাবলী এতই সুপরিচিত—তাঁহার চরিতলেখক তাহার সুলিখিত জীবনচরিতে এত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাহার সম্বন্ধে কোনও নূতন কথা বলিবার অবসর অতি অল্প। কিন্তু আজন্ম দর্শন করিলেও অরুণোদয়ের সৌন্দর্য্য যেমন কখনও পুরাতন হয় না, প্রত্যেক প্রভাতেই যেমন তাহা নূতন বলিয়াই জ্ঞান হয়, মহাপুরুষদিগের প্রসঙ্গও তেমনই কখনও পুরাতন হইতে পারে না। প্রত্যেকবার পাঠের ও প্রত্যেকবার শ্রবণের সময় তাহা নূতন ভাবে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। রামমোহন রায়ের জীবনের যে কোন অংশের কথা আমরা চিন্তা করি, তাহাতেই যেন বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার কিশোর বয়সের কার্য্য আলোচনা করুন। ধনাঢ্য গৃহের বালক একাকী পাটনা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে দীর্ঘপ্রবাসের পর তৎকালসমাদৃত বিদ্যায় ভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নবযৌবন তাঁহার প্রতিভামণ্ডিত, বিদ্যা-বিনয়-বিভূষিত মুখমণ্ডলকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার দেহে অসাধারণ বল, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লোকরঞ্জন সৌন্দর্য্য, বিদ্যায় বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহার নিকট পরাজিত এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আর্দ্র। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন, তাঁহার গণ্ডদ্বয় অশ্রুতে অভিষিক্ত হয়। এমন কুলপাবন পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং বিবাহ দিয়া পুত্রকে সংসারে স্থায়ী করিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সংসারের শান্তি কোথায়? তিনি যদি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গতানুগতিক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অশান্তির কোনও কারণ থাকিত না। পিতা, মাতা, পত্নী, আত্মীয় স্বজন, রূপ, যৌবন, সম্পদ, সম্ভ্রম লইয়া তিনি পরিতৃপ্ত চিত্তে আরও দশ জনের ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু জ্ঞান একদিকে যেমন সুখের, অপরদিকে তেমনই দুঃখেরও কারণ বটে; রামমোহন রায় বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার অশান্তির কারণ হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, সদাচারের নামে, কদাচার, এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম তাঁহার স্বদেশে রাজত্ব করিতেছে। সমাজ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, লোকে অর্দ্ধনিদ্রায়, অর্দ্ধ জাগরণে জড়প্রায়। স্ত্রী-পুরুষ কাহারও শিক্ষা নাই, অসার আমোদপ্রমোদ লইয়া অতি বুদ্ধিমান লোকেও ব্যস্ত; নিজের কথাই কেহ ভাবে না, অপরের কথা ভাবিবার শক্তি কোথায়? তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, তাঁহার স্বাভাবিক শান্তি অন্তর্হিত হইল। কি করিলে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে তিনি ইহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পর্ব্বত-গুহার মধ্যে যখন বারি-বিন্দু সঞ্চিত হইতে

থাকে, তখন কেহ তাহা দেখিতে পায় না, অবশেষে যখন, পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া, বাধা-বিপত্তি উৎপাটিত করিয়া তাহা ধাবিত হয়, তখনই লোকে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করে। রামমোহন রায় এতদিন মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সের লিখিত "তুহাকৃতুল মহাদীন্" নামক একেশ্বরপ্রতিপাদক গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। নিষ্ঠাবান সাকার আরাধনাশীল গৃহে অশান্তির কোলাহল ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। পিতামাতা পুত্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, সদুপদেশ ও শাস্তি পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। রামমোহন রায় অবশেষে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু সুখপূর্ণ, মায়ামমতায় স্নিগ্ধ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া নিঃসহায় নিঃসম্বল যুবক কোথায় চলিলেন। যে দেশ প্রাচীন কাল হইতে দুর্গম ও দুর্জ্জেয় বলিয়া পরিচিত, অথচ যাহা দেবভূমি ও ধর্ম্মভূমি বলিয়া কল্পিত, কঠোরতায় ও ক্লেশে অভ্যস্ত তীর্থযাত্রিগণও যে দেশে গমন করিতে ভীত হন, এই নবীন যুবক একমাত্র ধর্ম্মানুরাগে প্রণোদিত হইয়া সেইদেশে গমন করিলেন। রামমোহন রায় সেখানে কি দেখিয়াছিলেন, কি শিখিয়াছিলেন তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

কিন্তু তাঁহার তিব্বত প্রবন্ধের কথা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান কি দৃঢ় উপাদানে তাঁহার শরীর ও তাঁহার মন গঠিত করিয়াছিলেন। স্নেহ, মমতা এবং শারীরিক ক্লেশ কর্ত্তব্যসাধনের পথে তাঁহার নিকট কিছুই নয়। যদি রামমোহন রায় আর কিছুই না করিতেন, তবে, ধর্ম্মানুসন্ধানের জন্য তাদৃশ সময়ে এবং তাদৃশ বয়সে কেবল তিব্বত গমনের জন্যই আমাদিগের বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতেন।

তাঁহার তিব্বত হইতে প্রত্যাগমনের সঙ্গে আমরা তাঁহার জীবনের একাংশ সম্পূর্ণ দেখিতে পাই। আমরা তাহা হইতে জানিতে পারি যে, রামমোহন রায় ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি প্রধান ধর্ম্মের মূলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, আমরা দেখিতে পাই যে তিনি ভক্তিপরায়ণ এবং সেই সঙ্গে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, তিনি কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়ব্রত। ইহার পর তাঁহার জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরব্ধ হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাতে কিছু নূতনত্ব নাই; তাঁহার স্বদেশবাসী আরও দশ জনের ন্যায় তিনিও রাজকর্ম্মচারীরূপে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে অপর সকলের সহিত তুলনায় তাঁহার ব্যবহারে একটু বিশেষত্ব অনুভূত হয়। যে সময় তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে অনেকে আত্মমর্য্যাদা বিক্রয় করিয়া রাজসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় রামমোহন রায় পূর্ব্ব হইতে এইরূপ স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে, কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলে দণ্ডায়মান থাকিবেন না, উপযুক্ত আসন গ্রহণ করিবেন। নিয়োক্তা এবং নিয়োজ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ক্ষোভ

প্রকাশ করেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, রামমোহন রায়ের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা রক্ষণে যত্নশীল ভারতবাসীর অস্তিত্ব লোপ না হইলে ডিগ্‌বীর ন্যায় মহানুভব ইংরাজেরও অত্যন্তাভাব হইবে না।

রামমোহন রায়ের জীবনের এই সময়কার কার্য্যে আরও একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁহার সময়ের আরও দুই চারি জন বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ইংরাজী শিক্ষা কেবল অর্থোপার্জ্জনেরই জন্য। কোন রূপে ভাঙা ইংরাজীতে বা আধ বাঙ্গলা আধ ইংরাজীতে সওদাগর বা সিভিলিয়ান সাহেবের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই তাঁহারা যথেষ্ট হইল বিবেচনা করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায় এরূপে ইংরাজী শিক্ষা করেন নাই। জ্ঞানার্থী জ্ঞানলাভের জন্য যে ভাবে ভাষাশিক্ষা করে তিনি সেই ভাবেই ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই ভাষার সাধারণ উপন্যাস, বা সংবাদপত্র বুঝিবার শক্তিলাভেই তিনি পরিতৃপ্ত হন নাই, ইহার দর্শন, ধর্ম্মতত্ব, মনস্তত্ব প্রভৃতি দুরূহ বিষয় সকল, অন্য সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া যাহাতে বুঝিতে পারেন, সেইরূপই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজীকে তিনি কেবল অর্থকরী ভাষা বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, বহুজ্ঞানের আধার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসু-হৃদয় কেবল ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াই পরিতৃপ্ত হয় নাই। যখন ভারতবাসী-দিগের মধ্যে ইংরাজী ভিন্ন অপর য়ুরোপীয় ভাষার চর্চ্চা একবারেই ছিল না, তখন তিনি ইংরাজীর সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রাচীন ও নব্য য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমি বলিয়াছি যে রামমোহন রায়ের জীবনের যে কোন অংশেরই আমরা পর্য্যালোচনা করি, আমাদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতে হয়।

রামমোহন রায়ের জীবনকে প্রধানতঃ তিন অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। তাহার এক একটির পরিমাণ ন্যূনাধিক কুড়িবৎসর। তাঁহার তিব্বত হইতে প্রত্যাগমন প্রথমাংশের এবং রাজকার্য্য গ্রহণ ও অর্থোপার্জ্জন দ্বিতীয়াংশের অন্তর্ভূত। আমরা এই দুই অংশের আলোচনা করিয়াছি। এইবার তাঁহার জীবনের তৃতীয় বা শেষ অংশের আলোচনা করিব। রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন রায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। দূরদর্শী যোদ্ধা যেমন ভাবী-যুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝিয়া, আপনার অস্ত্রাগার অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ভগবানের চিহ্নিত সৈনিক রামমোহন রায়ও তেমনি, আপনাকে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপযোগী সজ্জায় সজ্জিত করিয়া অধর্ম্ম ও অসদাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। উপযুক্ত বয়সে এবং উপযুক্ত সময়েই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৪০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। যৌবনের চপলতা চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বার্দ্ধক্যের জড়তা আসে নাই। তিনি তখন বিষয়বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মশাস্ত্রে

পারদর্শী, এসিয়া ও য়ুরোপের কয়েকটি প্রধান ভাষায় সুপরিচিত। সাংসারিক অবস্থায় তিনি তখন অনন্যপরতন্ত্র এবং সাংযমে ও সাধনায় তিনি দৃঢ়চিত্ত। মানিকতলায় সার্কুলার রোডে এখন যেখানে পুলিস ষ্টেসন আছে, সেই বাটীতে অবস্থান করিয়া তিনি আপনার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তখন বঙ্গদেশ কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা বর্ণনা করিতে যাইলে এ প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইবে। সংক্ষেপে এই বলিলেই হইবে যে, সমস্ত সমাজ তখন যেন নিদ্রিত বা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় ছিল। অবরুদ্ধ জলরাশি দূষিত হইয়া যেমন অনিষ্টকর জলজ তৃণের আকর হয়, চিন্তাশক্তিহীন এবং জীবনীশক্তিহীন সমাজ তখন সেইরূপ দূষিত আচার, ব্যবহারের আকর হইয়াছিল। রাজনীতিতেই হউক সমাজ সম্বন্ধে হউক, অথবা ধর্ম্মমতে হউক, যাহা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল, তাহাই চলুক, ইহাই তখন সমাজের মূলমন্ত্র ছিল। স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন আলোচনাই যে সুস্থ মনের লক্ষণ, তখন কাহারও মনে তাহা স্থান প্রাপ্ত হইত না। এই সময় রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। চারিদিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। জড়দেহে কে যেন বৈদ্যুতিকপ্রবাহ সঞ্চারিত করিল; সমাজের ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন চাঞ্চল্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। রামমোহন রায় কলিকাতায় যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এখন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সমাজের কল্যাণকর এমন কোন অনুষ্ঠানই ছিল না, তিনি যাহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষা-প্রচার, কুসংস্কার ও কুরীতি-দমন, সংবাদও সাময়িক পত্র স্থাপন, রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি প্রত্যেক হিতকর কার্য্যেই তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পথ কুসুমাবৃত ছিল না, কণ্টকে এবং কঙ্করে ক্ষতবিক্ষত হইয়াই তিনি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন শরীরের শোণিত পাত করিয়া তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যয় করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে কি প্রতিদান ঘটিয়াছিল? ভাষায় এমন কটু ও মর্ম্মভেদী শব্দ ছিল না, যাহা তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই; কেহ বলিতেন তাঁহারই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় হইতেছে, কেহ বলিতেন তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভায়" গোহত্যা হয়। তিনি নগরান্তেবাসী অর্থাৎ চণ্ডাল, এইরূপ সুমধুর ভাষায় তিনি অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসক যেমন প্রলাপী রোগীর দুর্বাক্য শুনিয়া তাহার উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পরাঙ্মুখ হন না, তিনি তেমনি নিন্দা, লাঞ্ছনা এবং নির্য্যাতনের জন্য আপনার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। সতীদাহ নিবারণ এবং ইংরাজী শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই সুপরিচিত। অথবা কেবল এই দুইটি কেন? তাঁহার কোন্

কার্য্য ছাড়িয়া কোন্ কার্য্যের উল্লেখ করিব। একদিকে বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ব্যাকরণ-রচনা হইতে বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ এবং অপরদিকে সুপ্রীমকোর্টের নিষ্পত্তির এবং লাখরাজ ভূমি বিষয়ক আইনের প্রতিবাদ প্রত্যেক বিষয়ে তাহার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহার বহুকার্য্যের মধ্যে তিনটি কার্য্যই প্রধান :—(১) খ্রীষ্টধর্ম্মের বেগ প্রতিরোধ; (২) পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচার; (৩) এবং ঋষি-সেবিত সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের চিত্তাকর্ষণ। খ্রীষ্টীয় নীতি ও উপদেশ-সম্বন্ধে অকপট ভক্তি সত্ত্বেও রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, বেদান্ত-উপনিষদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টধর্ম্ম হিন্দুসন্তানের গ্রহণীয় নয়, সেইজন্যই তিনি তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং সাগরতটবর্ত্তী পর্ব্বত যেমন তরঙ্গের আক্রমণ হইতে কূলকে রক্ষা করে, তিনিও তেমনি 'ক্যারি' ও 'মার্শম্যান' প্রভৃতি স্বনামপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের আক্রমণ হইতে হিন্দু-ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার সম্বন্ধেও তাহার চেষ্টার অবধি ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইতিহাসাদিতে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা না করিলে যে চলিতে পারে না, ইহা বুঝিয়া তিনি হেয়ার, ডফ্ প্রভৃতিকে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাও সফল হইয়াছিল। 'হিন্দু কলেজ' সংস্থাপনের সঙ্গে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার তৃতীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তিনি তজ্জন্যও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একেশ্বরবাদ প্রচারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকলের সঙ্গে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কার না ঘটিলে কোনও জাতির প্রকৃত উন্নতি হয় না, এইজন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডবাসীদিগের নিকট ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাপন আবশ্যক। ঈশ্বরানুগ্রহে উপযুক্ত সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। দিল্লীর বাদসাহ তাহাকে আপনার অভাব-অভিযোগ-জ্ঞাপনার্থ—প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। যিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তিনি যে এরূপ সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিনি পার্লামেণ্টের কমিটীতে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এবং ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের নিকটে—ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যথাসাধ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তিনি সেখানে রাজা ও রাজপুরুষদিগের কিরূপ সমাদর, পণ্ডিতমণ্ডলীর কিরূপ সম্মান এবং সাধারণ জনসমাজের কিরূপ শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মভাব দর্শনে বহু নরনারীর চিত্ত ভারতভূমির ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই বিশ্ব-

বিধাতা তাঁহাকে নিজের নিকট আহ্বান করিলেন।

স্বদেশের কার্য্যে তিনি একরূপ আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় শোণিত-শোষিণী অর্থচিন্তা আসিয়া তাহাকে অক্রমণ করিল। কঠোর পরিশ্রমের ফলে ও দুশ্চিন্তায় জীর্ণ হইয়া তিনি পীড়িত হইলেন। নিজের গুণে তিনি বহু নরনারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রবাস হইলেও ইংলণ্ডে তাহার সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু রোগ চিকিৎসার ও শুশ্রূষার অতীত হইল, অবশেষে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর এমনই দিনে তাহার মর্ত্যলীলা শেষ হইল। অদ্যকার ন্যায় সেদিনও শুক্লপক্ষ ছিল, রজনী শারদজ্যোৎস্নায় সমুজ্জলা—নিশীথের গাম্ভীর্য্যের মধ্যে প্রকৃতি যোগমায়ার ন্যায় মৌনা—বৃক্ষলতাসমূহ চন্দ্রিকা ধৌত হইয়া মনোহর শোভায় বিরাজমান, চতুর্দ্দিক শান্ত, সুন্দর, মর্ত্ত্যে স্বর্গ-লোকের দৃশ্য অবতীর্ণ—এমন সময় ভারতের শেষ রাজ-ঋষি সমাধিস্থ হইয়া পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিলেন। রোগের সূত্রপাত হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার অব্যাহতি নাই, তিনি আর্য্য-ঋষিগণের সর্ব্বস্ব 'ওঁ' এই মহামন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতেন, অন্তিমকালেও সেই মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলেন। ভারতের পক্ষে সে দিন যদিও অতি দুর্দ্দিন গিয়াছে, কিন্তু তিনি যে কর্ম্মভূমি পৃথিবীর কর্ম্ম শেষ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন ইহাতেও দেবলোকে নিশ্চয়ই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। ঐরূপ মহাপুরুষদিগের মৃত্যু, মৃত্যু নয়, ইহা প্রকৃতই স্বর্গারোহণ নামে অভিধেয়।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় যাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিয়াছি। ভারতবর্ষ বহু মহাপুরুষের জন্মভূমি। জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে বহু সাধুজন ইহাকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তুলনায় কাহারও গৌরব হ্রাস করিয়া রামমোহন রায়ের গৌরব বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মনে হয় ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এক সঙ্গে এত গুণের আভায় আর কেহ ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করেন নাই। "যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং" এই মহাবাক্য আর কাহারও জীবনে এমন ভাবে সার্থক হইতে দেখি নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে অনুতৎপর থাকিয়াও চিত্ত ভগবৎপদারবিন্দে রাখাই সংসারী জীবের কর্ত্তব্য এবং হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের চরমাদর্শ। রামমোহন রায়ের জীবনে এই আদর্শ চরিতার্থ হইয়াছিল। আমি বলিয়াছি যে তাঁহার যে কার্য্যই চিন্তা করি তাহাই বিস্ময় উৎপাদন করে। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিব্বতগমন বিস্ময়কর; তাঁহার বহুভাষায় ও বহুশাস্ত্রে অধিকারলাভ বিস্ময়কর, তাঁহার মার্সমানের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিতকে তাঁহারই ভাষায় এবং তাঁহারই শাস্ত্রে পরাজয় করা বিস্ময়কর, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর লক্ষণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীনতা। স্বদেশের এবং স্বজাতির হিতকর এমন কোন কার্য্যই ছিল না যাহা তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত না ছিল। সকল বিষয়ে দৃষ্টি

সামান্ত শক্তির পরিচায়ক নয়। রামমোহন রায়ের এ শক্তি কোথা হইতে আসিল, তাহার উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। যুক্তরাজ্যের Pensylvaniaর প্রতিষ্ঠাতা কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত William Penn কিরূপে এত কার্য্য করিতে পারিতেন, একজন একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। Pennএর কোন আত্মীয় প্রশ্নকর্ত্তাকে একটি গৃহে লইয়া গিয়া গৃহতলে দুইটি চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, "পেন যে কেন কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন এই তাহার কারণ দেখুন।" প্রশ্নকর্ত্তা ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিলে প্রদর্শক বলিলেন Penn প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে অবনতজানু হইয়া এই গৃহতলে এই স্থানে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারই জানুর ঘর্ষণে এই স্থান খোদিত হইয়াছে। ভগবানের আরাধনাই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির মূল। রামমোহন রায়েও এই ভাব বর্ত্তমান ছিল। শৈশবে তিনি হরিভক্ত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভোর হইতেন, যৌবনে তিনি দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থায় ভগবানের নাম জপই তাঁহার সম্বল ছিল। তাহার ইংলণ্ড অবস্থান কালে তাঁহার এই উপাসনাশীলতা সম্বন্ধে কুমারী হেয়ার লিখিয়াছেন "He was in a constant habit of prayer and was not interrupted in this by her presence, whether sitting or riding he was frequently in prayer. ইহাই রামমোহন রায়ের শক্তির মূল, ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। আজ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর সাম্বৎসরিক ইহকালের ও পরকালের যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি আমাদিগের মধ্যে অদ্য বিরাজিত আছেন। আমরা তাঁহার যতই প্রশংসাবাদ করি, তাহা তাঁহার প্রীতিকর হইবে না, কিন্তু তিনি যে মহাকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মাতৃভূমির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন, সধর্ম্ম ও সদাচারের প্রবর্ত্তনে তিনি যে ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহাতে যদি আমরা স্ব স্ব শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁহার অনুসরণ করিতবেই তিনি প্রীত হইবেন এবং তাহা হইলেই তাঁহার এই স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি।

আমাদের দেশের নানা স্থানে যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোনও মূর্ত্তিই শাক্যসিংহের মূর্ত্তি নহে; তাহা "বুদ্ধমূর্ত্তি" ;—মানবাত্মা সাধনবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিলে যে আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই আধ্যাত্মিক অবস্থার "শ্রীমূর্ত্তি"। তাহাতে শাক্যসিংহের মানবদেহকে যথাযথ অভিব্যক্ত করিবার

প্রয়োজনাভাবেই তাহা অভিব্যক্ত হয় নাই। তাহাতে আকারানুকরণের নানা শৈথিল্য দর্শন করিয়া, কেহ কেহ তাহার রচনা-লালিত্য উপভোগ করিতে পারেন না; কেহ কেহ তাহাকে শাক্যসিংহের নরমূর্ত্তি মনে করিয়া, তাহার দেবভাব অস্বীকার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, সে কালের ভারতবর্ষীয়গণ যতদূর পর্য্যন্ত নরমূর্ত্তির অনুকরণ করিতে পারিতেন, এই সকল শ্রীমূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন;— তাহা ভারতশিল্পের অসামর্থ্যের নিদর্শন।*

বুদ্ধমূর্ত্তি শাক্যসিংহের নরমূর্ত্তি হইলে, এই সিদ্ধান্তকে অকাট্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি শাক্যসিংহের তিরোভাবের বহুকাল পরে একটি আধ্যাত্মিক ভাবসামগ্রীর শ্রীমূর্ত্তিরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহের জীবিতকালে তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবার কথা উল্লিখিত আছে, শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইবার সময়ে তাহা বর্ত্তমান ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। † কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি কিরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার একটি আখ্যায়িকা বর্ত্তমান আছে। মহাপরিনির্ব্বাণের পর বহুকাল পর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মচক্রের, বোধিবৃক্ষের অথবা বুদ্ধপাদপদ্মের পূজামাত্রই প্রচলিত ছিল; তখনও বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হয় নাই। * যখন তাহার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই আদর্শের অনুসারে শিল্পকার মূর্ত্তিরচনা [illegible]

[illegible] করিয়া, [illegible] কার্য্য করিয়াছিলেন [illegible] এই আখ্যায়িকার মধ্যেই ঘটনারহস্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধমূর্ত্তি ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে নানা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহার সহিত শাক্যজীবনের নানা ঘটনাও সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সকল ঘটনার মধ্যেই তাহাকে বুদ্ধরূপে প্রদর্শিত করাই শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। তজ্জন্য কোনমূর্ত্তিই নরমূর্ত্তিরূপে উদ্ভাবিত হয় নাই।

---

* European artists, with no knowledge of Indian philosophy, have always erroneously supposed that this type of figure represented the nearest approach to the human form which Indian sculptors were capable of producing.—Havell's *Indian Sculpture and Painting*, p. 32.

† মগধাধিপতি বিম্বিসার শাক্যসিংহের একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

* এই সকল বৌদ্ধোপাসনার চিহ্ন বহুচৈত্যের শোভাবর্দ্ধন করিত। চৈত্যপূজা শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

From several passages in the Pali Budhistical annals, it would appear that Topes were in existence prior to Sakya's advent.——Cunningham's *Vilsa Topes*, p. 10.

† এই আখ্যায়িকা 'দিব্যাবদান' গ্রন্থে বিম্বিসারের চিত্রপট প্রস্তুত করাইবার প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বুদ্ধমূর্ত্তি অধ্যাত্মমূর্ত্তিরূপে উদ্ভাবিত হয় নাই। যথা—This point will be found of value, for it proves that there was no desire to create an ideal type.—*Budhist Art in India*, p. 68. কিন্তু "দিব্যাবদান" বিম্বিসারের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল।

বৈরাগ্যোদয়ের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে মহাপরিনির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত কোন সময়েই, শাক্যসিংহ আর শাক্যসিংহ ছিলেন না; মনুষ্যত্বের অনেক উপরে দেবত্বের যে সকল সমুন্নত সোপান উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে, তিনি তখন সেই সকল সোপান অধিকার করিয়া, ধীরে ধীরে মহাপরিনির্ব্বাণলাভে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুতরাং সকল অবস্থায়, সকল সময়েই, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রীর আধার হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল আকারানুকরণে তাহা অভিব্যক্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্যই শিল্পকার সে পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সাধনাগ্রন্থে, এই সকল শ্রীমূর্ত্তিপূজার যে সকল সঙ্কেত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতেও এইরূপ সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীভূত হয়। "ইতি অদ্বয়াহঙ্কারং কুর্য্যাৎ" এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ বাক্যে বুদ্ধ-মূর্ত্তির উদ্ভাবনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ধ্যানের সৌকর্য্যসাধনের জন্যই তাহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—বর্ত্তমান কল্পে পাঁচজন বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী;—চারিজন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন,—একজন এখনও অবতীর্ণ হন নাই। এই পঞ্চবুদ্ধের নাম—ক্রকচ্ছন্দ, কণকমুনি, কাশ্যপ, গৌতম এবং মৈত্রেয়। ইঁহাদের অধ্যাত্ম-ধ্যানপরায়ণ মূর্ত্তি যথাক্রমে—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি নামে কথিত। ইঁহাদের বোধিসত্বগণের নাম—সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি, এবং বিশ্বপাণি। সুতরাং যাহা সচারাচর বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও নরমূর্ত্তি নহে। এই সকল অধ্যাত্ম-মূর্ত্তিনির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া শিল্পকার যাহা করেন নাই তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, তথ্যনির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র এই সকল শ্রীমূর্ত্তিকে অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রীর অনির্ব্বচনীয় আধার বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ ভাবেই এই সকল শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল;—সেইরূপ ভাবেই তাহা চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।
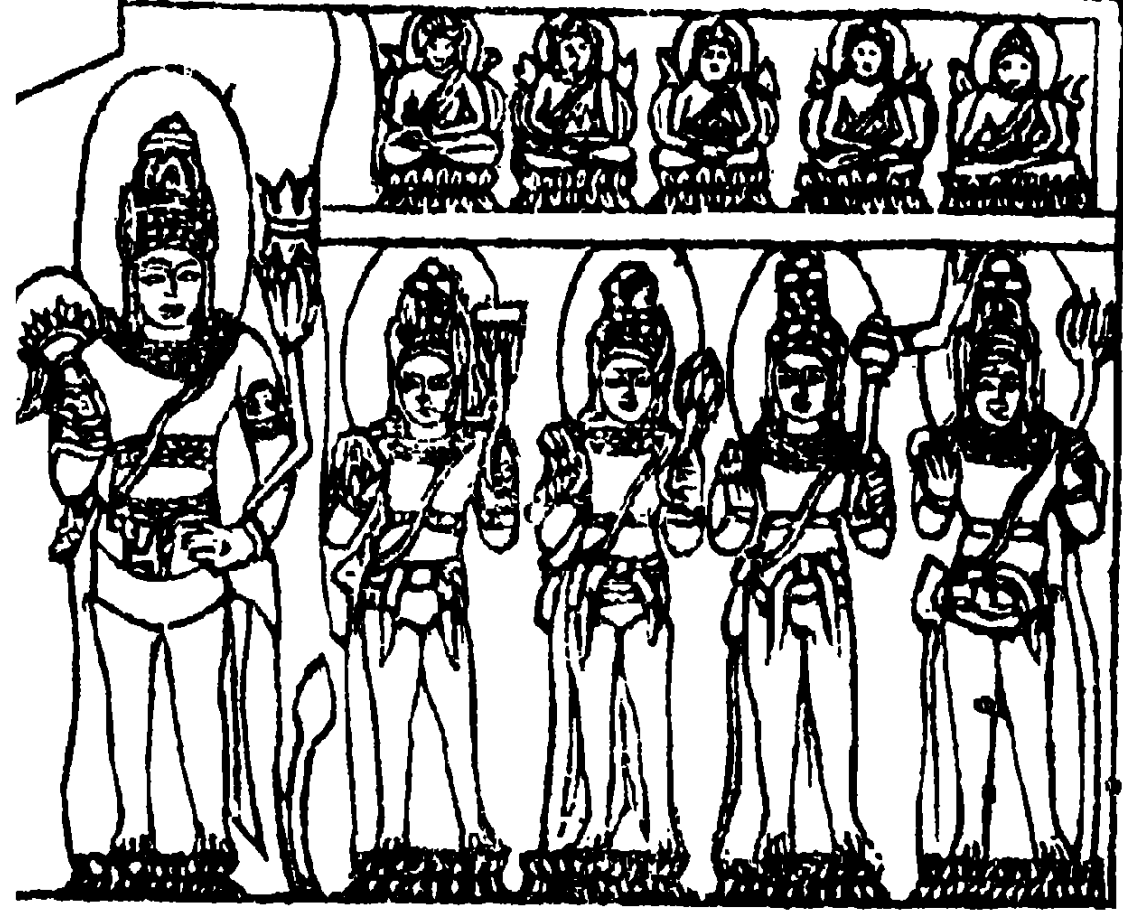
ভারতবর্ষ ভিন্ন পাশ্চাত্য সভ্যদেশে এরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষ অন্য কোনও সভ্যদেশ হইতে মূর্ত্তি শিল্পের এইরূপ হেতুগর্ভ ভাবপ্রকাশ-কৌশল শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। *

* The Greeks no more created Indian Sculpture and Painting than they created Indian Philosophy and Religion.—Havell's *Indian Sculpture and Painting*, p 7.

ভারতবর্ষের অন্যান্য শিক্ষাদীক্ষার ন্যায় ইহাও ভারতবর্ষেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন পুরাতন শ্রীমূর্ত্তির রচনা-প্রণালীতে কিছু কিছু বিদেশাগত শিল্পকৌশল লক্ষ্য করিয়া, কেহ কেহ ভারতের মূর্ত্তি-শিল্পকে পরানুকরণলব্ধ বলিয়া ব্যক্ত করিবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। পরানুকরণের নিদর্শন বলিয়া যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত কেবল বৌদ্ধধর্ম্মেরই সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ-পরম্পরারও অভাব নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল; তৎকালে নানা দেশের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব ছিল।

পুরাতন ভারতবর্ষের যে প্রদেশ "গান্ধার" নামে সুবিখ্যাত ছিল, তাহা হেরোদোতাস, হেকাতোয়স, টলেমি এবং স্ত্রাকের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই দেশের বীরপুরুষগণ পারসিক সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া, গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করিয়া, ভুবনবিখ্যাত থার্ম্মপিলির যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়গৌরব লাভ করিয়াছিল। * কালক্রমে এই প্রদেশ আবার কিছুকালের জন্য গ্রীকদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে গান্ধার প্রদেশে গ্রীকদিগের আদর্শ কিছুকাল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর, তদ্দেশে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সত্য সত্যই গ্রীকসংস্রবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। * সে মূর্ত্তি শ্রীমূর্ত্তি হয় নাই;—তাহাতে লালিত্যের আড়ম্বর থাকিলেও, ভাবগাম্ভীর্য্যের অভাব ঘটিয়াছিল, সমাধির ভাব বিকশিত না হইয়া, তন্দ্রার ভাব বিকশিত হইয়াছিল! ভাবের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিন্যাসের, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিন্যাসের সহিত বসনভূষণের পারিপাট্যের যে অপরিহার্য্য সামঞ্জস্য শিল্পকৌশলের গৌরব ঘোষণা করিতে পারে, গান্ধারের শিল্প-কারগণের ভাস্কর্য্যে তাহা অভিব্যক্ত হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নরমূর্ত্তিকে আদর্শ করিবার জন্য গ্রীকশিল্পের যে প্রবল লালসা তাহাকে বিশেষভাবে "আকার-লোলুপ" করিয়া রাখিয়াছিল, গান্ধারের শিল্পকার-গণের পরানুকরণপ্রবৃত্তি তাহাকেও আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, শ্রীমূর্ত্তিরচনার সময়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। † গান্ধার-শিল্পের যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। কোথায় ভারতবর্ষের তপস্যা-লব্ধ

* The Gandaris furnished their contingent to the army of Darius in the invasion of Greece.—*Budhist Art in India*, p. 75

* খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮০ অব্দে থার্ম্মপিলির যুদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে গ্রীকবীর শেকন্দর কর্ত্তৃক গান্ধারজয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪২ অব্দে গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচার। গান্ধার-শিল্পের প্রথম চেষ্টা গ্রীক-আদর্শের অনুকরণে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাকে গান্ধার-শিল্পের প্রাদেশিক বিশেষত্ব বলিতে পারা যায়; সমগ্র ভারত-শিল্পের পরানুকরণপ্রিয়তার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

† শ্রীযুক্ত হাভেল সাহেব ইহাকে বলিয়াছেন—"insincerity of Gandharan art."

অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্যের বিকাশ, আর কোথায় গান্ধারের পরানুকরণলব্ধ বাহ্য চাকচিক্যের আতিশয্য! অল্পদিনের মধ্যেই এই পার্থক্য এরূপ বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, গান্ধার-শিল্প ধীরে-ধীরে তাহার পরানুকরণপ্রবৃত্তি সংযত করিয়া, আবার ভারতীয় ভাবমাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে যত্নশীল হইয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকারগণকে শ্রীমূর্ত্তি-রচনায় নিযুক্ত করিলে যাহা হয়, সেকালের গান্ধারের শিল্পকারগণকে বুদ্ধ-মূর্ত্তি-রচনায় নিযুক্ত করিয়াও তাহাই হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন, গান্ধারেই শ্রীমূর্ত্তি-রচনার প্রথম প্রয়াস পরানুকরণে উৎসাহ লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে ভারতবর্ষীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের জন্ম দান করিয়াছিল, তাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ।*

যাহা গান্ধার-ভাস্কর্য্য নামে কথিত, তাহাই যদি [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] বহুস্থানে [illegible] হইলে, [illegible] গান্ধার-ভাস্কর্য্যের বহুসংখ্যক নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিতে পারিত। যাহা হউক, গান্ধার-ভাস্কর্য্য আমাদিগকে একটি শিল্প-রহস্যের সন্ধান প্রদান করিয়া, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের প্রকৃত লক্ষ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষের মূর্ত্তিশিল্পে আকারানুকরণের আতিশয্য থাকিতে পারে না কেন, তাহা গান্ধার-ভাস্কর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতিভাত হয়। নরমূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অস্থিমাংসশিরা প্রভৃতি যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নরমূর্ত্তিকে দেবমূর্ত্তির আদর্শরূপে অবলম্বন করিবার উপায় তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুর্য্য বিকশিত করিয়া দেবমূর্ত্তিরচনার সাফল্য লাভ করিতে হইলে, শিল্পকারকে নর-মূর্ত্তির অস্থিসংস্থানাদি বিশেষভাবে জানিয়া রাখিতে হইবে। অস্থিমাংসশিরার যথাদৃষ্ট অবস্থানের অনুকরণ করিবার জন্যই জানিয়া রাখিতে হইবে না,—কেবল তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই জানিয়া রাখিতে হইবে। কি করিলে দেবমূর্ত্তি নরমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে না, তাহা জানিতে হইলে অস্থি-সংস্থান বিদ্যা অধিগত করিতে হইবে। যাঁহারা আকারানুকরণের অসম্পূর্ণ নিদর্শন দেখিয়া মনে করেন, ভারতবর্ষের শিল্পকারগণ অস্থি-সংস্থান-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পারেন, আকারানুকরণের অসম্পূর্ণ নিদর্শনই অস্থি-সংস্থান-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিবার প্রধান প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। যেখানে যে পরিমাণে আকারানুকরণ করিতে হইবে, এবং যেখানে যে পরিমাণে সে চেষ্টা সংযত করিয়া দেবভাব বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা ভারতবর্ষের ন্যায় অন্য কোনও সভ্যদেশে বিকশিত হইয়াছে কি না, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয়। তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; তাহাকে ভারতবর্ষের পক্ষে অতিমাত্রায় আত্মপ্রশংসা-লাভের প্রগল্‌ভতা বলিয়া অবজ্ঞা করিবারও

* The Gandharan School is not an example of Hellenistic influence upon Indian art but the reverse; it shows Greeco-Roman art being gradually Indianised.—Havell's *Indian Sculpture and Painting*, p. 11

প্রয়োজন নাই। তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরিয়া যে ভাবে অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিবিধ দেবমূর্ত্তির উদ্ভাবনীয় তপস্যাপরায়ণ হইয়াছিল, অন্য কোনও সভ্যদেশকে সে ভাবে শ্রীমূর্ত্তির রচনা-কৌশলের অনুশীলন করিতে হয় নাই। ইহা কাহারও নিন্দার এবং কাহারও প্রশংসার কথা নহে; ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধানলাভের উপায় নাই।

যথাযথ আকারানুকরণ করিতে পারিলে কখন কখন শিল্পের কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে;—সকল সময়ে সকল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। আকারানুকরণ করিতে গিয়া, সকল সময়ে সমগ্র আকারকে অনুকরণ করিয়া বসিলেও, শিল্পের উদ্দেশ্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা সকল সময়ে, সকল দিক্ হইতে, বাহ্যবস্তুর সমগ্র অবয়ব দৃষ্টিগোচর করিতে পারি না;—যাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারি, তাহার অধিক আকারানুকরণ করিলেও, তাহা স্বাভাবিক হয় না। যাহা দেখি, তাহার সকল অংশেরও অনুকরণ করিতে পারি না। যতদূর হইতে দেখি যেরূপ আলোকের সাহায্যে দেখি, যেরূপ পারিপার্শ্বিক পদার্থনিচয়ের সংশ্রবে দেখি, তদ্দ্বারাই আকারানুকরণ পরিচালিত হইয়া থাকে। যাহা "আছে," তাহার অনুকরণ করিতে পারি না;—যাহা "প্রতিভাত" হয়, তাহারই অনুকরণ করিতে পারি। তাহাই মূর্ত্তিশিল্পের লক্ষ্য। মহামতি রস্কিনের সুতীব্র সমালোচনাবলে এই শিল্পতত্ত্ব এক্ষণে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাহা "আকারানুকরণ" নামে কথিত, তাহাও প্রকৃত পক্ষে অসংযত আকারানুকরণ নহে;—বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা "প্রতিভাত" হয়, তাহারই অনুকরণমাত্র। এই বাহ্যদৃষ্টি কিরূপ বাহ্যদৃষ্টি? তাহা অন্তর্দৃষ্টির অনুগত;— শিক্ষা, সংস্কার, ধ্যানধারণার অনুগত,—ব্যক্তিগত এবং জাতিগত সৌন্দর্য্যবোধশক্তির অনুগত। যাহার যেমন অন্তর্দৃষ্টি, সে বাহ্যদৃষ্টিতেও সেইরূপ বাহ্যরূপই দৃষ্টিগোচর করে। যাহার যেরূপ সৌন্দর্য্যবোধশক্তি, সে চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে তাহাই অভিব্যক্ত করিবার জন্য প্রযত্ন প্রকাশিত করিয়া থাকে। *

ভারতবর্ষের শিল্পকারগণ অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাবে অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রীকে যে ভাবে দর্শন করিতেন, সেই ভাবের অনুগত ও উপযোগী বাহ্যরূপের কল্পনা করিতেন;—তাহাই চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত হইত। তাহা তাঁহাদিগের মানসী মূর্ত্তি;—ধ্যানলভ্য বলিয়া ধ্যানগম্য;—তাহার সহিত আকারানুকরণের আতিশয্য জড়িত হইতে পারে না। যে সকল শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে উদ্ভাবিত হইয়া বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত এবং সুগঠিত

---

* মনস্তত্ত্বের এই নিগূঢ় রহস্য অতি পুরাকালেই প্রাচ্য মানবসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহা এতকালের পর আবার সমালোচিত হইতেছে। যথা;—"When we see, hear, touch or move, what comes before us, is really contributed *more* by the *mind* itself than by the present object,'—Bain's Mind and Body.

দেবায়তন মধ্যে ধূপদীপে অর্চ্চিত হইবার সময়ে লোকলোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, আমরা সেই সকল শ্রীমূর্ত্তির ক্ষতবিক্ষত কলেবর, ভগ্নাবশেষের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, উন্মুক্ত দিবালোকে,—শ্রদ্ধাহীন কৌতুহলের অসংযত দৃষ্টিতে,—সকুন্মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার রচনা-কৌশলের প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধানলাভের আশা করিতে পারি না!* যাহা ছিল, তাহা নাই। যাহা আছে, তাহাও সেরূপ ভাবে বর্ত্তমান নাই।

বাহ্যদৃষ্টির সাহায্যে বাহ্যবস্তুর আকারে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে কাল্পনিক বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি না;—শিল্পের অনুপযোগী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেও পারি না। সাধারণ বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা অদৃশ্য, অন্তর্দৃষ্টির নিকটে তাহা প্রতিভাত হইতে পারে। এমন কি, ধ্যাননিষ্ঠের নিকটে তাহাই "বাস্তব;"—বাহ্যদৃষ্টিলব্ধ বাহ্যরূপ "অবাস্তব" বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাহা স্বপ্ন,—তাহা মায়া,—তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভারতশিল্প স্বপ্নাতীত, মায়াতীত চিরসুন্দরের ভাবমাধুর্য্য প্রতিফলিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতবর্ষের কোন লক্ষ্যই যেমন এখানে—এই মরজগতের ধূলামাটিতে—প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাহার মূর্ত্তিশিল্পের লক্ষ্যও সেইরূপ। তাহা মূর্ত্তি ছাড়িয়া, মূর্ত্তিরূপের অভ্যন্তরে—অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে—অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। তাহার একমাত্র লক্ষ্য—অমূর্ত্ত ভাবসামগ্রীর শ্রীমূর্ত্তিরচনা।

শ্রীমূর্ত্তিরচনার সহিত কেবল যে ভারতবর্ষেরই ইতিহাসের সংস্রব আছে, তাহা নহে। ইহার সহিত মানবমনের ক্রমোন্মেষের বিচিত্র ইতিহাসও জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মানবমনকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য আধুনিক সভ্যসমাজে যে নবচেষ্টা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহা দিন দিন নূতন নূতন মনস্তত্বের সন্ধান লাভ করিয়া পুরাতন ভারতবর্ষীয় তত্ববিদ্যার গূঢ়মর্ম্ম অনুভব করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত কত শক্তির কত অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাত মানব-মনের অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে তাহা জানিয়া শেষ করিবার উপায় নাই। কেবল জ্ঞাতের দোহাই দিয়া মানব-মনের সকল প্রকার বিচিত্র চিন্তার,—সকল ধারণার, সকল অনুভূতির—গূঢ়মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। অনি-

* The grandeur of Asoka—ideal type of Asiatic monarchs, whose edicts dictated terms to the sovereigns of Antioch and Alexandria—is almost forgotten among the crumbling stones of Bharhut and Budha Gaya. The jewelled Court of Vikramaditya is but a lost dream, which even the poetry of Kalidasa fails to evoke. The sublime attainments of Indian art, almost effaced as they have been by the rough-handedness of the Hunas, the fanatical iconoclasm of the Mussalman, and the unconscious vandalism of mercenary Europe, leave us to seek only a past glory in the mouldy walls of Ajanta, the tortured sculpture of Ellora, the silent protests of rock-cut Orissa, and finally in the domestic utensils of the present day, where beauty clings sadly to religion in the midst of an exquisite home-life.—*The ideals of the East.*

র্ব্বচনীয় হইলেও, অনেক অজ্ঞাত প্রতিঘাতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা কখন কখন সাহিত্যে ও শিল্পে আত্মপ্রকাশের আভাস প্রদান করিয়া থাকে। ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে সেরূপ আভাস সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের অনির্ব্বচনীয় মনস্তত্বের সন্ধান লাভের আশা আছে। মানবমন পৃথিবীতে তাহার সমগ্র শক্তি-সামর্থ্যের যত নিদর্শন প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিনিচয় সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ। যাহা বাহ্যদৃষ্টির অগোচর, তাহাকে দেখাইবার চেষ্টার এই সকল অনির্ব্বচনীয় নিদর্শনের মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকৃত ইতিহাস লুকাইয়া রহিয়াছে। ইহার আলোচনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলে, বঙ্গসাহিত্য সমগ্র মানবসমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গলাজয়।

মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে গোবিন্দপাল দেব যে মগধের একাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপাদমন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে তিনি ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্ত্তী কালে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, (১) কারণ তাঁহার চতুর্দ্দশ রাজ্যাব্দ ১২৩২ বিক্রমসম্বতের সঙ্গে সমান। গোবিন্দপাল দেবের এই উৎকীর্ণ লিপিতেও "গতে" শব্দ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিগুলির সহিত ইহা মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে গয়ায় তাঁহার শাসনের কথা অতীত ঘটনার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাঁহার তথনও মৃত্যু হয় নাই, তাহা আমরা পরে দেখাইব। তাঁহার শাসনকালের প্রথমভাগে নালন্দা তাঁহার রাজত্বের সীমাভুক্ত ছিল; কারণ লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" পুথির পুষ্পিকায় আমরা দেখিতে পাই যে উহা গোবিন্দপাল দেবের শাসনকালের চতুর্থ বৎসরে লিখিত হইয়াছিল। (২) গয়ার উৎকীর্ণ লিপিদ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে একসময়ে গয়া গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সমস্তটি লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই বঙ্গেশ্বর কোন সেননরপতিই তাঁহার নিকট হইতে গয়া জয় করিয়া লইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি স্বয়ং লক্ষ্মণসেন। ৫১ লক্ষ্মণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়া-লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ঐ সময়ে গয়াপ্রদেশ সেননরপতিদিগের অধিকারে ছিল, কারণ যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অশোকচল্ল দেবের ন্যায় একজন

১ A. S. R. Vol. III, pt. XXXVIII, No. 18 Kielhorn's No 116.

২। ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থের XXII পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদেশী সে সময়ে বঙ্গেশ্বর সেননরপতিগণের অব্দ ব্যবহার করিতেন না। ৭৪ লক্ষণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ার লিপি হইতেও দেখা গিয়াছে যে তখনও গয়াপ্রদেশ বঙ্গেশ্বর সেন নরপতির অধিকারেই আছে এবং "গতে" শব্দ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে সেননরপতির অধিকার এই সময়ে অবিচ্ছিন্নই ছিল।

পূর্ব্বভারতের পালনৃপতিগণের রাজ্য কিরূপে ধ্বংস হইল তাহার নিশ্চিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। পালবংশের শেষ রাজার নাম এপর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা 'মদনপাল দেব'। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থানুসারে এই মদনপাল দেব মহোদয় বা কনৌজাধিপতি চন্দ্রদেবের সমসাময়িক,—

" কমলা-বিকাশ-ভেষজ-ভিষজা
চন্দ্রেণ বন্ধুনোঽপেতাম্
চণ্ডীচরণ সরো (জ)-প্রসন্ন সম্পন্ন
বিগ্রহশ্রীকং
ন খলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ
জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ। (৩)

এতদনুসারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বৈদ্যদেব প্রদত্ত কমৌলি তাম্রশাসনের যে সময় মিঃ ভেনিস নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা একবারে ভুল। (৪) উহার যথার্থ সময় ১০২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পড়িবে। সারনাথে প্রাপ্ত মহীপাল-লিপির তারিখ ১০২৬ খৃষ্টাব্দ (৫) এবং চন্দ্রদেবের চন্দ্রাবতী-শাসনের তারিখ ১০৯০ খৃষ্টাব্দ। (৬) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ৬০ বৎসরের মধ্যে পালরাজগণের কোন বিবরণ জানা যায় না। গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে গোবিন্দপাল দেব পালরাজবংশেরই কেহ হইবেন, কিন্তু তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজিও পাওয়া যায় নাই। দুইটি ব্যাপারে কিন্তু এই অনুমান কতকটা সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ তাঁহার নামের শেষে 'পাল' শব্দ আছে এবং দ্বিতীয়তঃ তিনিও পালরাজগণের ন্যায় বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ধ্বংসের পরও বৌদ্ধলিপিকারেরা কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারই নামে পুথির পুষ্পিকায় লিপির তারিখ উল্লেখ করিবার প্রথা বজায় রাখিয়াছিলেন। (৭) তাঁহার রাজত্বও যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা জানা যায় না। তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি মগধ বা দক্ষিণ বিহারের কতকাংশে রাজত্ব করিতেন এবং বঙ্গেশ্বর সেননরপতিগণের সহিত যুদ্ধে সেই রাজ্যেরও কতকাংশ ক্রমশঃ হারাইয়াছিলেন। তিনি ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তবকত-ই-নাসিরিতে যে বিহারনগরীকে তাঁহার শেষ আশ্রয়দুর্গ বলা হইয়াছে, তাহাতে হয় ত সত্য থাকিতে

৩। সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিত—Memoirs A. S. B. Vol. II.

৪। Epi. Ind. Vol. II.

৫। Annual Report of Arch. Survey of India, 1903-4.

৬। Epi. Ind. Vol. IX, p. 302.

৭। Bendall's Catalogue of Sans. Mss., in the University Library, Cambridge,—Buddhist Sanskrit Manuscripts.

পারে। (৮) তিনি তাঁহার রাজত্বকালের ৩৮ বৎসরে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত হন, (১১৬১+৩৮=১১৯৯ খৃষ্টাব্দ) একজন বৌদ্ধলিপিকার সদুঃখে এই ঘটনা একখানি পুথির পুষ্পিকায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—

"পরমেশ্বরেত্যাদি, রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাম্ বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরেঽভিলিখ্যমানো"—(৯)

রামচরিতে মদনপালকে 'অঙ্গেশ' অর্থাৎ অঙ্গদেশপতি বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সময়ে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ সেনরাজগণের অধীনে স্বাধীন রাজ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেনরাজগণ প্রবল হইয়া পালরাজগণ হইতে দেশের পর দেশ কাড়িয়া লইতেছিলেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমান-বিজয়ের সময় কেবল বিহার ও রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশটুকু গোবিন্দপাল দেবের অধিকারে ছিল। বিহারের অবশিষ্টাংশ এবং সমগ্র বঙ্গ সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ৬০ বৎসরে পালরাজত্বের অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশী রাজগণের আক্রমণেও বিশেষ উপদ্রুত হইতেছিল।

কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রদেবও ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধ আক্রমণ করেন এবং মুদ্গগিরি (মুঁঙ্গের) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোরক্ষপুর জেলায় লারগ্রাম হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তিনি মুঙ্গেরে অবস্থানকালে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গঙ্গাস্নান করিয়া গোরক্ষপুরের অন্তর্গত কোন গ্রাম এক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন। (১০) কনোজাধিপতি যে বন্ধুতাসূত্রে বা তীর্থস্নানের জন্য ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই, বরং তখনকার দুর্ব্বল মগধরাজ্যে আপতিত হওয়াই বেশী সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহার ২৫ বৎসর পরে দেখা যাইতেছে, গয়াপ্রদেশ বঙ্গেশ্বর সেননরপতিগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। মগধের প্রান্ত প্রদেশের অধিকার লইয়া এই সময়ে যে পালরাজগণ ও সেনরাজগণের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অন্তর্বিদ্রোহ শেষে মুসলমানের আগমনে মিটিয়া যায়। তুর্কীরা আসিয়া উভয় রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে। বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং মগধরাজ গোবিন্দপাল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন। এই ধর্ম্মমতের অসাদৃশ্য হইতেই হয় ত বা উভয় রাজ্যে চিরবিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। ধর্ম্মগত এই বিবাদের কথার ইঙ্গিত একখানি বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য হইতেও পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ধর্ম্মপূজার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের পূজকসম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে" এই ইঙ্গিত দেখা যায়। শাস্ত্রী

৮। Raverty's Tabaqat-i-Nasiri (Bib. Ind.)

৯। Bendall's Catalogue of Sans. Mss. in the University Library of Cambridge. —Buddhist Sanskrit Mss. P. iii.

১০। Epi. Ind. Vol. III, p. 88.

মহাশয় এই পুস্তক আবিষ্কার করেন; এবং ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে বৌদ্ধেরা মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। ইহাতে কথিত হইয়াছে ধর্ম্ম যবনরূপী (মুসলমান) হইয়া কৃষ্ণবর্ণের টুপি মাথায় দিয়া বৌদ্ধদিগের পরিত্রাণহেতু আসিয়া উপস্থিত হইলেন! (১১) ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মগধে পার্শ্ববর্ত্তী ভূপালেরা আপতিত হইতেছিলেন। সেনরাজগণের সঙ্গেই পালরাজগণের বিবাদ একপ্রকার চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছিল; কাজেই যখন কনোজের রাঠোড়রাজ উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন কেহই ভাল করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে পারিলেন না; তিনি স্বচ্ছন্দে মুঙ্গের পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন। এই সুযোগ দেখিয়াই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খানের ও বিহার নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সাহসী হন। পালরাজগণ তখন অতি দুর্ব্বল। তাঁহারা এই বিদেশীয় আক্রমণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। বঙ্গেশ্বর সেনরাজও তখন এই বিদেশী শত্রুকে বাধা দিবার অবসর পান নাই। তাঁহাকেও তখন স্বীয় গৃহবিবাদে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে আমরা দেখিতে পাই লক্ষ্মণসেনের পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন রাজা হন। তাম্রশাসন হইতেই এই দুই নৃপতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে কেশবসেনের উল্লেখ আছে। কর্ণেল জ্যারেট অনুবাদকালে "কেশুসেন' নাম পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কেশোয়া অর্থাৎ 'কেশব' হইবে। (১২) ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ কেশবসেন দেবের একখানি তাম্রশাসন প্রকাশিত করেন। (১৩) তিনি রাজার নামটি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন তাহা শুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে উক্ত শাসনের রাজনাম বিশ্বরূপসেন বলিয়া পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে। (১৪) নগেন্দ্রবাবুর মতই ডাঃ কীলহর্ণ্‌ স্বীকার করিয়া তাঁহার সংগৃহীত উত্তর ভারতীয় উৎকীর্ণলিপির তালিকায় উহাকে বিশ্বরূপসেনের শাসন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (১৫) নগেন্দ্রবাবু তাম্রশাসনখানির ১০ম কবিতায় ১৭শ পংক্তিটি সংশোধন করিয়াছেন। এই কবিতার শেষাংশের কথা কয়টির পাঠ তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ; কিন্তু তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজনাম আছে, তাহা মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। উহা 'কেশবসেন'। দাতার নামস্থলেও যে সেই নামটি আছে, তাহা ৪০—৪৩ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই হইবে। লিপিখানির প্রকৃত পাঠ এই,—

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানুধ্যাত সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যুপেত অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-

১১। The discovery of Living Buddhism in Bengal by Mahamahopadhyaya H. P. Shastri.

১২। Jarrett's Ain-i-Akbary (Bib. Ind.) II. Vol., p. 126.

১৩। J. A. S. B. Vol., VII., pt. I., p. 44.—1838.

১৪। J. A. S. B. Vol. pt. I.—1895.

১৫। Epi. Ind: Vol. V. Appendix p. 43, No. 549.

রাজত্রয়াধিপতি সোমকুলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগতবজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজঅসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ কেশবসেনদেবপাদাবিজয়িনঃ”—তর্পণ দীঘী (১৬) ও আনুলিয়ায়, (১৭) প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের শাসনে “শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব কুশলী”—এবং বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে প্রাপ্ত শাসনে (১৮) শ্রীবিশ্বরূপসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ”—এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। যদি বাকরগঞ্জ শাসনখানি বিশ্বরূপসেনের প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে দাতার নামস্থলে উহাতে আমরা অন্যের নাম কেন দেখিতে পাইতেছি? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ইদিলপুরে প্রাপ্ত শাসনখানির নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি সংশোধনকালে

(পংক্তি ১৭)......

“তস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধুবৈধব্যবদ্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপ:” ইত্যাদি স্থলে তস্মাৎ কথমন্যথা রিপু-বধু-বৈধব্যবদ্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন।

এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে ইদিলপুরের শাসনখানিও বিশ্বরূপসেনদেবের প্রদত্ত এবং কেশবসেনের নহে। এই অবস্থায় নগেন্দ্র বাবু বিশ্বরূপ শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র নাম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, লক্ষ্মণসেনকে করা হয় নাই। আর তাহা হইলে, তাড়াদেবী (?)কে বিশ্বরূপের মহিষী বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; লক্ষ্মণসেনের মহিষী বলিতে পারা যাইবে না। অবশেষে ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে বিশ্বরূপসেন রাজা বিশ্বরূপের ঔরসে মহিষী তাড়াদেবীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!!!

প্রকৃত প্রস্তাবে ইদিলপুরের শাসনখানি কেশবসেনেরই প্রদত্ত। তিনি লক্ষ্মণসেনের জনৈক পুত্র, তাঁহার—“অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর” ইত্যভিধেয় বিরুদ (রাজোপাধি) ছিল। এইরূপে লক্ষ্মণসেনের দুইটি পুত্রের বর্ত্তমানতা তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেশবসেন প্রদত্ত ইদিলপুরের শাসনে মদনপাড়-শাসনের সমস্ত শ্লোকই আছে, এবং তদতিরিক্ত আরও কয়েকটি শ্লোক অধিক আছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান হয় যে বিশ্বরূপ কেশবসেনের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ইদিলপুর শাসনে কেশবসেনের নাম দুই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখা যায় যে কোন একটি নাম চাঁছিয়া ফেলিয়া কেশবসেনের নাম পুনরায় খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে স্থানে এইরূপ করা হইয়াছে, সেখানে নূতন নামটি ধরিবার কোন কষ্ট হয় নাই। মদনপাড়-শাসনেও ঐরূপ বিশ্বরূপ নামটি দুইবার আছে এবং প্রত্যেক

১৬। J. A. S. B. pt. I—1875, p. 1.
১৭। Ibid 1900 pt. I.
১৮। J. A. S. B. 1896 pt. I p. 9.

স্থানেই শিল্পীকে স্থানের অসচ্ছলতায় নামের অক্ষরগুলি অত্যন্ত ঘন করিয়া খুদিয়া দিতে হইয়াছে। ইহাতে 'বিশ্বরূপ' নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর হইতে ছোট হইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব যে কোন একটি তিন অক্ষরের নাম চাঁছিয়া 'বিশ্বরূপ' এই চারি অক্ষরের নাম সেই স্থানে বসান হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে লক্ষণসেনের পর মধুসেন নামে একটি রাজনাম পাওয়া যায়। এই নামটি অন্যায় রূপে অক্ষরান্তরিত হইয়াছে,—ইহা 'মাধবসেন' হইবে। যদি এট্‌কিনসনের উক্তি সত্য হয়, তবে বলিতে হয় মাধবসেনেরও একখানি দলীল পাওয়া গিয়াছে, (১৯) কিন্তু তাহার পাঠোদ্ধার আজিও হয় নাই। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে মদনপাড়-শাসনে এই মাধবের নাম চাঁছিয়া বিশ্বরূপের নাম বসান হইয়াছে, তাহা হইলে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের বংশলতা এইরূপ হয়,—

বীরসেন
।
সামন্তসেন
।
হেমন্তসেন
।
বিজয়সেন
।
বল্লালসেন
।
লক্ষ্মণসেন
।
। । ।
মাধবসেন (?) বিশ্বরূপসেন কেশবসেন।

বাঙ্গালার কুলাচার্য্যগণের বংশলতা হইতেও জানা যায় যে কেশবসেনই গৌড় ত্যাগ করেন। (২০) কুলাচার্য্যগণের এই সকল কুলগ্রন্থ ঐতিহাসিক সাবধানতাসহকারে লিখিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এবং সে জন্য প্রসিদ্ধও নহে। কিন্তু এস্থলে এই সমানোল্লেখ অনেকটা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। লক্ষ্মণসেনের পর দেখা যাইতেছে যে তাঁহার দুই বা তিন পুত্রই তাঁহার পর প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শেষ রাজা কেশবসেনই মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড় হইতে বিতাড়িত এবং কোন পূর্ব্ব রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্বদেশাধিপতির নাম জানা নাই, তবে নগেন্দ্র বাবু এডুমিশ্রের যে কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়েশ্বর সেনদিগের কোন সামন্ত নৃপতি নহেন।

সংক্ষেপতঃ মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্‌কালে বাঙ্গালা ও বিহারের অবস্থা বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। মগধের শেষ বৌদ্ধ নৃপতি কয়েক মাইল মাত্র রাজত্বের অধিপতি ছিলেন। তাহাও আবার অন্তর্বিপ্লবে-হিন্দু-বৌদ্ধসংঘর্ষে—পালরাজ ও সেনরাজগণের পরস্পর আক্রমণে উদ্বাস্তু হইতেছিল।

১৯। Atkinson's Kumaun, p. 10.

২০। J. A. S. B. Vol. LXV (1896), pt. I. p. 24.

প্রবল পরাক্রান্ত কনোজরাজ গোবিন্দচন্দ্র যথন এই সংঘর্ষের মধ্যে আপতিত হইয়া-ছিলেন, তখনও বঙ্গবিহারের চৈতন্য হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবতঃ কোনও বিদ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেনরাজবংশীয়েরা তখন আত্মকলহে মত্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা আজিও জানা যায় নাই; কিন্তু এই সময়ে মাধবসেনের কতিপয় অনুচর যে গঢ়োয়াল প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে হিন্দু-রাজগণের মধ্যে যে কোন না কোন উৎপাত চলিতেছিল, তাহা স্পষ্ট সূচিত হয়, নতুবা মাধবসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের অধিকারী ব্রাহ্মণ বিষয়সম্পত্তি ও রাজ-অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া ওরূপ দূরদেশে নিজ দলীল-দস্তাবেজ লইয়া গিয়া বাস করিবে কেন? ইহা হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুত্রগণও পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়াছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গঢ়োয়ালে পলাইয়া গিয়াছিলেন। একবারে অত দূর-দেশে পলায়নেরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে। অশোকচল্লদেব বা তাঁহার ভ্রাতা দশরথ যথন বুদ্ধগয়া দর্শনে এদেশে আসিয়াছিলেন, তথন হয় ত এই সেন-রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে বিপৎকালে সেই দূরগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এ ঘটনা কনোজধ্বংসের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত উপদ্রব—অশান্তিতে ডুবিয়া ছিল। তুর্কীগণের উৎপাতই তাহার মধ্যে প্রধান।

৩০ বৎসর মধ্যে তিনজন সেনরাজ-পুত্রই একে একে সিংহাসনারোহণ করেন। ইহা এক এক তাম্রশাসনে পুরাতন দাতার নাম চাঁছা ও পুনরায় তাহাতে নূতন রাজ-নাম বসাইবার ব্যাপার হইতে পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাও অল্প অশান্তির পরিচায়ক নহে। এইরূপ অবস্থার সুযোগে যথন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বিহারে আসিয়া পড়িলেন, তখন দুর্ব্বল মগধরাজের বাধা দিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। এবং বঙ্গের হিন্দুরাজও নিজরাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের সামন্ত ও শাসনকর্তৃগণের বিদ্রোহ এবং ভ্রাতৃ-বিদ্রোহ লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণও বোধ হয় তাদৃশ বলশালী ছিলেন না, কাজেই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ক্রমশঃ সাহসী হইয়া শোণ-গঙ্গা-সঙ্গমস্থলে মানের পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন। শোণ পার হইতেও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না এবং বিহার নগরের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ করিলেও তাঁহাকে এথানে দাঙ্গা ব্যতীত যুদ্ধই করিতে হইল না; কারণ মহম্মদ বখ্‌-তিয়ারের একটু ভুল হইয়াছিল। পর্ব্বতশীর্ষে এই সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় বিহারটিকে তিনি নিম্ন ও দূরভূমি হইতে সুদৃঢ় পার্ব্বত্য দুর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দেশের কৃষক-সম্প্রদায় ও নিরীহ যাজকসম্প্রদায় আপনা-দের দেবস্থান, ধর্ম্মভবন রক্ষার জন্য লাঠি-ঠেঙা লইয়া আসিয়া তুর্কীসৈন্যকে যতটা পারিল বাধা দিতে গেল, কোন ফল হইল না। যিনি রাজা, তিনি তখন বৃদ্ধ এবং তাঁহার সৈন্যবলও সামান্য; কাজেই তাহা দ্বারাও কোন প্রতিকারের আশা ছিল না। দেশের লোকে বহুকালাবধি এরূপ বিদেশী

শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। যে হূনেরা ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গুপ্তরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল; তাহাদের পর এদেশে আর বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ঘটে নাই; কাজেই দেশের সাধারণ লোকে তুর্কীদিগের আক্রমণে একবারে ভয়ে অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই মুসলমান-বিজয় অতি সহজে সুসিদ্ধ হইয়া গেল। গজনীর মামুদ যে কয়বার ভারত আক্রমণ করেন, সে কেবল লুঠের উদ্দেশ্যে, এ দেশের কোন রাজ্যাধিকারের আশায় নহে। কাজেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সে উৎপাত চুকিয়া গিয়াছিল।

বিহারের বৌদ্ধবিহার ধ্বংস গোবিন্দপালদেবের রাজত্বের অষ্টাত্রিংশবর্ষে অর্থাৎ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা রেভার্টি (২১) ও ব্লকম্যান (২২) সাহেবের নির্দ্দিষ্ট মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময় সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি। তবকাত-ই-নাসিরিকে যদি এজন্য আমাদের কোন মূল্য দিতে হয়, সে কেবল ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-বিজয় হইয়াছিল, ওই ঘটনাটুকু প্রকাশের জন্য। উহার গ্রন্থকার প্রায় তৎকালবর্ত্তী লোক; সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণকে আমরা অনেকটা বিশ্বাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বঙ্গবিজয়ের ৪২ বৎসর পরে তিনি এদেশে আসেন, (২৩) এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন সৈনিকদিগের মুখে শুনিয়া বঙ্গবিজয়বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। (২৪) পরবর্ত্তীকালের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা উহা হইতে বঙ্গজয়বিবরণ নকল করিয়া সারিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের গ্রন্থে আর বেশী কিছু নাই। তাঁহারা বরং এই ঘটনাটিকে বিজেতার অসীম পরাক্রমের ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। রেভার্টি তবকাত-ই-নাসিরির অনুবাদ কালে এই সকল ঐতিহাসিকের প্রতি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। (২৫)

তবকাত-ই-নাসিরির মতে গৌড়বিহার-বিজেতা মহম্মদ বখ্‌তিয়ার গোর প্রদেশের অধিবাসী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসিয়া অযোধ্যার মালিক হুসামুদ্দীন অগলবকের নিকট অবস্থান করেন ও তাঁহার কাছে আশানুরূপ স্থান প্রাপ্ত হন। এই স্থান হইতে বখ্‌তিয়ার মধ্যে মধ্যে সৈন্য-সামন্ত লইয়া দক্ষিণ বিহারে লুঠপাট করিতে আসিতেন। ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া গেলে, তিনি ক্রমশঃ বিহারের সকল প্রদেশেই প্রবেশ করিতে থাকেন। ক্রমে সজ্জারাম লুঠের ব্যাপার ঘটে। ইহাকেই যদি তাঁহার বীরত্বের পরিচয় বলিতে হয়, তবে দস্যুতা আর কাহার নাম! ইহার পর তাঁহার ধনগৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া, তাঁহার

২১। J. A. S. B. 1876, Pt. 1, p. 331—32,

২২। J. A. S. B. 1875, pt I. p. 276 এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত J. & P. A. S. B. Vol. V, p. 51.

২৩। Tabaqat-i-Nasiri—Raverty, p. 663.

২৪। ঐ p. 553.

২৫। ঐ p 558.

আত্মীয় স্বজন তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমিতে থাকে; এবং তাহাদিগকে লইয়াই তিনি ১২০০ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালা আক্রমণ করেন।

ইহার পর হইতে তবকাত-ই-নাসিরিতে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে লোকে কোন সাহায্য না পাইয়া আরও গোলমালে পড়িয়া যায়। বঙ্গের মুসলমান-বিজয়ের সময়ে লক্ষ্মণসেনকে তাহার অধীশ্বর বলিয়া উল্লেখ ও তাঁহার রাজ্যত্যাগের যে বিবরণ তবকাতে আছে, তাহাই তাহার প্রথম এবং মহাভুল। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে যে ঐ সময়ে কেশবসেন বঙ্গ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; এবং লক্ষ্মণসেন তখন কেন, তাহার অনেক পূর্ব্বে (১১৭০ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যের শাসনভার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পরের ভ্রম—নদীয়া আক্রমণের উল্লেখ। এই যুদ্ধযাত্রার বিবরণ অতিমাত্র তুচ্ছ এবং বোধ হয় অতি ব্যস্ততার সহিত লিখিত। মিনহাজ যাহার নিকট শুনিয়া এই বিবরণ সংগ্রহ করেন, হয় সেই ব্যক্তি স্পষ্ট করিয়া সকল কথা বলে নাই বা মিনহাজ সকল কথা মনোযোগ করিয়া শুনেন নাই। মিনহাজ বঙ্গজয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই,—"তাহার পর বৎসর মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিহার হইতে যাত্রা করিলেন এবং এরূপ বেগে হঠাৎ নদীয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সতের জনের অধিক অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে নাই।"—এই বর্ণনা অতি সরল এবং কেহই সেই জন্ত একাল পর্য্যন্ত ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উৎসুক হন নাই।

বিহার হইতে নদীয়ায় যাইতে হইলে, তিনটি রাস্তা ধরিয়া যাওয়া যাইত;—(১) বিহার হইতে ভাগলপুর বা মুঙ্গের হইয়া, গঙ্গাপার হইয়া গৌড়ে যাইতে হয়, তৎপরে পুনরায় ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে উত্তীর্ণ হইয়া নদীয়ায় পৌঁছিতে হয়। (২) ছোটনাগপুর ও বীরভূমের পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া অর্থাৎ প্রায় বর্ত্তমান রেল লাইনের ধার দিয়া নদীয়ায় যাওয়া যায় এবং (৩) সাহেবগঞ্জের পথ দিয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূলে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় ভাগীরথী বাহিয়া উহার পশ্চিম তীরে নদীয়ায় উত্তরণ করিতে পারা যায়।

বখ্‌তিয়ার কোন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, মিনহাজ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বলার রীতি হইতে বুঝা যায় যে এসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও বড় সামান্ত। তিনটির মধ্যে শেষটিই সহজ এবং অশ্বারোহী সৈন্তের পক্ষে সুগম। প্রথমটিতে দুইবার গঙ্গা পার হইতে হয়; ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা বড় সামান্ত কথা ছিল না। দ্বিতীয় পথটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। উহাতে পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, এবং উহার চারিদিকে স্বাধীন বন্যজাতির নিবাস। তখনকার কালের মল্লভূমির স্বাধীন সাঁওতাল সর্দ্দারেরা বখ্‌তিয়ারের মত বিজয়কামীর অনুচরবর্গকে ধ্বংস করিতে অতি সচ্ছন্দে সক্ষম হইত। বাঙ্গালা-জয়কর্ত্তারা সকলেই তৃতীয় পথ ধরিয়াই জয় করিয়াছেন, এবং প্রথম মুসলমান-বিজেতাও

সম্ভবতঃ এই পথেই আসিয়াছিলেন। অতিমাত্র ব্যস্ততাসহকারে সতেরজনমাত্র অশ্বারোহীকে লইয়া নদীয়া-জয়ের গল্পের কোন ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা নাই! এই ঘটনার বর্ণনাত্মক যে সকল উপাদান মিনহাজ শুনিয়াছিলেন, তাহা তাড়াতাড়িতে গুছাইয়া লিখিতে না পারায় ঐরূপ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম কথা এই,—নদীয়া বা নবদ্বীপ যে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে লক্ষ্মণসেনের সময়ে বিজয়পুর নামক নগরে রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই বিজয়পুর সুহ্মদেশে অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী নদীয়ার সহিত বিজয়পুরের অভেদত্ব নির্ণয় করেন, কিন্তু ইহার প্রমাণের জন্য কিছুই বলিবার নাই। এই অতিরঞ্জিত নদীয়া-আক্রমণের ব্যাপারটিকে বথ্‌তিয়ারের বাঙ্গালার বহুস্থান আক্রমণের মধ্যে একতম বলিয়া বোধ হয়। তিনি হঠাৎ একটি তীর্থস্থান আক্রমণ ও বশীভূত করেন। লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ব্যাপারটি নব্য ইতিহাসের একটা অতিমাত্র অতিশয়োক্তির নিদর্শন। সম্ভবতঃ সিংহাসনস্থ কেশবসেনই পলাইয়া থাকিবেন। বঙ্গের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে তখন কি সেনরাজ কি তাঁহার সামন্তরাজগণ, কেহই এই সকল মুসলমান-আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। মহম্মদ বথ্‌তিয়ার বিহার ও গৌড়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ তাঁহার জীবদ্দশায় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জয়ের দক্ষিণ সীমা গৌড় বা লখ্‌নৌতি বা লখ্‌নৌর বা লখ্‌নোর। এই সহর বর্ত্তমান বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। নদীয়া-আক্রমণে বিহার হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত যে জয় হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহার প্রতিপক্ষে অতি স্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে মুঘিসুদ্দীন উজবকের সময়ের পূর্ব্বে নদীয়া বিজিত হয় নাই। মিনহাজও বলিয়াছেন,—"মহম্মদ-ই-বথ্‌তিয়ার সেই প্রদেশ (রায় লখমণিয়ার রাজ্য) অধিকার করিয়া, নদীয়া নগরকে জনশূন্য করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং এখন যাহার নাম লক্ষ্মণাবতী, তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। (২৬) মহম্মদ বথ্‌তিয়ার নদীয়া ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় জয় করেন। জাজনগরের (উড়িষ্যার) রাজা ১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তখনও লখ্‌নৌর বাঙ্গালার মুসলমানদিগের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণবর্ত্তী প্রান্ত দুর্গ ছিল। এতদ্ভিন্ন মুঘিসুদ্দীন উজবকের যে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতে জানা যায় যে ৬৫৩ হিজিরায় বা ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। (২৭) এই মুদ্রাটির লিপির ব্যাখ্যা যে আর কিছু হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। ঐ মুদ্রার লিপির পাঠ এইরূপ, " হজজর্বে৷ বলকনৌতী মিন খিরাজ গরমর্দন ও মুদিয়া ফিঃ সনাহ্‌ সলসা ও খমসিন ও সিত্তামেয়াৎ

"৬৫৩ সালে গরমর্দন ও মুদিয়ার

২৬। Tabaqat-i-Nasiri.

২৭। Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, pt. II, p. 146.

রাজত্বের জন্ম লকনৌতী নগরে ইহা মুদ্রিত হইল।

গড়বর্দ্ধন শব্দে বর্দ্ধনকুটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। ঐরূপ মুদ্রা এখনও আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় নাই। হর্ণ্‌ল ইহার আর একটি দেখিয়াছেন বলেন। (২৮) আলতামশের একটি রৌপ্যমুদ্রার লিপির সহিত এই মুদ্রার লিপির মিল আছে। সেই মুদ্রাটি কনোজ-জয়ের সূচনার্থ মুদ্রিত বলিয়া অনুমিত। (২৯) এই ধরণের আরও একটি কামরূপ মুদ্রা আছে। উহা বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর বিন্‌ ইলিয়াসের রাজত্বকালে মুদ্রিত। উহাতে তাঁহার আসামজয় সূচিত হইয়া থাকে। আলতামশের কনোজ-মুদ্রার ভাষা পর্য্যন্ত মুঘিসুদ্দীনের মুদ্রার ভাষার সঙ্গে এক। নবাবিষ্কৃতের প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে জয়চন্দ্রের মুসলমানযুদ্ধে এটাওয়াতে মৃত্যু হইলে, গহড়বাল প্রদেশ তাঁহার অধিকারচ্যুত হয়। অনুমান হয় মুসলমানেরা গঙ্গার দক্ষিণ কূলে কূলেই আক্রমণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত দোয়াব প্রদেশ ও অযোধ্যা জয়চন্দ্রের পুত্রের হস্তেই ছিল। মিনহাজের পুস্তকে অযোধ্যাজয়ের কথা যাহা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা এই অনুমান হয় যে মুসলমানেরা উহার অতি সামান্য অংশই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের (জয়চন্দ্রের পুত্রের) মচ্‌লিসহরের তাম্রশাসনখানি ১২৫৭ বিক্রমসম্বতে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত। (৩০) উহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে তখনও জয়চন্দ্রপুত্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই শাসনখানির আবিষ্কারে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে জয়চন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ দশ বৎসর পরে কনোজ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল। কাজেই নদীয়ার শেষ বিজয় ১২৫৫ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। বলবনের বংশধরেরা যখন ৪০ বৎসর পরে বাঙ্গালার স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল, তখনই বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশ জয়ের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালার প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। তিনিই ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

যতটা দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অতি অল্প। উহা উত্তরে দেবীকোট বা দেওকোট; দক্ষিণে রাঢ়ের অন্তর্গত লখ্‌নোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (৩১) পূর্ব্বসীমা ঠিক নির্দ্দিষ্ট ছিল না। মুসলমানের বাঙ্গালা-জয়ের ব্যাপারে গৌড়-আক্রমণ ও অধিকারের বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়; কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই একটি কথাও বলেন নাই, সকলেই বিনাবাক্যে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতি-

২৮। J. A. S. B. 1881.

২৯। Catalogue of Coins in the Indian, Museum, Vol. II.

৩০। Annual Report, Arch. Survey of India, N. Circle, for 1908.

৩১। রেভার্টির অনুদিত তবকাত-ই-নাসিরি, ৫৮৫ পৃষ্ঠা। পুনর্ভবা নদীতীরবর্ত্তী দিনাজপুরের অন্তর্গত দমদমা নামক স্থান।

হাসিকেরা বিজেতা মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, (১)—"সুলতান এই ব্যাপার (বাঙ্গালাজয়) শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন এবং তাঁহাকে "বেঙ্গালা" দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াদিলেন।" (৩২) (২)—"বাঙ্গালারাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ কুতুবুদ্দীনের হস্তে প্রদত্ত হইল। সুলতান কুতুবুদ্দীন মালিক ইকৃতিয়ার-উদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তে বিহার ও লক্ষ্মণাবতী প্রদেশের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।" (৩৩)—এইরূপ ভাবের উল্লেখ নানা গ্রন্থে আছে। তবকাত-ই-নাসিরিই এই সকল ঐতিহাসিকের নিকট এই সময়ের ইতিহাসের জন্য একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল, তাহাতে কিন্তু ঐরূপ কোন কথার বাষ্পও নাই! মহম্মদ বখ্‌তিয়ার একজন ভাগ্যান্বেষী পুরুষ, অধ্যবসায় ও দুর্দ্দান্ত সাহসের বলে দেশের বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজের একটা রাজত্ব গুছাইয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যদি সুশৃঙ্খলে কোন যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার উত্তর-বাঙ্গালা ও আসামের পর্ব্বতনিম্নস্থ প্রদেশ জয়ের চেষ্টা, আর তাহাতে তিনি বিফল হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য সমস্ত যুদ্ধোদ্যোগ দস্যুর দেশাক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঘোররাজ্যের সহিত বা তাঁহার প্রতিনিধি দিল্লীপতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। তাঁহার সমধর্ম্মিগন তাঁহাকে একজন সঙ্কল্পসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। সারাবকের রাজা কককেও বোধ হয় ইংরাজেরা এই ভাবেই দেখেন। *

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩২। রাঙ্কিনের অনুদিত মুন্তখবুত্তরাবিখ প্রথমখণ্ড ৮২।৮৩ পৃ।

৩৩। মৌঃ আবদস্‌সলামের অনুদিত রিয়াজুস্‌-সলাতিন, ৫৯ পৃ।

* এই প্রবন্ধটি ইংরাজিতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ মহাশয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির "মিময়ার" নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আমরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া "বঙ্গদর্শনের" পাঠকবর্গের জন্য অনুবাদ করাইয়া দিলাম। এই প্রবন্ধে কনোজরাজ জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ব্যাপারের অনৈতিহাসিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তথ্য আবিষ্কারের জন্য রাখালদাস বাবু সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।—বং সং

বসন্ত-রাণী।

ভুবন ভরিয়া
এসগো আমার
　　ওগো বসন্ত-রাণী,
কোকিল কণ্ঠে
মধুপ গুঞ্জে
　　শুনিব তোমার বাণী।

বিটপ লীলায়
বাহু বিভ্রম,
　　সরোজে উরজ শোভা,
দশন কুন্দে
অধর বান্ধুলি
　　শশী মুখ মনোলোভা।

বকুল গন্ধে
অধর মদির
　　অশোকে চরণ পাত,
আকুলি উঠিবে
মলয় অনিল
　　লোল অঞ্চল সাথ।

সুনীল গগনে
নিলীম নয়ন
　　অলকে নিবিড় কেশ,
নদীর লহরে
যৌবন মদ
　　চন্দ্রিকা চারু বেশ।

ফুল্ল কুসুমে
হাসির বিকাশ
　　নয়নে লাগিবে ঘোর,
নিদাঘ মেঘের
বিদ্যুত রেখা
　　চকিত চাহনি তোর।

অন্ধ অমার
নয়নাঞ্জন
　　অরুণে ললাট টীকা,
সান্ধ্য গগনে
রক্তিম রাগ
　　তব অনুরাগ শিখা।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রত্নাকর—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। দস্যু রত্নাকর কেমন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি হইলেন এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই গল্প আছে। গল্পটি মামুলি এবং লেখার মধ্যেও কোন বিশেষত্ব নাই। বরঞ্চ গ্রন্থকার যেখানে নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে গিয়াছেন সেইখানেই গল্পটিকে নষ্ট করিয়াছেন। গল্প লেখা শক্ত, পুরাণ গল্পকে নূতন ভাবে লেখা আরো শক্ত লেখকের অক্ষমতায় পুরাতনের শ্রীত যায়ই নূতন কোনো ভাবও ফুটিয়া উঠে না। কঠিনহৃদয় দস্যু রত্নাকরের হৃদয়ে কেমন করিয়া করুণার উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল, কেমন করিয়া জগতের আদিকবি সেই বিগলিত ধারায়

ছন্দোবদ্ধ বাণী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতে হইলে, যে কবিত্ব এবং দক্ষতা আবশ্যক তাহা না থাকিলে এ গল্পে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার নিজের ক্ষমতা না বুঝিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তাহার ফল যাহা হইবার হইয়াছে

গন্ধপুষ্প—শ্রীমতিলাল দাস, বি, এ প্রণীত। মূল্য ৫৹ আনা। এখানি কবিতা পুস্তক এবং হাল-ফ্যাসান অনুযায়ী সুবিখ্যাত লেখকের ভূমিকা সম্বলিত। প্রবীণ সমালোচক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যে পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন তাহার উপর কলম চালাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু ভাল লাগিবার শক্তি সকলের সমান নহে। বোধ হয় আমরা "হৃদয়িক বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য নহি" তাই গন্ধপুষ্পের "কবিতার প্রাণতর্পণ আমোদ পাইয়া সুখী" হইতে পারি নাই এবং গন্ধপুষ্পের একটি পংক্তি কেন সমগ্র পুস্তকখানি পড়িয়াও আমাদের "হৃদয় ও মন আরও বহুকথা চিন্তা করিতে বাধ্য" হয় নাই। কবিতাগুলি পড়িয়া "বাধ্য" হইয়া আমাদের মনে যে সকল কথা উঠিয়াছিল তাহা লিখিতে হইলে অনেক অপ্রিয় সত্য বলিতে হয়, তাই বিস্তারিত সমালোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইল। শ্রদ্ধাস্পদ ভূমিকা-লেখকের সহিত এক বিষয়ে আমাদের মতের মিল হইয়াছে, পুস্তকের নামটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে সম্ভবত আরো অনেকের ভাল লাগিবে, কিন্তু হায়!

গুরু গোবিন্দসিংহ—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵৹ মাত্র। গ্রন্থখানি শিখদিগের দশমগুরু গোবিন্দসিংহের জীবনী তাহা লেখা বাহুল্য। গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়া দশম গুরুর জীবনের ঘটনাগুলি একত্র করিয়াছেন—ফলে তাহা ঘটনার সমষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে প্রতিভা, একাগ্রতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারা বিক্ষিপ্ত শিখদিগকে একতাদান করিয়া এক শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়া নিপীড়িত শিখমণ্ডলীকে নূতন তেজে নব শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়াছিল সেই অসাধারণ চরিত্র এ পুস্তকে ফুটিয়া উঠে নাই।

২০নং হরিতুকি বাগান লেনে কমারশিয়াল যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।